দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ২রা শ্রাবণ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 18th July, 1942 [[illegible] সংখ্যা

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত—

নয়দিন যাবৎ সুদীর্ঘ আলোচনা এবং বিবেচনা করিবার পর কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সিদ্ধান্তের সুস্পষ্টতায় এবং অন্তর্নিহিত

যুক্তির অভ্রান্ততায়, বিষয়োচিত ধীরতাপূর্ণ বিবেচনার গুরুত্বে ও দায়িত্বসম্পন্ন সংকল্পশীলতার গাম্ভীর্যে এবং আদর্শের ঔদার্যে এই প্রস্তাব ঐতিহাসিক মূল্যে লাভ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করা হইয়াছে এবং ভারত হইতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অপসারিত করিতে বলা হইয়াছে। কমিটি বলিয়াছেন, তাঁহারা তাড়াহুড়া করিয়া কিছু করিতে চাহেন না এবং সম্মিলিত শক্তিকে বিব্রত করিবার ইচ্ছাও তাঁহাদের নাই। প্রস্তাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, আগামী ৭ই আগস্ট বোম্বাইতে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির একটি অধিবেশন হইবে, ঐ অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত পাকা করিয়া লওয়া হইবে। প্রকৃত-পক্ষে ব্রিটিশ পক্ষের সমরোদ্যম যাহাতে ভারতবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় শক্তিশালী হইতে পারে, কমিটি এমন প্রস্তাবই করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, স্বাধীন ভারতই সমগ্র শক্তি লইয়া পররাজ্যগ্রাসী প্রবৃত্তিকে সমুচিতভাবে সংযত করিবার সামর্থ্য রাখে। ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে কতকটা উপযাচক হইয়া পুনরায় প্র[illegible]যোগিতার হস্তই সম্প্রসারিত করিয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়া দিয়াছেন যে, যদি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়, তবে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন অতি ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইবে। মহাত্মাজীর কর্মনীতির একটি বিশেষত্ব হইল এই [illegible] অপর পক্ষকে সকল রকম সুবিধা তিনি দান করেন এবং [illegible] পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া তবে কর্মসাধনায় প্রবৃত্ত হন। ওয়ার্কিং কমিটির বর্তমান সিদ্ধান্তেও এই বিশেষত্বটি পরিলক্ষিত হইবে। আমরা আশা করি, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এখনও তাঁহাদের ভ্রান্তি উপলব্ধি করিবেন এবং নিখিল ভারতীয় [illegible] সমিতির অধিবেশনের পূর্বে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা [illegible] সূত্রে কংগ্রেসের সহিত তাঁহাদের আপোষ-[illegible] সম্ভব হইবে।

শ্বেতাঙ্গ জাতির বোঝা—

বিলাতের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস হইতে সম্প্রতি 'ভারতের স্বাধীনতা' শীর্ষক একখানা পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানা ভারতসচিব আমেরী সাহেবের ভারত সম্পর্কিত বক্তৃতাবলীর সঙ্কলন। ভারতসচিব স্বয়ং এই পুস্তকের একটি মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। আমেরী সাহেবের এই সব বক্তৃতা তাঁহার সাম্রাজ্য-শাসনস্পর্ধী স্বজাতীয়গণের পক্ষে আস্বাদ্য হইবে এবং ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তাঁহাদের স্বজাতীয়দের সাম্রাজ্য-শাসন গর্ব—পুস্তকখানা দ্বারা উপভোগ করি[illegible] এই দিক হইতে পুস্তকখানা প্রচারের আশা করিয়াই সম্ভবত প্রকাশক এজন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। এই পুস্তকের সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি করিবার কিছু নাই; কিন্তু আমেরী সাহেব এই পুস্তকের মুখবন্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের [illegible] কীর্তনচ্ছলে ভারতবাসীদের মনুষ্যত্বের মর্যাদার উপ[illegible] আঘাত করিয়াছেন, সেগুলি বরদাস্ত করা আমাদের প[illegible] হইয়াছে বলিয়াই আমাদিগকে তৎসম্বন্ধে কয়েকটি [illegible] হইতেছে। এশিয়াবাসীরা অমানুষ ছিল, এগু[illegible] দেওয়ার ভার ভগবান শ্বেতাঙ্গ জাতির উপ[illegible]

দিক হইতে ভারত-শাসনে ইংরেজের দায়িত্ব রহিয়াছে। ইংরেজ যদি ভারতবাসীদের হাতে ভারত-শাসনের অধিকার ছাড়িয়া দেন, তবে সেই পবিত্র ভগবৎ-বিধানই লঙ্ঘন করা হয়, এই ধরণের উৎকট যুক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকদের মুখে আমরা অনেক দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। আমেরী সাহেব আলোচ্য পুস্তকের ভূমিকায় সেই গর্বোদ্ধত মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইংরেজেরা ভারতবর্ষকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভারতবাসীদের কোন ধারণাই ছিল না, ইংরেজেরা ভারতবর্ষে গিয়া ভারতবাসীদের মধ্যে স্বাধীনতার তীব্র আবেগ জাগ্রত করিয়াছে। আমেরী সাহেব জানেন না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই সব যুক্তি অনেক দিনই অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। ভাগ্যে ইংরেজ ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, নতুবা ভারতবাসীরা পরস্পরের মধ্যে কাটাকাটি করিয়া মরিত, এ-সব কথার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। সুতরাং জগতের লোককে ঐ সব কথা বলিয়া আর ধাপ্পা দেওয়া চলিবে না এবং জগতের লোকে ইহাও জানে যে, ভারতবর্ষ জুলু বা হটেনটটের দেশ নয়। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ভারতের বৃহৎ অবদান রহিয়াছে। জগতের লোককে বর্তমান যুগে এ সত্যও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই যে, আমেরী সাহেবের পূর্ব-পুরুষেরা যখন আমমাংস ভোজন করিয়া আরণ্য জীবন যাপন করিতেন, ভারতবর্ষ সুদূর অতীতের সেই যুগেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করিয়াছিল; এমন অবস্থায় ইংরেজ ভারতে না আসিলেও ভারতবর্ষ মরিত না এবং ভারতবর্ষকে বাঁচাইবার জন্যও ইংরেজ ভারতবর্ষে আসে নাই। ভারতবর্ষে যদি শান্তি না থাকিত, তবে ভারতের সমৃদ্ধিও থাকিত না এবং ভারতের যদি সমৃদ্ধি না থাকিত, তবে অকৈতব প্রেম বিতরণ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতে আসিবার প্রয়োজনও ব্রিটিশ জাতির পূর্বজ-দের মনে দেখা দিত না। ভারতবাসীদের মধ্যে স্বাধীনতার কোন ধারণা ছিল না, ইংরেজই সে ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে, আমেরী সাহেবের এই যে উক্তি, এই উক্তিরও কোনই মূল্য নাই। তখনকার যুগে স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝাইত, ভারতবাসীদের মধ্যেও সে স্বাধীনতার অনুভূতির অভাব ছিল না; বরং ইউরোপের অন্যান্য জাতি বর্বরোচিত ধর্মান্ধতায় প্রমত্ত হইয়া মানুষকে যে যুগে জ্যান্ত-পোড়া করিয়া জয়গর্ব উপভোগ করিত, ভারতবর্ষ সে যুগে ধর্মান্ধতার জন্য সংগ্রাম করে নাই, স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করিয়াছে। ইহা ছাড়া বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রীয়তার যে নবীন আদর্শের পুনরুজ্জীবন পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহাও আমেরী সাহেবের স্বজাতিগণের অবদান নয়। ইংরেজ এদেশে না আসিলেও ভারতবাসীরা এ আদর্শে উদ্দীপিত হইত। গণ-তান্ত্রিক আদর্শে স্বাধীনতার জন্য এই যে উদ্দীপনা, ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতারই দান। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী-গণ স্বাধীনতার এই তীব্র আবেগ এবং উদ্দীপনায় উৎসাহ দান করেন নাই, বরং যখনই উহা নিজেদের সাম্রাজ্য-স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা কঠোর হস্তে দলন করিয়াছেন। সেই সেই আবেগ এবং উদ্দীপনাকে প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে কৌশল অবলম্বন করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই।

ভারতের স্বাধীনতার সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণের সে মনোভাবের আজও পরিবর্তন ঘটে নাই। ভারতের শাসনতন্ত্রে রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাম্প্রদায়িকতাকে ঢুকাইয়া দিবার নীতি—পরিশেষে ভারতের জাতীয় সংহতির বিচ্ছেদবাদী মোস্লেম লীগের দম্ভকে সুস্পষ্টভাবে পৃষ্ঠপোষকতাই এপ্[illegible] প্রমাণ। আমেরী সাহেবের গর্ব এবং ঔদ্ধত্য ভারতে ইংরেজ-শাসনের এই সব ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করিতে সমর্থ হইবে না।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—

পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, প্রফেসর রেজিন্যাল্ড কুপল্যান্ড নামক এক ভদ্রলোক কয়েক মাস পূর্বে এদেশে আগমন করেন। এদেশে আসিয়া তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি এদেশে আসিয়াছেন, ভারত গভর্নমেণ্ট কিংবা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ইঁহাদের কাহারও সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু ক্রিপস সাহেব ভারতবর্ষে আসিবার পর একদিন প্রভাতে দেখা গেল যে, এই শিক্ষাব্রতী ভদ্রলোকটি কোন্ রহস্যবলে স্যার ক্রিপসের দলে যুক্ত হইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি এই প্রফেসর বিলাতে গিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখিয়া ফেলিয়াছেন এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিলাতে একটি বেতার বক্তৃতাও দিয়াছেন। প্রফেসর এই বক্তৃতায় বিলাতের লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ক্রীপস্ মিশনের দৌত্য বিফল হয় নাই। গ্রেট বৃটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দান করে, তাহাও আন্তরিকতাপূর্ণ। তবে কংগ্রেস স্যার স্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল কেন? প্রফেসর বলেন "কংগ্রেস নেতৃবর্গ এখনও তাঁহাদের পুরাতন নীতি অনুযায়ী কথা বলিতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেসই ভারতবর্ষ নহে, এমন কি কংগ্রেসী দলের যুবজনের মধ্যেও বর্তমান যুগোপযোগী নূতন আদর্শ ও নূতন কর্মনীতি অনুসরণের তাগিদ দেখা দিয়াছে। প্রফেসর কুপল্যান্ড কংগ্রেসকে খর্ব করিবার জন্য যদি মোস্লেম লীগের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, তাহা হইলে বরং তাহা কিছু মানাইত এবং বৃটিশ রাজনীতিক কর্তৃপক্ষের দিক হইতেও তাহা রীতিসম্মত হইত; কিন্তু ভারতের তরুণদের তিনি এক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছেন কোন্ ভরসায় এবং কি সাহসে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ভারতের তরুণেরা রুশিয়ার সমর্থক, তাঁহার বর্তমান সংগ্রামে চীনের সমর্থক, এই বলিয়া কি প্রফেসরের বিশ্বাস হইয়াছে যে, তাঁহারা কংগ্রেসের আদর্শের বিরোধী এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্সের প্রস্তাবের পৃষ্ঠপোষক? ভারতের তরুণেরা নবযুগের যে আদর্শ গ্রহণ করিতে চাহে, তাহা ভারতে বৃটিশ শাসননীতির অনুকূল, প্রফেসর যদি ইহাই বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি নিতান্তই ভুল বুঝিয়াছেন। ভারতের তরুণদের অন্তরের কথা যদি তাঁহার জানা থাকিত, তবে তরুণদের সম্বন্ধে এমন আপ্যায়নপূর্ণ ভাষা নিশ্চয়ই স্যার স্টাফোর্ডের প্রস্তাবে অন্তর্নিহিত নীতি সমর্থন করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত না, বরং তরুণদের সম্বন্ধে আশঙ্কার কথাই আম

তাঁহার মুখে শুনিতাম। প্রফেসর কুপল্যান্ড ভারতের তরুণদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা অন্তরে পোষণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহেন, আপত্তি আমাদের নাই; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তরুণদের বলিষ্ঠ এবং বাস্তব অবদান তাঁহার এই ভ্রান্তি ভাঙ্গিয়া দিবে। সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের ক্রীড়নক এই শ্রেণীর জীবদের ধাপ্পাবাজী চালাইবার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, এ বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্বাধীনতাই সর্বাগ্রে—

আগে সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং মীমাংসা, তারপরে স্বাধীনতা—মহাত্মা গান্ধী এতদিন পর্যন্ত এই মতই পোষণ করিয়া আসিয়াছেন এবং এই মতের তিনি প্রধান প্রচারক ছিলেন; কিন্তু এতদিন পরে মহাত্মাজীর সেই মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন তিনি সুস্পষ্ট ভাষাতে এই কথাই বলিতেছেন যে, সর্বাগ্রে স্বাধীনতা লাভ করা প্রয়োজন, পরে সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং মীমাংসার পথ উন্মুক্ত হইবে। ভারতের শাসনতন্ত্রে তৃতীয় পক্ষের প্রভাব যতদিন পর্যন্ত আছে, ততদিন পর্যন্ত হিন্দু এবং মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তির কোন চেষ্টাই কার্যকরী হইবে না। মহাত্মাজীর প্রস্তাবিত যে কর্মপ্রণালী ওয়ার্কিং কমিটিতে কিছু পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে, তাহা তাঁহার এই সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়াই পরিকল্পিত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন যে, তাঁহার আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইল একটি এবং তাহা হইল ভারতের শাসন-ব্যাপারে ভারতবাসীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, অন্যকথায় ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটানো; মহাত্মাজীর মতে ইহা করা যদি সম্ভব হয়, তবে অবস্থার প্রয়োজনই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকে সুনিশ্চিত করিয়া তুলিবে। এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়া মহাত্মাজী মোস্লেম লীগকেও ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'মুসলমানেরা যদি স্বাধীন ভারতে যেমন বিশ্বাসী, পাকিস্থানেও তেমনই বিশ্বাসী হয়, তবে তাহারা কেন যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করিবে না, ইহা আমি বুঝিতে পারি না। তবে যদি তাহারা ব্রিটিশের অধীনতাই কামনা করে এবং ব্রিটেনের সাহায্যে পাকিস্থান গঠন করিতে চায়, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। সেক্ষেত্রে আমার সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। মহাত্মাজী বর্তমানে যে সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছেন, তাহা সরল এবং সহজ। আরও কিছুকাল পূর্বে যদি তিনি এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেন, তবে সাম্রাজ্যবাদীদের বহু কূটচক্র ব্যর্থ হইত। মূল আদর্শের সম্বন্ধে যেখানে ঐক্য রহিয়াছে, পথের অনৈক্য আপোষ-আলোচনার সাহায্যে সেইখানেই মিটিতে পারে; কিন্তু মূল আদর্শের যেখানে অনৈক্য, সেখানে আপোষ-আলোচনার প্রশ্ন উত্থাপন করাই অযৌক্তিক। মহাত্মাজীর এই সিদ্ধান্তে কংগ্রেস এতদিনের একটা বিভ্রম হইতে মুক্ত হইল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এতদ্বারা একটি অভিনব অধ্যায় উন্মুক্ত করিবে এ বিষয়ে সন্দেহ

দেশের অন্নসমস্যা—

দেশের লোকের অন্নসমস্যা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিতেছে। কলিকাতার বাজারে আলুর দর বৃদ্ধি পাইয়া চার আনায় উঠিয়াছে। বর্ষাকালে কলিকাতার বাজারে রেঙ্গুন এবং শিলংয়ের পার্বত্য অঞ্চলের আলু আমদানী হইত। রেঙ্গুন হইতে নৈনিতাল ও শিলংয়ের পার্বত্য অঞ্চলের আলু আমদানী হইত। রেঙ্গুন হইতে আলু পাইবার পথ তো বন্ধই হইয়াছে, উপযুক্ত পরিমাণ মালগাড়ির অভাবে নৈনিতাল কিংবা শিলং হইতেও আলু আসিতেছে না। অবস্থার প্রতিকার না হইলে কলিকাতার বাজারে আলু আদৌ মিলিবে না, এমন আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে বলিয়া শুনিতেছি। এদিকে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সম্পর্কিত সমস্যাও কিছুই লাঘব হয় নাই। বাঙলা সরকার অবশ্য ঘন ঘনই ইস্তাহার জারী করিতেছেন এবং লাভখোরদের শাসাইতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের এই ধরণের ফাঁকা হুমকী অগ্রাহ্য করিয়া লাভখোরদের ব্যবসা স্বচ্ছন্দভাবেই চলিতেছে, এরূপ মনে করিবার কারণ রহিয়াছে। সম্প্রতি বাঙলা সরকার একটি ইস্তাহারে এইরূপ নির্দেশ করিয়া দেন যে, পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়কারী দোকানদারগণ সকল অবস্থাতেই চাউল, গম, আটা, লবণ প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবেন। ইঁহারা যদি দ্রব্য বিক্রয় করিতে অস্বীকার করেন, তবে ইঁহাদিগকে কঠোর সাজা দেওয়া হইবে। পাইকারী দোকানদারগণ বিক্রীত জিনিসের ক্যাসমেমো দিতে বাধ্য থাকিবেন, খুচরা দোকানদারগণ ক্যাসমেমো দিবার নিয়ম থাকিলে ক্যাসমেমো দিবেন, কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই ইঁহাদের সমস্ত জিনিসের একটি মূল্যতালিকা সাধারণের বোধগম্য ভাষায় দোকানের কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া রাখিতে হইবে। ক্যাসমেমো দিবার সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাহারে যে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সুফল ফলিবে বলিয়া আমরা আশা করি না; কারণ ইতিপূর্বেও খুচরা দোকানদারদের সম্বন্ধে ঐরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। দ্রব্যের মূল্যতালিকা লটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থায় ক্রেতাদের পক্ষে কিছু সুবিধা হইবে সত্য, কিন্তু ক্রেতাদের পক্ষে সমস্যা ঘটে এই যে, অনেক ক্ষেত্রেই দোকানদারগণ সরকার নিয়ন্ত্রিত জিনিসপত্র রাখা বন্ধ করিতেছেন। সরকারী দোকানে গিয়া জিনিসপত্র ক্রয়ের চেষ্টায় সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে দুর্ভোগই সার হয়। এরূপ অবস্থায় সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সরকারী নির্ধারিত দরে জিনিসপত্র যাহাতে সর্বত্র মিলে, তেমনভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা পাকা রাখিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে লাভখোরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব জনসাধারণের উপর না রাখিয়া সরকারের নিজেদের হাতে লইতে হইবে। সাধারণ ক্রেতাগণ এই সম্পর্কে মামলা মোকদ্দমার ঝঞ্ঝাট এড়াইবার চেষ্টা করিবে, সরকারের ইহা বুঝা উচিত। কলিকাতার বাজারে জিনিসপত্রের অভাব সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস এই যে, লাভখোরদের চক্রান্তেই অনেক ক্ষেত্রে অভাব ঘটিতেছে। প্রকৃতপক্ষে সরকার বলিতেছেন, মালের অনটন নাই; ইহা সত্ত্বেও বাজারে যখন মাল পাওয়া যায় না

ন্যে মাল বেচিবার জন্য মাল মজুত রাখা হইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতার পুলিশ মাল গোপনে মজুত রাখিবার অভিযোগে কলিকাতায় কতকগুলি লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে পুলিশের প্রখর দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী এই সম্বন্ধে একটি ভাল প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা ইতি-পূর্বে সে প্রস্তাব করিয়াছিলাম। মহাত্মা গান্ধীর মতে খাদ্য-শস্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিলেই গভর্নমেণ্টের কর্তব্য শেষ হইবে না, পোস্টাফিসের ন্যায় খাদ্যশস্যের দোকান খোলাও তাঁহাদের কর্তব্য। প্রত্যেক বাজারে এইরূপ সরকারী দোকান যদি থাকে এবং কেবল দোকান থাকাই নয়, সে সব দোকানে মাল থাকে আর মাল বিক্রয়ের ভাল ব্যবস্থা থাকে, তবে জনসাধারণের দিক হইতে এ সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে।

ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা—

১৭৮৯ খৃস্টাব্দের ১৪ই জুলাই পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই দিবসে প্যারিসের কারাদুর্গের প্রাকার বিদীর্ণ করিয়া মানবতার একটা প্রবল প্লাবন বিশ্বকে উদ্বেলোড়িত করিয়া তুলে। ফরাসী বিপ্লবের সে বাণী মনুষ্যত্বের বাণী, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জন্য সে এক অগ্নিময়ী প্রেরণা; ফ্রান্সের ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে শোণিতসিক্ত করিয়া বিপ্লবের সেই প্রাণ-প্রবাহ জগৎকে যে বস্তু দান করে, তাহা সভ্যতার ইতিহাসে সত্যকার দান। ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সের বুকের উপর দিয়া বহু বিপর্যয় গিয়াছে, কিন্তু সাময়িক ঘটনাচক্রের গতি বিপ্লবের অন্তর্নিহিত প্রচুর এবং প্রবল সেই প্রাণশক্তিকে নির্জীব করিতে সমর্থ হয় নাই। সে শক্তি সমগ্র বিপর্যয়ের ভিতর দিয়াই স্বাধীনতা ঐক্য এবং সৌভ্রাত্র এই আদর্শের অভিমুখেই মানবজাতিকে ব্যাপকভাবে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সর্বত্র মানব জাতির মধ্যে স্বাধীনতার মর্যাদা আজও স্বীকৃত হয় নাই। বর্ণগতবৈষম্য এখনও ইউরোপীয় জাতিনিচয়কে প্রভুত্বের অহমিকায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সৌভ্রাত্রের পরিবর্তে হিংসা এবং বিদ্বেষের আগুনে বিশ্ববলয় আজ প্রধূমিত, কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সত্য স্থির আছে এবং সেই সত্যের প্রেরণায় ভীরুও শির তুলিতেছে। কবি বলিয়াছেন, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই। ফ্রান্স [illegible] আজ সে পর পদানত, প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তি আজ মানব-মহত্ত্বকে পিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং স্বাধীনতা এবং সাম্যের আদর্শকে পরিম্লান করিয়া তাদের সর্বতোমুখী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছে: কিন্তু তাহার এই দম্ভ-দর্প, মদ এবং ঔদ্ধত্য ক্ষণিক মাত্র। মানব মহিমার কাছে তাহাকে পরাভূত হইতেই হইবে। প্যারিসে কারাদুর্গের প্রাকার ফ্রান্সের স্বাধীনতাকামী সন্তানদের শোণিতের দ্বারা পাকা করিয়া রাখিবার প্রয়াস চলিতেছে; কিন্তু সে কারাপ্রাকার বিদীর্ণ করিয়া মহিমার জলদজ-স্রোত পুনরায় বিশ্বকে প্লাবিত করিবে। [illegible]দের শোণিতোৎসর্গ বৃথা যায় না। মানবতার জয়গান-কারী ফ্রান্সের মহনীয় সন্তানগণের আদর্শও কো[illegible] ম্লান হইবে না। সে আদর্শের উগ্রতর প্রেরণা অম[illegible] দুর্গতোরণ যত ধূলিতলে লগ্ন করিবে এবং মানব-অভ্যু[illegible] বাণী মহাকাশে মন্দ্রিত হইয়া উঠিবে।

ইস্টবেঙ্গলের গৌরব—

গত শনিবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ক্যালকাটার মাঠে মো[illegible] বাগানকে এক গোলে পরাজিত করিয়া এই বৎসরের জন্য চ্যাম্পিয়ান হইলেন। ইতিপূর্বেও দুই একবার ইস্টবেঙ্গল খ্যাতিলাভের কাছাকাছি যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু করিতে পারেন নাই। মহমেডান স্পোর্টিং গত ৬ বৎসর [illegible] লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের মর্যাদা ভোগ করিতেছিলেন, ইস্টবে[illegible] এ বৎসর তাঁহাদিগকে নিজেদের কৃতিত্বের জোরে সরাইয়া এই সম্মান লাভ করিলেন, এদিক হইতে ইস্টবেঙ্গলের কৃ[illegible] বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। মহমেডান স্পোর্টিং এ বৎসর সম্মান হইতে বঞ্চিত হইলেন; আমরা আশা করি, ভবি[illegible] তাঁহারা নিজেদের সম্মান পুনরায় লাভ করিতে চেষ্টা করি[illegible] মহমেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগান প্রথম ডিভিসনের [illegible] শ্রেণীর টিম রূপে বড় বড় শ্বেতাঙ্গ টিমদের কয়েক বৎসর নীচে দাবাইয়া রাখিতেছেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে কম গৌরবের নয়। আমরা আশা করি, ইস্টবেঙ্গল এ বৎসর যে সম্মান [illegible] করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য তাঁহারা বি[illegible] ভাবে দৃষ্টি রাখিবেন। আমরা ইস্টবেঙ্গল টিমকে সমগ্র এবং টিমের সুযোগ্য ক্যাপ্টেন সোমানাকে বিশেষভাবে আ[illegible] অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

মহারাণী হেমন্তকুমারী—

পুঁঠিয়ার স্বনামধন্যা ভূম্যাধিকারিণী মহারাণী হে[illegible] কুমারী গত ১২ই জুলাই পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যু[illegible] তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল। মহারাণী ধর্মপরায়ণা, [illegible]শীলা এবং বিদ্যোৎসাহিনী ছিলেন। তিনি রাজসাহীতে সং[illegible] কলেজ স্থাপনা করেন এবং রাজসাহী কলেজের হিন্দু ছা[illegible] জন্য বিরাট বোর্ডিং নির্মাণ করিয়া দেন। তিনি রাজসা[illegible] জলের কলের জন্য লক্ষ টাকা দান করেন। এদেশের [illegible] বিস্তারে, বিশেষভাবে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তারকল্পে মহার[illegible] দান সামান্য নহে। তিনি রাজসাহী এবং ময়মনসিংহ [illegible] জেলায় তাঁহার জমিদারীতে বহু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, স[illegible] টোল, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং অতিথিশালা পরিচা[illegible] ব্যয়ভার বহন করিতেন। ইহা ছাড়া, পল্লীর জলকষ্ট নিবা[illegible] জন্যও তিনি অনেক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। পরহি[illegible] সাধনা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার মৃ[illegible] বাঙলা দেশ একজন মহীয়সী ভূম্যাধিকারিণীকে হারাই[illegible] আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আ[illegible] সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

২০

হঠাৎ সেদিন শাশ্বতীর নামে মানিঅর্ডারে পঁচিশ টাকা আসিয়া পেঁীছাইল।

শাশ্বতী প্রেরকের নামটা আগেই দেখিয়া লইল—সুমন্ত রায় ; শাশ্বতীর মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল।

অনেকদিন পরে মনে পড়িয়া গেল সুমন্তের চেহারাখানা। এখানকার নানা ঘটনায় সে বিস্মৃত হইয়াছিল, কবে সে যুগিপকুর নামে বাঙলার অখ্যাত অজ্ঞাত একটি গ্রামে গিয়াছিল এবং পল্লীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া দু তিনদিন সেখানে সে কাটাইয়া আসিয়াছে।

মনে পড়িল বর্ষাস্নাত গ্রামের সেই মূর্তি—পথ ছাপাইয়া কুলকুল করিয়া জল ছুটিয়াছে, মাঠ ডিঙাইয়া চলিয়াছে কোন্ অজানা পথে কে জানে। মনে পড়িল—সে দোতালার যে ঘরে ছিল, সেই ঘরের সামনে একটা গাছের পাতাগুলি বৃষ্টিতে নুইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই আড়ালে একটি পেচক বসিয়া বসিয়া নিঃশব্দে নীরবে ভিজিতেছিল। একদিন সকাল হইতে বেলা নয়টা পর্যন্ত আড়াই তিনঘণ্টা খোলা জানালার কাছে বসিয়া সে তন্ময়ভাবে চাহিয়াছিল শান্ত সুন্দর গ্রামের পানে। আকাশে কালো মেঘের সারি—একটার উপর আরেকটা আসিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ধাঁধিয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিতেছিল, সেই সঙ্গে কড়্‌কড়্‌ করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছিল। সেদিন শাশ্বতীর মনে কবির সেই কবিতাটিই জাগিতেছিল,—

"দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওরে দেখদেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরেছে কি,
রাখাল বালক কি জানি কোথায়
সারাদিন আজ খোয়ালে—
এখনই আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।"

সেই অঝোর বৃষ্টিধারা এখানেও ঝরে ; কিন্তু সেই শ্যাম সৌন্দর্য এখানে দেখা যায় না। নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে এখানেও মেঘ সাজিয়া আসে, কিন্তু উপভোগ করিবে কে, সে মন কই ?

পঁচিশ টাকা—

নাম সাইন করিয়া সে টাকা লইল। একবার ভাবিয়াছিল ফেরৎ দিবে, কিন্তু তখনই মনে হইল দরকার নাই অতটা উদারতায়—অতটা মহানুভবতায়।

কুপনে এতটুকু লেখা ছিল, তাহাতে লেখা—

"আপনার মহানুভবতার জন্য ধন্যবাদ। কুড়ি টাকা দিবাকরের হাতে দিয়াছিলেন, সেই কুড়ি টাকা এবং তাহার আট মাসের সুদ, মাসে টাকাপিছু দুই পয়সা হারে দশ আনা করিয়া পাঁচ টাকা পাঠাইলাম। ধন্যবাদ।

বিনীত—সুমন্ত রায়।"

পাঁচ টাকা সুদ—

শাশ্বতীর পা হইতে মাথা পর্যন্ত রাগে জ্বলিয়া উঠে। টাকাপিছু দুই পয়সা হিসাবে মাসে দশ আনা—আট মাসে পাঁচ টাকা সুদ সে ধরিয়া দিয়াছে,—এ দারুণ অপমান করা বই আর কিছু নয়।

নোট কয়টি নিতান্ত অবহেলাভরে ড্রয়ারে ফেলিয়া শাশ্বতী উঠিতে যাইতেছিল এমনই সময় ভৃত্য বেহারী আসিয়া কয়েকখানা পত্র তাহার সামনে টেবলে রাখিয়া গেল। পোস্টম্যান যথানিয়মে এগুলি লেটার বক্সে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিল এবং বেহারীও যথানিয়মে এই সময় লেটার বক্স হইতে পত্র বাহির করিয়া শাশ্বতীর কাছে পেঁীছাইয়া দিয়া গেল।

দিন চার পাঁচ আগে স্বাতী শিলংয়ে তাহার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়াছে।

পিতামাতা আপত্তি করেন নাই।

সুজিত সোমের সঙ্গে স্বাতীর বিবাহ হইতে পারে না কথাটা স্বাতীর কানে পেঁীছাইয়াছিল এবং পুরা চব্বিশ ঘণ্টা সে ঘরের বাহির হয় নাই। আঘাতটা সে তাহার বুকে অত্যন্ত নির্মমভাবেই বাজিয়াছে তাহা মাতা বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাহাকে বিরক্ত করেন নাই। চব্বিশ ঘণ্টা পরে সে ঘরের বাহির হইয়াছিল নিয়মিতভাবে নিজের যথাযোগ্য কাজ করিয়াছিল।

দুইদিন বাদে সে যখন বন্ধু সুমিত্রার নিকটে শিলংয়ে যাইতে চাহিল, তখন পিতামাতা আপত্তি করেন নাই। দুদিন সেখানে থাকিয়া তাহার মনটা ভালো হইয়া উঠিবে তাঁহারা তাহাই আশা করিয়াছিলেন।

পিতার ও মাতার নামীয় পত্রগুলো বয়ের হাতে পাঠাইয়া শাশ্বতী নিজের নামের একখানা পত্রের কভার ছিঁড়িল।

পত্র লিখিয়াছে স্বাতী এবং পত্রখানি ছিল অনুনয়পূর্ণ কথায় পূর্ণ। স্বাতী লিখিয়াছে—

প্রিয় শাশ্বতী,

তোমায় আমি পত্র দিচ্ছি একটা বিশেষ কাজের ভার দিয়ে। বাবা বা মাকে লিখতে আমার সঙ্কোচ মনে হয়, তাই তোমায় লিখছি, তুমি তাঁদের জানিয়ে দিয়ো।

গতকাল আমার বিবাহ হয়ে গেছে এবং শুনে বিশেষ সুখী হবে না—সুজিত সোমের সঙ্গেই আমার বিবাহ হয়েছে। জানি বাবা মা মত দেন নি, অনুমতি চাইলেও পাব না, বাধা হয়ে এখানে বিবাহ করতে হ'ল।

তুমিই তাঁদের এ বার্তা দিয়ো—

শাশ্বতী আড়ষ্টভাবে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল।

মাতাপিতাকে এ বার্তা জানাইতে হইবে তাহাকে—কিন্তু সে কি ভীষণ ব্যাপার তাহা সে অনুমানেই বুঝিতেছে।

ঘণ্টা বাজাইতে বয় আসিয়া দাঁড়াইল।

শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব বাড়ি আছেন?"

বয় জানাইল,—আছেন।

পত্রখানা হাতের মধ্যে লইয়া শাশ্বতী উঠিল।

মিঃ বোসের কণ্ঠস্বর শুনা গেল, মহা উৎসাহে তিনি কাহার সহিত গল্প করিতেছেন। পিতার এমন উগ্র কণ্ঠস্বর শাশ্বতী কোন দিন শুনে নাই, তাই সে বিস্মিত হইল বড় কম নয়।

দরজার পরদাটা সরাইতেই চোখে পড়িল সুন্দর সুপুরুষ একটি যুবক তাহার পিতার সামনে বসিয়া আছে—পিতা ধূমপান করিতে করিতে তাহার সহিত গল্প করিতেছেন।

শাশ্বতীকে দেখিয়াই মিঃ বোস বলিলেন, "এই সেই শাশ্বতী —যাকে তুমি দেখেছিলে এতটুকু মেয়ে। তুমিও তখন ছেলে মানুষ অরুণ, তবু অল্প অল্প মনে থাকতে পারে। তোমার বাবা আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু সুরেন্দ্র এদের দুবোনকে ভারি ভালোবাসতেন কিনা, বিলেতে যাওয়ার আগে বারবার করে বলে গেছলেন—আমি যেন আমার কথা রাখি। আমি কিন্তু আমার কথা—"

বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া শাশ্বতীর পানে তাকাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমায় এর পরিচয় দেওয়া হয় নি শাশ্বতী, এ আমার পরমবন্ধু সুরেন্দ্র ঘোষের ছেলে অরুণ। তোমার বয়স যখন সাত, অরুণের বয়স পনেরো, তখন ওর বাপ মায়ের সঙ্গে বিলেতে যায়, ওর লেখাপড়া যা কিছু সব ওদেশেই হয়েছে। ওর বাপের সঙ্গে আমার কথা ছিল—আমার স্বাতির সঙ্গে অরুণের বিবাহ দিতে হবে। সম্প্রতি অরুণ মস্ত বড় ডাক্তার হয়ে ফিরেছে, মেডিকেল কলেজে কাজও সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছে, কাজেই স্বাতির সঙ্গে বিবাহ দিতে আমার আটকাবে না—কি বলো?"

শাশ্বতী একটা নমস্কার করিয়া পিতার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল।

অরুণ প্রতিনমস্কার করিয়া স্মিতহাস্যে বলিল, "ভারতের সঙ্গে বিশেষ করে বাঙলার সঙ্গে আমার মোটেই পরিচয় নেই, সেই হয়েছে আমার মুস্কিল—তাই ভাবছি কি করব, কি করে দাঁড়াতে পারব?"

শাশ্বতী গম্ভীর মুখে বলিল, "এতে মুস্কিলও নেই, ভাববারও কিছু নেই। নাই বা রইলো পরিচয়, বাঙালীর ছেলে যখন, মাতৃভাষায় যখন কথা বলতে পারেন, বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় হতে আপনার দেরী হবে না। কত ইউরোপীয়ান এখানে আসেন, তাঁরা কিভাবে এখানকার লোকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন, সেই কথাটাই ভাবুন।"

অরুণ মাথাটা একটু কাত করিল, বলিল, "কিন্তু সেটা করতেও যে দেরী লাগে তো। তা ছাড়া ইউরোপীয়ানরা সহজে পারেন, কারণ তাঁদের মুখে ধন্যবাদ নেওয়ার জন্যে অনেকেই এগিয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের বেলায় সেটা কি সম্ভব হবে মিস—মিস—"

নামটা জানা না থাকায় সে থামিয়া গেল। শাশ্বতী বলিল, "আমায় কেবল শাশ্বতী বলেই ডাকবেন।"

পিতার সহিত কোন কথা বলিবার সুযোগ না পাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া স্মিতমুখে বলিল, "নমস্কার, আমার একটা বিশেষ দরকার আছে—আমি উঠছি, কিছু মনে করবেন না।"

পিতারপানে তাকাইয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ দরকারী কথা ছিল বাবা, এর পরে বলব এখন—কেমন?"

পিতা বলিলেন, "কি তোমার এমন দরকার আছে তা যখন জানিনে—তোমার বাধা দিতে পারিনে। তবে কথা হচ্ছে অরুণ যখন তোমাদের বাড়িতে তখন—"

মহাব্যস্ত হইয়া অরুণ বলিয়া উঠিল, "না না, এমন কথা আমি বলিনে যে, আপনি আপনার সব কাজ ক্ষতি করে এখানে থাকবেন। আপনি অনায়াসে যেতে পারেন, আমার তাতে এতটুকু আপত্তি নেই।"

শাশ্বতী একটু হাসিল, চলিতে চলিতে ফিরিয়া বলিল, "আবার যেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে মিঃ ঘোষ সেদিন আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলার ইচ্ছা রইলো।"

সে বাহির হইয়া গেল।

২১

স্বাতীর পত্রখানা পাইয়া মিঃ বোস গুম হইয়া গেলেন। বহুক্ষণ তিনি একটি কথাও বলিতে পারিলেন না, টেবিলের উপর দুই হাত লম্বা করিয়া ছড়াইয়া দিয়া উপুড় হইয়া মুখখানা লুকাইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন।

মিসেস বোস চোখ মুছিতেছিলেন, কোন কথা বলিবার যো নাই। স্বামীকে তিনি চেনেন—তিনি যেমন একদিকে কোমল, অন্যদিকে তেমনি পাথরের চেয়েও কঠিন, শত আঘাতেও যাহা ফাটিবে না। মিঃ বোস ধনীর দুলাল নহেন, বাল্য হইতে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া তিনি মানুষ হইয়াছেন, মানুষের চরিত্র বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে এবং আঘাতের পরিবর্তে নির্মম প্রত্যাঘাত করিতেও তিনি জানেন।

শাশ্বতী পত্রখানা আস্তে আস্তে পিতার সামনে রাখিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, পত্র দিয়া পিতার সামনে থাকিবার সাহস তাহার হয় নাই।

অনেকক্ষণ পরে মিঃ বোস মুখ তুলিলেন, বিশ্বের অন্ধকার তখন সে মুখের উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে।

মিসেস বোস চোখ মুছিতেছিলেন দেখিয়া জ্বলন্ত চোখে তাঁহার পানে চাহিলেন, তাহার পর হাত দুখানা বুকের উপর আড়াআড়িভাবে রাখিয়া ঘরের মধ্যে দ্রুত পদচারণা করিতে লাগিলেন।

মিসেস বোস কান্নাভরা সুরে বলিতে গেলেন, "স্বাতী যদি একটিবার আমায় বলতো, আমি কক্ষনো তাকে যেতে দিতুম না সেখানে, আমি—"

"চুপ চুপ—বস করো—থামো—"

মিঃ বোস গর্জন করিয়া উঠিলেন, আবার খানিক পদচারণা করিয়া মিসেস বোসের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন—রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, "কেমন, মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শিখাবে—বেশী রকম সামাজিক হওয়ার সুযোগ দেবে?"

মিসেস বোস আহত হইয়া বলিলেন, "সেটা আমার দোষ? মেয়েদের লেখাপড়া শিখানো সামাজিকতা শিখানো আজকাল কেন, বহুকাল ধরেই এদেশে চলে আসছে। তুমিই বলেছো না—গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রীর কথা তুমিই বলেছো না লীলাবতী, খনা, উভয় ভারতীর কথা—?"

মিঃ বোস একখানা চেয়ার টানিয়া স্ত্রীর সামনে বসিলেন বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি বলেছি এবং আমি চেয়েছিলুম তাদেরই ছাঁচে ফেলে মেয়েদের গড়তে, আর তুমি চেয়েছিলে আমেরিকা ইউরোপের অতি আধুনিক ছাঁচে ঢেলে মেয়ে গড়তে। হয়েছে তো তোমার দত্ত-শিক্ষার সুফল—? একটি মেয়ে এই কীর্তি করলে আর একটিও কি করবে তাই দেখ।"

উত্তাক্ত মিসেস বোস উষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, "এর শিক্ষার ভার তুমিই নিয়েছো, নিজের ইচ্ছায় মনের মত ছাঁচে ঢেলে তৈরী করেছো মেয়েকে চিত্রাঙ্গদার মত। আজ যদি ও মেয়ে কিছু করে—সে তোমারি দেওয়া শিক্ষার ফলে, আমার শিক্ষার ফলে নয়। সেকালের চিত্রাঙ্গদা তীর ধনু তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতো, তোমার চিত্রাঙ্গদা বেত আর ছোরা নিয়ে নিজেই মোটর চালিয়ে যেখানে খুসি সেখানে যায়। না প্রাচ্য না প্রতীচ্য কোন শিক্ষার বালাই তার

নেই, কাজেই তুমি তার সামাজিকতার দোহাই দিতে পারো না, আর সে জন্যে আমায় দায়ী করতেও পারো না।"

মিঃ বোসের মুখের অন্ধকার কতকটা পাতলা হইয়া আসিল—বলিলেন, "বেশ, শাশ্বতীর যা করবার তা আমিই করব। কিন্তু তোমায় বলে রাখছি কেটি যে মেয়ে আমার অমতে আমার অবাঞ্ছনীয় পাত্রকে—তার সম্বন্ধে সব কথা জেনেও বিয়ে করলে, আর কোন দিন সে এ বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে না। আমার প্রচুর সম্পত্তির একটি পাই সে পাবে না, আমি এই মুহূর্ত হতে তাকে ত্যাগ করলুম, আমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আর তুমিও কেটি, আমার সামনে প্রতিজ্ঞা কর—"

"আমি—আমি প্রতিজ্ঞা করব—?"

মিসেস বোসের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল।

গম্ভীর কণ্ঠে মিঃ বোস বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমাকেও আমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তুমি আধুনিক সমাজে বাস কর, যত আধুনিকাই হও, আমি জানি তুমি আধুনিক সমাজে মিসেস কেটি বোস হলেও আসলে শ্রীমতী কাত্যায়নী ছাড়া কিছু নও এবং কেটি-রূপে যত চালই দাও, কাত্যায়নীরূপে তুমি আমার সহধর্মিণী গৃহ-লক্ষ্মী, আমার আদেশ পতিব্রতা হিন্দু স্ত্রীর মতই মাথা পেতে নেবে। আমি তোমার মাতৃত্বের পরে অন্যায় অত্যাচার করব না—সেদিক দিয়ে তোমায় রেহাই দিচ্ছি। তুমি যদি ইচ্ছা করো, যে মেয়েকে তুমি ভালোবাসো, তার কাছে তুমি যেতে পারবে, কিন্তু এখানে—আমার বাড়িতে তাকে আনতে পারবে না, এখানে থাকতে তাকে পত্রাদি দিতে পারবে না, তার নাম জীবনে আমার সামনে নিতে পারবে না। দেখ, যদি তোমার স্বামীর দিকে চাও—তোমায় এ প্রতিজ্ঞা করতে হবে।"

মিসেস বোস দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিলেন—

মিঃ বোস উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাত দুখানা পিছনে রাখিয়া তিনি আবার কয়েকবার পাদচারণা করিয়া স্ত্রীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি ভাবো, আজ সারাদিন ভাবো—কি তুমি চাও—তোমার প্রিয় কন্যা অথবা স্বামী। তুমি মেয়ের কাছে গিয়ে থাকতে পারো, আমি তোমায় তোমার খরচ যা লাগবে পাঠাব। আর এখানে যদি থাকো—তোমার মেয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না—মনে করবে তোমার মেয়ে নেই, স্বাতী নামে কেউ কোনদিন থাকলেও সে মরে গেছে—"

আর্তকণ্ঠে মিসেস বোস চেঁচাইয়া উঠিলেন, "না না, ও কথা বলো না, ও কথা বলো না—"

মিঃ বোসের মুখে একটুকরা হাসির রেখা জাগিয়াই মিলাইয়া গেল, তিনি বলিলেন, "বলাটাই অন্যায় কিন্তু বাস্তবিকই ঘটলো যে তাই কেটি—"

তিনি আবার বসিলেন—

শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি জানো আমি স্বাতীকে কম ভালোবাসতুম না, লোকে তার প্রশংসা করলে তোমার চেয়ে আমার বড় কম আনন্দ হতো না। সারাদিন আমার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না, তোমাদের কারও সঙ্গে কখনও দু তিন দিন দেখাই হতো না কাজের জন্যে, তবু আমি জানতুম আমি কেবল কাজের নেশায় কাজ করে গেলেও আমার ঘরে লক্ষ্মী স্ত্রী আছে আমার দুটি মেয়ে আছে। অফিসে পর্যন্ত কারও কাছে আমার মেয়েদের সুখ্যাতি শুনলে আমার অত কাজের মধ্যেও ভুল হয়ে যেতো। সেই মেয়ে—আমার মেয়ে আজ যে আমার অমতে একটা ভ্যাগাবণ্ডকে বিয়ে করলে—"

তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন—

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, "সুজিত সোম বিলেত হতে ব্যারিস্টারী পাশ করে এসেছে, তার হাতে একটি পয়সা নেই—জাল জুয়োচুরী করে কোনরকমে ভদ্রতা বজায় রেখে চলেছে। আমি জানি সে আমার বিশাল সম্পত্তির অর্ধেক লাভ করবার আশায় স্বাতীকে প্ররোচিত করেছে। জানে একবার বিয়েটা হয়ে গেলে আর বিয়ে ফিরানো যাবে না। সে জানে প্রথমটা আমি রাগ করলেও পরে স্বাতীকে ক্ষমা করব, তাকে গ্রহণ করব। কিন্তু আমিও দেখাব কেটি, আমি অনেক আঘাত সয়ে দাঁড়িয়েছি, আমার কর্তব্যের কাছে আমার স্ত্রী কন্যা অনেক ছোট। আমার আদর্শ যেখানে খাটো হবে সেখানে আমি সকলকে ত্যাগ করতে পারি।"

রুদ্ধ দরজায় কে আঘাত করিল—

আরদালী একখানা কার্ড দিল—

কার্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মিঃ বোস বলিলেন, "যাও, সাহেবকে বসতে বল, আমি যাচ্ছি।"

ফিরিয়া স্ত্রীর সামনে দাঁড়াইয়া চিন্তিত মুখে বলিলেন "অরুণ এসেছে। ওকে আমিই ডেকে এনেছি পাটনা হতে, সে পাটনায় কাজ নিয়ে এসেছে। ওর বাপের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলুম স্বাতীর সঙ্গে ওর বিয়ে দেব—অরুণও তাই জানে। আমি কি করে জানাব কেটি, অবাধ্য মেয়ে আমার নির্বাচিত পাত্রকে উপেক্ষা করে এক ভ্যাগাবণ্ডকে বিয়ে করেছে।"

মিসেস বোস একটিও কথা বলিতে পারিলেন না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মিঃ বোস বলিলেন, "আমায় এ কথা বলতেই হবে—যত অপমানই হোক আমায় সইতেই হবে, তা ছাড়া উপায় নেই।" আস্তে আস্তে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

ক্রমশ

১৫
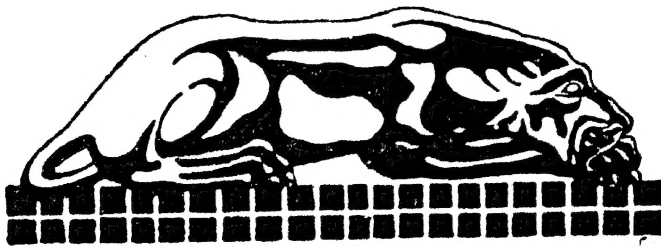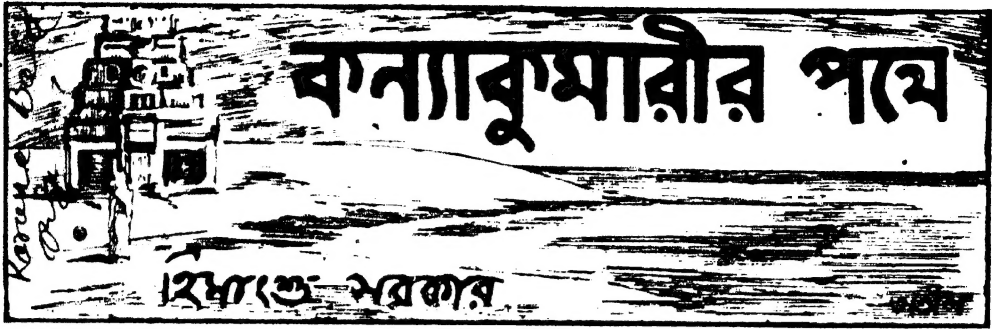
তাঞ্জোর দেখা শেষ করে আমরা স্টেশনে ফিরলাম। ঠিক হল যে, এখান থেকে রাত ৭টার ট্রেন ধরে আমরা চিংগলপ্টের দিকে রওনা হব। চিংগলপুটে নেমে আমরা পক্ষীতীর্থ এবং মহাবালীপুরম্ দেখব।

ট্রেন আসার পর একটা খালি কামরা দেখে সকলে উঠে পড়লাম। আমরা চিংগলপুটে নামব সেই ভোর ৫টায়। ট্রেনে তাঞ্জোর থেকে আনা খাবার খেয়ে সকলে একরকম করে শুয়ে পড়ল। ট্রেনের যে কামরায় আমরা উঠেছিলাম, তাতে যে দুচার জন লোক ছিল তারা দু একটা স্টেশন বাদেই নেমে গেল।

ভোর পাঁচটায় চিংগলপুট স্টেশনে নেমে অন্যান্য স্থানের মতই স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করে ওয়েটিংরুমে আমাদের জিনিসপত্র রাখলাম।

চিংগলপুট থেকে পক্ষীতীর্থ প্রায় নয় মাইল। স্টেশনের বাইরে থেকে পক্ষীতীর্থে যাওয়ার বাস ছাড়ে। সকাল সাতটার বাস ধরে আমরা পক্ষীতীর্থের দিকে রওনা হ'লাম।

পাহাড়ের মাথার ওপরে মন্দির। প্রায় ৫৬০টা সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে গিয়ে পৌঁছলাম। মন্দিরের দেবীর নাম ত্রিপুরা সুন্দরী। মন্দিরের কাছেই একটা জায়গা আছে, যেখানে একজোড়া পক্ষী রোজ দুপুরের দিকে এসে পুরোহিতের দেওয়া খাদ্য খেয়ে যায়। শুনলাম যে আরও ঘণ্টা দুই বাদে পক্ষী দুটি খাদ্য খেতে আসবে। আমাদের পক্ষে অতক্ষণ বসে ... সম্ভব নয় দেখে আমরা পক্ষী দুটির খাদ্য গ্রহণ দেখবার আসা ত্যাগ করে মন্দির থেকে নীচে নেমে এলাম।

পাহাড় থেকে নীচে নেমে এসে মহাবালীপুরম্ দেখতে যাওয়ার জন্য কোন বাস পাওয়া যায় কিনা তার খোঁজ করলাম। শুনলাম যে বাস সেই বেলা ১টার পর পাওয়া যাবে। তখন বেলা প্রায় ১১টা—অর্থাৎ আমরা যদি বাসের আশায় থাকি, তাহ'লে এখানে দু ঘণ্টার ওপর বসে থাকতে হবে। অন্য কোন উপায়ে মহাবালীপুরম্ যাওয়া যায় কি না, তার খোঁজ করতে লাগলাম।

পক্ষীতীর্থ থেকে মহাবালীপুরমের দূরত্ব প্রায় দশ মাইল। ...লাম যে, ভাল ঝট্‌কা নিলে ঘণ্টা দেড়ের মধ্যে মহাবালীপুরমে ... যায়। এক একটা ঝট্‌কায় চারজন করে লোক বেশ আরামে যেতে পারে। যাতয়াতের ভাড়া ১৸৹ থেকে ২৲ মধ্যে। আমরা আর দেরি না করে দুটো ঝট্‌কা নিয়ে মহাবালীপুরমের দিকে রওনা দিলাম।

রাস্তা বেশ ভালই। সোজা রাস্তা। রাস্তা খোয়া দিয়ে তৈরী। রাস্তার দুপাশের দৃশ্য দেখলে বাঙলা দেশের কথা মনে পড়ে। সারা রাস্তাটার দুপাশে বড় বড় বট, অশত্থ এবং তেঁতুলের গাছ। মাঝে মাঝে দুচারটে ছোট ছোট গ্রাম চোখে পড়ে।

এন্নুর বাওলজিকল স্টেশনের পথে

মহাবালীপুরমে যাওয়ার ঠিক আগেই একটা খাল পড়ে। খালটার নাম জিজ্ঞাসা করায় শুনলাম বাকিংহাম ক্যানাল বা বাকিংহাম খাল। নামটা প্রথমবারে শুনে উত্তরকারীকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—

কি জানি আমার শুনতে যদি ভুল হয়ে থাকে। পরের বার তার উত্তর শুনে বুঝলাম যে, না আমার নাম শুনতে ভুল হয়নি—এটার নাম বাকিংহাম ক্যানাল। ক্যানালের দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে ভাবলাম—এই রকম এক অজ্ঞাত, অখ্যাত স্থানে এই প্রাণহীন খালের হঠাৎ প্রথম চটকদার নামকরণ হ'ল কি করে। একটা বেশ বড় শহরের কাছে যদি কোন খালের এই নাম হ'ত, তাহ'লে বোধ হয় ভাল হ'ত। খালের পাড়ে একটা কিম্ভুত কিমাকার আকৃতির নৌকা রয়েছে, সেটায় করে খালটা পার হয়ে অপর পাড়ে যেতে হয়।

খালের অপর পাড়টাকেই মহাবালীপুরম বলে। এটা সমুদ্রের ধারেই বলা যায়। শোনা যায়, বর্তমানের মহাবালীপুরমের নাম আগে মামাল্লাপুরম ছিল। পহ্লব রাজারা এই মহাবালীপুরম স্থাপন করেন। সেই সময় তাঁরা এই স্থানে বন্দর এবং দুর্গ তৈরী করেছিলেন। এই রাজবংশের আমভল্ল নামে এক রাজার নাম থেকে এর নাম হয়েছিল মমাল্লাপুরম্—পরে সেটার মহাবালীপুরম্ নাম হয়।

অনেকে আবার বলেন যে, মহাবালী নামে এক দৈত্যরাজ এই স্থানে তাঁর রাজ্য স্থাপন করেন। পরে এই বংশের রাজারা এইখানে এক শহর গড়ে তুলে তার নাম দেন মহাবালীপুরম্।

নামকরণের ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে এখানকার সব মন্দির এবং সেগুলির স্থাপত্যকলা দেখে বলা যায় যে, প্রায় ২০০০ বৎসর আগে এই-খানকার সব মন্দিরগুলো তৈরী হয়েছিল।

আমরা খাল পার হয়ে বালি এবং মাঠ ভেঙ্গে এগিয়ে চললাম। রাস্তায় প্রথমে তাল গাছ—পরে তাল গাছের সঙ্গে ছোট বড় অনেক ঝাউ গাছ পার হয়ে আমরা পঞ্চ পান্ডবদের রথের মত দেখতে কতকগুলো মন্দিরের কাছে এসে পেঁাছলাম। শোনা যায়, পঞ্চ পান্ডবরা তাঁদের অজ্ঞাত বাসের সময় এইখানে বাস করতেন।

লক্ষ্য করে দেখলাম যে, বালির ওপর পাঁচটা ছোট বড় মন্দির একশ্রেণীতে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলির মধ্যে প্রথম দিক থেকে যুধিষ্ঠিরের, ভীমের, দ্রৌপদীর, সহোদরের মন্দির—এইগুলি থেকে আলাদাভাবে নকুলের মন্দির। মন্দিরগুলো খুব বেশী উঁচু নয়। দেখলে বোঝা যায় যে, প্রত্যেকটা মন্দির এক-একটা আস্ত পাথর থেকে কেটে তৈরী করা হয়েছে। সমস্ত মন্দিরগুলোর দেওয়ালে খোদা মূর্তিতে ভর্তি। এখান থেকে কিছু দূরেই একটা ছোট পাহাড়ের ওপর অর্জুনের মন্দির আলাদাভাবে পাহাড়ের ভেতর থেকে খুদে তৈরী করা রয়েছে। এই মন্দিরের দেওয়ালে আট অবতারের মূর্তি রয়েছে। পাহাড়ের মাথায় একটা আলোকস্তম্ভ আছে।

আরও কিছুদূর এগিয়ে আমরা সমুদ্রের ধারে এসে পেঁাছলাম। এই স্থানে এক সময় সাতটি প্যাগডা (7 Pagodas) ছিল, বর্তমানে এই সাতটি প্যাগডার মধ্যে একটিমাত্র ঠিক সমুদ্রের ধারেই দাঁড়িয়ে আছে। শোনা যায়, বাকি ছয়টা ভেঙ্গে সমুদ্রের মধ্যে চলে গেছে। বর্তমানে যে প্যাগডাটি রয়েছে, তার মধ্যে একটি ঘরে হরপার্বতীর মূর্তি এবং আর একটি ঘরে পাথরের বিষ্ণুর শয়ান মূর্তি রয়েছে।

মহাবালীপুরম দেখা শেষ করে আমরা আবার খাল পার হয়ে ঝটকায় এসে উঠলাম। ঝটকা পক্ষীতীর্থের রাস্তা ধরে চলতে লাগল। মাঝ রাস্তায় মুষলধারে বৃষ্টি নামল। প্রথম দিকটায় বৃষ্টি থেকে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করে শেষকালে হার মেনে বৃষ্টিতে ভিজেই এগিয়ে চললাম। যখন আমরা পক্ষীতীর্থে ফিরলাম, তখন সকলেই চুপচুপে হয়ে ভিজে গেছি। ভিজে কাপড়েই সেই অবস্থায় পক্ষীতীর্থ থেকে বাসে উঠে স্টেশনে ফিরে এলাম। স্টেশনে ফিরে সকলেই ভিজে কাপড়-জামা ছেড়ে, গা-মাথা মুছে তবে একটু আরাম বোধ করলাম। এখান থেকে আমরা এবার মান্দ্রাজে যাব।
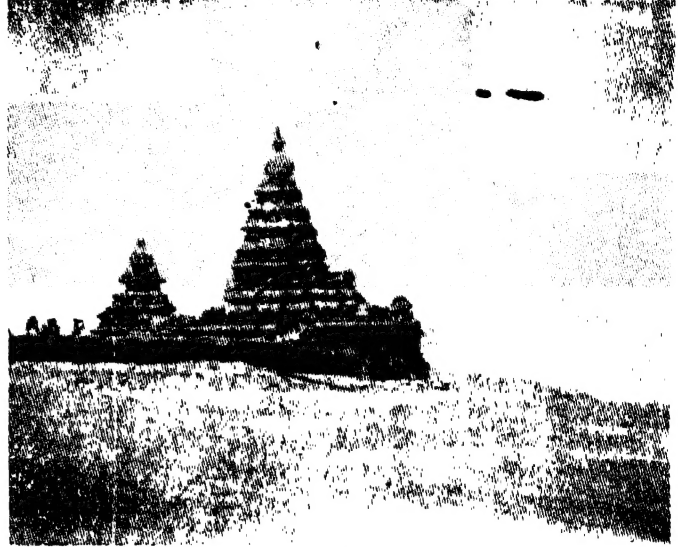
মহাবলীপুরমে সপ্ত প্যাগোডার শেষ প্যাগোডা

মান্দ্রাজ এখান থেকে ৪০ মাইলের ভেতরেই। ঘণ্টা দুই ট্রেনে করে গেলেই আমরা মান্দ্রাজ পেঁাছব।

আমরা যখন মান্দ্রাজের এগমোর স্টেশনে এসে নামলাম, তখন রাত প্রায় ৮॥টা। এবার আর আমরা হোটেলে উঠব না—আগে থেকেই ঠিক ছিল যে, আমাদের দলের একজন আত্মীয়ের বাড়িতে চড়াও হব। আমরা সেইজন্য আমাদের পেঁাছনর সংবাদ দিয়ে ভদ্রলোককে আগেই একটা টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলাম। আমরা যে ভদ্রলোকের বাড়ি উঠব—তার বাড়ি মান্দ্রাজ শহরের একটু বাইরে গিণ্ডি বলে একটি জায়গায়।

আমরা এগমোর থেকে ইলেকট্রিক ট্রেনে করে গিণ্ডিতে এসে নামলাম। আমাদের লটবহর নিয়ে যখন ভদ্রলোকটির বাড়িতে পেঁাছলাম, তখন রাত প্রায় ৯॥টা। ভদ্রলোকটির নাম মিঃ এ ব্যানার্জি।

সকলেই ক্লান্ত থাকায় কোন রকমে খেয়ে দেয়ে নিয়ে আমরা ঢালা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে চায়ের সময় ঠিক হ'ল যে, এখানে দু'দিন থেকে আমরা মান্দ্রাজ শহর এবং মান্দ্রাজ থেকে কয়েক স্টেশন দূরে এন্নুরে গিয়ে বাওলাজিকাল স্টেশন দেখব।

সেদিন সকাল বেলা যার যে ধারে ইচ্ছা বেড়াবার জন্য বের হ'ল। আমরা একটা রাস্তা ধরে হাটতে হাটতে মান্দ্রাজের এরোড্রোমের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দূরে থেকে দেখে আমরা আবার একটা নূতন রাস্তা ধরে ফিরলাম। এই রাস্তায় আমরা সৈন্যদের ব্যারাক ইত্যাদি দেখে বাড়ি ফিরলাম। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে সকলে মান্দ্রাজের যাদুঘর দেখতে গেলাম।

যাদুঘরে নূতনত্বের মধ্যে সামুদ্রিক প্রাণী এবং ... দেখলাম। এছাড়া, আর অন্য সব খুব সাধারণ ধরণের। যাদুঘর ... বিকেলের দিকে সমুদ্রের ধারে মান্দ্রাজ একুইরিয়াম দেখ...

ত্রিভেনদ্রামের একুইরিয়াম এই মান্দ্রাজের একুইরিয়ামের চেয়ে অনেক ভাল। একুইরিয়াম দেখে সমুদ্রের ধারে কিছুক্ষণ বসে আমরা বাড়ি ফিরলাম। ঠিক হ'ল যে পরের দিন দুপুরে এনুর দেখে সন্ধ্যাবেলার মান্দ্রাজ মেল ধরে আমরা কলকাতার দিকে ফিরব।

পরের দিন বেলা এগারটায় আমরা এনুর যাওয়ার জন্য ট্রেন ধরলাম। স্টেশন থেকে এনুরের এই বাওলজিকাল স্টেশনটি প্রায় দু' মাইলের মত। রাস্তায় একটা বড় ঝাউ বন পার হয়ে আমরা এনুর বাওলজিকাল স্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম। স্টেশনের ইন্-চার্জ ভদ্রলোকের সঙ্গে মাস্টার মশাইয়ের পূর্ব থেকেই আলাপ ছিল। এখানে সমুদ্রের ধরনের প্রাণী সংগ্রহের পর সেগুলোকে ওষুধ দিয়ে preserve করে রাখা হয়। পরে দরকার মত বিভিন্ন স্থানে পাঠান হয়। আমরা সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দেখা শেষ হবার পর বিকাল পাঁচটায় আমরা ফিরে এলাম। ফিরেই আমরা জিনিসপত্র গোছগাছ করে কলকাতা রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম। ট্রেনের সময় হলে ভদ্রলোককে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আমরা মান্দ্রাজ সেন্ট্রালের দিকে রওনা দিলাম। ট্রেনে সুবিধামত একটা কামরা দখল করে তাতে উঠে বসলাম।

মহাবলীপুরমে পঞ্চপাণ্ডবের রথ

মান্দ্রাজ সেন্ট্রাল থেকে ট্রেন ছাড়ল—জানালার বাইরে মুখ বার করে শেষবারের মত স্টেশনটা দেখে নিলাম—কি জানি আর এদিকে কোন দিন নাও আসতে পারি।

আগেই আমরা ঠিক করে রেখেছিলাম যে, ওয়ালটিয়ারে নেমে ভিজাগাপটমের বন্দর, জাহাজ তৈরীর কারখানা এবং সীমাচলমের মন্দির দেখব।

সেই অনুযায়ী পরদিন বেলা ২॥টায় আমরা ওয়ালটিয়ারে নামলাম। এখানে থাকার সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, স্টেশন থেকে প্রায় দু মাইল দূরে একটা ডাকবাংলো আছে। এটায় থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে। একটা ঝট্‌কা নিয়ে আমরা সেই দিকেই রওনা হলাম। ডাকবাংলোয় এসে দেখি চৌকিদারের দেখা নেই। একজন লোককে তার খোঁজে পাঠিয়ে আমরা ডাকবাংলোর বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। ডাকবাংলোটি বেশ সুন্দর। বিশেষ করে এর আস-পাশের দৃশ্য। স্থানটিও বেশ নির্জন। ডাকবাংলোর পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালে দূরে সীমাচলম পাহাড়ের শ্রেণী চোখে পড়ে। পাহাড়ের কোলে কোলে দু'চারটে বাড়ি দেখা যায়। সমুদ্র দেখা না গেলেও বাঁদিকে তাকালে অনন্ত প্রসারিত আকাশ—দৃষ্টি এদিকে কোন কিছুতে বাধা পায় না। দূরে ভাইজগ শহরের একটা আঁচ এখান থেকে পাওয়া যায়। বন্দরের জাহাজগুলোর মাস্তুল দেখতে পাওয়া যায়।

চৌকিদার এসে ঘর খুলে দিল। দুটো ঘর আছে—একটা বড়, আর একটা ছোট। বৈদ্যুতিক পাখার এবং আলোর বন্দোবস্ত আছে। বিশ্রাম করে চা খেয়ে আমরা একটা ঝট্‌কা নিয়ে ওয়ালটিয়ার এবং ভাইজগ বন্দর দেখবার জন্য বের হলাম।

প্রথমে ডাকবাংলো থেকে বের হয়ে আমরা ভাইজগ শহরের উল্টো দিকে চললাম, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় দেখবার জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়টি সমুদ্রের ধারেই অবস্থিত বলতে গেলে। ছোট বিশ্ববিদ্যালয় হলেও বাড়িগুলো বেশ সুন্দর। আমরা যে সময় এটি দেখতে গিয়েছিলাম, তখন এখানে আরও কয়েকটা নূতন নূতন বাড়ি তৈরী হচ্ছিল। সমস্ত বাড়িগুলোই কিন্তু এক ধাঁজের এবং পাথরের তৈরী। পাথর দিয়ে তৈরী করবার কারণ এই যে, সমুদ্রের নোনা বাতাসে সাধারণ চূণ বালিওয়ালা বাড়িতে নোনা ধরে খুব তাড়াতাড়ি সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু পাথরের তৈরী বাড়িতে সেটা সম্ভব হয় না।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় দেখে আমরা সমুদ্রের ঠিক ধার দিয়ে যে রাস্তা ভাইজগ গেছে, সেইটে ধরে চললাম। রাস্তাটি ভাল। কোন্ এক রাজা এই রাস্তাটি সম্পূর্ণ নিজের খরচে তৈরী করে দিয়েছেন।

এই রাস্তা ধরে যেতে যেতে দূরে 'ডল্‌ফিন্ নোজ' চোখে পড়ল। ডল্‌ফিন্ হচ্ছে সমুদ্রের তিমি জাতীয় এক জন্তু। এটাকে

ডল্ফিনের নাক বলাতে আমরা যেন না মনে করি যে, ডল্ফিনের নাক এই রকম দেখতে। একটা মাঝারি গোছের পাহাড় সমুদ্রের পাড় থেকে বের হয়ে সমুদ্রের ভেতরে চলে গেছে। জলের ভেতরের ভূমির সম্মুখ দিকটা গোল মত। ডল্ফিন্ নোজ পার হয়ে আমরা ভাইজগের বন্দরে এসে পেঁাছলাম। সেই সময় এই অঞ্চল সামরিক অধিকারে থাকার দরুণ আমরা জাহাজ নির্মাণের কারখানার ভেতর প্রবেশ করতে পারলাম না। কিন্তু বন্দরের ভেতর যেখানে জাহাজগুলো থাকে, সেখানে যাবার কোন বাধা না থাকায় আমরা জাহাজগুলোর কাছে গিয়ে দেখলাম।

ভাইজগ বন্দর থেকে বের হয়ে আমরা শহরের ভেতরে ঢুকলাম। রাস্তার ধারে ধারে ছোট ছোট পার্ক আছে—পার্কগুলো খুব ছোট হলেও দেখতে সুন্দর। রাস্তায় অনেক হোটেল এবং কফিখানা আছে। শহরের ভিতর দিয়ে আমরা ডাকবাংলোর দিকে ফিরলাম।

সমস্ত মিলে ভাইজগ এবং ওয়ালটিয়ারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বেশ সুন্দর। ভাইজগের তুলনায় ওয়ালটিয়ারে ঘরবাড়ি কম এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যও ভাল। ওয়ালটিয়ার হচ্ছে জমিদারের বাগান বাড়ি, আর ভাইজগ হচ্ছে জমিদারী।

সন্ধ্যার পর ডাকবাংলোর বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ভাইজগ শহরের এবং বন্দরের আলো মুক্তার মত দেখায়। চারধার নিস্তব্ধ—শুধু একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে—এর মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দূর থেকে রেলগাড়ির শব্দ, আর কারখানার শব্দ ভেসে আসছে। সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস ডাকবাংলোর খোলা দরজা দিয়ে হু হু করে বয়ে চলেছে।

রাত্রে ঠিক করলাম যে, সকাল বেলায় সীমাচলম দেখে দুপুরের গাড়িতে কলকাতার দিকে রওনা দেব। শুনলাম যে, এখান থেকে ভিজিয়ানাগ্রামের বাস সীমাচলমের ওপর দিয়েই যায়—কিন্তু বাসের সময় জানা না থাকার দরুণ ঝট্কা করেই সীমাচলমে যাওয়া ঠিক করে একটা ঝট্কাওয়ালাকে ভোরবেলায় ঝট্কা নিয়ে আসবার কথা বলে দিলাম।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে প্রস্তুত হতে হতেই ঝট্কাওয়ালা ঝট্কা নিয়ে হাজির হ'ল। সীমাচলম ডাকবাংলো থেকে প্রায় দশ মাইলের পথ। যাতায়াতের ভাড়া ৩৲ ঠিক হ'ল।

প্রায় তিন মাইল যাওয়ার পর ভাইজগ মিউনিসিপ্যালিটির সীমা শেষ হ'ল। লক্ষ্য করলাম যে, মিউনিসিপ্যালিটির সীমার পর থেকেই রাস্তা খুব ভাল। রাস্তার দু'পাশের দৃশ্য খুব সুন্দর। রাস্তার গা ঘেঁষে সীমাচলমের পর্বতের শ্রেণী। সমস্ত পাহাড় একটা সবুজের আবরণ দিয়ে ঢাকা—এর মধ্যে কোথাও একটু ফাঁক নেই। দু'পাশের পাহাড়ের কোলে সবুজ ধানের ক্ষেতে ভর্তি—তার মধ্যে অসংখ্য তাল গাছ।

আট মাইলের পর রাস্তাটা দুভাগে ভাগ হয়ে সোজা রাস্তাটা আনাকাপাল্লী পর্যন্ত চলে গেছে, আর ডান দিকের রাস্তাটা বেঁকে ভিজিয়ানাগ্রাম পর্যন্ত গেছে। আমাদের ঝট্কা ডান দিকের রাস্তা ধরল। এই রাস্তা ধরে প্রায় দু মাইল যাওয়ার পর আমরা সীমাচলমের মন্দির যে পাহাড়ের ওপর, তার পাদদেশে এসে পেঁাছলাম। পাহাড়ের ওপরে ওঠবার জন্য পাকা প্রশস্ত সিঁড়ি একেবারে মন্দির পর্যন্ত চলে গেছে। সিঁড়ির সংখ্যা প্রায় ১১,২০। সিঁড়ির দুপাশে প্রাচীর দেওয়া। সিঁড়ির কয়েক ধাপ পর পর একটা সিঁড়ি খুব চওড়া। এতে সুবিধা এই যে, ওঠবার সময় এই সমতল চওড়া সিঁড়িটা পার হওয়ার দরুণ কিছুক্ষণ করে বিশ্রাম করবার সময় পাওয়া যায়। প্রাচীরের ওপর কিছু দূরে দূরে একটা করে গর্ত করা আছে। আগে এতে তেল আর সলতে দিয়ে আলো জ্বালান হ'ত। বর্তমানে আর এর দরকার হয় না, কারণ, মন্দিরের নীচে থেকে আরম্ভ করে মন্দির পর্যন্ত বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত আছে।

ওপরে উঠে মন্দিরে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখলাম যে, দর্শনার্থীদের প্রত্যেককে এক আনা করে প্রবেশ মূল্য দিয়ে তবে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। মন্দিরে দেবতাকে দর্শন করতে যেতে প্রবেশ মূল্য দিয়ে তবে ঢুকতে হবে। এই প্রথাটা একেবারে ভাল লাগল না। এতে মনে হয়, যেন কোন আমোদ-প্রমোদের স্থানে টিকিট কেটে প্রবেশ করছি। এই ধরণের প্রবেশ মূল্য দিয়ে মন্দিরে ঢোকবার প্রথা আরও অনেক স্থানের মন্দিরেই আছে।

মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করে একটা বড় শিবলিঙ্গ মূর্তি দেখলাম। সমস্তটা সাদা—দেখলে মনে হয়, যেন চূণকাম করা। মন্দিরে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে মাটি থেকে প্রায় অর্ধেকটা পর্যন্ত সুন্দর সুন্দর সব মূর্তি খোদা রয়েছে। কিন্তু ওপরের অংশটায় কোন রকম মূর্তি অথবা কারুকার্য চোখে পড়ে না—মনে হয়, যেন ওপরের দিকটার নির্মাণকার্য কোন কারণবশত তাড়াতাড়ি করেই শেষ করা হয়েছিল।

মন্দির ছাড়া পাহাড়ের মাথায় যাত্রীদের থাকবার কিছু কিছু বন্দোবস্ত আছে। মন্দিরের পূজারীরাও এখানে ঘরবাড়ি তৈরী করে বসবাস করছে।

মন্দির দেখা শেষ করে আমরা ওপর থেকে নীচে নামলাম। ঝট্কায় উঠে প্রায় দু' ঘণ্টা বাদে ডাকবাংলোয় ফিরলাম। ঝট্কাওয়ালাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা স্নান খাওয়া শেষ করে, সোজা স্টেশনের দিকে মান্দ্রাজ মেল ধরবার জন্য রওনা দিলাম।

ট্রেনে একটা সুবিধামত তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি দেখে তাতে উঠে বসলাম। এবার সোজা কলকাতা। রাত্রে বাঙ্কের ওপর কোন রকমে রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে প্রায় ষোল দিনে ৩,৬০০ মাইল ভ্রমণ করে হাওড়ায় এসে পেঁাছলাম।

সমাপ্ত

আমাদের ভ্রমণের সঙ্গী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়কে ভ্রমণের মধ্যে তাঁর নিজের তোলা অনেক ফটো দিয়ে আমায় সাহায্য করার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

হিঃ সু

মৃত্যু

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সুদীর্ঘ আঠার বছর পরে।......

অকস্মাৎ সুজাতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

এভাবে যে সুজাতার সঙ্গে আবার কোন দিন আমার দেখা হতে পারে কোন দিনও ভাবিনি।

হাতে কোন কাজকর্ম ছিল না বলে বাঙলা দেশের গ্রামগুলি অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম নিজের পান্সীতে।

চারিদিকে সুবিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর। শীতের সকাল। ওদিককার প্রকাণ্ড মাঠটা জুড়ে কে যেন হলুদ রঙের একটা আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে গেছে। দুপাশের মাঠের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে সরু শীতের শীর্ণকায়া নদী অত্যন্ত ক্লান্ত গতিতে বয়ে চলেছে!...

মাঝিকে বললামঃ দুটো দিন এখানেই নোঙর করে রাখ।

বন্দুকটা কাঁধে ফেলে নদী কিনারের সবুজ মাঠ ভেঙ্গে মন্থর পদে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে শীতের রৌদ্র-ঝলকিত আকাশপথে বেলে হাঁসের সার উড়ে চলেছে।

মাথার উপর আর একটা ঝাঁক আসতেই বন্দুক তুললাম; কিন্তু সহসা শান্ত প্রকৃতির বুকখানাকে ফালি ফালি করে একটা বন্দুকের আওয়াজ জেগে উঠল......গুড়ুম!......দিকে দিকে মুক্ত প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে পড়ল তার ধ্বনী......ম...ম!......

চমকে বন্দুক নামালাম।

সহসা এমন সময় একটা উচ্চ সুমিষ্ট হাসির কলোচ্ছ্বাস কাণে এসে বাজল।

কে?

চমকে ফিরে দাঁড়ালাম।

ব্রিচেস্ পরা...মাথায় শিকারের ধূসর রঙের টুপি...হাতে রাইফেল একজন আমার অল্প দূরেই দাঁড়িয়ে।......তার মুখের কোলে তখনও সেই সুমিষ্ট বিলীয়মান হাসির শেষ উচ্ছ্বাসের শেষ পরশটুকু সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান ঃ আমি দুঃখিত মিঃ! আপনার শিকারে ভাগ বসিয়েছি!

এ কার কণ্ঠস্বর!......

বহুদিন না শুনলেওঃ এ স্বর ত' আজিও ভুলিনি! এখনও যে অন্তরের নিভৃত কন্দরে তেমনি সুস্পষ্ট হয়েই আছে।

কিন্তু!......

ঃ আরে কে কৌশিক না?......

ঃ হাঁ!...তুমি!...আপনি!...মানে!......

ঃ মানে হাঁ আমি সুজাতাই! তাতে কোন ভুল নেই! ঃ তারপরই ও হাসতে হাসতে বললেঃ After a pretty long days!......কী বল?...এ্যাঁ!...

কী বলব!...অন্তরের সমস্ত ভাষা আজ মূক হয়ে গেছে।

সুজাতা!...সত্যিই তবে আজিও সুজাতা বেঁচে আছে। এবং আমার সামনেই সশরীরে দাঁড়িয়ে।

ঃ কী দেখছো কৌশিক? চিনতে পারছ না সুজাতা কে? ঃ হাসতে হাসতে একটান দিয়ে সুজাতা মাথার টুপিটা খুলে ফেললে। অফুরন্ত কেশপাশ মাথার দুপাশে বিনুনী করে পাকানো। সামনে দুচারিটা স্থানভ্রষ্ট চুল কপালের পরে ঘামে জড়িয়ে এঁটে ধরেছে। কাঁধের পরে বন্দুকটা তুলে হাত দুটো তার উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিল ঃ তারপর এদিকে কোথায় এসেছো?

সে প্রশ্নত' আমিও তোমায় করতে পারি সুজাতা ঃ আমি বললাম।

সুজাতা তখন মাটির পাড় ভেঙ্গে এগিয়ে চলতে সুরু করেছে ঃ উঃ কত কাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা!

একটা যুগ!...

তা এক যুগ বইকি!...দীর্ঘ আঠার বছর পরে ঃ চলতে চলতে আমি জবাব দিই।

বিলেত হতে কবে ফিরলে কৌশিক ঃ সুজাতা প্রশ্ন করে।

তাও বছর দশেক হবে। ঃ অবসন্নভাবে বললাম।

প্রায় সিকি মাইল চলার পর নদীর বাঁকে একটা বড় পান্সী দেখা যায়। আঙ্গুল তুলে পান্সীটা নির্দেশ করে সুজাতা বলে ঃ ঐ আমাদের আবাস!...

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে সুজাতার মুখের দিকে তাকালাম।

হাঁ আজ দীর্ঘ সতের বছর ঐ নৌকাতেই আমরা নীড় বেঁধেছি ঃ সুজাতা বলে।

আমার বিস্ময়ের মাত্রা যেন ক্রমে বেড়েই চলে। দুজ ততক্ষণে চলতে চলতে একেবারে পান্সীর কাছে এসে পড়েছি। ডাঙ্গা হতে এক লাফ দিয়ে সুজাতা নৌকার পাটাতনে গিয়ে ওঠে। তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে আহ্বান জানায়ঃ এসো। আমিও এক লাফে গিয়ে পাটাতনের উপরে পড়ি। সামনেই একটি ছোট্ট ঘর। অতি পরিপাটি করে সাজান। ধবধবে বকের পালকের মত বিছানার পরে শুয়ে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি! এই দিকেই তাকিয়ে বুক পর্যন্ত পাতলা একটা মোরাদাবাদী চাদরে ঢাকা। সুজাতা ঝুপ্ করে তার শয্যার পাশে বসে পড়েঃ এ আমার বন্ধু......অনেক দিন আগেকার......সেই যে মনে নেই কৌশিক সেন!......আর ইনি হচ্ছেন আমার স্বামী সলিল রায়! ঃ কৌশিকের দিকে চেয়ে সুজাতা বলে।

সলিলবাবু নীরবে চোখ তুলে আমার দিকে তাকান। ভাবলেশ হীন মুখখানি...সামান্য একটি কুঞ্চন পর্যন্ত নেই কোথাও যেন পাথরের মুখের পরে দুটো অতলস্পর্শী চোখ। সমস্ত মুখখানা জুড়ে মাত্র এক জোড়া ভাষাহীন নীরব নিথর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি!...আমার চোখের দৃষ্টি আপনা হতেই নীচের দিকে ঝুলে পড়ে। সামান্য একটা নমস্কার জানাতেও যেন ভুলে যাই!

তুমি কিছু মনে করো না কৌশিক ঃ সুজাতার কণ্ঠস্বরেও উচ্চকিত হয়ে উঠি ঃ দীর্ঘকাল ধরে বেচারী প্যারালিসিসে ভুগছে কি না?......কথাত' বলতে পারে না!...হাত পাও নাড়তে পারে না।

অত্যন্ত সহজভাবে সুজাতা বলে। আমার সমগ্র দেহট

যেন সহসা জমে পাথর হয়ে যায়। সুজাতা তখন বলছে ঃ চলু বাইরে গিয়ে বসি। চা করি!......

না থাক। চা আর এখন খাবো না ঃ এতক্ষণে যেন আমার গলায় ভাষা ফোটে।

কেন চা খাবে না.কেন? আমি নিজে হাতে চা করে দেব! তুমি আমার হাতের চা খেতে কত ভালবাসতে?...একদিন বৃষ্টির সন্ধ্যায় চা করে দিইনি বলে তোমার সেই অভিমান। ভুলিনি কোন কথাই আমি ভুলিনি। দেখেছো কৌশিক। সব হুবহু মিলে যাচ্ছে না!...ঃ তরল কণ্ঠে সুজাতা হেসে উঠে। আমি চুপ করে থাকি!...সেই আঠার বছরের আগেকার সুজাতা আজও ঠিক তেমনিই আছে। তেমনি হাসে তেমনি কথা বলে। মাথার চুলগুলি আজিও তেমনি রুক্ষ্ম তৈলহীন!...চা তৈরী করতে করতে সুজাতা কত কথাই যে অনর্গল বকে চলে। আমি শুধু নীরবে শীতের শীর্ণ শান্ত নদীর দিকে তাকিয়ে থাকি। আকাশের নীল বুকখানা রৌদ্রের তেজে ঝক্ঝক্ করে জ্বলে। সুজাতা তার ব্রিচেস ছেড়ে সাধারণ গেরুয়া রংয়ের একখানি লাল চওড়া পাড় সাড়ী পরেছে!...মাথার চুলগুলি দিয়েছে খুলে—রুক্ষ্ম বিপর্যস্ত সারা পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে।

এক সময় সুজাতা বললে ঃ তোমার নৌকাটা আমাদের নৌকার কাছেই নিয়ে এসো না। কটা দিন একসঙ্গে পাশাপাশি থাকা যাবে।

আমি কোন জাবাব দিলাম না। একটু শুধু হাসলাম।

* * * * *

সুজাতাকে ত' ভুলেই গেছিলাম।

আজ যৌবনের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছি। দীর্ঘ বিয়াল্লিশটা শীত বসন্ত এই দেহটাকে নিয়ে ওলটপালট করে গেছে। কলকাতার এক কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে মারামারি করে বহরমপুর কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম ঃ সেইখানেই আমার সুজাতার সঙ্গে ভাব। সুজাতার বাবা সঞ্জীববাবু ছিলেন ওই কলেজেরই ইকনমিক্সের সিনিয়র প্রফেসর। ভাল স্পোর্টম্যান হিসাবে চিরদিনই আমার একটা নামডাক ছিল। সঞ্জীববাবু ছিলেন আবার কলেজের স্পোর্ট সেক্রেটারী। আলাপ হতে তাই দেরী হয়নি। এসব ছাড়াও বাঁশী বাজান আমার কাছে ছিল একটা নেশার মত। সুজাতা আমাদের সঙ্গেই পড়ত। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা কলেজের সামনের খোলা মাঠে বসে বাঁশী বাজাতাম যখন...কলেজের সংলগ্ন কোয়ার্টার হতে সঞ্জীববাবু ও সুজাতা আমার পাশে এসে বসতেন। কত রাত পর্যন্ত যে বাঁশী বাজাতাম। ক্রমে সুজাতার সঙ্গে আমার আলাপটা অত্যন্ত গভীর হয়ে এল। এমন সময় কেমিস্ট্রীর নতুন প্রফেসর সলিল রায় কলেজে এলেন। সলিলবাবুর সঙ্গে কী ভাবে যে একদিন মেয়ে ও বাপের পরিচয় সূত্রটা গভীর হয়ে এল টের পাইনি। টের পেলাম প্রথম সুজাতার কাছে এক সন্ধ্যায় বিবাহের প্রস্তাব করতে গিয়ে। সেদিন সন্ধ্যায় মৃদু হেসে শুধু সে জবাব দিয়েছিল ঃ বিয়ে আমার সব ঠিক হয়ে গেছে কৌশিক। সেই দিনই শেষ রাত্রের গাড়িতে কাউকে কিছু না জানিয়ে কলেজ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসি।

সে আজ দীর্ঘ আঠার বছরের কথা। দেখাশোনা আর আমা করা হয়ে ওঠেনি। সুজাতার খোঁজও আর নেইনি। কলেজ ছাড়বার. বছরখানেকের মধ্যেই মা ও বাবা দুজনেই মারা গেলেন সেই জন্যই বিয়ের কথাটাও চাপা পড়ে গেছে বিশেষ করে নিজের দিক হতে কোন তাগিদই যখন আর অবশিষ্ট ছিল না।

* * *

রোজই প্রায় সন্ধ্যা ও সকালটা সুজাতাদের নৌকাতেই কাটত। কখনো সুজাতা গল্প করতো কখনো গাহিত গান আমি শুনতাম। পুরাতন হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো যেন অতীতের বিস্মৃতির সাগর ডিঙিয়ে ফিরে এসেছে। যাকে ভুলেছিলাম ভেবে এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম, আজ আবার তাকে এত কাছাকাছি পেয়ে নতুন করে যেন আবার মনে হতে লাগল ঃ ভুলিনি শুধু ভুলবার চেষ্টা করেছি মাত্র!

হাসি গল্পে গানে সুজাতা আবার নব রূপে চিরপুরাতনের মাঝে ফিরে এল।......

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে যায় সঙ্গলিপ্সায় অশরীরী রক্তাক্ত হয়ে ওঠে।...

শুনেছিলাম বিবাহের এক বছর পরই নাকি সহসা সলিলবাবুর প্যারালিসিস্ হয়ে কথা বলার শক্তি ও চলচ্ছক্তি চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তথাপি সুজাতা ওই পঙ্গু দেহটাকে সযত্নে আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে দীর্ঘ সতের বছর ধরে। এতটুকু ক্লান্তি নেই। এতটুকু বিরক্তি নেই। দিনের পর দিন একঘেয়ে পরিচর্যা! ওই অভিশপ্ত দেহটা ঘিরে ওর নারী জীবনের প্রথম বাসনা যেন আজিও ফলে ফুলে সুশোভিত। কিন্তু কেন?...কেন এ অহৈতুক কাঙালপনা! কেন ওই অচল অথর্ব দেহটাকে আজিও এমনি করে সম্মানিত করবে।

দীর্ঘ সতের বছরের ক্লিষ্টতায়ও সুজাতার যেন এতটুকু পরিবর্তনও হয়নি...বরং যৌবনের তটপ্রান্তে এসে ওর যৌবন আরো পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। এখন ভরা নদীর বুকে জলোচ্ছ্বাস!...

মাঝে মাঝে দু'জনে নদী তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গল্পে গল্পে কতদূর চলে যাই। দু'জনের সেই পুরাতন দিনগুলি যেন আবার ফিরে আসে। হঠাৎ সেদিন আকাশে উঠেছে জোৎস্না হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা চলে এসেছি। চলতে চলতে একসময় সুজাতা বললে ঃ এসো এখানে বালুর পরে একটু বসা যাক। দু'জনে বসলাম। হঠাৎ একসময় সুজাতার হাতটা টেনে নিয়ে গভীর স্বরে বললাম ঃ কেন এমন করে নিজেকে ধ্বংস করছো সুজাতা!...... ওই মরা দেহটাকে নিয়ে কেন আর এ উঞ্ছবৃত্তি!... সুজাতা একটি কথাও বললে না ঃ নীরবে নিজের ধৃত হাতটি শুধু আমার হাত হতে মুক্ত করে নিল। তারপরই উঠে আবার চলতে সুরু করলে। দীর্ঘ পথ দু'জনেই চুপ করে অতিবাহিত করে দিলাম। সে রাত্রে নৌকায় ফিরে আর ঘুমোই নি। তীব্র অনুশোচনায় ছট ফট করে কাটল! ভোরের আলো তখনও ফুটে উঠে নি ছুটলাম সুজাতাদের নৌকার দিকে!...কিন্তু একি! নদী কিনার শূন্য! সুজাতাদের নৌকা যেখানে নোঙর করা ছিল সেখানে নেই! এদিক ওদিক চাইতেই এক জায়গায়

(শেষাংশ ৯৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২৬

পরদিন বৈকালে জয়ন্ত তাহার সহকর্মিদের চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়িতে ডাকিয়া আনিল। প্রতিমা, প্রশান্ত, বরেন, দিলীপ ও নীমাধব এই পাঁচজন এবং আরও অনেকে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে রাণুও আছে। রাণুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে পদ্মা।

পদ্মা নিজের হাতে মাংস রাঁধিয়াছে। নিজেই লুচি ভাজিতেছে। খুব উৎসাহের সহিত সে লাগিয়া গিয়াছে।

প্রতিমা ও রাণু পদ্মাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া রান্নাঘরে গিয়া তাহাকে আবিষ্কার করিল।

প্রতিমা হাসিয়া বলিল—'বাঃ! চমৎকার মানিয়েছে ত তোমাকে! একেবারে যে অন্নপূর্ণার মত দেখাচ্ছে!'

পদ্মা কহিল—'তাহলে বল রান্নাঘরেই আমাকে মানায় ভাল!'

—'না না, ঠাট্টা নয়। দেবীর মত তোমার এই রূপ—তার পাশে রয়েছে ওই লুচির স্তূপ—আর মন্দিরের মত পবিত্র পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর—সবটা একত্রে ভারি চমৎকার দেখায়।'

—'কিন্তু দেবীর মত রূপ থাকলেই ত দেবী হওয়া যায় না প্রতিমা, আমাকে দেবী বলে ঠাট্টা করাই হয়।'

রাণুও তাহাদের কথায় যোগ দিল।

রাণু বলিল—'দেবতার মত যার স্বামী, তাকে দেবীর মত মনে হওয়াই ত স্বাভাবিক। সঙ্গদোষে বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে সঙ্গগুণেই বা থাকবে না কেন? দেবতার সঙ্গে যে থাকে, সে দেবী ছাড়া আর কি?'

রাণুর যুক্তিটা অকাট্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যুক্তি আর প্রমাণ এক নয়। পদ্মা নিজের কাছে নিজে লজ্জা পাইল। দেবতার সঙ্গে বাস করিয়াও সে দানবীর মত হইয়াছে।

পদ্মা কোন কথা না বলিয়া লুচি ভাজায় মন দিল। রাণুও বসিয়া গেল লুচি ভাজিতে।

পদ্মা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—'সেকি! তুমি কেন পারবে? তোমার ত এসব করে অভ্যেস নেই!'

রাণু বলিল—'আমার ভারি ইচ্ছে করছে আপনার সঙ্গে বসে এসব করি। কোনদিন করিনি বলেই সখ হচ্ছে।'

—'থাক থাক, সখ করে সাড়িটা নষ্ট করতে হবে না। তুমি ওই চৌকিটাতে বসে গুন্ গুন্ করে একখানা গান গাও দেখি। কতদিন তোমার গান শুনতে পাব না কে জানে!'

—কেন, আপনারা কোথাও যাচ্ছেন নাকি?'

—'হ্যাঁ ভাই, দিন কতকের জন্য বাইরে যাচ্ছি।'

—'কবে ফিরবেন?'

—'তা জানি না।'

রাণু জিজ্ঞাসা করিল—'কি গাইব বলুন ত?'

পদ্মা বলিল—'যা তোমার ভাল লাগে তাই গাও।'

রাণু একটু ভাবিয়া লইল, তারপর গান ধরিল। পদ্মা গান শুনিতে শুনিতে নিজের কাজ করিতে লাগিল।

জয়ন্ত পদ্মাকে তাগিদ দিতে আসিয়া রাণুর গান শুনিয়া বলিল—'বেশ ত! তুমি পুরুষদের বর্জন করে শুধু মেয়েদের গান শোনাচ্ছ, এটা কিন্তু তোমার উচিত হচ্ছে না। আমরা বুঝি আর গান শুনতে জানি না!'

রাণু হাসিয়া বলিল—'যারা কাজের লোক তাদের আর গান শুনবার সময় কোথায়?'

জয়ন্ত বলিল—'তোমার কথাটা কিন্তু ঠিক হ'ল না। আমি অহিংস ভাবে এর প্রতিবাদ করছি। যে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না? গানটাকে কুঁড়েদের জন্যে রেখে দেবে—আর কাজের লোকদের দেবে ফাঁকি—এ অবিচার আমরা সহ্য করব না।'

—'কি করবেন শুনি?'

—'তোমাকে গাইতে বাধ্য করব।'

—'গায়ের জোরে নাকি?'

—'গায়ের জোরে গান গাওয়ানো যায় না, তা জানি কিন্তু গায়ের জোরই ত একমাত্র জোর নয়। আমরা ভারতবর্ষের লোক,—আমরা আত্মার জোরে বিশ্বাস করি।'

রাণু বলিল—'আপনি যে মহাত্মা গান্ধীর মত কথা বলছেন।'

'তাই নাকি! তা' যদি বলে থাকি তাতেই বা ক্ষতি কি? আমি হিংসায়ও বিশ্বাস করি—অহিংসায়ও বিশ্বাস করি। গায়ের জোরও আমি সত্যি বলে' জানি—আত্মার জোরও সত্যি বলে মানি। কোথায় কোন্‌টা প্রয়োগ করতে হবে তা' নিয়েই হ'চ্ছে কথা। আমার মতে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা।'—এই বলিয়া জয়ন্ত হাসিয়া রাণুর মুখের পানে তাকাইল।

কথাটা রাণু বুঝিতে পারিল বলিয়া জয়ন্তের মনে হইল না। বুঝাইবার চেষ্টাও সে করিল না। পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার কতদূর?'

পদ্মা কহিল—'এই ত হ'ল বলে! বেশী দেরী নেই।'

জয়ন্ত চলিয়া যাইতেছিল, রাণু তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আপনারা নাকি বেড়াতে যাচ্ছেন? কোথায় যাবেন?'

জয়ন্ত বলিল—'তীর্থ পর্যটনে বেরুব। ঘুরে ঘুরে সমস্ত তীর্থই দেখব মনে করেছি। তারপর কোথাও নিরিবিলি কিছুদিন থাকব।'

রাণু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—'আপনি যে তীর্থও মানেন দেখছি!'

—'কেন, মানতে নেই নাকি?'

—'আপনার মত একজন revolutionary-ও যদি সেকেলের সব কিছু মানে, তা' হলে'—

বাকীটুকু না বলিলেও বুঝা গেল! রাণুর কণ্ঠে যেন হতাশার সুর। জয়ন্ত যেন প্রাচীন পন্থীর মত তীর্থ করিতে চলিয়াছে, ইহাতে রাণু বোধ করি হতাশ হইয়াছে।

জয়ন্ত বলিল—'তুমি 'যা' বলতে চাও রাণু তা'ও কিন্তু নেহাৎ সেকেলে কথা। প্রায় এক শ' বছরের পুরোনো। ইংরেজি শিক্ষা যখন এদেশে প্রথম প্রচলিত হয় তখনকার ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরা ঠিক ঐ কথাই বলত। ইংরেজ পাদ্রীদের মুখে শুনে শুনে তাদের ধারণা হ'য়েছিল,—সেকালের সমস্ত সংস্কারই কুসংস্কার। তাই সেকালের সব কিছু না-মানাটাই ছিল তাদের বাহাদুরি—তাদের ফ্যাসান। তাদের সেই বাহাদুরি আর তাদের ফ্যাসান যদি আমার ভাল না লাগে, তা' হলে বোধ করি আমাকে দোষ দেওয়া যায় না।'

কথাটার মধ্যে যে মৃদু ভর্ৎসনা ছিল, তা ব্যর্থ হইল না। জয়ন্ত রাণুর মুখ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিল।

সে বলিতে লাগিল—'সেকেলে বলতে তোমরা মূর্ছা যাও, তাতে তোমাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। সেকালের সব কিছুই ভাল, তা আমি বলি না। কিন্তু সেকালের অনেক কিছুই যে একালের অনেক কিছুর চেয়ে অনেক ভাল, একথা আমি জোর ক'রে বলতে পারি। সেকালে তোমাদের দেশ স্বাধীন ছিল,—তোমাদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল, আর একালে তোমাদের দেশও স্বাধীন নেই—তোমাদের সংস্কৃতিও পরের কাছ থেকে ধার করা। একালে তোমাদের বড়াই করবার কি আছে?'

জয়ন্তের ভর্ৎসনায় রাণু তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু পদ্মা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না।

পদ্মা উঠিয়া দরজার কাছে আসিয়া বলিল—'কেন তুমি ওকে ও-রকম ক'রে বলছ? তুমি নিজে ত কিছু মান না, আমি জানি।'

—'কিছুই মানি না ঠিক তা নয় পদ্মা, অনেক কিছুই মানি না, আবার অনেক কিছুই মানি। কিন্তু সেকালের ভারতবর্ষ যে অনেক উন্নত ছিল, তা আমি জানি এবং জানি বলেই তাকে আমি অশ্রদ্ধা করতে পারি না।'

—'তুমি যে বক্তৃতা সুরু করলে দেখচি! আমরা রাণুর গান শুনছিলাম—তুমি সব মাটি করে' দিলে।'

জয়ন্ত হাসিয়া বলিল—'আমার বক্তৃতায় যদি সব মাটি হ'য়ে গিয়ে থাকে তা' হ'লে তোমার বক্তৃতায় শোনা হোক্ না! আমি ত তোমার মুখ বন্ধ করে' রাখি নি!'

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিল।

পদ্মা বলিল—'আচ্ছা,—হয়েছে! তুমি এখন এখান থেকে যাও।'

—'কিন্তু রাণুর সঙ্গে যে আমার কথা এখনও শেষ হয় নি। কথাটা শেষ করতে দাও।'

—'আবার কি কথা বাকী রইল? মানুষকে নিমন্ত্রণ করে' এনে বক্তৃতা শোনানো কোন্ দেশী সভ্যতা?'

জয়ন্ত বলিল—'রাণুকে আমি স্নেহ করি বলেই দু' একটা কথা বলছি। রাণু তাতে কিছু মনে করবে না,......কি বল রাণু,—তুমি কি তাতে দুঃখিত হচ্ছ?'

রাণু প্রসন্ন কণ্ঠেই বলিল—'না, না, দুঃখিত হব কেন?'

'তা' হ'লে আমি যা বলি শোন, নিজের দেশকে—নিজের জাতিকে একটু শ্রদ্ধা করতে শেখ। তোমরা ভাব—যারা নিজের দেশ ও জাতির Tradition মেনে চলে না—সাহেবদের অনুকরণে সাহেবিয়ানা করে—তারা ভারি বাহাদুর, কিন্তু আষ্টপৃষ্ঠে বিদেশীর বশ্যতা স্বীকার করায় যে বাহাদুরি প্রকাশ পায় তাতে গৌরব করবার কিছু নেই। যারা সাহেব নয়—অথচ সেজে থাকে—তারা আসলে কি মেকী তা' বলাই বাহুল্য।'

—'আমি বুঝতে পেরেছি, আর বলতে হবে না।'

জয়ন্ত সস্নেহে রাণুকে পুনরায় বলিল—'শুধু বুঝলেই ত হবে না রাণু, বুঝবার ফলটা কি হ'ল তাই আমি দেখতে চাই। ফিরে এসে তা' যেন দেখতে পাই।'

রাণু কহিল—'নিশ্চয় আপনি দেখতে পাবেন।'

প্রতিমা একটু হাসিয়া জয়ন্তকে বলিল—'আপনি কিন্তু রাণুকে বিপদে ফেললেন। পিশেমশাই বিলেত ফেরত লোক, ঘোরতর সাহেব। তাঁর মেয়ে হ'য়ে রাণু যদি মেম সাহেবের মত না চলে, তা হলে ব্যাপারটা কি হবে বলুন ত!'

—'তা' ত আমার চেয়ে তুমিই ভাল বলতে পারবে প্রতিমা, তোমার নিজেরই সে অভিজ্ঞতা আছে।'

—'তাই ত রাণুর বিপদটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। খুব সহজ বিপদ নয়। আমার পরিবর্তন দেখে পিসিমা আর পিশেমশাই আমাকেও কম বকেন নি—বাবাকে বকতে কসুর করেন নি। এখন তাঁরা কি করবেন—আমি কেবল তাই ভাবছি।'

পদ্মা হাসিয়া বলিল—'রাণুকে নিশ্চয়ই তাঁরা ত্যাজ্যপুত্র করবেন!'

'তা আশ্চর্য নয়!'—বলিয়া প্রতিমাও হাসিল।

জয়ন্ত প্রতিমাকে ডাকিয়া বলিল—'চল প্রতিমা, তোমার সঙ্গেও আমার গোটা কয়েক কথা আছে। কথাগুলো বলে যাওয়া বিশেষ দরকার।'

জয়ন্ত অগ্রসর হইল। প্রতিমা তাহার পিছনে পিছনে গেল।

যাইতে যাইতে প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল—'হঠাৎ আপনার তীর্থে বেরুবার কারণটা কি?'

জয়ন্ত বলিল—'কারণ একটা আছে, কিন্তু সেটা বলা যাবে না, তবে বেরুবারও এই ত সময়! হাতে কিছু সময় রয়েছে। এ সময় একটু ঘুরে আসা যাক্।......পৃথিবীর অনেক দেশই দেখেছি, কিন্তু নিজের দেশটাই ভাল করে' দেখা হয় নি। দেখবার বড় সাধ হয়েছে। নিজেও দেখব,—পদ্মাকেও দেখাব। সেকালের লোক তীর্থ করতে করতেই সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াত। আমিও তাই করব।'

(ক্রমশঃ)

মহাসাগরের তীর

শ্রীজগদিন্দ্র মিত্র

মহাসাগরের মাঝে যে ঢেউ উঠে, ফাঁপিয়া তাহা পাড়ের উপর আছড়াইয়া পড়ে। বাধা পাইয়া মহাআক্রোশে রচিয়া তুলে শুধু পঙ্কিল আবর্ত!

অনেক পরিবর্তন হইয়াছে মধুমালতীর। যৌবনের প্রান্তে আসিয়া দেহ তাহার স্থূল হইয়াছে, গালের নীচে ভাঁজ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। শাশুড়ী এখন কিছু বলেন না। যদিও বা কখনু কিছু বলেন, দশ কথা শুনাইয়া দেয় মধুমালতী।

বলে,—"ও এত কি হয়েছে, যদি ভাল না লাগে, তবে দুয়ার ত খোলাই আছে। কে থাক্‌তে কাকে বলছে—আমরা কিছুই বলি না, বরং সয়ে যাচ্ছি—তবে এত গোলমাল কেন?"

শাশুড়ী কোনদিন কিছুই বলেন না। কোনদিন আবার চেঁচাইয়া উঠেন,—"আমার হবে কি লোকে হাসে, সেটা খুব ভাল লাগে—আমার ছাই কপাল! ছেলে পর হয়েছে—নিতাইকে বলবো, আমাকে বিদায় করে দে।"

—"তাই বলবেন, এখন তবে চুপ করেন।"

মধুমালতী পাকের ঘরে আসিয়া বসে। চা'র তৃষ্ণা পাইয়াছে—এ অভ্যাস তাহার ছিল না। কিন্তু এখন চা না হইলে যেন তাহার চলে না। গা ম্যাজ ম্যাজ করে শরীরে কোন শক্তি পায় না। কাল আবার শহরে গিয়াছিল ফিরিয়াছে অনেক রাত্রে।

নিতাইএর ইচ্ছা ছিল না ফিরিবার; বলিয়াছে,—"রাতে গিয়ে কি হবে, ক্লাবেই থাকবো, কাল ভোরে বাড়ি দিয়ে আসবো, আমি না পারি—পরেশ দিয়ে আসবে।"

পরেশ তাহাদের সাথেই ছিল, সে বলিয়াছে,—"সেইটাই ভাল হবে বৌদি।"

কিন্তু মধুমালতী রাজী হয় নাই কোনমতে। পরেশের আকার ইঙ্গিত তাহার ভাল লাগে নাই।

বলিয়াছে,—"সে হয় না বাড়ি চল।"

অগত্যা নিতাইকে আসিতে হইল, আসিয়াই একরকম চলিয়া গিয়াছে। সকালে তার কাজ ক্লাব ঘরে থাকিতে হয়। বাগান পরিষ্কার রাখার ভার তাহার উপর। সন্ধ্যায় ও রাত্রে যখন আড্ডা বসে, গরমের দিনে পাখা টানিতে হয় নিতাইকে। অনেকদিন এ কাজে সে বহাল আছে। শহর বাড়ি হইতে বেশী দূরে নয়। তাড়াতাড়ি হাটিলে ঘণ্টাখানেক লাগে। এখন মাঝে মাঝে আসে রাতটুকু থাকিয়াই ভোরে চলিয়া যায়। বিয়ের পর নিতাই রোজই বাড়িতে আসিত।

মধুমালতী তখন নববধূ। পদে পদে তাহার দ্বিধা, সঙ্কোচ এবং সাবধানতা।

শাশুড়ী বলিতেন,—"এ পাড়াগাঁ বৌ; তবু শহরের কাছে, লোকের নিন্দেজ্ঞান কিন্তু পটপটে। একটু সাবধানে থাকবে।"

নিতাই এসব পছন্দ করিত না, সে বলিত,—"বুঝলে মধু, দশ-হাত ঘোমটা আমার কাছে চলবে না। রোজ আমার কতজন সাহেবের সাথে দেখা হয় জানো।"

মধুমালতী বিস্মিত হইয়া বলে—"না।"

—"প্রায় পঞ্চাশেক! আমাকে ডাকে 'বেহারা' বা 'বয়'। আমার স্ত্রী—কি না-কিনা—ওয়াইফ হয়ে ঐরকম থাকতে পারবে না।"

"কিন্তু মা যে বারণ করেন।"

নিতাই রাগিয়া বলে—"তা করুক। তারা কি জানে আজকালকার ফ্যাসান!

বিমুখী দুই স্রোতের মাঝে থাকিতে হয় মধুমালতীর। কয়েকদিন পরে কাগজে মোড়া একটি মোড়ক আনিয়া নিতাই কহিল,—"বলতো কি এনেছি।"

মধুমালতী কহিল—"জানিনে।"

"দেখবে।" কাগজের মোড়ক ছিঁড়িয়া ফেলিল। ভিতরে ভাঁজ করা দুই তিনটা ব্লাউজ ও একটা সেমিজ—মাঝে মাঝে ছেঁড়া ও ময়লার দাগ।

নিতাই কহিল—"এতেই চলবে কি বলো।" হাকিমবাবুর স্ত্রী দিয়েছেন—এমন ছেঁড়া নয়—কি বলো।"

—"এগুলি দিয়ে আমি কি করবো।"

"কেন পরবে। তাও বলে দিতে হবে।"

সলজ্জভাবে হাসিয়া মধুমালতী কহিল—"কিন্তু আমার লজ্জা করবে।"

নিতাই হাসিয়া কহিল এতে আবার লজ্জা কিসের। শহরে সবাই এই গায়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে—এদিকে এসো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

কিন্তু গোল বাধাইলেন তাহার শাশুড়ী।

দুপুরবেলা মধুমালতী নিজের ঘরে ব্লাউজ গায় দিল। ফিকা খয়েরী রং এক হাতের উপর সুতো দিয়া নক্সা আঁকা। ছোট আয়না দিয়া সে নিজেকে একবার দেখিল, সরম পুলকে তাহার মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল,—মন্দ দেখাইতেছে না তাহাকে; তবে কেমন লজ্জা করিতেছে। সে চলিল রামীর কাছে।

পাশের বাড়ির বৌ-ই রামী। তাহার প্রায় সমবয়সী তবে বধুত্বের হিসাবে সে একটু প্রাচীন। দুই বাড়ি প্রায় পাশাপাশি—মাঝে একটা মাঠ। একধারে একটা মরা ডোবা—চারিটা দিক কচু গাছে সমাচ্ছন্ন—ওদিকে কাঁঠাল ও আমগাছের বাগ। তাহার ভিতর দিয়া ঘুরিয়া যাইতে হয়।

"তুমি কে গো যাচ্ছো।"

শব্দ শুনিয়াই বুঝিল এ তাহার শাশুড়ীর গলা; দাঁড়াইল।

—"ও বৌ! আমি চিনতেই পারিনি। ভেবেছিলাম কোন মেম সাহেব বুঝি যাচ্ছে। নবকিশোরের বৌএর কাছে যাচ্ছ বুঝি।"

"হাঁ।"

"তা বুঝেছি। সেজেগুজে এমন ঢং না হয়ে আর যাবে কোথায়। দাঁড়িয়ে রইলে কেন—যাও—ওমা অভিমান হয়েছে বুঝি।"

মধুমালতী সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

একথা শুনিয়া নিতাই জ্বলিয়া উঠিল, কহিল—"তুমি আরো বেশী করে যাবে, দেখি ও কি করতে পারে—আমি তোমাকে আরও অনেককিছু এনে দিব।"

এর পর সত্যই নিতাই অনেককিছুই আনিয়াছে—শাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া পাউডার, স্নো পর্যন্ত। মধুমালতী ইতিমধ্যে কয়েকদিনই রামীর বাড়ি হইতে বেড়াইয়া আসিয়াছে। নবকিশোরের ছোট বোন নবি তাহার দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে—সলুব্ধ প্রশংসাময় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বলিয়াছে,—"তোমার কি বৌদি, নিতাই দাদা তোমাকে কতকিছু এনে দেয়—আমাদের যে কপাল।"

মধুমালতী বলিয়াছে,—"আমি কি ওসব চিনি ছাই—ওই আমাকে সব শিখিয়েছে। আমার কাছে তুমি যেও, দেখবে কত কি জিনিস এনেছে,—নামও মনে থাকে না।"

রামী কিছু বলে নাই। তবে তাহার নীরবতার মাঝে রিক্ততার বেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল যেন।

ইতিমধ্যে মধুমালতী শহরে একদিন বেড়াইয়া আসিয়াছে—সিনেমা দেখিয়া আসিয়াছে।

নিতাই আসিয়া বলিয়াছে,—"কাল আমার ছুটি আছে চলো একদিন শহরে বেড়িয়ে আসি। সিনেমা দেখবো।"

মধুমালতীর ইচ্ছা ছিল খুব—সে কোন প্রতিবাদ করে নাই। তাহার শাশুড়ী একবার প্রতিবাদ জানাইয়াছিল সত্য; কিন্তু নিতাই-এর রুক্ষ মেজাজের কাছে তাহা শেষ অবধি টিকে নাই।

শহরে আসিয়া প্রথমেই আসিয়াছিল হাকিমবাবুর বাড়ি। হাকিম-স্ত্রী তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছে—"তোর বৌ ত দেখছি নিতাই, বেশ ভাল।"

সলজ্জভাবে হাসিয়া নিতাই বলিয়াছে—"আপনাদের আশীর্বাদে।"

সিনেমা দেখিয়া তাহার ভালই লাগিয়াছে। তাহাদের সাথে আগাগোড়া ছিল পরেশ।

নিতাই বলিয়াছে—"এ আমার বন্ধু, নাম পরেশ। ওকে লজ্জা করো না।"

পরেশ হাসিয়া বলিয়াছে,—"আমরা দুজন হ'লাম, ঢোলের ডাইনা আর বায়া—কোন লজ্জা করবেন না বৌদি।"

মধুমালতী কোন কথা বলে নাই, শুধু হাসিয়াছে।

কিন্তু যত গোল বাধিল, মধুমালতীর পায়ের স্যাণ্ডেল লইয়া। দুই একদিন আগে মাত্র নিতাই আনিয়া দিয়াছে, পায়ে তত রপ্ত হয় নাই।

সিনেমা হল হইতে কিছু দূরে আসিয়াই মধুমালতী আর পারিল না। কহিল,—"আর পারছি না।"

নিতাই কহিল—"আবার কি হয়েছে।"

"জুতো পায় দিয়ে আর চলতে পারছি না।"

নিতাই ব্যস্ত হইয়া কহিল,—"দেখ একটু চেষ্টা করে।"

নিরুপায় হইয়া মধুমালতী কহিল,—"কোন মতেই পারছি না।"

হাতে তুলিয়া স্যাণ্ডেল নিয়াছে। পরেশ কাছেই ছিল, কহিল,—"আমার কাছে দিন বৌদি—রুমাল দিয়ে জড়িয়ে দিচ্ছি।"

শহরের মেয়েদের সজ্জা দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছে। সে তুলনায় তাহার পরিচ্ছদ কত সামান্য। অথচ ইহাতেই তাহার শাশুড়ীর ঘোর আপত্তি।

নিতাইএর কাছে বলিয়াছে,—"সত্যি, হাকিমবাবুর-স্ত্রী চমৎকার, আমার বড় ভাল লেগেছে।"

নিতাই বলিয়াছে,—"আমাকে বড় ভালবাসেন—ওটা-সেটা প্রায়ই খেতে দেন।"

মধুমালতী বলিয়াছে,—"উনির স্বাস্থ্য কি চমৎকার, আমার কেন ও রকম থাকে না।"

একটু চিন্তিত হইয়া নিতাই বলিয়াছে,—"আচ্ছা আমি দেখবো।"

ইহার মধ্যে মধুমালতীর অনেক অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। সাজিয়া প্রায়-ই এ বাড়ি ও বাড়ি বেড়ায়। কেহ কিছু নিন্দাবাদ করিলে পরম তাচ্ছিল্যভরে মুখ বাঁকাইয়া হাসে। শ্বাশুড়ী কিছু বলিলে, মাঝে মাঝে ইহার প্রতিবাদ করে,—বলে—"আপনার কি হয়েছে তাতে।"

শাশুড়ী রাগিয়া নির্বাক হইয়া যান।

সন্ধ্যায় একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—মেঘ কমে নাই। নিতাই আসিল ভিজিয়া। কহিল,—"একটু চা করে দাও।"

চা নিয়া মধুমালতী আসিয়া অবাক হইয়া গেল—নিতাইএর মুখ হইতে কিসের একটা গন্ধ বাহির হইতেছে। কহিল,—"এ কিসের গন্ধ।"

হো হো করিয়া হাসিয়া নিতাই কহিল,—"দূর খোকা, এও বুঝো না।—দেশী নয়, বিলাতী—সাহেবরা যা খায়।"

মধুমালতী মনে মনে আহত হইল কহিল,—"দেশী বিলাতী কোনটাই ভাল নয়।"

"কে বলেছে। এই তোমার বুদ্ধি হয়েছে। শহরে এত হামেশা অনেকেই খাচ্ছে—একি দেশী—বিলাতী—খেতে ভারি মজা, মেমরাও খায়। তুমি খাবে—।"

—"দূর—পাগল হয়েছো।"

মাস দু'এক কাটিয়া গিয়াছে। নিতাই একদিন বলিল,—"মধু, একটা ওষুধ খাবে।"

মধুমালতী বলিল,—"কি ওষুধ।"

নিতাই একটু চুপ থাকিয়া কহিল,—"আজকাল অনেকেই খাচ্ছে এ ওষুধ।"

"এতে কি হবে।"

"ছেলে—পুলে আর হবে না।"

"মধুমালতী চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে কহিল,— "না, খেতে পারবো না।"

নিতাই কহিল,—"এতে সুবিধা অনেক আছে, একটু বুঝে দেখ—ছেলেপুলে হ'লে, আমি যা পাই তাতে সংকুলান হবে না।"

"না হোক।"

"রাগ করো না। বলছি, এতে হবে এই, তুমি এরকম ভাবে থাকতে পারবে না—এত সুবিধা থাকবে না।" মধুমালতী চুপ করিয়া রহিল। স্বামীর অনুরোধ সে কখনো উপেক্ষা করে নাই, এবারও করিল না।

ওষুধ সত্যি ভাল—তার ফলও ফলিতে সুরু করিয়াছে। কয়েক বৎসর-ই চলিয়া গিয়াছে। মধুমালতীর কোন সন্তান হয় নাই। শাশুড়ী নিরাশ হইয়াছেন। রামীর কয়েকটি সন্তান হইয়াছে—মধুমালতীর কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। রামীর দিকে চাহিয়া তাহার মন ব্যথাতুর হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে ভাবে, —ইহার কি কোন প্রতিকার নাই।

নিতাইকে একদিন বলিয়াছে—"আমার ভাল লাগছে না।"

নিতাই হাসিয়া কহিয়াছে—"কেন, খারাপটা কিসের, নবর বৌএর কি দশা হয়েছে—দেখেছো। আর তুমি কেমন বেশ দিব্যি আছো।

কথাটা অবশ্য ঠিক। রামীর শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে এরি মধ্যে। হাড্ডিসার হইয়াছে তাহার দেহ। মধুমালতী চুপ করিয়া রহিল, বলি বলি করিয়াও সে কিছুই বলিতে পারিল না। রামীর মতই ভগ্নস্বাস্থ্য সে বরং চায়। একটি সন্তানের কামনা তাহার মনের ভিতর ধীরে ধীরে তীব্র হইয়া উঠে। কিন্তু সন্তান তাহার হইবে না। হতাশায় তাহার মন বিষাইয়া উঠে।

দিন পলে পলে চলিয়াছে। মধুমালতী পরিপাটী হইয়া সাজে, মাঝে মাঝে শহরে বেড়াইয়া আসে। পরেশ আসিয়া তাহার কাছে ইয়ার্কিও করে। নিতাইএর বাড়িতে আসা এখন অনেক কমিয়াছে। যখন আসে, তখন চোখ দুটা তাহার লাল থাকে, মুখ দিয়া বিশ্রী মদের গন্ধ বাহির হয়, কিছু বলিলে উত্তর দেয় না। যখনও বা কিছু বলে, গলায় জড়াইয়া যায়। মধুমালতীর কুকথা মনে হয়; সন্দেহ হয়, মদের পিছনে হয়ত আরও কিছু আছে।

পরেশকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছে,—"বল তো সত্যি

করে।" পরেশ হাসিয়া উত্তর দিয়াছে—"এতে দোষের কি আছে. সবাইএর একটু আধটু এ অভ্যাস আছে।"

মধুমালতীর শরীর জ্বলিয়া গিয়াছে এ উত্তর শুনিয়া।

চুপ করিয়া বসিয়াছিল সেদিন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—তবু উঠে নাই। আলস্যে তাহার মন বিষাক্ত হইয়াছে।

শাশুড়ী বলিলেন,—"সন্ধ্যাবাতির সময় হয়ে গেছে বৌ, তুলসী বাতি দেখাও।"

মধুমালতী উঠিয়া আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল।

শাশুড়ী বলিলেন,—আজ শনিবার, আবার অমাবস্যে, কাপড় ছেড়ে তুলসী তলায় যেও। শনির নামে দু'পয়সার বাতাসা এনেছি, আমি নিয়ে আসছি।"

তুলসীতলায় গড় করিয়া প্রণাম করিয়াই দেখিল, পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন শাশুড়ী।

বলিলেন,—"এই নাও বৌ, এই তাবিজটে সনাতনের কাছে থেকে আনিয়েছি। তোমরা বিশ্বাস কিছুই করবে না, আমরা কিন্তু সব মানি। বিন্দুর ছেলে হ'ল, এই তাবিজের গুণেই। তোমার কপালে থাকলেও হবে। তুলসীতলায় উত্তরমুখী হ'য়ে তাবিজ নিও। বাবার কাছে প্রার্থনা জানাইও।—তোমার ইচ্ছা।"

শাশুড়ীর চোখ অশ্রুসজল হইয়া আসিল। মাথায় হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন।

মধুমালতী আসিয়া দাঁড়াইল বকুল গাছের নীচে। বকুল ফুল ফুটিয়াছে, গন্ধে ওদিকটা আকুল হইয়া উঠিয়াছে। গাছের নীচে মরা পাতা ও বাসি শুক্‌না ফুল। চাঁদ উঠে নাই, অনাবৃত মাঠ হইতে বিচ্ছুরিত আভায় অন্ধকার ততটা জমে নাই। তবু মধুমালতীর শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কি হইবে তাবিজ পরিয়া—সে জানে, যে ওষুধ সে খাইয়াছে, তাহার কোন প্রতিকার নাই। সন্তান তাহার হইবে না। তাবিজটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। নিতাইও দূরে সরিয়া যাইতেছে। যে পথ সে ধরিয়াছে, ইহার স্রোতে সে আরো দূরে চলিয়া যাইবে। তখন মধুমালতী কি অবলম্বন করিয়া থাকিবে! জীবন তাহার কাছে এখন দুর্বহ। যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, তাহা হইতে নিজকে রক্ষা করিবে কি করিয়া। মধুমালতী চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিল। একবার ভাবিল—হয়ত তাবিজের ফল ফলিত। মধুমালতী অন্ধকারে পাগলের মত বকুলতলা হাতড়াইতে লাগিল, তাবিজের খোঁজ কিন্তু পাইল না।

মহাসাগরের মাঝে যে ঢেউ উঠে, ফাঁপিয়া ফুলিয়া তাহা পাড়ের উপর আছড়াইয়া পড়ে। পাড় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া রচিয়া তুলে শুধু পঙ্কিল আবর্ত!

মৃত্যু

(৯৬৯ পৃষ্ঠার পর)

পড়ল একটা বড় খান ইট চাপা একটা ভাজ করা কাগজ। আগ্রহভরে ভাজ করা কাগজটা তুলে নিলাম। একটা চিঠি, দুই লাইনে লেখা সংক্ষিপ্ত: কৌশিক 'মৃত্যু' কেমন জানি না! তবে যত দিন সে একেবারে রিক্ত হয়ে না আসে এমনি করেই তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াব। ওকে যে আজিও আমি আমার নিজের চাইতেও বেশী ভাল বাসি। ওর কণ্ঠস্বর নেই বটে.. চোখের দৃষ্টির মাঝে আজিও সে বেঁচে আছে। সেইটুকুই আজ আমার কাছে চরম পাওয়া—ইতি—সুজাতা।
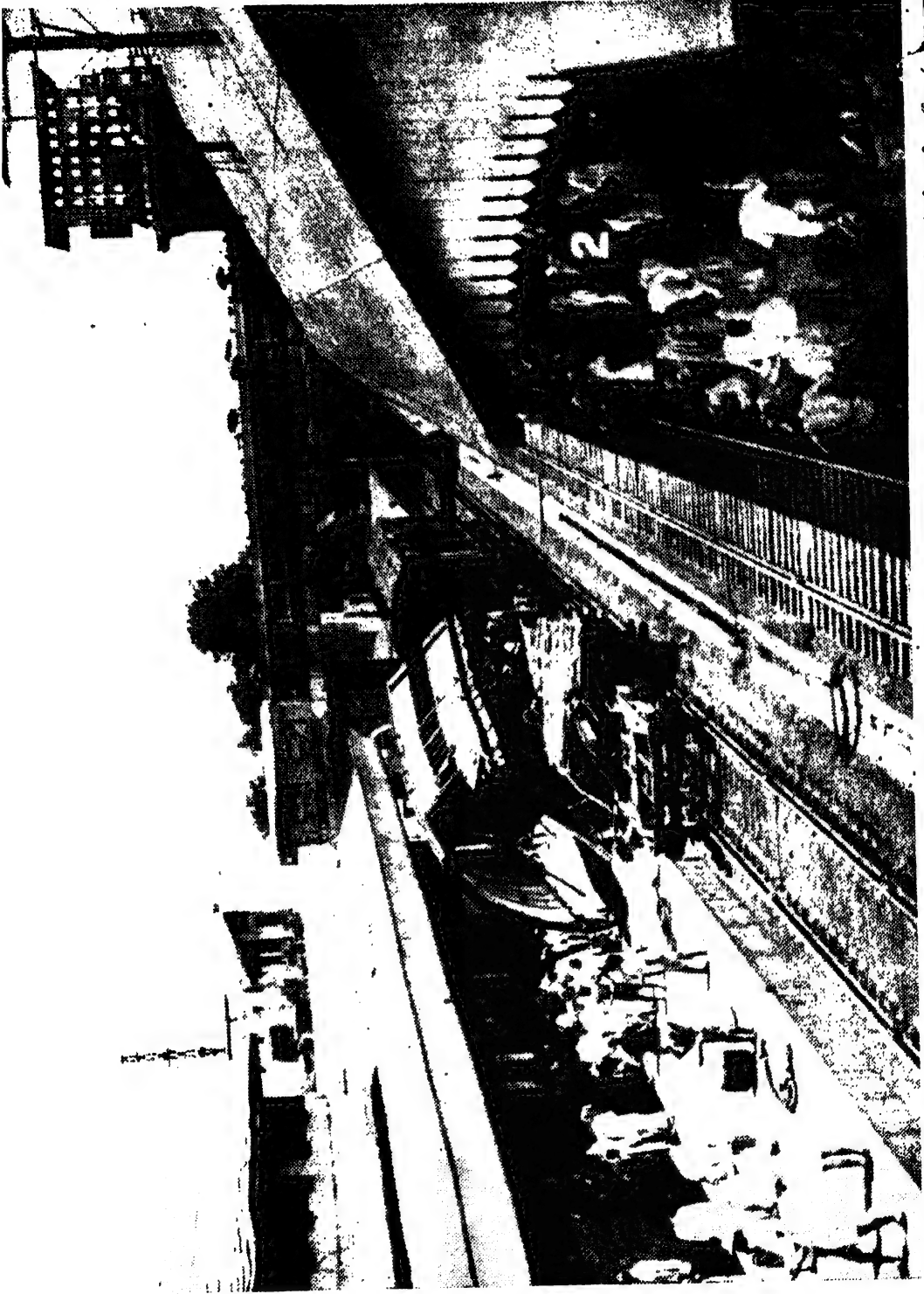
বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন দুর্ঘটনার দৃশ্য : আপ দেরাদুন এক্সপ্রেসের সহিত আপ দিল্লী এক্সপ্রেসের সংঘর্ষের ফলে শেষোক্ত ট্রেনখানির ব্রেকভ্যান ও তৃতীয় শ্রেণীর দুইখানি বগী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়

কালসাপ

সুধাংশু শেখর সরকার

আমারে কেটেছে সাপ, বিষে কণ্ঠ নীল হ'য়ে আসে,
সহস্র বিদ্যুত বেগ, মৃত্যুময় ধারা ঢালে বুকে,
নির্বাক পশুর মতো, মরে রই দুর্বার নিঃশ্বাসে,
হে বিধাতা, বলে দাও, এক সাপে কত বিষ থাকে?

আমারে ছুঁয়েছে সাপ, মাংসপেশী আসে স্থুল হ'য়ে,
উদ্যত ফণার তলে রক্তকণা চেতনা হারায়,
সিন্ধু শকুনেরা কাঁপে হাঙরের রক্ত আঁখি ভয়ে,
মানুষের বিষে ভয়? সাপুড়ে ও সাপে কামড়ায়?

মাঝ রাতে ঘুম ভাঙ্গে, কাল সাপ কাটিয়াছে মোরে,
সর্বাঙ্গে বিষের জ্বালা, অগ্নিদাহ উষ্ণ দংশনে,
শবের চাদরে ঢাকা, বিবর্ণ বিশীর্ণ দেহ ঝুরে,
ওই বিষ তিলে, পলে, ক্ষয়কল্প মৃত্যু ডেকে আনে।

ওই সাপ যাদুকরী, পৃথিবীরে কাটে ওই সাপ,
চলিছে বিষের ক্রিয়া, রাত্রিদিন ধরণীর বুকে,
ধারালো চাহনিতলে, জ্বালাময়ী শত সূর্য তাপ,
রক্ষা করো হে বিধাতা, ওই চোখে অত বিষ থাকে?

শিকারী সাপের মত, চাহনিতে মরণ ইঙ্গিত,
নিষ্ঠুর শাপের মত, বিশ্বেরে করিছে জর্জর,
স্বপ্ন হ'য়ে ঐ সাপ, আনে মনে বাসনা সংগীত,
বিশ্বেরে চঞ্চল করে, কালকূট খেয়াল খর্পর।

আমার প্রাণের পথে, ঐ কীট তুলেছে প্রাচীর,
চিরন্তনী ভাঙ্গিয়াছে, মুক্তি ভীরু সাবধানী ধ্যান,
ম্লান হলো পরিচয়, হতগতি, বন্ধনের ভীড়,
শান্ত করো হে বিধাতা, ঐ কাল সর্প অভিযান।

নিরক্ত চাঁদ

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী

নিরক্ত চাঁদের আলো পৃথিবীর খোলা বুকে চুমু খেয়ে যায়ঃ
ধু ধু সাহারায়।
আর ওঠে ঝোড়ো হাওয়া, এলোমেলো ঝোরো হাওয়া—
বিধবার ধূপছায়া ধূসরের প্রায়
দিকে দিকে বালুদের কুয়াসা ঘনায়।
সে সব বালুর দেহে আজো বেঁচে আছে তাপ,
সাদা দিবসের তাপ, স্নায়ু ও শিরায়।

নিরক্ত চাঁদের আলো ঝলোমলো অলকায়-ও উঁকি দিয়ে যায়ঃ
রেশমী আভায়।
হু হু করে হাওয়া ওঠে, উদ্ধত ঝোড়ো হাওয়া—
বাতায়ন-আবরণ সরে সরে যায়ঃ
আর্থিক কুমারীরা শায়িত সোফায়।
হি-হি হাসি, শ্যাম্পেন, তীক্ষ্ণ বিলিতী সুর—
লাল, নীল কুমারীরা আঁচলি ওড়ায়।

নিরক্ত চাঁদের আলো আমাদের সমাজেও নেমে আসে, হায়
বিষণ্ণতায়।
দখিন সাগর হ'তে প্রলাপিত হাওয়া আসে
গলি ঘুঁজি পার হ'য়ে ভাড়াটে বাসায়ঃ
শ্রান্ত কেরাণী এসে ওঠে বিছানায়।
একমুঠি দাল-ভাত, তাও মুখে ওঠে নাক—
ছেঁড়ে প্রিয়াঃ ছেলেমেয়ে বেসুরে চেঁচায়।

নিরক্ত চাঁদের আলো সেখানেও সমভাবে জ্যোস্না ঝরায়ঃ
নোংরা পাড়ায়।
তাড়ির বিকট বাসে মাতাল দখিনা হাওয়া
শ্রমিকের পাঁজরেতে হু হু বয়ে যয়;
জমা-করা ঘুণগুলো ঘূর্ণি ওড়ায়ঃ
প্রভুদের গালাগাল, সারাদিন লাথিচড়
--ভুলে যেতে তাই তারা আরো মদ খায়।

আলেকজান্দার পুশকিন ফেডর ডস্টয়েভস্কি লিও টলস্টয় আণ্টন শেখভ

বিপ্লবোত্তর রুশ সাহিত্য

ভবানী পাঠক

প্রাক্ বিপ্লব রুশের সাহিত্য ক্ষেত্রে কয়েকজন মহারথীর আবির্ভাব হয়েছিল। এঁরা সবাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ: পুশকিন, নেক্রাসোভ, লেরমোনটোভ, গোগোল, টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কী, গোনকারভ ও লেসকভ। এঁদের পরবর্তী আরও কয়েকজনকে আমরা আমাদের কিছু নিকটে পাই, কিন্তু তাঁরা পূর্ববর্তীদের মত অত বড় ছিলেন না এবং তত বিশিষ্টও হ'তে পারেন নি। যথাঃ—সোলোগুব, আন্দ্রিভ, ব্লোক, বেলি, আর্জিবাসেভ, রোজানভ ও রেমিজভ। এঁদের প্রতিভার উৎকর্ষ আমাদের কাছে ততটা সুস্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়ে নি, তার কারণ আংশিকভাবে এই হ'তে পারে যে, তাঁরা আমাদের কাছাকাছি যুগের লোক। কিন্তু তাঁদের এই অস্পষ্টতার এটাই একমাত্র কারণ নয়, তাঁরা অস্পষ্ট হয়ে গেছেন, তার মূলে রয়েছে তাঁদের বর্ণিত কথাবস্তুর প্রকৃতি।

সোলোগুব তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটির নাম দিয়েছিল যা ডস্টয়েভস্কীর একখানি উপন্যাসের নাম। তিনি মিছামিছি একাজ করেন নি। ডস্টয়েভস্কী আশি সনের বিপ্লবীদের নিয়ে একটি শ্লেষরচনা লিখেছিলেন। এই রচনার প্রধান চরিত্রগুলিকে ইচ্ছে করেই তিনি কদর্য করেছিলেন। তবুও সেই চরিত্রগুলির মধ্যে এক ধরণের বিরাটত্ব ছিল, এই উপন্যাসটির নাম ছিল 'দানব'; ইংরেজী ভাষায় উপন্যাসটি 'সম্পন্ন' (The Possessed) নামে পরিচিত। সোলোগুব তাঁর উপন্যাসের নাম রাখেন পাতি-দানব (Petty Demon)। এ লেখার মধ্যে প্রধান চরিত্রটিকে সেইরূপ ইচ্ছে করেই কদর্য করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু কদর্য আর 'বিরাট' নয়, তার উল্টো—কদর্য এবং ছিঁচকে। দুই উপন্যাসের মধ্যে এইখানে বড় পার্থক্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশীয় সাহিত্যিক এবং তাঁদের পরবর্তীদের মধ্যে (বিশেষ করে ১৯০৫ সালের বিপ্লবের ও ১৯১৭ সালের বিপ্লবের মধ্যবর্তী লেখকদের মধ্যে) মোটামুটি পার্থক্য এইখানে। যদিও পরবর্তীদের মানসিক দৃষ্টির পরিধি সব সময়ে একান্ত-ভাবে সঙ্কীর্ণ ছিল না, তবুও তাঁরা সকলেই অতি সাধারণ ও নগণ্য বিষয় নিয়েই লিখতেন। কিন্তু 'বিরাট' লেখকদের জগৎও ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত; টলস্টয় তাঁর যথাসাধ্য ক্ষমতা নিয়োগ করেছিলেন সমগ্র রুশের কাহিনীকে ফুটিয়ে তুলতে। প্রাক্-বিপ্লব রুশের অন্যান্য অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতিভাবান লেখকেরা এই বিরাট রুশেরই কথা লিখেছেন। তবে তাতে রুশের সমস্ত রূপ নয়, তার একটা অংশ মাত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

বিপ্লবের ঠিক পূর্ববর্তী সময়ে রুশ সাহিত্যের উদ্দেশ্যের মধ্যেও একটা পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তিত সাধনার মধ্যে মাত্র দুইজন সাহিত্যিককে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে দেখা যায়। অন্যান্যের ক্ষুদ্র সৃষ্টির রাজ্যে এরা দুইজন বিরাট ব্যতিক্রমের মত দাঁড়িয়েছিল। এঁদের নাম—শেখভ আর গর্কি; গর্কি ও শেখভ যে মানুষের জগতের কথা লিখেছেন, যদিও তা টলস্টয়, গোগোল, ডস্টয়েভস্কী ও গোনকারভের জগতের চেয়ে ক্ষুদ্রতর, তবু তাঁদের বলবার ভঙ্গী ও শক্তির ব্যাপারে তাঁরা 'বিরাট'দের সমকক্ষই ছিলেন। এ সাহিত্যের উদ্দেশ্য একই রকম উদার ও ভাবগভীর ছিল। ছোট গল্পের লেখক ও নাট্যকার শেখভ এবং উপন্যাসিক গর্কি দুজনেই রুশ-জীবনের সমগ্রতাকেই তাঁদের আখ্যানের বিষয়বস্তু করেছিলেন। ব্যক্তির জীবন নিয়ে নয় বা ব্যক্তিবর্গের জীবন নিয়ে নয়। তাঁরা সমস্ত রুশের এবং রুশ দেশের কথা লিখেছেন। রুশের নর ও নারীর ব্যক্তিগত জীবনের দাবী দাওয়ার কথাকেই তাঁরা বড় করে তুলে ধরেন নি। তাঁরা রুশের নরনারীর ব্যষ্টিগত জীবনের কথাকে আলোচনার বিষয় করে, রুশের সমাজ-জীবনের অঙ্গ হিসাবে ব্যক্তির জীবনকে বিচার করেছেন।

এই ধরণের মন্তব্যে পাঠক সাধারণ হয়তো চমকে উঠবেন, তাঁরা হয়তো টলস্টয়ের লেখার মধ্যে ব্যক্তির জীবনে ধর্মনিষ্ঠার সার্থকতা অথবা ডস্টয়েভস্কীর লেখার মধ্যে ব্যক্তি-সত্তার বিচিত্র গহনের রহস্যময় রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে আছেন, কিন্তু প্রাক্-বিপ্লব রুশের সাহিত্যে যে বৃহত্তর সামাজিক আদর্শের একটি উদ্দেশ্যমুখিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, টলস্টয় প্রভৃতি মনীষীর লেখার মধ্যে ঠিক তার বিপরীত দিক
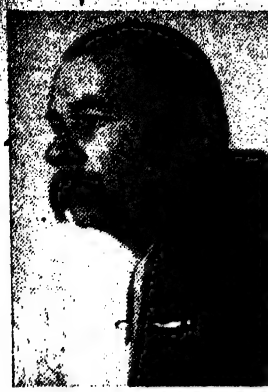
ম্যাক্সিম গর্কি — আলেকজান্দার ব্লক — ভেলেমির খেব্‌নিকভ — ভ্লাডিমির মায়াকভস্কি

প্রকট। কিন্তু টলস্টয়ের লেখা থেকে কিছু পেছনে সরে দেখা যাক্। তাঁর লেখায় বর্ণিত বিষয়গুলির খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে একবার দেখা যাক্, সমগ্র বিষয়টি দেখা হোক্। আনা কারেনিনার লেভিন ও তার জমিদারী, রেসারেক্‌সনের ডিমিট্রি কর্তৃক সেই বালিকার উদ্ধারের কাহিনী—এসব কাহিনীর মধ্যে ব্যক্তিত্ববাদই আসল বক্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু টলস্টয় এই সব সমস্যাকে ব্যক্তিগত সত্তা বা বিবেকের সমস্যা হিসাবেই বিচার করেন নি। সামাজিক সমস্যা হিসাবেই আলোচনা করা হয়েছে। সমাজ জীবনের বিশেষ একটি সময়ে, সমাজের এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এক বালিকার সর্বনাশ সাধন করে—এই ছিল সমস্যা। যে চরিত্রহীন বঞ্চকের ছলনা মেয়েটির জীবনের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী, সেই প্রবঞ্চক কি ভাবে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, সে কাহিনীকে ব্যক্তিগত সমস্যা হিসাবেই লেখা যায়। টলস্টয় এ কাহিনীর মধ্যে ধার্মিকতার প্রেরণা দিতে পারেন। কিন্তু লেখকের সে চেষ্টা সত্ত্বেও আসলে এটা সামাজিক সমস্যাই হয়ে দাঁড়ায়।

ডস্টয়েভস্কীর লিখিত আখ্যানবিষয়কে এইভাবে একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখা হোক্। সামাজিক অনুশাসন ও মানুষের বিবেকবোধ—এই দুই জিনিস ছাড়া এই সাহিত্যে আর কি আলোচনা করা হয়েছে? শুধু রুশের সমাজ কথা নয়; সমাজের কথা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রযোজ্য। ব্রাদার কারমাজভ নামক উপন্যাসটিতে সাধারণভাবে পাপ অপরাধ ও মানুষের প্রকৃতির প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রশ্ন—ছেলেটি তার বাপকে সত্যি সত্যি খুন করেছিল, না শুধু সেটা তার মনের ইচ্ছা মাত্র ছিল, কিন্তু এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ বক্তব্য কি? 'দন্ডমুন্ডের বড়কর্তা'র চরিত্রই কি আসল বক্তব্য? সত্যিই কি ডস্টয়েভস্কী মানুষের বিবেকের ভেতরে খোঁজ করে দেখেন নি যে, মানুষকে শুধু শাসিয়ে রাখতে হয়, না মানুষের নিজেই নিজেকে শাসনে সংযত করে রাখা উচিত? বর্তমান যুদ্ধ—গণতন্ত্র বা ডিক্টেটরীর সদসৎ প্রশ্নগুলি কি আমরা তাঁর লেখার মধ্যে দেখতে পাই না! যেপৃথিবীতে মানুষ বাস করে সেপৃথিবীর সমাজ জীবনের সুব্যবস্থার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আদর্শের দায়িত্ব—এটা কি তাঁর কথা নয়? অথবা এক পরম প্রতাপশালী দন্ডমুন্ডের কর্তার (Grand Inquisiter) যাকে ব্যক্তি তার জীবনের সর্বস্ব ছেড়ে দেবে অর্থাৎ যেটা আধুনিক ডিক্টেটরী শাসনের প্রধান লক্ষ্য। এইসব প্রশ্ন কি ডস্টয়েভস্কীর লেখার ভেতর আমরা পাই না?

তবে আজকের রুশ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কি! বিপ্লবের পূর্বেকার ঘটনাগুলি একবার অনুধাবন না করে দেখলে এ প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক দেওয়া যাবে না। কিন্তু সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে তখনি, যখন গত পঁচিশ বছরের সাধনাকে একই অঙ্গাঙ্গী ও অখন্ড বিষয় হিসাবে দেখা যাবে। ঝড়ের মত ঘটনাবহুল এই কয়েকটি বৎসরের মধ্যে অনেক নতুন পরিদৃশ্যের উদ্ভব হয়েছে, ফাসিস্ত আপদ দিন দিন পুষ্টিলাভ করে উঠেছে। এই আপদের সম্মুখীন হয়ে যাতে সংগ্রাম করা যায় তার জন্য সোভিয়েট রুশকে প্রস্তুত হতে হয়েছে। সোভিয়েট নীতিতে নিদারুণ সব পরিবর্তন সইতে হয়েছে। পার্টির কর্মপন্থা সম্বন্ধেও সেই রকম বড় বড় পরিবর্তন সাধন করতে হয়েছে। সাহিত্যিকদের সেই পন্থার অনুমোদন করতে গিয়ে অনেক বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। গত পঁচিশ বছরে সোভিয়েট রুশের সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচারের নীতিতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। 'প্রকাশের নীতিতে পরিবর্তন, একথা ইচ্ছে করে বলা হলো। আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রের যুগে 'ছাপার অক্ষরে' প্রত্যেকে জন্মলাভ করে। সমাজের নিয়ম অনুসারে, লেখা মানে প্রকাশ করা। সোভিয়েট সাহিত্যে 'জবরদস্তী' পরিবর্তনের অর্থই হলো প্রভাবান্বিত জনসাধারণের সিদ্ধান্ত অনুসারে যা পুস্তক প্রকাশ মুদ্রণ ও প্রচার ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যেক সমাজেই এই রকম কারও না কারও প্রভাবে সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেলেও লোকে সেই নতুন জীবনযাত্রায় তত তাড়াতাড়ি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। বংশ হিসাবে ভবিষ্যপুরুষে একটি জাতি গড়ে উঠতে পুরো বিশ বছর সময় লাগে। সুতরাং বিপ্লবোত্তর যুগের প্রথম লেখক গোষ্ঠীর জন্য খানিকটা নির্দেশ ও পরিচালনার প্রয়োজন। নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হ'লে কিছুটা সাহায্যের প্রয়োজন। একথা সত্য নয় যে রুশের এ যুগের লেখকেরা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল না; তাঁদের মধ্যে অনেকে বিপ্লবের জন্য কাজও করেছিল, কিন্তু তাঁদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক লেখকই নতুন পরিবেশের সঙ্গে সহজ হয়ে উঠতে পেরেছিল। বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে
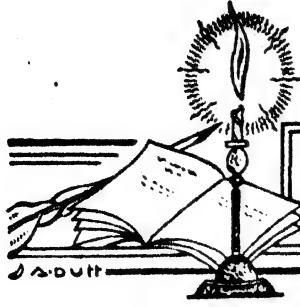
টেম্পল অব ইনস্পিরেসেনঃ—(ইংরেজী) শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত। প্রবর্তক পাবলিসিং হাউস। ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমতিলাল রায় মহাশয়ের ধর্মোপদেশাবলীর ইংরেজী অনুবাদ। প্রবন্ধাকারে 'প্রবর্তকে' প্রকাশিত হইয়াছিল। গীতায় যে অবস্থাকে [illegible]পরানিষ্ঠা এবং বৈরাগ্য উপাশ্রিত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে [illegible] সেই অবস্থায় গভীর আনন্দসত্তাকে একান্তভাবে উপলব্ধি করেন। [illegible] উপলব্ধির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হয় তাঁহার উক্তির ভিতর দিয়া, [illegible] প্রসাদেরই মত। শ্রদ্ধাবান শ্রোতা মহতের মুখশ্রুত এই উপদেশ [illegible] অন্তর্নিহিত আনন্দের সন্ধান পাইয়া থাকেন এবং আত্মলগ্ন সেই আনন্দ-[illegible] তাঁহাকে [illegible]জীবনে উন্নীত করে। এইভাবে মানুষ দিব্যজীবন লাভ [illegible] ছন্দোময় এবং অমৃতময় আশ্রয় পায়। আলোচ্য গ্রন্থখানির [illegible] সাধকের এইরূপ গভীর অনুধ্যানলব্ধ প্রত্যক্ষ অনুভূতির [illegible]লোকে [illegible]; সে আলোক সংশয়কে ছেদন করে এবং যুক্তিতর্কের [illegible] দীর্ঘকে দগ্ধ করিয়া আত্যান্তিক সুখের জন্য উৎকণ্ঠাকে [illegible] গ্রন্থে গ্রথিত উপাদেশাবলীর মধ্যে আমরা যে রসের [illegible] সংকীর্ণতা হইতে মনকে উদ্ধার করিয়া বৃহতের সঙ্গে [illegible] গণ্ডী হইতে মুক্ত মানব সঙ্ঘের মধ্যে পায় শক্তি এবং [illegible] সমগ্রী, সমগ্রাণাং তৃপ্তঃ সুখং"। এই সুখ সত্য সুখ ও নিত্য [illegible]। এইখানেই মানুষের পরম পুরুষার্থ লাভ এবং ইহাই একান্তলাভ। [illegible] ঋষিগণ, বিশ্বমানবকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, "শ্রোতারঃ [illegible] সোমং বীরায় শূরায়।" নিত্য সত্যের সঙ্গে যোগের প্রীতি [illegible] কর এবং সেই মদ্য পান করিয়া বীর হও, শূর হও। শ্রীমতিলাল রায় [illegible] প্রত্যক্ষানুভূতি লব্ধ গভীর সত্যের মধ্যে বীর হইবার এবং শূর [illegible] পথে চিত্তকে তুষ্টি ও পুষ্টিদান করিবার উপযুক্ত রসের প্রাচুর্য-[illegible] রহিয়াছে। তাঁহার বাণী চির তরুণের জন্য বাণী। তিনি যে [illegible]কে অবলম্বন করিয়া কথা বলিয়াছেন, সেখানে গ্লানি নাই, হানি নাই। [illegible] আছে একান্ত লাভের আশ্বস্তি এবং অকুতোভয়ত্ব। বীর্যময় [illegible]রণাই শ্রীমতিলালের উপদেশাবলীর বিশেষত্ব এবং সে বিশেষত্বে [illegible]চিত্র্য আছে। মানব জীবনের বিভিন্ন ভঙ্গীকে, গতিকে তাহা [illegible]গ্রতায় সার্থক করিবার মত স্বাচ্ছন্দ্য দান করে। তাঁহার [illegible]পদেশাবলী পাঠককে দিব্যজীবনের অভিমুখে জাগায় [illegible]কটা অমোঘ উৎসাহ। সর্বোপাধি এবং সংস্কার বিনির্মুক্ত [illegible]ন্ময় রসের উজ্জীবনই সকল ধর্ম সাধনার সার কথা এবং [illegible]ষ কথা। বর্তমান গতানুগতিক সাম্প্রদায়িক সাধনার সংস্কার হইতে [illegible]মতিলালের প্রেরণায় পরিপূর্ণতার এই অভিনবত্ব বিশেষভাবে [illegible]প্রণিধানযোগ্য। তিনি জীবনকে খণ্ড করিয়া দেখেন নাই, সকল ভাবের [illegible]মাহার এবং সমন্বয়ের মধ্যে মানবের মহত্বকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছেন। [illegible]অল্পেকেও তিনি উপেক্ষা করেন নাই, সেই অল্পের মধ্যেও অব্যয়ের সন্ধান [illegible]দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য গ্রন্থের উপদেশাবলী পাঠককে গীতার্থ-[illegible] প্রতিপাদিত পথে প্ররোচিত করে, দিব্যজীবনের অভিমুখে সৃষ্টি করে অন্তরের অধৃষ্য আবেগ ও অপ্রতিহত এবং অগ্নিময় প্রেরণা। সর্বোপাধি এবং সংস্কার বিনির্মুক্ত যে সত্য, তাহা সকল যুক্তি ও তর্কের ঊর্ধ্বে চিন্ময় রসসূত্রেই বিধৃত; আলোচ্য উপদেশাবলী সেই রসের উজ্জীবন করে। ভারতের ঋষি-প্রদর্শিত পন্থা ইহাই এবং ইহাই সকল ধর্ম সাধনার সার কথা ও শেষ কথা। বহু মতবাদ এবং বহু বিতর্কতার বর্তমান সমাজজীবন প্রত্যক্ষতার পরম বল হারাইতে বসিয়াছে। ধর্ম সাধনার অন্তর্নিহিত এই সার্বভৌম সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজনীয়তা আজ সকল দিক হইতে দেখা দিয়াছে। আজ আহ্বান আসিতেছে কার্পণ্য এবং ক্লৈব্যকে পরিত্যাগ করিয়া সবার পথে, ত্যাগের পথে অমৃতত্বকে উদ্বোধন করিবার। এদেশ, এজাতিকে যদি বাঁচিতে হয়, তবে সেই পথই একমাত্র পথ। কারণ সেই ভিত্তির উপরই ভারতীয় জাতি হিসাবে আমাদের সর্বাঙ্গীন অভিব্যক্তি নির্ভর করিতেছে। বিশ্বের দরবারে দাঁড়াইবার পক্ষে আমাদের সঙ্গতি হইল সেইখানেই। বিশ্বেশ্বরের পূজার যোগ্যতালাভ করিতে হইবে আমাদিগকে সেই বলেই। এই দিক হইতে গ্রন্থখানা আমাদের অন্তরে আশা জাগাইয়াছে। অনুবাদের ভাষা সুন্দর এবং ভাবের সঙ্গতি, অন্তর্গূঢ় ভাষার ভাব সম্পুট, ভাঙ্গিয়া এমন ক্ষেত্রে রক্ষা করা সুকঠিন হইলেও অনুবাদক সেদিকে অপ্রত্যাশিত সাফল্যই লাভ করিয়াছেন বলিতে হয়। ছাপা ও বাঁধাই অতি সুদৃশ্য। আমরা এমন গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

জাগরণ—শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম-এ, পি আর. এস, পি এইচ ডি। মূল্য দশ আনা। প্রকাশক—শ্রীরাধাচরণ চৌধুরী, প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিভিন্ন জনশিক্ষা সমিতির পাঠাগারসমূহের [illegible] পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন,—বেশী বয়সে [illegible] একটু আধটু লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, তাহারা একটি অক্ষরের গায়ে বা মাথায় আর একটি অক্ষর চাপাইলে তাহা পড়িতে অসুবিধা বোধ করে। তাই এমন ভাষায় বইখানি লিখিত হইয়াছে, যাহাতে সকল হরফ আলাদা আলাদা থাকে। কাহিনীগুলির ভিতর দিয়া সমবায়ের ও লেখাপড়া শিক্ষার উপকারিতা, কৃষিজাত জিনিস কি ভাবে বেচিলে বেশী পয়সা পাওয়া যায়, মজুরদের সুখসুবিধা কিরূপে বাড়ান যায়, এই সব বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। গল্পগুলি উপদেশাত্মক হইলেও এগুলিতে ছোট গল্পের রস প্রচুর রকমেই আছে। বাঙলা দেশের অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এমন পুস্তকের প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দারিদ্র্য মোচন:—শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম এ, পি আর এস, পি এইচ্ ডি, ভাগবতরত্ন। মূল্য এক টাকা।

অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়কে আমরা প্রধানত সাহিত্যিক এবং দার্শনিক ব্যক্তি বলিয়াই জানিতাম। দেশের অর্থাগম—বিশেষভাবে কৃষির উন্নতির দিকেও তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাঠকবর্গ ইহাতে পাইবেন। 'আমরা এত গরীব কেন,' এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার সমাধানের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। জমি তৈয়ারীর পদ্ধতি, বিভিন্ন সারের ব্যবস্থা, ইক্ষু, আলু, তামাক প্রভৃতি আবাদের নিয়ম এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। গৃহস্থ মাত্রেই এমন পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন। বিমানবাবু দেশের লোককে দেশের কথা শুধু ভাবান নাই, কাজের পথও নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের প্রথম ডিভিসনের সকল খেলা এখনও শেষ হয় নাই কিন্তু তাহা হইলেও ইহার মধ্যেই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এই বিভাগের চ্যাম্পিয়ান ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব রাণার্স আপ সাব্যস্ত হইয়াছে। ইষ্টবেঙ্গল একটি ভারতীয় দল সুতরাং ইহার সাফল্য ভারতীয় খেলোয়াড়গণের গৌরবের বিষয়। কলিকাতা ফুটবল লীগ-ইতিহাসে ভারতীয় দল হিসাবে ইষ্টবেঙ্গল তৃতীয় দল এই গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিল। ইতিপূর্বে মহমেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগান ক্লাব এই সম্মানলাভে সক্ষম হইয়াছিল। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এই বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ায় একান্ত সঙ্গতই হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ দল শ্রেষ্ঠত্বলাভে সক্ষম হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতার সমস্ত খেলার মধ্যে ইষ্টবেঙ্গল মাত্র একটিবার মহমেডান স্পোর্টিং দলের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। অপর কোন দলের পক্ষেই ইষ্টবেঙ্গলকে পরাজিত করা সম্ভবপর হয় নাই। ১৯২১০ সালে কলিকাতার ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার পর ইষ্টবেঙ্গলের সর্বপ্রথম এই সাফল্যলাভে সক্ষম হইল। ইতিপূর্বে ১৯৩২, ১৯৩৩, ১৯৩৫, ১৯৩৭ ও ১৯৪১ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব রাণার্স আপ হইবার সৌভাগ্য-লাভ করে। ইহার মধ্যে ১৯৩২, ১৯৩৩ ও ১৯৩৫ সালে মা[illegible] য়েগেটের জন্য ইষ্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ানসিপ হইতে বঞ্চিত হ[illegible] হয়। এই বৎসর ইষ্টবেঙ্গল তাহাদের অসম্পূর্ণ ও বহু আকাঙ্ক্ষিত গৌরবলাভ করিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত করিল, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় খেলোয়াড়দেরও সম্মানবৃদ্ধি করিল।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

১৯২২ সালে কুচবিহার কাপের রাণার্স আপ।

১৯২৪ সালে প্রথম ডিভিসনে উন্নীত ও কুচবিহার কাপ বিজয়ী।

১৯২৮ সালে দ্বিতীয় ডিভিসনে নামিয়া যায়।

১৯৩১ সালে প্রথম ডিভিসনে উন্নীত।

১৯৩২, ১৯৩৩, ১৯৩৫, ১৯৩৭, ১৯৪১ সালে প্রথম ডিভিসনের রাণার্স আপ।

১৯৩৪, ১৯৩৭ :—ইয়ঙ্গার কাপ রাণার্স আপ।

১৯৪০ সালে লেডী হার্ডিঞ্জ শীল্ড বিজয়ী ও পাওয়ার লীগ চ্যাম্পিয়ান।

১৯৪২ সালে—প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ান।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাস

কথিত আছে ১৯১১ সালে ইউনিয়ান ক্লাব নামে যে ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই পরে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব নামধারণ করে। ঐ সময়ের ঐ ক্লাবের সভাপতি ছিলেন স্বর্গীয় দেশপ্রিয় জে এম সেনগুপ্ত। ১৫ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত শৈলেশ বসুর প্রচেষ্টায় ইউনিয়ান ক্লাবের নাম ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব হয়। স্বর্গীয় জে এম সেনগুপ্ত মহাশয় ঐ ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১১ হইতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কোন ফুটবল দল ছিল না। শ্রীযুক্ত শৈলেশ বসু ক্রিকেট ও স্বর্গীয় সেনগুপ্ত মহাশয় টেনিস বিভাগ পরিচালনা করেন। ১৯১৪ সালে ফুটবল খেলার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে না। তবে এই সময় হইতে কলিকাতা ফুটবল লীগে স্থান পাইবার চেষ্টা চলে। দীর্ঘ আট বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই ক্লাব সর্বপ্রথম ১৯২১ সালে কলিকাতা ফুটবল লীগে স্থান লাভ করে। এই সময় অর্থাৎ ১৯২০ সালে উয়াড়ী ক্লাবের বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় মিঃ আর সেন ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিয়া জোড়াবাগান ক্লাবে যোগদান করেন। এই সময়ে ময়মনসিংহের নগরপুরের জমিদার মিঃ সুরেশ চৌধুরী জোড়াবাগান ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। মিঃ সেন ও মিঃ চৌধুরী একটি নূতন ক্লাব খুলিবার সংকল্প করিবামাত্র ভাগ্যকুলের সুপ্রসিদ্ধ রায়দের নিকট হইতে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেন। বিশেষ করিয়া রায়বাহাদুর টি বি রায়, মিঃ এন এল রায়, মিঃ নীলকৃষ্ণ রায়, মিঃ বি এল রায় প্রভৃতি উদ্যোক্তাগণের আন্তরিক চেষ্টায় ৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ মিঃ আর সেনের বাসস্থানে ক্লাব গঠনের প্রথম খসড়া রচিত হয়। ইহার পর ১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে রায় বাহাদুর টি বি রায়ের আবাসস্থলে ক্লাবের প্রথম সূত্রপাত হয়। এই বৎসরই উক্ত ক্লাব হার্কিউলিস কাপে অংশ গ্রহণ করিয়া বিজয়ীর সম্মানলাভ করে। হার্কিউলিস কাপে প্রতি দলে ৬ জন করিয়া খেলিত। এই প্রতিযোগিতায় বিখ্যাত খেলোয়াড় গোষ্ঠবিহারী পাল ইষ্টবেঙ্গল দলকে সাহায্য করেন।

হার্কিউলিস কাপ বিজয়ী হইবার পর ক্লাবের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার ভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা ও মফঃস্বলে খেলোয়াড় ও পৃষ্ঠপোষকগণের সহানুভূতি লাভ করিবার জোর প্রচেষ্টা চলে।

১৯২০-২১ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে ক্রিকেট খেলার পত্তন হয়। প্রথম বৎসরেই তাহারা স্পোর্টিং ইউনিয়নের বসু ভ্রাতৃবৃন্দ ও রায় ভ্রাতৃবৃন্দের সাহায্যে কয়েকটি ম্যাচ খেলে। ১৯২১ সালের প্রথমদিকে মিঃ বি এল রায়ের বাসস্থানে ক্লাবের প্রথম বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এস রায় উক্ত সভার পৌরোহিত্য করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তিনি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রথম সভাপতি এবং মিঃ সুরেশ চৌধুরী ও রায় বাহাদুর টি বি রায় যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। মিঃ চৌধুরী, রায় বাহাদুর টি বি রায়, মিঃ আর সেন, মিঃ বি সি ঘোষ বার এট ল, মিঃ এন এল রায় মিঃ কেশবলাল চ্যাটার্জি, মিঃ জিতু মুখার্জি প্রভৃতির এককালীন দান ক্লাবের প্রাথমিক রূপদানে বিশেষ সহায়তা করে।

কিরূপে স্থানলাভ করিল

কিন্তু ক্লাব গঠিত হইলেও তাহাদের কলিকাতায় ফুটবল মাঠে নিয়মিত খেলার কোন সুবিধা হইল না। তখন মাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিসনে কলিকাতায় ফুটবল লীগ খেলাপরিচালিত হইত।

এবং দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ান দল প্রথম ডিভিসনে উন্নীত হইবে দ্বিতীয় ডিভিসনের শূন্যস্থান পূর্ব বৎসরের ট্রেডস্ কাপ বিজয়ী দলের দ্বারা পূরণ করা হইত। সুতরাং ইস্টবেঙ্গল দলের লীগে অংশ গ্রহণ করিবার আশা একপ্রকার শূন্যে মিলাইয়া গেল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেই বৎসর তাজহাট ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিসন হইতে অবসর গ্রহণ করে, ফলে আই এফ এ এবং লীগের তদানীন্তন সম্পাদক মিঃ মেড্লিকটের বিশেষ চেষ্টায় ইস্টবেঙ্গল দল দ্বিতীয় ডিভিসন লীগে স্থান লাভ করে।

অধিকাংশ উয়ারী দলের খেলোয়াড় দ্বারা দল গঠন করিয়া ইস্টবেঙ্গল দল দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলা আরম্ভ করে। অন্যান্য ক্লাব হইতে আর কয়েকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করিয়া তাহারা রীতিমত পুষ্ট ও সবল হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁহারা সেই বৎসর চ্যাম্পিয়ানসিপের গৌরব অর্জন করিতে পারেন নাই। তালিকায় [illegible] স্থান অধিকার করেন। প্রথম বৎসর ইস্টবেঙ্গল দলের গোলে এন কাশী, ব্যাকে ভোলা সেন ও ভানু দত্তরায় এবং হাফব্যাকে প্রফুল্ল মিত্র, ননী গোঁসাই, সুরেন ঠাকুর ও হরেন সাহা প্রভৃতি খেলেন। ফরোয়ার্ডে যাঁহারা খেলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আর সেন, প্রশান্ত [illegible]র্শন, জিতু মুখার্জি, ধীরু সেন, সূর্য চক্রবর্তী ও কালু ঘোষ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পর পর ৪ বৎসর দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলিয়া পঞ্চম বৎসরে ইস্টবেঙ্গল দল তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াও প্রথম ডিভিসনে স্থান লাভ করিল। ১৯২৪ সালে ইস্টবেঙ্গল দলের প্রথম ডিভিসনে উন্নয়নের ইতিহাস বহু ক্রীড়ামোদীর নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। পুলিশ দল সেই বৎসর দ্বিতীয় ডিভিসনে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করিলেও প্রথম ডিভিসনে খেলিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। লীগের রানার্স আপ দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ক্যামেরোনিয়ান্স 'বি' দল তাহাদের 'এ' দল প্রথম ডিভিসনে থাকায় আইনত দ্বিতীয় ডিভিসনেই খেলিতে বাধ্য হয়। ফলে তৃতীয় স্থান অধিকারী ইস্টবেঙ্গল দলই উপরোক্ত ডিভিসনে খেলিবার সৌভাগ্য লাভ করে। কিন্তু এখানেও এক আইনের প্রশ্ন উত্থিত হয়। তখন মাত্র দুইটি ভারতীয় দল প্রথম ডিভিসনে স্থান পাইবার অধিকারী ছিল। ইস্টবেঙ্গল দলকে প্রথম ডিভিসনে উন্নীত করিতে হইলে আইনের সংশোধন করিতে হয়, কিন্তু সমস্যার মীমাংসা হয় না। আই এফ-এর তদানীন্তন সম্পাদক মিঃ রেড্লিকট কাস্টমস্ দলের প্রতিনিধি। সেই বৎসর কাস্টমস দল লীগ তালিকায় সর্বনিম্ন স্থান দখল করে সুতরাং ইস্টবেঙ্গল দলের উত্থান ও কাস্টমস দলের পতন সকল কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। ফলে আই এফ-এর সভাপতি জাস্টিস স্যার ইউয়ার্ট গ্রেভসএর সভাপতিত্বে এই ব্যাপার মীমাংসার জন্য যে সভা হয় তাহাতে ইস্টবেঙ্গল দলের সমর্থকগণের প্রস্তাব নামঞ্জুর হওয়ায় তাঁহারা সভাস্থল ত্যাগ করেন। অতঃপর ক্যালকাটা ক্লাবের মিঃ এন ম্যাকানের সভাপতিত্বে আর একটি সভা হয়, ইহাতে ইস্টবেঙ্গল দলের সমর্থকবৃন্দের আইন পরিবর্তনের প্রস্তাব মঞ্জুর হয় এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম ডিভিসনে খেলিবার অধিকার লাভ করে। মিঃ রেড্লিকট এই ব্যাপারে পদত্যাগ করেন এবং টমাস ল্যাম্ব আই এফ-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন

৩ বৎসর প্রথম ডিভিসনে অবস্থান করিবার পর ১৯২৮ সালে ইস্টবেঙ্গল দল পুনরায় নামিয়া যায়। কিন্তু ১৯৩২ সালে পুনরায় প্রথম ডিভিসনে উন্নীত হইয়া মাত্র এক পয়েণ্টের জন্য তাহারা চ্যাম্পিয়ানের গৌরব হইতে বঞ্চিত হয়। পর বৎসরও ঠিক একই প্রকারে তাহারা চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করিতে পারে নাই। উভয় বৎসরই ডারহামস দল ইস্টবেঙ্গল অপেক্ষা এক পয়েণ্টে অগ্রগামী থাকিয়া চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে। ১৯৩৫, ১৯৩৭ ও ১৯৪১ সালেও ইস্টবেঙ্গল দল লীগে রানার্স আপ হইবার গৌরব অর্জন করে। উক্ত ৩ বৎসরই মহমেডান স্পোর্টিং দল তাহাদের চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভের পথে অন্তরায় হইয়াছিল।

পূর্ববর্তী লীগ চ্যাম্পিয়ন দলসমূহ

১৮৯৮—গ্লসস্টারস, ১৮৯৯—ক্যালকাটা, ১৯০০-১—রয়াল আইরিস রাইফেলস, ১৯০২—কে ও এস বি, ১৯০৩—হাইল্যাণ্ডার্স, ১৯০৪-৫—কিংগস্ ওন, ১৯০৬—এইচ এল আই, ১৯০৭—ক্যালকাটা, ১৯০৮-৯—গর্ডনস, ১৯১০—ডালহৌসী, ১৯১১—৭০ ...আর জি এ, ১৯১২-১৩—ব্ল্যাক ওয়াচ, ১৯১৪—৯১ হাইল্যাণ্ডার্স, ১৯১৫—১০ মিডলসেক্স, ১৯১৬—ক্যালকাটা, ১৯১৭—লিংকলনস্ ১৯১৮- ক্যালকাটা, ১৯১৯—দ্বাদশ স্পেশাল সার্ভিস ব্যাটেলিয়ান, ১৯২০—ক্যালকাটা, ১৯২১—ডালহৌসী, ১৯২২-২৩—ক্যালকাটা, ১৯২৪—ক্যামেরন হাইল্যাণ্ডার্স, ১৯২৫—ক্যালকাটা, ১৯২৬-২৭—প্রথম ব্যাটেলিয়ান নর্থ স্ট্যাফোর্ডস, ১৯২৮-২৯—ডালহৌসী, ১৯৩০—অসহযোগ আন্দোলনে খেলা স্থগিত থাকে। ১৯৩১-৩৩—ডারহাম লাইট ইন, ১৯৩৪-৩৮—মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯৩৯—মোহনবাগান, ১৯৪০-৪১—মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯৪২—ইস্টবেঙ্গল।

লীগ কোঠায় কাহার কিরূপ স্থান

প্রথম ডিভিসন

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইস্টবেঙ্গল	২৩	১৯	৩	১	৬১	৭	৪১
মহঃ স্পোর্টিং	২৩	১৬	৬	১	৫৭	১৩	৩৮
মোহনবাগান	২১	১৩	৪	৪	৪৫	১৬	৩০
ভবানীপুর	২২	৮	৯	৫	২৫	১৩	২৫
বি এণ্ড এ আর	২২	১০	৫	৭	৪৭	৩৫	২৫
এরিয়ান্স	২১	৭	৭	৭	২৮	৩২	২১
কালীঘাট	২২	৭	৬	৯	২৭	২৫	২০

৮ই জুলাই—

রুশ রণাঙ্গন—ভরোনেজ-এর পশ্চিমে ঘোরতর সংগ্রাম চলে। জার্মানরা একটি মাত্র সংকীর্ণ এলাকায় ডন নদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

মিশর রণাঙ্গন—এল আলামেন এলাকায় বৃটিশ বাহিনী প্রতিপক্ষের সহিত সংঘর্ষে ব্যাপৃত থাকে এবং বৃটিশ বিমান বাহিনী প্রতিপক্ষের কামান-ঘাঁটি ও সরবরাহ পথসমূহের উপর প্রবল বোমা বর্ষণ করে।

চীন রণাঙ্গন—হোনান-সানসী রণাঙ্গনে টাইহাং পর্বতমালার পাদদেশে চীনারা কয়েক স্থানে জাপানীদের যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া দিতে সমর্থ হয়। জাপানীদের বিপুল ক্ষতি হয়।

৯ই জুলাই—

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, প্রবল সংগ্রামের পর সোভিয়েট বাহিনী ষ্টারিয়ি-ওস্কল পরিত্যাগ করিয়াছে। মস্কো রেডিওর সংবাদে বলা হয় যে, ভরোনেজ রণাঙ্গনে সোভিয়েট ট্যাঙ্কের আক্রমণে একটি জার্মান পদাতিক ব্যাটেলিয়ান সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

১০ই জুলাই—

রুশ রণাঙ্গন— ডন নদীর পশ্চিম তীরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। জার্মানগণ দাবী করিতেছে যে, তাহারা ডন নদীর পূর্ব তীরে সেতুমুখ নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।' খারকভের পূর্বে প্রায় একশত মাইল দ্রুত আগাইয়া যাওয়ার পর মার্শাল ফন বক একটি নূতন অংশে মস্কো-রোষ্টভ রেলওয়ের উপর গুরুতর চাপ দিতেছে। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির বিষয় মস্কো মধ্য রাত্রির ইস্তাহারে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে ভরোনেজের ১১০ মাইল দক্ষিণে উক্ত রেলপথে রোসোশ-এর সন্নিকটে প্রচণ্ড সংগ্রামের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

চীন রণাঙ্গন—চীনা বাহিনী পূর্বে চীনের কিয়াংসি প্রদেশের অন্তর্গত নানচাং শহর পুনরধিকার করিয়াছে।

১১ই জুলাই—

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে বলা হয় যে, ভরোনেজ হইতে রোসোশ পর্যন্ত ১৫০ মাইলব্যাপী রণাঙ্গণে প্রায় দশ লক্ষ সৈন্য মৃত্যু পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে। সংখ্যাধিক শত্রু-সৈন্যের আক্রমণের মুখে রুশরা রোসোশ শহর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে মস্কো-রষ্টোভ রেলওয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

মিশর রণাঙ্গন—মিশরের মরুযুদ্ধের মন্থরতার অবসান হইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ কর্তৃক দিবারাত্র প্রবল বিমান আক্রমণের পর এল আলামেনের উত্তর দিকস্থ রণক্ষেত্রে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। গতকল্য বৃটিশ বাহিনী এল আলামেন-এর পশ্চিমে অনুমান পাঁচ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। প্রতিপক্ষের কতকগুলি সৈন্য বন্দী করা হইয়াছে। দক্ষিণ দিকে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদল পূর্ব দিকে অগ্রসর হইলে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদলের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধে। উভয়পক্ষ পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ করে।

চীন রণাঙ্গন—পোইয়াং হ্রদ তীরবর্তী পোইয়াং শহরটি চীনা বাহিনী পুনরায় অধিকার করিয়াছে।

১২ই জুলাই—

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে বলা হয় যে, রুশ সৈন্যদল এখনও দৃঢ়তার সহিত ভরোনেজ শহরের আত্মরক্ষার ব্যূহ রক্ষা করিতেছে। কিন্তু যে সমস্ত স্থানে জার্মানরা আত্মরক্ষার ব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, সেই সকল স্থানে অবস্থা সংকটজনক হইয়া উঠিয়াছে। ডন এলাকায় প্রচণ্ড ট্যাংক যুদ্ধ চলিতেছে। জার্মানদের সমূহ ক্ষতি হইতেছে।

চীন রণাঙ্গন—জাপ সৈন্যেরা চেকিয়াং প্রদেশের লিসুই হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া সিংটিয়েন নামক স্থানটি দখল করিয়াছে। জাপানীরা একই দিনে ফুটু ওউ দ্বীপটিও দখল করিয়াছে। চীনা হাই কমাণ্ডের ইস্তাহারে প্রকাশ, চীনারা শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে; শত্রুপক্ষ নানচাং ও লিনচোয়ানের দিকে চলিয়া যাইতেছে।

মিশর রণাঙ্গন—কায়রোতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, উত্তর এলাকায় মিত্রপক্ষীয় বাহিনী প্রতিপক্ষের এলাকায় তাহাদের ঘাঁটি সুদৃঢ় করিয়াছে। প্রতিপক্ষের দুই সহস্রাধিক সৈন্য বন্দী হইয়াছে এবং ১৮টি ট্যাংক ধ্বংস হইয়াছে।

১৩ই জুলাই—

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, ভরোনেজ-এর প্রবেশপথে ও ডন নদীর তীরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। সোভিয়েট বাহিনী লিসিচানস্ক ও কাণ্টেমিরোভকা পরিত্যাগ করিয়াছে।

রয়টারের সামরিক সংবাদদাতা লিখিতেছেন, ককেসাসমুখী অভিযানে হের হিটলার তাঁহার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। তিনশত মাইল ব্যাপী রণাঙ্গন জুড়িয়া অনুমান ২০ লক্ষ সৈন্য প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। ফন বকের সৈন্যদল শিল্পপ্রধান ষ্ট্যালিনগ্রাদ শহরের দিকে তাহাদের সূচীমুখ লক্ষ্য করিয়া সমগ্র ডন উপত্যকায় আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে, আরও দক্ষিণে টাগনরোগ হইতে রোষ্টভ অভিমুখে নূতন আক্রমণ সুরু হইয়াছে।

মিশর রণাঙ্গন—জেনারেল অকিনলেকের সৈন্যদল এখনও টেল-এল-ইসা (যীশুর পাহাড়) নামক উচ্চ পার্বত্য ভূমি এখনও রক্ষা করিতেছে। দুই হাজারের উপর শত্রু-সৈন্য বন্দী করা হইয়াছে। জেনারেল রোমেল সাঁজোয়া বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। মুসোলিনী স্বয়ং মরু যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস; কায়রোর কোন কোন বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, বিজয়ী ইতালীয় সৈন্যদের তিনিই আলেকজান্দ্রিয়ায় লইয়া যাইবেন তাঁহার এরূপ আশা ছিল।

চীন রণাঙ্গন—চীনা সামরিক ইস্তাহারে প্রকাশ, চীনারা ফুচাও-এর নিকটে মীন নদীর মোহানায় একটি দ্বীপ পুনরাধিকার করিয়াছে। চীনারা রাত্রিকালে নৌকাযোগে আসিয়া দ্বীপে অবতরণ করে।

১৪ই জুলাই—

রুশ রণাঙ্গন—ভরোনেজের নিকটে আরও বহু জার্মানসৈন্য ডন সেতুমুখ পার হইয়াছে এবং ধূম্রজালের আবরণে বহুসংখ্যক জার্মান ট্যাংক ও মোটরবাহী সৈন্যদল সর্বপ্রকার বাধা কাটাইয়া ভরোনেজ শহরে প্রবেশ করিতেছে। ভরোনেজের প্রবেশপথের গ্রামগুলি বারংবার হাত বদল হইতেছে। সোভিয়েট সৈন্যেরা প্রতি গজ জমির জন্য লড়িতেছে। কালিনিন অঞ্চলে জার্মান আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে।

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ৯ই শ্রাবণ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 25th July, 1942 [৩৭শ সংখ্যা
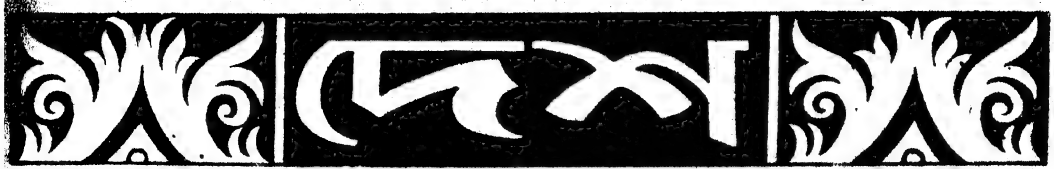
প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া—

...সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের ঘাঁটিসমূহ হইতে কংগ্রেস-...য় প্রবল প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। ভারতের ...শ আজ শত্রু উপস্থিত; এমন সঙ্কটকালে কোথায় ...যুদ্ধ জয়ে মিত্রশক্তিকে সাহায্য করিবে, তাহা না করিয়া ...তার জন্য দাবী করিতেছে? এই দারুণ অপরাধের জন্য ... ও আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে ... ভাষায় উত্তেজনা প্রকাশ করিতেছে। আমেরিকার একটি ... মহাত্মা গান্ধীকে চেঙ্গিস খাঁর সঙ্গে পর্যন্ত তুলনা করা ...ছে। বৃটিশ এবং মার্কিন সংবাদপত্রসমূহের এ উত্তেজনার ...প্রধান যুক্তি এই যে, কংগ্রেস যে প্রস্তাব করিয়াছে, তাহাতে ...দের সুবিধা পাইবে এবং কংগ্রেসের পরিগৃহীত প্রস্তাবে ...ও, বার্লিন ও রোম উল্লসিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু অদ্ভুত ...যুক্তি। কংগ্রেসের প্রস্তাবে স্পষ্ট ভাষাতেই এই সত্যের ... জোর দেওয়া হইয়াছে, যে, জাপানীদের প্রতিরোধ শক্তি প্রবল ... উক্ত প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। কংগ্রেস স্বাধীনতা চাহে, ... কংগ্রেস বুঝিয়াছে যে, বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক ভারতের ...নতা স্বীকৃতির উপর সমরোদ্যমে সম্মিলিত শক্তিকে সাহায্য ...বার স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি নির্ভর করিতেছে। সমগ্র ভারতের ...ক্তি এবং সমরসঙ্গতি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ ...বার জন্যই কংগ্রেস স্বাধীনতা দাবী করিয়াছে। কংগ্রেস যদি ...নতা লাভ করে, তবে সে এখন যেমন সরকারী সমরোদ্যমের ...র্কে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, তেমন আর থাকিবে না। ...গ্র শক্তি লইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে। অহিংস নীতির ...ড়ালে জাপানীকে সুবিধা দিবে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এমন ...ভিযোগের মূলে বিরুদ্ধবাদীদের হীন স্বার্থহানির আশঙ্কা-...মূলক দুরভিসন্ধিই যে রহিয়াছে ইহাও সুস্পষ্ট; কারণ মহাত্মাজী ...কথা আগাগোড়াই বলিয়া আসিয়াছেন এবং 'হরিজন' পত্রিকায় ...দিনও তিনি একথা বলিয়াছেন যে, স্বাধীন ভারতের সঙ্গে চুক্তি-...বদ্ধভাবে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে বৃটিশ কিংবা মার্কিন ...ন্যদের সঙ্গে ভারতবাসীদের সশস্ত্র সহযোগিতার তিনি বির-...তা করিবেন না। তিনি বলিয়াছেন, মিত্রশক্তির বাহিনী অপসারণ ...রিতে বলার তাৎপর্য যদি মিত্রশক্তির নিশ্চিত পরাজয় হয়, তাহা হইলে তাঁহার সে দাবী অগ্রাহ্য করিলে তাঁহার আপত্তি নাই। মিত্রশক্তির সেনাদল স্বাধীন ভারতের গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে ইহাই তিনি চাহেন! তিনি কথাটা আরও ভাষায় বলেন যে গ্রেট বৃটেন যদি ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তবে বৃটিশ সৈন্যের উপস্থিতি কোনও প্রকারে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের মনোবৃত্তির বিরোধী হইতে পারে না। গত মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সৈন্য ফ্রান্সে থাকিয়া লড়াই করিয়াছিল, তাহাতে কি ফ্রান্সের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, না ফ্রান্স স্বাধীন থাকাতে ইংরেজ সেনাদের লড়াই করিতে অসুবিধা হইয়াছিল এবং ফ্রান্সের স্বাধীনতার জন্য গত মহাযুদ্ধে বি... মিত্রশক্তির পরাজয় ঘটিয়াছে?' গত যুদ্ধে বিজয়ের নজীরটা সুস্পষ্ট রহিয়াছে বলিয়াই মহাত্মাজী সে নজীর উত্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের মার্কিন সেনাদল ইংলন্ডে রহিয়াছে। তাহারা অস্ট্রেলিয়ায় থাকিয়া লড়াই করিতেছে; কিন্তু সেক্ষেত্রে ইংলণ্ড কিংবা অস্ট্রেলিয়ার স্বাধীনতা তো মার্কিনদের যুদ্ধ জয়ের সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি করে নাই। তবে ভারতের ক্ষেত্রেই বা এ প্রশ্ন কেন? আমেরী প্রভৃতি আত্মগর্ব জাহির করিবার জন্য মু... যতই বলুন না কেন, স্বাধীন ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রাণবন্ত সহযোগিতায় বৃটিশের সমরোদ্যম এদেশে যতটা শক্তিশালী হইত, তাহা হয় নাই এবং হইতেও পারে না। স্বাধীনের সহ-যোগিতার সঙ্গে ক্রীতদাসের সহযোগিতার তুলনা হয় না। ব্রহ্ম-মালয়ের রণক্ষেত্রের ব্যাপারের সঙ্গে রুশিয়ার রণাঙ্গনের তুলনা করিলেই এ প্রভেদ স্পষ্ট চোখে পড়িবে। নিজেদের হীন স্বার্থের প্রলোভনে বৃহত্তর স্বার্থকে যাহারা বিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়া-ছেন, এবং সেই হীন স্বার্থবুদ্ধির সংস্কার বশে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে ভণ্ডামী দেখিতেছেন, ভণ্ডামী কোন্ পক্ষ হইতে হইতেছে, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন এবং এই ধরণের ভণ্ডামী যদি তাঁহারা এখনও পরিত্যাগ না করেন, তবে তাঁহাদেরই সমধিক বিপত্তির কারণ ঘটিবে ইহাও সেই সঙ্গে জানিয়া রাখুন।

যুক্তির পঙ্গুতা—

বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডল কংগ্রেসের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিবে...

রয়টারের সংবাদদাতা এইরূপ আভাস দিয়াছেন। তাঁহাদের অভাবিত সে সিদ্ধান্ত প্রত্যাশিত নয়, ইহা আমরা বুঝি। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানি যে, বৃটিশ জাতির রাজনীতিকগণ তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদমূলক মনোবৃত্তি সহজে ছাড়িতে পারেন না; কিন্তু এত বিপর্যয়ের পরও তাহাদের সুবুদ্ধির উদয় হইলে ভাল হইত। সাম্রাজ্যবাদের সংস্কারে বিভ্রান্ত যুক্তি ছাড়িয়া যদি কাজকে তাঁহারা বড় করিয়া দেখিতেন তবে অনেক অনর্থ এখনও কাটিয়া যাইত। দুঃখের বিষয়, কংগ্রেসের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিবার পক্ষে রয়টারের সংবাদদাতার মারফতে বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের যে শ্রেণীর যুক্তির পরিচয় আমরা পাইয়াছি, আসন্ন সঙ্কটের সমাধানে তাহার কতটা সার্থকতা আছে সে সম্বন্ধে আমাদের ষোল আনাই সন্দেহ রহিয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রধান যুক্তি যেটি, সেটি মামুলী যুক্তি, ভারতের সাম্প্রদায়িক ভেদ-বৈষম্যের যুক্তি। তাঁহাদের নাকি ধারণা এই যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষের উপর হইতে প্রভুত্ব অপসারিত করিলে কংগ্রেসের প্রস্তাবানুযায়ী অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব; কারণ ১০ কোটি মুসলমান এবং ৬০ লক্ষ অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করিবে। ১০ কোটি মুসলমান অর্থাৎ ভারতের গোটা মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেসের বিরোধী, কতদিন এই অসত্য প্রচার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের ব্যবসা চলিবে, আমরা জানি না। অনুন্নত সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেও সেই কথা। এই ধরণের স্বার্থমূলক প্রচারকার্যের দ্বারা, কংগ্রেসই যে ভারতের স্বাধীনতাকামী সর্বসম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, এ সত্য মিথ্যা হইয়া যায় না। স্বাধীনতাকামী ভারতের সহযোগিতার সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন হয়, তবে সে ক্ষেত্রে কংগ্রেসের মর্যাদাকেই সর্বাগ্রে স্বীকার করিতে হইবে। কংগ্রেস ভারতের অন্য সর্বসম্প্রদায় এবং অন্য সকল দলকে দাবাইবার উদ্দেশ্যেই ভারতের স্বাধীনতা চাহিতেছে এই ধরণের কথাও বলা হইতেছে। ভারতের স্বাধীনতা অন্য দলের পক্ষে কাম্য নয় বা তাহা নিন্দনীয় ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে এ হেন গ্লানিকর প্রচারকার্যে, ভারতের আত্মমর্যাদা বুদ্ধিকেই তাঁহারা আঘাত দিতেছেন। ভারতের জনকয়েক পরদপলেহীকে এই ধরণের ভাষায় তাহারা প্রশ্রয় দিতে পারেন, কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত ভারতের সমস্যা তাহাতে মিটিবে না বরং সে সমস্যা এই ধরণের মতি-গতিতে বৃদ্ধিই পাইবে। ভারতের সকল দল ও সকল সম্প্রদায়ই দেশের স্বাধীনতা চায় এবং যে মুহূর্তে এ দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, ক্ষুদ্র স্বার্থসেবীদের সাম্প্রদায়িকতার কচায়ন সেই মুহূর্তেই বন্ধ হইয়া যাইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিরুদ্ধবাদীদের আর এক যুক্তি হইল এই যে, ভারতবাসীদিগকে ত স্বাধীনতা দেওয়াই হইয়া গিয়াছে। বড়লাটের শাসন পরিষদের ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জন ভারতবাসী; ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের আধাআধি এখন ভারতবাসী, অন্যান্য বিভাগেও ভারতবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। দেশ শাসনের প্রকৃত অধিকার যে ক্ষেত্রে রহিয়াছে সম্পূর্ণ পরের হাতে, সেখানে এই ধরণের গোলামগিরির সুবিধা এবং সুযোগ প্রকৃত স্বাধীনতার স্পৃহাকে তৃপ্ত করিতে পারে না বরং নিজেদের হাতে প্রকৃত কর্তৃত্বের ঘাটিগুলি বজায় রাখিবার জিদ ভারতবাসীদের অন্তরে বিক্ষোভই সৃষ্টি করে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ইহা এখনও বুঝা উচিত ছিল। যদি সেটুকু বুঝিবার মত সদবুদ্ধি তাহাদের না হয়, তবে কাজের দিক হইতেও তাহাদের বুঝা উচিত যে, ভারতীয় দেশরক্ষা সচিবের হাতে ভারত হইতে সেনা সংগ্রহের কর্তৃত্ব থাকিলে এক্ষেত্রে দেশব্যাপী সাড়া জাগিবার পক্ষে যে সুবিধা হয়, বিদেশীর হাতে সে কর্তৃত্ব থাকিলে তাহা হয় না। ভারতের স্বাধীনতা স্বীকৃতিতে যুদ্ধোদ্যমে কার্যত তাঁহারা যে সহযোগিতা লাভ করিবেন, স্বাধীনতা না দিবার পক্ষে শত যুক্তিও সেদিককার ত্রুটি মিটাইতে পারে না।

দেশরক্ষা সচিবের ক্রোধ—

আমরা শুনিয়াছিলাম বড়লাটের শাসন পরিষদের কতিপয় ভারতীয় সদস্য কংগ্রেসের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া দেশরক্ষা কার্য যাহাতে সর্বাধিক শক্তিশালী হয়, সেজন্য বড়লাট এবং ভারত সচিবকে পরামর্শ দিতে প্রবৃত্ত হইবেন। সিভিলিয়ান চক্রের মধ্যে পড়িয়াও বড়লাটের শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে কয়েকজনের দেশপ্রেম এমন তীব্র এবং স্বাধীন চিত্ততা এরূপ সুদৃঢ় আছে আমরা জানি না। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের পরিগৃহীত প্রস্তাবের সম্বন্ধে শাসন পরিষদের দুই জন সদস্যের অভিমত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার সে দিন বলিয়াছেন যে, তিনি ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবগুলি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়াও এখনও তাহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। না বুঝাতে তেমন ক্ষতি ঘটে না; কিন্তু ভ্রান্তভাবে বুঝাতে এবং বুঝানোতেই ক্ষতি। নবনিযুক্ত দেশরক্ষা সচিব স্যার ফিরোজ খাঁ নুন ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবগুলি এইরূপ ভ্রান্তভাবে বুঝিয়াছেন শুধু তাহাই নহে, বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্যার ফিরোজ চিরকালই বৃটিশ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের প্রশংসাবাদী। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বশংবদ পুরুষ। ভারতের স্বাধীনতা এবং দেশরক্ষা ব্যাপারে স্বাধীন ভারতের সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার মত বিচারবুদ্ধি তাঁহার নাই। দেশরক্ষা দপ্তরের ভার হাতে লইয়া তিনি প্রথম উক্তিতেই ইহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বিলাতের প্রভুদিগকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। ভারতের জনমতের প্রতিনিধিদের সুবিবেচিত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এমন হঠকারিতা প্রদর্শন না করিলেই তাঁহার পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করা হইত। কারণ সমস্যাটি ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয়, সমগ্র জাতির স্বার্থ উহার সঙ্গে জড়িত আছে; সুতরাং সংস্কারান্ধ অধীর উত্তেজনার বিষয়ও উহা নহে। স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের মতে মহাত্মাজী হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার মতলবে আছেন, শুধু তাহাই নহে, তিনি গণতান্ত্রিকতার বিরোধী এবং ফ্যাসিস্টবাদকে উৎখাত করিতে যে শক্তিবর্গ বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তিনি তাহদের বুকে ছোরা বসাইতে যাইতেছেন। স্যার ফিরোজ তাঁহার বিলাতের মনিবদের রীতি মক্স করিয়া এ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাকে টানিয়া আনিয়াছেন

এবং কংগ্রেস বিরুদ্ধতার কৌশলে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সামন্ত রাজাদের মিলনের স্বপ্নে মজগুল হইয়াছেন। ইহাকে আহাম্মকী ছাড়া আর কি বলিব? এই নির্বুদ্ধিতা তাঁহার বিচারবুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং তাঁহার যুক্তি সাধারণের কাছে হাস্যকর করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধীনতা লাভ করিলে গোটা ভারত জুড়িয়া মিত্রপক্ষের সমরোদ্যমে যে আন্তরিকতা এবং উৎসাহ দেখা দিবে, অধীন ভারতে তাহা সম্ভব নহে। স্যার ফিরোজ দেশরক্ষা দপ্তরের ভার পাইয়াছেন; কিন্তু দেশরক্ষার দিক হইতে এই সোজা সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। দেশরক্ষার প্রকৃত দায়িত্ব তাঁহার হাতে নাই এবং দায়িত্বোপযোগী বুদ্ধিও তাঁহার দেখা দেয় নাই, সুতরাং এজন্য দুঃখও নাই। এই দিক হইতে, এ বিষয়ে তাঁহার উক্তিকে আমরা তেমন গুরুত্ব প্রদান করি না। তিনি বৃটিশ কর্তৃত্ব পরিচালিত পুত্তলিকা মাত্র। তাঁহার নিয়ামকদের মধ্যে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবগুলি সদিচ্ছাপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার মত শুভবুদ্ধি নও জাগ্রত হইবে, আমরা ইহাই আশা করি।

বিপজ্জনক এলাকার স্কুলে শিক্ষা—

গত ১৮ই জুলাই শনিবার ডায়মণ্ডহারবার স্কুলের প্রবীণ প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্তী এলাকার হাইস্কুলসমূহের শিক্ষকগণের একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, যতদিন পর্যন্ত কলিকাতা হইতে বাধ্যতামূলকভাবে লোক সরাইবার ব্যবস্থা না করা হয়, ততদিন পর্যন্ত কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী এলাকার স্কুলগুলিতে শিক্ষা ব্যবস্থা যাহাতে ভালভাবে চলে কর্তৃপক্ষের তেমন ব্যবস্থা করা উচিত। বাঙলা সরকার বিপজ্জনক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে স্কুল খুলিবার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আমরা আমাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছি। আমাদের মত এই যে, কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্তী অঞ্চলে বিপদের ঝুঁকি লইয়াই অনেককে থাকিতে হইতেছে। তাঁহারা যতদিন এখানে থাকিবেন, তাঁহাদের ছেলে মেয়েরাও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবে। ইঁহারা অনেকেই চাকুরিয়া শ্রেণীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, বাহিরে ছেলেমেয়েদের রাখিয়া বোর্ডিংএর খরচ চালাইবার সামর্থ ইঁহাদের নাই। এমন অবস্থায় কলিকাতায় এই সব পরিবার যতদিন থাকিবেন, ততদিন পর্যন্ত বাহিরে রেসিডেন্সিয়াল স্কুল খুলিলে কার্যত ইঁহাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। সুতরাং এই অঞ্চলে অবস্থানকারী পরিবারসমূহের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থার দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কিন্তু কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্তী বিপজ্জনক এলাকাসমূহের স্কুলগুলির অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে, স্কুলের ছাত্রদের উপস্থিতির সংখ্যা স্বাভাবিক নয়। এরূপ অবস্থায় স্কুলগুলির বর্তমান সঙ্কট কাটাইবার জন্য কর্তৃপক্ষর অর্থ সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষক সম্মেলনে সমবেত শিক্ষকগণ তাঁহাদের পরিগৃহীত একটি প্রস্তাবে বলিয়াছেন,—বিপজ্জনক এলাকায় থাকিয়া যে সব শিক্ষক তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিবেন, তাঁহাদের সেই কর্তব্য পালনের দায়িত্ব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও গভর্নমেন্টের গ্রহণ করা উচিত; সুতরাং দুর্দশাক্লিষ্ট শিক্ষকগণের সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের অবশ্য কর্তব্য।' আমরা এই প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করি।

দেশব্যাপী সমস্যা—

জীবন ধারণের নিত্য আবশ্যক দ্রব্যের অভাবের সমস্যা সমগ্র দেশে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বস্ত্রের অভাবও আছে এবং সে অভাব মিটাইবার জন্য প্রত্যাশিত স্ট্যান্ডার্ড ক্লথ এখনও প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই; কিন্তু অন্ন সমস্যার কাছে বস্ত্রের সমস্যা কতকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বাজারে চিনি মিলে না, লবণ মিলে না, কেরোসিন তেল মিলে না, দিয়াশলাই দুর্লভ হইয়াছে; কর্তৃপক্ষের মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা এই সব জিনিস পাইবার পক্ষে খরিদ্দারদের কিছুই সাহায্য করিতেছে না। জিনিস যেখানে মিলে না, সেখানে দরের প্রশ্ন ত অবান্তর। এই সঙ্গে চাউলের সমস্যা অবস্থাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। গভর্নমেন্ট বিবৃতির পর বিবৃতি প্রচার করিতেছেন এবং এই আশ্বাস আমাদিগকে দিতেছেন যে, বাঙলা দেশে চাউলের অভাব হইবে না। কিন্তু কর্তৃপক্ষের এই আশ্বাস ক্ষুধিতের উদরপূর্তির পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। খরিদ্দারদের পক্ষে চাল পাওয়াই প্রয়োজন এবং উপযুক্ত মূল্যে পাওয়া প্রয়োজন, কিন্তু সরকারী নির্দিষ্ট দরে বাজারে চাউল মিলে না। দোকানদারের কথা সর্বত্রই এই যে, আমরা সরকারী দরে চাউল কিনিতে পারি না, বেচিব কেমন করিয়া? এরূপ ক্ষেত্রে অন্ন সমস্যা মিটাইবার জন্য ক্রেতাদিগকে চড়া দাম দিয়াই চাউল ক্রয় করিতে হয়। কেন এমন ব্যাপার ঘটে, সম্প্রতি ইহার কতকটা কারণ বুঝা গিয়াছে। হাওড়ায় খানাতল্লাসীর ফলে বহু পরিমাণ মজুদ চাউল ধরা পড়িয়াছে। এই চাউলের কতকাংশ বাঙলা দেশের বাহিরে রপ্তানীর জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। কলিকাতা এবং শহরের উপকণ্ঠভাগেও এইরূপ গোপনে মজুদ চাউলের কিছু কিছু সন্ধান মিলিয়াছে। লাভখোরেরা দেশ বুঝে না, জাতি বুঝে না। দেশের এই দুর্দশায় তাহারা নিজেরা মোটা হইতে চায়। ইহাদিগকে কঠোরহস্তে সাজা দেওয়া দরকার এবং সাজা এমন হওয়া উচিত যাহাতে অর্থদণ্ড কিছু দিয়া লাভের বেশীটা ভোগের সুযোগ ইহারা না পায়। বাঙলা সরকার সম্প্রতি বাঙলা দেশ হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এ ব্যবস্থা সঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। কলিকাতা হইতে চাউল বাহিরে চালান দিবার অপকৌশল গোপনে গোপনে অবলম্বিত হইতেছিল ইহাতে তাহা বন্ধ হইবে। বাঙলা দেশে যে চাউল আছে, তাহাতে দেশবাসীর অভাব মিটাইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে, বাঙলা

সরকার এই ধারণা লইয়া এতদিন কাজ করিতেছিলেন; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, তাঁহাদের এই ধারণা শুধু অনুমান মাত্র ছিল; হিসাবে পাকা নয়; কারণ সম্প্রতি তাঁহাদেরই এক ইস্তাহারে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা বাঙলার ধান ও চাউলের হিসাব লইতেছেন; সুতরাং হিসাব না করিয়াই চাউল উদ্বৃত্ত হইবে কর্তৃপক্ষ ইহাই ধরিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে উদ্বৃত্ত চাউল ক্রয় করিয়াছেন বলিতেছেন, সে চাউল প্রকৃতপক্ষে উদ্বৃত্ত কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের অনুরোধ এই যে সরকার উদ্বৃত্ত বলিয়া যে চাউল ক্রয় করিয়াছেন, অন্য প্রদেশের অভাব মিটাইবার জন্য যেন তাহা ব্যয়িত না হয়। কারণ বাঙলা দেশের লোকেই আজ চাউলের চড়া দামে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সরকার চাউল বাঙলা দেশে যথেষ্ট আছে বিজ্ঞপ্তিতে শুধু একথা শুনাইলেই সমস্যার সমাধান হইবে না, বাজারে চাউলের সরবরাহ নির্ধারিত মূল্যে বজায় রাখিতে হইবে; যদি দোকানীদের দ্বারা তাহা সম্ভব না হয়, তবে সরকার হইতে দোকান খুলিতে হইবে। সমস্যা হইল অভাব পূরণের। সরকারী নোটিশ জারীর নিরর্থকতা দেশবাসীর মনে নৈরাশ্যই বৃদ্ধি করিতেছে। তাঁহাদের মূল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। সে নীতি অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে নিরর্থক, অনর্থক এবং অকেজো।

ডক্টর আম্বেদকরের সর্দারী—

ডাক্তার আম্বেদকর বড়লাটের শাসন পরিষদের অন্যতম নবনিযুক্ত সদস্য। নাগপুরে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে তিনি সেদিন যে বক্তৃতা করিয়াছেন, নবগঠিত শাসন পরিষদে কি ধরণের রত্নরাজীর সমাবেশ ঘটিয়াছে, ইহাতে সে পরিচয় মিলিয়াছে। ডাক্তার আম্বেদকর এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য একটি অছুৎস্থান চাই। বর্ণ হিন্দুদের বাসস্থান হইতে দূরে স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে এবং সরকারী ব্যয়ে নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইবে। ডাক্তার বলেন, মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের ঘোষণার প্রতিবাদ করিয়াছেন, সুতরাং অনুন্নত সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা তাঁহাদের দ্বারা চলে না। বৃটিশ গভর্নমেন্টও ক্রীপস্ প্রস্তাবে হিন্দু ও মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারাও অনুন্নত সম্প্রদায়ের অভিভাবকত্ব করিবার যোগ্য নহেন। সর্বশেষে যাঁহার কাছে সবচেয়ে বেশী আশা করা গিয়াছিল, সেই জিন্না সাহেবও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সহিত কাজ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে অনুন্নত সম্প্রদায়ের স্বার্থ তিনি ছাড়া আর কে দেখিবে? অনুন্নত সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার এই ব্যাপারে তিনি সকলকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু জিন্না সাহেবের সাকরেদী ছাড়িতে পারেন নাই—ইহা বেশই বুঝা যাইতেছে। এই শ্রেণীর যুক্তির উৎকটতা এবং এগুলি উপস্থিত করিবার নির্লজ্জতা উপলব্ধি করিবার মত কাণ্ডজ্ঞান সাধারণ লোকেরও আছে; কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির মোহ ইহাদিগকে অন্ধ করিয়াছে, অথ সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিতে ইঁহারাই হইতেছেন জননেতা এবং ইঁহারাই তাঁহাদের নিকট হইতে উত্তরোত্তর প্রশ্রয় পাইতেছেন। ডাক্তার আম্বেদকরের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। এখন তিনি অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভাবনা ছাড়িয়া সরকারী চাকুরীর আরাম ভোগ করিলেই ভাল হয়। যে জন্য রাজনীতি লইয়া থাকা দরকার ছিল সে কাজ ত হাসিল হইয়া গিয়াছে; এখন কর্তার ইচ্ছায় কর্ম পরম ধর্মই তিনি পালন করুন।

অকেজো উচ্ছ্বাস—

বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণ জাতীয় গভর্নমেন্টের বিরোধী কি না, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব সম্পর্কে এই প্রশ্নটি দেশের লোকের মনে উঠা অস্বাভাবিক নয়। জাতীয় গভর্নমেন্টের জন্য যাঁহারা অপেক্ষা করেন না—দেশের লোকের কর্তৃত্বহীন শাসনতন্ত্রের সেবার প্রয়োজন বোধ যাঁহাদের পক্ষে সে অপেক্ষাকে তুচ্ছ করিয়া ফেলে, তাঁহাদের সম্বন্ধে লোকের মনে এ প্রশ্ন দেখা দিতেই পারে। সেদিন বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার দেশের লোকের এইরূপ মনোভাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, দেশে প্রকৃত জাতীয় গভর্নমেণ্ট যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তিনি যে কোন সময়ে পদত্যাগ করিবার ন্য প্রস্তুত হইয়াই আছেন এবং দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ঘটাইবার জন্যই তিনি আন্তরিকভাবে আগ্রহপরায়ন। কিন্তু স্যার রাম স্বামীর এই আন্তরিকতা যদি বাস্তবে পরিণত না হয় তবে দেশের স্বার্থের দিক হইতে তাঁহার কোন মূল্যই নাই। ভারত গভর্নমেন্টের বাণিজ্য সচিবস্বরূপে তিনি এদিকে যে কাজ করিয়াছেন তাহাতে তেমন পরিচয় কিছু পাওয়া যায় নাই। ভারতে সত্যই যদি জাতীয় গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এই ধরণের অকেজো আন্তরিকতা প্রদর্শনের কোন ক্ষেত্র থাকিবে না, একথা বলাই বাহুল্য। ভারতের মত স্থানে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিল্পোন্নতির সর্বপ্রকার সংগতি থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সমর সঙ্কটের মধ্যে ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের জল তুলিবার এবং কাঠ টানিবার কাজ চালাইয়াই যে সন্তুষ্ট হইতে হইতেছে, বাণিজ্য সচিবের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই কৃতিত্বের পরিচয় নয়। দেশের প্রকৃত কাজই যদি না হইল তবে এই ধরণের অকেজো উচ্ছ্বাসের কোন মূল্যই নাই এবং দেশের লোকে ইঁহাদের মনে আন্তরিকতা আছে ইহা ধরিয়া লইলেও দেশের সমস্যা কিছু কমে না। আন্তরিকতার পরিচয় হইল কাজ—কাজ করিবার সামর্থহীন যে আন্তরিকতা, তাহা ভাবের ঘরে চোখ ঠারিয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা করা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

২৭

জয়ন্ত ও প্রতিমা একটা নিভৃত কোণে গিয়া দাঁড়াইল।

যে-কথাটা বলিবার জন্য জয়ন্ত প্রতিমাকে ডাকিয়া আনিল, সেই কথাটা নিতান্তই ব্যক্তিগত। কথাটা কিভাবে সুরু করিবে, জয়ন্ত তাই ভাবিতেছিল। প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল—'আমার সম্বন্ধে কিছু বলবেন?'

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বলিল—'হ্যাঁ, তুমি একটা মস্ত ভুল করছ। সে কথাই আমি বলতে চাই।'

—'বলুন!'

—'ডাক্তারকে নিশ্চয়ই তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ;—না? তাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত হয় নি।'

জয়ন্তের কথা শুনিয়া প্রতিমা অবাক হইয়া গেল। জয়ন্ত এসব কি করিয়া জানিল? তবে কি দিলীপ নিজে জয়ন্তকে বলিয়াছে?

চুপ করিয়া প্রতিমা কিছুক্ষণ কি ভাবিল, তারপর বলিল—'আমি বিয়ে করব না ঠিক করেছি।'

জয়ন্ত বলিল—'তুমি যে সেই মতলবই করেছ, তা' আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কেন? কেন তুমি বিয়ে করবে না?'

—'সেটাও আপনার বুঝা উচিত ছিল।'

—'যে জন্যে তুমি বিয়ে করবে না মনে করেছ, সেই জন্যেই আমি তোমাকে বিয়ে করতে বলছি।'

জয়ন্তের কথা শুনিয়া প্রতিমা হাসিল। হাসিটাই যেন ইহার প্রত্যুত্তর।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল—'হাসছ যে?'

প্রতিমা বলিল—'হাসির কথা বলছেন—হাসব না?'

—'একদিন একজনকে ভালবেসেছিলে বলে যে আর কোনদিন কারুকে বিয়ে করতে পারবে না—এটাই বরং একটা হাসির ব্যাপার।'

—'আপনার যদি এতে হাসি পায়—আপনি অনায়াসেই হাসতে পারেন! কে আপনাকে মানা করছে?'

জয়ন্ত সমবেদনার সহিত বলিল—'আমার জন্যে তুমি সারা জীবন কষ্ট পাবে জেনে আমিও যে কষ্ট পাচ্ছি প্রতিমা!'

প্রতিমা হাসিয়া কহিল—'আপনি মহৎ! তাই সবার দুঃখেই আপনি দুঃখ পান। কিন্তু আজ আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা, আর আমাকে অপমান করা একই কথা'—বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুটি ভিজিয়া উঠিল।

জয়ন্ত সস্নেহে কহিল—'আমি তোমাকে অপমান করতে পারি না—তা' তুমি ভাল করেই জান। তবু কেন একথা বলছ?'

প্রতিমা অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিল—'জেনে শুনেও একথা আমাকে বলতে হচ্ছে! আর কেউ যদি আমাকে বিয়ে করতে বলত তাহলে আমার দুঃখ হ'ত না। কিন্তু আপনি—'

প্রতিমা আর বলিতে পারিল না। উদ্গত বাষ্পে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

জয়ন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল 'অবুঝ হয়ো না প্রতিমা,—সংসারে অবুঝ হ'লে চলে না। আমি অনেক চিন্তা করেই তোমাকে বিয়ে করতে বলছি। তাতে তোমারও মঙ্গল হবে—আরও অনেকের মঙ্গল হবে।'

—'আর কার কি হবে না হবে জানি না, কিন্তু আমার তাতে মঙ্গল হবে না আমি জানি।'

—'কি করে তুমি জানলে? ওটা ত তোমার ধারণা মাত্র। তোমার ধারণা ত ভুলও হ'তে পারে!'

প্রতিমা কঠিন দৃষ্টিতে জয়ন্তের দিকে তাকাইয়া বলিল—তা' হ'তে পারে। কিন্তু আপনি যা বলছেন তাই যে অভ্রান্ত, একথা আপনি জোর করে বলতে পারেন?'

প্রতিমার দৃষ্টিতে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহার চোখে এ রকম দৃষ্টি জয়ন্ত আর দেখে নাই।

প্রতিমা পুনরায় বলিল—'আপনি যদি আমার মঙ্গল কামনা করেন, তাহ'লে আমাকে বিয়ে করতে বলবেন না।'

—'আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি কি না, অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি—প্রথম যেদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়, সেদিনই কি তুমি তার পরিচয় পাও নি?'

—'আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, তা' আমার মনে আছে। আমি ভুলি নি। তাতে আপনার মহত্ব আর দুর্জয় সাহসেরই পরিচয় পেয়েছিলাম। আমি মুগ্ধ হ'য়েছিলাম, তা'ও আজ স্বীকার করছি। কিন্তু সেদিন যদি আমার মৃত্যু হ'ত—ভালই হ'ত!'

এটা নিতান্তই অভিমানের কথা। এ দুরন্ত অভিমান যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না। বাধ্য হইয়া জয়ন্ত নির্বাক হইয়া রহিল।

প্রতিমা বলিতে লাগিল—'আমার জন্যে আর আপনাকে ভাবতে হবে না। এখন ভেবে কি করবেন? যখন ভাববার সময় ছিল—ভাবলে ফল হ'ত—তখনই ভাবলেন না!'—বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল।

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বলিল—'না ভেবে আমি কাজ করি না প্রতিমা! বিয়ের জন্যেই আমি বিয়ে করি নি, তা' তুমি জান। পদ্মাকে আশ্রয় দেওয়া আমি কর্তব্য মনে করেছি—তাই তাকে আশ্রয় দিয়েছি। তুমি যদি তাকে আশ্রয় দিয়ে তোমার কাছে রাখতে পারতে, তা'হলে পদ্মার ভার আমাকে নিতে হ'ত না।......তা' ছাড়া দিলীপ তোমাকে কত ভালবাসে, তা' ত আমি জানি। তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে তুমি অসুখী হবে না, এ বিশ্বাসও আমার আছে। দিলীপের সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক্—এটাই আমি মনে মনে কামনা করেছি

—'আপনি ভুল করেছেন!'

—'না। আমি ভুল করি নি। ভুল করেছ তুমি। দিলীপ তোমাকে ভালবাসে জেনেও তাকে বঞ্চিত করে' আমি তোমাকে বিয়ে করব, এটা আশা করাই তোমার মস্ত বড় ভুল!'

জয়ন্তের কথায় প্রতিমা আহত হইয়া বলিল—'আপনার কাছে আমি কিছুই আশা করি না। কেন আপনি একথা বলছেন? আমি বিয়ে করি বা না করি, তাতে আপনার কি? আপনার ত কিছু যায় আসে না?'

জয়ন্ত তীক্ষ্মকণ্ঠে বলিল—'তুমি কিছু জান না—তাই একথা বলছ! জানলে বলতে পারতে না।'

প্রতিমা কিছু বুঝিতে না পারিয়া হতভম্বের মত জয়ন্তের মুখের পানে তাকাইল।

জয়ন্ত বলিতে লাগিল—'যাক্, তুমি যখন বিয়ে করবে না স্থির করেছ, তখন অনর্থক আর আমি তোমাকে পীড়াপীড়ি করব না। কিন্তু বিয়ে করা তোমার উচিত ছিল—একথা আমি বলব। আর বলব—দিলীপকে প্রত্যাখ্যান করে' তুমি হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছ।'

'কি বলছেন আপনি!'—বলিয়া আরক্ত দৃষ্টিতে প্রতিমা জয়ন্তের মুখের পানে তাকাইল। কিছুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। কি একটা অব্যক্ত বেদনায় মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ বাদে সে বলিল—'যাকে ভালবাসি না, তাকে আমি কি করে বিয়ে করব? ভালবাসা ছাড়া ত কোন নারী কখনও পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। তাতে নারীর দেহমন অশুচি হয়। সেদিকটা আপনি একবার ভেবে দেখবেন।'

জয়ন্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল—'কিন্তু যে ভালবাসে, তার কাছে ত আত্মসমর্পণ করতে কোন দোষ নেই। নিবৃত্তি শান্ত নারীহৃদয়ের আত্মনিবেদনই সব চেয়ে শুচি সব চেয়ে সুন্দর! সংসারের কল্যাণে নারীর আত্মত্যাগ নারীত্বের মর্যাদাই বাড়ায়।'

কথাটা বোধকরি প্রতিমার মন স্পর্শ করিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া প্রতিমা বলিল—'আপনার কথাটা আমি ভেবে দেখব। না ভেবে কিছু বলতে পারি না।'

—'তুমি বিয়ে করলে আমি খুসী হব প্রতিমা,—এই আমি বলতে চাই। এটাই আমার শেষ কথা। এ কথাটা বলবার জন্যেই তোমাকে কষ্ট দিলাম, কিন্তু তোমাকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না।'

—'আপনাকে খুসী করতে আমি চেষ্টা করব। পারব কি না, তা' এখনো বলতে পারি না। যদি না পারি, তা'হলে আপনি মনে করবেন না যে মনের জেদ আমি ছাড়িনি। ওটা আমার জেদ নয়। সত্যি না।'

জয়ন্ত বুঝিল, প্রতিমাকে আর এ বিষয়ে বলিয়া কোন লাভ নাই। জিজ্ঞাসা করিল—দিলীপের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে তোমার আপত্তি নেই ত?'

প্রতিমা কহিল—'না। কাজ করতে আপত্তি কি!'

—'তা হ'লে তুমিও নার্সিংহোমের কাজে লেগে যাও। দু'জনে লাগলে তাড়াতাড়ি কাজটা এগিয়ে যাবে।'

—'আচ্ছা। কাল থেকে আমি সুরু করব।'

জয়ন্ত বলিল—'নার্সিংহোমের সম্পূর্ণ ভার কিন্তু তোমাদের দু'জনের ওপরই থাকবে। আশা করি, আমি ফিরে এসে দেখতে পাব, সব প্রস্তুত আছে।'

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি কবে যাচ্ছেন?'

—'যেতে দু'চার দিন দেরী হবে হয়ত। যাবার আগে একটা উইল তৈরী করে' যাব মনে করেছি।—'

—'উইল!' সে কি! উইল করবার কি হ'য়েছে?'

প্রতিমা অবাক হইয়া জয়ন্তের মুখের পানে তাকাইল।

জয়ন্ত গলা খাটো করিয়া কহিল—'টাকাগুলো যেন আমার ঘাড়ে একটা বোঝা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, বোঝাটা ঘাড় থেকে নামাতে পারলেই বাঁচি।'

কথাটা বলিতে বলিতে জয়ন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহাকে এরূপ চঞ্চল হইতে আর কখনো দেখা যায় নাই।

প্রতিমা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—'কেন? কি হ'য়েছে?'

জয়ন্ত একটু স্থির হইয়া বলিল—'অর্থ বড় অনর্থ ঘটাচ্ছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক পয়সাও আর আমি রাখব না।'

ব্যাপারটা প্রতিমা পরিষ্কার বুঝিতে না পারিলেও এটুকু বুঝিল যে, পদ্মা এমন কিছু করিয়াছে, যার জন্য জয়ন্ত মর্মাহত হইয়াছে। ঐশ্বর্য ভোগ করিবার স্পৃহা পদ্মার পুরাপুরিই আছে, কিন্তু জয়ন্তের জন্য সে ভোগ করিতে পারে না, ইহা প্রতিমা জানে। হয়ত এই কারণেই কোন গোলযোগ ঘটিয়াছে মনে করিয়া প্রতিমা প্রশ্ন করিল—'উইলের কথা পদ্মা জানে?'

জয়ন্ত বলিল—'না। এখনো বলি নি।'

প্রতিমা কহিল—'পদ্মা যে ভয়ানক মনঃক্ষুণ্ণ হবে।'

—'তা হোক! এ ছাড়া উপায় নেই। মনের ক্ষোভ দু'দিন বাদেই মিটে যাবে, কিন্তু টাকাগুলো চোখের সামনে থাকলে ভোগের বাসনা কিছুতেই মিটবে না।'

—'আপনি মনে প্রাণে সন্ন্যাসী কি না, কাজেই ভোগ-বিলাস দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। কিন্তু সকলেই ত আপনার মত নয়।'

জয়ন্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল—'আমার স্ত্রীকে আমার মতই হ'তে হবে। আর সকলের কাছে আমি এ দাবী করতে পারি না—কিন্তু স্ত্রীর কাছে দাবী করতে পারি।'

(আগামী বারে সমাপ্য)
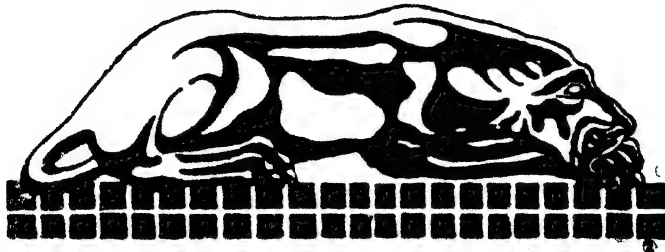
মাল্টার কাব্যসাহিত্য

গোপাল ভৌমিক

বর্তমান যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হিসাবে মাল্টা আজ প্রসিদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। ভূমধ্যসাগরীয় এই ব্রিটিশ ঘাঁটিটির উপর প্রায় রোজই জার্মান বিমান দুই চারবার হানা দিয়ে থাকে। মাল্টা সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী খবর হয়ত অনেকেই জানেন না। কিন্তু মাল্টা সম্বন্ধে জানার কথা আছে অনেক। মাল্টিজরা একটি স্বতন্ত্র ভূমধ্যসাগরীয় জাতি; তাদের সংখ্যা কম হ'লেও (প্রায় দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার) তাদের একটা স্বতন্ত্র সাহিত্য ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে। বর্তমান প্রবন্ধে এই মাল্টিজ জাতির সাহিত্য—বিশেষ করে তাদের কাব্য-সাহিত্যই আমাদের আলোচ্য বিষয়। মাল্টার কাছাকাছি সবশুদ্ধ চারটি দ্বীপ আছে; তার মধ্যে তিনটিতে মাল্টিজদের বাস—প্রধান দ্বীপটি সিসিলির প্রায় ষাট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে মাল্টার বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে এখানকার অধিবাসীরা ছিল ফিনিসীয়; তারা ছিল তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ পরিশ্রমী ও সভ্য জাতি। কিন্তু এতদিন পূর্বের ফিনিসীয় রক্ত আজ মাল্টাবাসীদের দেহে আছে কিনা সন্দেহ; কারণ মাল্টা পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী প্রতিবেশী দেশগুলি কর্তৃক বারবার বিজিত ও প্রভাবান্বিত হ'য়েছে। তবে তাদের ভাষায় এখনও ফিনিসীয় প্রভাব যথেষ্ট মাত্রায় বিদ্যমান আছে। মাল্টিজরা অতি প্রাচীন কাল থেকেই খৃস্ট ধর্মাবলম্বী; সংস্কৃতির দিক থেকে তারা ল্যাটিন খৃস্টান জগতের অংশ বিশেষ। জাতি হিসাবে তারা ভূমধ্যসাগরীয় একটা বিশেষ জাতি; আন্তর্জাতিক বিবাহ ও উপনিবেশ স্থাপন সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যেটুকু ফিনিসীয় রক্ত অবশিষ্ট আছে তার পরিমাণ নগণ্য। মাল্টিজদের উপর দিয়ে প্রায় তিন হাজার বৎসরের বৈদেশিক প্রভাব গেছে—তার মধ্যে ল্যাটিন দেশগুলির প্রভাবই ছিল বেশী; এই সময়ের মধ্যে মাল্টা বহুবার শক্তিশালী প্রতিবেশী শক্তির পদানত হয়েছে; এইসব আক্রমণের ফলে মাল্টিজরা বিচ্ছিন্ন ত হয়ই নি—বরং তারা একতাবদ্ধ হয়ে বিশেষ একটা জাতিতে পরিণত হয়েছে; তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং সাহিত্য গড়ে উঠেছে। জাতীয় সংমিশ্রণ সত্ত্বেও মাল্টিজরা ভাষা ও সাহিত্যের দিক থেকে নিজেদের বৈশিষ্ট হারিয়ে ফেলে নি। মাল্টিজ তাদের একমাত্র ভাষা। গত ছয় শ' বছর ধরে মাল্টিজই তাদের কথ্য ভাষা ছিল; কিন্তু এতদিন সিসিলীয়, ল্যাটিন এবং ইতালীয় ভাষাই তাদের সংস্কৃতির বাহন হিসাবে কাজ করে এসেছে। সাধারণ অধিবাসীদের সঙ্গে এই সব ভাষার কোন যোগাযোগ ছিল না বললে চলে। শিক্ষিত মাল্টিজরা ইতালীয় ভাষায় কথাবার্তা বলত বলে এই সেদিন পর্যন্ত ইতালীয়কেই মাল্টার জাতীয় ভাষা বলে চালান হ'ত। মাল্টার আইন এই ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল—আদালতের সব কাজ চলত এই ভাষায়; এমনকি মাল্টার কবিরা পর্যন্ত ইতালীয় ভাষায় কাব্য চর্চা করতেন। ফলে বহুবর্ষ ধরে মাল্টায় অনেক ইতালীয় কবি জন্মেছিলেন কিন্তু মাল্টিজ কবি জন্মান নি একজনও। জাতীয় জাগরণের সাথে সাথে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ইতালীয় ভাষা আজ মাল্টাবাসীদের জীবন থেকে বিতাড়িত হয়েছে; আজকাল মাল্টার আদালতে মাল্টিজ ভাষায়ই মালটাবাসীদের বিচার হয়ে থাকে। আজ শুধু বিদেশী ভাষা হিসাবে মাল্টার স্কুল ও কলেজের উচ্চ শ্রেণীতে ইতালীয় ভাষা শেখান হয়—এইমাত্র। মাল্টার জাতীয় জীবনে ইতালীয় ভাষার প্রভাব আজ নাম মাত্র। জাতীয় ভাষার সাথে সাথে জাতীয় সাহিত্যেরও দাবী উপস্থিত হ'ল। একশত বৎসর আগের একজন মাল্টিজ বিপ্লবী পণ্ডিতকে অনুসরণ করে মাল্টিজ লেখকরা বলা সুরু করলেন: "আমাদের নিজেদের জাতীয় অনুভূতি ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আধারস্বরূপ আমাদের একটা জাতীয় সাহিত্য গড়ে উঠবে না কেন?" মাল্টিজদের মধ্যে ইতালীয় কবি অবশ্য অনেক ছিলেন কিন্তু জনসাধারণ তাঁদের কবিতা বুঝতে পারত না। সাহিত্যে এরূপ শ্রেণী বিভাগ মোটেই শোভন নয়। ইতালীয় কবি হিসাবে খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকজন মাল্টিজ কবি নিজেদের ভাষায় সুন্দর কবিতা লেখা সুরু করলেন। এই পরীক্ষায় মাল্টিজ ভাষা চমৎকার উৎরে গেল; জনসমাজে একটা নতুন প্রেরণা এল। খাঁটি জাতীয় সাহিত্যের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলল। ইতালীয় এবং মাল্টিজ ভাষার মধ্যে আধিপত্যের জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হ'ল। এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে মাল্টিজ ভাষা সগৌরবে বিজয়ী হ'য়ে বেরিয়ে এল। মাল্টিজই এখন মাল্টাবাসীদের একমাত্র জাতীয় ভাষা—তাদের আদালতের ভাষা, তাদের নতুন সাহিত্য ও নতুন কবিতার ভাষা।

মাল্টিজ ভাষায় প্রথম কবিতা লিখে যিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর নাম ডাঃ ভ্যাসালো (১৮১৭-১৮৬৭)। তিনি ইতালীয় ভাষার অধ্যাপক এবং ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি অনেক সুন্দর গীতিকবিতা এবং একখানি ছোট মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। তার পরেই নাম করতে হয় জি মাস্কাট আ্যাজ্জোপার্ডির (১৮৫৩-১৯২৭)। তিনি নিজে ইতালীয় ভাষার ছাত্র এবং ভক্ত ছিলেন। তিনি ভাল ঔপন্যাসিকও ছিলেন। কবি হিসাবেও তিনি খুব বড় ছিলেন; মাল্টিজ ভাষায় খুব জোরালোভাবে তিনি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে পারতেন; শৈল্পিক উৎকর্ষের দিক থেকে মাল্টিজ তখনও ছিল নীচু দরের ভাষা। কিন্তু তিনি এই ভাষায় সুন্দর মৌলিক কবিতা রচনা করে গেছেন। মাল্টিজ ভাষায় যে সব উচ্চ শ্রেণীর কবিতা তিনি লিখেছিলেন তার প্রভাবে অনেক তরুণ কবি এই ভাষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং এই

ভাষায় কাব্য-রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। মাল্‌টায় আজ অনেক সংস্কৃতিবান্ তরুণ জাতীয় কবি আছেন যাঁদের নিয়ে মাল্‌টার সাহিত্য গর্ব করতে পারে। এ'রা সবাই নিজেদের ভাষা ছাড়া আরও অনেক ইউরোপীয় ভাষা জানেন—উদাহরণ স্বরূপ ইংরেজী, ইতালীয়, প্রাচীন ল্যাটিন এবং ফরাসী ভাষার নাম করা যেতে পারে। আধুনিক ইউরোপীয় কাব্যিক আন্দোলনের সংগে এ'দের যথেষ্ট যোগাযোগ আছে; এদিক দিয়ে এ'রা যথেষ্ট প্রগতিশীল। আধুনিক মাল্‌টিজ্ কবিদের কয়েকজনের কবিতা প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক লরেণ্ট্ রোপা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। অনুবাদগুলি কাব্যামোদী পাঠক সমাজে খুব সমাদৃত হ'য়েছে।

আধুনিক কবিদের মধ্যে ডান্ কার্মের প্রসিদ্ধিই সর্বাপেক্ষা বেশী। মাল্‌টিজ্ ভাষা ছাড়াও তিনি ইতালীয় ভাষায় ভাল কবিতা লিখতে পারেন। মাল্‌টিজ্ ভাষায় লিখিত তাঁর সনেটগুলি টেক্‌নিকের দিক থেকে অনবদ্য। ছন্দ এবং ভাবের গভীরতার দিক থেকেও মাল্‌টিজ্ কবিতায় সেগুলির তুলনা মেলা মুস্কিল। কবি হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর ছন্দের ভারসাম্য অনিন্দনীয় এবং চিন্তাশীল অনুভূতির সাহায্যে তিনি বাস্তবকে আদর্শজগতে উন্নীত করতে পারেন। প্রতিটি কবিতায় আমরা তাঁর বুদ্ধি-বিদগ্ধ সংস্কৃতিবান মনের পরিচয় পাই। একটি সমালোচনামূলক গদ্য রচনায় তিনি বলেছেন যে, সৌন্দর্যের জন্য মানুষের মনের বিশ্বজনীন কামনাকে সুন্দর প্রতীকের সাহায্যে কাব্যে রূপায়িত করাই কবির কাজ। তাঁর মতে কবির মন হচ্ছে এই বিশ্বজনীন কামনার সংশ্লেষণ-স্থল এবং তার ফলে কবির কাব্যের আবেদনও সার্বজনীন। তাঁর এই থিয়োরীর সংগে আমাদের মতের মিল না থাকতে পারে—কিন্তু তাঁর প্রতিটি কবিতায় আমরা এই মতের সমর্থন পাই। ডান্ কার্মের The Ego and the Beyond ব'লে পাঁচশ তেইশ পংক্তির একটি দীর্ঘ কবিতা আছে। এই কবিতাটিতে তিনি জীবন এবং মরণ সম্বন্ধে খৃস্টীয় তত্ত্ববাদের দার্শনিক রূপ দিয়েছেন। শিল্পীসুলভ দরদ দিয়ে তিনি জীবনের বহু কঠিন সমস্যার আলোচনা ক'রেছেন এই কবিতায়। এই সব কঠিন সমস্যার চাপে পড়ে মানুষ অনেক সময় সন্দেহবাদী হ'য়ে পড়ে—পারত্রিক জগত সম্বন্ধে তার বিশ্বাস থাকে না। কিন্তু কবি তাঁর পা থেকে পৃথিবীর ধূলি ঝেড়ে পারত্রিক জগতে গেছেন।—একমাত্র এই পারত্রিক জগতেই মানুষের শান্তি এবং সুখের তৃষ্ণা মিটতে পারে—এজগতে নয়। শিল্পের দিক থেকে বিচার করলেও তাঁর এই কবিতাটি রসোত্তীর্ণ হ'য়েছে।

আরেকজন প্রসিদ্ধ কবি হচ্ছেন রেভারেণ্ড্ আনাস্টাসি কুস্‌কিয়েরি। এ'র কাব্যপ্রতিভা কার্মের মত ব্যাপক নয়; এ'র কাব্যের বিষয়বস্তুও সীমাবদ্ধ। ইনি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং নানা ধরণের রচনায় এ'র পারদর্শিতা আছে। ইনি ইতালীয় দার্শনিক—ক্রোচের সঙ্গে দার্শনিক বিতর্কও করেন আবার মাল্‌টিজ্ এবং ইতালীয় ভাষায় সুন্দর কবিতাও লেখেন। প্রধানত ধর্মমূলক প্রেরণা থেকেই এ'র কবিতার জন্ম। বাইবেলের ধর্মমূলক কবিতার (pslms) প্রভাব এ'র উপর খুব বেশী। তাই এ'র মাল্‌টিজ্ ধর্মমূলক কবিতা পড়তে পড়তে অনেক সময় বাইবেলের কথা মনে পড়ে যায়। নিনু ক্রেমোনা হ'চ্ছেন মাল্‌টার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। স্থানীয় বর্ণাঢ্যতায় তাঁর কবিতাগুলি সব চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ। অথচ তাঁর কবিতার পাঠকসংখ্যা খুব কম, কারণ তাঁর কবিতা মোটেই সহজবোধ্য নয়। ভাব-ব্যঞ্জনার জন্য কবিতায় যে দুর্বোধ্যতা আসে সেটা অনেক সময় আদরণীয় কিন্তু ক্রেমোনার দুর্বোধ্যতা ভাব-ব্যঞ্জনার দরুণ নয়। ব্রাউনিংয়ের মত তাঁর চিন্তাধারায় অস্পষ্টতা এবং জটিলতা আছে—তার ফলেই এ দুর্বোধ্যতা। তাঁর দুর্বোধ্যতা এবং জটিল বাক্যবিন্যাস সত্ত্বেও তাঁর মৌলিক কাব্যিক চিত্রাবলীর জন্যই তাঁর কাব্য পাঠ করা উচিত। আধুনিক মাল্‌টিজ্ কবিদের মধ্যে তাঁর মত বর্ণাঢ্য চিত্রবিন্যাস আর কোন কবি করতে পারেন না। তাঁর The Redemption of the Peasants নামক নাটকে তিনি বিদেশীদের প্রভুত্বের ফলে তাঁর মাল্‌টিজ্ পূর্বপুরুষরা যে সব দুঃখকষ্ট ভোগ করতেন তার সুন্দর ছবি এ'কেছেন। তাঁর এই নাটকখানি খুব হৃদয়স্পর্শী। অপেক্ষাকৃত আধুনিক মাল্‌টিজ্ কবিদের মধ্যে রুজার ব্রিফা সব চেয়ে বেশী রোম্যাণ্টিক্। ব্রিফা সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি। তাঁর Tired yet unsatisfied কবিতাটি ওয়াল্‌টার ডি লা মেয়ারের কবিতার মত স্বপ্নময় আবেশে পরিপূর্ণ। এই কবিতাটির অর্থ উদ্ধার করা মুস্কিল। তবে মনে হয় যে, কবি রহস্যের হাল্‌কা রঙের তুলি বুলিয়ে এই বলতে চান যে মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েও বেঁচে থাকতে চায়। এই বেঁচে থাকার উদগ্র কামনাই পরিশ্রান্ত মানুষকে অতৃপ্ত রাখে। নিরন্তর মানুষ তাই এগিয়ে চলে।

জর্জ পিসানী আরেকজন শক্তিশালী তরুণ কবি; আধুনিক মালটিজ সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি খুব প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তাঁর অনুদিত বেশীর ভাগ কবিতাই ঐতিহাসিক —কাজেই মাল্‌টার বাইরের পাঠকদের এ সব কবিতা খুব নাড়া দিতে পারেন না। কিন্তু পিসানীর কাব্য প্রতিভা খুবই বৈচিত্র্যময়—তিনি মাল্‌টার প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাপার নিয়ে যেমন কবিতা লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন, গ্যাস্-মাস্ক নিয়েও। তাঁর গীতি কবিতা প্রায় ক্ষেত্রেই একটা গভীর বিষাদে পরিপূর্ণ—কি যেন একটা ব্যর্থতা কোনরূপে আশাকে অবলম্বন ক'রে বেঁচে আছে। কার্মেলু ভ্যাসালোর নৈরাশ্যবাদ, কিন্তু ভয়ানক তীব্র; তাঁর ব্যাপক দুঃখবাদের চাপে পড়ে অনেক সময় পাঠকের মন হাঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর ছন্দের উপর যথেষ্ট দখল আছে এবং তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ হলেও তাঁর চিত্র-বিন্যাসের বৈচিত্র আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না। তরুণ কবিদের মধ্যে ডাঃ জে আকুইলিনারও যথেষ্ট নাম আছে। কবিতা ছাড়াও ইনি মাল্‌টিজ্ ভাষার উন্নতি সাধনে যথেষ্ট তৎপর। পি, পি, সেডন্ নামক প্রসিদ্ধ মাল্‌টিজ লেখকের সহযোগিতায় ডাঃ আকুইলিনা তিন খণ্ডে মাল্‌টিজ সাহিত্যের সংকলন প্রকাশ করেছেন। এই সংকলন বর্তমানে

(শেষাংশ ১০০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কুমার সম্ভব

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ধাত্রীবিদ্যা আর শিশু চিকিৎসায় গাঁয়ের মধ্যে সারদার জুড়ি নেই। মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়-ফুঁক আর বহু গাছ-গাছড়া তার জানা। দু' একজন সম্পন্ন গৃহস্থের ঘর ছাড়া গাঁয়ের অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের অসুখ তার ওষুধেই সারে। ছেলেমেয়ে খুব ভালবাসে সারদা। যে বাড়িতেই যাক্ সব চেয়ে ছোট শিশুটিকে সেই যে কোলে তুলে নেয় আর আসার সময় নামিয়ে দিয়ে আসে। পাড়ার ছেলেমেয়ে যদি হয় কোলে করে' প্রায়ই সে নিয়ে আসে বাড়িতে। বলে, 'যদি আর না দিই।'

ছেলের মা হেসে বলে, 'বেশ ত ওকে তুমিই নিয়ে পাল গিয়ে। সারদা হাসে, 'ঈস্ দশটি হোলেও তো একটিকে প্রাণ ধরে দিতে পারবে না। ছেলের মা ভয়ংকর আতঙ্কের ভাব মুখে এনে বলে 'রক্ষা কর দশটিতে দরকার নেই আর।'

দুদণ্ড বেলা হতে না হতেই সারদা এক বোঝা কুমড়োর ডগা আর ফুল নিয়ে গোঁসাইদের বাড়িতে উপস্থিত। পিণ্টুর ঠাকুরমা তো খুব খুসি। 'ধন্যি মেয়ে বাবা রাত পোয়াতে না পোয়াতে রাজ্যের ডগা নিয়ে এলি কোত্থেকে?

সারদা সহাস্যে বলল, আনলুম, কখনো কোন জিনিসের আমার অভাব হয় দেখেছেন?'

পিণ্টুর ঠাকুরমাও হাসলেন, 'তা ঠিক রাজার নেই যে ধন টুনির আছে সেই ধন।'

'পিণ্টুকে দেখছি নে যে সে কোথায়?' সারদা কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করে।

'পিণ্টু? দেখ গিয়ে কুলতলায় সকাল থেকেই কি সব খেলা আরম্ভ হয়েছে। তার নতুনদা এসেছে মামাবাড়ি থেকে। তাকে কি আর আজ পাওয়ার জো আছে?'

ঘুরে ঘুরে সারদা এলো কুলতলায়। বাড়ির সব ক'টি ছেলেমেয়ে সেখানে এসে জড় হয়েছে। কল্যাণ এদের মামাতো ভাই বছর বার তের বয়স। 'সে পাতটিন দিয়ে এয়ারোপ্লেন তৈরি করেছে। সবাই দারুণ কৌতুহল নিয়ে তা দেখছে। বছর তিনেকের ছেলে পিণ্টুর চোখে গভীর উৎসুক্য।

কিন্তু সারদা তা লক্ষ্য করল না। দল থেকে পিণ্টু একটু দূরেই বসেছিল। সারদা তাকে কোলে নিতে চেষ্টা করে বলল, কুমড়ো ফুল নিবি নাকি পিণ্টু? দেখ এসে কতগুলি কুমড়ো ফুল এনেছি। পিণ্টু কোল থেকে জোর করে নামতে নামতে বলল, না না নেব না নেব না, ছাড় আমাকে ছাড় শিগগির।

কল্যাণও মহা বিরক্ত হয়ে একবার সারদার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে অমলের দিকে ভ্রূকুটি করে অর্থপূর্ণ ভাবে তাকালে। মানে, এ আবার কি উৎপাত? একে প্রশ্রয়ই বা দেওয়া কেন, সহ্য করাই বা কেন?

অমল কল্যাণেরই সমবয়সী ও সহপাঠী, মামাবাড়ি থেকে ঐ স্কুলে পড়ে, কল্যাণের কাছে সে ভারী লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করল। সঙ্গে সঙ্গে রাগও হ'ল তার অত্যন্ত। মুখ ভেংচিয়ে, বলল, 'কুমড়ো ফুল নিবি? কাজের সময় সোহাগ দেখাতে এসেছেন কাণী পেত্নী কোথাকার? আস্পর্ধা দেখ ঐ নোংরা কাপড় চোপড় নিয়ে পিণ্টুকে আবার কোলে নিতে চায়।

সারদার এক চোখ দিয়ে আগুণ বেরতে লাগল। 'কি, কি বললি? অমল আরও জোরে তার কথার পুনরাবৃত্তি করল, কাণা পেত্নী কাণা পেত্নী আরও বলব, হাজারবার বলব, কেন ভয় করি নাকি তোর?'

সারদা দাঁত কড়মড় করতে করতে যত অশ্লীল গালাগাল দিতে লাগল ছেলেরাও তত ক্ষেপাতে লাগল। এয়ারোপ্লেন তৈরির কথা আর মনে রইল না, তারা নতুন খেলা পেয়েছে।

অমলদের মা ইন্দিরা কলসী নিয়ে, জল ভরতে যাচ্ছিল। চেঁচামেচি শুনে এ দিকে এসে দাঁড়াল। 'কি হয়েছে কি?'

সারদা এসে নালিশ করবার সঙ্গে সঙ্গে অমলও পাল্টা নালিশ করল।

সারদার গালাগালগুলি ইন্দিরার কানে গিয়াছিল। মুখ ভার করে বলল, 'তা একটুও তো মিথ্যা বলে নি বাছা, কাণাকে কাণা বলেছে, কুৎসিতকে কুৎসিত। তা বলে অমন দুধের ছেলেকে তুমি শাপমন্যিাই বা করবে কেন? অত্যন্ত আপন মনে করি কিনা তোমাকে তাই আমার ছেলেকে গাল, না দিলে আর কাকে দেবে। ছোট লোককে আস্কারা দিতে নেই।'

পিণ্টুর ঠাকুরমা শুনে আরও উগ্রমূর্তি হয়ে উঠলেন, বললেন 'ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার কপালে, তুই নিজের হাতে ওদের ধরেছিস আর তুই নিজেই ওদের অমন শাপমন্যি করলি? ওপরে কি ভগবান নেই? জিব খসে পড়বে না তোর?'

সারদা তবু প্রতিবাদ করল, 'শুধু কি আমারই দোষ দেখলে তোমরা?'

'তবে আর কার দোষ? না হয় এক কথা বলেইছে। অমন সোনার চাঁদ দুধের বাছাদের সাথে তোর মত বুড়ো মাগীর তুলনা?'

সমস্ত দয়া দাক্ষিণ্য এতদিনের স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধ কোথায় উবে গেছে। কোন চিহ্ন মাত্র নেই। সারদা আস্তে আস্তে সরে এলো। সেই ওদের ধরেছে, তার ঐ নোংরা হাত দিয়েই এই সব সুন্দর ছেলেমেয়েরা বেরিয়েছে, তার কোলে ওঠে সারদার কুৎসিত মুখই সকলের প্রথমে দেখেছে কিন্তু আজ সে ওদের কেউ নয়, কোন সম্বন্ধ নেই কারো সঙ্গে, সে কেবল কাণা পেত্নী।

অবশ্য কথাটা ঠিকই; ছেলে বেলায় বসন্ত উঠে তার একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায়। শুধু চোখই নয়, তার মুখের সর্বত্র বসন্ত তার বীভৎস ছাপ রেখে গেছে। কিন্তু এতকাল একথা কার মনে ছিল, সে নিজেও তো একেবারে ভুলে গিয়েছিল। তার যে একটা চোখ নেই, সে যে দেখতে কুৎসিত একথা তো এতদিন কারো চোখেও পড়েনি, মনেও পড়েনি। তারও যে রূপ থাকা প্রয়োজন একথা সারদারই কি কোনদিন মনে হয়েছে। সে শুধু জেনেছে যে, সে দাই, গাঁয়ের সমস্ত ছেলেমেয়ে

দ মা, তারা সকলেই তার, অন্য সকলেও তার গুণে তার সুন্দর স্বভাবের জন্য মুগ্ধ হয়ে রয়েছে, তার দেহের দিকে তাকাবার কারো অবকাশই হয়নি।

অতি শৈশবে সারদার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তার স্বামী জলে ডুবে মারা যায় ; আর সে তার মায়ের কাছে ফিরে আসে। কিছুদিন পরে এল মারাত্মক বসন্ত চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে গেল তার চোখে মুখে। কয়েক বৎসর পরে এল আরেক বসন্ত, সে আরও মারাত্মক। এই কুৎসিত লক্ষ্মীহীন মুখেও যৌবন তার হাত বুলাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সারদার মা ছিল অত্যন্ত জাঁদরেল মেয়ে। বাঘের মত সে সর্বদা পাহারায় রইল। সে বুঝেছিল বসন্তের কুৎসিত দাগ কেউ মুছতে পারবে না, কিন্তু আর যেন কেউ কোন রকম দাগ রেখে যেতে না পারে, তবু জগৎ নামে একটা ছোকড়া এসেছিল, বেড়া কেটে ঘরে ঢুকেছিল রাত্রে, শুনেছিল সারদার মা বাড়িতে নেই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সারদার মা সেদিন ঘরেই ছিল। টের পেয়ে জগতের এক কাণ কেটে রেখেছিল কাঁচি দিয়ে। সারদার দুঃখ হয়েছিল খুব, কিন্তু হাসি পেয়েছিল তার চেয়েও বেশী। এর পর থেকে কোন পুরুষের কথা মনে হ'লেই কানকাটা জগতের মূর্তি তার চোখের সামনে ভেসে উঠত, আর কিছুতেই হাসি চাপতে পারত না সে। এমনি ক'রে সমস্ত যৌবনকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল সারদা।

আজ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে, ক্ষোভের সঙ্গে তার মনে পড়ল—তা যদি সে না দিত, গাঁয়ের সমস্ত ছেলের মা না হ'য়ে যদি একটি ছেলেরও মা হ'তে পারত সে, এমন দুর্দশা তার হ'ত না। তার পেটের ছেলে এমন গাল তাকে দিতে পারত না। আজ সমস্ত পৃথিবীতে নিজেকে অত্যন্ত নিঃসহায়, একাকী মনে হ'তে লাগল। তার কেউ নেই, কেউ নেই সংসারে।

ব্রজবল্লভ কোত্থেকে আসছিল হন্ হন্ করে। সারদার জংলা ভিটার নীচ দিয়েই পথ। হঠাৎ তাকে ও-ভাবে সবেদা গাছটার নীচে বসে থাকতে দেখে ব্রজবল্লভ চমকে উঠল। এত করুণ মুহ্যমান্ অবস্থায় সে আর তাকে দেখেনি। কাছে এসে ব্রজবল্লভ জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে, সারদা কাঁদছ কেন? সারদা শান্তভাবে বলল, 'কিছুই হয়নি রাঙাঠাকুর।'

'আমার কাছে কিছু গোপন ক'র না সারদা সব খুলে বল।'

সারদা চোখ তুলতে ব্রজবল্লভের আরক্ত সুন্দর ঠোঁট দুটি তার চোখে পড়ল। সারদা চোখ নামাল।

ব্রজবল্লভ গোঁসাইকে সারদা চেনে। সমস্ত মেয়েমানুষের সঙ্গেই তার রসিকতার সম্পর্ক, মেয়েমানুষ যেন রসিকতার জন্যই। সারদাকেও এই রসিকতার ছোঁয়াচ থেকে বাদ দিতে চায় না, কিন্তু সারদা তার ছেলেমেয়েদের যত কাছে টেনে নেয়, ব্রজবল্লভ তত দূরে দূরে রাখে, যেমন অন্য সবাই করে। চেহারা ব্রজবল্লভের সুন্দর, চার-পাঁচটি সন্তানের বাপ হ'লেও বয়স তার অনেক কম মনে হয়, তবু পাড়া-সম্পর্কে কোন বউদিই তার রসিকতায় কিছুমাত্র সায় দেয় না, কারণ ব্রজবল্লভ বড় সুলভ, বড় স্থূল। গায়ে-পড়া তার রসিকতা। কথার আড়াল রেখে কথা বলতে জানে না সে।

কিন্তু আজ সারদার কেউ নেই। গাঁয়ের কোন ছেলেমেয়েই তার নয়। যে-কোন লোকের [illegible]মাত্র মনোযোগ, এমনকি মনোযোগের ছলনাও তার কাছে লোভনীয়। চোখ তুলে সারদ বলল, 'সব খুলেই বলব, আসুন রাঙাঠাকুর?

ভিটের অর্ধেকের বেশী নানারকম আগাছার জঙ্গল লোকে বলে সারদার অনেক গাছগাছরা এগুলির মধ্যে আছে বলেই সে এ জঙ্গল সযত্নে পুষছে। বাকি যেটুকুতে সারদার ঘর আর উঠান, সেটুকু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দু-একটা তরি-তরকারীর গাছ, কি ফুলের গাছ ছাড়া আর কিছু সেখানে নেই ঘরের মেঝে আর দাওয়াটুকু পরিষ্কার ক'রে গোবরমাটি দিয়ে নিকান। ব্রজবল্লভ বেশ তৃপ্তিই বোধ করল। একটা থাম হেলান দিয়ে মাটিতেই ব্রজবল্লভ বসতে যাচ্ছিল। সারদা তাড়াতাড়ি একখানা আসন এনে দিল। ব্রজবল্লভ আশ্চর্য হ'য়ে বলল, 'ব[illegible] আসন কোথায় পেলে সারদা?'

সারদা ম্লান হেসে বলল, 'আপনারা থাকতে আমার কিছুর অভাব আছে?' তারপর সারদা সমস্তই আনুপূ[illegible] বলল, বলতে বলতে তার কানা চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড় লাগল, ব্রজবল্লভ কিছুক্ষণ অভিভূতের মত থেকে বলল, 'এ বাঁদর হয়েছে অমল, আচ্ছা, দাঁড়াও বাড়ি গিয়ে আমি আর [illegible] আস্ত রাখছিনে।'

কথায় কোনরকম ক্রোধের উত্তাপ নেই ব্রজবল্লভের। সা বুঝতে পারল, ব্রজবল্লভের সহানুভূতি যতই আন্তরিক হো ছেলেকে সে কিছুই বলবে না। শাসনের তার অভ্যাসও [illegible] ক্ষমতাও নেই। তবু তার সহানুভূতিটুকু ভাল লাগল সার বলল, 'না কিছু বলবেন না অমলকে, ছেলেমানুষ—'

পথে আসতে আসতে সারদার করুণ মুখের কথা বার [illegible] ক'রে মনে পড়তে লাগল ব্রজবল্লভের, এমন হতাশ বেদনার্ত [illegible] সে যেন আর দেখেনি। কুৎসিত মুখেই কি কারুণ্য সবচে বেশী করে ফোটে?

ব্রজবল্লভের পেশা গুরুগিরি। পিতা-পিতামহর আ থেকে কয়েকশ' ঘর শিষ্য বিভিন্ন জেলায় ছড়ান রয়েছে। কি পূর্বের মত প্রভাব-প্রতিপত্তি আর নেই। নতুন শিষ্য [illegible] জোটে নি, পুরান শিষ্যদের ভক্তির বহর আর প্রণামীর ট ক্রমশ হ্রাস হ'য়ে আসে। তবু বছরে দু'-একবার ব্রজবল্লভ বের[illegible] শিষ্যমহলে; বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ক'রে তারপর প্রণা কুড়িয়ে এনে ঘরে এসে বসে কয়েক মাসের জন্য। যতদিন বাড়ি থাকতে হয়, ব্রজবল্লভের সময় কাটতে চায় না। নিজের পছন্দ[illegible] রসের ব্যাখ্যা নিয়ে শিষ্যমহলেই সে থাকে ভাল। এখানে [illegible] আসর যাপনের কিছু নেই। সংসারীর ভার মা আর স্ত্রীর উপ গল্প-গুজবেই সময় কাটাতে চায় সে পাড়ার মেয়ে মহ[illegible] কিন্তু ব্রজবল্লভের যারা প্রতিবেশী, দারিদ্র্য আর রোগ তা নিত্য সঙ্গী। রসের চেয়ে চোখের জলের স্রোত তাদের সংস বেশী বইতে থাকে। এতদিন ব্রজবল্লভ সুন্দরের সন্ধানে ফিরে আজ দেখল অ-সুন্দরের রূপ নেই, কিন্তু স্বরূপ আছে, আরও স্পষ্ট, আরও উগ্র।

একদিন ব্রজবল্লভ এসে সারদাকে কুব্জার উপা[illegible] শোনাল। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের স্পর্শে কুব্জার কুব্জতা নিমেষে [illegible] হয়েছিল।

'তাই বলে তুমি কি কেষ্ট হ'তে চাও নাকি রাঙাঠাকুর?'

সারদার এই ব্যঙ্গ ব্রজবল্লভকে আরও উন্মত্ত ক'রে তুলল। ব্রজবল্লভ জানে, সে ভালবাসে না সারদাকে। এ-তার অভিনবত্বের আসক্তি। ভালোবাসার চেয়ে লালসা আরও শক্তিশালী, আরও নির্বিচার, নির্মম।

সারদা এক মুহূর্ত ব্রজবল্লভের দিকে তাকিয়ে রইল; তারপর বলল, 'রাঙাঠাকুরের মত সুন্দর না হয় নাই হলাম, তাই বলে অত ঠাট্টা করেন কেন রাঙাঠাকুর?'

ব্রজবল্লভও সারদার দিকে তাকাল। কামনার উগ্রতাও কি হাসিত মুখে সবচেয়ে বেশী ক'রে ফোটে? ব্রজবল্লভ আস্তে আস্তে বলল, 'না ঠাট্টা নয়।'

এই নিম্ন স্বরের কি আলাদা কোন অর্থ আছে? কথাটা সারদার মনে যত খোঁচা দিতে লাগল, তত তার সেই আগাছার জঙ্গলের মধ্যে কাঁটার খোঁচা খেতে খেতে কি একটা গাছড়ার অনুসন্ধান ক'রে ফিরতে লাগল।

সুন্দরের মত অ-সুন্দরেরও কি একটা আকর্ষণী শক্তি আছে? বিপরীত শক্তির মত অ-সুন্দর কি আরও বেশী আকর্ষণ করে সুন্দরকে?

ইন্দিরার শরীর প্রায়ই ভাল যায় না। চারটি সন্তান হয়েছে ইন্দিরার কিন্তু প্রতিবারেই প্রথম থেকে শরীর তার এমনি বিকল হয়ে পড়ে। অনিয়মিত অসহ্য বেদনায় মাঝে মাঝে প্রায়ই তাকে শুয়ে থাকতে হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পিন্টুর ঠাকুরমার বিরক্তির অবধি নেই। এই বুড়োবয়সে তাঁকেই এ অবস্থায় সংসারী কাজ-কর্ম দেখতে হয়। প্রথমে পৌত্র মুখ দর্শনের যেমনই আগ্রহ ছিল, এখন তেমনি প্রতি বৎসর মা ষষ্ঠীর কাছে প্রার্থনা করছেন, 'মা আর না, আর না।' ফলে কনিষ্ঠা নাতনির নাম হয়েছে আন্না। ব্রজবল্লভ তাকে আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত ক'রে মেয়ের নাম রেখেছে ইতি। কিন্তু তবুও এ বৎসর পুনশ্চের আবির্ভাব সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। ইন্দিরার ওষুধ দেওয়ার জন্য ব্রজবল্লভকে প্রায়ই সারদার বাড়িতে যেতে হয়।

সেদিন ইন্দিরার অবস্থা আরও বেশী নরম হ'য়ে পড়ল। প্রসব আসন্ন বলেই মনে হ'ল। ব্রজবল্লভকে ছুটতে হ'ল সারদার কাছে।

সব শুনে সারদা বলল, 'এত ব্যস্ত কেন ঠাকুর, দেরি আছে। পুরান পোয়াতি ভয় কি?'

ব্রজবল্লভ উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল, 'আহা, ভারি কষ্ট পাচ্ছে, তুমি একবার দেখে এস।'

সারদার চোখ ঈর্ষায় জ্বলে উঠল, তীক্ষ্ণ একটু হেসে বলল, ইস্, 'ভারি যে দরদ, ঐ সময় কষ্ট মেয়েমানুষে পায়ই। আমার কষ্টের সময় কি রাঙাঠাকুর দেখতে আসবেন?'

ব্রজবল্লভের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল, 'তার মানে?'

'সত্যি বলছ রাঙাঠাকুর, মানে মোটেই বুঝতে পারছ না তুমি?'

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। তারপর ব্রজবল্লভ বলল, 'ছিঃ ছিঃ, মুখ দেখাব কেমন করে, মুখ দেখাব কেমন করে সারদা? তোমার তো অনেক ওষুধ-বিষুধ, গাছগাছড়া জানা আছে—'

সারদার চোখ জ্বলতে লাগল, 'তা আছে, সে সব গাছড়া রাঙাঠাকুরণের জন্য, নিয়ে যাও তুলে দিচ্ছি।'

'তুমি বুঝতে পারছ না সারদা। ক'দিন পরে কি আর মুখ দেখাবার জো থাকবে? আর রেখে তোমার লাভই বা হবে কি? শুধু কেলেঙ্কারী।'

'হোক্ কেলেঙ্কারী, আমি ভয় করিনে।'

ব্রজবল্লভ আরও অনুনয়ের সুরে বলল, 'ভেবে দেখ সারদা কি লাভ হবে রেখে?'

সারদা যেন উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে, বলল, 'অনেক লাভ, সে আমাকে কোনদিন কাণা পেত্নী বলতে পারবে না, আমার কোলে আসতে কোনদিন তার ঘেন্না হবে না।'

ব্রজবল্লভ শান্তভাবে যুক্তির অবতারণা করল, যেন যুক্তি দিয়েই তাকে পথে আনা যাবে।

'তার কোন মানে নেই সারদা, কোলে কি সব দিন ছেলেকে রাখা যায়, তাছাড়া, আশেপাশের সুন্দর মুখ যখন সে দেখবে, তখন কি সে বুঝতে পারবে না, তুমি কুৎসিত, তখন কি সে ঘৃণা করবে না তোমাকে? তা কি তুমি তখন সহ্য করতে পারবে?'

সারদা চমকে উঠল। ভবিষ্যতের সেই দুঃখকর যন্ত্রণার কল্পনা এখনই যেন তার কাছে অত্যন্ত অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। বলল, 'মিথ্যা আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ঠাকুর। আমার পেটের ছেলে আমাকে ঘেন্না করবে, আর আমি তা সহ্য করব? তার ব্যবস্থা আমি আগেই করে রাখব না? আমার এক চোখ আছে, তারও এক চোখ থাকবে না। আমাকে ছাড়া সে এক পাও চলতে পারবে না। চিরকাল তাকে আমার কাছেই থাকতে হবে। সে জানবে মেয়েমানুষ এই রকমই হয়। সব মেয়েমানুষের রূপই আমার মত। হওয়ামাত্র তার দু' চোখই আমি কানা করে দেব, বুঝলে?' বলতে বলতে সারদার তর্জনী দুটো এগিয়ে এল।

ব্রজবল্লভ শিউরে উঠল এবং সভয়ে তাড়াতাড়ি দু' পা পিছিয়ে দাঁড়াল, সর্বনাশ, সারদার আঙুল কি তার চোখে এসেই বিঁধবে নাকি?

২২

চণ্ডীর মন্দিরে পূজা দিয়া রাজলক্ষ্মী বাহির হইতে ছিল।

মন্দিরের পাশ দিয়া গ্রাম্য নদী বহিয়া চলিয়াছে, ওপারে দেখা যায় খানিক দূর মাঠ, তাহাতে নানা রকম সাময়িক ফসল উৎপন্ন হয়। মাঝে মাঝে দুই একটা বড় গাছ গায়ের তলায় ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নদীর বক্ষ হইতে সরু পথটা সবুজ মাঠের বুকে আঁকিয়া বাঁকিয়া কোন্ দূরান্তরে গ্রামের বুকে মিশিয়া গেছে কে জানে। এ পারে চণ্ডীর মন্দিরে প্রতিদিন সকালে দুপুরে বৈকালে রাত্রে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর বাজে, সে বাজনা নদীবুকের উপর দিয়া ওপারে ভাসিয়া যায়।

রাজলক্ষ্মী মন্দিরের বারাণ্ডায় আসিয়া একবার শ্রান্ত চোখ তুলিয়া ওপারের দিকে চাহিল।

শরতের মাঠ সোনার ফসলে ভরিয়া উঠিয়াছে, নদীর, তীরে বামদিকে দেখা যায় শুভ্র কাশফুলে খানিকদূর ভরিয়া গেছে। নদীর উপর দিয়া শান্ত বাতাস বহিয়া আসিয়া ধানেরগুচ্ছ ও কাশফুলে দোলা দিয়া যাইতেছে।

মন্দিরের পাশে কয়েকটি শিউলী ফুলের গাছে অজস্র কুঁড়ি ধরিয়াছে, সন্ধ্যায় এইগুলি ফুটিয়া উঠিবে—সারারাত গন্ধ বিকীর্ণ করিয়া প্রভাতে ঝরিয়া তলায় পড়িবে, ছেলেমেয়েরা আঁচল ভরিয়া কুড়াইবে। একদিন রাজলক্ষ্মীও প্রতি প্রভাতে এখানে আসিয়া আঁচল ভরিয়া ফুল কুড়াইত—সেই কুড়ানো ফুলের বোঁটায় কাপড় রঙাইয়া যেদিন সেই কাপড় পরিত, সেদিন কত আনন্দই না হইত। সেদিন আজ নাই, কবে আসিল কবে ফুরাইয়া গেল, কে জানে।

ওই পাশে ওই যে গন্ধরাজ, টগর, কলকে প্রভৃতি ফুলের গাছ-গুলি দেখা যাইতেছে, রাজলক্ষ্মী ওই সব ফুল সংগ্রহ করিয়া মালা ...াথিত, সে মালা প্রতিদিন সে মন্দিরে দিয়া যাইত। কোনদিন সুমন্ত আসিয়া পড়িলে নিষ্কৃতি ছিল না, সুমন্ত দেবতার মালা কাড়িয়া লইয়া নিজের গলায় দুলাইত। রাজলক্ষ্মী ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিত—ঠাকুরের জন্য মালা নাকি মানুষের পরিতে নাই, উহাতে অকল্যাণ হয়। সুমন্ত হাসিত, বলিত—"অকল্যাণ যদি হয় হোক না—তাতে আমার কিছুই আসবে যাবে না। কিন্তু সত্যি করে বল দেখি লক্ষ্মী, এ মালা আমার গলায় কি রকম মানিয়েছে? পাথরের ঠাকুরের গলায় পরালে সত্যি কি এমন সুন্দর দেখাতো—বল?"

রাজলক্ষ্মী মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত।

মানুষের গলায় ফুলের মালা সত্যই যত সুন্দর দেখায় পাথরের ঠাকুরের গলায় তেমন দেখায় না। আজ সেই কথাই রাজলক্ষ্মীর মনে হইতেছিল।

দীর্ঘকাল পরে সে আবার তাহার গ্রামে ফিরিয়াছে। সে-বার আসিয়াছিল বর্ষার সময়, মাত্র দুই একদিন থাকিয়াই চলিয়া গিয়াছিল—আবার দেড় বৎসর পরে পিতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া রাজলক্ষ্মী কাশী হইতে আসিয়াছে, এখন সে কাশীতেই থাকে।

স্বামীর অসীম সম্পত্তি সে পাইয়াছে।

জগন্নাথ মিত্রের একটি বিকলাঙ্গ পুত্র এবং একটি কন্যাকে লইয়া বর্তমানে রাজলক্ষ্মীর সংসার। দেড় বৎসর পূর্বে সে কলিকাতার বাড়ি ভাড়া দিয়া পুত্রকন্যাকে লইয়া কাশীর বাড়িতে গিয়া বাস করিতেছে।

রামবসুর অত্যন্ত অসুখ। গ্রাম ছাড়িয়া তিনি কিছুতেই কন্যার নিকটে গিয়া থাকিতে পারেন নাই। কদাচিৎ গিয়া দু'পাঁচদিন থাকিয়া চলিয়া আসেন। এবারে রাজলক্ষ্মী ঠিক করিয়া আসিয়াছে পিতাকে কতকটা সুস্থ করিয়া তাঁহাকে সে কাশীতে নিজের কাছে লইয়া গিয়া রাখিবে, আর এখানে আসিতে দিবে না। এখানকার বাড়ি বাগান ও জমিজমার ব্যবস্থা সে করিয়া যাইবে—যাহার জন্য পিতাকে আবার দুদিন বাদে না আসিতে হয়।

দীর্ঘ সাত আট বৎসর পরে সে পূজা দিতে মন্দিরে আসিয়াছে এ কয়দিন পিতার অসুখের জন্য এদিকে আসিতে পারে নাই, আজ তিনি কতকটা ভালো আছেন।

পুরোহিত পূজা করিয়া গিয়াছেন অনেকক্ষণ, রাজলক্ষ্মী একাই আহ্নিক করিতেছিল।

বেলা বোধ হয় একটা দেড়টা হইবে—আকাশ পানে তাকাইয়া তাহাই মনে হয়।

রাজলক্ষ্মী অন্যমনস্কভাবে গাছগুলার পানে তাকাইয়াছিল—অতীতের কথা—যাহা সে প্রাণপণে এড়াইয়া চলিতে চায়, আজ সেই বাল্যস্মৃতিই মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার নিজেরই অজ্ঞাতে।

ওপার হইতে ডিঙি বাহিয়া একজন লোক এপারে আসিতেছিল। তীরবেগে স্রোত ভেদ করিয়া ডিঙি এপারে ছুটিতেছিল। রাজলক্ষ্মী বিস্মিত চোখে ডিঙিটার পানে চাহিয়াছিল; নিকটে আসিতে আরোহীর পানে চাহিয়া সে স্তম্ভিত ও আড়ষ্ট হইয়া গেল।

ডিঙি আসিয়া থামিতেই সুমন্ত এক লাফ দিয়া তীরে উঠিয়া পড়িল। ডিঙি বাঁধিয়া উঠিতে উঠিতে বারাণ্ডায় দণ্ডায়মানা রাজলক্ষ্মীর পানে তাকাইয়া সে হাসিল, নিকটে আসিয়া বলিল, "দূর হতে দেখে চিনতে পারিনি, যদিও দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা পরিচিত বলেই ঠেকছিল। তারপর, কবে আসা হয়েছে রাজলক্ষ্মী?"

চিরাচরিত ভালো মন্দের প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন।

রাজলক্ষ্মী উত্তর দিল, "এসেছি আজ তিনদিন—আর এই তিন দিনই তো রোগীর বিছানা হতে বেমালুম গা ঢাকা দিয়েছো সু-দা, অথচ আমি আসার আগে পর্যন্ত তুমিই রোগীকে দিনরাত সামলেছো—আমায় টেলিগ্রাফ করেছো। আশ্চর্য মানুষ যা হোক— তিনদিন ছিলে কোথায় শুনি?"

সুমন্ত বলিল, "সে কৈফিয়ৎ দেওয়ার কোন আবশ্যক হবে কি একটা কথা শুধু মনে রেখো রাজলক্ষ্মী, কৈফিয়ৎ দেওয়া নেওয়ার সময় আমরা পার হয়ে এসেছি।"

রাজলক্ষ্মীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল—

এক মুহূর্ত থামিয়া বলিল, "হ্যাঁ একেবারেই নিষ্প্রয়োজন তুমি যা ইচ্ছা করেছো, বরাবর তাই করে এসেছো সু-দা, কৈফিয়ৎ কোনদিন কাউকে দাও নি, হয়তো দেবেও না, তাও জানি—"

সুমন্ত বলিল, "হয়তো নয় রাজলক্ষ্মী, নিশ্চয়ই দেব না

দিতে পারতুম একদিন—আর দিয়েও ছিলুম, কিন্তু সেদিন এখন আর নেই কি না—"

বলিতে বলিতে সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল,—ছোটবেলার মতই প্রাণখোলা হাসি।

রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে কেবল তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

স্কন্ধের গামছাখানা দিয়া বারাণ্ডার ধারটা ঝাড়িয়া লইয়া সেখানে বসিয়া পড়িয়া সুমন্ত বলিল, "একটু বসলুম,—বাপ্‌সে কি রোদ, তার ওপর লগি ঠেলে ওপার হতে এ পারে আসতে একেবারে প্রাণান্ত হয়ে গেছে। হাত দুখানার পরকাল প্রায় ঝরঝরে—দেখ একবার—"

সে হাত দুখানা রাজলক্ষ্মীর সামনে বিস্তৃত করিয়া দিল, রাজলক্ষ্মী দেখিল, হাত দুখানা টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

সুমন্ত বলিল, "তোমরা সহুরে লোক, কলমধরা হাতকেই প্রশংসা কর, কিন্তু আমরা নাকি গেঁয়ো লোক, তাই কুড়াল দিয়ে কাঠ কাটি, কোদাল দিয়ে মাটি কোপাই, আবার দাঁড়ও বাই।"

রাজলক্ষ্মী বলিল, "আবার রোগীর সেবাও কর—"

সুমন্ত হাসিল, বলিল, "তা কতকটা করতে হয় বই কি—বিশেষ যখন ঘাড়ে এসে চাপে দৈত্যের মতই। রাগ কোরনা রাজলক্ষ্মী, এই যেমন তোমার বাবা চিরটাকাল শত্রুতা করে এসেছেন। পারলে বোধ হয় বুকে ছুরি বসাতেও ছাড়তেন না; সামান্য একটা গরু নিয়ে, গাছের ফল নিয়ে চিরটাকাল হাড় জ্বালিয়ে এসেছেন, বাড়ি বয়ে জুতো লাঠি-পেটা করতে এসেছেন—অথচ এমন অসময়ে কি না কেউ দেখতে রইলো না—আমাকেই সেবা করতে হল—"

বাধা দিয়া রাজলক্ষ্মী বলিল, "আরও একবার যখন গাছ পড়েছিল তখন নিজের জীবন বিপন্ন করে তুমিই তো তাঁকে বাঁচিয়েছিলে সু-দা—।"

সুমন্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "সে কথা দেখছি আজও তুমি মনে করে আছো—। ও কাজ কোরোনা রাজলক্ষ্মী, ভুলে যেয়ো। তোমার বাবা দুদিন না যেতে সেকথা ভুলে গেছলেন, আমি কে—কেমন রইলুম তা জানবার জন্য একটিবার এলেন না, মুখের কথাটাও জিজ্ঞাসা করলেন না। দুদিন না যেতে দেখলুম আবার যথাপূর্বং তথা পরং, অর্থাৎ কি না কথায় কথায় বাড়ি বয়ে এসে গালাগালি ইত্যাদি, যেমন আগেও ছিল তেমনি পরেও রইলো। যাক গিয়ে, আমার কাজ তো ফুরিয়ে গেছে, তুমি এসেছো এখন যা হয় করো, আমার ছুটি।"

রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল, আস্তে আস্তে কখন যে তাহার চক্ষুর সামনে সব ঝাপসা হইয়া আসিয়াছিল তাহা সে নিজেই জানিতে পারে নাই।

একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া হাই তুলিয়া সুমন্ত বলিল, "যাক, এখন ওঠা যাক, যা হোক দুটো এখনও সিদ্ধ করতে হবে, স্নান করতে হবে কি না। আরাম করে চার দণ্ড বিশ্রাম করারও সময় নেই তো, ঘাড়ে এক জোয়াল লাগানো আছে, এক মিনিট বসবার দাঁড়াবার জো নেই। দিবাদাও এখানে নেই কি না, নিজেরই সব করতে হবে—"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল—।

রাজলক্ষ্মী আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "দিবাদা এখানে নেই, নিজেই তো রাঁধবে সু-দা, তার চেয়ে এখান হতে চট করে ডুবটা দিয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ি চল না কেন—ভাতটা না হয় ওখানেই খাবে—"

হাসিমুখে সুমন্ত বলিল, "তোমার মুখের ভাত তো?"

রাজলক্ষ্মী বলিল, "হলই বা। আমি রেঁধে রেখে এসেছি পূজো দিতে, তুমি এখনই খেতে পাবে এখন।"

সুমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কাল একাদশী গেছে না?"

রাজলক্ষ্মী বলিল, "গেছে, তাতে কি?"

সুমন্ত বলিল, "আজ দ্বাদশীতে নিজের মুখের অন্ন আমার ধরে দিয়ে স্বর্গে যাওয়ার পথে পা বাড়াবে, অতটা পুণ্য আমি তোমায় করতে দেব না রাজলক্ষ্মী, একথাটা তুমি বেশ জেনে রেখো। পাগলামী করো না—বাড়ি যাও বলছি—"

সে নামিয়া গেল—

দুই পা অগ্রসর হইয়া গিয়া আবার সে ফিরিল—বলিল, "আজ খাওয়াতে পারলে না বলে দুঃখ করো না, বরং নেমন্তন্ন করে রেখে যাও, তোমার কাশীর বাড়িতে গিয়ে না হয় একদিন নিরামিশ ভাত তরকারী পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে আসব।"

একটু হাসিয়া সে চলিয়া গেল—।

রাজলক্ষ্মী খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, নিঃশব্দে চোখের অশ্রুধারা মুছিয়া ফেলিয়া আস্তে আস্তে নামিল; মন্দিরের সোপানে মাথা রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে একবার মাত্র বলিল "দেবতা, তুমিই সাক্ষী—"

কিসের সাক্ষী তাহা সেই জানে, আর জানেন অন্তর্যামী দেবতা।

২৩

সদরে নালিশ ঠুকিয়া দিয়া আসিয়া মহে[...]
—সগর্বে বলিলেন, "এইবার বাছাধন জব্দ, অ[...]
হবে না, একেবারে জোঁকের মুখে নুন পড়ে[...]

পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া গেল মহেশ[...]
নালিশ করিয়া আসিয়াছেন।

সুমন্তের কানেও কথাটা পোঁছাই[...]
হাঁফাইতে আসিয়া এ খবর দিল—।

সুমন্ত মহাকলরব জুড়িয়া দিল—"[...]
দিবাদা, অমনি বলে এসো, ভোলা, রঘু[...]
দেয়, আজ রাত ভোর এখানে কীর্তন গাইব[...]
বধ—।"

মহিষাসুর বধের কীর্তন—

কথাটা নেহাৎ অসমীচিন হইলেও[...]
অসারত্ব প্রতিপন্ন করিবার অবস্থা দিবাক[...]
কাতর হইয়া সে বলিল, "পাগলামি ছেড়ে দা[...]
সবসময়ে চলে না, একটু মানুষের মতো ভাব[...]
শেখো। মাথার উপর নালিশ ঝুলছে আর[...]
করতে বসছো?"

সুমন্ত অবজ্ঞার সুরে বলিল, "না[...]
দিবা দা, দিব্য আরামে মাথা পেতে ঘুমাব—[...]
তো তোমার রামধন পোদ্দারও করেছিল,[...]
করেছিল, তাতে মাথার একগাছি চুল কাঁপ[...]
ছাড়ো, তুমি মোহনকে একবার খবর দাও[...]
তৈরী কর, সারা রাত আজ মাইফেল চা[...]
ডাকাব তবে আমার নাম সুমন্ত রায়, অমি[...]

দিবাকর আশ্চর্যভাবে খানিক তাহা[...]
রহিল, তাহার পর আস্তে আস্তে পাশের[...]
ডাকিতে যাইবার কোন উদ্যোগই তাহার দে[...]

সুমন্ত চেঁচাইয়া ডাকিল, "কি হ[...]

বিরক্তির সঙ্গে দিবাকর উত্তর দিল,[...]
বেলায় বাগদীপাড়া, জেলেপাড়া ঘুরতে যে[...]
অবেলায় এই বুড়ো বয়সে আর স্নান করি[...]
মরবো শেষকালে।"

"বুড়োবয়েসে সন্ধ্যে বেলায় স্নান—"

সুমন্ত খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল,[...]
করেই তো গেলে দিবাদা,—জাত জাত করে[...]
বাগদি, জেলে, মালো কি মানুষ নয়, ওদেরকে[...]
নয় তা জানো?"

দিবাকর গজ গজ করিতে করিতে উনা[...]
"না—উচিত নয়? চিরকাল বাপ ঠাকুরদা তয[...]

ওরা দূরে দূরেই রইলো, আজ ওদের ছুঁতে হবে, ঘরে উঠতে দেবে? তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করে তুলছো খোকাবাবু, যা রয় সয় তাই ভালো। হাড়ি বাগদি জেলে মালোরা ছোট জাত, ওদের সঙ্গে মেশা করা কি ভদ্দর-লোকের মানায়, না ওতে তাদের জাত জন্ম থাকে?"

—"বাপ ঠাকুরদা—বাপ ঠাকুরদা—"

"রাগ করিয়া সুমন্ত বলিল, "বাপ-ঠাকুরদা কেন—আমাদের পূর্বপুরুষেরা একদিন কাঁচামাংস খেতো, বনে জঙ্গলে বাস করতো, তীর ধনুক নিয়ে বেড়াতো, আমরাও আজ তাই করি! বাপ ঠাকুরদা তাঁদের চিরাচরিত নিয়ম পালন করে গেছেন, মন্দ জেনেও সংস্কৃতি করেননি, আমরাও তাই করব? তুমি আর পূর্বপুরুষের দোহাই দিও না দিবা দা, ওতে সত্যি আমার রাগ হয়।

দিবাকর উত্তর দিল না; সুমন্ত গোঁয়ার লোক, ইহার পর মৃত পূর্বপুরুষকে জীবন্ত নরকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে এবং

ডাকিতে চলিল, দিবাকরকে আর

দিয়া যাইতে দৃষ্টি পড়িল রাংচিতার পানে—এককোণে তুলসীতলায় রাজ- । প্রদীপ দিয়া সে গলায় আঁচলটা ক্ষণ ধরিয়া কি প্রার্থনা করিতে লাগিল

লেও সুমন্ত নড়িতে পারিল না, রাজলক্ষ্মীর পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার নিজের সমস্ত আশা ভরসা, —নিজের প্রয়োজন তাহার নাই, তবু , তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবেও। কখানা থান কাপড়ে তাহার অভাব কামনা। তাহার পানে তাকাইবার ার বার্তা লইবার অবকাশ কাহারও , সকলের সুখ-দুঃখ দেখিবে—এই ীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা।

চোখ দুইটি জ্বালা করিতেছিল, ফিরাইতে পারিল না।

উঠিল, দুইহাত বুকে কপালে পড়িল বেড়ার পাশে একটি লোক জ্ঞাসা করিল—"ওখানে দাঁড়িয়ে

বলিল, "আমি—আমি রাজলক্ষ্মী

"সু-দা? এখানে এমনভাবে

ামার কাজ আছে, আমি আজ

জন্যে তো? শুনলুম কাকা- বরদস্তী করে সর্বকিছু দখল এসেছেন।"

বয়েই গেল,—"নিজের জিনিস ক্ষপ কেউ বলতে পারে না হবে না—বরং লাভই হবে, ার কোনদিনই কোন কিছুতে হাত দিতে পারবেন না। আইনত সবই আমার বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে। আইন আদালত না করে তবু বরং বাগানের ফলটা লতাটা, পুকুরের মাছটা পাচ্ছিলেন, অন্ততপক্ষে মুখের জোরেও নিজের বলে দখল করছিলেন, এর পর তাও আর হতে পারবে না, তা তোমরা সবাই দেখো।"

সে প্রাণখোলাভাবে হাসিতে লাগিল—।

রাজলক্ষ্মীও হাসিল, বলিল, "বেশ মানুষ তুমি, চিরকাল এক সমানই কাটালে সু-দা,—ভাবনা করার দিন তোমার আর এলো না।"

হাসি থামাইয়া সুমন্ত বলিল, "তার মানে, ভাবনা করব কেন —কিসের জন্যে—কার জন্যে তাই বল। দিব্য আছি, এই চলেছি মোহনকে খবর দিতে, দলবল নিয়ে আসবে—আজ সারারাত মহিষাসুর বধ কীর্তন গাইবো জানো? খোল করতাল, কাঁসি, বাঁশি, তাতে কিছু বাদ যাবে না; দুটো কানেস্তারাও যোগাড় করে রেখেছি, কাজে লাগিয়ে দেব—।"

ভারি খুসি মনে আবার সে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, "খোল, করতাল, কাঁসি বাঁশি—আবার তার সঙ্গে দুটো কানেস্তারা,—তোমাদের সম্মিলিতকণ্ঠস্বরের সঙ্গে এতগুলো সুর তালের শব্দ যখন মিশবে বেশ বোঝা যাচ্ছে, কেবল তোমার বাড়ির লোক কেন, পাড়ার লোকেরাও আজ দুই চোখের পাতা এক করতে পারবে না।"

সুমন্ত বলিল, "তাই তো চাই, লোকে জানুক আমার ভারি আমোদ হয়েছে।"

"রাজলক্ষ্মী বলিল, "যাক—সে যা হয় পাড়ার লোক বুঝবে, কিন্তু ঐ যে কি পালাটা বললে—নামটা যেন কেমন কেমন ঠেকলো। মহিষাসুর পালা যাত্রায় হতে পারে, কীর্তনটা হবে কেমন—?"

গম্ভীর হইয়া সুমন্ত বলিল, "শুনবে—শুনবে, কাল সকালেই কেবল পাড়ায় কেন—গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনতে পাবে, সবাই স্বীকার করবে—হ্যাঁ, একখানা পালা কীর্তন শুনলুম বটে। আচ্ছা, রাত হয়ে এলো, আমি চললুম আর দাঁড়াব না।"

সে অগ্রসর হইল—একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল তখনও রাজলক্ষ্মীর সাদা কাপড়খানা দেখা যাইতেছে।

সামনের আকাশে জাগিয়েছিল শুক্লা তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদখানা, খাণিকক্ষণের জন্য আলো দিয়া সে নিভিয়া যাইবে।

সেই চাঁদের একটু পাশে ঝিকমিক করিয়া জ্বলিতেছে সান্ধ্যতারাটি,—সেই আকাশের পানে চাহিয়া সুমন্ত থমকিয়া দাঁড়াইল।

অন্তরে দোলা দিয়াছে পূর্বস্মৃতি—কোনকালে দেওয়া সেই মালার কথা। মালার ফুল শুকাইয়া গেছে, বিবর্ণ হইয়া গেছে, শুষ্ক দলগুলি ঝরিয়া পড়িয়াছে, সুতায় লাগিয়া আছে গন্ধহীন, রূপহীন বৃন্তগুলি। সুমন্ত ভাবে, এই-বা রাখিয়া ফল কি, ছিঁড়িয়া ফেলিলেই তো হয়।

ছিঁড়িয়া ফেলার নামেও হাসি পায়।

স্মৃতিতে যাহা জড়াইয়া গেছে তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলা সহজ নয়। আজ পরস্ত্রী অথবা বিধবা রাজলক্ষ্মীর চিন্তা করাও মহাপাপ, কিন্তু সেদিন এ রাজলক্ষ্মী পরস্ত্রী ছিল না,—সে ছিল কুমারী এবং সে ছিল সুমন্তের—

সুমন্ত চমকাইয়া উঠিল,—হিঃ হিঃ, সে কি ভাবিতেছে তাহার মাথা কি খারাপ হইয়া গেল?

সে হন্ হন্ করিয়া চলিল, আর আকাশের পানে চাহিল না, আর কোনও চিন্তা জোর করিয়া মনে উঠিতে দিল না।

ক্রমশ

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'অটো সাজেশন'

যাদুকর—পি সি সরকার

মনোবিজ্ঞানের এই বিভাগটি বড়ই সুন্দর। ইহাকে বাঙলায় 'স্বকল্প অভিভাবন' এবং ইংরেজীতে Self Mesmerism, Self Hypnotism বা আরও সহজ কথায় Auto Suggestion বলা হয়। ইহাতে সম্মোহক নিজেই নিজেকে আদেশ দিয়া নিজের অবাঞ্ছনীয় প্রবৃত্তি, মদ, গাঁজা প্রভৃতি নেশার অভ্যাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এই ব্যাপারে স্বীয় দৃঢ় ইচ্ছাই মূল প্রবর্তক শক্তি। ভারতীয় যাদুকরগণ, সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ এই ক্ষমতায় বলীয়ান্ হইয়া নানাবিধ অত্যাদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে। একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। একবার একজন সাধু মহারাজা রণজিৎ সিংহের সম্মুখে আসিয়া এই বিদ্যার অদ্ভুত ক্রিয়া দেখান। রাজা ইহা অবিশ্বাস করিয়াছিলেন, কাজেই তিনি নিজে এক কঠোর আত্মপরীক্ষার সম্মুখীন হন। সাধু নিজেই নিজেকে সংজ্ঞালুপ্ত করিয়া পড়িয়া থাকে, তারপর তাহার দেহ একটি কফিনের ভিতর ভর্তি করিয়া পরে একটি বড় বাক্সে বন্ধ করা হয় এবং সীলমোহর করা কফিন ও বাক্সের চারিদিকে বহু প্রহরী নিযুক্ত হয়। একদিন একদিন করিয়া ছয় সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তখন নির্দিষ্ট দিনে রাজা এবং বহু ইংরেজ ও ভারতীয় দর্শকদের সম্মুখে তাঁহাকে বাহির করা হয়। মৃতপ্রায় দেহটি বাহির করিবার পর ধীরে ধীরে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল। সাধু তখন উঠিয়া বসিয়া অবিশ্বাসী রাজাকেই সর্বপ্রথম সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজা, এখন তুমি বিশ্বাস কর?" এইটি 'সংকল্প অভিভাবন ক্রিয়া' এবং ডাক্তার ব্রেইড নিজেও সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিখ্যাত ডাক্তার ম্যাকগ্রেগর সাহেব তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক 'হিস্টোরি অব দি শিখস্' বা শিখদের ইতিহাসে ২২৭ পৃষ্ঠায় ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরে স্যার রিচার্ড বার্টন সাহেবও অনুসন্ধান করিয়া এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ডাঃ ম্যাক গ্রেগর নিজে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের দৃষ্টি ভংগীতে এই ব্যাপারের বিস্তৃত আলোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার মূলে ছিল 'সংকল্প অভিভাবন বা অটো সাজেসন। এইরূপ আরও বহু ঘটনা আছে। ফরাসী আর্মির সার্জেন মেজর ডাক্তার লাগ্রেভ সাহেব অন্তর্জাতিক কংগ্রেসে এই 'স্বকল্প অভিভাবন' সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রত্যক্ষ ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই অভ্যাস দ্বারা তিনি ইচ্ছামত যে কোন সময় এবং যতক্ষণের জন্য খুশী নিদ্রা উৎপাদন করিতে সক্ষম হন। তিনি বলেন যে, বিছানায় শুইয়া দেহটিকে এলাইয়া দিয়া আমি ঘুমের প্রতি মনসংযোগ করি এবং অল্পকাল মধ্যে ঘুমকে নিজের আয়ত্বে আনিতে সক্ষম হই। তিনি আরও বলেন যে, নিয়মিত মানসিক আদেশ দ্বারা তিনি ঘণ্টায় পাঁচ হইতে ছয়বার ঘুমাইতে ও জাগ্রত হইতে পারিতেন। বিখ্যাত মার্কিন লেখক সি জি লেলাণ্ড তাঁহার বিখ্যাত "আপনার কি দৃঢ় ইচ্ছা আছে?" পুস্তকে এ সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়াছেন। তিনি দাবী করেন এই উপায় দ্বারা তিনি স্বীয় স্মৃতিশক্তি, মেধা এবং কর্মক্ষমতা বহুগুণে বর্ধিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ নিদ্রার পূর্বে এই বিষয় লইয়া গভীর চিন্তা করিতেন এবং নিজেকে নিজেই মানসিক আদেশ দিতেন। নিজের প্রতি নিজের আদেশ বা আভ্যন্তরীন মানসিক দৃঢ় ইচ্ছা দ্বারা নানারূপ অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদন করা সম্ভবপর তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। মানুষের মনই সব—সে যাহা গভীর-ভাবে আকাঙ্ক্ষা করিবে তাহাই হইবে।

হিপ্‌নোটিজম্‌ বিদ্যার আবিষ্কর্তা ডাক্তার ব্রেইড নিজেও এই 'স্বকল্প অভিভাবন' দ্বারা কয়েকবার বিশেষ উপকার পাইয়া তাঁহার পুস্তকে (Page 45, Biographical Introduction, Waite's Edition, 'Neurypnology, or the Rationale of Nervous Sleep') এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিজের জীবন হইতে একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অবহেলার জন্য আমার বামদিকের ঘাড়, বুক ও বাম হাত কঠিন বাত রোগে আক্রান্ত হয়। এত অত্যধিক যন্ত্রণা হয় যে, আমি ক্রমাগত তিনরাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই। তৃতীয় রাত্রিতে আমার এরূপ অবস্থা হয় যে, বেদনার আধিক্যে আমি আমার হাত ও ঘাড় একভাবে পাঁচ মিনিটের বেশী রাখিতে সক্ষম ছিলাম না। আমি মাথা নাড়িতে পারি নাই, হাত একটু নাড়িতেই প্রাণান্ত কষ্ট বোধ করিতাম ও নিঃশ্বাস টানিতেও খুবই কষ্টবোধ হইতেছিল। ঠিক যেন প্লুরিসি রোগের যন্ত্রণাভোগ করিতেছিলাম। এই অবস্থায় আমি নিজেকে সম্মোহন সাহায্যে চিকিৎসা করাইব স্থির করিলাম। আমি আমার দুইজন বন্ধুর সাহায্য লইলাম, যাঁহারা আমার প্রণালী (Braid's Method of inducing Hypnosis) সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাত আছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলি যে আমি নিজেকে 'আত্মসম্মোহিত' করিতেছি এবং ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে পৌঁছিতেছি, তাঁহারা যেন উহা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং যথেষ্ট সম্মোহিত হইবার পর তাঁহারা যেন আমাকে জাগরিত করেন। বন্ধু দুইজন তাঁহাদের এই কর্তব্য সম্বন্ধে সম্মতি দিলে পর, আমি নিজেকে নিজে সম্মোহিত করিতে প্রয়াসী হই। নয় মিনিট পরে তাঁহারা আমাকে জাগাইয়া দেন এবং আমি আশ্চর্যান্বিত হই যে, আমার সমস্ত বেদনা দূর হইয়াছে ও আমি যে কোন দিকে অক্লেশে আমার ঘাড় ঘুরাইতে পারি। আমি নিজে সম্মোহন সাহায্যে যখন রোগ চিকিৎসা করিয়াছি, তখন আমার রোগীরাও এইভাবে বেদনামুক্ত হইয়া আমাকে বলিয়াছে। কিন্তু অপরের কতখানি বেদনা ছিল এবং কতখানি লাঘব হইল তদপেক্ষা উহা নিজে নিজে পরীক্ষা করিয়া বাস্তবিকই অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হই। অন্যের বেদনার কথা শুনা এবং নিজের অসহ্য বেদনা নিজে অনুভব করা নিশ্চয়ই এক হইতে পারে না। আমার নিজের বেদনা এত অসহ্য ছিল যে, তাহা অপরকে বুঝান কষ্টকর। আমি 'আত্মসম্মোহিত' হইয়া শুধু চিন্তা করিয়াছিলাম "আমি এই রোগ সারাইতে চাহি" এবং পরে জাগ্রত হইবার পর দেখি বাস্তবিকই আমার বেদনা সারিয়া গিয়াছে—কি আশ্চর্য! সেদিন সমস্ত বৈকাল আমি খুব ভাল ছিলাম, রাত্রিতে গাঢ় নিদ্রা হইয়াছিল, পরদিন প্রাতে ঐ বাতযুক্ত স্থান একটু শক্ত হইয়াছে অনুভব করিয়াছিলাম। তবে কোনরূপ বেদনা ছিল না। এক সপ্তাহকাল পরে আমি পুনরায় ঐ বেদনা একটু অনুভব করিতে থাকি বলিয়া পুনরায় নিজেকে 'আত্মসম্মোহিত' করি। ইহার পর হইতে আজ ছয় বৎসর হইল আমি আর কোন বাতের বেদনা অনুভব করি না।"

সকলের পক্ষে ডাক্তার ব্রেইডের ন্যায় মাত্র নয় মিনিট সময়ের মধ্যে আত্মসম্মোহিত করা ও নিজেকে রোগমুক্ত করা সম্ভবপর নহে। কারণ তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক খুবই বিরল—তিনি

হিপনোটিজমের আবিষ্কর্তা। পরবর্তীকালের সম্মোহক ও মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ গবেষণা দ্বারা স্থির করেন যে সম্মোহিত না করিয়াও নিজেকে নিজে ভাল করিব এইরূপ ইচ্ছা দ্বারাও নিজের রোগমুক্তি সম্ভবপর। এই ক্রিয়া বর্তমানে নবচিন্তাধারা বা 'নিউ থটস্' নামে প্রচলিত। বিখ্যাত ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানবিদ্ ডাঃ জেমস্ কোটস্ বলেন যে, নিজে নিজের রোগ সারাইবার জন্য সব সময়ে স্বকল্প অভিভাবনের প্রয়োজন নাই। তিনি 'নিউ থটস্' অর্থাৎ নিজেকে জাগ্রতাবস্থায় দৃঢ় ইচ্ছাপূর্ণ আদেশ বা মানসিক আদেশ দ্বারা চিকিৎসিত হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি নিদ্রাহীনতা (ইনসমনিয়া) রোগীদের নিদ্রোৎপাদনের নিমিত্ত শুধু 'স্বকল্প অভিভাবন' ব্যবস্থা দিয়াছেন। গাঢ় নিদ্রা না হইলে স্বাস্থ্য ভাল হয় না। এই গাঢ় নিদ্রা লাভের জন্য তিনি নিম্নলিখিত নির্দেশ দিয়াছেন।

"একটি আরামপূর্ণ স্থানে নিজের দেহকে এলাইয়া দিয়া ঘুমের কথা চিন্তা কর। শুইয়া শুইয়া নিজের চক্ষু দুইটি বন্ধ রাখ, আস্তে মৃদু মন্দভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস লও, মনকে ঘুমের চিন্তায় এক বিষয়ীভূত কর ও বাহিরের চিন্তা সমস্তই পরিত্যাগ কর। নিজে নিজেই নিজের মনকে বাঞ্ছিত কার্যের জন্য আদেশ দিতে থাক, তবেই ঘুম আপনা আপনি আসিবে ও সুখবোধ হইবে।"

আত্মিক চিকিৎসক ডাক্তার লীবোঁ ১৮৮৬ সালে এ বিষয়ে অতি চমৎকার একটি মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ব্রেইড সাহেবের "নিদ্রাকর্ষণ বিদ্যা" ও হিন্দুদের 'আত্মসমাধি' সম্বন্ধে বিশেষ অবগত ছিলেন। তিনি বলেন যে—যদি কেহ মনে মনে চিন্তা করে যে, "আমি ভাল হইব" এই একই চিন্তার উপর (বিশ্বাস ও সততার সহিত) নির্ভর করে, তবে সে রোগমুক্ত হইবেই। মেস্‌মেরিজমে একজন মানুষের অন্তর্নিহিত অদৃশ্য কোন শক্তি অপরের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে রোগমুক্ত করে। ঐ অন্তর্নিহিত সুপ্ত অদৃশ্যশক্তি প্রত্যেক জীবদেহের মধ্যেই বর্তমান। মানুষ অপর কোন সম্মোহকের সাহায্য না লইয়াও নিজে নিজের উপর ঐ শক্তি খাটাইতে পারে। 'আমি ভাল হইব' (আমি ভাল হইতেছি) এই প্রগাঢ় ইচ্ছাই উক্ত শক্তিকে কার্যকরী করিয়া তুলে। অপরাপর উপায় অপেক্ষা নিজের প্রতি নিজের আদেশ দ্বারা অধিকতর ফল পাওয়া যাইবে। ভারতীয় ইতিহাসের পাঠকবর্গকে একটি ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। দিল্লীর বাদশাহ বাবরের পুত্র হুমায়ুনের একবার খুব অসুখ হয়। ইহাতে বাবর খুব বিচলিত হইয়া পড়েন। তাহার আন্তরিক ইচ্ছা হয় যে, প্রাণাধিক পুত্র হুমায়ুন রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হউক এবং কাহাকেও যদি রোগভোগ করিতেই হয় তবে তিনি নিজেই উহা করিবেন। এইরূপ প্রবল মানসিক ইচ্ছা লইয়া তিনি একদিন হুমায়ুনের রোগ শয্যার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন "হে ঈশ্বর হুমায়ুনের রোগ আমাকে দাও ও তাহাকে রোগমুক্ত কর।" বাবরের এই দৃঢ় বিশ্বাসপূর্ণ ইচ্ছা কার্যকরী হইয়াছিল। সেইদিনই তিনি রোগাক্রান্ত হইলেন এবং পুত্র আরোগ্যলাভ করিলেন। এখানে বাবরের দৃঢ় বিশ্বাস ও ইচ্ছা (অটো সাজেশন) যে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। দৃঢ় বিশ্বাসের এইরূপ নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতার কথা আরও অনেক স্থানে পাওয়া যায়। 'বিশ্বাস' (ফেথ্) সম্বন্ধে ইতি-পূর্বেই একটি প্রবন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলাম। স্বকল্প অভিভাবন দ্বারা নানারূপ অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদন করা সম্ভবপর। এই অভ্যাসবলে আমেরিকায় সানফ্রানসিস্‌কোর একটি কলেজের যুবক এমন করিতে পারে যে, তাহার হাতে সূচ বিঁধাইয়া দিলে সে কিছুই অনুভব করে না। এক্ষেত্রে তাহাকে বাহির হইতে কেহই সম্মোহিত করে নাই। একমাত্র দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি বলেই সে ইহা করিতে সক্ষম হইয়াছে। অনুরূপ আরও কত উদাহরণ আছে। আমার ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা হইতে সুন্দর একটি উদাহরণ দিতেছি। আমি ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে তখন বি এ, চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র (বোধ হয় ১৯৩৩ সালের শীতকালে)। আমি ম্যাজিক ও সম্মোহন বিদ্যায় ঐ অঞ্চলে তখন বিশেষ পরিচিত। ম্যাজিকের খেলাই তখন বেশী দেখাইতাম এবং বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই সহকারী ছিলেন। মিস্টার × আমার অন্যতম প্রধান সহকারী। ম্যাজিকের বহু খেলায় তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। ম্যাজিকের সম্বন্ধে যাঁহাদের ধারণা আছে, তাঁহারা জানেন আমরা খেলা দেখাই একপ্রকার কৌশলে, কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা করি কত ঘুরাইয়া—কত অলৌকিক ভাবে। ম্যাজিকে কত ফাঁকি থটরীডিং, ফাঁকি মেসমেরিজম দেখাইতে হয়। আমার সহকারী × ঐগুলি লক্ষ্য করিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছেন যে, আমার সমস্ত খেলাই বোধ হয় ঐরূপ ফাঁকি মাত্র। ইহার পর আমি (কয়েকজন সমপাঠী বন্ধুর) অনুরোধে একটি আসল মেসমেরিজমের খেলা দেখাইতে উদ্যত হই। মিস্টার × জানিতেন না যে আমি তৎকালে সম্মোহিত করিতেও বিশেষ পারদর্শী। আমি কয়েকজন দর্শককে রঙ্গমঞ্চে ডাকিলাম। মিস্টার × নিজেও স্বেচ্ছায় আসিয়া বসিলেন। সম্মোহিত করিতে আরম্ভ করিলাম, সকলেই নিদ্রিত হইল। সকলের নাম ভুল করাইলাম, সকলকেই কাগজ দিয়া লুচি খাওয়ান হইল, গান করান হইল, নাচান হইল ইত্যাদি। অনেক হাস্যরসের অবতারণা করা হইল। আমি লক্ষ্য করিলাম যে মিস্টার ×ই সর্বাপেক্ষা বেশী সম্মোহিত হইয়াছেন। তখন সকলকে জাগাইয়া দিয়া কেবলমাত্র ×কে চেয়ারে রাখিলাম। দর্শকগণকে বলিলাম যে আমি এঁর হাতে এই বড় সূঁচটি বিঁধাইয়া দিতেছি, সে কষ্ট অনুভব করিবে না, তারপর আরও একটি সূঁচ বিঁধাইলাম। তৃতীয়টি বিঁধাইতে গেলে তিনি চুপিচুপি বলিলেন, আর প্রয়োজন নাই। শুনিয়া আমি অবাক! সম্মোহিত ব্যক্তি আমার সঙ্গে ঐরূপ আলাপ করেন কি করিয়া? শেষে শুনিলাম যে, × মোটেই সম্মোহিত হন নাই, তিনি আমাকে সাহায্য করিবার জন্যই মিছামিছি ঐরূপ নাচিয়াছেন ও লোকজনকে হাসাইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস অপরাপর যাহারা সম্মোহিত হইয়াছিল তাহাদের সকলকেই পূর্ব হইতে শেখান ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে উহারা প্রকৃতই সম্মোহিত হইয়াছিল। মিস্টার ×কে সূঁচ ফুটানোর কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, তিনি উহা নিজে নিজে সহ্য করিয়াছেন। তিনি মনে মনে দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলেন যে, আমার সুনাম রক্ষার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, ঐ সূঁচ ফুটানোতে তিনি মোটেই কষ্ট পাইবেন না। তাঁহার এই অটো সাজেশন বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল বলিয়া তিনি অম্লানবদনে ঐ ক্লেশ সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই দিন আমি অটো সাজেশনের একটি প্রত্যক্ষ ক্রিয়া দেখিলাম। উক্ত সহকারীর কথা আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। আমার উন্নতির জন্য তাঁহার যে দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহার প্রমাণ ঐদিন ঐ ঘটনা হইতেই পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার ধারণা ছিল যে, সম্মোহনবিদ্যাটাও ফাঁকি-বাজী। পাত্রগণ নিজেরা সহ্য করে, আর প্রদর্শক সূঁচ ফুটাইয়া থাকে; পরে আমি সম্মোহনের উচ্চতর ও উচ্চতম স্তরগুলিকে দেখাইয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ হই। ঘটনাটি নেহাৎ ব্যক্তিগত হইলেও খুবই উপভোগ্য। দৃঢ় ইচ্ছা দ্বারা যে মানুষ তাহার নিজের দেহে বোধ-রাহিত্যাবস্থা উৎপাদন করিতে পারে, এ তাহারই একটি বিশেষ পরীক্ষা মাত্র। "আমি দুঃখ পাইব না" মানসিক এই দৃঢ় ইচ্ছা ও বিশ্বাসই তাহার দেহে বোধরাহিত্যাবস্থা উৎপন্ন করিয়াছিল।

আন্তরিক বিশ্বাস লইয়া এই অটো সাজেশন অভ্যাস করিতে হয়। ইচ্ছাকে নিজের অধীন করিলে ইহা সহজলভ্য। অনেকে সামান্য দুই চারদিন অভ্যাস করিয়াই ইহার সুফল পাইবার পরীক্ষায় ব্যস্ত হন এবং ভগ্নমনোরথ হইয়া এই সাধনায় বিরত হন। তাহাতে কখনও সুফল

পাওয়া যাইবে না। দুঃখ বিনা কখনও সুখলাভ হয় না। এ বিদ্যা-শিক্ষার পথ কুসুমাকীর্ণ নহে। প্রতিদিনের নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা ইহাকে আয়ত্ত করিতে হয়। ডাক্তার পল এসিল লেভী বলেন যে, প্রতিদিন নিয়মিত প্রাতে বা সন্ধ্যায় এই অটো সাজেশনএর অভ্যাস করিতে হইবে। কারণ সেই সময়ে মন প্রশান্ত থাকে বলিয়া ঐ সময়ই এই বিদ্যাভ্যাসের প্রশস্ত সময়। এই বিদ্যা শিক্ষাকালে মনে সংশয় রাখিলে চলিবে না। ইহা সম্পূর্ণ আত্মিক ব্যাপার, কাজেই বাহ্যিক তর্ক দ্বারা ইহার মূল সূত্র আবিষ্কার করা অসম্ভব। বিখ্যাত মনো-বিজ্ঞানবিদ্ মিঃ হ্যারিসন ব্রাউনও বলেন যে, ইহা সম্পূর্ণ আত্মিক ব্যাপার। বাহ্যিক সত্তা দ্বারা বাহ্যিক বিষয়ের অনুধাবন সম্ভবপর, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বুদ্ধির ব্যাপারগুলি বোধগম্য হয়, সেইরূপ আত্মিক ব্যাপারসমূহ জানিতে হইলে মনটিকে তদ্গত করিতে হইবে। সাধারণ বিচারবুদ্ধি ও বাহ্যিক বস্তুতন্ত্রের তর্ক দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত সূক্ষ্ম মানসিক বৃত্তিসমূহের ক্রিয়া,—যাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া মানবচরিত্র গঠনে ও তাহার দৈনন্দিন কার্যকলাপে নানাভাবে প্রভাবিত করিতেছে—ইহার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ এত সহজ নহে যে সামান্য বাহ্যদৃষ্টিতে পাওয়া যাইবে। ভারতীয় আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ব্যাপারসমূহের ন্যায় আত্মিক তত্ত্বও অতিশয় গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। বর্তমানে সূক্ষ্ম্যানুসন্ধান সমিতি (Society of Psychical Investigation) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা চলিতেছে। আধ্যাত্মিক বা উচ্চতম আত্মিক শক্তিসমূহের গবেষণা লইয়া বর্তমানে অনেকেই আলোচনা করিতেছেন। কারণ একদা ভারতবর্ষ এই বিভাগে অনেকেই আলোচনা করিতেছেন। কারণ একদা ভারতবর্ষ এই বিভাগে চরম উন্নতি লাভ করিয়া পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজকে চমকিত করিয়াছিল কিন্তু চর্চার অভাবে উহা দিন দিন লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। ভারতীয় আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি তথ্য লইয়া গবেষণা করার এখনও প্রচুর বিভাগ আছে, প্রকৃত গুণীদের এদিকে মনোনিবেশ করা একান্ত কর্তব্য।

মাল্টার কাব্যসাহিত্য

(১০০০ পৃষ্ঠার পর)

মাল্টার সব বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে পড়ানো হয়। তিনি একটি মাল্টিজ সাহিত্য পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন—এই পত্রিকাটিতে তিনি অনেক গদ্য ও পদ্য লেখা লিখেছিলেন। মাল্টিজ সাহিত্যের প্রচারকল্পে অনুষ্ঠিত একটি গভর্নমেণ্ট প্রতিযোগিতায় তিনি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনার জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। অন্যান্য আধুনিক মাল্টিজ কবিদের মধ্যে জি, চেটকুটির ছন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান খুব বেশী, আর্থার ভ্যাসালোর কবিতা মধুর কল্পনা শক্তিতে সমৃদ্ধ এবং বুটিগিগের কবিতায় আধুনিক ইংরেজী কবিতার প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। আরও অনেক কবি অবশ্য আছেন, কিন্তু রচনারীতির দিক থেকে তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য খুব বেশী নেই ব'লে আমরা তাঁদের নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।

মাল্টার কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের এই আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, মাল্টিজ কবিরা সাধারণত প্রচলিত ছন্দই পছন্দ করেন এবং আধুনিক ইউরোপীয় কাব্য ধারার সঙ্গে এ'দের যথেষ্ট যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও এ'রা কেউ বিপ্লবী আধুনিক কবি নন। মাল্টিজ কবিতায় ধর্মের আধিপত্য খুব বেশী ঃ ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কবিরা কবিতা লেখেন। প্রচলিত ছন্দ ও কাব্যরীতির প্রতি আধুনিক কবিদের এই মানসিক প্রবণতা দেখে মনে হয় যে, তাঁরা মাল্টাকে এমন সব ভাল কবিতা দিতে চান যা ভবিষ্যৎ কালের দরবারে টি'কে থাকবে। ইংলণ্ড, ইটালী, ফরাসী প্রভৃতি দেশের সাহিত্যিক ঐতিহ্য খুব প্রাচীন ; এ'দের সাহিত্যে এত ভাল কবিতা আছে যে, ভবিষ্যৎ যুগে যদি এ'দের আধুনিক পরীক্ষামূলক কবিতার মৃত্যুও হয়, তবুও এ'দের সাহিত্যের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু মাল্টার সাহিত্যিক ইতিহাস সবে মাত্র সুরু হ'য়েছে—কাজেই মাল্টিজ কবিরা পরীক্ষামূলক আধুনিক কবিতার উপর ভিত্তি ক'রে তাঁদের সাহিত্য গ'ড়ে তুলতে পারেন না। তাই মাল্টিজ কবিরা কিছু পরিমাণে রক্ষণশীল। মাল্টিজ কবিতায় ধর্মমূলক বিষয়বস্তুর আধিক্যের কারণ এই যে মাল্টিজরা ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। ক্যাথলিক ধর্মে কতকগুলি বাঁধা আইন কানুন আছে, যার বিরুদ্ধে দাঁড়ান সহজ নয়—এ ধর্মে বিশ্বাসই একমাত্র পন্থা। কবিরা তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে এ ধর্মবিশ্বাসকে যাচাই করার অধিকারী নন ; বাঁধা নিয়মাবলীর মধ্যে কবির মনের যে আধ্যাত্মিক প্রতিক্রিয়া তারই ছবি পাই আমরা মাল্টিজ কবিদের ধর্মমূলক কবিতায়। এতে আধুনিক কবিদের অসুবিধা হয়ত হয়, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের বাঁধা নিয়মের মধ্যে থেকেই ইটালীয় মহাকবি দান্তে তাঁর Divina Comedia নামক মহাকাব্য এবং ইংরেজ কবি ফ্রান্সিস্ টম্সন্ তাঁর Hound of Heaven নামক প্রসিদ্ধ কবিতা রচনা ক'রেছিলেন। এই বন্ধনের মধ্য দিয়েই মাল্টিজ কবিরা হয়ত একদিন তাঁদের মুক্তির পথ খুঁজে পাবেন।

দেশ

শ্রীগিরিজাপতি সান্যাল

ঠুন্ ঠুন্—রিক্সাওয়ালা চলিয়াছে, অনশনক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ-খানির মতই জীর্ণ রিক্সাখানিকে সে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। হাপরের পর্দার মতো পাঁজরের হাড়কয়খানি উঠানামা করিতেছে, তৈলাভাবে প্রত্যেক আবর্তনেই গাড়ীর চাকা ক্যাঁচকোঁচ শব্দে আর্তনাদ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে নিশীথরাত্রের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রিক্সাওয়ালা ঘণ্টি বাজিয়া উঠিতেছে—ঠুন্ ঠুন্। উপরে বসিয়া একজন আরোহী, গভীর চিন্তামগ্ন, কালো আকাশের দিকে চাহিয়া সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতেছে—দেখিলেই বোঝা যায়, আনকোরা টাটকা প্রেমিক। রিক্সা চলিতেছে, বিরাট বিরাট বাড়িগুলি রাস্তার দুধারি সোজা চলিয়া গিয়াছে; উপরে কালো আকাশ, নীচে কালো পীচের রাস্তা গ্যাসের আলোয় সাদা, মাঝখান দিয়া রিক্সা চলিতেছে—সঙ্গে দুইজন মানুষ—একজন ছুটিতেছে পেটের দায়ে, আর একজন মাত্র কয়েকটি পয়সার বিনিময়ে পশ্চাদ-পসারী সিগারেটের ধোঁয়া দেখিতে দেখিতে স্বপ্নের জাল বুনিয়া চলিয়াছে। রাস্তার উপর একজায়গায় পীচ উঠিয়া গিয়া একটা ছোট গর্তের মত হইয়াছিল, গাড়ীর চাকা তাহার মধ্যে পড়িয়া গিয়া সহসা হোঁচট খাইয়া দুলিয়া উঠিয়া আবার সোজা হইয়া চলিতে লাগিল। ধাক্কা খাইয়া আরোহীর কল্পনা বাধা পাইল, জাগিয়া উঠিয়া দেখিল কেউ কোথাও নাই। হাতের সিগারেটটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সেটাকে ফেলিয়া আরোহী একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল। একা আর কতক্ষণ বসিয়া থাকা যায়, তাই সে রিক্সাওয়ালার সহিত গল্প জুড়িল। জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁরে, আর কতদূর?

'এই যে এসে পড়েছি বাবু',—রিক্সাবালা গাড়ির বেগ বাড়াইতে চেষ্টা করে, সে ভাবে বাবু বোধ হয় গতির মন্থরতার জন্য রাগ করিয়াছেন।

কি ক্ষণ আবার চুপচাপ। স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—এবার আগের চেয়ে নরম সুরে,—হ্যাঁরে তোর নাম কী?

—'সুখন'।

—তোদের দেশ কোথায় রে?

—দ্বারভাঙ্গা জিলা বাবু।

—সেখানে কে কে আছে রে তোর?

ইহার উত্তর দিতে গিয়ে সুখনের অনেক কথাই মনে পড়িয়া যায়—ছেলেপিলে, বৌ, মা—সকলেরই স্মৃতি মনে পড়ে, সেই সঙ্গে মনে পড়ে বহুদিন পূর্বে শুধু ইহাদেরই ভরণ-পোষণের জন্য একদিন অনেক অশ্রুপাতের মধ্য দিয়া সে ইহাদের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করে। তারপর? তারপর আর তাহার দেশে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। মণি অর্ডারে টাকা পাঠান ও মাঝে মাঝে একটা চিঠি ছাড়া, সেখানের সঙ্গে তাহার আর কোনো সম্পর্ক নাই। দিনের অঙ্ক সে বহুদিন আগেই ভুলিয়া গেছে, তবে এটুকু সে বেশ বুঝিতে পারে যে, আজ সে দেশে ফিরিলে নিজের ছেলেমেয়েদের আর সেরকম দেখিতে পাইবে, না তাহারা অনেক বড় হইয়া গিয়াছে। আর অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের দেখিতে পাইবে বলিয়া তো তাহার কল্পনাই হয় না। কে জানে, কতদিনে তাহাদের সঙ্গে দেখা হইবে। আবেগে তাহার গলা বুজিয়া আসে, ভাঙ্গা গলায় সে যা বলে, তাহা হইতে অর্থোদ্ধার করিতে আরোহীকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। তাহার ভাবে ও ভঙ্গীতে তাহার আর বেশিদূর অগ্রসর হইতে সাহস হয় না। রিক্সাচালকের সম্বন্ধে সকরুণ একটা কিছু কল্পনা করিয়া একটা সহানুভূতিসূচক 'আহা' করিয়াই সে চুপ করিয়া থাকে।

সুখন চিন্তাসূত্রের জের টানিয়া চলে,—তাহার ছেলে-মেয়েরা আর সেই ছোট্টটি নাই, অনেক বড় হইয়া গিয়াছে। এইতো সেদিন দেশ হইতে চিঠি আসিয়াছে, তাহার বড় ছেলে রামলালকে স্কুলে কী একটা পরীক্ষায় ভাল ছেলে বলিয়া কতকগুলি বই দিয়াছে। পুত্রগর্বে সুখনের বুক ফুলিয়া ওঠে। ও কোন কোঠাতে পড়ে কে জানে! ছোটুলাল নাকি আজকাল ভয়ানক দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকেও নাকি এইবার স্কুলে পাঠানো দরকার। স্কুলের নামে নাকি তাহার ভীষণ উৎসাহ। সুখন আপন মনে হাসে, পাঠশালা হইতেই তাহাকে পড়াশুনা ছাড়িতে হয়। স্কুলের নামে তাহারও খুব উৎসাহ ছিল; কিন্তু পড়াশুনাটা তাহার নিকট মোটেই সরস বলিয়া বোধ হইত না। নিজের ছেলেদের সঙ্গে নিজের শৈশব তুলনা করিয়া তাহার হাসি পায়। কেন পায়, কে জানে! সে কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না, তবু যেন হাসি পায়—দুর্দমনীয় ফাটিয়া পড়া হাসি নহে, বয়সোচিত বিজ্ঞের হাসি। হাসি যেন ইহাদের নির্ঝঞ্ঝাট শৈশবকে নিজের বার্ধক্য দিয়া বিদ্রূপ করিতে চায়। লছমীয়া—

সহসা সে যেন একটু সচেতন হইয়া উঠে,—কিন্তু উহারা অনেক বড় হইয়া গিয়াছে, আর সেই পুরাতন ব্যবহার উহাদের সঙ্গে চলিবে না! আজ যদি সে ছোটুলালকে ঘাড়ে তুলিয়া নাচায় তবে সে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিবে। লছমীয়ার বিবাহের কথা চিঠিতে ছিল। আজ যদি সে লছমীয়ার সহিত বিবাহের কথা লইয়া তামাসা করে...সে ছুটিয়া পলাইবে। তাহারা সকলেই বড় হইয়াছে; তাহাদের সঙ্গে আগের মতো ব্যবহার আর চলিবে না। কারো সহিতই আর পুরাতন ব্যবহার চলিবে না। রুক্মিনীর সহিতই কি পূর্বের ব্যবহার চলিবে? পরিপুষ্ট যৌবনে রুক্মিনীর সঙ্গে যে হাসি-ঠাট্টা, ভালবাসা, গল্প চলিত আজ কি আর তাহা চলিবে? আজ সে দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইল সুদূর পশ্চিমের এক দেহাতে একখানি কুঁড়ে-ঘরে চলাফিরা করিতেছে একটি স্ত্রীলোক, যৌবনের শেষ সীমায় সে উপনীত, তাই তার পদবিক্ষেপও মন্থর। প্রৌঢ়তা আসিয়া ধীরে ধীরে যৌবনের চাঞ্চল্যের স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে। দাওয়ায় বসিয়া বুড়ীমা তুলা পিঁজিতেছে।

: সবাই বদলাইয়া গিয়াছে—মা, বৌ সকলেই। সেই কি লায় নাই, তাহার শরীর—

তাহার চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া গেল—এইও! রোকো, রোকো।

ক্যাঁচকোঁচকোঁচ—একটা চূণবালিখসা বাড়ির সামনে গাড়ি ড়াইয়া গেল। আরোহী নামিয়া ভাড়া চুকাইয়া বাড়ির ভিতর কিয়া গেল, দরজা খোলাই ছিল। সুখন বাঁহাত দিয়া কপালের াম মুছিয়া ফেলিয়া ফিরিবার জন্য রিকশা উঠাইল। কিন্তু ালি রিকশা আগের চেয়েও ভারি বোধ হইতেছে, আটদশ পা য়াই সে রিকশা নামাইয়া পাদানীর উপর বসিয়া পড়িল। তক্ষণ চলিতেছিল বেশ চলিতেছিল। একবার থামিয়া আবার লা অসম্ভব হইয়া উঠিল। মাথা অসম্ভব ধরিয়াছে, সম্ভবত বর আসিতেছে।

ক্লান্ত অসুস্থ মস্তিষ্কে যত রাজ্যের উদ্ভট চিন্তা আসিয়া ুটিল। কাল, বয়স এবং পরিবর্তন—এই কথাগুলি তাহার াথায় কেমন করিয়া ঢুকিয়া গেল, কেবলই এইগুলাই ঘুরিয়া করিয়া নানা আকারে মনে হইতে লাগিল। একবার মনে হইল াহার ছেলেরা তাহাকে চিনিবে তো? পরক্ষণেই নিজের চিন্তার াসম্ভাব্যতায় তাহার হাসি পাইল। তাহার ছেলেরা তাহাকে চনিবে না? এই তো সেদিন তাহার গ্রামসম্পর্কীয় এক ভাই হু দিন পরে এখানে আসিয়াছিল—সে তো তাহাকে একদৃষ্টেই চনিতে পারিয়াছিল। সকলেই বলে এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে াহার কোন পরিবর্তন হয় নাই। আবার ভাবিল সে বোধ হয় দ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন আগে সে একবার একটা ানের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়াছিল—আয়নায় নিজের তিফলিত মূর্তির মাথার চুলগুলি সাদা দেখিয়া বেত্রাহত কুরের মতো পলাইয়া আসে। দোকানী কিছু বুঝিতে না ারিয়া শুধু বলিয়াছিল—পাগল। আজ এই জ্বর বিক্ষিপ্ত মস্তিষ্কে চোখের সামনে সেই ছবি কেবলই ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। আজ তাহার কেবলই বোধ হইতে লাগিল, সে বার্ধক্যের সীমায় পৌঁছিয়াছে। অতিরিক্ত পরিশ্রম, জীবনের অপব্যয় সবকিছু মিলিয়া তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু আগে বার্ধক্যের কোঠায় পৌঁছিয়া দিয়াছে। আজ তাহার কাছে পৃথিবী রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে নিঃস্ব। আজ তাহার মনে হইতে লাগিল সকলের ভরণপোষণের জন্য এতো অর্থ উপার্জন তাহার সমস্তই অপব্যয় হইয়া গিয়াছে। তাহার ভারি আফশোষ হইতে লাগিল যে কেনো এতদিন সে জীবনটাকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিয়া লয় নাই। যাহাদের জন্য সে এতো কষ্ট করিতেছে তাহারা কি তাহার যৌবন আবার ফিরাইয়া আনিয়া দিবে?

ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল। সে সেইখানেই ঘুমাইতে চেষ্টা করিল, ঘুম আসিল না। নানা চিন্তায় মাথা ভরাট হইয়া উঠিল। থাকিয়া থাকিয়া কেবল এই কথাটা মনে হইতে লাগিল যে, তাহার এ জীবনটা নিতান্তই অপব্যয় হইয়া গিয়াছে। অবশেষে ভোরের দিকে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়াও নিস্তার নাই; সে স্বপ্ন দেখিল, একটা বিকটাকার লোক তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া খুন করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঘুম ভাঙিলে দেখিল ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল সকাল হইয়াছে। সুখন সামনের কল হইতে মুখ ধুইল। জ্বর ছাড়িয়া গেছে। প্রভাতী ঠাণ্ডা হাওয়ায় সর্বশরীরে একটা নবীন স্ফুর্তির সঞ্চার হইল। রিকশার কাছে আসিয়া সেটাকে তুলিয়া লইতেই গতরাত্রের উষ্ণ মস্তিষ্কের চিন্তা মনে পড়িল। সুখন একটু হাসিয়া রিকশা চালাইল, তাহার ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল ঠুন্ ঠুন্।

কঙ্কালময়ীর পত্র

শ্রীতারাকুমার ঘোষ এম-এ

পুরাতন পৃথিবীর কুণ্ঠিত দুর্দিন,
সরল যাত্রীর মুখে নিত্য করি পাঠ।
যৌবনের অন্তরাগ মধ্যাহ্ন বিপিনে
ম্লান হয় দেহের কুণ্ঠনে।
গভীর রাত্রির বুকে অগণ্য তারায়
জাগে শীর্ণ আত্মাদের জীর্ণ পরিচয়।
অশান্ত ক্রন্দন আর বিবর্ণ ভীতিতে,
সচকিত রাত্রির প্রহর।
তাহারি লজ্জিত রূপ হেরি নিত্য
নগরীর রাজপথে;
মানব-মানবী বেশে রিক্ত হস্তে যারা
দান-পাত্র লয়ে,
দ্বার হ'তে দ্বারে,
ঘোরে প্রতিদিন
অক্ষমের কৃপা সঞ্চয়নে।
ভিক্ষা অন্ন লয়ে
স্বার্থ-প্রতিযোগিতায় তীব্র দ্বন্দ্ব জাগে।
দিবসের সঞ্চয়ন দেয় অবশেষে
প্রভুর চরণতলে বিচারের আশে।
বঞ্চিতে সত্যের বেদী, আত্ম-প্রবঞ্চনা
প্রসারে আপন ক্ষুদ্র জীর্ণ কৃপাসন।
তারে লয়ে করে নিত্য জীবন সার্থক।

কতদিন এ বঞ্চনা বক্ষের আগুনে
স্বকীয় সাধনে রাখি হানিবে আত্মায়
মূঢ়তার ম্লান গ্লানি-ভারে?
জাগিবারে আমি যেন চাই
লভিতে উষার দীপ্ত কনক-কিরণে।

কোথা হ'তে ঝড় ধেয়ে আসে—
দেখি পুরাতন বিভীষিকা!
গলিত উচ্ছিষ্ট খুঁজি' নগ্ন শীর্ণ-দেহ
পথিপার্শ্বে আবর্জনা স্তূপ উদ্ঘাটিয়া
দুই হস্তে করিছে ভক্ষণ।
চক্ষে তার প্রলয়ের লেখা
বক্ষে জাগে উন্মত্তের ঘোর অট্টহাসি।
আমি যে শিহরি উঠি।
যারে নিত্য দিই অসম্মান,
যেই রিক্তা রমণীর আত্মদেহ দান
সমাজেরে পরায়েছে খণ্ডিত-শৃঙ্খল,
সেথায় দেবতা মোর হ'তেছে ভিক্ষুক।
জীর্ণ কৃপাসনে সেথা মোর নির্বাসন।

হে কঙ্কালময়,
মোর পত্র
জীবনের সর্বস্তরে কুণ্ঠা জ্বালি
বিভীষিকা জাগাবারে নয়।
ভিক্ষুকের নহে আবেদন
লভিতে ক্ষমীর কৃপা।
অক্ষমের করুণার কণাবৃত্তি লাভে
নাহি মোর আশ।
যে অগ্নি দেখেছি তব চোখে,
যার জ্বালা রিক্তদের বক্ষে বক্ষে রাজে,
সে নির্মম ব্যর্থ পরিহাস
আত্মপ্রত্যয়ের তীরে আপন কল্যাণে
লভুক নির্বাণ।
সক্ষমের করে তাই মোর পত্র লেখা।

ভোজপাল বা ভূপাল

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
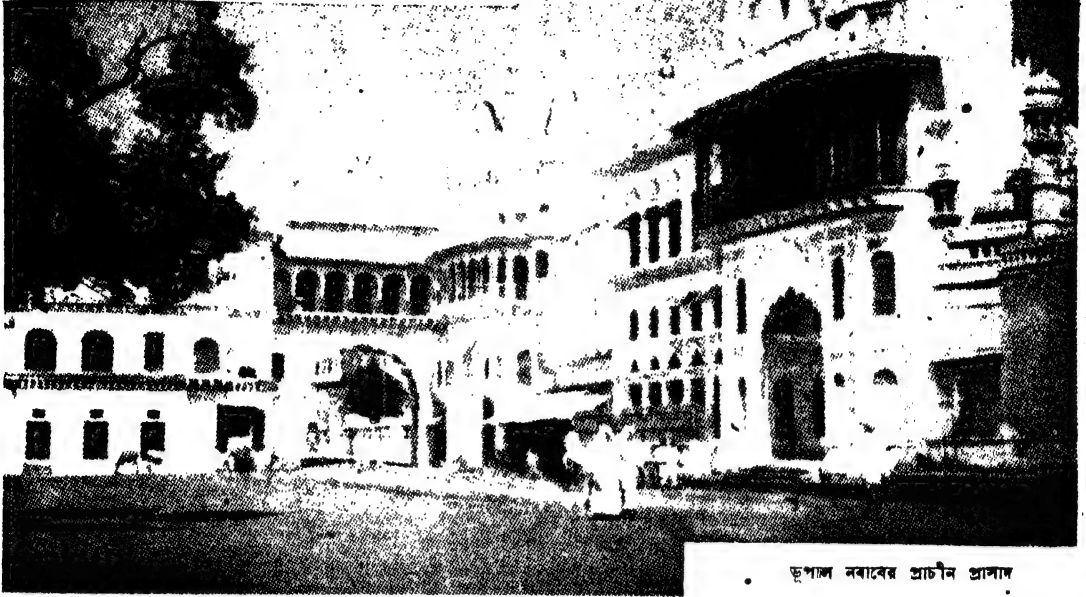
ভূপাল নবাবের প্রাচীন প্রাসাদ

স্বাধীন ভারতের বিজয়-নিকেতন যে মালাওয়া রাজ্যে স্বগর্বে উড্ডীন ছিল, যার গিরিকন্দরে, ঘোর বনে, বন্ধুর পথে বীর সন্তানের বীরগাথায় মুখরিত হইত, মধ্য ভারতের সেই মলাশুয়া প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে ভোজরাজের ভোজপাল অবস্থিত। বর্তমানে সেই ভোজপাল ভূপাল নামে পরিচিত। উজ্জয়িনী, ভালসা, সাঁচীর শূন্য স্মৃতির সহিত ভূপালের উত্থান-পতনের ইতিহাস বিজড়িত। ভারতের ঠিক মধ্যস্থলে গগনচুম্বী দুর্গম গিরিশ্রেণী বেষ্টিত ছোট বড় দুইটি হ্রদের তীরে অমরাবতীর ন্যায় ভূপাল নগরটি শোভিত হইয়া রহিয়াছে। ভারতের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ দ্রাঘিমা (লঙ্গিচিউড) ও লাঘিমা (ল্যাটিচিউড) যে স্থানে মিলিত হইয়াছে সেই বিন্দুতেই মহারাজ অশোক সাঁচীর স্তূপটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ভারত শিল্প ঐশ্বর্যের সেই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সাঁচীর স্তূপ ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত। ভূপাল সাঁচীর স্তূপগুলি হইতে নয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

বঙ্গের নর-নারীর ভ্রমণে তেমন আগ্রহ নাই। তাঁহারা তীর্থ-ভ্রমণে যান যখন তাঁহাদের বয়স অধিক, উদ্যম হ্রাস হইয়া যায়। তাঁহারা কেবল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রচলিত তীর্থগুলি মাত্র দর্শন করেন। ভারতের শিল্প ও বীরত্ব গৌরবের কথায় পরিপূর্ণ মধ্য ভারতের খবর খুব অল্পই রাখেন। ভূপাল যেমন প্রকৃতি-রাণীর কৃপায় গিরি ও জলাশয় পরিবৃত হইয়া অপূর্ব সৌন্দর্যের আকর তেমনি ইহার দুর্গ ও দুরূহ সৌধাবলী বীরত্বের উৎসর পরিচায়ক। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা এই সত্যেরই সাক্ষ্য এই ভূপাল। ভোজপাল বা ভূপালের ইতিহাস নানা বীরের লীলার সহিত জড়িত।

প্রায় ৭০০ খৃষ্টাব্দে ভোজরাজ 'ধারে' মুকুট ধারণ করেন। তিনিই ভোজপাল শৈলনগরটি স্থাপনা করেন। সেই সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসর হিন্দুর স্বাধীনতা এই রাজ্যে অক্ষুণ্ণ ছিল। মহারাণী দুর্গাবতীর ও রাণী কমলাবতীর বীরত্ব-কাহিনী ভূপালের ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া আছে। দোস্ত মহম্মদ খাঁ গণ্ডা সর্দারকে পরাজিত করিয়া বর্তমান ভূপাল রাজ্য স্থাপিত করেন। ১৮১৫ খৃঃ ইংরেজ সরকার ভূপালের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভূপালকে একটি করদ-মিত্র রাজ্যে পরিণত করেন। মুসলমান নবাবের শাসন অধীনে থাকিলেও রাজ্যের জনসংখ্যা শতকরা সত্তরজন হিন্দু। তবে শহরটির জনসংখ্যা হিন্দু ও মুসলমান প্রায় সমান সমান। পুরুষদের পোষাক নানাপ্রকার, শিরভূষণ টুপি বা পাগড়ী কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নারীগণ পায়জামা ও ঘাঘরা পরিধান করেন।

জি আই পি রেলপথের ইটার্সী হইতে ঝান্সী যাইবার রেল পথের উপরই ভূপাল স্টেশন অবস্থিত। ভূপাল স্টেট রেল লাইন এই স্থানে মিলিত হইয়াছে।

ভূপালের অতীত বীরত্ব কাহিনীর পরিচয় তাহার দুর্গম গিরিদুর্গ ফতিগড় ও তাহার অস্ত্রাগার। গগনচুম্বি পাঁচটি গিরির অঞ্চলের মধ্যে সুবৃহৎ হ্রদের তীর হইতে সোজা যে পাহাড়টি উঠিয়াছে, তাহারই শিরোপরি ফতিগড়ের দুর্গ নির্মিত। ভোজরাজই এই দুর্ভেদ্য দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা। হ্রদের সচ্ছ সলিল-রাশি দুর্গপাদমূল ধৌত করিয়া বিরাজ করিতেছে। দুর্গটি সুদৃঢ় প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। প্রধান তোরণের শিরোপরি ভূপাল রাজের পতাকা সতত উড্ডীন থাকে। পর পর দুইটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া বৃহৎ বৃহৎ দুইটি তোরণের মধ্য দিয়া প্রধান পথটি দুর্গের প্রাসাদের অভিমুখে গিয়াছে। দুর্গের ভিতর প্রবেশ করি- হইলে ছাড়পত্র প্রয়োজন, তাহা নূতন শহরে অবস্থিত ফে- হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

দুর্গের ভিতরের প্রাসাদ ও সৌধাবলী প্রায় চারি সহস্র বৎসরের পুরাতন এবং উহা ভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। প্রাসাদ ও দরবার গৃহগুলি সুদৃঢ় ও বৃহদাকারের, কিন্তু তাহাতে কোন শিল্প ঐশ্বর্যের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না; কেবল হ্রদের দিকের কয়েকটি ঝরোকা ও বারান্ডার থাম সূক্ষ্ম কারুকার্য-মণ্ডিত। অভ্যন্তরের কতকগুলি কপাটের উপর নানা বর্ণের গালার কারুকার্য (ল্যাকার ওয়ার্ক) যেমন সুশ্রী তেমনই বিচিত্র।

প্রার্থনা গৃহের দালানের মধ্যভাগে বৃহৎ বৃহৎ পাঁচখানা কোরাণ উচ্চ কাষ্ঠাধারে রক্ষিত আছে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পুস্তকটি পাঁচ ফুট লম্বা ও তিন ফুট ছয় ইঞ্চি চওড়া। এই বৃহৎ কোরাণ পুস্তকের মলাট সূক্ষ্ম কারুকার্য সমন্বিত রৌপ্যপাত মণ্ডিত। প্রত্যেকটি পাতা নানা রং ও সোনালী কালি দ্বারা লিখিত, পত্রপুষ্প চিত্রিত কিনারা অঙ্কিত, বড় বড় ফার্শী অক্ষরে সমগ্র কোরাণটি লিখিত। উহা কয়েক শতাব্দী পূর্বের লিখিত হইলেও মনে হয় যেন সদ্য হইয়াছে। একটি পৃষ্ঠাও কীট-দংশিত হয় নাই। কি অপূর্ব রাসায়নিক বিদ্যার প্রভাবে এমন স্থায়ী উজ্জ্বল কালি ও কাগজ নির্মিত হইত! উচ্চ কাষ্ঠের আধারের উপর উহা রক্ষিত হওয়াতে দণ্ডায়মান থাকিয়া পড়িতে হয়। প্রত্যেকটি পাতা উল্টাইবার নিমিত্ত তিনজন ব্যক্তির প্রয়োজন। বৃহৎ কোরাণটি কিংখাপের বস্ত্র ওয়াড়ের মধ্যে রক্ষিত থাকে।

এই প্রকার বৃহৎ আকারের আর যে চারিটি কোরাণ দেখা যায় তাহাদের মলাট সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত চন্দন কাষ্ঠের এবং আবরণও কিংখাপ ও মখমলের কাপড়ের। তদানীন্তন বাদশাগণ ধর্ম ও শিল্পের উৎকর্ষ বিধানে কখন কার্পণ্য করিতেন না।

ফাতিগড় দুর্গের অস্ত্রাগারের সংগ্রহ হিন্দু-মুসলমান বীরগণের শৌর্য ও বীর্যের পরিচয় প্রদান করে। ছোট বড় নানা আকারের প্রায় তিন হাজার বন্দুক, বহু সহস্র তরবারি, প্রায় দুই শত শিরস্ত্রাণ, বহু বর্শাদণ্ড ও ফলক, অনেকগুলি লৌহ বর্ম, বৃহৎ বৃহৎ ঢাল প্রভৃতি নানা যুদ্ধোপকরণে তিনটি বৃহৎ দালান পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

স্বনামধন্য ভোজরাজ আড়াই হাত লম্বা ৫ ফুট চওড়া যে তরবারী দ্বারা শত শত বীরের মস্তক ভূলুণ্ঠিত করিয়াছিলেন, এখনও সেই তরোয়াল অস্ত্রাগারের মর্যাদা রক্ষা করিতেছে। বর্তমান ভূপাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বীরবর দোস্ত মহাম্মদ খাঁ প্রাচীন ভোজপালের রাজবংশধরকে পরাজিত করিয়া এই বৃহৎ তরবারীটি দখল করিয়াছিলেন। সেই কাহিনী এই স্থানে লিখিত রহিয়াছে। দোস্ত মহাম্মদের বৃহৎ সুদৃঢ় লৌহের শিরস্ত্রাণ ও লৌহের পোষাক দেখিলে বীর অবয়বের পরিচয় পাওয়া যায়। আর একটি অপূর্ব লৌহ বর্ম ও পোষাক প্রাচীর গাত্রে লম্বমান রহিয়াছে। এই লৌহের পোষাকে প্রতি শিকলের উপর 'রামাবলীর' ন্যায় কোরাণের 'বয়েদ' উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত কোন বীর যে কোন রণ জয় করিতে পারে না, ইহাই স্পষ্ট প্রকাশ হয়।

দুইটি লম্বা বর্শা দেখা গেল, তাহাদের দণ্ড হস্তীদন্তে নির্মিত এবং তীক্ষ্ম উজ্জ্বল লৌহ ফলক মস্তকে প্রোথিত রহিয়াছে। সৌন্দর্যের ও বীরত্বের অপূর্ব সমাবেশ। অপর দেওয়ালে লম্বিত দুইটি ছয় হাত বা ৯ ফুট লম্বা বন্দুক দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। তোপখানার প্রাঙ্গণে ছোট বড় ৫০টি লৌহ, ত[illegible] ও পিতলের কামান অতীত গৌরবের চিহ্নস্বরূপ রহিয়াছে।

ভূপালের একটি রাস্তার দৃশ্য

১৮১৭ খৃঃ ভূপালের নবাব ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে সন্ধি হয়, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে পতাকা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাও স্বসম্মানে সংরক্ষিত।

গিন্নর গড়ের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী দুর্গাবতীর আত্মী[য়া] রাণী কমলাবতী প্রায় ১২০০ খৃস্টাব্দে একটি রাজপ্রাসাদ পাহাড়ের পাদমূলে এবং বড় হ্রদের তীরে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহারা[ণী] দুর্গাবতী যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর আত্মসম্মান রক্ষার জ[ন্য] প্রাণত্যাগ করেন, সেই সংবাদ পাইয়া রাণী কমলাবতীও এই প্রাস[াদে] আত্মহত্যা করিয়া নিজ মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই প্রা[সাদ] 'কমলাবতী প্রাসাদ' নামে পরিচিত এবং গণ্ডা সর্দারদের পু[রাতন] স্থান—দোস্ত মহাম্মদ খাঁর ভূপাল জয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্য[ন্ত] রাজপুত বীরগণ প্রাসাদটি রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন দো[স্ত] মহাম্মদ গণ্ডা সর্দারের বংশধরকে "বারী" পরগণা প্রদান ক[রি]য়া স্থানান্তরিত করেন তদবধি ইহা ভূপাল রাজসম্পত্তি হয়। প্রাসাদ

গত মহাযুদ্ধের সময় যে অবিরাম গবেষণা চলিয়াছিল এবং যাহা এখনও চলিতেছে, তাহার ফলে জানা গিয়াছে যে যদি ইস্পাতের সহিত ভিন্ন কোন ধাতু বা ভিন্ন ভিন্ন ধাতুসকল সংযুক্ত করা যায় তবে ইস্পাত বিশেষ বিশেষ গুণ লাভ করে। এই ধাতুসকলের মধ্যে নিকেল বহু প্রয়োজনীয়—কারণ ইহা ইস্পাতকে ক্ষয় এবং তাপ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা প্রদান করে। নিকেল-মিশ্রিত ইস্পাত প্রথমে যুদ্ধোপকরণের জন্য ব্যবহৃত হইত; এখন ইহা মোটর এবং এরোপ্লেনের অনেক অংশ নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। মোটরে বা এরোপ্লেনে ইহা বিশেষভাবে আভ্যন্তরিনদহন-কালে (internal Combeestion engine) বাইল বা দ্বার (valve) রূপে ব্যবহৃত হয়।

অম্লেরক্রিয়ার উপর প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রয়োজন হইলে অকলঙ্ক ইস্পাতে' (Stainless steel) ক্রোনিয়ম্ নামক ধাতু মিশান হয়। এইরূপ ক্রোনিয়ম্ মিশ্রিত ইস্পাত যে তীক্ষ্মধার হইতে পারে না, ইহা মনে করা ভুল; আজকাল ইহার ছুরি, কাঁচি এবং অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রাদি নির্মাণে ব্যবহার হইয়া থাকে। Austenite নামক ইস্পাতই অকলঙ্ক ইস্পাতের মধ্যে সর্বোত্তম। ইহা Robrt Hadfild কর্তৃক ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডে বিশেষ অধিকার পত্রের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে। এই ইস্পাতের মধ্যে ম্যাগনেসিয়ম্ ধাতু বর্তমান এবং ইহা চুম্বক-শক্তিহীন। ইহার বিভিন্ন অংশ সহজেই পিটাইয়া সংযুক্ত করা যায়। পাম্প তৈয়ারী করিতে, রাসায়নিক যন্ত্রাদি নির্মাণে এবং আরও বহু কাজে এই ইস্পাত ব্যবহৃত হয়।

দ্রুতগতিসম্পন্ন যন্ত্রাদি নির্মাণে কোবল্ট্ নামক একটি ধাতুর সহিত ইস্পাতের মিশ্রণের প্রয়োজন। এই ধাতুর মিশ্রণের ফলে চুম্বক অধিকতর ক্ষুদ্র এবং লঘু করিতে পারা যায়। ভ্যানাডিয়ম্ নামক ধাতুর সহিত মিশাইলে ইস্পাতের স্থিতি-স্থাপকতা বৃদ্ধিলাভ করে। সেই জন্য স্প্রিং তৈয়ারী করিবার ইস্পাতে ভ্যানাডিয়মের মিশ্রণ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

হাতুড়িবিশেষের আঘাত অথবা ঘর্ষণের ন্যায় গুরু সংঘর্ষের অধীনে থাকিলে ইস্পাতের আকস্মিক চাপ এবং উচ্চতাপজনিত ক্ষয়ের উপর প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা উচিত। উপযুক্তরূপ ক্ষমতা ইস্পাতকে দেওয়া যায় টাংস্টেন্ নামক ধাতুর মিশ্রণে।

ধাতুমিশ্রিত ইস্পাতের বিষয়টি এত ব্যাপক যে উপরে কেবলমাত্র বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় কয়েক প্রকারের কথা বলা হইল। একাধিক ধাতু একত্রে ইস্পাতের সহিত মিশ্রিত করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় নিকেল-ক্রোম ইস্পাত এবং ক্রোম-ভ্যানাডিয়ম্ ইস্পাত। বৃটিশ সাম্রাজ্যে প্রভূত খণিজ পদার্থের সম্ভাবনা আছে, যাহা হইতে উপাদান হিসাবে প্রয়োজনীয় বস্তু পাওয়া যাইতে পারে। একমাত্র কানাডা হইতেই পৃথিবীর শতকরা নব্বই ভাগ নিকেল এবং পঞ্চাশ ভাগের অধিক কোবল্ট্ পাওয়া যায়।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ধাতু এবং মিশ্র ধাতুর (allay) বিশ্লেষণ, শিল্পদ্রব্যাদির সূক্ষ্ম গঠন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে আরও নিশ্চিত করিয়া দিতেছে। এই নূতন বিজ্ঞান অন্য-প্রকার সূক্ষ্ম পরীক্ষা, ধাতুর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা বা ধাতুর রাসায়নিক পরীক্ষায় সাহায্য করে। ইহা দ্বারা ধাতুর মধ্যে বহু গলদ আবিষ্কৃত হইতে পারে; যাহার ফলে কার্যের অনুপযোগী বলিয়া ধাতুকে বাদ দেওয়া যায়। বয়লার (boiler) তৈয়ারীর জন্য যে ইস্পাতের চাদর লাগে, বা ইঞ্জিনের কোন অংশ যাহা ইস্পাতনির্মিত—তাহা সময় সময় নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এই সকল ইস্পাতের দোষ ধরিবার জন্য আধুনিক-তম ব্যবস্থা হইতেছে 'এক্সরে'র ব্যবহার।
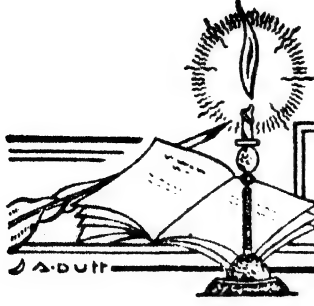
*পাকিস্থানের বিচার—রেজাউল করিম, এম এ, বি-এল প্রণীত। বুক কোম্পানী লিমিটেড, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

"পাকিস্থান পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ যে সব প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা হইতে একটা বিষয় পরিস্কার হইয়া গিয়াছে যে, কতকগুলি মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত কেহই ইহা সমর্থন করেন না। আর যাঁহারা সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবহ সেবক। উপরিওয়ালা প্রভুর মনতুষ্টি সাধন করাই যাঁহাদের মানবজীবনের একমাত্র করণীয় কাজ, তাঁহারা কি অন্য পথ অবলম্বন করিতে পারেন। আসন্ন সংগ্রামের সম্মুখে এই পাকিস্থান পরিকল্পনা সাম্রাজ্যবাদকে যেভাবে সাহায্য করিবে, কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান অন্য কোন প্রকারে তাহা করিতে পারিত না।"—মৌলবী রেজাউল তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত 'পাকিস্থানের বিচার' শীর্ষক পুস্তকে এই যে মন্তব্য করিয়াছেন, ভারতের স্বাধীনতাকামী মাত্রেই তাহা সর্বাংশে সমর্থন করিবেন।

মৌলবী রেজাউল করিমের পরিচয় বাঙলা দেশের পাঠক-পাঠিকাদের নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। মৌলবী সাহেব বাঙলা দেশের রাজনীতি এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার স্বকীয় স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি এবং স্বদেশপ্রেমের প্রভাবে সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার সেই মর্যাদাকে সমধিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবে এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। মৌলবী সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি বিভিন্ন দিক হইতে পাকিস্থানী প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়াছেন এবং অভ্রান্ত যুক্তিসহকারে এই পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত অনিষ্টকারিতাকে উন্মুক্ত করিয়াছেন।

আলোচ্য পুস্তকখানাতে পাকিস্থানী প্রস্তাবের সমালোচনামূলক পনেরোটি সন্দর্ভ আছে। এই পনেরোটি প্রবন্ধের ভিতর দিয়া মৌলবী সাহেব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারত সম্পর্কিত মূলনীতির স্বরূপকে দক্ষতার সহিত উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"বঙ্গভঙ্গের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী জাতির সমষ্টিগত শক্তি বিনষ্ট করা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কলিকাতার রাজনীতিক প্রাধান্য ধ্বংস করা এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে এমন একটা স্বতন্ত্র শক্তিকে জাগাইয়া দেওয়া—যাহা ক্রমবর্ধমান হিন্দুদের শক্তিকে বাধা দিতে সক্ষম হইবে। বর্তমান পরিকল্পনার ক্ষেত্র আরও বড়—একটা প্রদেশের নহে, ইহা সমগ্র ভারতের সংহতি শক্তি নষ্ট করিতে সহায়তা করিবে। পাকিস্থান পরিকল্পনার দ্বারা মুসলমান একটুও লাভবান হইবে না—লাভবান হইবে সাম্রাজ্যবাদ।"

সাম্রাজ্যবাদের কর্ণধারগণ পাকিস্থানী প্রস্তাবের প্রধান পরিপোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং যাঁহারা এতদিন পর্যন্ত মুখে অখণ্ড ভারতের আদর্শ প্রতিষ্ঠাই বৃটিশের পরম দান বলিয়া স্পর্ধিত উক্তি করিতেন, বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ঘাঁটিতে দাঁড়াইয়াই নিতান্ত নির্লজ্জভাবে পাকিস্থানী প্রস্তাবের পাণ্ডাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস যে প্রস্তাব লইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন, সে প্রস্তাবে বৃটিশ স্বার্থের ভিত্তি পাকা করা হইয়াছিল। এই পাকিস্থানী পরিকল্পনারই অন্তর্নিহিত অনিষ্টকর যুক্তিরই উপর; সুতরাং 'পাকিস্থানের শেষ পরিণতি ভারতের চির দাসত্ব, পাকিস্থান গোলামস্থান ব্যতীত আর কিছুই নহে'—মৌলবী সাহেবের এই উক্তিতে কে সন্দেহ প্রকাশ করিবে? কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা বড়ই সস্তায় বিকায়। এক শ্রেণীর দুরভিসন্ধিপরায়ণ লোক এই সাম্প্রদায়িকতাকে ভাঙ্গাইয়া নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধ করিবার মতলবে রহিয়াছে। ইহারা 'বিপন্ন ইসলামে'র জিগীর তুলিয়া দুই[...] নেতা বনিয়া যায় এবং নিরীহ জনসাধারণের দুর্দশা সৃষ্টি কা[...] নিজেদের ব্যবসা জাঁকাইয়া তুলে। প্রকৃতপক্ষে দেশের স্বার্থ তাহারা চ[...] না, জাতির স্বার্থও চাহে না, এমনকি যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দোহাই [...] সেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থও তাহাদের নিকট নগণ্য। মৌলবী রেজাউল ক[...] সাহেব এই শ্রেণীর নেতাদের প্রকৃত কারসাজী ধরাইয়া দিয়াছেন। তি[...] অকাট্য যুক্তি প্রদর্শনসহকারে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পাকিস্থ[...] পরিকল্পনা মুসলমানদের পক্ষেও ঘোরতর অনিষ্টকর হইবে। এ সম্ব[...] তাঁহার যুক্তি জগতের বর্তমান রাষ্ট্রনীতিক অবস্থা এবং ঐতিহাসিক ভি[...] উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং সেগুলিকে ধর্মান্ধতার ধাপ্পাবাজীর দ্ব[...] কাটাইবার উপায় নাই। মৌলবী সাহেব মিশর, তুরস্ক, চীন প্রভৃতি দে[...] মুসলমান জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশের ধারাকে সুস্পষ্ট করিয়া ধরিয়া[...] এবং দেখাইয়াছেন ঐ সব স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্রেও ধর্মগত ভিত্তি ছা[...] জাতীয়তার আদর্শই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং সেই প[...] ঐ সব মুসলমান রাষ্ট্র ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা হই[...] আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে। যদি সেই আদর্শে সমুন্নত না হইয়া ম[...] যুগীয় সাম্প্রদায়িকতাকেই বড় করিয়া দেখিত তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক [...] নীতির প্রভাবে সেগুলি ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ ক্ষেত্রে পরি[...] হইত। এই দিক হইতে বিচার করিয়া মৌলবী সাহেব বলিয়াছেন 'দরিদ্র মুসলমান পাকিস্থানে হয়ত ইসলামের শাসন পাইবে; কি[...] উদরের অন্ন সংস্থান করিতে পারিবে না। পাকিস্থান মুসলমানদের [...] গোরস্থান রচনা করিবে।

এখন এক দল লোক বলিতে পারেন উদরান্নের সংস্থান না হইল [...] আমরা ইসলামের শাসনই চাই। মৌলবী সাহেব ইহাদের অবা[...] অন্ধতারও খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, "বি[...] ধর্মসম্প্রদায়ের সমবায়ে একটি জাতি গঠন করা ও সেই নামে পরি[...] হওয়া ইসলামের আদর্শের বিপরীত নয়, বরং মুসলিম সংস্কৃতির ইতি[...] হইতে দেখা যাইবে যে, মুসলমানগণ বরাবর সেই প্রকার জাতীয়তা গ[...] সহায়তা করিয়াছেন।" তিনি বলেন,—'মুসলিম শাসনের প্রাক্কাল হই[...] বৃটিশ শাসনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ভারতের সামাজিক ইতিহাস হিন[...] মুসলমানের সংহতিরই ইতিহাস। নানা ঘটনা আসিয়া এই সংহতির কা[...] বাধা উৎপাদন করিয়াছে সত্য; কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অন্[...] সলিলা ফল্গু ধারার মত শত শত বৎসর ধরিয়া ভারতের সংহতি [...] সমন্বয়ের কাজ চলিয়া আসিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাজনৈ[...] আদর্শের যোগাযোগে দেশবাসীর মনে এমন একটা ভাবধারা জাগিয়া[...] যাহার জন্য বিদেশী শাসকদের ভেদনীতির প্রভাব পরিহার করি[...] ভারতবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছে [...]

মৌলবী রেজাউল করিম সাহেবের এই পুস্তকখানা সময়োপযো[...] হইয়াছে। বাঙলা দেশে জাতীয়তার আন্দোলন প্রগতিমূলক ভাবধারা আশ্রয় করিয়া নূতন উদ্যমে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে। মৌলবী সাহে[...] এই পুস্তক সেই ভাবধারাকে পরিপুষ্ট করিয়া বাঙলার জাতীয় জী[...] শক্তিসঞ্চার করিতে সাহায্য করিবে এবং স্বার্থসন্ধীদের বিরুদ্ধে স[...] সমাজে প্রতিকূলতার শুভবুদ্ধিকে জাগাইয়া তুলিবে। হিন্দু-মুসলম[...] নির্বিশেষে বাঙালী সমাজের সর্বত্র আমরা এই পুস্তকের প্রচার কা[...] করি।

মিউনিসিপ্যাল থিয়েটার

বোম্বাই-এর সমাজতন্ত্রী নেতা ও মেয়র মিঃ উসুফ মেহেরালী সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, বোম্বাই-এর মত একটি প্রধান শহরে কোনও পাবলিক থিয়েটার নেই—এটা লজ্জার বিষয়। সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্যে তিনি বোম্বাই-এ মিউনিসিপ্যাল থিয়েটার গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং তার জন্যে অর্থ সংগ্রহের কাজেও তিনি হস্তক্ষেপ করেছেন।

ফণী মজুমদার পরিচালিত 'তমন্না' চিত্রে জয়রাজ ও লীলা দেশাই

মিঃ মেহেরালীর এই প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। সবাক চিত্রের ক্ষেত্রে বোম্বাই আজ ভারতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে, কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয় সেখানে একটিও নেই। পৌর প্রতিষ্ঠান হিসাবে করদাতাদের প্রতি স্বাস্থ্য বিধানের দায়িত্ব যেমন কর্পোরেশনের আছে, ঠিক তেমনি দায়িত্ব রয়েছে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বিধানের জন্য, আর নৃত্যগীতাভিনয় প্রভৃতি মানব মনের ভাব প্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাকে অনুরাগী করে তোলায় মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের ও চিত্তবিনোদনের একমাত্র উপায়।

আজকাল যান্ত্রিক সভ্যতার যুগ—তাই মানুষ আজ যন্ত্রের দাস। সিনেমা রেডিও গ্রামোফোন রেকর্ড প্রভৃতি মানুষকে যেভাবে আকর্ষণ করে থিয়েটার তা পারে না। অথচ সিনেমা অপেক্ষা রঙ্গালয়েই আর্টের আবেদন বেশী। রঙ্গালয় সিনেমার মতো মেকানিক্যাল নয়—সেখানে শিল্পী প্রতিদিনের অভিনয়ে নূতন সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়ে থাকে।

মিউনিসিপ্যাল থিয়েটার নেই শুধু আমাদের দেশেই। লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় শহরে এই ধরণের রঙ্গালয় মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনায় চলে এসেছে; অল্প পয়সায় যাতে জনসাধারণ শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে পারে তার পথ সুগম করে দিয়েছে। আমরাও চাই যে আমাদের দেশের জনসাধারণ দেশের শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হোক। অর্থের অভাবে অথবা সুপ্রচারের ফলে দেশের অগণিত জনসাধারণ যে শিল্পরস উপলব্ধি থেকে আজ

'শেষ উত্তর' চিত্রে কানন ও যমুনা

বঞ্চিত রয়েছে মিউনিসিপ্যাল থিয়েটার গঠনের সঙ্গে যদি সে অভাব দূর হয়, তাহলে দেশের মস্ত উপকার হবে।

নিউ সিনেমায়—"চৌরঙ্গী"

ফজলী ব্রাদার্সের ছবি; কাহিনী ও পরিচালনা—এস ফজলী; সুরযোজনা কাজী নজরুল ইসলাম; ভূমিকায়—অনিশ, মেহতাব, আমজাদ, নজীর প্রভৃতি। ছবিখানি এই শনিবার চতুর্থ সপ্তাহে পদার্পণ করবে।

কৃত্রিম জীবনযাপনে বীতশ্রদ্ধ ধনীপুত্র এক রাজকুমারীর সঙ্গে বাকদত্ত হয়েও শেষে পথের এক ভিখারিণীর পাণিগ্রহণে উদ্যত হয়। সমাজ তার বিরুদ্ধে যায় এবং তার পিতাও। সর্বস্ব ছেড়ে সে ভিখারিণীকে নিয়ে দুঃখের জীবন বরণ করে নেয়। পরিশেষে পিতা তার ভুল বুঝতে পারেন এবং তাকে ফিরিয়ে নেন। রাজকুমারী বুঝতে পারেন যে প্রকৃত প্রেম মণিমুক্তার বিনিময়ে পাওয়া যায় না এবং অতঃপর সে এদের মিলনে আর প্রতিবন্ধক হল না।

বিষয়বস্তুটি উচ্চাদর্শের প্রতীয়মান হলেও কাহিনীর গঠনকার্যে কোন কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না এবং চিত্তকেও মোটেই আকর্ষণ করে না। পরিচালনায় প্রশংসা করবার কিছু নাই। একমাত্র উপভোগ্য বিষয় হচ্ছে গানগুলি। মোট তেরখানির মধ্যে অধিকাংশই সুগীত হয়েছে। এবং এজন্য কাজী নজরুল জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হবেন। অভিনয়ে রাজকুমারীর ভূমিকায় মেহতাব ও ভিখারিণীর [illegible]

নদীবহুল রুশ রণাঙ্গনে সৈন্যগণের জন্য নদী অতিক্রমের ব্যবস্থা হইতেছে

১৬ই জুলাই

রুশ রণাঙ্গন—তুমুল সংগ্রামের পর সোভিয়েট সৈন্যেরা লিগচোর ও মিলেরোভো পরিত্যাগ করিয়াছে। জার্মানদের ভরোনেজ শহরের পাস কাটাইয়া যাওয়ার এবং ভরোনেজ নদী অতিক্রমের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। জার্মানরা ভরোনেজ-এর একটি উপকণ্ঠে প্রবেশ করে; কিন্তু রুশরা তাহাদিগকে তথা হইতে বিতাড়িত করে।

মিশর রণাঙ্গন—এল আলামেন-এর উত্তর অঞ্চলে এক্সিস-বাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া মিত্রপক্ষীয় বাহিনীকে তেল-এল-ঈশার উচ্চভূমি হইতে হটাইয়া দেয়। এল আলামেন রণাঙ্গনের মধ্যাংশে সারাদিনব্যাপী ট্যাঙ্ক যুদ্ধে মিত্রপক্ষ সাফল্য লাভ করে এবং বহু সৈন্য বন্দী করে।

১৭ই জুলাই—

রুশ রণাঙ্গন—ভরোনেজ শহরের উপকণ্ঠে থাকিয়া জার্মানরা ভরোনেজ শহর দখলের চেষ্টায় বিরাট সাঁড়াশী অভিযান সুরু করিয়াছে এবং এক নূতন স্থানে ডন নদী অতিক্রম করিয়াছে। "রেড স্টার" পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, উত্তরে জার্মানদিগকে সাফল্যের সহিত নদীর পশ্চিম তীরে ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণে তাহারা নদীর পূর্ব তীরে একটি সেতু মুখ নির্মাণে সমর্থ হইয়াছে।

এক সোভিয়েট ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ১৫ই মে হইতে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত জার্মানদের ৯ লক্ষ সৈন্য হতাহত ও বন্দী হইয়াছে এবং সোভিয়েটের তিন লক্ষ ৯৯ হাজার সৈন্য হতাহত ও নিখোঁজ হইয়াছে।

মিশর রণাঙ্গন—রুওয়েসেপ উচ্চভূমিকে কেন্দ্র করিয়া নূতন সংগ্রাম সুরু হইয়াছে। গতকল্য জেনারেল রোমেলের বাহিনী এই স্থান হইতে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীকে হঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু জেনারেল রোমেলের ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই যুদ্ধে এক্সিস পক্ষের কতকগুলি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়।

[illegible] জুলাই—

রুশ রণাঙ্গন—মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে, ভরোনেজের [illegible] সোভিয়েট বাহিনী ২০২নং জার্মান পদাতিক রেজিমেণ্ট [illegible] করিয়া ফেলিয়াছে এবং ২২২নং রেজিমেণ্ট সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন [illegible] দিয়াছে। জার্মানরা রোস্টভ ও ককেসাসের প্রবেশ পথ [illegible] অধিকতর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া অগ্রসর হইতেছে। জার্মানরা সিলোরোভোর বরাবর দক্ষিণে একটি কীলক প্রবেশ [illegible] সমর্থ হয়।

[illegible] জুলাই—

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে বলা হয় যে, বর্তমানে উত্তর [illegible] অঞ্চলই জার্মান আক্রমণের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছে। [illegible]ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া সংগ্রাম চলিতেছে। জার্মানরা দলে দলে সৈন্য প্রেরণ করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। আজ [illegible] ধরিয়া ভরোনেজ এলাকায় সোভিয়েট সৈন্যেরা জার্মানদের [illegible]ধ করিয়া আসিতেছে।

মিশর রণাঙ্গন—গতকল্য উত্তরাঞ্চলে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী ঘাটিসমূহ রক্ষা করে। রণাঙ্গনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে মিত্র-সৈন্যদল রুওয়েসেপ উচ্চভূমি ধরিয়া সামান্য একটু অগ্রসর [illegible] দক্ষিণাঞ্চলে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে জানা গিয়াছে।

চীন রণাঙ্গন—চেকিয়াং প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ওয়েনচাও পুনরধিকার করিয়াছে। ওয়েনচাওয়ের দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত জুইয়ানও চীনাগণ কর্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছে তদুপরি চীনারা চেকিয়াং ও কিয়াংসি রেলপথে অবস্থিত হেনযে এবং ইয়াংও পুনরধিকার করিয়াছে।

সুদূর প্রাচ্যের সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বেসরকারী সূত্র হইতে ওয়াশিংটনে যে সকল সংবাদ পৌঁছিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া "নিউইয়র্ক টাইমস" সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে, মাঞ্চুকো-সাইবেরিয়া সীমান্তের উত্তর দিকে জাপানীরা বাছাই করা দুর্ধর্ষ সৈন্য প্রেরণ করিতেছে।

২০শে জুলাই—

রুশ রণাঙ্গন—রুশ সৈন্যগণ রোস্টভের ৯০ মাইল উত্তর পশ্চিমে রেলওয়ে শহর ভরোশিলভগ্রাদ পরিত্যাগ করিয়াছে লিসিচানস্ক হইতে পূর্ব দিকে এবং মিলেরোভো হইতে দক্ষিণ দিকে কামেনস্ক অভিমুখে দুই পথে জার্মানদের অগ্রগতির ফলে ভরো-শিলোভগ্রাদ হইতে সোভিয়েট সৈন্যের অপসরণ অপরিহার্য হয়। ভরোনেজ রণাঙ্গনে সোভিয়েটের পাল্টা আঘাতের প্রচণ্ডতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। ডন নদীর তীরে ভরোনেজ-এর পশ্চিম ও দক্ষিণে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলিতেছে। ৭৫ সংখ্যক জার্মান পদাতিক ডিভিসনের হতাবশিষ্ট সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া এবং নদী অতিক্রম করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতেছে। ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর গতকল্য রাত্রে সোভিয়েট বাহিনী ভরোনেজ-এর ঠিক বিপরীত দিকবর্তী ডন নদীর উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুমুখ দখল করে।

মিশর রণাঙ্গন—মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা রণাঙ্গনের বিভিন্ন এলাকায় তাহাদের ঘাটিসমূহ রক্ষা করে।

২১শে জুলাই—

রুশ রণাঙ্গন—ভরোনেজে ডন নদীর যুদ্ধের এক নূতন পর্যায় আরম্ভ হইতেছে। আক্রমণোদ্যম রুশদের হস্তে চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট পাল্টা আক্রমণ ক্রমেই অধিকতর প্রবল হইতেছে। সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েটবাহিনী এক অঞ্চলে এক্সিস ব্যূহ ভেদ করিয়া জার্মানদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। জার্মানদের ১৫টি ট্যাঙ্ক, কয়েকটি কামান ও মেসিনগান বিনষ্ট হইয়াছে এবং শত শত জার্মান সৈন্যও নিহত হইয়াছে। অপর এক অঞ্চলে সাতশত জার্মান নিহত হইয়াছে। ভোরোশিলোভগ্রাদ রণাঙ্গনের এক অঞ্চলে লালফৌজের আক্রমণে চারশত জার্মান সৈন্য নিহত হয়; কিন্তু লালফৌজকে পরে প্রতিপক্ষের বেষ্টনী এড়াইবার জন্য পশ্চিমে হটিয়া আসিতে হয়। মিলেরোভোর দক্ষিণে এবং ভরোশিলোভগ্রাদের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সোভিয়েট সৈন্যদল অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত পশ্চাদ্ভাগ রক্ষার সংগ্রাম চালাইতেছে। কয়েক অঞ্চলে লালফৌজ পিছু হটিয়া আসিয়া নূতন ঘাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

মিশরের রণক্ষেত্রে বাহ্যতঃ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে সম্ভবত ইহার অর্থ এই যে, উভয়পক্ষই চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। আলেকজান্দ্রিয়ার সংবাদে প্রকাশ, গত চার দিনে মার্সামাত্রুর উপর তিনবার গোলাবর্ষণ করা হইয়াছে। পোতাশ্রয়স্থ একটি ছোট টহলদারী জাহাজ ও অপর কয়েকটি জাহাজই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল। গোলাবর্ষণের ফলে জাহাজগুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

মাদ্রিদের এক সংবাদে প্রকাশ, ফ্রান্সে প্রায় ২৮ হাজার ইহুদীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, জার্মান ওয়ার ট্রাইবুন্যাল ৩৮জন ফরাসী কম্যুনিস্টের মধ্যে ১৫জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে।

১৫ই জুলাই—

মাদ্রাজ আইন সভার কংগ্রেসী দলের সভায় শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী কংগ্রেসী দলের নেতৃত্ব এবং মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহার সদস্যপদ পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ইহাও ঘোষণা করেন যে, মাদ্রাজ পরিষদের স্পীকার শ্রীযুক্ত বুলুসু শম্বমূর্তি তাঁহার স্পীকারের পদ ও মাদ্রাজ পরিষদে তাঁহার সদস্যপদ ত্যাগের সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন।

সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজের ছাত্রী কুমারী ইন্দিরা দত্ত এবং কলিকাতা বেথুন কলেজের ছাত্রী কুমারী নীলিমা মজুমদার যথাক্রমে বর্তমানে বৎসরের আই এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

বরিশালে রাজবন্দী দিবস উপলক্ষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সভা করিতে ও শোভাযাত্রা বাহির করিতে অনুমতি না দেওয়ায় জেলা ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ হইতে ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে নিষেধ করা হয়। ফলে বহুসংখ্যক ছাত্র বিদ্যালয় হইতে অনুপস্থিত থাকে।

১৬ই জুলাই—

হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ছাড়পত্র ব্যতীত হাওড়ার আড়ৎদাররা আর চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন না, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সম্প্রতি এইরূপ নির্দেশ জারী করিয়াছেন। প্রকাশ যে, গত একপক্ষ কাল যাবত হাওড়ার গ্রাম অঞ্চলসমূহের বাজার ও দোকানগুলিতে চাউল সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, খুচরা ব্যবসায়ীরা চাউল সংগ্রহ করিতে না পারাতেই এই অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। তদন্তে ইহাও জানা যায় যে, ৫০ হাজার মণের অধিক চাউল রামকৃষ্ণপুরের গুদামগুলিতে মজুদ রহিয়াছে।

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘড়ি এক ঘণ্টা আগাইয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্ট প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহের নিকট পত্র দিয়া এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মতামত জানাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

১৭ই জুলাই—

ভাওয়ালের মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহিত বালীগঞ্জের ইনসিওরেন্স অফিসার শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ মুখার্জির কন্যা কুমারী ধরাসুন্দরী দেবীর বিবাহ স্থির হইয়াছে। শ্রাবণ মাসের শেষ সপ্তাহে কাশীতে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে।

কলিকাতার ট্রাম কর্মচারিগণ পুনরায় ধর্মঘট করে এবং উহার ফলে কলিকাতা ও হাওড়ার সমস্ত সেক্সনে ট্রাম চলাচল বন্ধ থাকে।

গত সপ্তাহের শেষভাগে মধ্য ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টির ফলে কানহান নদীতে বন্যা হওয়ায় নাগপুরের নিকটস্থ খাপা গ্রামে চারিশত কুটীর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং বার শত বাড়ির ক্ষতি হইয়াছে।

১৮ই জুলাই—

মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী অফিসারের অনুমতি ব্যতীত বাঙ্গলা প্রদেশের বাহিরে কোন স্থানে চাউল ও ধান্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়া বাঙলা সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে দ্রব্য বিক্রয়ের অভিযোগে কলিকাতার বহু ব্যবসায়ীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

নাসিক শহরের যে একটিমাত্র দোকানে কম দরে খাদ্যদ্রব্য বিক্রীত হইত তাহার বাজার দর বৃদ্ধি করায় অদ্য প্রাতে উহা শত শত ক্রেতা কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে।

করাচীতে জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আহূত এক সভায় এইরূপ ঘোষণা করা হয় যে, তিলক মৃত্যুবার্ষিকীর পর প্রস্তাবিত আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে।

১৯শে জুলাই—

অদ্য মধ্যরাত্রে কলিকাতার ৬৩নং রাধাবাজার স্ট্রীটস্থ একটি ত্রিতল ভবনে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ফলে ছয়জন নিহত এবং এগারজন আহত হইয়াছে।

গত ১৯শে জুন যোধপুর জেলে অনশনব্রতী শ্রীযুক্ত বালমুকুন্দজী বিশা মৃত্যুবরণ করায় "বিশা দিবস" উদযাপনের জন্য কলিকাতায় নাগরিকবৃন্দের এক সভা হয়। সভায় যোধপুর সরকারের নীতির তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।

ঢাকায় সোভিয়েট সুহৃদ সঙ্ঘের শ্রীযুক্ত অজিত রায় প্রভৃতি ১৩জন কম্যুনিস্টের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী যে মামলা রুজু করা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

২০শে জুলাই—

বোম্বাই গভর্নমেণ্টের আদেশক্রমে ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী আটক আরও ত্রিশজন কম্যুনিস্ট বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই লইয়া ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস হইতে এ পর্যন্ত মোট ৭৭ জন কম্যুনিস্ট বন্দীকে মুক্তিদান করা হইল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর "কন্যার নিকট পিতার চিঠি" পুস্তকখানি গত দুই বৎসরে যুক্তপ্রদেশ ছাত্র সমাজে সর্বাপেক্ষা বেশী বিক্রয় হইয়াছে। বিক্রীত সংখ্যার পরিমাণ ৬০ হাজারেরও বেশী হইবে।

১৯শে জুলাই—

কলিকাতা আর্য সমাজ হলে কলিকাতা ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। মৌলবী সৈয়দ নৌশের আলী এম এল এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ফ্যাসিস্টবাদ প্রতিরোধের সংকল্প জ্ঞাপন করিয়া এবং সমস্ত ফ্যাসিস্ট বিরোধী ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক বন্দীর আশু মুক্তি দাবী করিয়া সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

"হরিজন" যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়—এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা গান্ধী হরিজন পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"হরিজন" বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতে পারে, কিন্তু আমি যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন যে বাণী ইহা প্রচার করিয়া আসিতেছে, তাহা বন্ধ করা যাইবে না।"

২০শে জুলাই—

বোম্বাইএর সংবাদে প্রকাশ, নাগরিকগণের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সম্পর্কে ১ কোটি টাকার ঋণ সংগ্রহের জন্য সরকারের নিকট অনুমতি চাহিয়া বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অদ্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

কলিকাতায় ট্রাম ধর্মঘটের অবসান হয়।

২১শে জুলাই—

হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের কতকগুলি গুদামে হানা দিয়া পুলিশ আরও ৬ হাজার মণ চাউল উদ্ধার করিয়াছে। হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহকুমা হাকিম সমভিব্যাহারে যাইয়া উক্ত আড়ৎদারদিগকে সমুদয় চাউল অবিলম্বে সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করিতে রাজী করাইয়াছেন

গতকল্য মাণিকতলা পুলিশ মূল্য নিয়ন্ত্রণ অফিসের কর্মচারীদের সাহায্যে ক্যানাল ওয়েস্ট একটি গুদামে অনুমান নয় হাজার মণ চাউলের সন্ধান পায় এবং এই সম্পর্কে তদন্ত চলিতে থাকে।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

৯ম বর্ষ "দেশ" ২৫শ সংখ্যা হইতে ৩৭শ সংখ্যা পর্যন্ত।

৯ই শ্রাবণ, ১৩৪৯

সাহিত্য সংবাদ

"গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা"—'মোগলসরাই মণিমেলা' পরিচালিত 'পরশমণি' মাসিকের শারদীয় উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে:—বিষয়—(১) যে কোন গল্প (ফুলস্কেপ ১০ পাতার অনধিক), (২) যে কোন কবিতা।

নিয়মাবলী:—রচনাগুলি কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী হওয়া চাই। যে কেহ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন। কোন প্রবেশ-মূল্য নাই। পুরস্কারপ্রাপ্ত ও অন্যান্য রচনা "পরশমণি"তে বাহির করা হইবে। উভয় বিভাগেই একটি করিয়া রৌপ্য-পদক দেওয়া হইবে। ২৫শে ভাদ্র রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ। সম্পাদক—বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

রচনাদি পাঠাইবার ঠিকানা:—সম্পাদক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। C/o. কমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, A. S. W. Office, মোগলসরাই, U. P.

রচনা ও চিত্র প্রতিযোগিতা

'কণিকা' পত্রিকার উদ্যোগে এক গল্প, প্রবন্ধ ও চিত্র প্রতিযোগিতা হইবে। রচনাদি ১২ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না। যে কোন বিষয়ের লেখা চলিবে। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ১ম এবং ২য় পুরস্কার যথাক্রমে একটি কাপ এবং একটি পদক। চিত্রের বিষয়:—যে কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য। পাঠাইবার শেষ তারিখ—আগামী ২০শে আগস্ট। "কণিকা"র ছাত্রীদের উদ্যোগে এক প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিযোগিতা হইবে। কেবল ছাত্রীরাই যোগদান করিবেন। পাঠাইবার শেষ তারিখ—আগামী ৩০শে আগস্ট। কোন কিছু জানিতে হইলে তিন পয়সার ডাকটিকিট পাঠান।

প্রধানকর্মসচিব—"কণিকা",
পোঃ ঝিকরা, হাওড়া।

সোভিয়েট 'ডাইভ' বোমারুদের আক্রমণে জার্ম্মাণ যন্ত্রসজ্জিত বাহিনীর দুর্দ্দিন পড়িয়াছে

মিত্রপক্ষের কোন একটি জাহাজ কারখানায় বহু জাহাজ তৈরী হইতেছে

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 1st August, 1942 [৩৮শ সংখ্যা
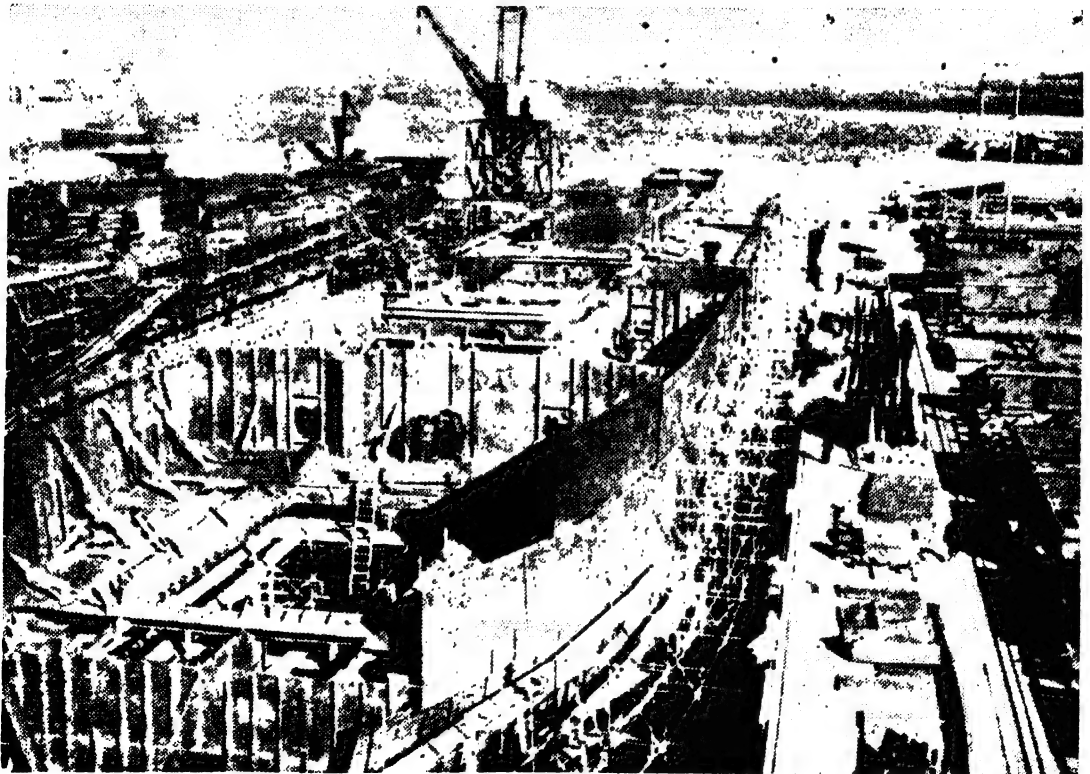
ভবিষ্যতের আভাষ—

কংগ্রেসের সঙ্গে এখনও আপোষ-নিষ্পত্তির চেষ্টা হইবে, কোন কোন গবেষণাপরায়ণ সাংবাদিক আমাদিগকে এমন কথা শুনাইতেছেন। কংগ্রেসের তরফ হইতে আপোষ-নিষ্পত্তির পথ অবশ্য খোলাই আছে। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আজাদ সেদিনও বলিয়াছেন, সম্মিলিত শক্তি যদি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে অভিব্যক্ত আবেদনে সাড়া দিতে প্রস্তুত হন, তবে সমরোদ্যম সম্পর্কে বিস্তৃত বিধি-ব্যবস্থার কথা অনায়াসেই আলোচনা দ্বারা মীমাংসিত হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসই সর্বপ্রথম সম্মিলিত শক্তির নিকট ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কোন কোন সাংবাদিক এমন কথা বলিতেছেন বটে যে, মার্শাল চিয়াংকাইসেক কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের যাহাতে মিটমাট হয় সেজন্য চেষ্টা করিবেন, সেজন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট চেষ্টা করিবেন; শুধু ইহাই নহে, ব্রিটিশ ও আমেরিকার শ্রমিক দলের প্রতিনিধিরা ভারতে আসিয়া এই উদ্যোগে অবতীর্ণ হইবেন। এই ধরণের জল্পনা-কল্পনা শ্রুতিসুখকর এবং সংবাদ-পত্রের পক্ষে জাঁকালো হইলেও ইহার মূলে প্রকৃত সত্য কতখানি আছে সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণই সন্দেহ আছে। আটলাণ্টিক সনদ এবং ইঙ্গ-রুশ চুক্তির পরিণতি দেখিয়া বিদেশী শক্তিবর্গের ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্তরিকতা কতখানি তাহা আমরা বুঝিয়া লইয়াছি। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার শ্রমিক দলের পক্ষ হইতে কংগ্রেস-প্রস্তাবের অপব্যাখ্যা করিয়া যে উত্তেজনামূলক প্রচার কার্যের অবতারণা দেখিতেছি, তাহাতে ভারতের এইসব বিদেশী বন্ধুদের স্বরূপ আমাদের চিনিতে বাকী কিছু নাই। সুতরাং আপোষ নিষ্পত্তির কোন লক্ষণই আমরা দেখিতেছি না। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিবার জন্যই যে গভর্নমেণ্ট প্রস্তুত হইতেছেন, লক্ষণ দেখিয়া ইহাই মনে হইতেছে। ভারত গভর্নমেণ্টের শাসনপরিষদের নয়া সদস্যদের মধ্যে কেহ কেহ ইতি-মধ্যেই কংগ্রেস-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অপব্যাখ্যা করিয়া প্রচারকার্যে ব্রতী হইয়াছেন। একথাও শুনিতেছি যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করিবেন এই উদ্দেশ্য লইয়াই এতদিন পরে ভারতের কমিউনিস্ট দলের উপর হইতে নিষেধবিধি প্রত্যাহার করা হইয়াছে। দেশরক্ষা সচিব স্যার ফিরোজ খাঁ কিছুদিন পূর্বে তাঁহার একটি বক্তৃতায় ইহার আভাষ দিয়াছিলেন; তারপর ভারত গভর্নমেণ্টের শ্রমিক কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত নিম্বকরের মুখেও তেমন কথাই আমরা শুনিয়াছি। বিলাতের 'স্পেক্টেটর' পত্র সেদিন আমাদিগকে শুনাইয়াছেন যে, কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করিবে। ইহার পর আমেরিকা হইতেও ঐ ধরণের যুক্তিরই প্রতিধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। আমেরিকার 'ওয়াশিংটন স্টার' পত্র বলিয়াছেন যে, কমিউনিস্ট বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিয়া ভারত গভর্নমেণ্ট গান্ধীজীর বিরুদ্ধে বন্ধুদের সাহায্য লাভ করিবেন সন্দেহ নাই, ইত্যাদি। এই ধরণের প্রচার-কার্য সত্যই উদ্বেগজনক হইয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদের ভেদ-নীতি প্রয়োগের এই অভিনব কৌশল আমাদিগকে আতঙ্কিত করিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংহতি শক্তিকে নষ্ট করিয়া পরকীয় প্রভুত্ব ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষেই এই সব অপকৌশল প্রযুক্ত হইতেছে। আমরা আশা করি, ভারতের কমিউনিস্টগণের বাস্তব বিচারশীল দৃষ্টির কাছে তাহা প্রচ্ছন্ন থাকিবে না। তাঁহারা সহজেই ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিবেন। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহাদের পক্ষে এ সত্য উপলব্ধি করিতে বিলম্ব ঘটিবে না যে, যাঁহারা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ স্বার্থ সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের কমিউনিস্টদের প্রতি আজ আপ্যায়নপূর্ণ উক্তি করিতেছে, আপাতপ্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যে মুহূর্তে তাহাদের স্বার্থের ঘাঁটি একটু পাকা হইবে, তখনই তাহারা ভারতের স্বাধীনতাকামী কমিউনিস্টদের টুঁটি চাপিয়া ধরিবার জন্য গভর্নমেণ্টকে প্ররোচিত করিতে প্রবৃত্ত হইবে। ভারত গভর্নমেণ্টের ভবিষ্যৎ নীতি সম্বন্ধে কমিউনিস্ট-গণের পক্ষ হইতে দল হিসাবে আমরা এখনও কোন কথা শুনি নাই। স্বামী সহজানন্দ কিংবা মিঃ মাসানীর উক্তি অবশ্য কংগ্রেসেরই প্রতিকূলে; কিন্তু আমরা এই সব উক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করি না; কিংবা সেদিন লাহোরে জনকতক কমিউনিস্ট কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্টের সমক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শনের যে আয়োজন করিয়াছিল, তাহাকে আমরা অবিবেচিত কার্য বলিয়া উড়াইয়া দিতেও প্রস্তুত আছি। বাঙলার কমিউনিস্ট দলের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে এই পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, তাঁহারা জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের নীতি

নিয়ন্ত্রণ করিবেন। আমরা আশা করি, তাঁহাদিগকে এ কথাটা বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না যে, ভারত যদি স্বাধীনতা লাভ করে, তবেই সাম্রাজ্যবাদমূলক শোষণ নীতি হইতে মুক্ত ভারতে জনসাধারণের স্বার্থ সুনিশ্চিত হইবে; নতুবা রুশিয়ার সাম্যবাদ, আন্তর্জাতীয়তা এইসব কথার মূল্য এ দেশের দরিদ্র এবং বুভুক্ষিত জনগণের বাস্তব জীবনে কিছুই নাই। তাঁহারা যে ঐক্যের কথা বলিতেছেন, তৃতীয় পক্ষের প্রভাব যতদিন পর্যন্ত ভারতের শাসনতন্ত্রে বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তাহা যে সার্থক হইবে না, আমরা আশা করি, কমিউনিস্টগণ এ সত্যটিও উপলব্ধি করিবেন।

বিপরীত বুদ্ধি—

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কিরূপ নীতি অবলম্বন করিবেন এতদিন স্পষ্টরূপে বুঝা যায় নাই। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহ যেরূপ অধীর উত্তেজনা প্রকাশ করিতেছিল, তাহাতে বাতাস কোন দিকে বহিতেছে ইহার আভাস পাওয়া যাইতেছিল। সেদিন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস মার্কিনবাসীদের নিকট এক বেতার বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবাসীদের সাম্প্রদায়িকতার মামুলী যুক্তি উপস্থিত করিয়া তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেস অথবা মহাত্মা গান্ধীর দাবী মানিয়া লইতে রাজী হইবার অর্থ ভারতে অশান্তি এবং অরাজকতা সৃষ্টি হইতে দেওয়া। জাপানীদের বিরুদ্ধে যুক্ত-ভাবে সংগ্রাম চালাইবার নিরাপদ ঘাঁটিস্বরূপে ভারতবর্ষকে রাখিতেই হইবে। এ জন্য যাহা কিছু করা দরকার, আমরা নির্ভীকভাবেই তাহা করিব। বলা বাহুল্য, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের এই উক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্বস্পর্ধী মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক, ইহার মূলে যুক্তি কিছুই নাই। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ভারতবর্ষকে [illegible]ভাবে স্বাধীনতা প্রদান করেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে [illegible] অরাজকতা আরম্ভ হইয়া যাইবে ইহার সঙ্গত কোন কারণই ন[illegible] ভারতবর্ষের সকল দল, এক মুসলিম লীগের কয়েকজন [illegible] ছাড়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবীর সম্বন্ধে এক[illegible] এরূপ অবস্থায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতা [illegible] করিয়া লইলে, সমগ্র ভারতে জাতীয়তার যে প্লাবন বহি[illegible]বে, [illegible] জনকয়েক স্বার্থসন্ধীর চেষ্টা চিরকালের জন্য বি[illegible] হ[illegible] তৃতীয়পক্ষের প্রশ্রয় পাইতেছে বলিয়াই ইহাদের [illegible] যত কিছু [illegible]জো আস্ফালন চলিতেছে। তৃতীয়পক্ষ তাহা[illegible]দের পৃষ্ঠপো[illegible] ছাড়িয়া যে মুহূর্তে স্পষ্টভাবে ভার[illegible]তের স্বাধীনতা[illegible]ক হইবেন, সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের [illegible] প্রকার অপচেষ্টা[illegible] অবসান ঘটিবে। তারপর জাপানীদের [illegible]রুদ্ধে সংগ্রাম চালা[illegible] জন্য ভারতবর্ষকে নিরাপদ ঘাঁটি-[illegible]রূপে রাখিবার [illegible] স্যার স্ট্যাফোর্ড যে যুক্তি [illegible]স্থাপিত করিয়াছেন, তাহারও কোন মূল্য নাই। [illegible] গ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌ[illegible] আবুল কালাম আজাদ এবং [illegible]ডিত জওহরলাল নেহরু উভয়েই কংগ্রেস প্রস্তাবের [illegible] বিশ্লেষণের দ্বারা ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে মিত্রশক্তির সম্মিলিত সমর-ব্যবস্থায় বিশেষ কোন বিপর্যয় ঘটিবে না, বরং সমগ্র ভারতের আন্তরিক সহযোগিতায় জাপানীদের প্রতিরোধের পক্ষে সমর বল এবং সমর সঙ্গতি উভয় দিক হইতেই তাঁহারা সমধিক শক্তিশালী হইবেন। তারপর, গান্ধীজী সেদিনও 'হরিজন' পত্রে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 'কংগ্রেস অভ্রান্ত ভাষায় এ কথা স্বীকার করিয়াছে যে, জাপানীদের আক্রমণের প্রতিরোধকল্পে ব্রিটিশ প্রভুত্ব ভারত হইতে অপসারিত হইলেও মিত্রশক্তির সেনাদল স্বাধীন ভারতের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভারতে অবস্থান করিতে পারিবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন বলিয়া ঘোষিত হইবার পরও তাঁহারা যেরূপ সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিবেন আরও বেশী স্বাধীনভাবে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন।' সুতরাং স্বাধীন ভারতে মিত্রশক্তির সমর-ব্যবস্থার প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টির আতঙ্কের কোন কারণ তো কংগ্রেসের প্রস্তাবে নাইই, অধিকন্তু বর্তমানে মিত্রপক্ষকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব-সাধারণের মধ্যে ঐকান্তিক আগ্রহের যে অভাব রহিয়াছে, তাহা দূর করিয়া তাঁহাদের স্বপক্ষে ভারতের সকল শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার শুভ সঙ্কল্পই সে প্রস্তাবে রহিয়াছে। ভারত-বর্ষ জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদিগকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যেই স্বাধীনতা চায়। মহাত্মাজী জাপানীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া 'হরিজন' পত্রে সেদিনও সে কথা শুনাইয়াছেন। তিনি বলেন 'আমি মনে করি, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এখন যদি ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তবে অপ্রসন্ন ভারতের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহ-যোগিতা তাঁহারা লাভ করিবেন এবং আপনাদের (অর্থাৎ) জাপানীদের নিষ্ঠুরতা রোধ করিবার শক্তি তাঁহারা অর্জন করিতে পারেন।' ইহার পরেও যদি কেহ কংগ্রেস প্রস্তাবের উদ্দেশ্য অরাজকতা সৃষ্টি করা, কিংবা জাপানীদের কাছে ভারতবর্ষকে বিকাইয়া দেওয়া, এই ধরণের অপব্যাখ্যা করেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, নেহাৎ গায়ের জোরেই তাঁহারা তাহা করিতেছেন এবং করিতেছেন একটা অভিসন্ধি লইয়া এবং ভারতবর্ষ চিরদিন পরাধীন থাকুক, বলিতে গেলে তাঁহাদের অভিসন্ধির তাৎপর্য ইহাই গিয়া দাঁড়ায়। স্বাধীন ভারত যে তাঁহাদের নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থ অর্থাৎ সমরোদ্যমে সাফল্যের পক্ষে সহায়কই হইবে, সাম্রাজ্যবাদমূলক সংস্কারের জন্য তাঁহারা এই সত্যটি উপলব্ধি করিতেছেন না। তাঁহাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর যদি পরিবর্তন না হয়, তবে তাহা-দেরই বিপত্তির কারণ ঘটিবে। তাঁহারা আমাদের পরামর্শ অনুকূলভাবে গ্রহণ করিবেন, অতীতের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে এ বিশ্বাস আমরা হারাইয়াছি, তবু কর্তব্যের অনুরোধে এই সতর্কবাণী আমাদিগকে উচ্চারণ করিতে হইতেছে।

লবণ সঙ্কট—

চাউল আছে যথেষ্ট, কয়লার অভাব নাই, চিনি প্রচুর পরিমাণে মজুত রহিয়াছে, সরকারের এই ধরণের আশ্বিস্তপূর্ণ বিবৃতি দৈনন্দিন অভাব-পীড়িত জনসাধারণের পক্ষে ক্রমেই

বিরক্তিকর হইয়া উঠিতেছে। মোটা মাহিয়ানা পকেটে পুরিয়া যাঁহারা এই ধরণের বিবৃতি প্রচার করেন, লোকের দুঃখকষ্ট উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা তাঁহাদের নাই। সম্প্রতি ভারত গভর্নমেণ্ট দেশের লবণ সমস্যা সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে সে পরিচয় আমরা প্রভূতরূপেই পাইয়াছি। এই বিবৃতিতে তাঁহারা বলিতেছেন, ভারতে প্রতি বৎসরে মোট ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ মণ লবণের দরকার হয়। গত ১৫ই জুন যে হিসাব লওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, দেশে এখনও ৩ কোটি ৬২ লক্ষ মণের মত লবণ জমা আছে; সুতরাং বৎসরের যে কয়েক মাস বাকী আছে, তাহার জন্য ঐ পরিমাণ লবণ যথেষ্ট। কিন্তু কথা দাঁড়ায় এই যে, লবণ যথেষ্ট আছে বলিলেই সমস্যা মিটে না, লোকের অভাব মিটিবার পক্ষে বাজারে পর্যাপ্ত লবণ সরবরাহ বজায় থাকার ব্যবস্থা প্রয়োজন। ভারত সরকার বলিতেছেন যে, সেই বিষয়েই সন্দেহ রহিয়াছে। তাঁহাদের মতে মধ্যে মধ্যে কোন কোন এলাকায় লবণের অভাব ঘটিতে পারে; কারণ ইদানীং ভারতের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মাল চালান দিবার পক্ষে গাড়ির অভাবে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। এ অসুবিধা দূর করিবার জন্য তাঁহারা অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এ অসুবিধা দূর করিবার উপায় নাই। বিবৃতির এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, লবণ ভারতের এক অঞ্চলে জমা থাকিলেও অন্য অঞ্চলের গরীবের ভাতে নুনের অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা যোল আনাই থাকিবে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য লবণ প্রস্তুতের অবাধ অধিকার দেশবাসীকে দান করিবার জন্য গভর্নমেণ্টকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট তাহাতে রাজী হন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। স্বাধীনভাবে লবণ তৈয়ারী এবং বিক্রয়ের অধিকার যদি দেশের লোককে দেওয়া যায়, তবে লবণ শুল্ক হইতে গভর্নমেণ্টের যে আয় তাহা হ্রাস পাইবে। সুতরাং গরীবের পক্ষে অবস্থা অদ্ভুত হইয়া দাঁড়াইল। গভর্নমেণ্ট লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিজেরা দায়িত্ব লইবেন না, লবণ না পাওয়া গেলে দেশের লোকে যে ছোটখাট রকমে ঘরোয়াভাবে লবণ প্রস্তুত করিয়া লইবে এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে খুচরা হিসাবে তাহা বিক্রয় করিয়া লবণের অভাব পূরণ করিবে, তাহাতেও কর্তারা বাদ সাধিতেছেন। গরীবের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব পূরণের কর্তৃপক্ষের এই ধরণের উদাসীনতা তাঁহাদের হৃদয়হীনতারই পরিচায়ক। এ ক্ষেত্রে সরকারী রাজস্ব লোকসানের যে যুক্তি ভারত সরকার উপস্থিত করিয়াছেন, আমরা তাহা সমর্থন করিতে পারি না। লবণ তৈয়ারী সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বাজারে বিক্রয় করিবার উপযুক্তভাবে তাহা পরিষ্কার করা আরও কঠিন। এরূপ অবস্থায় যাঁহারা নিতান্ত অভাবের চাপে পড়িত, তাহারাই ঘরোয়াভাবে লবণ প্রস্তুত করিত, সে জন্য ভারত গভর্নমেণ্টের বিশেষ কোন ক্ষতি ঘটিত বলিয়া আমাদের মনে হয় না এবং সামান্য যদি কিছু ক্ষতি ঘটিবার কারণও তাহাতে থাকে, তাহা হইলেও সমস্যাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সাময়িক জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে তাঁহাদের ইহাতে সম্মত হওয়া উচিত ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈষ্ণব সাহিত্য—

গত ২৫শে এবং ২৬শে জুলাই কলিকাতায় বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গেল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম এ, ডি-লিট মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"দুঃখের বিষয় এই যে, সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট অংশ বৈষ্ণব সাহিত্যের দিকটা সাধারণ পণ্ডিতমণ্ডলীর ও শিক্ষা বিভাগের কর্ণধারগণের দ্বারা একপ্রকার অনাদৃত হইয়াই আছে। কিছুকাল পূর্ব হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এম এ পরীক্ষায় বৈষ্ণব দর্শন অন্যতম পাঠ্য বিষয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু গোস্বামী গ্রন্থের আলোচনা ও প্রচারের পক্ষে উহা আদৌ পর্যাপ্ত নহে। বহু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির প্রদত্ত অর্থে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ও গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি লেকচারার বা বিশেষজ্ঞের পদ সৃষ্ট হইয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনার জন্য এইরূপ কোন ব্যবস্থা আজও হয় নাই। বৈষ্ণব সমাজে বিত্তশালী ব্যক্তির অভাব নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ প্রদান করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচারের পথ যে সুগম ও প্রশস্ত হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। নৃপেন্দ্রবাবু সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি সত্যই বলিয়াছেন—'বৈষ্ণব সাহিত্য বাঙলা তথা ভারতের অমূল্য সম্পদ। শিক্ষিত ও স্বদেশপ্রেমিক বাঙালী যদি দেশের এই অমূল্য সম্পদের সন্ধান না রাখেন, তবে তাহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?' আমরা নৃপেন্দ্রবাবুর এই উক্তির প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—

গত ১০ই শ্রাবণ, রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব সমারোহের সঙ্গে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই পঞ্চাশ বৎসরে পূর্ণতা লাভ করিল। অর্ধশতাব্দীকাল এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া বঙ্গজননীর শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের সাধনা সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। আজ বঙ্গভাষার মর্যাদা, বাঙলা সাহিত্যের মর্যাদা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, ভারতের সর্বত্র, এমনকি, জগতের সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এজন্য সমগ্র বাঙালী জাতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিকট কৃতজ্ঞ। সাহিত্য-পরিষদের এই সাধনায় সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ এখনও ঘটে নাই। এ সাধনা বড়ই দুষ্কর সাধনা। সেদিন পরিষদে সভাপতিস্বরূপে স্যার যদুনাথ সমগ্র বাঙালী জাতিকে এ সম্বন্ধে তাহাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যে সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন, সে সাধনায় জগদীশচন্দ্র, [illegible] [illegible]দ, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন [illegible] এই সাধনাকে সার্থক করিতে হইলে বাঙলা দেশের সকলের [illegible] [illegible]য়া এবং আনুকূল্য লাভ করা আবশ্যক। বাঙালীর এই [illegible] [illegible]ীয় পরিষৎ যেন সমগ্র বাঙালী সমাজের সদুপদেশ এবং [illegible] [illegible]ম্য

হইতে বঞ্চিত না হয় এবং আমাদের সাহিত্য সেবকগণ যেন সে অনুগ্রহের উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। ভগবানের কৃপায় পূর্বাকাশের শেষ বজ্রনাদী মেঘ কিছুদিন পরে উড়িয়া যাইবে, ফলে আবার শান্তির সূর্য দেখা দিবে এবং সাহিত্য ও কলা-কুসুম আবার বিকশিত হইয়া জাতীয় দেহে নবজীবন-রস ঢালিয়া দিবে। স্যার যদুনাথের এই প্রার্থনা সার্থক হউক, সাহিত্য পরিষদের অর্ধশতাব্দীব্যাপী সাধনার জয়ন্তী-উৎসব বর্ষে পদার্পণের এই শুভলগ্নে আমরা ইহাই কামনা করিতেছি।

কুইনাইনের অভাব—

গত ১১ই শ্রাবণ, সোমবার জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর উদ্যোগে বাঙলা সরকারের দপ্তর বাঙলায় কুইনাইন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য সমস্যার মত কুইনাইন সমস্যাও এক অদ্ভুত সমস্যা। ভারত গভর্নমেণ্ট সম্প্রতি একটি ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, দুই বৎসর চলিবার মত যথেষ্ট পরিমাণ কুইনাইন তাঁহাদের হাতে আছে; অথচ বাজারে কুইনাইন দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙলা দেশের কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষভাবে টাঙ্গাইল মহকুমায় এ বৎসর ম্যালেরিয়া অত্যন্ত ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছে; কিন্তু কুইনাইনের অভাবে কোনরূপ চিকিৎসা চলিতেছে না। এরূপ অবস্থায় কুইনাইন সরকারের হাতে যথেষ্ট আছে, এই ধরণের কথার ম[illegible]। দেশের লোকের সমস্যার সমাধানের দিক হইতে কিছুই আছে [illegible]লিয়া আমরা মনে করি না। বাঙলা দেশের ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত স্থানসমূহে যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কুইনাইনের সরবরাহ হয় এবং ব্যাধির প্রতিকার ঘটে, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

বাহিরে বাঙলার চাউল—

সম্প্রতি বাঙলা সরকার এই আদেশ জারী করিয়াছেন যে, বাঙলা সরকারের [illegible]মূল্য নিরূপণ বিভাগের চীফ কণ্ট্রোলারের অনুমতি ব্যতীত [illegible] কেহ বাঙলা দেশের বাহিরে বাঙলা দেশ হইতে চাউল রপ্তানি করিতে পারিবে না। আমরা বাঙলা সরকারের এই সিদ্ধান্ত [illegible]অনুমোদন করি[illegible]; কিন্তু বঙ্গীয় বণিক-সভা এই সম্বন্ধে [illegible] আর একটি [illegible] উত্থাপন করিয়াছেন; তাঁহারা জানিতে চাহি[illegible]য়াছেন, বাঙলা [illegible] যে চাউল ক্রয় করিয়া মজুদ রাখিয়াছেন, [illegible]তৎসম্বন্ধেও ঐ [illegible] প্রযুক্ত হইবে কি না; সম্ভবত তাহা নহে; [illegible] কারণ, ভারত [illegible] সিভিল সাপ্লাইস বিভাগের কমিশনার [illegible] বণিক-সভার প্র[illegible]দের নিকট কিছুদিন পূর্বে বলিয়াছেন [illegible] যে, বাঙলা সর[illegible]ক মজুদ চাউল আমদানী করিয়া [illegible] অন্য প্রদেশের অ[illegible]মি[illegible]বার ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্বন্ধে [illegible] ভারত সরকার বি[illegible] করিতেছেন। আমরা এইরূপ ব্যবস্থার [illegible] প্রতিবাদ ই[illegible]পূ[illegible] এবং বলিয়াছি যে, বাঙলার [illegible] চাউলের দ্বারা [illegible] অভাব মিটাইবার দিকে লক্ষ্য রাখাই [illegible] সর্বপ্রথমে প্রয়ো[illegible] বাঙলায় চাউলের দর ক্রমেই চড়িতেছে [illegible] বাজারে চাউল[illegible] পড়াতে বাঙলা সরকারকে পর্যন্ত [illegible]লের পূর্ব নির্ধা[illegible]মূল্যের পরিবর্তন সাধন করিয়া মাঝারি চাউলের দাম মণকরা এক টাকা ইতিমধ্যেই চড়াইয়া দিতে হইয়াছে; এরূপ অবস্থায় বাঙলা দেশে যে পরিমাণ চাউল আছে, বাঙলা দেশের অভাব মিটাইয়া তাহা অন্য প্রদেশে রপ্তানি করিবার মত উদ্বৃত্ত হইবে, এমন যুক্তির আমরা কোন মূল্য দেখি না। আমরা আশা করি, বাঙলা সরকার তাঁহাদের ক্রীত চাউলে বাঙলা দেশের অভাব মিটাইবার দিকেই দৃষ্টি রাখিবেন।

জাপানের নূতন উদ্যম—

চীনের লড়াই ছাড়া জাপানীদের সমরোদ্যমের অন্য দিক হইতে এ পর্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছিল না। প্রথম দিকে মনে হইয়াছিল যে, সিঙ্গাপুর এবং ব্রহ্মদেশ অধিকার করিবার পর প্রশান্ত মহাসাগরে তাহাদের প্রভুত্ব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা অস্ট্রেলিয়ার উপর ঝুঁকিবে; কিন্তু মিডওয়ে দ্বীপের কাছে নৌযুদ্ধের পর জাপানীদের নৌবহর কিছুদিন এদিকে একেবারে নীরব ছিল। সে নৌবহর প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চল ছাড়িয়া উত্তর অঞ্চলের দিকে যায় এবং উত্তর আমেরিকার আলাস্কার উপকূলের কাছে এলিউসিয়ান দ্বীপে জাপানীদের সৈন্য নামায়। আমেরিকা এবং রুশিয়ার মধ্যে নৌ-গতিবিধির পথ রুদ্ধ করাই সম্ভবত এক্ষেত্রে জাপানীদের এ নীতির উদ্দেশ্য ছিল; সম্প্রতি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানীদের নূতন কর্মতৎপরতার আভাস পাওয়া গিয়াছে। তাহারা পপুয়া দ্বীপে সেনা নামাইয়াছে। এখানে সেনা নামাইয়া তাহারা নিউগিনির মোরসবী বন্দর এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন বন্দরের উপর বোমা বর্ষণের বোধ হয় সুবিধা করিতে চায়। জাপানীদের এই কার্য অস্ট্রেলিয়ার সমরোদ্যমকে পুনরায় সচকিত করিয়া তুলিয়াছে। আমেরিকার দৃষ্টি আটলাণ্টিকের পথে ইংলণ্ড এবং ভারত মহাসাগর ও উত্তর মহাসাগরে রুশিয়ার সাহায্যপথ হইতে অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করাই জাপানীদের এই নূতন উদ্যমের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

কথা ও কাজ—

ইংলণ্ড ও আমেরিকার রাজনীতিকদের অন্তরে বিশ্বপ্রেম এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীর উজান বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব ইডেন সাহেব নটিংহামশায়ারের সভায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শুনাইয়াছেন—'সমগ্র জগৎ আজ জাগিয়া উঠিয়াছে; যুদ্ধের পর কয়েকটা জাতি নিজেরা বিশেষ সুবিধা করিয়া লইয়া জগৎ জুড়িয়া বসিতে চেষ্টা করিবে, এমন মনে করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইবে। একটা জাতির স্বাধীনতার বিনিময়ে কোন শক্তির আর্থিক সুবিধা লাভের সুযোগ আর থাকিবে না ইত্যাদি। ইহার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট-সেক্রেটারী মিঃ কর্ডেল হাল যুদ্ধোত্তর বিশ্বের কল্পনাময় চিত্র আঁকিয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছেন যে, কোন দেশের অতঃপর আর কোন অভাব থাকিবে না। আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর অর্থনৈতিক বন্ধন হইতে সকল জাতি মুক্ত হইয়া উন্নতির পথে সমানভাবে অগ্রসর হইতে থাকিবে। সেই সঙ্গে মিঃ কর্ডেল হাল আটলাণ্টিক সনদের মহিমাও প্রচার করিয়াছেন এবং ইহার

অব্যবহিতকাল পরেই ইংলন্ডের উপকূল হইতে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের আন্তর্জাতিক মৈত্রীর উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, আটলান্টিক সনদ প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বন্দ্বের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আমাদের অর্থনীতিকে মানবকল্যাণ সাধনের পথে প্রযুক্ত করিতে হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনীতিকদের মুখে এইসব বড় বড় কথা শুনিয়া আমাদের মনে আশার পরিবর্তে আশঙ্কারই সৃষ্টি হইয়া থাকে। আমাদের মতে বিশ্বে যতদিন পর্যন্ত দুর্বল জাতির স্থান থাকিবে অর্থাৎ পশুশক্তির বলে পরাধীন করিয়া রাখিবার মত জাতি বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত ইউরোপ এবং আমেরিকার রাজনীতিকদের এই ধরণের বড় বড় কথা অকেজোই থাকিয়া যাইবে। আজ তাঁহাদের মুখে কথায় যে শুভেচ্ছা রহিয়াছে, অপর জাতির দুর্বলতার সুযোগে স্বার্থের সূক্ষ্ম সূত্রে তাহা সাম্রাজ্যবাদমূলক শোষণ নীতিতেই সত্য হইয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে পরাধীনতাকে প্রতিহত করিবার উপযুক্ত শক্তি যদি প্রত্যেক দেশ এবং জাতি অর্জন করে, তখন আর তেমন আশঙ্কার কারণ থাকিবে না। দুর্বল যে, সে কেবল যে নিজের দুর্বলতার ফল নিজেই ভোগ করে, এমন নয়, তাহার সংস্পর্শে প্রবলের মধ্যেও অসৎ প্রবৃত্তি পুষ্ট হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। প্রত্যেক জাতি স্বাধীনতার জন্য সত্য-সঙ্কল্প হইবার পথই জগতের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ। অপরের উদারতা বা অনুগ্রহ রাজনীতিক্ষেত্রে নিগ্রহেরই কারণ সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইউরোপ এবং আমেরিকার রাজনীতিকদের শুভেচ্ছাপূর্ণ উচ্ছ্বাস আমাদিগকে এই সত্য সম্বন্ধে যেন বিভ্রান্ত করিতে না পারে।

লবণ ও চিনি নিয়ন্ত্রণ—

রেল এবং স্টীমারযোগে বহু পরিমাণ লবণ ও চিনি বাঙলা দেশে আসিতেছে, অথচ বাজারে খুচরা জিনিস বিক্রেতাদের কাছে ঐগুলি পাওয়া যায় না এবং পাওয়া গেলেও খরিদ্দার-দিগকে সে জন্য সরকারী নির্ধারিত দরের অপেক্ষা অনেকক্ষেত্রেই চড়া দাম দিতে হয়। ভুক্তভোগী মাত্রেই এ সমস্যার কথা অবগত আছেন। বাঙলা সরকার এতদিন পরে এ সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহারা বলিতে-ছেন, এইসব মাল লাভখোরদের হাতে যাইতেছে এবং তাহারা চক্রান্ত করিয়া কৃত্রিমভাবে বাজারের দর চড়াইতেছে বা মালের অভাব সৃষ্টি করিতেছে। বাঙলা সরকার এ জন্য এই নির্দেশ জারী করিয়াছেন যে, সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অনুমতিপত্র ছাড়া কলিকাতা এবং হাওড়ার কোন রেল বা স্টীমার স্টেশন হইতে কেহ ঐ সব মাল লইতে পারিবে না এবং অনুমতিপত্রে নির্দিষ্ট সর্ত ব্যতীত অন্যভাবে মাল বিক্রয় করিতে পারিবে না। উপরে দেখিতে এই ব্যবস্থা অনেকটা কার্যকর বলিয়াই মনে হইবে, কিন্তু লাভখোরদের বুদ্ধির সূক্ষ্মতাও কম নয়, তাহারা যাহাতে অসদুপায়ে নির্দেশ এড়াইয়া মাল লইতে না পারে, সেজন্য সরকারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে এইসব ছাড়পত্র লইতে ব্যবসায়ীদিগকে যাহাতে বিশেষ কোন ঝঞ্ঝাট না পোহাইতে হয়, তেমন ব্যবস্থার প্রতিও সরকারের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হইতে ছাড়পত্র বাহির হইতে যদি অনর্থক বেগ পাইতে হয়, তবে পরোক্ষভাবে ঐসব মালের কারবারের পক্ষে অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা

আগামী ২২শে শ্রাবণ, ইংরেজি ৭ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথের পরলোকযাত্রার প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে 'দেশ' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। এই কারণে ৩৯শ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস, গল্প ও অন্যান্য বিভাগীয় বিষয়গুলি থাকিবে না।

রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যায় যাঁহাদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী,
মিঃ হুমায়ুন কবীর,
শ্রীসজনীকান্ত দাস,
শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী,
শ্রীমৃণালকান্তি বসু,
শ্রীশান্তিদেব ঘোষ,
শ্রীপরিমল গোস্বামী,
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠি ও ফটোচিত্র প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক, 'দেশ'।

২৪

মহিষাসুর বধ কীর্তনই বটে—

প্রথম রাতটা মহেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, শয়নের পূর্বেও ঠিক করিয়াছিলেন—এবার উহারা থামিবে। যাই হোক, যতক্ষণ না থামে তিনি বামদিকে কাত হইয়া শুইয়া দক্ষিণ কানের উপর দুইটা বালিশ চাপা দিয়া ছিলেন; থাকমণির অবস্থা আরও কাহিল হইয়া উঠিয়াছিল। সারাদিন সংসারে ভূতের মত খাটিয়া রাত্রে যে নিশ্চিন্তভাবে চার দণ্ড ঘুমাইবেন, তাহারও যো নাই।

ইহার উপর রাত সাড়ে এগারোটায় যখন খোল করতালের সঙ্গে দুইটা কানেস্তারা বাজিতে সুরু করিল তখন নিস্তব্ধভাবে বিছানায় ঘুমানোর চেষ্টা করা বৃথা হইল।

মহেশ শয্যাত্যাগ করিলেন—।

একেবারে ঘর ছাড়িয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন, ক্রোধে তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। এই যে ব্যাপারটা ঘটিতেছে ইহার একটা হেস্ত নেস্ত করিয়া তবে তিনি ছাড়িবেন, সুমন্ত রাস্কেলকে একবার বুঝাইয়া দিবেন এমন করিয়া ভূতের মত উপদ্রব মানুষ হইয়া তিনি কিছুতেই সহ্য করিবেন না। সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে; যতক্ষণ খোল করতাল বাজিতেছিল, সম্মিলিত পনের কুড়িটি কণ্ঠের চীৎকার বাতাস ভেদ করিয়া কানে আসিয়াছিল তিনি তাহাও সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আবার আরম্ভ হইয়াছে দুইটি কানেস্তারার শব্দ, কাঁসির খন খন ও বাঁশির গোঁ গোঁ আওয়াজ; মানুষের সহ্যের অতীত।

রুদ্রমূর্তিতে মহেশ আসিয়া দাঁড়াইলেন। একেবারে সুমন্তের দরজায়,—সে ঘরের দৃশ্য তখন অতি অপূর্ব। সারি সারি কীর্তনীয়ারা বসিয়াছে, কেহ বাজাইতেছে খোল, কেহ করতাল, কেহ কাঁসি, কেহ বাঁশি, কেহ কানেস্তারা।

"সুমন্ত—"

যেন মেঘের গর্জন, কিন্তু সে মেঘের গর্জনও এসব শব্দের নীচে তলাইয়া গেল।

মহেশ আবার চীৎকার করিলেন, "সুমন্ত—"

সুমন্তের দৃষ্টি মহেশের উপর পড়িল—

"এ কি কাকামশাই যে—আসুন আসুন।—আমাদের অনেক সৌভাগ্য—আপনি আমাদের মহিষাসুর বধকীর্তন শুনতে এসেছেন। ওহে মহেশ, রতন, ভোলা, হাঁদু, তোমরা খুব ভালো করে কীর্তন ধর হে, কাকামশাই আজ নিজে তোমাদের কীর্তন শুনতে এসেছেন বোঝ ব্যাপারখানা—

উৎসাহিত কীর্তনীয়া দল জোরে খোল করতাল ও কানেস্তারায় আঘাত করিতেই মহেশ জোর করিয়া দরজার উপর ঠেলিয়া উঠিলেন—দুই হাত সামনের দিকে সজোরে আন্দোলিত করিয়া বিকটসুরে বলিয়া উঠিলেন, "থামো—থামো বলছি, একটুখানি থামো—"

সকল যন্ত্রই অকস্মাৎ থামিয়া গেল, গায়কেরা চুপ করিয়া গেল—।

সুমন্ত করতাল রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বিনীতকণ্ঠে বলিল, "ব্যাপার কি কাকামশাই, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই যেন—"

"প্রকৃতিস্থ নেই—" মহেশ ধরিয়া মারেন আর কি—

"প্রকৃতিস্থ থাকবার হাল রেখেছো তোমরা? রাত বারোটা বাজলো, এখন কি না আরম্ভ হয়েছে কানেস্তারার ঢ্যাম ঢ্যামানি, একেবারে জ্বালাতন। তোমার মতলবটা কি বাপু, বাড়িতে থাকতে দেবে,—না সব নিয়ে বেরিয়ে যেতে বল? সারাদিন খেটেখুটে রাত্রে এসে যে ঘুমাব, তার যোও যে রাখলে না দেখছি।"

বলিতে বলিতে হাত বাড়াইয়া কীর্তনীয়া দলকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই সব ছোটলোকগুলোর চাঁছাছোলা গলার একত্রে চ্যাঁচানো—এ কি আর বরদাস্ত হয় বাপু?"

সবিনয়ে সুমন্ত বলিল, "আজকালকার দিনে ছোটলোক কথাটা বলবেন না কাকামশাই, হরিজন বলুন—ছোটলোক কথাটা ওদের প্রেস্টিজে বাধে। খবরের কাগজ পড়েন—এই গিয়ে আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী,—ইংরেজি অমৃতবাজার, অ্যাডভান্স এগুলোর কথা না হয় ছেড়েই দেই—এই সব বাঙলা কাগজ এক আধবার পড়লে জানতে পারবেন মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন ওদের যেন হরিজন বলা হয়—ছোটলোক কথাটা মোটে উল্লেখ করা না হয়। আপনি কি না অনায়াসে—"

চেঁচাইয়া উঠিয়া মহেশ বলিলেন, "চুলোয় যাক তোমার খবরের কাগজ, চুলোয় যাক তোমার গান্ধী। ছোটলোককে একশোবার ছোটলোক বলব—ছোটলোক—ছোটলোক, ছোটলোক—

হাজারবার বলব, লক্ষবার বলব—

তাঁহার কণ্ঠ ক্রোধের আতিশয্যে রুদ্ধ হইয়া গেল।

শান্তকণ্ঠে সুমন্ত বলিল, "আহা রাগ করছেন কেন, শান্ত হোন— ধৈর্য ধরুন। যাক গে চুলোয় যাক গান্ধী, তাই বলে খবরের কাগজগুলোকে চুলোয় পাঠালে তো চলবে না কাকামশাই, দেশের বিদেশের খবর দেবে কে? এই দেখুন জার্মানীতে হিটুখুড়ো কি কাণ্ডটাই বাঁধিয়েছেন—একেবারে অগ্নিঅবতার,—হাঁ করছেন আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি স্থান গলাধঃকরণ করছেন। হ্যাঁ, বীর বটে একখানা আমাদের হিটু খুড়ো,—একেবারে কাঁঠালের আমসত্ত্ব দেখিয়ে ছাড়ছে।"

মহেশের কণ্ঠ দুরন্ত ক্রোধে রুদ্ধ হইয়া গেছে, নির্বাকে কেবল

আগুন ঢালা চোখে। তিনি সুমন্তের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

সুমন্ত বলিল, "যাক আজ ঘরে যান, কাল সকালেই আমি আমার কাগজখানা পড়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেব—একবার পড়বেন দয়া করে। ইটালীতে মুসো মেসো, আমেরিকায় রুজো জ্যোঠা, জার্মানিতে হিটু খুড়ো, রাশিয়াতে স্টেনা মামা আর খাস ইংলন্ডে আমাদের চেচে দাদা কি কান্ডই বাঁধিয়েছে, দেখবার মত। ভাববেন না কাকামশাই, সব ঠিক হল বলে, কুছ পরোয়া নেই।"

ফিরিয়া দলের পানে তাকাইয়া বলিল, "তোমরা অবাক হয়ে শুনছো কি বল দেখি, এ সব তোমাদের জানা কথা। নাও তোমরা আরম্ভ কর দেখি সেই কীর্তনখানা—জয় মহিষাসুর নাশিনী দুর্গে—"

কীর্তনীয়া দল সুর করিতেই মহেশ ক্ষিপ্তভাবে একেবারে ঘরের মাঝখানে গিয়া তান্ডব নৃত্য সুরু করিলেন, "থামো থামো বলছি নইলে সব মেরে ধরে একাকার করব,—সব খুন করে ফেলব, রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেব এখানে।"

তাঁহার বীরদর্পে একমাত্র সুমন্ত ছাড়া আর সকলেই ঘাবড়াইয়া গেল।

সুমন্ত ধীরভাবে বলিল, "ব্যাপার কি বলুন তো কাকামশাই, এই রাত্রে ভরা আসরের মাঝখানে আপনার এরকম মহিষমর্দনরূপে আবির্ভূত হয়ে এদেরকে মারধর করতে যাওয়ার কারণ তো কিছুই বুঝছি নে।"

গুরুগম্ভীরকণ্ঠে মহেশ বলিলেন, "বন্ধ করো—এই রাত দুপুরে এই ভূতের মত চেঁচানো আমি বরদাস্ত করব না—সোজা কথা বলে দিচ্ছি।"

সুমন্ত বলিল, "এ আপনার অন্যায় অনুযোগ, আমার নিজের ঘরে আমি গান-বাজনা করব না—?"

"না—"

বর্ধিতরোষ মহেশের মুখে আর কথা ফুটিল না। সুমন্ত বলিল, "আইনত কিন্তু নিজের ঘরে যা খুসি করবার অধিকার সবারই আছে তা জানেন তো?"

মহেশ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "নিকুচি করেছে তোমার আইন, আমি আইন মানতে চাইনে।"

সুমন্ত কটু হাসিয়া বলিল, "ওকথা বলবেন না কাকামশাই, শুনলে পুলিশে এসে হাতে কড়া পরাবে, আর আইন মানবেন না একথা কখনও বলবেন না; আইনের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যেই না আমার নামে নালিশ করে এলেন,—"

মহেশ নিস্তব্ধে সুমন্তের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

সুমন্ত বলিল, "রাত দুপুরে আর চেঁচামেচি করে পাড়াসুদ্ধ লোককে জাগিয়ে কোন লাভ নেই, তার চেয়ে কানে বালিশ চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে, এক ঘুমে তোফা রাত কেটে যাবে এখন।"

মহেশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অর্থাৎ তুমি এই গান-বাজনা থামাতে চাও না—কেমন তো?"

সুমন্ত নির্বিচারে মাথা কাত করিল, "তাই বটে, নিজের ঘরে নিজে একটু আমোদ করতেও পাব না কাকামশাই সবতাতেই আপনাদের অনুমতি নিয়ে করতে হবে এমন কিছু কথা কি হতে পারে?"

"আচ্ছা থাকো,—আমিও আইন দিয়ে বন্ধ করতে পারি কি না দেখব। পাড়ার পাঁচজন লোক সাক্ষী হবে এই হল্লা করার,—সোজা আঙুলে ঘি যে উঠবে না তা জানি। আচ্ছা থাকো, আমিও মহেশ রায়, তোমার বিষদাঁত যদি না ভাঙতে পারি—আমার নাম মিথ্যে—"

বেগে মহেশ বাহির হইয়া গেলেন।

সুমন্ত মুখ ফিরাইল, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলিল, "যেতে দাও যেতে দাও,—আমাদের কীর্তন রদ করা ওঁর ক্ষমতা নয়। তোমরা ধর হে—"

সে নিজেই সুর ধরিল—

তনয়ে তার তারিণী—মাগো—

সঙ্গে সঙ্গে কীর্তনের সুরে কীর্তনীয়া দল ধরিল—তনয়ে তার তারিণী ওগো মা—

২৫

মিঃ বোসের দেখা পাওয়াই মুস্কিল—মিসেস বোস হাঁপাইয়া উঠিলেন।

মিঃ বোসের কাজ যেন বড় বেশী রকম বাড়িয়া গেছে, আজ কলিকাতায়, কাল বম্বে, পরশু দার্জিলিং, তার পরদিন মাদ্রাজ, এমনই করিয়া তাঁহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে।

পনেরো দিন পরে মিসেস বোস স্বামীকে বাড়িতে পাইলেন।

পুঞ্জীভূত ক্রোধ বোমার আকারে ফাটিয়া পড়ে—

"বেশ আছো যা হোক একটা কোন দায়িত্ব নেই, সংসার রাখবার দরকারটা কি, ভাঙিয়ে দিয়ে গেলেই হয়—"

শান্তভাবে চা-পান করিতে করিতে মিঃ বোস বলিলেন, "আহা, চটো কেন, যা বলবে একটু শান্তভাবেই বল অমন করে আগুনে তেতে বলো না। দায়িত্ব যথেষ্ট আছে, সেক্রেটারী মিঃ আগরওয়ালাকে হুকুম দেওয়া আছে, যখন যা লাগবে যেন দেওয়া হয়,—সেও তো তা করেছে। তোমার একটা চাকর চলে গেছলো, সারা কলকাতা খুঁজে আবার চাকর এনে দিয়েছে। তেমার বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে পাঁচশো টাকা চেয়েছিলে, সে হুকুম মত কাপড় জামা আর যা যা দরকার সব এনে দিয়েছে।"

অত্যধিক ক্রোধে কথা বলা হইল না, মিসেস বোস অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মিঃ বোস ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন,—"এ কি, তুমি কেঁদে ফেললে যে, অ্যাঁ কাঁদবার মত কি হ'ল—"

চায়ের পাত্র টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া তিনি মিসেস বোসের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন আস্তে আস্তে তাঁহার মাথায় হাতখানা রাখিয়া স্নেহপূর্ণকন্ঠে ডাকিলেন, "কেটি, কাত্যায়তী—কাতু—"

স্বামীর হাত দুখানা নিজের মুখের উপর চাপা দিয়া মিসেস বোস ক্ষুদ্র বালিকার মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এই মুহূর্তে কর্মী মিঃ বোস পরিণত হইয়াছেন—স্ত্রীর প্রেমময় স্বামীতে, একটি সংসারের কর্তাতে; মন হইতে মিলাইয়া গেছে কর্মব্যস্ততা, অসাধারণত্ব তাঁহাতে এখন নাই, তিনি অতি সাধারণ একটি লোক।

তিনি স্ত্রীকে বাধা দিলেন না বেচারা কাঁদিয়া যদি বুকের বোঝা কতকটা পাতলা করিতে পারে করুক তিনি নিঃশব্দে শুধু স্ত্রীর পানে তাকাইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বামী ডাকিলেন, "কাত্যায়ণী—"

মিসেস বোস স্বামীর হাত দুখানা ছাড়িয়া দিলেন, তাঁহার চোখের জলে স্বামীর হাত ভিজিয়া গেছে। লজ্জিতভাবে মিসেস বোস নিজের শাড়ীর অঞ্চলে হাত মুছাইয়া দিতে গেলেন, শুষ্ক হাসিয়া হাতের অশ্রুজল নিজের মাথায় মুছিয়া মিঃ বোস পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "থাক, মুছাতে হবে না।"

মিসেস বোস লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, "চা পড়ে রইলো যে? জুড়িয়ে গেছে, আর এক কাপ দিতে বলি—।"

কলিংবেল টিপিতে যাইবামাত্র মিঃ বোস বাধা দিলেন, "থাক থাক, এখন চা আর না খেলেও চলবে। তোমার ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই কেটি, আমি আসার সময় এখনই স্টেশনে চা খেয়ে এসেছি, বেশি না খেলেও চলবে।"

রুদ্ধকণ্ঠে মিসেস বোস বলিলেন, "যেখানেই যত খাও, বাড়িতে এসে আমি যে তোমার খেতে দিলুম না, এ কষ্ট তো আমার যাবে না।"

মিঃ বোস হাসিলেন, বলিলেন, "আমি তোমায় অভয় দিচ্ছি কৌটি কষ্ট তোমায় এতটুকু পেতে হবে না। ওসব কথা যেতে দাও, এখন বল দেখি এখানকার ব্যাপার হঠাৎ তোমার এত রাগ বা দুঃখ হওয়ার মানে কি—? চিরকালই তো দেখে আসছো—আমি সংসারের ভার তোমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে কাজের জন্যে এখানে ওখানেই বেড়াই, কোনদিন তো তার জন্যে এতটুকু অভিযোগ অনুযোগ কর না, আজ হঠাৎ তোমার এ রকম অবস্থা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি।"

মিসেস বোস নিঃশব্দে কতক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তাহার পর স্বামীর দিকে ফিরিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, আমি এখানে আর থাকব না, আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে চল—"

"আমার সঙ্গে—"

মিঃ বোস আকাশ হইতে পড়িলেন, "আমার সঙ্গে তুমি যাবে কোথায়? আমি কোনদিন কোথায় থাকি, হয়তো কারখানায় একটা সোফায় শুয়ে রাত কাটাই, হয়তো শুধু চা বিস্কুট খেয়েই দিন কেটে যায়; তোমায় সে সব কষ্ট দিতে এখানে সেখানে কোথায় নিয়ে চলবো? আর তুমিও যে তা জানো না তা তো নয় কৌটি। তবুও অনেককাল আগে যখন তোমার মেয়েরা হয়নি, আমি তোমায় তখন সঙ্গে করে এখানে সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম; তখন বোঝা বইবার শক্তি ছিল, লোককে নূতন কিছু দেখাবার ঝোঁক ছিল,—সেদিন তুমি নিজেই এ বাড়ি ছেড়ে নড়তে চাওনি, সেকথা আজও কি মনে আছে? এখন আমার উৎসাহ নেই, সে শক্তি নেই—সব চলে গেছে, কেবল অর্থোপার্জনের কেন্দ্রে আজ আমার শুধু পয়সা চাই—শুধু টাকা চাই, শুধু কাজ চাই। আজ আমার সে আলাদা জগতে তোমার স্থান তো নেই কৌটি, সেখানে আজ—"

"ওগো, থাক থাক, তোমার পায়ে পড়ি ও সব কথা থাক—"

বলিতে বলিতে মিসেস বোস স্বামীর কোলের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া নিঃশব্দে কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নিরুপায় স্বামী কেবল স্ত্রীর মাথায় পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন একটিও কথা বলিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে মিসেস বোস মুখ তুলিলেন, সোজা হইয়া বসিলেন।

নিরুপায় স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন আমাকে এখন কি করতে বল?"

উদাসভাবে মিসেস বোস বলিলেন, "কিছু নয়। জানা রইলো সব এখন নিজের ব্যবস্থা নিজেই করব।"

শঙ্কিত হইয়া মিঃ বোস বলিলেন, "নিজের ব্যবস্থা কি রকম?"

মিসেস বোস বলিলেন, "সে যাই হোক। তোমার মেয়ের ব্যবস্থা তুমি করো, ওর ভার আমায় যেন না বইতে হয় এইটুকুই তোমায় বলে রাখছি।"

মিঃ বোস নিজের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন—"তার মানে? শাশ্বতীর সঙ্গে তুমি কোন সম্পর্ক রাখতে চাও না?"

মিসেস বোস শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "তা হতে পারে না, আমি তার মা, সে সম্পর্ক ওর সঙ্গে আমার কোনদিন ঘুচতে পারে না। আমি বলতে চাচ্ছি কিছুদিন আমি বাইরে যেতে চাই, লোকে যার যা খুসী সে তাই বলে যাবে এ আমি সহ্য করতে পারছিনে।"

তাহার দুটি চোখ আবার অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

মিঃ বোস বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন, "লোকে কি বলে যাচ্ছে, কেনই বা বলে যাচ্ছে সে কথাটা আমায় বল; তুমিই বা কোথায় যেতে চাও, সব কথা না জানলে আমি কি বুঝব বল দেখি?"

মিসেস বোস বলিলেন, "স্বাতীর সম্পর্কে অনেক কথা অনেক লোকে বলছে তো—"

অবহেলারভাবে মিঃ বোস বলিলেন, "লোকের কথার ভয়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে পলাতে হবে, তুমি যে আমায় আশ্চর্য করে দিলে কৌটি? কউ কেউ তো আমায় কোন কথা বলতে আসে না, যত কথা তোমাকেই বলে যায়? তোমাদের মেয়ে জাতের ধরণই আলাদা;—কাজও নেই—কামাইও নেই। যখন ছোট ছিলুম গাঁয়ে থাকতে দেখতুম পাড়ার মেয়েরা কত ছোট কথা ধরে কেমন আলাপ করে। তাদের অশিক্ষিতা বলে ঘৃণা করো না কৌটি, তোমরা শিক্ষিতার অহঙ্কার করলেও ওই পরের সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি তোমাদেরও রক্তে রক্তে মিশে আছে। কে কি করলে, কাকে কোন ছিদ্র ধরে দুকথা বেশ শুনিয়ে দিয়ে আনন্দ পাওয়া যাবে—"

রুক্ষকণ্ঠে মিসেস বোস বলিলেন, "তুমি থামো, বাজে বোক না বলছি, আমার এখন ও সব আলোচনা করতে ভালো লাগছে না। দুদিন আছো তো, না আজই আবার বার হচ্ছো—?"

মিঃ বোস উত্তর দিলেন, "মনে তো করছি দুদিন থাকব, এর মধ্যে আবার যদি—"

সবেগে মিসেস বোস বলিলেন, "না এর মধ্যে হাজার ডাক এলেও তোমার শাশ্বতী মেয়ের ব্যবস্থা না করে তুমি যেতে পারবে না। আমি দিন পনেরো ঘুরে আসি, এর মধ্যে যদি পারো তবে ওকে—"

তিনি থামিয়া গেলেন।

বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ বাইশ বৎসরের মধ্যে যে স্ত্রী একটা দিনের জন্যও এই গৃহ ত্যাগ করিয়া যান নাই, তিনি আজ কি না পনেরো দিনের জন্য অন্যত্র যাইতে চান—বিস্ময়ের কথা বটে।

মিঃ বোস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যেতে চাও তুমি, স্বাতীর কাছে?"

গম্ভীরকণ্ঠে মা উত্তর দিলেন, "না, স্বাতী মরে গেছে, আমি তার কাছে যাচ্ছিনে। আমি যাব যুগীপুকুরে, আমার দিদির কাছে।"

মিঃ বোস স্তব্ধ হইয়া রহিলেন—

তাহার পর বলিলেন, "বাইশ বছর পরে এই জীবন পথে চলতে অভ্যস্ত হয়ে তুমি গ্রাম্যজীবনের মধ্যে দিন কাটাতে পারবে কৌটি?"

"পারব—"

মিসেস বোস শান্তকণ্ঠে বলিলেন,—"তুমি জানো না মেয়েরা যেখানে যেমন করেই হোক মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে। আজ তোমার স্ত্রী হয়ে পাঁচজনকে আদেশ দিচ্ছি, কাল আমিই লোকের আদেশ তামিল করবো। মেয়েরা সব পারে,—কিছুই তাদের কাছে শক্ত নয়।" তামিল করবো। মেয়েরা সব পারে,—কিছুই তাদের কাছে শক্ত নয়, অসম্ভবও নয়।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মিঃ বোস বলিলেন, "আমার আপত্তি নেই কৌটি, দুদিনের জন্যে তুমি তোমার দিদির সঙ্গে দেখা করে এসো। পনেরো দিন আমি তোমায় সেখানে থাকতে দিতে পারব না, দুচারদিন থেকে তুমি চলে এসো, না হলে তোমার সংসার অচল হয়ে পড়বে।"

(ক্রমশ)

কতকগুলো মুহূর্ত

সুজনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাইরের আকাশ মিশ কালো, একটা তারাও দেখা যায় না, মেঘ করেছে। থেকে থেকে দমকা হাওয়ায় ঘরের দরজাটা নড়ে উঠছে। মুকুল তার তিনতলার ছোট ঘরটিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে এই মাত্র, সারাদিনের ঘুরুনির পর ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিয়েছে ডেক চেয়ারটায়। ঘরে আলো জ্বালে নি, বাইরে থেকে হাওয়া এসে ওর মুখে আর মাথার বড়ো বড়ো চুলে হাত বোলাচ্ছে, আধ ভোলা একটা মিষ্টি হাতের আদর যেন, ভারি ভালো লাগছে। শুধু চুপ করে খানিক্ষণ পড়ে থাকা। ঘড়িতে কটা বাজে জানবার দরকার নেই, অন্ধকার ঘরে টেবলের উপর সে বেচারা নিজের কাজ করে চলুক। মুকুল চোখ বুজল, চোখ বুজে নিশ্চিন্ত হ'ল। কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবার কি উপায় আছে? হঠাৎ ঘরের পাশে সিঁড়িতে একটা শব্দ, কে যেন আসছে। এমন হামেসাই ঘটে থাকে, কত লোকই ত আসে। আওয়াজটা সিঁড়ি থেকে বাইরের ছাতে ঘরের সামনে এসে থেমে গেল। সাধারণত যারা আসে তারা সোজা আসে ঘরের ভিতর চলে। মুকুল চোখ চাইলো। দরজার সামনে আবছায়া অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে ঘরে আসতে, দাঁড়াবার ভঙ্গিটি যেন চেনা চেনা।

"কে, কে তুমি?" মুকুল চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো।

"মাগো এত অন্ধকারে মানুষ থাকে?" দু'তিন বছরের ওপার থেকে মিলিয়ে আসা আলোর রেশ, রাণীর গলা। "রাণী তুমি?" ঘরটা আলোয় ভরে গেলো, মুকুল আলো জেলে দিলো। রাণী এসে দাঁড়িয়েছে, সেই রাণী। সেই নিখুঁত চেহারা, সেই চোখ, একটু যেন রোগা। একমুহূর্তে মুকুল অন্য পৃথিবীতে চলে গেলো।

"বস দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

রাণী বসে পড়ল মুকুলের বিছানার উপর। তাকিয়ে নিলো ঘরের চারি দিকে। কেবল বই আর বই—নানা আকারের ছোট বড়ো বইএ ঘর ঠাসা। মুক্তি এনেছে টেবলের উপর ফুলদানিটায় রজনী-গন্ধার ঝাড়। মুকুলকেও দেখে নিয়েছে। এককালে চেহারা নিয়ে মুকুলের গর্ব ছিলো, এখন তার স্মৃতিটুকু মাত্র আছে—ভীষণ রোগা, রং কালো হয়ে গেছে পরিচিত অঙ্গভঙ্গি, সেই হাসি আর চোখের সেই গভীর ভাবটা রয়ে গেছে।

রাণী এবার কথা কইলো—"কেমন আছো মুকুল?"

"ভালোই।"

আধ মিনিট চুপচাপ তারপরে মুকুল—"ঠিক ঐ কথাটা জানতেই কি হঠাৎ এতদিন পরে এই আকস্মিক আগমন?"

"ঠিক তাই—কতদিন তোমার খবর পাই নি, যাচ্ছিলুম এই পথ দিয়ে মনে হোল তোমার কথা"—

"তাই এলে?"

"হুঁ"—

"তারপর?"

"কী তারপর"—

"তোমার খবর কি?"

"দেখতে পাচ্ছ না ভালই আছি।"

মুকুল কিন্তু নাছোড়বান্দা—"যা দেখতে পাচ্ছ তার বাইরেও যে কিছু থাকতে পারে"—

"বা—রে, খারাপ থাকবো কেন?"

"সন্দেহ হচ্ছে, ভালো থাকলে তো মুকুল রায়ের কাছে আসতে না"—

"কী মুস্কিল ভালোই আছি, সত্যি বলছি ভালোই আছি।"

রাণী উঠে গেলো তাড়াতাড়ি। দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে একটা ছবি, তারই দিকে মনোযোগী হয়ে পড়লো। মুকুল কিন্তু ছাড়ে না—"জানি মনে মনে একটা কী ভাবছ আমার কাছে লুকোচ্ছো কেন?"

রাণী এবার মুখ ঘোরালো চোখের দৃষ্টি মুকুলকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে, কানের বড়ো বড়ো দুল দুটি দুলে উঠলো ঈষৎ—"সব কথা কি সব সময় বলা যায়?"

"আমার কাছেও না?"

মুকুল এবার রাণীকে নিয়ে গেল বাইরে ছাতে—"এই ছাতটুকু আর এই ঘরটি ভাগ্যিস আছে। আমার খবর নিতে এসেছো রাণী? আমার খবরে তোমার এখনও মাঝে মাঝে দরকার হয়, ভাবতেও ভালো লাগে। আমি এখন ভীষণ কাজের মানুষ হয়ে পড়েছি। দিনরাত্রির কোনও সময়টাই আমার কাজের অনুপযুক্ত নয়—এত কাজ যে যন্ত্রের মত সহজ আর সাবলীল হয়ে পড়েছে আমার জীবনটা। আমার সময় নেই—মনে হয় এই ছোট্ট জীবনের পরিধি—এর মাঝে কি সব কাজ শেষ করে যেতে পারবো? কিন্তু আমার কথা থাক—তুমি রাণী এই অন্ধকারে একলা এলে আমার কাছে, ভয় কোরল না—ভয় করছে না?"

"ভয়, ভয় কিসের?"

"কেন আমাকে, আমি যে ভয়ঙ্কর লোক?"

"তোমাকে?"

"হ্যাঁ আমাকে, একলা আমি এই অন্ধকারে"—

রাণী স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, মুকুলের কাঁধটার কাছে আদর করে এক চড় মারলো।

"আহা বীরপুরুষ"—

দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, মুকুল রাণীর কাঁধের উপর হাত রাখলো, এক নিমেষে দু'তিন বছরের ব্যবধান ঘুচে গেলো, সেই দুটি হাসি খুসি ছেলেমেয়ে মুকুল আর রাণী। মুকুল রাণীর হাতের ওপর একটা ছোট্ট চিমটি কেটে বললে—"দাঁড়াও আসছি।" ছুটে গেল ঘরের ভিতর, ফুলদানিতে ছিলো রজনীগন্ধার ঝাড়, তার থেকে নিয়ে এলো একগুচ্ছ, রাণীর মাথায় গুজতে গুজতে বলল—"বেচারা ফুল ফুলদানিতে শুকিয়ে মরে—অনেক দিন তার দিকে তাকাবার অবসরও হয় না—আজ সে তার যোগ্য স্থান পেয়ে ধন্য হল।" কারুর মুখেই কথা নেই, দুজনে চলে গেছে সেই আগেকার যুগে, অন্ধকার আকাশ থেকে সেই সব দিনগুলো কথা কইছে।

নীরবতা ভঙ্গ করলো রাণী—"যাও না কেন আমার বাড়ি?"

"আমার যে অনেক কাজ।"

বিশ্বাস করি না, ওটা কেবল এড়িয়ে চলার অজুহাত। ইচ্ছে করলেই সময় করা যায়।"

"ভয় হয়, তোমাকে খুঁজে পাবো না।"

"মানে?"

"ভিড়ের মাঝে তোমাকে হারিয়ে ফেলবো।"

"থাকলোই বা ভিড়, তুমি তো যাবে আমার কাছে।"

"সত্যিই কি তুমি আমাকে এখনও চাও"—

"কি মনে হয়? এতদূর ছুটে এসেছি অভিনয় করতে"—রাণীর গলা রীতিমত ভারি হয়ে এসেছে, কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেলো।

মুকুল বিস্মিত হয়ে গেছে একটু আজ, দুবছর বাদে রাণীর এই আবির্ভাবে। তথাকথিত আধুনিক সমাজের ইংরেজীতে যাকে বলে

স্মার্ট সেটের মেয়ে সে, ড্রয়িং রুম আর পার্টি বিহারিণী। পয়সা আছে, উচ্ছ্বসিত হাসিতে বন্ধুর দলে বিদ্যুৎ হানে, কটমট করে কথা বলে। সে আজ এ কী বলে? একদিন মুকুল গিয়ে পড়েছিলো ওদের দলে, সে কেবল রাণীর টানে। লটি, মলি, রে ডে'র দল কৌতুক অনুভব করেছিলো। ওর সঙ্গে আপ্যায়িত করে কথা বলতো, রীতিমত মজা লাগতো তাদের মুকুলের অস্তিত্বে। কিন্তু মুকুলের ছিলো কৃপা এই সব লোকদের উপর। নানা চমক লাগানো কথায়, প্রচ্ছন্ন ঠাট্টায় এদের বিপদগ্রস্ত করে তুলতো। মুকুল ছিলো ওদের জগতে একটা সৃষ্টি ছাড়া আশ্চর্য। ভারি সাধারণ আর সবুজ। কিন্তু চুলোয় যাক্ তারা। রাণীর কথা মনে হয়। মুকুলকে নিয়ে ভালোবাসার খেলা চলেছিলো কিছুকাল—তারপরে সব শেষ। মুকুল হারিয়ে গেলো তার কাজের মাঝে আর রাণী রইলো তার ড্রয়িং রুম নিয়ে। সে অনেক দিনের কথা। আজ আবার হঠাৎ রাণী কাছে সরে এলো কেন? মুকুল ভেবে পায় না। রাণীর মাথা থেকে রজনীগন্ধার গন্ধ আসছে মৃদু মৃদু, আকাশে বর্ষণোন্মুখ মেঘ —অনেক নীচে থেকে শহরের কোলাহল শোনা যায়—

মুকুল বলল—"কথা কও, কিছু বলো"—

কোনও উত্তর নেই।

আবার মুকুল—"তুমি কিন্তু এতো গম্ভীর ছিলে না তো কোনওদিন—আমার কাছে এলেই গম্ভীর হয়ে যাও, না? দেখছ রাণী এ একটা নতুন জায়গা—এখানে কেবলমাত্র আমার মত লোকই থাপ খায়, তোমরা নও"—

মুকুল এবারে রাণীর মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলো। গাল দুটো দু হাতে নিয়ে আদর করতে গিয়ে চমকে গেলো, রাণী কাঁদছে।

"একি তুমি কাঁদছ?"

"আমি আর পারি নে"—রাণী ফোঁপাচ্ছে।

"কেন কি হ'ল?"

"কী হয়েছে জান না? দেখতে পাচ্ছ না কী হয়েছে? আমার কিছু ভাল লাগে না, পেয়েছি সব, টাকার কাঁড়ি খোষামোদের দল ঘিরে রয়েছে অনবরত, উঠতে বসতে স্তুতি, কিন্তু মন ভরে না, মন চায় ভালোবাসা।"

"রাণী তুমি ভালোবাসার কাঙ্গাল? না চাইতে অজস্র ভালোবাসা যার পায়ের কাছে জড়ো হয়?"

"পায়ের কাছে আসে জানি, মনে লাগে না। আমাকে বাঁচাও মুকুল, আমাকে এই ক্লেদ থেকে জীবনের এই একঘেঁয়েমি থেকে বাঁচাও—সব যেন যান্ত্রিক হয়ে গেছে, প্রাণ নেই।"

"কিন্তু কী করে তোমার ধারণা হল, আমি তোমায় বাঁচাতে পারি?"

"তাকিয়ে দেখি চারিদিকে—তোমাকেই একমাত্র জানি যে বেঁচে আছে"—

মুকুল এবার রাণীর হাত ধরে তাকে নিয়ে এলো ঘরের ভিতর—

"ভিতরে এসো আলোতে, তোমাকে ভালো করে দেখি। তোমাকে বাঁচাতে পারি এ সম্বল আমার হাতে আছে—কিন্তু আমাকে তো জান না রাণী আজকাল, কোনও কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার উপায় যে আমার নেই, তা ছাড়া"—

"থাক বুঝেছি"— এক নিমেষে সুর গেলো ভেঙে, মিঠে সুরের তার গেলো ছিঁড়ে। রাণী এবার দৃপ্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো, ভঙ্গিটা অস্বাভাবিকরূপে কঠিন—

"তা ছাড়া আর কিছু বলবার দরকার নেই। কোনও মেয়ে কোনও ছেলের কাছে যেচে ভালোবাসা দিতে এসেছে, আধুনিককালের ইতিহাসে এই-ই বোধ হয় প্রথম। দরকার কি? যেখানে আছো সেইখানেই থাকো, রাণীও চলল তার স্ব-স্থানে।" ঘর থেকে বেরিয়ে ঝড়ের মত নীচে নেবে চলে গেলো। মুকুলের যখন চেতনা হল তখন রাণীর মোটর চলে গেছে। অন্ধকার ছাতটায় খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ঘরে ফিরে এলো। কী হয়ে গেলো, কয়েকটা মিনিট, শুধু কয়েকটা মিনিটে সব তোলপাড় হয়ে গেলো। কোথা হতে অন্ধকারের মাঝ থেকে এই মেয়েটা আবির্ভাব হয়ে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে আবার অন্ধকারেই মিশিয়ে গেলো। বুঝতে চাইলো না মুকুল এখন রাণীর কাছে থেকে কতদূরে থাকে, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা পৃথিবী যে। কিন্তু কোথা থেকে কী হয় বলা যায় না—রাণী যে কষ্ট পাচ্ছে, তাকে দুটো মিষ্টি কথা বলাও যে উচিত ছিল। নিজের উপর রাগ হোল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর রাগ হোল, বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমতে চেষ্টা করল, কিন্তু ঘুম কি আসে?

গেছে কতকগুলো দিন কেটে। মুকুল হাজার কাজের মাঝেও রাণীর কথা ভুলতে পারে না। তার অস্তিত্ব ওকে যেন দিন কে দিন বেঁধে ফেলছে, জড়িয়ে ধরছে ওর মুক্ত পা দুখানাকে। ভালো লাগে না, উঠতে বসতে মনে হয় রাণীর কথা, সে যে মুকুলকে চায়। ক্রমশ কাজের টান শিথিল হয়ে আসে, এমনি করে আর চলে না। রাণীকে দেখতে ইচ্ছে করে, কাছে গিয়ে বসে দুটো মিষ্টি কথা বলতে চায়। মনে মনে যে বাসনা গুমরে ওঠে একদিন সত্যিই প্রকাশ পেলো কাজে। ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যাবেলা গিয়ে পড়লো রাণীর বাড়ি। রাণীর ড্রয়িং রুমে অনেক লোকের ভিড়, এদের মধ্যে অনেককেই সে চেনে না।

"মুকুল রায়"—ব্যারিস্টার সেন বলে উঠলো।

"ঠিক চিনেছো"—

এতদিন বাদে, কোথা থেকে?"

"রাণী কোথায়?" মুকুল জিজ্ঞেস করলো।

"টেলিফোন করছে উপরে"—

মুকুল বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে, সোজা চলে গেলো উপরে রাণী টেলিফোন করছিলো কোনও বন্ধুকে, উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ছে থেকে থেকে, কী যে দুষ্টুমি করে বাদল তার ঠিক নেই। আজ সে আসতে পারে নি তাই নিভৃতে একটু রসালাপ করার চেষ্টা। এমন সময় মুকুল এসে ঘরে ঢুকলো—এক নিমেষে রাণী পাথর হয়ে গেলো। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে মুকুলের কাছে এগিয়ে গেলো।

"তুমি কখন এলে?"

"এই মাত্র।"

"হঠাৎ আমাকে মনে পড়লো?"

"তুমি তো মনে মনেই আছো।"

"মিথ্যেবাদী।"

"তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসি নি, দেখতে এসেছি।"

রাণী আর মুকুল পাশাপাশি বসেছে সোফায়। এবারে রাণীর পালা।

"উহু দেখতে আস নি, দয়া করতে এসেছো, না? আহা বেচারী রাণী কষ্ট পাচ্ছে, তাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে আসি, নয়? আমি কিন্তু ভালোই আছি, মনের ওসব দুর্বলতা আর কখনও হবে না।"

"ভালো যে আছো তা তো দেখতেই পাচ্ছি। ভালো থাকার উপকরণ নীচে দলে দলে হাজির—চলো রাণী নীচে যাই—ওরা ভাবছে কী তোমাকে?"

"ভাবুকগে, রোস একটা বোঝাপড়া করি, তারপরে কাজের মানুষ"—

মুকুল কিন্তু কি ভাবছে। নিজের মাথার চুলগুলো নিয়ে নাড়তে লাগলো, ও যখন অন্যমনস্ক হয়ে যায়—এমন ধারা করে থাকে। রাণী হেসে ফেলল—

"মাথার পোকা এখনও যায় নি দেখছি, ঠিক সেই মানুষটিই আছো।" রাণী সরে এলো মুকুলের কাছে।

"হ্যাঁ এইগুলোই রয়ে গেছে—তোমাকে কিন্তু রাণী বুঝতে পারছি না, হঠাৎ তোমার কি হলো।"

"কি রকম?"

"তুমি মুক্তি চাইছো, তোমার সম্বন্ধে সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে—জগত এতদিন ধরে এই সব আবহাওয়ায় থেকেও তুমি মরে যাও নি"—

-"ফ্ল্যাটারার"—

"ওঁ জিনিসটা খুঁজতে গেলে নীচে যেতে হবে।"

"ঈস্ নীচের লোকদের উপর দেখছি যে ভারি রাগ—আমরা মেয়েরা কিন্তু ফ্ল্যাটারী ভালোবাসী।"

"আমি কিন্তু ঠিক উল্টো কথা বলবো—অনেক সময় বুঝতেও পারবে না।"

"তুমি তো চিরকালই উল্টো কথা বলো আর তাই তো তোমাকে ভালোবাসি।"

"এ যে অনেকটা সেই রকম হোল—যা বুঝতে পারি না তা ভারী ভালো"—

"না তোমার কথাগুলো মনের ভিতর পেঁছয়, নিজেকে চিনিয়ে দেয়—কিন্তু যাও তুমি বড্ড সিরিয়াস হয়ে পড়েছো, এতদিন বাদে দেখা হোল।"

"দেখা হোল ত কী হবে"—মুকুল হেসে ফেললো। হঠাৎ এলো বসন্তের হাওয়া যেন, চারিদিকে ফুল ফুটে উঠেছে।মুকুল ভারি খুশী হয়ে পড়েছে, কোথায় গেলো তার মুরুব্বীয়ানা—রাণীর গলা জড়িয়ে ধরে খেলো চুমু। রাণী লজ্জায় আর খুশীতে লাল হয়ে গেছে, সোফা ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা কিন্তু মুকুলের হাতের ভিতরে হাত ধরা, ওঠা গেল না। এই ঘেঁষাঘেঁষি বসে থাকতে ভালো লাগে।

মুকুল বলছে—"আমার কাছে যদি আসো রাণী আমি তোমাকে টাকায় ডুবিয়ে রাখতে পারবো না। অনেক দিন খেতেও পাবে না হয়তো। বলবো কষ্ট পাও, অবশ্য সখ করে নয়, নিরুপায় হয়ে। এই আমাদের জীবন এর মধ্যে আতিশয্য নেই একটুও—

এমন সময় উঠে এলো সেন নীচে থেকে—সিগার ফুঁকতে ফুঁকতে—

"রিণি তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়েরাণ।"

"বলো।"

"রাণী হেসে ফেললো।"

"ঐ সেই ব্যথাটা"—

মুকুল বললো—"ব্যথা? প্রবোধবাবু আপনার কি কলিকের ব্যথা হয় নাকি?"

"না ভাই, এ এক অদ্ভুত ব্যথা বুকের ভিতর মুচড়ে মুচড়ে ওঠে, মনে হয় সব যেন খালি, কিছু যেন নেই।"

মুকুল অভিনয় করতে জানে। চোখ বড়ো বড়ো করে বলে উঠলো—"সর্বনাশ! উপায় এখন?"

হিলিংবাম-এর রিণির কাছে, রায়—"সেন যেন মুষড়ে পড়েছে।"

মুকুল অপ্রস্তুত একটু—"তাই তো রাণী দেখছো টেলিফোন করতে অনেকটা সময় নিয়ে নিয়েছো—"চলো নীচে যাই।"

রাণী কিন্তু বসেই রইলো, সেনকে উদ্দেশ্য করে বললো—

"মুকুলের সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে জরুরী, শেষ করেই আসবো।" সেন কাঁধ দুটো তুলে একটা বিশেষ ভঙ্গি করে যেমন এসেছিলো তেমনি চলে গেলো। যাবার সময় বুকের কাছটা চেপে ধরলো যেন সত্যিই বড়ো ব্যথা—

"কী যে করি ব্যথাটা নিয়ে"—

সেনের বিলিতি জুতোর খট্‌খট্ আওয়াজ তখনও মেলায় নি মুকুল এবার উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলো—"তোমার চিড়িয়াখানায় কত রকমই দেখবো রাণী।"

"না প্রবোধ আমাকে ভালোবাসে।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি।"

"তোমার মতো নয়, খালি ঝগড়া করো"—

"প্রবোধের বুকের ব্যথার বন্দোবস্তো করে ফেলো তাড়াতাড়ি, লুচি পাঠা খাওয়া যাক্—অনেক দিন ওসব খাই নি।"

"ঠাট্টা বোঝ না, কোথাকার লোক তুমি?" রাণী মুকুলের কাঁধে মাথা রাখলো।

এ এক অদ্ভুত সময় দুজনে দুজনকে হারিয়ে ফেলেছিলো, এখন কেবল ফিরে পাওয়ার আনন্দ। রাণীর হাতটা ধরে মুকুল বসে রইলো। এইমাত্র খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেছে, ভিজে হাওয়া আসছে ঘরে, বাইরে রাস্তায় লোক চলাচল কম, দু' একটা মোটর চলেছে তারই আওয়াজ আসে—

"ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ।" কতকগুলো ছাড়া ছাড়া গলার আওয়াজ এলো ভেসে রাস্তা থেকে। হঠাৎ—রাণীর হাতটা ক্ষণিকের জন্য মুকুল চেপে ধরলো জোরে—তারপরে উঠে গেলো। দ্রুত পায়চারি করে এলো দুবার ঘরের চারিদিকে তারপরে রাণীর হাত ধরে তুলে আনলো সোফা থেকে। মুকুলের চোখের দৃষ্টি শান্ত আর স্থির। রাণীর চোখের উপর চোখ রেখে বলল—

"পারবে?"

রাণীর মুখেও ফুটে উঠেছে অদ্ভুত আভা, শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিলো। প্রতিদিনের সন্ধ্যার উৎসবের বেশ তার, ছন্দায়িত সবুজ শাড়ী, মাথার ফুল আর চোখের কাজল আজ সার্থক হোল।

এবারে উপরে এলো উঠে লতা,—"কী কান্ড তোমার ভাই রাণীদি"—কিন্তু কোথায় রাণী—সারা বাড়িতে তাকে পাওয়া গেল না, মুকুলও চলে গেছে।

২
বছর ৭
ইংরেজীতে ৭॥
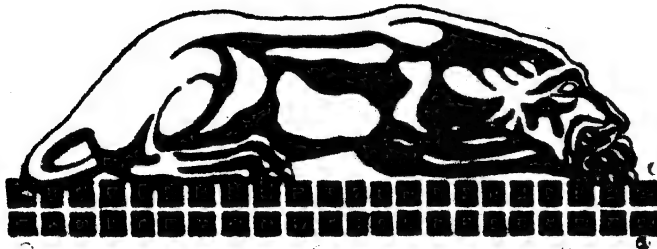
অবনীন্দ্রনাথের ছবি

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
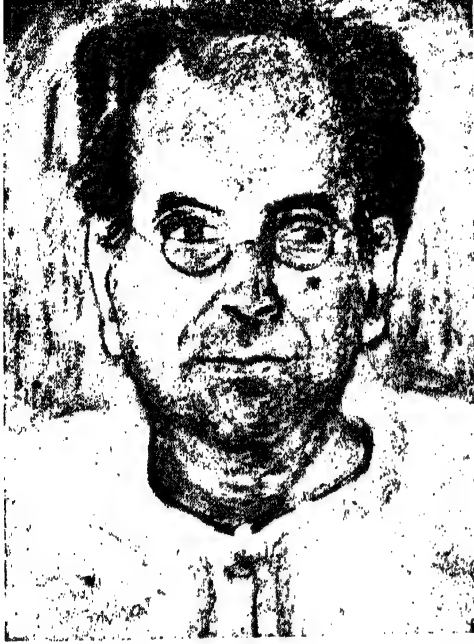
অবনীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিলেতি চিত্রকরের কাছে বিলেতি কায়দায়। তাঁর প্রথম শিক্ষক মিঃ গিলার্ডি, কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। মাত্র ছয় মাস তিনি গিলার্ডির কাছে ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের মতে গিলার্ডি সাহেব ওস্তাদ Portrait Painter ছিলেন। Pastel drawingএ সাহেব আশ্চর্য দক্ষ ছিলেন। বিশেষভাবে Pastel Portrait করা শিখতেই অবনীন্দ্রনাথ আর্টিস্ট গিলার্ডির কাছে গিয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় শিক্ষক মিঃ পামার সে সময় কলকাতার নামজাদা oil painter ছিলেন। চিত্রকর পামারের কাছে অবনীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় একাডেমির রীতি অনুযায়ী শিক্ষা করেন ১৮৪২-৪৪ দুই বৎসর। Still life, Model drawing, Oil এবং Water Colour Study, অর্থাৎ সংক্ষেপে বিলাতি আর্টিস্টের হাতে হলে যে রকম শিক্ষা দরকার, পামারের কাছে সব কিছুই চর্চা তিনি করেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ বিলাতি মতে ছবি আঁকা শিখলেন বটে, কিন্তু বিলাতি ধরণের ছবি তাঁর আঁকা হোল না। অতি সাধারণ একটি ঘটনায় তাঁর জীনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল।

১৮৯৪ সালে ঠাকুর পরিবারের বন্ধু জনৈকা ইংরেজ মহিলা, বিলেতি কায়দায় কতগুলি কবিতা নিজের হাতে ইলাস্ট্রেট করে অবনীন্দ্রনাথকে উপহার পাঠান। বিলেতি ইলাস্ট্রেশনের একটা বিশেষ ধারা আছে। উজ্জ্বল রং এবং আলংকারিক রূপ এই জাতীয় ছবির বিশেষত্ব। ইংরেজ মহিলার উপহার যখন পান, ঠিক একই সময়ে তাঁর এক আত্মীয়ার কাছ থেকে লক্ষ্ণৌ ঢং-এ করা একখানি ছবির এ্যালবাম উপহার পান। দেশী ও বিদেশী ছবির আলংকারিক রূপ এবং প্রকাশের সহজ ভঙ্গী দেখে অবনীন্দ্রনাথের মনে নূতন ধরণে ছবি আঁকবার প্রেরণা এনে দিল। রস সৃষ্টির পথে কখনো ভাব ভাষা খোঁজে, কখনো বা ভাষা ভাব চায়। চিত্রকর অবনীন্দ্র ছবির নূতন

অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত স্কেচ

ভাষা পেলেন এই ভাষাকে তিনি ব্যবহার করবেন কি করে এই হলো তাঁর সমস্যা। অবনীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয় নিয়ে নূতন ধরণের ছবি করতে শুরু করলেন। অবনীন্দ্রনাথের নিজের জীবনে এবং আধুনিক ভারতীয় চিত্রের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে

সুরশিল্পী : অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত

উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে এই ছবিগুলি। অবনীন্দ্রনাথ ছবির আলংকারিক ভঙ্গীকে অনুকরণ করলেন, কিন্তু তাঁর বিলাতি অঙ্কন-বিদ্যার প্রভাবে তাঁর আদর্শের একটু পরিবর্তন ঘটাল। পুরোপুরি দেশী বা হুবহু বিলাতি ছবির নকল ছিল না, দুই-এর মিশ্রণে তাঁর ছবিতে সম্পূর্ণ নূতন রূপ দেখা দিল। এ পর্যন্ত বিলাতি বা দেশী অঙ্কন কৌশল দুই-এর সংস্কার গতিহীন হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে দুই-এর মিশ্রণে গতিহীন সংস্কার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। এই দিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে আধুনিক ভারতীয় চিত্রের রূপ প্রকাশিত হতে দেখি। সমকালিন চিত্রের সংস্কৃতির অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলেই অবনীন্দ্রনাথের এই রচনার মূল্য আরও ভাল করে বোঝা যাবে।

একদিকে ভারতীয় চিত্র-সংস্কৃতিতে সংস্কারগত ছবির আলংকারিক কাঠামো মাত্র ছিল, চিত্রকর যাঁরা, তাঁদের মধ্যে কারিগর-সুলভ ওস্তাদি দেখা যেত : নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী তাঁরা হারিয়েছিলেন। রসের দিক দিয়ে ভারতীয় চিত্র যে কতদূর দরিদ্র, সেকথা বিস্তারিত-ভাবে পূর্বেই বলেছি। অন্যদিকে বিলাতি চিত্র সংস্কৃতি বা বিলাতি ideal বলতে আমরা পেয়েছিলাম ইংলন্ডের শিল্পপ্রধান রয়েল এ্যাকাডেমির কতকগুলি গতানুগতিক সংস্কার। আরও পরিষ্কার করে বলা যায় বস্তুরূপে অনুকরণ করবার কতগুলি কৌশল মাত্র আমরা পেয়েছিলাম। এই সংস্কার দ্বারা ইউরোপীয় শিল্প সংস্কৃতির অন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি।

১৮৯৪-৯৫ এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ কি রকম পরিপূর্ণ সৃষ্টির আনন্দের মধ্যে ছিলেন, সে কথা নিজেই তিনি উল্লেখ করেছেন। একদিকে সৃষ্টি করার আনন্দ অন্য-দিকে নূতন পথে চলার কৌতূহল সম্মিলিতভাবে তাঁর অগ্রগতিকে মুহূর্তের জন্য থামতে দেয়নি। যে সময়ে অবনীন্দ্রনাথ এইভাবে নিজের সৃষ্ট জগৎকে নিয়ে একান্ত নির্জনে দিন যাপন করছিলেন, এমনই সময়ে ১৮৯৭ সালে ই. বি হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচয়ের বহু পূর্বে অবনীন্দ্রনাথের এই নূতন চেষ্টা কে প্রথম স্বীকার করেছিলেন তাঁর শিক্ষক মিঃ পামার। মিঃ পামার যে অবনীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেছিলেন তাই নয়; বিলাতি অঙ্কনবিদ্যা শেখা থেকে অবনীন্দ্রনাথকে নিবৃত্ত হতে বলেন এবং আর্টিস্টের মর্যাদা দিয়ে পামার অবনীন্দ্রনাথকে তাঁর শিষ্যত্ব থেকে মুক্তি দেন। হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচয় অবনীন্দ্রনাথের জীবনে এবং আধুনিক শিল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত থেকে হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের নাম এমনইভাবে যুক্ত হয়েছে যে, আজ উভয়কে স্বতন্ত্র করে আমরা দেখতে প্রায় ভুলেছি এবং এ কথা সত্যই যে, এ যুগের শিল্প ইতিহাসে দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। হ্যাভেলের সহায়তা ব্যতীত অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব এত ব্যাপকভাবে এত তাড়াতাড়ি জাতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হওয়া সহজ ছিল না। অবনীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাকে আকর্ষণ করতে না পারলে হ্যাভেলের আন্দোলন সার্থক হোত কিনা সন্দেহ। সাক্ষাৎ-ভাবে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশ হ্যাভেল বা কোন ব্যক্তিবিশেষের অপেক্ষা করেনি। একমাত্র শিক্ষক, পামার ব্যতীত তাঁর প্রতিভার অভিনবত্ব বোঝবার মত কোন সমজদার তখনও আসেনি। খ্যাতির তীব্র মাদকতা, উপেক্ষার দুঃখ দুই-ই তাঁর কাছে অপরিচিত ছিল। হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার মূল্য বুঝেছিলেন এবং তাঁর প্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্র তিনি পরম আন্তরিকতার সঙ্গে প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেছিলেন। হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে লোকচক্ষুর সামনে এনে দাঁড় করালেন। হ্যাভেলের একান্ত চেষ্টায় ও আগ্রহে অবনীন্দ্রনাথ কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে সহকারী অধ্যক্ষের কাজ গ্রহণ করলেন এবং প্রবীণ শিল্প আদর্শের পুনরুদ্ধারক বলে হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে প্রচার করলেন। আর্ট স্কুলে যোগদানের অল্প-কালের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কন ভঙ্গীর পরিবর্তন দেখা দেয়। সম্পূর্ণ নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নিজেকে উপলব্ধি করবার সুযোগ ইতিপূর্বে অবনীন্দ্রনাথের জীবনে আসেনি। দেশীয় চিত্র-সংস্কৃতিকে বুদ্ধির দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করে' বোঝাবার চেষ্টা করলেন। হ্যাভেল নিজে মোগল শৈলীর অনুরক্ত ছিলেন, হ্যাভেলের সাহায্যে অবনীন্দ্রনাথ মোগল শৈলী চিনলেন।

মোগল চিত্রের বৈশিষ্ট্য অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কন ভঙ্গীর মধ্যে কতদূর প্রাধান্য পেয়েছে পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব। অবনীন্দ্রনাথের আর্ট স্কুলে যোগদানের অল্পকালের মধ্যে এ দেশে জাপানী চিত্রকরদের আসাযাওয়া সুরু হয়। লোকের একটা ধারণা আছে যে, অবনীন্দ্রনাথের ছবি জাপানী প্রভাবান্বিত। ইংরেজ ক্রিটিকরা অবনীন্দ্রনাথের ছবিকে Indo-Japanese Style নাম দিয়েছিলেন। এই মতের পরিবর্তন দরকার। এইজন্য এ দেশে জাপানী চিত্রকরদের আগমন ও তাঁদের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন আমাদের দেশের মত জাপানে ইউরোপীয় Naturalistic Art-এর প্রভাব ও পূর্ব সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে জাপানী চিত্রের অবস্থা অনেক দিক দিয়ে প্রায় আমাদের মতই হয়েছিল। এই অবস্থার থেকে নূতন উৎসাহে যাঁরা জাপানী চিত্র-সংস্কৃতিকে পূর্ব অবস্থায় বিখ্যাত শিল্পরসিক ওকাকুরা ছিলেন সর্বপ্রধান। 'Asia is one'

ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত ফেনলসা ও এই বিখ্যাত উক্তির প্রবর্তক Kakuju Okakuraর ব্যক্তিত্বের ছাপ আধুনিক ভারতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে না পড়লেও, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রথম অনুবর্তিদের মধ্যে এবং আরও কোন কোন ক্ষেত্রে যে সে ছাপ পড়েছিল এ কথা হয়ত অনেকেরই জানা নেই।

পারস্য রাজকুমারী

ওকাকুরা স্বামী বিবেকানন্দের অতিথি হয়ে এ দেশে আসেন এবং বেলুড় মঠে অবস্থানকালে তাঁর Ideals of the East বইখানি রচিত হয়। ওকাকুরার স্থায়ী বন্ধুত্ব হয় ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে; এই পরিবারের মধ্য দিয়ে প্রথম জাপানী রুচির আবহাওয়া বাঙলা দেশে দেখা দেয়। জাপানী চিত্রকরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ এই পরিবারই প্রথম পেয়েছিল। জাপানী চিত্রকরদের সঙ্গে ভারতীয় আধুনিক চিত্রকরদের সম্বন্ধে ওকাকুরার উদ্যোগে সম্ভব হয়। তারই চেষ্টায় থাটস্‌তা, হিসিডা এবং টাইকান এই কয়জন তরুণ চিত্রকর এদেশে আসেন এবং অবনীন্দ্রনাথের অতিথি হন। তিনজনের মধ্যে থাটসুতাই বোধ হয় সর্বপ্রথম এদেশে আসেন। এই তরুণ চিত্রকররা এ দেশে এসেছিলেন ভারতীয় রূপকলার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে। এই তরুণ চিত্রকরদের মধ্য দিয়ে আমাদের আধুনিক চিত্রে জাপানী প্রভাব প্রথম দেখা দেয়। সাক্ষাৎভাবে এই প্রভাব অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রথমে এসেছিল। চিত্রের সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি, অবনীন্দ্রনাথ জাপানী চিত্রকরদের কাছ থেকে তেমন কোন আদর্শ পাননি। জাপানী চিত্রের করণ কৌশলের একটা দিক তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কোন্ দিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন, কি তার বৈশিষ্ট্য এবং কতদূর পর্যন্ত এই জাপানী কৌশল অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুবর্তীদের প্রভাবান্বিত করেছিল তার আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এইসব জাপানী চিত্রকরদের চিত্রের গুণাবলী বিচার করলেই তাদের প্রভাব কতখানি ভারতীয় চিত্রকরদের উপর ছিল তা সহজেই বোঝা যাবে।

ছবির অন্তর্গত রূপ (Form)কে রংএর আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে দেওয়ার একটা রেওয়াজ এই সব জাপানি চিত্রকরদের মধ্যে খুবই ছিল। Atmospheric effect প্রকাশ করবার এই চেষ্টা বিলাতি প্রভাব এর পরে জাপানে দেখা দিয়েছিল। প্রাচ্য চিত্রের একটা প্রধান গুণ (quality) Surface-এর পরিবর্তে space-কে দেখাবার চেষ্টা। জাপানী চিত্রকরদের ছবিতে এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া গেল। অর্থাৎ, Two dimentional আলংকারিক গুণের পরিবর্তে Three dimentional naturalistic গুণ এদের ছবিতে বেশি স্পষ্ট ছিল। এই বর্ণের আচ্ছাদন দেওয়ার উপযোগী 'হোতিহার' অর্থাৎ তুলি, জাপানী চিত্রকরদের ছিল। অবনীন্দ্রনাথ জাপানী চিত্রের মোলায়েম রূপ দেখে আকৃষ্ট হলেন এবং জাপানী তুলি গ্রহণ করলেন। এ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের ছবির গুণ ছিল বর্ণের ঔজ্জ্বল্য এবং ছবির রূপ ছিল আলংকারিক। জাপানী কৌশলের ব্যবহারে তাঁর ছবির এই আলংকারিক গুণ কিভাবে অদৃশ্য হয়েছে আমরা দেখতে পাই, তাঁর বিখ্যাত ছবি ভারতমাতা এবং ঋতুসংহারের চিত্রাবলী নামক ছবিতে। বিশেষভাবে 'Jakshya of the upper air' এই ছবিতে। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যে জাপানি কৌশল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, সহজেই তা আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

ছবির আলোচনা করতে গিয়ে করণকৌশলের একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা না করে উপায় নেই। কারণ, ছবির রস করণকৌশলের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত। বিশেষভাবে অবনীন্দ্রনাথের ছবির করণকৌশল সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, কারণ অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কনভঙ্গী (Style) পরবর্তিকালে চিত্রকরদের খুবই প্রভাবান্বিত করেছে। তাঁর ভঙ্গী অনুসরণ করবার চেষ্টা এত বেশি হয়েছে যে, অবনীন্দ্রনাথের আদর্শ বলতে বহু ক্ষেত্রে তাঁর Style-কেই গ্রহণ করবার চেষ্টা হয়েছে। এইবার এই বিষয়ে আর একটু অনুসন্ধান করা যাক।

১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথের কাছে নন্দলাল ইত্যাদি তাঁর প্রথম দলের ছাত্ররা এলেন, তখন অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কনভঙ্গীর পরিবর্তন সুরু হয়েছে। জাপানী প্রভাব এই সময়ের ছবিতে অত্যন্ত স্পষ্ট, 'অবনীন্দ্রনাথের Wash' নামে অতি পরিচিত বর্ণ প্রয়োগ প্রণালী সবেমাত্র দেখা দিয়েছে। ১৮৯৪—১৯০০ পর্যন্ত তার কিছু পরেও অবনীন্দ্রনাথের বর্ণের যে আলংকারিক বিন্যাস এবং ঔজ্জ্বল্য Surface-এর প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল প্রথমত মোগল চিত্রের সংস্পর্শে ; ছবির আলংকারিক কাঠামো কিছু পরিমাণে শিথিল হয়েছে দেখা যায় জাপানী বর্ণ প্রয়োগের কৌশলে, নূতন যে জিনিস দেখা দিল, তা আলংকারিক গুণের বিপরীত Surface-এর পরিবর্তে, Space, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের স্থানে atmosphere effect অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কনভঙ্গীর এই অপরিণত রূপ তাঁর ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত হলো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে এই ভঙ্গীই স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ছাত্রপরম্পরায় এই ভঙ্গীই অবনীন্দ্রনাথের ভঙ্গী (Style) নামে অভিহিত হয়েছে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের সত্যকারের পরিণত ভঙ্গীর সঙ্গের তুলনায় এই সময়ের ভঙ্গীর পার্থক্য অনেক।

তাঁর ভারতমাতা ছবিতে জাপানি বর্ণ যেমন স্পষ্ট, কয়েক বৎসরের ব্যবধানে অঙ্কিত (১৯০৬—৭) ওমরখৈয়াম চিত্রাবলীতে তার কোন চিহ্নই চোখে পড়ে না। অবনীন্দ্রনাথের স্বকীয় ভঙ্গী (Style) এখানে সর্বাঙ্গীন হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর ভারতমাতা, মেঘদূতের কোন কোন ছবিকে 'Indo-Japanese Style' বলা চলতে পারে; কিন্তু ওমর খৈয়ামের চিত্রাবলীকে এই নামে অভিহিত করা চলে না। অবনীন্দ্রনাথের ভঙ্গীর এই নূতন রূপ কেবলমাত্র জাপানী প্রভাবের

দ্বারাই সম্ভব হয়নি, তাঁর বিলেতি অংকন-কৌশলের জ্ঞান এবং মোগল-রীতির বৈশিষ্ট্য আশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর Style-এ। অবনীন্দ্রনাথ যে তিনটি রীতির সঙ্গে তাঁর প্রথম জীবনে পরিচিত হয়েছিলেন, সেগুলি যে Naturalistic ঘেঁসা রীতি, সে কথা নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই। জাপানি রীতির যে কৌশল তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তার গুণ Naturalistic। এই Naturalistic গুণকে প্রকাশ করার কৌশল, জাপানী ছবি দেখার পূর্বেই তিনি ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। তারপর যে মোগল শৈলীর সঙ্গে তিনি পরিচিত হলেন, তারও গুণ (quality) Naturalistic, পূর্ব আলোচনায় সেকথা উল্লেখ করেছি।

অবনীন্দ্রনাথ দেশী ছবির আলংকারিক রূপ (quality) দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তারপর মোগল ও জাপানী রীতির সংস্পর্শে এই আলংকারিক বাঁধন শিথিল হয়ে এসেছিল কেন, এখন বুঝতে পারা খুবই সহজ হবে। আলংকারিক গুণ তাঁকে আকৃষ্ট করলেও, তার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন না ; কিন্তু মোগল বা জাপানী রীতির Naturalistic গুণকে বুঝতে অতি সহজেই তিনি পেরেছিলেন। কেবল তাই নয়, Space বা atmosphere effect দেখাবার যে চেষ্টা জাপানী ছবিতে বা পরবর্তী মোগল ছবিতে পাই, সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ অত্যন্ত পরিচিত। পরবর্তী মোগল চিত্রকররা atmosphere effect দেখাবার যে চেষ্টা করেছিলেন, বিলাতি করণ-কৌশলের জ্ঞান থাকায় অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে সেই চেষ্টাকে আরও নিখুঁত করা সম্ভব হয়েছিল। বস্তু রূপকে প্রকাশ করবার ভঙ্গী অবনীন্দ্রনাথ মোগল রীতির থেকে পেয়েছিলেন, কিন্তু বর্ণের কারুকার্য বহুল পরিমাণে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর বিলাতি একাডেমির বিদ্যার সাহায্যে।

জাপানী অংকনরীতির সংস্পর্শে আসার প্রথম অবস্থায় অবনীন্দ্রনাথের বর্ণ-প্রয়োগ-কৌশল প্রধান ছিল। সেইজন্য তাঁর ছাত্রদের পক্ষে তাঁর অংকনরীতি অনুসরণ করা সম্ভব ছিল। পরবর্তী কালের, অর্থাৎ ওমর খৈয়ামের চিত্রাবলীর সময়ের অংকনভঙ্গীতে কৌশলের অন্তরালে যে আশ্চর্য করণ-কৌশলের জ্ঞান ছিল, তাঁর অনুবর্তীদের কারুরই মধ্যে সেই জ্ঞান, অর্থাৎ বিলাতি অংকন-কৌশলের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় তাঁর Style গ্রহণ করা কোথাও সম্ভব হয়নি। এখন বলা চলে, অবনীন্দ্রনাথের Style-এর নামে কাগজের Surface-কে ভাঙবার বিশেষ কৌশল মাত্র তাঁর প্রথম ছাত্ররা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এই বিশেষ কৌশল এবং প্রাচীন উপাখ্যান বা কাব্যের বিষয় অবলম্বন করে তাঁর প্রথম ছাত্ররা ছবি আঁকা সুরু করেছিলেন।

পুস্তক পরিচয়

বাইওকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকা—ডাক্তার নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় এম-ডি, বি-এইচ-এস, হোমিওপ্যাথ প্রচার কার্যালয়, নবাবপুর, ঢাকা। মূল্য—তিন টাকা।

বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা প্রণালী এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পুস্তকখানার সপ্তম সংস্করণ হইল ; ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, পুস্তকখানা কতটা লোকপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। ব্যাধির ভেষজ, লক্ষণ সুন্দরভাবে দেওয়া হইয়াছে এবং উদাহরণের সাহায্যে ভেষজ প্রয়োগ প্রক্রিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গৃহচিকিৎসার ক্ষেত্রেও এই পুস্তক বিশেষ কাজে আসিবে এবং চিকিৎসকগণ এই পুস্তকে সাহায্য লাভ করিবেন। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

সুপর্ণা—সম্পাদিকা—শান্তি বসু। চতুর্থ সংখ্যা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মুখপত্র।

সুপর্ণা বৎসরে একবার করিয়া প্রকাশিত হয় এবং গত কয়েক বৎসর যাবত পত্রিকাখানা বিশেষ যোগ্যতা এবং নিপুণতার সঙ্গে পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য সংখ্যাটি সারগর্ভ এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা এবং চিত্রসম্পদ—সকল দিক হইতে সমৃদ্ধ। বর্তমান সংখ্যাটির রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আলোচনা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রবন্ধগুলি আমাদের সবই এত ভাল লাগিল যে, কোনটি ছাড়িয়া কোনটির প্রশংসা করিব বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এমন সুসম্পাদিত পত্রিকা সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না। এ দিক হইতে 'সুপর্ণা'র সম্পাদিকা এবং 'সুপর্ণা'র মন্ত্রণা পরিষদের কৃতিত্ব সর্বাংশেই প্রশংসার্হ। এ পত্রিকাখানি পাঠ করিলে প্রত্যেকেই উপকৃত হইবেন। বাঙলার ঘরে ঘরে আমরা ইহার প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গেঃ—শ্রীদিলীপকুমার রায়। দি কালচার পাবলিশার্স, ২৫৩, বকুলবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

দিলীপকুমারকে অনেকেই সাহিত্যিক, কবি, এবং সংগীতশিল্পী বলিয়া জানেন, আলোচ্য গ্রন্থখানাতে আমরা সাধক দিলীপকুমারের পরিচয় পাই। সাধনা আরম্ভ হয় গুরুর উপদিষ্ট মার্গ অবলম্বন করিয়া এবং গুরুতত্ত্ব উপলব্ধির ভিতর দিয়াই সাধক নিত্য সত্যের সঙ্গে 'যুক্ত' হন। দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দের কৃপায় নূতন জীবনের পথে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। সেই দৃষ্টির প্রভাবে শ্রীঅরবিন্দকে তিনি কবি, জ্ঞানী, প্রেমী এবং যোগী এই চাররূপে দেখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভক্ত জীবনের পূর্ণতা এই চার তত্ত্বকে সত্য করিয়াই। কবিদের কণ্ঠে গান না শুনলে পথের বিনিময় ঘটে না, সংশয় কাটে না; প্রত্যক্ষতার বলই পরম বল এবং সেই বল তমের পরপারে মহান্ত পুরুষকে যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই দিতে পারেন। এ দান পূর্ণতার দান, তাই সে দানের ক্ষেত্রে কোন প্রশ্নের অবকাশ থাকে না—অবিতর্ক সে প্রসাদ। এমন প্রসাদের স্পর্শলাভ করিলে তবে জ্ঞানের পথ আরম্ভ হয়। এই জ্ঞানরাজ্যে গূঢ়তত্ত্বের অনেক রহস্য আলোচ্য পুস্তকখানাতে দিলীপকুমারের জ্ঞানী শ্রীঅরবিন্দের বন্দনাছন্দে পাঠকপাঠিকাদের চিত্তে সুরিত হইবে। মানবপ্রকৃতিকে দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তরিত দেখাই জ্ঞানের কাজ—বিপর্যয়ের ঊর্ধে ব্রাহ্মীস্থিতির স্তরে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ জিজ্ঞাসুকে লইয়া যান এবং তাঁহাদের প্রণিপাতের সেই পথে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। প্রকৃত জ্ঞানাহরণে সে প্রণিপাতের রীতির সঙ্গে পাঠকপাঠিকাগণ এ পুস্তকে পরিচয় লাভ করিবেন। জ্ঞান হইলে প্রেম হইবেই, কারণ অজ্ঞানতাই ভেদজ্ঞান এবং 'কামাদেব কলিঃ' যতকাল পর্যন্ত কামের প্রভাব ততকালই ভেদদৃষ্টি, এর পরে 'সকলই আমার'। সাধক দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবনে এই প্রেমের ঊর্মিমালার লহরী লীলাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং অপরকে সেই মহিমা দেখাইয়া প্রেমের পরম মাধুর্যের আকর্ষণ উদ্দীপিত করিয়াছেন। এ উদ্দীপনা মাপজোখের মধ্যে বদ্ধ জীবনেও অপূর্ব আনন্দের ধারা প্রবাহিত করে এবং ছন্দোময় এবং আনন্দোময় প্রেমের সেই প্রাচুর্য যে যোগ সেই যোগকে সত্য করিয়া তোলে। পাঠকপাঠিকাগণ যোগ বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে কি—গতানুগতিকতার ধারা ছাড়িয়া আলোচ্য পুস্তকে তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। মহাপুরুষদের জীবনকে আশ্রয় না করিলে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে। দিলীপকুমারের আলোচ্য গ্রন্থখানা ভারতের বিশিষ্ট সাধনার অন্তর্নিহিত সেই আধ্যাত্ম সমৃদ্ধি লাভে অগ্রসর হইতে সকলকে সহায্য করিবে।

ইন্দ্রধনু—সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য। ভারতী সাহিত্য সভা, ৮৯, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

গল্পের বই। ছোট গল্প লেখায় গ্রন্থকার ইতিমধ্যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। গল্পগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এই উদীয়মান লেখকের প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। পুস্তকখানায় ছয়টি গল্প আছে। গল্পগুলি বেশ জমাট এবং মানবতার একটা উদারভাবে বিগাঢ়। এমন লেখার আদর হইবে।

আবছায়া—শ্রীমহেন্দ্রলাল সেন। প্রাপ্তিস্থান—চপলা বুক স্টল, শিলং এবং বাণীচক্র ভবন, সিলেট। দাম এক টাকা।

লেখকের সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি আছে। পুস্তকখানা কয়েকটি গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধের সংগ্রহ। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সাহিত্য সভায় পঠিত হইয়াছে।

২৮

চায়ের আনুসঙ্গিক আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে 'খাওয়ার ডাক পড়িল। ছাদে জায়গা করা হইয়াছে। একেবারে সনাতন ব্যবস্থা —কলাপাতা, মাটির গ্লাস আর কুশাসন। সকলে গিয়া আসনে বসিলে পদ্মা, প্রতিমা ও রাণু পরিবেশনে লাগিয়া গেল।

খাইতে খাইতে গল্প চলিল। রকমারি গল্প। সঙ্গে সঙ্গে হাসি তামাসা।

প্রশান্ত, বরেন, ননীমাধব ও দিলীপ খুব কাছাকাছি বসিয়াছে। তাহারা আগের দিনকার শোভাযাত্রা সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিল।

অনেক কথার পর প্রশান্ত বরেনকে বলিল—'প্রসেশান্ খুব সাক্সেস্ফুল হ'য়েছে বলতে হবে। এ রকম যে হবে আমি ত আশাই করিনি।'

'পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক এক সঙ্গে মার্চ করে' যাচ্ছিল আর আমার কি মনে হচ্ছিল জানেন? আমার মনে হচ্ছিল এ যেন আমাদের জয়যাত্রা!'—এই বলিয়া বরেন ননীমাধবের দিকে তাকাইল।

ননীমাধবও সায় দিল, কিন্তু মুখে নয়, মুখ বন্ধ বলিয়া সম্মুখের দিকে মাথা নাড়িল। তাহার মুখে তখন মস্ত এক টুকরা মাংস।

প্রশান্ত কহিল—'মার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা মার্চিং সংগ হ'লে বেশ হ'ত কিন্তু!'

বরেন তাহার কথাটা সমর্থন করিয়া বলিল—'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছিল।'

'ও মশাই ননীবাবু!'—বলিয়া প্রশান্ত ননীমাধবকে ডাকিয়া বলিল—'আপনি ত কবিতা লেখেন শুনেছি, একটা মার্চিং সংগ লিখে ফেলুন না, নেক্‌ট্‌স্ টাইমে কাজে লাগবে।'

ননীমাধব মাংসের টুকরাটা চিবাইতে চিবাইতে বলিল—'আপাতত আমাদের প্রচলিত গান গেয়েই মার্চ করতে হবে প্রশান্তবাবু! তারপর চলতে চলতে চলার গান আপনি তৈরী হ'য়ে যাবে। সে গান কৃষক মজুরেরাই তৈরী করবে, আমাদের কারুকে তৈরী করতে হবে না।'

প্রশান্ত ভাবিয়া বলিল—'প্রচলিত গান কি আছে? বন্দেমাতরম্ ত চলবে না।'

ননীমাধব হাসিয়া কহিল—'বন্দে মাতরম্ না চলে বন্দে ভ্রাতরম্ চালান না! আপনারা ত বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করেন, সুতরাং মাতার বন্দনা না করে' ভ্রাতার বন্দনা স্বচ্ছন্দেই করতে পারেন।'

ননীমাধব প্রশান্তকে এক হাত লইতেছে দেখিয়া বরেন হাসিল, হাসিয়া ননীমাধবকে বলিল—'থাক থাক, তোমাকে আর ইয়ার্কি করতে হবে না।'

প্রশান্ত গম্ভীর হইয়া বলিল—'সত্যি ননীবাবু, এটা ইয়ার্কির কথা নয়। সমগ্র ভারত যে গান সর্ববাদীসম্মতভাবে গ্রহণ করতে পারে এ রকম একটি গান চাই।'

প্রশান্তের কথা শুনিয়া ননীমাধব যেন গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেল। বলিল—'তা'ত ঠিক কথা, তা' না হ'লে সে গান চলবে কেন? কিন্তু আমার গান কি সর্ববাদীসম্মতভাবে সমগ্র ভারত গ্রহণ করবে? একটা গান আপনাকে আমি দিতে পারি। কালই মার্চ করতে করতে তৈরী করে' ফেলেছি। শুনতে চান ত এখনই শুনিয়ে দিই।'

প্রশান্ত খুশী হইয়া বলিল—'বেশ ত, শোনান না!'

গলা খাকারি দিয়া ননীমাধব গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইল, তারপর ব্যান্ড মাষ্টারের মত হাত দুইটি ছুঁড়িয়া উচ্চ কণ্ঠে সুরু করিল—

আওরে আও, আওরে আও!
হাতকে সাঁথ হাত মিলাও।
আও কিষাণ, আও মজুর!
কুইক্ মার্চ, চালাও জোর।
লড়তে হবে লড়াই আজ
গড়তে হবে শ্রমিক রাজ।
ডাল, রুটি, ভাত, যে যা' চাও
মিলবে সবই, আওরে আও!'

ননীমাধবের 'মার্চিং সংগ' শুনিয়া সকলে হো হো হাসিয়া উঠিল।

ননীমাধব জিভ্ কাটিয়া কহিল—'আপনারা হাসবেন হাসবেন না! এটা হাসির গান নয়।'

বরেন বলিল—'হাসির গান নয়ত কি! ভাষাটা শুনলেই ত হাসি পায়।'

ননীমাধব প্রতিবাদের ভঙ্গীতে হাত মুখ নাড়িয়া কহিল—'ভাষার কথাই যদি তুললে তা হ'লে বলি'—

প্রশান্ত তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—'আপনি যা'-ই বলুন না কেন ননীবাবু আপনার ভাষাটা সত্যি কিম্ভূত কিমাকার! না বাঙলা না হিন্দী।'

'ও কথা বলবেন না প্রশান্তবাবু, আধা বাঙলা আধা হিন্দী বলুন!' এই বলিয়া ননীমাধব প্রশান্তের কথাটা সংশোধন করিয়া দিল, তারপর পুনরায় কহিল—'কিন্তু তা'ছাড়া উপায় কি! বাঙ্গালীরা বলছে বাঙলা চালাও, আর হিন্দুস্থানীরা বলছে—না তা' চলবে না, হিন্দী চালাতে হবে। দুই পক্ষই নাছোড়বান্দা। কাজেই আমি রফা করেছি, আধা বাঙলা আধা হিন্দী, একেবারে ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি।'

তাহার কথা শুনিয়া সকলে আর এক চোট হাসিল।

হাসি থামিলে বরেন ননীমাধবকে বলিল—'ইয়ার্কি করে করেই তুমি তোমার প্রতিভা নষ্ট করে' ফেললে ননী, কলেজেও দেখেছি—এখানেও দেখছি।'

মৃত্যু-দূত

অমর সান্যাল

আসাম-ব্রহ্ম সীমান্ত। রহস্যময় গারোপাহাড়ের অন্তরালে সীমান্তের রেখা কোথায় মিলিয়ে গেছে। চারিদিকে সুনিবিড় বনানী, তার মাঝে সরু আঁকাবাঁকা পথ। সে পথে আনাগোনা করে অসভ্য গারোরা আর পালিয়ে বেড়ানো চোর ডাকাতের দল। সভ্য মানুষের পায়ের দাগ সেখানে পড়ে না।

ডিসেম্বরের শেষাশেষি রেঙ্গুনে বোমা পড়ল। প্রবাসী ভারতবাসী দলে দলে ছুটল সীমান্তের দিকে। বিপদের দিনে দেশের মাটি ছাড়া আশ্রয় কোথায়? দুর্গম পথ ও খরস্রোতা নদী তাদের কাছে সুগম হয়ে গেল; অসভ্য গরোরা তাদের আহারও পানীয় জোগাল; সীমান্তরক্ষী প্রহরীর মত গারো পাহাড় নিঃশব্দে তাদের অভিনন্দন জানাল।

এমনি এক দলের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ দত্ত এসে পা দিল বাঙলাদেশের মাটিতে। ব্রহ্মের সঙ্গে তার বার বছরের সম্বন্ধ চূর্ণ হয়ে গেল জাপানী বোমার এক ঘায়ে। রেঙ্গুনের প্যাগোডা, রয়্যাল লেক, রূপসী ব্রহ্ম তরুণী স্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে গেল।—

খাঁটি কসমোপলিট্যান বলতে যা বোঝায়, পূর্ণ হচ্ছে সেই দলের লোক। তার জন্ম বাঙলাদেশে, কিন্তু পাঞ্জাবের রুক্ষ মাটিতে পুষ্ট হ'ল তার ছেলেবেলার দিনগুলি। লেখাপড়ার পর্ব তার শেষ হ'ল মাদ্রাজে, চাকরী করতে গেল বম্বে, আর ব্যবসা করতে এল বিহারের কোন এক অখ্যাত শহরে। তারপর একদিন সব ছেড়ে দিয়ে আরব সাগর পেরিয়ে এডেনে পৌঁছল নুনের ব্যবসা করতে। সেখানে টিঁকে থাকল কোন রকমে ছ' মাস, তারপরে একেবারে পাড়ি দিল ব্রহ্মের পথে ব্রহ্মদেশে তার জীবনের এক নূতন অধ্যায় সুরু হ'ল। ট্যাভয়ে বেছে বেছে এক ভূতের বাড়িতে এক মাস বাস করে সে তাক লাগিয়ে দিল স্থানীয় লোকদের। কিছুদিন পরে ব্যবসার নেশা আবার তাকে পেয়ে বসল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে নিজেকে করল প্রতিষ্ঠা। বিত্তহীন, সহায়হীন পূর্ণ দত্ত, পি ডাট নামে হ'ল পরিচিত। দীর্ঘ বার বৎসর পরে পি ডাট ফিরে এল সম্বলহীন পূর্ণ দত্ত হয়ে।

পূর্ণ আশ্রয় পেল কলকাতায়,—তার জ্ঞাতি দাদা বিনয়বাবুর বাড়িতে।

কলকাতার অবস্থা দেখে সে বিস্মিত হ'ল না। স্টেশনে ভীত, ত্রস্ত জনতা,—বড়লোকের উদ্বেগাকুল মুখমণ্ডল, মধ্যবিত্তের হতাশামিশ্রিত ব্যস্ততা, বিত্তহীনের নিরুদ্বেগ তৎপরতা। ট্রামে, বাসে, ফিস্‌ফিস্ কথাবার্তা, সাবধানীদের সচকিত চাহনি,—পূর্ণর মনে আক্রমণের পূর্বে রেঙ্গুনের ছবি ভেসে উঠল। বিনয়বাবুদের সরু গলিটার মোড়ে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে, তার মনে হয় গারো পাহাড়ের ছায়া আসচে কলকাতাকে গ্রাস করতে। প্রথম উত্তেজনার ভাব কেটে যেতেই পূর্ণ পড়ল অসুস্থ হয়ে।

বিনয়বাবুর সংসারটি বড়, দুবেলা কুড়িখানি পাত পড়ে। দু বছর উৎরে গেলেই তাঁর বাড়ির ছেলেমেয়েরা দুধের বাটী ছেড়ে ভাতের থালায় মুখ দেয়। কচি কচি ছেলেমেয়েদের ভাত খেয়ে খেয়ে স্বাভাবিক লাবণ্য মুছে গেছে। সরু সরু হাত পা, পেট মোটা চোখে কি রকম একটা করুণ অসহায় ভাব। তাদের মধ্যে টেপু, মিনু স্কুলে যায়। গোলগাল, নাদুসনুদুস কত ছেলে তাদের সঙ্গে পড়ে। টিফিনের সময় বাড়ির চাকর সকলকে রূপোর গ্লাসে তাদের জন্য দুধ নিয়ে আসে; তারা কতক খায়, কতক ফেলে দেয় কুলকুচি করে। টেপু, মিনু অবাক হয়ে দেখে।

পূর্ণ এসে বিনয়বাবুর সংসারের বোঝা বাড়িয়ে তুলল। পরমহংস ইনস্টিটিউসনে মাস্টারি তাঁর যেতে বসেছে। ডিসেম্বরের মাইনে দিয়ে সেক্রেটারী পীড়াপীড়ি করছে এক বছর ছুটি নিতে বিনা বেতনে। টুইসনিও পাওয়া যাচ্ছে না। বিনয়বাবুর চিন্তা-ক্লিষ্ট মুখে হতাশার ভাব সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। চল্লিশ বছর বয়সেই যেন তাঁকে সর্বহারা বৃদ্ধের মত দেখাচ্ছে। বারটি প্রাণী যে তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।—

সুষমা খরচ কমিয়ে ফেলল। দেড় বছরের নিপুর জন্য ভাত বরাদ্দ হয়ে গেল। টেপু, মিনু স্কুল ছেড়ে দিল। ঠিকা ঝি বিদায় নিল। অম্বলের দোহাই দিয়ে সে নিজে একবেলা খেতে আরম্ভ করল। পূর্ণ একটু সুস্থ হয়েই চলে যেতে চাইল,—তার ভবঘুরে জীবনের আবার গোড়াপত্তন হবে। সুষমা ছেড়ে দিল না; বললে,—বোমার ভয় তোমাকেও পেয়ে বসল নাকি ঠাকুর-পো?

এদিকে বিনয়বাবু চাকরীর চেষ্টায় ঘোরাফেরা করছেন। সব জায়গাতেই অযাচিত উপদেশ পাচ্ছেন,—কাজ নেই মশায়, এ আর পি'তে ঢুকে পড়ুন। কেউ কেউ মুচকি হেসে বললে,—এম এ পাশ লোক আপনি, কাজ সহজেই জুটে যাবে আপনার। দু একদিন স্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গেও দেখা করলেন। সেক্রেটারী বললে,—এম এ, বি টি পাশ আপনি, আপনার আর কাজের ভাবনা কি। মফস্বলের স্কুলে আপনাকে লুফে নেবে। বিনয়বাবু বুঝতে পারেন,—এম এ পাশের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।

এক মাস কেটে গেল। যে বোমার ভয় শহরের দৈনন্দিন জীবনে বিশৃঙ্খলা এনে দিয়েছিল, তার পরিচয় অজ্ঞাতই রয়ে গেল। হেঁটে হেঁটে বিনয়বাবুর শীর্ণ দেহ শীর্ণতর হয়ে গেল, দুশ্চিন্তায় মাথার চুলগুলি প্রায় সাদা হয়ে গেল। সুষমাও অধিক পরিশ্রম ও অর্ধাশনে দুর্বল হয়ে পড়বে; নিপুর গোল গোল হাত পা শুকিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। সারা বাড়িখানার উপরে যেন দুর্দিনের বিভীষিকা তার করাল ছায়া বিস্তার করছে একটু একটু করে। বিনয়বাবু হাসেন আপন মনে,—এম এ পাশ আমি, আমার আবার চাকরীর অভাব কি?

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পূর্ণও বেরুল কাজের খোঁজে। বিনয়-বাবুকে বললে,—অনেক সয়েছেন বিনয়দা আপনার বোঝা এবার আমায় দিন।

পূর্ণ চেষ্টার ত্রুটি করল না। কিন্তু কলকাতা রেঙ্গুন নয়, কাজেই পূর্ণ দত্ত অনেক চেষ্টা করেও পি ডাট হবার আভাস পেল না। ব্রহ্ম প্রত্যাগত শুনে অনেকেই সহানুভূতি প্রকাশ করল, কেউ কেউ গল্প শুনতে চাইল; চাকরীর বেলায় সকলেই বললে,—তাই ত! রেঙ্গুনের ধনী ব্যবসায়ী পি ডাটের মানসম্ভ্রম ক্রাইভ স্ট্রীটের রুক্ষ ধাক্কায় গুঁড়ো হয়ে গেল।

পূর্ণ চিন্তিত হয়ে পড়ল,—নিজের জন্য নয়, বিনয়বাবুদের জন্য। তার জন্য ত বিশাল বিশ্ব উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। গারো পাহাড় হাতছানি দিচ্ছে তাকে, আরবসাগরের ঢেউ চঞ্চল হয়ে উঠেছে তারই জন্য। পূর্ণ অতিকষ্টে বাধাচঞ্চল মনকে শান্ত করে।—

সুষমা খরচ আরও কমিয়ে ফেলেছে। ধোপা ও দরজীর খরচ সে তুলে দিল, দৈনিক খাবারের পরিমাণও দিল কমিয়ে। তার নিজের ব্রতোপবাসের সংখ্যাও অনাবশ্যকভাবে গেল বেড়ে।

বিনয়বাবু আজকাল বেশীর ভাগ সময় বাড়িতেই থাকেন। তাঁর চেহারায় একটা অস্বাভাবিক পরিবর্তন এসেছে। রাত্রিশেষের ফ্যাকাসে অন্ধকারের মত ম্লান জড়তা রয়েছে তাঁকে ঘিরে।—পূর্ণ রোজ কোথা থেকে একখানা খবরের কাগজ নিয়ে আসে। বিনয়বাবু তন্ন তন্ন করে চাকুরীখালির স্তম্ভটি খোঁজেন। যত রকম লোক নিচ্ছে যুদ্ধে, কত রকমারি তার বিজ্ঞাপন। কারখানায় কত মিস্ত্রী, ফিটার, প্লাম্বার চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। এম এ, বি টি প্রার্থী বিজ্ঞাপন একদিনও নজরে পড়ে না। বিনয়বাবু ভাবেন,—স্কুল মাস্টার আজ সমাজের চোখে অপরিহার্য আবর্জনা, সমাজ গঠনে তার দাবী ও যোগ্যতার পরিমাপ কেউ করে না।

পূর্ণর উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। বিনয়বাবুদের সংসারের দৈন্য তার দীর্ঘ পথশ্রান্ত উদ্যম ও উৎসাহে একটা অভিনব আবেগ দিলেও, তার গতি ক্রমে শিথিল হয়ে এল। রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে সে আনমনে ঘুরে বেড়ায় পথে ঘাটে; ম্যাকিননের বাড়ির ছায়ায় বসে স্বপ্ন দেখে মা—পানের চায়ের দোকানের,—তরুণী পরিবেশিকা হাসিমুখে এগিয়ে দিচ্ছে গরম রোস্ট আর সুরভিত চা। ক্ষণেকের জন্য পূর্ণ ভুলে যায় বিনয়বাবুর সকরুণ খেদোক্তি, বৌদির পাণ্ডুর মুখচ্ছবি, টেপু মিনুর ছলছল চোখের করুণ চাহনি।

সারা বৈকাল সে ঘুরে বেড়ায় পার্কে পার্কে। সেখানে তখন কোথাও চলেছে সোভিয়েট বান্ধব সম্মেলনীর অধিবেশন, কোথাও বা মহাসমারোহে প্রতিপালিত হচ্ছে চীন দিবস। বক্তৃতামঞ্চ থেকে বান্ধবেরা একে একে মর্মস্পর্শী আবেদন করছে সোভিয়েট রাশিয়াকে সাহায্য করতে সর্বস্ব দিয়ে। পূর্ণ তাদের অনেককেই চিনতে পারে তার বেকার জীবনের কল্যাণে।

রেঙ্গুনে বোমা পড়ার পর দেখতে দেখতে দু'মাস কেটে গেল। যাঁরা মত প্রকাশ করেছিলেন, রেঙ্গুনের পর দশ বার দিনের মধ্যেই কলকাতায় বোমা বর্ষণ সুরু হবে, তাঁরা নির্লজ্জের মত নূতন ভবিষ্যদ্বাণী করে অহেতুক ভীতি সঞ্চার করতে লাগলেন।

বিনয়বাবুর সংসার কাণ্ডারীহীন ভাঙ্গা নৌকার মত ভেসে চলেচে। কঠোর পরিশ্রম ও উদ্বেগে দু মাসের মধ্যেই সুষমার অর্ধপুষ্ট দেহ শয্যাশায়ী হ'ল। বিনয়বাবু ঝিমিয়েপড়া আগ্নেয়গিরির মত স্ত্রীর কাছে বসে বাইশ বছরের মাস্টারি জীবনের হিসাব-নিকাশ করতে লাগলেন। ছেলেদের ভার গিয়ে পড়ল পূর্ণর উপর।

পূর্ণ এতদিনে একটা বড় রকমের কাজ পেল। তার বোহেমিয়ান জীবনের স্রোত সামাজিক জঞ্জালে আবদ্ধ থাকবে না, তাকে উদ্ধার করে শতমুখী করে দেবে টেপুরা তিন রুশোর এমিলের মত তাদের শিক্ষার মধ্যে সে আনবে একটা স্বতস্ফূর্ত বিকাশ, সাগরের ঢেউএর মত চঞ্চল হবে তাদের জীবনের গতি। অসংস্কৃত সমাজ বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে থাকবে তাদের পায়ের কাছে; তারাই হবে অনাগত অম্লান যুগের স্রষ্টা,—যে যুগ কোন দিনই গড়ে তুলতে পারবে না অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের গ্র্যাজুয়েটরা আর বাপের পয়সা খরচ-করা তরুণের দল।

সারা পৃথিবী ছড়িয়ে আছে এই কচি ছেলেদের পায়ের কাছে। অনলস দুর্বার গতিতে তারা আহরণ করবে প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ। বেঁচে থাকবার অধিকার কারুর চাইতে তাদের এক তিলও কম নেই, এইটুকু জানিয়ে দেবে তারা জগতকে। পূর্ণর এইত জীবনের সার্থকতা। তার নিজের বিগত জীবনের স্মৃতি মনে পড়ে। উত্তর ভারতের রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরে পরিব্রাজকবেশে বিচরণ, এডেনের শিলাস্তীর্ণ পাহাড়ে রাত্রি যাপন,—পূর্ণর মনে কোন গোপন সুখের মায়া এনে দেয় একটা সুমধুর আবেশ।

সুষমার রোগ ক্রমে বৃদ্ধির দিকে চলেচে। পূর্ণ ভাল ডাক্তার নিয়ে এল। ডাক্তার রোগী দেখে যা মত প্রকাশ করল, তাতে আশার চাইতে নিরাশার বাণীই বেশী ছিল। লম্বা প্রেসক্রিপসন আর পুষ্টিকর পথ্যের সুদীর্ঘ তালিকা দিয়ে ডাক্তার ত বিদায় নিল। এদিকে জমান টাকা নিঃশেষ হয়ে এসেচে। গহনা যা দু'চারখানা আছে তাতে ডাক্তার ও সংসারের খরচ এক মাসের বেশী চলবে না। ঘরের দিকে চেয়ে পূর্ণ দেখল, বৌদির রোগজীর্ণ দেহ বিছানায় মিশে আছে, বিনয়দা উদ্গত অশ্রু রোধ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করচেন, ছেলেরা মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। সারা ঘরখানি যেন একটা দুঃসহ ব্যথায় থমথম করচে।—

পূর্ণ সংকল্প স্থির করে ফেলল। বৌদিকে বাঁচাতেই হবে। জীবধাত্রী জননী,—তিনি না থাকলে বার্মা ফেরত পূর্ণ দত্ত কোথায় ভেসে যেত। ছেলেরা থাক—সে ফিরে এসে তাদের হাতে ধরে দেবে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন।

হেস্টিংসে রিক্রুটমেণ্ট আপিসে সে ছুটল তখনি, সেখানে খোঁজ করে পেল কেরাণীর কাজ। তার রেজিমেণ্ট যাবে আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তে। সেখানে আছে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন সরু পথ; সীমান্তপ্রহরী গারো পাহাড় সস্নেহে তাকিয়ে আছে তারই প্রতীক্ষায়।

প্রৌঢ় পূর্ণর ঠাণ্ডা দেহে প্রথম যৌবনের রক্ত ঝিলিক দিয়ে উঠল। মনের এক কোণে সংসারনীড় রচনা করবার যে বাসনা জেগেছিল, এক নিমেষে তার সমাধি হয়ে গেল। জীবনে হয়ত এই হবে তার শেষ অভিযান; কিন্তু কি মূল্যে সে এই সুদূর পথে যাত্রী হ'ল, তার হিসাব করবে কে?

বৃদ্ধ বিধাতা

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় পাল

চুপ কর্ ভীরু, মোছ আঁখিজল, চাস্‌নে ওপর-পানে;
ডাকিস্‌নে ওরে, ডাকিস্‌নে মিছে অক্ষম ভগবানে।
অন্ধ দৃষ্টি, বধির কর্ণ,
বিলোল চর্ম্ম, কপিশ বর্ণ,
অবশ অঙ্গ, বৃদ্ধ বিধাতা,—
জর্জ্জর জরা-বাণে।
ডাকিস্‌নে ওরে, ডাকিস্‌নে মিছে অক্ষম ভগবানে॥

দিকে দিকে শোন্ আর্ত্ত নরের নিষ্ফল কোলাহল;
আকণ্ঠ ভরি' করিয়াছে পান বেদনার হলাহল।
শক্তিমানের শক্ত কৃপাণ
মানব-রক্তে করিয়াছে স্নান;—
অতি-অক্ষম অভাগাজনের
বক্ষে আঘাত হানে।
ডাকিস্‌নে মিছে ডাকিস্‌নে ওরে, নির্ম্মম ভগবানে॥

দেখিস্‌নি মূঢ় শোষকের দল জোঁকের জাতের মতো
নিঃস্ব নিরীহ রুধিরে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিছে যতো।
নগরোপান্তে বস্তির গায়
কান পেতে শোন্ কে কাঁদে ক্ষুধায়!
কোন্ বর্ব্বর কোথা ভাঙে ঘর,
নারীর হস্ত টানে!
ডাকিস্‌নে মিছে ডাকিস্‌নে আর নির্দ্দয় ভগবানে॥

ধর্ম্মের কড়া মদে বুঁদ হ'য়ে কে তুই চক্ষুহীন,
বঞ্চনা আর লাঞ্ছনা স'য়ে, হ'য়ে যেতেছিস্ হীন!
পরকালে কোথা পাবি সুবিচার
বিধাতা বসিয়া নেয় সমাচার?
বিধাতা থাকিলে ভায়ের বক্ষে
ভাই কভু ছুরি হানে?
ডাকিস্‌নে আর ডাকিস্‌নে মিছে নিস্তেজ ভগবানে॥

জেগে ওঠ্ ওরে ব্যথা-বিদ্রোহী, দুখের অশ্রুনদে
পার হ'য়ে চল্; বিদলিত কর্ জঞ্জাল নিজপদে।
ধর্ম্মের বাণী লয় পেয়ে যাক্;
পরকাল তোর ধূলায় লুটাক্;
বিচার-আশায় বাড়াস্‌নে হাত
আকাশের পথপানে।
ডাকিস্‌নে ওরে, ডাকিস্‌নে আর অথর্ব্ব ভগবানে॥

সিন্ধু-সভ্যতার কথা

ভবানী পাঠক

কেউ জানতো না সেখানে মাটির নীচে সাত হাজার বছরের আগেকার এক নগর ঘুমিয়ে আছে। মাটির ওপরে আধা মরুভূমি, বালি ও পাথরের ঢিবি, দূরে দূরে হয়তো ছোট এক একটা চাষাদের বস্তি। মধ্যাহ্ন-সূর্যের তাপে মাঠ ঘাট জ্বলতে থাকে। সিন্ধু দেশে—সিন্ধু নদের উপত্যকায় এই জায়গাটির নাম মোহেঞ্জোদাড়ো। জীর্ণ বিগলিত একটি বৌদ্ধস্তূপ দাঁড়িয়ে ছিল সেই নির্জন রুক্ষ শুষ্ক প্রান্তরের মাঝখানে। স্তূপের চারদিকে পোড়া ইঁটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরী করা প্রাচীরের বেষ্টনী। গাঁয়ের লোকেরা একে মোহেঞ্জোদাড়ো বলেই জানে। মোহেঞ্জোদাড়ো—অর্থাৎ মৃতের ঢিবি।

প্রায় দশ বছর আগে এক বাঙ্গালী ঐতিহাসিক সেই প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের ওপর লোকজন নিয়ে খুঁজে ফিরছিলেন কোন ঐতিহাসিক রহস্যের সন্ধানে। তার ফলে আবিষ্কৃত হলো এক অতি প্রাচীন সুসমৃদ্ধ নগরের সমাধি। ঘর বাড়ি স্নানাগার, খেলার পুতুল, মুদ্রা, আরও কত সাংসারিক সামগ্রী। কত হাজার বছর ধরে এই শহর মাটির নীচে এমনি ভাবে মুখ লুকিয়ে ছিল। সেই মানুষেরা আর নেই। সেই পৌরভবনে কোন কোলাহল নেই। কত হাজার বছর ধরে সেখানে একটি পাখীর ডাক, একটি প্রতিধ্বনিও বেজে ওঠেনি। পুরবাসীর জন্য তৃষ্ণার জল ভরে সুগভীর কূপ এখনও সেখানে রয়েছে। কিন্তু হাজার বছর ধরে কোন পুরনারী 'পানিয়া ভরনে' সেখানে আসে নি। মাটির নীচে এই বিরাট এক পুরাতন ঋদ্ধ সভ্য মানুষের জনপদ স্তব্ধ হয়ে ছিল শত শত বৎসর ধরে। সময়ের ঝড় চলে গেছে ওপর দিয়ে। আবার এল বিংশ শতাব্দীর সত্যসন্ধানী কৌতূহলী বৈজ্ঞানিক মানুষের পরশ-পাথর খোঁজার পালা। পুরাতন বৌদ্ধস্তূপ খুঁড়ে আবিষ্কৃত হলো এই শহর। সাত হাজার বছর পরে আবার সেই কূপের ঠান্ডা জল মানুষের তৃষ্ণা মিটালো।

সিন্ধু নদের উপত্যকায় এই আবিষ্কার আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক সিদ্ধান্তকে উল্টে দিয়েছে। পাঞ্জাবের হরপ্পা নামে সিন্ধু উপত্যকার আর একটি স্থানে এই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সিন্ধু প্রদেশে আর একটি জায়গার নতুন করে আবার সন্ধান পাওয়া গেছে। সে জায়গাটির নাম চানুদাড়ো।

আর্যেরা বাইরে থেকে ভারতে প্রথম সভ্যতা আমদানি করেছিল একথা আজ আমরা বিশ্বাস করি না। আর্যদের আগে উত্তর পশ্চিম ভারতে সিন্ধু নদের উপত্যকায় যে বিরাট ও বহু বিস্তৃত সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার থেকে প্রমাণিত হয় যে, অনার্য ভারত আর্যদের চেয়ে সভ্যতাগুণে অনেক বেশী উন্নত ছিল।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম মোহেঞ্জোদাড়োর স্তূপটিকে পরীক্ষা করে দেখেন। অনুসন্ধানের ফলে তিনি প্রথমে কয়েকটি চতুষ্কোন সীল ও তামার পাত খুঁজে পান। ১৯২১ সালে পাঞ্জাবের হরপ্পা
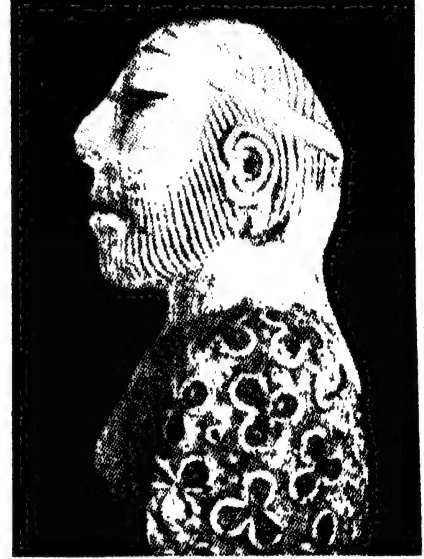
মোহেঞ্জোদাড়োর কোন মনস্বী বা দেবতার মূর্তি। অতি উন্নত ভাস্কর্যের নিদর্শন

খননের ফলে ঠিক এই ধরণের কতগুলি জিনিস পাওয়া গিয়েছিল। দুজায়গার এই নিদর্শন-সাম্য প্রত্নতাত্ত্বিকদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। এই বিবরণ প্রকাশিত হবার পর আলোচনা ও গবেষণার ফলে দেখা গেল যে এই সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয় সভ্যতার সাদৃশ্য আছে। স্যার জন মার্শাল মনে করেন যে, নীল, টাইগ্রিস, ইউফ্রেতিস প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় যে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আজও ছড়িয়ে রয়েছে, এই ভারতীয় সিন্ধু সভ্যতা তারই অঙ্গীভূত সহযুক্ত এবং সমসাময়িক একটি সভ্যতা। তাই প্রথম প্রথম এই সিন্ধু নদের উপত্যকার সভ্যতাকে ইন্দো সুমেরীয় সভ্যতা আখ্যা দেওয়া হয়। এরপর ডাঃ ই ম্যাকে'র পরিচালনায় মোহেঞ্জো-দাড়ো এবং হরপ্পাকে ভালভাবে খুঁড়ে দেখা হয়। সমগ্র শহরটি আবিষ্কৃত হবার পর থেকে যেসব নতুন তথ্য পাওয়া গেছে তার ফলে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আবার নতুন করে তাঁদের গবেষণা আরম্ভ করেন।

মেসোপটেমিয়ার উর এবং কিস প্রভৃতি অঞ্চল খনন করে যে সুমেরীয় সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে এই সিন্ধু সভ্যতার কতগুলি বড় বড় পার্থক্য দেখা যায়। সুমেরীয়

সভ্যতায় ঘরবাড়ি তৈরী হয়েছে রোদে শুকানো কাদার ইঁট দিয়ে। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার ঘরবাড়ি পোড়ানো ইঁটের তৈরী। সবচেয়ে বিস্ময়কর সিন্ধু-সভ্যতার নগর পত্তনের রীতি। এত বড় নাগরিক জীবন যাত্রার জন্য যে সব সামাজিক
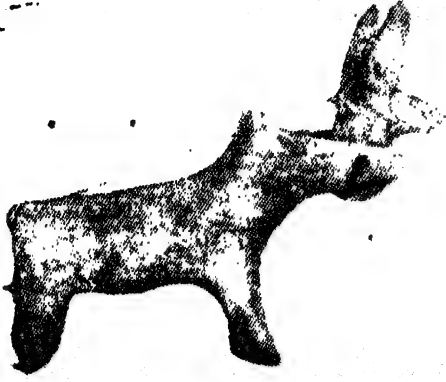
সাত হাজার বছর আগে ভারতের শিশুরা যে পুতুল নিয়ে খেলা করেছে।

ও রাজনীতিক অনুশাসন ছিল তার কোন লিখিত প্রমাণ সেখানে পাওয়া যায় নি। এই শহরগুলির আসল নাম কী ছিল তাও আজ জানা যায় না। এটা বোঝা যায় যে, তারা শিল্পী হিসাবে তেমন উৎকর্ষ লাভ করতে পারে নি। চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে মূর্তি ও নানাবিধ ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে যা তাদের উঁচুদরের কারিগরি প্রতিভার প্রমাণ। চিত্র শিল্পের কিছু নিদর্শন বা দেয়াল চিত্র প্রভৃতি কিছু থাকলে তবু তাদের জীবনযাত্রার একটা আংশিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব ছিল। তবু স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে তাদের কৃতিত্ব আর্যদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তে বলা হয়েছে যে আর্যেরা এদেশে এসে একটি বর্বর দাসজাতিকে দেখতে পান। সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার প্রাচীন আর্য কবির এই অহঙ্কার মিথ্যা বলে প্রমাণিত করেছে। প্রাগার্য ভারতের সভ্যতা কোন কোন অংশে মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সভ্যতা থেকে উন্নত ছিল।

অনেকে অনুমান করেন ভারতে আর্য আক্রমণকারীরা দলে দলে এসে এই সিন্ধু-সভ্যতাকে বিনষ্ট করে। নিছক গায়ের জোরের কারণে পৃথিবীর অনেক সভ্যতা ও সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাতির কাছে পরাভূত হয়েছে। আর্যরাও যে গায়ের জোরে একটি উন্নততর বৈদেশিক সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

সিন্ধু-সভ্যতায় মানুষের জীবনযাত্রার যতটুকু পরিচয় গবেষণা করে জানতে পারা গেছে, তা থেকে বলা যায় এরা তামা ও ব্রঞ্জের হাতিয়ার ব্যবহার করতো, কৃষিকার্যে এরা নিপুণ ছিল। পণ্যদ্রব্য আমদানি রপ্তানি করে ব্যবসায় চালাতো। তুলোর থেকে সুতো তৈরী করে কাপড় বোনার পদ্ধতি এরা ভালভাবেই জানতো। এদের পরিচ্ছদ ছিল ভাল, আচারে ব্যবহারেও পরিচ্ছন্ন ছিল। বড় বড় স্নানাগার রচনা করে এরা এদের নাগরিক জীবনের উন্নত রুচির পরিচয় দিয়েছে। বোঝা যায় যে, জনহিতের জন্য ইষ্টাপূর্তের ব্যবস্থা এদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। সিন্ধু-সভ্যতায় এই সব স্বাস্থ্যরক্ষক মিউনিসিপ্যাল পদ্ধতিকে আধুনিক অনেক শহর হিংসে করতে পারে। তাছাড়া পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, আবর্জনা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, পানীয় জলের কূপ প্রভৃতি দেখে তাদের শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় আছে, যা অন্য কোন প্রাচীন বা আধুনিক শহরে কোথাও দেখা যায় নি। মোহেঞ্জোদাড়োয় সমস্ত ঘরবাড়িই পাকা দালান। জনসাধারণের জন্য কোথাও এতটা আরামের বাসগৃহের নিদর্শন কোন শহরে দেখা যায় নি।

স্যার জন মার্শাল অনুমান করেন এই শহরের নীচে আরও নিম্ন ভূস্তরে নিশ্চয় প্রাচীনতর আরও শহরের নিদর্শন রয়েছে। আরও গভীরে খনন কার্য আরম্ভ হ'লে হয়তো সেই অতিবৃদ্ধ নগরের সন্ধান পাওয়া যাবে।

সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, সিন্ধু-সভ্যতার কতকগুলি স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য একে প্রাচীনতর প্রমাণিত করেছে। অনেকে মনে করেন যে, আদি সভ্যতার সূত্রপাত হয়তো এখানে। কেন না এতটা উন্নত সভ্যতা এককভাবে গড়ে উঠতে বহু সহস্র বৎসরের সাধনা থাকা চাই। সিন্ধু নদের গতি ও প্রবাহ, এখন যতখানি সরে গেছে, স্থানীয় জলবায়ু যে রকমভাবে বদলে গেছে, তাই থেকে এর অতি প্রাচীনত্ব আরও বেশী করে প্রমাণিত হয়। যে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার মধ্যে সিন্ধু-সভ্যতার উদ্ভব ও অস্তিত্ব ছিল, সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ বদলে গেছে। তাই সেই সুউর্বর দেশ আজ বন্ধুর শুষ্ক প্রান্তরে পরিণত। সেখানে আজ মরুভূমির প্রদাহ, কাঁটা গুল্ম আর ধূসর ঘাসের বন। লবণের আকর মাঠের পাথরে পাথরে বাসা বেঁধেছে। এতটা নৈসর্গিক পরিবর্তন এক দুই হাজার বছরের কথা নয়।

এখন একবার জীবন্ত মোহেঞ্জোদাড়োর রূপ কল্পনা করে দেখা যাক। সুন্দর একটি শহর ভরা সুরুচি সম্পন্ন মানুষের দল—স্বচ্ছল সংসার। শহরের চারিদিকে বার্লি ও গমের ক্ষেত। ঘাসভরা সবুজ মাঠে গরু মহিষের পাল। গৃহপালিত ঘোড়া, হাতী, উট, শূকর, কুকুর ও নানারকমের পাখী।

এই ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন শহরের 'চৌরঙ্গী'কে এখনো চিনতে পারা যায়। এই রাস্তাটি প্রায় পৌনে এক মাইল লম্বা আর ৩৩ ফুট চওড়া। এই পাকা রাস্তাটির নির্মাণ কৌশল দেখেই বোঝা যায় এককালে এর ওপর দিয়ে শত শত রথচক্রের অভিযান হয়ে গেছে। যদিও পোড়া মাটির ইঁট দিয়ে এই শহরের ঘরবাড়িগুলি তৈরী, কিন্তু ইঁটের ওপর কোন কারুকার্যের চিহ্ন দেখা যায় না। এর কারণও খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার কারু-শিল্পের বা কাঠের কাজের খুব প্রচলন ছিল। ঘরবাড়ির অলঙ্করণ হতো কাঠের কাজ দিয়ে। দরজা, চৌকাট, জানালা প্রভৃতির ওপর নানারকম বিচিত্র খোদাই-এর কাজ থাকতো। সেই কারণেই ইঁটের ওপর কারুকার্যের তেমন চেষ্টা ছিল না। এই সব কাঠের কাজের

অতএব জাপানের সামনে ভবিষ্যৎ আক্রমণের ক্ষেত্র হিসেবে তিনটে জায়গা রয়েছে ঃ সাইবেরিয়া, ভারতবর্ষ এবং অস্ট্রেলিয়া। এদের কোন্‌টা এবার সে আক্রমণ করবে সেইটাই বিবেচ্য।

ব্রহ্মের যুদ্ধ শেষ করার পর জাপানের তিনটে সামরিক উদ্যম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—(১) প্রবাল সাগর ও মিডওয়ের জলযুদ্ধ; (২) অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম প্রান্তের কিস্‌কা, আকাম ও আত্তু দ্বীপ দখল; (৩) পাপুয়ায় (নিউগিনি) পোর্ট মোর্সবির বিপরীত দিকের উপকূলে বুনায় জাপানী সৈন্যের অবতরণ। এর সবগুলোই নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ অভিযান-পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রবাল সাগর ও মিডওয়ে যুদ্ধে জাপানের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণভাবে মার্কিন নৌশক্তিকে প্রশান্ত মহাসাগরে খর্ব করা এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমেরিকার যোগাযোগ বিঘ্নিত করা। কিন্তু এ যুদ্ধে জাপান পরাজিত হয়েছে। পক্ষান্তরে তার নৌ শক্তির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। বুনায় জাপানীদের অবতরণের স্পষ্ট কারণ হচ্ছে পোর্ট মোর্সবি চড়াও করা এবং অস্ট্রেলিয়ার উপরে অবস্থিত নিউগিনিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা। কিন্তু মিত্রপক্ষ বিশেষভাবে আমেরিকানরা অস্ট্রেলিয়ায় ও নিউগিনির প্রান্তভাগে যেভাবে শক্তিবৃদ্ধি করে যাচ্ছে এবং যেভাবে শত্রুর উপর বিমান আক্রমণ চালাচ্ছে তাতে মনে হয় এখানে জাপানীদের ভাবী আক্রমণ আগেকার মতো সহজ হবে না। অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ঘাঁটি গাড়ার উদ্দেশ্য বেরিং প্রণালীর সন্নিহিত অঞ্চলে সোভিয়েট রুশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে হ্রস্বতম সামুদ্রিক যোগপথ ব্যাহত করা তাতে সন্দেহ নেই। সোভিয়েটের উপর আক্রমণ আরম্ভ করলে অ্যালিউশিয়ানে জাপ নৌঘাঁটি ও নবনির্মিত বিমান ঘাঁটি খুব কাজ দেবে। ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ আরম্ভ করবার জন্যে জাপানের পক্ষে নতুন কোনো ঘাঁটি না হলেও চলে। আসাম ও বাঙলার সীমান্ত বরাবর ব্রহ্মদেশে জাপানীরা এসে রয়েছে, বঙ্গোপসাগরে আন্দামানও তাদের দখলে।

বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করলে মনে হয়, তিন দেশের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার উপর অভিযান আরম্ভ করার অবস্থা জাপানীদের পক্ষে সব চেয়ে কম অনুকূল। অস্ট্রেলিয়া অভিযানে জাপানের নৌশক্তি এবং স্থল ও বিমান শক্তি সমানভাবে নিয়োজিত করতে হবে। কিন্তু তার নৌশক্তি দুই জল যুদ্ধের ফলে রীতিমতো ঘা খেয়েছে। আবার সে মার্কিন নৌবাহিনীর সঙ্গে ব্যাপক শক্তি পরীক্ষার ঝুঁকি নেবে কিনা খুবই সন্দেহের বিষয়। আমেরিকা বিশেষ উদ্যমে অস্ট্রেলিয়া রক্ষার ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করেছে; তার ক্রমবর্ধমান শক্তির যে পরিচয় জাপান পাচ্ছে তাতে তাকে এখন সহজে পরাভূত করবার আশা জাপান করতে পরে না। এদিকে ভারতবর্ষে ও সাইবেরিয়ায় বৃটিশ ও সোভিয়েট শক্তি অক্ষুণ্ণ থেকে যায়, এমন কি বাড়তে থাকে। সুতরাং ঐ দুই দেশকে উপেক্ষা করে প্রথমে অস্ট্রেলিয়া আক্রমণে শক্তিহানি করতে যাওয়া জাপানীদের পক্ষে একটা বিপজ্জনক [illegible]্ম হবে।

সব চেয়ে বড় কথা—জাপানী সমর পরিকল্পনার সঙ্গে [illegible]র্মান সমর-পরিকল্পনার সংযোগ। এই দুই সাম্রাজ্যবাদী [illegible]ক্তর মধ্যে অন্তর্নিহিত যত দ্বন্দ্বই থাকুক না কেন, সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে জয়লাভ তাদের পক্ষে আশু প্রশ্ন এবং প্রধান প্রশ্ন। জাপান জানে যে, পশ্চিমে জার্মানী যদি পরাজিত হয়, তাহলে মিত্রপক্ষের সম্মিলিত কেন্দ্রীভূত শক্তির বিরুদ্ধে তার জয়লাভের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং জাপানের মধ্যে যদিও রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তবু বর্তমান সংগ্রামে তারা দুইজন বিপরীত দিকে। ফ্যাশিস্ট শক্তি সম্বন্ধে সোভিয়েটের মনোভাব এবং কমিউনিস্ট শক্তি সম্বন্ধে জাপানের মনোভাব কারো অজানা নেই। তারা যে এখনও পরস্পরের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়নি তার একমাত্র কারণ শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি করা আপাতত উভয়ের কারো স্বার্থানুকূল নয়। কার্যত যুদ্ধ না বাধলেও এদের দুজনকে মূলত শত্রু বলে ধরে নেওয়া যায়। আঘাত করবার যখন দরকার হবে তখন কেউই কাউকে ছাড়বে না।

সুতরাং বর্তমান মহাযুদ্ধে জার্মান সামরিক গতির সঙ্গে জাপানী অভিযান সামঞ্জস্য রেখেই চলবে, যাতে উভয়েরই সাধারণ শত্রু নিপাতে সুবিধা হয়। পশ্চিম থেকে জার্মানীর গতি পূব দিকে—সোভিয়েট মর্মস্থল অভিমুখে, তারপর ভারতবর্ষ অভিমুখে। জার্মান গতির সঙ্গে জাপানী অভিযানকে এখন সংযুক্তভাবে চলতে হলে জাপানী আক্রমণের পরবর্তী ক্ষেত্র হবে—হয় ভারতবর্ষ, নয় পূর্ব সাইবেরিয়া।

এখানে প্রশ্ন ওঠে—তাহলে নিউগিনির পাপুয়াতে জাপ সৈন্যের অবতরণ, পোর্ট মোর্সবি আয়ত্তে আনবার চেষ্টা, অস্ট্রেলিয়ার উপর বিমান আক্রমণ, এ সবের অর্থ কি? অর্থ আছে। অস্ট্রেলিয়া ক্রমশই মিত্রপক্ষের একটা শক্তিশলী প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হচ্ছে এবং এখান থেকে জাপানের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করবার অভিপ্রায় মিত্রপক্ষের আছে। এদিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার গুরুত্ব এক বিষয়ে চীনের চেয়েও বেশী। চীন এক বিমান পথ ছাড়া আর সমস্ত দিক দিয়ে একরকম অবরুদ্ধ হয়েছে; কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাইরের, বিশেষ করে আমেরিকার সমুদ্রপথে সংযোগ রয়েছে। জাপান যখন অন্যদিকে আক্রমণ করবে তখন অস্ট্রেলিয়া যাতে তাকে বেশী বিব্রত না করতে পারে সে জন্যে এই পাশটা সুরক্ষিত করা দরকার। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তবু একটা জলের ব্যবধান রয়েছে; কিন্তু নিউগিনির দক্ষিণ-পূব প্রান্তভাগে মিত্রপক্ষের অবস্থান জাপানী রাজ্যের পাশে ছুরির মতো বিঁধে আছে। এটাকে জাপান বের করে ফেলতে চায়। নিউগিনি সমস্তটা দখল করে অস্ট্রেলিয়ার উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে পারলে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তভাবে অন্যত্র মনোনিবেশ করা যায়।

এই বিচারেও শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন থেকে যায়—ভারতবর্ষ, না, সোভিয়েট, কোথায় জাপান জার্মান অভিযানের সঙ্গে সহযোগিতা করবে? এ প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দেওয়া যায়, এমন স্পষ্ট কোনো লক্ষণ আমরা বর্তমানে দেখছি না। জার্মানী যে রকম দ্রুতগতিতে দক্ষিণ রুশিয়ায় অগ্রসর হয়ে আসছে তাতে জাপানই অনতিবিলম্বে এ প্রশ্নের উত্তর দেবে। শীগ্গিরই তার একটা জায়গায় আঘাত করা আত্মরক্ষার কারণেও দরকার হবে। এ

(শেষাংশ ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কীট পতঙ্গের আত্মগোপন

যুদ্ধের খবরের মধ্যে 'কমোফ্লেজ' কথাটি সকলেই বোধ করি লক্ষ্য করেছেন। এই কথাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে একবার আলোচনা করেছি। শত্রুর শ্যেন দৃষ্টি থেকে আত্মগোপনের কৌশলের নামই 'কমোফ্লেজ'। সামরিক বস্তুগুলিকে গাছপালার মধ্যে আবৃত রেখে অথবা কৃত্রিম প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে গোপন রেখে শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়ার যে কৌশল দিন দিন আবিষ্কার করা হচ্ছে তা আধুনিক যুদ্ধে বিশেষ স্থান পেয়েছে। পরিষ্কার আবহাওয়ার মধ্যে ধূম্রজালের সৃষ্টি করে তার আড়ালে থেকে একপক্ষ বিপক্ষ দলের উপর বেশ আক্রমণ চালিয়া যায়। আমরা এতদিন ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়ালে থেকে যুদ্ধের কথা শুনে এসেছিলাম এবার আমাদের মধ্যে অনেকেই আকাশ যুদ্ধের চাক্ষুষ পরিচয় পেয়েছেন।

শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে আত্মগোপন কৌশল তা আমরা নিম্নশ্রেণীর কীট পতঙ্গের কাছ থেকে পেয়েছি। প্রকৃতির রাজ্যে কত সহস্র সহস্র যে কীট পতঙ্গ রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই অসহায় কীটপতঙ্গগুলি অপেক্ষা সবল জীব প্রকৃতির রাজ্যে বিচরণ করছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার খাদ্য হিসাবে কীটপতঙ্গগুলিকে শিকার করে। কীটপতঙ্গের শত্রু অনেক, দৈহিক শক্তিতে তারা শত্রুর কাছে দুর্বল হ'লেও তারা কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করে শত্রুর দৃষ্টি থেকে নিজেদের আত্মগোপন করে রাখে। সে সম্বন্ধে কিছু বলছি। কতগুলি কীট শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলেই শত্রুকে আক্রমণ করে দেহ মধ্যস্থ হুল ফুটিয়ে দেয়। আবার অনেকে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে আত্মরক্ষা করে। এই বিষাক্ত গ্যাস আক্রমণকারীর চোখের পক্ষে অনিষ্টকর। পল্লী গ্রামে অনেকেই কোলা ব্যাঙ দেখেছেন। ছোট ছেলেরা এদের পিছনে প্রায় লাগে। ইট পাটকেল দিয়ে আক্রমণ করলেই এরা উত্তেজিত হয়ে গা থেকে এক রকম সাদা রস বের করে। এই রস অনেক দূর পর্যন্ত ছিটকে যায়। এই বিষাক্ত রস শরীরের পক্ষে বিশেষ চোখের পক্ষে খুবই অনিষ্টকর। কতকগুলি কীট আবার দেহের উপরে একটি মজবুত আবরণ ঢেকে শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করে চলে। বইয়ের পাতায় এক শ্রেণীর পোকার আবির্ভাব দেখা যায়। তাদের শরীরের উপরে আত্মরক্ষার বর্ম চোখে পড়ে।

কয়েক শ্রেণীর প্রজাপতি যেমন ময়ূর পংখী (Peacock) এবং 'টরটোইস সেল' প্রজাপতির উজ্জ্বল পক্ষদ্বয় কি মনোহর। কিন্তু কয়েক জাতীয় গাছের গায়ে এরা বসলেই তাদের সেই উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাবে। গাছের রংয়ের মধ্যে এদের উজ্জ্বল বর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে যায় আর শত্রুর চোখ শত চেষ্টা করেও শিকারের সন্ধান পায় না। কেবল গাছ নয়, পাথরের উপর বসেও প্রজাপতিরা 'কমোফ্লেজ' করে। এইভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবার কারণ প্রজাপতির পাখার নীচের ভাগের রং খুব উজ্জ্বল নয়, পাঁশুটে রংয়ের। বিশ্রাম সময়ে এরা ডানা দুটি উল্টে দিয়ে গাছের ছালের উপর চুপ করে বসে পড়ে। ফলে গাছের রং এবং ডানার রং এক হয়ে চোখে ধাঁধাঁ লাগায়। এইভাবে পাথরের উপরে বসেও প্রজাপতি আত্মগোপন করে। কয়েক জাতীয় প্রজাপতি আবার ডানা দুটি এমনভাবে জোড়া লাগিয়ে বিশ্রাম করে যে তাদের গাছের পাতা বলে মানুষের চোখও ভুল করে। এই জাতীয় প্রজাপতির ডানার নিম্নভাগের রং কিন্তু উপরের মত নানা বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল নয়। ডানার নীচের দিকটা ফিকে রং হওয়ায় গাছের পাতার সঙ্গে একেবারে মিলে যায়। রং ছাড়াও গাছের পাতার গায়ের মত ডানায় লম্বা লম্বা শিরা উপশিরা থাকে। আমাদের ভারতীয় 'পাতার প্রজাপতি' গাছের মধ্যে যেভাবে আত্মগোপন করে সে রকম অন্য দেশের খুব কম শ্রেণীর প্রজাতিকেই আত্মগোপন করতে দেখা গেছে। সিংহলে 'সবুজ পাতার পতঙ্গ' নামে এক জাতীয় পতঙ্গ পাওয়া যায়। এরা ঠিক প্রজাপতি নয় তবে 'ক্রিকেটস্' এবং গঙ্গা ফড়িংয়ের সগোত্র। এই সবুজ পাতার পতঙ্গ দেখতে পত্রগুচ্ছের মত। গাছের ডালে যখন বসে তখন তাদের পাতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া খুবই মুস্কিল হয়ে পড়ে।

কয়েক জাতীয় কীট পতঙ্গ শত্রুর আক্রমণের ভয়ে দিনের বেলায় একেবারে নিজেদের আত্মপ্রকাশ করে না। জীববিশারদগণ এই জাতীয় কীটপতঙ্গের আত্মগোপনের পদ্ধতি দেখে তাদের 'stick insects' নাম দিয়েছেন। এরা পত্রশূন্য গাছের ডাল অবলম্বন ক'রে আত্মগোপন করে। এই জাতীয় কীটপতঙ্গের ডানা, পা এবং শরীর লম্বাটে শুকনো কাঠির মত দেখতে। ডানা দুটি জোড়া লাগিয়ে যখন এরা পত্রবিহীন গাছে বসে থাকে তখন এদের গাছের শুকনো ডাল বলেই মনে হয়। সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার এরা একটুও নড়াচড়া করে না। লম্বা লম্বা কাঠির মত পা ছড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ চাপ নিশ্চল হয়ে বিশ্রাম করে।

আত্মরক্ষার জন্য প্রকৃতি কীটপতঙ্গদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাদের ডানা, গায়ের রং প্রভৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে পৃথিবীতে এমন বহু জিনিস প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে যাদের মধ্যে অতি সহজেই আমরা কীট পতঙ্গদের অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখি। জীব জগতের কেবল কীটপতঙ্গই নয় আরও অপরাপর বৃহৎ জীবজন্তু প্রকৃতির রাজ্যে আত্মগোপন করে। কিন্তু জীববিশারদগণের চোখে ধুলো দিতে পারেনি। তাদের আত্মগোপন কৌশল একে একে ধরা পড়েছে। জীবজগতের অন্যান্য জীবজন্তুর আত্মগোপন কৌশল পরে আলোচনা করব।

জাপান কি করবে?

(২৭ পৃষ্ঠার পর)

কথা ভুললে চলবে না যে, মিত্রপক্ষ এই অবসরে চুপ করে 'বসে' নেই। ভারতবর্ষে বৃটিশ সামরিক শক্তি বাড়ছে; চীনে মার্কিন বিমানবহর জাপানীদের বিব্রত করতে সুরু করেছে। বেশী দিন চুপ করে' তারা থাকতে পারে না।

জাপানের বর্তমান অভিযান-বিরতিকে তার একটা সংক্ষিপ্ত প্রতীক্ষাকাল বলা যায়। কোন্ মুহূর্তটা যে আঘাত করবার পক্ষে প্রকৃষ্ট হবে তাই সে দেখছে। লালফৌজ কতখানি ঘায়েল হয় এবং মিত্রপক্ষ ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলবার আয়োজন বাস্তবিক করছে কিনা, এ-ও যেমন সে লক্ষ্য করছে, তেমনি লক্ষ্য করছে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক পরিস্থিতি, বৃটিশ শক্তির সঙ্গে গান্ধীজী পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসের সংঘর্ষের আসন্ন সম্ভাবনা।

বৈষ্ণব সাহিত্য *

ভদ্রমহোদয়গণ, সত্য, শিব এবং সুন্দরের আদর্শ সাহিত্য সাধনার আদর্শ, এ কথা আপনারা সকলেই জানেন; বৈষ্ণবের আদর্শও তাহাই, তবে বৈষ্ণব ঐ ত্রিতত্ত্বকে একের মধ্যে উপলব্ধি করতে চায়। বৈষ্ণব বলেন, যাহা সুন্দর, তাহাই সত্য এবং তাহাই শিব; বৈষ্ণব সাহিত্যিকের আরাধ্য দেবতাই তাই "সকল সুন্দর সন্নিবেশ।" এই সুন্দরের প্রত্যক্ষতাতেই বৈষ্ণব সাহিত্য সাধনার মূল উৎস নিহিত রয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্যিক বলেন, আমি সেই সুন্দরকে দেখছি এবং সেই প্রত্যক্ষতাজনিত আমার যে রসোপলব্ধি, আমার লেখার ভিতর দিয়ে তাই ফুটে বেরুচ্ছে, বাস্তবিকপক্ষে এতে আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নেই। আমার কথাকে, আমার লেখা মিষ্টি কচ্ছে সেই মধুর মুখের মধুমাখা হাসি। আচার্য্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী মহারাজ একটি উক্তির ভিতর দিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর সেই কথাটি ভাল করে বুঝলেই বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্বন্ধে আমাদের সব কথাই বুঝা হবে। তিনি বলেন, "পুস্তকশতশতসুস্তবদুগজয়ঃ" সুন্দরের নয়ন ভুলান রূপের বর্ণনাতেই শত শত পুস্তকের সৃষ্টি হয়েছে, বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে উঠেছে।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, এমন সুন্দরকে কোথায় দেখা যায়, যাকে দেখলে সাহিত্যের এই রসধারা অন্তরে উজ্জীবিত হয়; সে সুন্দরের স্বরূপ কি? এর উত্তরে মনীষী এমার্সন সুন্দরের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, তা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, সামঞ্জস্যই সৌন্দর্য। আমরা যা দেখি, যদি অন্তরের সুরের সঙ্গে তা মিলে যায়, তবে সে বস্তু সুন্দর হয়ে উঠে। বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে তাঁদের যিনি দেবতা তিনি হচ্ছেন সমঞ্জস। এখন প্রশ্ন উঠবে এই যে, আমরা কোথাও তো সামঞ্জস্য দেখতে পাচ্ছি না; বাইরে যা দেখি, অন্তরের সুরের সঙ্গে স্থায়ীভাবে তা মিলে কোথায়? ক্ষণিক যদি বা মেলে—ভগ্ন যাঞ্চনা পুনঃ প্রতপাতে, যা চাই তা পুরোপুরি না পাওয়ার দরুণ পুনরায় তাপই বাড়ে। নিজের অন্তরই থাকে ফাঁকা, রস জমতে না জমতে চোখ পাল্টাতে না পাল্টাতেই উবে যায়। অপরকে সে রস দেবে কোত্থেকে? তার কথা, তার লেখা মিষ্টি হবে কেমন করে? সামঞ্জস্যের সুর অন্তরে তো বাজে না। বৈষ্ণব সাহিত্যিকগণ এক্ষেত্রে ভরসা দেন, তাঁরা বলেন, সামঞ্জস্যের সুর অন্তরে তোমার বাজবে। প্রকৃতপক্ষে সামঞ্জস্যই তোমার কাম্য। জীবনের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব সংঘাতে তুমি পড়েছ বটে, কিন্তু এই দ্বন্দ্বসংঘাতের ভিতর দিয়ে সামঞ্জস্যের অভিমুখে অভিসারই তোমার জীবন। কামের জন্য তোমার অন্তরে অসামঞ্জস্য ঘটছে, কামাদেব 'কলিনর্নাং।' সামঞ্জস্যের মুখে তোমার অভিসার আজ কামের আকারে রয়েছে, একে প্রেমে পরিণত কর—"তাহে বিধি মিলাওব কাজ।" কামকে প্রেমে পরিণত করা যায়, যে সত্যকে আশ্রয় করে, বৈষ্ণবের সাধনা তাই হ'ল শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। তাই জীব গোস্বামীপাদ বললেন, কৃষ্ণ সুভগ-জগদুস্পত-ধামক কৃষ্ণ পরমতম স্বস্তদ নর্ম্মকঃ।

শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যান হলে জগতে তাঁর ধাম জেগে উঠে। এই অনুধ্যান কথাটি বুঝা একটু কঠিন। অনুধ্যান বলতে বৈষ্ণব সাহিত্যিক বুঝেন, অনুমান প্রমাণের স্তর থেকে মনের একেবারে প্রত্যক্ষতার মধ্যে চলে যাওয়া; ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে মনের অব্যবধান এবং এক হয়ে যাওয়া। আত্মীয়তার ভাব যেখানে অবিমিশ্র নয়, সেখানে উপাধি, ঐশ্চর্য এবং বিভূতির ব্যবধান রয়েছে, মন সেখানে এমন অব্যবহিতভাবে অবিতর্কিত এবং অসংশয়িতরূপে ভয়ের সকল অন্তরায়কে নিঃশেষে অতিক্রম করে আনন্দসত্তার মধ্যে আপনাকে পেতে পারে না। 'অবিতর্ক লিঙ্গৈর্ভগবান্ প্রসীদতাম'-এ প্রসাদকে আস্বাদন করে পুষ্ট হতে সমর্থ হয় না। বৈষ্ণব সাহিত্যিকের শ্রীকৃষ্ণ এজন্য বৃন্দাবনেরই শ্রীকৃষ্ণ, তার 'ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোপাচার'। শ্রীকৃষ্ণের অন্য সব লীলার মধ্যে বিভূতি আছে, ঐশ্চর্য আছে। বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিই শিরোধার্য করে এই কথা বলে আসছেন,—'ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত'।

বৈষ্ণব সাহিত্যিক বলেন, মন অব্যবহিত হয়ে কোন জিনিস দেখতে পাচ্ছে না, এজন্যই বহু বস্তুকে দেখছে, উপাধিকে দেখছে। অব্যবহিত হয়ে দেখবার মত ভাব বা ভরসা যদি কোথাও সে পায় তবে একের মধ্যেই ডুবে যাবে, এককেই দেখবে। শ্রীকৃষ্ণ লীলার মধ্যে এই রস আছে, যা মনকে প্রগাঢ় প্রীতির আকর্ষণে ভাবের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়, প্রত্যক্ষতার আশ্বস্তিতে মন পূর্ণতাকে লাভ করে। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যিক বলেছেন,—"ও চাঁদ বয়ানে নয়ন ভুলল, আন মনে নাহি লয়।" মাধুর্যের মধ্যে মনের এই অবস্থানই বৈষ্ণব সাহিত্যিকের সাধনা। মন যখন মাধুর্যের ছন্দ লাভ করে, তখনই সে সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করে; বাস্তবিকপক্ষে সুন্দরকে ভিতরে দেখাই পাকা দেখার উপায়। ভিতরে এই দেখার-মাধুর্যরসে মন ডুবে গেলে ভিতর বার এক হয়ে যায়। ভিতর আর বার—এই যে দুটো বস্তু, এ রয়েছে কেবল, মন, ষোল আনা ডুববার মত কিছু পায়নি বলে। মন ভিতরে ডুববার মত রসের সঙ্গে লগ্ন হলেই বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টির দরজা খুলে যায়। মনকে এমনভাবে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বিশ্বের সর্বত্র অনুস্যূত আনন্দ-ধারার উৎসের সঙ্গে যুক্ত করে এই কৃষ্ণলীলা। এজন্যই শ্রীল মধুসূদন সরস্বতী মহারাজ বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অখিল-কলাকলাপ-নিলয়, তিনি হচ্ছেন পরমানন্দ ঘনময় মূর্তি এবং সে মূর্তি হচ্ছে "অতি বৈরিঞ্চ প্রপঞ্চং"। সে মূর্তির মধু রসের স্পর্শ মন যদি পায়, তবে তাঁর প্রেমমহাসমুদ্রের মগ্নতায় সে সর্বত্র মধুরকেই দেখতে পায়। বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টির উৎস হচ্ছে এই মধু এবং সে মধু দাতা এবং পাতা হচ্ছেন সরস্বতী মহারাজের ভাষায় "অনবরত বেণুবাদন-নিরত বৃন্দাবন-ক্রীড়াসক্ত মানসহেলোদ্ধৃত গোবর্ধনাখ্য ভূধর গোবিন্দ এবং শ্রীগোবিন্দের এ লীলামৃত রসের অনুধ্যান লাভ করবার আশ্রয় হলেন শ্রীভাগবত। এ সত্যকে অনুভব করেই ভক্ত কবি বললেন, "প্রেমময় ভাগবত কৃষ্ণ তনুসম।" ভাগবত কৃষ্ণ-প্রত্যক্ষতার রস আছে এবং প্রত্যক্ষতার রসই সাহিত্য সৃষ্টির উৎস। বাঙলার রস সাহিত্যে রথী বীরবলের ভাষায় "বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার, তাহার কবিতা শুধু মনের বিকার।" বৈষ্ণব সাহিত্য লীলাকে স্বীকার করে, বৈষ্ণব সাহিত্যিকের ভগবান্ চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ বিগ্রহ। সর্বাঙ্গের সূক্ষ্ম রসানুভূতিকে যাঁর সেবায় সর্বভাবে সার্থক করা যায় তিনি তেমন জিনিস। উড়ো জিনিসের উপর বৈষ্ণব সাহিত্যের আশ্রয় নয়। ধরা ছোঁয়া এবং পাওয়ার মধ্যে এর পরম প্রতিষ্ঠা। বৈষ্ণব সাহিত্য বলে, জীবের নিত্যদেহ আছে। এখন তার যে দেহ, সে দেহ তার নিজের নয়, পরের। সে নিজের দেহ পাবে কাম রাজ্যের পরে উঠে প্রেমের রাজ্যে এবং সে দেহ হবে কৃষ্ণ সেবার দেহ। সিদ্ধ দেহে কৃষ্ণ সেবার আনন্দ রসের উচ্ছ্বাসই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের স্মরণে এবং মননে অনুধ্যান সত্য ও নিত্য হলে মন অবীর্য থেকে উপরে উঠে, আর কৃষ্ণ সেবার মাধুর্য আস্বাদন করে।

যে সব পুরোনো ছবি একদিন দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন এনেছিল, সে সব ছবির প্রতি তাদের আকর্ষণ সহজে কমে না। পুরোনো ছবির চাহিদা যে এখনও রয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় "দেবদাস", "চণ্ডীদাস", "সোনার সংসার", "ভাগ্যচক্রে"র মতো ছবি আজও প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের ভিড় জমিয়ে তোলে। হলিউডের বিশিষ্ট চিত্র-প্রযোজক ও পরিচালক হারবার্ট উইলকক্স দর্শকদের এই পুরোনো ছবির প্রতি প্রীতির পরিচয় পেয়ে একটি নূতন পন্থা অবলম্বন করেছেন। দুইটি জনপ্রিয় পুরোনো ছবিকে জোড়াতাড়া দিয়ে একটি নূতন ছবি খাড়া ক'রে দর্শকদের এই চাহিদাকে মিটিয়ে চলেছেন।

রঞ্জিত মুভিটোনের 'সাদি' চিত্রে খুরসীদ

এমন দুটি পুরোনো ছবি তিনি বেছে নেন যার কাহিনীর মধ্যে খানিকটা সামঞ্জস্য রয়েছে। তারপর কাঁচি চালিয়ে তাকে জোড়া দিয়ে একটি ছবিতে পরিণত করেন। পাঠকদের হয়তো মনে আছে, কয়েক বছর আগে হারবার্ট উইলকক্স কুইন ভিক্টোরিয়ার জীবন নিয়ে দুটি ছবি তোলেন। একটি হচ্ছে "Victoria the Great" অপরটি হচ্ছে "Sixty Glorinos years." হারবার্ট উইলকক্স এই দুইটি ছবির শ্রেষ্ঠ অংশগুলিকে সংগ্রহ ক'রে ও জোড়া দিয়ে আরেকটি ছবি তৈরী করলেন, তার নাম "Queen Victoria"। সম্পাদনার গুণে ও কাঁচি চালানোর দক্ষতায় রাণী ভিক্টোরিয়ার জীবন ও রাজত্বের একটি জীবন্ত ছবি দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছিল। সমস্যা দাঁড়িয়েছিল মূল ছবির ২১,০০০ ফিটকে ছেঁটে ৭,৮০০ ফিটে পরিণত করা সম্বন্ধে। ছবির গতি ও টেম্পো বাড়িয়ে এবং প্রাচীন ঘটনাগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে দৈর্ঘ-সমস্যাও দূর করা হোলো।

আরেকটি সমস্যা দেখা দিল ছবির রং নিয়ে। "Victoria the Great" ছবিটি সাদা কালোয় তোলা এবং "Sixty Glorious years" তোলা টেকনিকালারে। এ সমস্যারও সমাধান হোলো ছবির শতকরা ৬০ ভাগ সাদা-কালোয় রেখে এবং বাকিটা রঙীন্ রাখা হোলো। অর্থাৎ রাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনে যখন খ্যাতি সম্মান প্রতিপত্তি ও শৌর্য দেখা দিল সে অংশটা রঙীন রাখা হোলো। আনা নীগেল্ রাণীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এবং সঙ্গে ছিলেন আন্টন ওয়ালব্রুক, সি অব্রে স্মিথ এবং এইচ বি ওয়ার্নার প্রভৃতি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ধরণের পরীক্ষা আমাদের স্টুডিওগুলিতে চলতে পারে কিনা। আমাদের দেশে অনেক ছবিই আছে একই বিষয়বস্তু [illegible]লা। এই সব ছবির মালিক ও পরিচালকরা যদি [illegible] হন তাহলে আমাদের মনে হয় হারবার্ট উইলকক্সের মতো তাঁরাও পুরোনো ছবিকে নূতন করে বাজারে চালাতে পারবেন। এ বিষয়ে আমরা বম্বে টকীজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একই ধরণের কাহিনী নিয়ে ফরমুলা ছবি বম্বে টকীজ তুলেছে অনেক এবং তার অভিনেতৃবর্গও একই। সুতরাং পুরোনো কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে নূতন নূতন ছবি না তুলে পুরোনো ছবিগুলি জোড়াতালি দিয়ে নতুন করে তুললে খরচও বেঁচে যাবে, দর্শকদের কাছ থেকে পয়সাও মন্দ পাবেন না।

বাঙলা দেশের স্টুডিও মালিকরা এই ধরণের পরীক্ষা করতে পারতেন এন, টির আলো-ছায়া ও এম, পি-র শেষ উত্তর নিয়ে দুটি ছবিই Brain Stock-এর ব্যাপার নিয়ে। তবে সমস্যা হচ্ছে এই যে, আলোছায়া আর শেষ-উত্তর মিশ খেলেও এন, টি আর এম, পিতে মিশ খাবে না; তাছাড়া কী অভিনয়ে কী চেহারায় পঙ্কজ—বড়ুয়া ও মলিনা-কাননে কখনও মিশ খাওয়ানো যাবে না।

স্টুডিও সংবাদ

সাইগল ও শান্তা আপ্তেকে নায়ক ও নায়িকা করে একটি ছবি তোলার কথা নিউ থিয়েটার্স সম্প্রতি চিন্তা করছেন বলে জানা গেল। ছবি পরিচালনা করবেন হেমচন্দ্র। সাইগল এখন বম্বেতে আছেন, খুব সম্ভবত আগামী ১৫ই আগস্ট তিনি কলকাতায় ফিরে আসবেন।

* * * * *

সুবোধ মিত্র এতকাল নিউ থিয়েটার্স-এর ছবির সম্পাদনার কাজ করে এসেছেন, এবারে তাঁকে ছবি পরিচালনার ভার দেওয়া হবে বলে শোনা গেল। সম্প্রতি 'ডাক্তার' ছবির হিন্দি সংস্করণের পরিচালনা করে ইনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সুবোধ মিত্র যে ছবি পরিচালনা করবেন তার প্রধান ভূমিকায় নামবেন শ্রীমতী ভারতী ও অসিতবরণ অথবা সাইগল।

* * * *

নিউ থিয়েটার্স রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা' নাটিকাটি ছায়াচিত্রে রূপায়িত করার সংকল্প করেছেন। 'শোধ বোধ'এর পরিচালক সৌমেন মুখার্জি ছবির পরিচালনা করবেন। 'শোধ বোধের' তিক্ত অভিজ্ঞতার পরও মনে হচ্ছে নিউ থিয়েটার্সের শিক্ষার এখনও কিছু বাকি আছে।

* * * * *

পরিচালক মধু বোসের সহকারী শ্রীযুক্ত হেমন্ত গুপ্ত কালী ফিল্ম স্টুডিওতে নিউ টকীজের পক্ষ থেকে একটি ছবি পরিচালনা করবেন বলে খবর পাওয়া গেল। ছবির নাম 'বিয়ের পরে'।

* * * * *

শ্রী, পূরবী ও পূর্ণতে 'শেষ উত্তর'

এম পি প্রডাকসন্সের নূতন ছবি "শেষ উত্তর" বিপুল জনসমাগমের সঙ্গে তিনটি চিত্রগৃহে একযোগে প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবি পরিচালনা করেছেন প্রমথেশ বড়ুয়া। প্রধান ভূমিকায় আছেন—কানন, বড়ুয়া, যমুনা, অহীন্দ্র, রথীন প্রভৃতি। আগামী বারে আমরা ছবির বিস্তারিত আলোচনা করব।

২২শে জুলাই

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, ডনের উজানে ভরোনেজ এলাকায় সমস্ত প্রধান সেতুই সোভিয়েট বাহিনীর হস্তগত হইয়াছে। জার্মানরা ডন নদীর পশ্চিম তীরে পশ্চাদপসরণ করিতেছে। জেনারেল ফন বক ককেশাসের প্রবেশ পথ এবং ভলগা তীরবর্তী ট্যাঙ্ক উৎপাদন কেন্দ্র ষ্ট্যালিনগ্রাদ অভিমুখে অভিযানে পশ্চাদ্ভাগ হইতে দলে দলে নূতন সৈন্য আমদানী করিতেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ভোরোশিলভগ্রাদের দক্ষিণ-পূর্বে রণক্ষেত্র ব্যাপকতর হইয়াছে।

বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ইডেন কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, সুদূর প্রাচ্যের ১৮ শত ইংরেজ ও মিত্র রাষ্ট্রের অধিবাসীর সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের ১৮ শত জাপানী ও শ্যাম দেশবাসীর বিনিময়ের জন্য জাপান গভর্নমেণ্টের সহিত এক চুক্তি করা হইয়াছে।

চীন রণাঙ্গন—গত ১৭ই জুলাই চীনারা ওয়েনচাউ দখল করিয়াছিল। কিন্তু জাপানীরা নূতন সৈন্য আমদানী করিয়া উহা আবার দখল করিয়া লইয়াছে।

২৩শে জুলাই

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, অগ্রসর জার্মান বাহিনী সিমলিয়ানস্কায়ায় পৌঁছিয়াছে। উহা রোস্টভের ১২৫ মাইল পূর্বে এবং মিলোরোভের দক্ষিণ-পূর্বে অনুরূপ দূরে অবস্থিত। রোস্টভের ত্রিশ মাইলের মত উত্তরে ডন কসাক অঞ্চলের রাজধানী নোভোচেরকাস্কে যুদ্ধ চলিতেছে। সিমলিয়ানস্কায়া অঞ্চলে যুদ্ধ চলার অর্থ জার্মান বাহিনী ষ্ট্যালিনগ্রাদের ১১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে আসিয়া পড়িয়াছে। ককেশাস তৈলখনির যুদ্ধ রীতিমত আরম্ভ হইয়া গেল।

নিউগিনি—দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের হেডকোয়ার্টার্স হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জাপানীরা পাপুয়ার উত্তর উপকূলে অবতরণ করিয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "বুনাতে একটি বৃহৎ সৈন্যবাহী জাহাজ ও একটি বজরা ডুবাইয়া দেওয়া হয়। অবতরণকারী বহু সৈন্য হতাহত হয়।" জানা গেল যে, বুনাতে দেড় হাজার হইতে আড়াই হাজার জাপানী সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। ইহাতে মোর্সবির এক নূতন বিপদ দেখা দিল।

২৪শে জুলাই

রুশ রণাঙ্গন—জার্মানরা সরকারীভাবে রোস্টভ প্রবেশের দাবী করিয়াছে। 'রেডস্টার' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, জার্মানরা ডনের ভাঁটি এলাকা অতিক্রম করার জন্য মরিয়া হইয়া সংগ্রাম চালাইতেছে। সোভিয়েট বাহিনী দৃঢ়তার সহিত তাহাদের ব্যূহরক্ষা করিতেছে। গত ২৪ ঘণ্টাকালের মধ্যে রোস্টভের বিপদাশঙ্কা গুরুতর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মিশর রণক্ষেত্রে সকল অঞ্চলেই ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল।

মিশর রণাঙ্গন—জেনারেল অকিনলেক এল আলামেন রণাঙ্গনে অগ্রসর হইয়াছেন। রুওয়েসাত পাহাড়ের প্রস্তরময় ঢালু জমি হইতে জেনারেল রোমেল বিতাড়িত হইয়াছেন।

২৫শে জুলাই

রুশ রণাঙ্গন—'রয়টারের' বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, বিপুল জার্মান সৈন্য অন্ততপক্ষে ৬ লক্ষ সৈন্য, দুই হাজার ট্যাঙ্ক, একটি শক্তিশালী ঝটিকা বিমানবহর এবং হাল্কা ও ভারী কামান লইয়া ডন নদীর দক্ষিণ দিক দিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। দুই দল জার্মান সৈন্য রোস্টভের উত্তরে অবস্থিত সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং তৃতীয় একটি জার্মান বাহিনী টাগানরগের পূর্বে আজও সমুদ্রের তীরে ঘাঁটি লইয়াছে।

মিশর রণাঙ্গনে আবার নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে।

২৬শে জুলাই

রুশ রণাঙ্গন—রোস্টভ এলাকায় সোভিয়েট সৈন্যেরা ভীষণ সংগ্রাম চালাইতেছে। জার্মানরা এই অংশে বিপুল সৈন্যবাহিনী সংহত করিয়াছে এবং সোভিয়েট বাহিনীর উপর অনবরত আক্রমণ চালাইতেছে। কোথাও কোথাও জার্মান বাহিনী সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ এবং রোস্টভ শহরের প্রান্তভাগে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

চীন রণাঙ্গন—পূর্ব চেকিয়াংয়ে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া চীনারা জুইলিং ও লাংচি নামক দুইটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে।

২৭শে জুলাই

রুশ রণাঙ্গন—লিয় রেডিওতে প্রকাশ, এক্সিস বাহিনী চল্লিশ মাইল বিস্তৃত ডন বদ্বীপ অতিক্রম করিয়াছে এবং দক্ষিণ তীরে সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সরকারী জার্মান নিউজ এজেন্সীর সংবাদে দাবী করা হইয়াছে যে, রোস্টভের দক্ষিণে বাটায়স্ক নামক একটি সুরক্ষিত শহর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া দখল করা হইয়াছে। লণ্ডনে বলা হইয়াছে যে, বাটায়স্ক রোস্টভের দশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং এই দাবী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জার্মানরা রোস্টভের দক্ষিণে নিশ্চিতরূপে ডন অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। রোস্টভ রক্ষীরা দৃঢ়তার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতেছে। নগরের রক্ষাব্যূহের উপর সরাসরি আক্রমণে জার্মানরা সহস্রাধিক ট্যাঙ্ক নিয়োজিত করিয়াছে। কয়েকস্থলে প্রচণ্ড যুদ্ধ করার পর রুশরা স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব দিকে নগরের উপকণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছে। ভরোনেজ অঞ্চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। ডনের পশ্চিম তীর হইতে সোভিয়েট সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য জার্মান সৈন্যদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

গত রাত্রে বৃটিশ বোমারু বিমানসমূহ জার্মানীতে হ্যামবুর্গের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। গত ২৫শে জুলাই রাত্রে এক ঝাঁক সোভিয়েট বিমান জার্মানীতে কোনিসবার্গের সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর পুনরায় বোমাবর্ষণ করে।

২৮শে জুলাই

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রুশ সৈন্যদল নভোচেরকাস্ক ও রোস্টভ পরিত্যাগ করিয়াছে। জার্মান উর্ধতন কর্তৃপক্ষ দাবী করিয়াছেন যে, এক্সিস বাহিনী রোস্টভের পূর্বদিকে ডন নদীর তীরে একটি সেতুমুখ সম্প্রসারিত করিয়াছে। প্রকাশ যে, ডন নদীর বাঁকের যুদ্ধ গত সপ্তাহে ভলগা ও ষ্ট্যালিনগ্রাদ অভিমুখে জার্মান অভিযানে পরিণত হইয়াছে। ভরোনেজ অঞ্চলে সোভিয়েট সৈন্যগণ ডন নদীর পশ্চিম তীরে আরও দুইটি সেতুমুখ স্থাপন করিয়াছে।

মিশর রণাঙ্গন—তিন দিনব্যাপী নিস্তব্ধতার পর অষ্টম বাহিনী নূতন আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে এবং কিছু স্থান অধিকার করিয়াছে। কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, একদল ইতালীয় সৈন্য "সিওয়া" এবং "জিয়ারকব"—এই দুইটি মরূদ্যান দখল করিয়া লইয়াছে। উত্তরাঞ্চলে বৃটিশ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিয়া তাহারা গত বুধবার (২২শে জুলাই) যেখানে ছিল, সেখানে ফিরিয়া আসিয়াছে।

চীন রণাঙ্গন—চীনারা আবার চেকিয়াং প্রদেশে নিংপোর দক্ষিণ-পশ্চিমে চেংসিয়েন ছাড়িয়া আসিয়াছে। চেকিয়াং-কিয়াংসি রেলপথের উপর যুদ্ধ চলিতেছে।

২২শে জুলাই

ভারত সরকার ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি ও উহার মুখপত্র "ন্যাশনাল ফ্রন্ট" ও "নিউ এজের" উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি ১৯৩৪ সালে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কিছুকাল যাবৎ ফেণীতে জনসেবা কার্য করিতেছিলেন। গত ১৯শে জুলাই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নোয়াখালি ত্যাগ করিয়া যাওয়ার জন্য তাঁহার উপর এক নোটিশ জারী করা হয়। সতীশবাবু ঐ নির্দেশ পালন না করায় ২০শে জুলাই ফেণীতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গতকল্য ফেণীর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ভারতরক্ষা বিধানের ২৬(৬) ধারা অনুসারে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

কুষ্টিয়ার ১৯শে জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, ফুলবাড়ি থানার এলাকায় জগন্নাথপুর গ্রাম নিবাসী শিবনাথ সরকার নামীয় একজন নমঃশূদ্র বংশীয় দরিদ্র কাষ্ঠ ব্যবসায়ী ভেড়ামারা নিবাসী আজিজর রহমান খলিফা নামক জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং তৎসহ আরও আটজন লোকের নামে তাহার বিবাহিতা যুবতী স্ত্রীকে প্রলোভিত করিয়া নিজ বাটীতে তাহার সহিত স্বামী-স্ত্রীভাবে বসবাস করিবার অভিযোগে স্থানীয় এস ডি ও'র আদালতে দণ্ডবিধি আইনের ৩৪৩। ৩৬৩। ৩৬৬। ৩৭৬। ৪৯৭। ৪৯৮ ধারা মতে একটি মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে।

২৩শে জুলাই

বাঙলা গভর্নমেণ্ট ধান ও চাউলের দর সম্পর্কে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, ব্যবসায়ীদের সহিত আরও আলোচনার ফলে মোটা ও মাঝারি চাউলের পাইকারী দর মণ প্রতি ১, টাকা হিসাবে বৃদ্ধি করা স্থির হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী মিঃ এন আর গোগাটে তাঁহার সদ্য মৃত পত্নী ইন্দিরা বাঈর স্মৃত্যর্থে জনহিতকর কার্যের জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

বিলাতের শ্রমিক দলের মুখপত্র "ডেলী হেরাল্ড" কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে কটূক্তি করিয়াছেন, তাহার উত্তরে ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন; উহাতে তিনি বলিয়াছেন, "ভারতের বন্ধুগণ ভারতেই আছেন; তাঁহারা ভারতের বাহিরে নহেন। ১৯২০ সালে নাগপুরে আমরা কর্ণেল ওয়েজ উডকে ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি। রুশিয়ায়, চীনে, আমেরিকায়, এমন কি বৃটেনেও ভারতের বন্ধু বলিয়া কেহ নাই। শ্রমিক দলেও ভারতের বন্ধু বলিয়া কেহই নাই।"

২৪শে জুলাই

ঢাকার অবস্থার ক্রমোন্নতির বিষয় বিবেচনা করিয়া ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অদ্য হইতে ১৪৪ ধারার আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন।

২৫শে জুলাই

রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত পি এন ব্যানার্জি সাংবাদিকদের বৈঠকে বলেন যে, লোকাপসরণ বিষয়ে সামরিক প্রয়োজনই সর্বাগ্রগণ্য। তিনি জানান যে, গত জুন মাসের শেষ পর্যন্ত বাঙলার উপকূলবর্তী তিনটি জেলায় অপসারিত ব্যক্তিগণকে ১৬ লক্ষ টাকার অধিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে।

নয়া দিল্লীস্থ বিমান বিভাগের হেডকোয়ার্টার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ২৪শে জুলাই ভারতবর্ষে বৃটিশ বিমান বহরের একখানি সৈন্যবাহী বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হয়; ফলে বিমানের চালক এবং পাঁচ জন যাত্রী মারা গিয়াছে।

কমিউনিস্ট সিকিউরিটি বন্দী শ্রীযুক্ত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও শ্রীযুক্ত নাগেশ্বর সেন হাজারীবাগ জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

জমিয়ৎ-উল-উলেমা-হিন্দের প্রেসিডেণ্ট মৌলানা হোসেন আহমদ মদনী গত এপ্রিল মাসে জমিয়ৎ কনফারেন্সে প্রদত্ত একটি বক্তৃতা সম্পর্কে ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

২৬শে জুলাই

"জাপানীদের প্রতি" শীর্ষক এক প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী "হরিজন" পত্রিকায় লিখিয়াছেনঃ—"আপনারা যদি বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, ভারতের পক্ষ হইতে আপনারা স্বতঃপ্রণোদিত সম্বর্ধনা লাভ করিবেন, তাহা হইলে আপনারা যে শোচনীয়ভাবে নিরাশ হইবেন, এ বিষয়ে আপনারা যেন ভুল না করেন। আপনাদের ভারত আক্রমণ যখন আসন্ন, মিত্রশক্তিকে হয়রাণ করিবার জন্য আমরা ঠিক সেই সময়টি মনোনীত করিয়াছি, এইরূপ একটা গুরুতর রকমের ভুল সংবাদ আপনারা পাইয়াছেন বলিয়া আমি জানি। বৃটেনের দুঃসময় বুঝিয়া যদি আমরা এই সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহিতাম, তাহা হইলে প্রায় তিন বৎসর পূর্বে যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এই সুযোগ গ্রহণ করিতাম।"

২৭শে জুলাই

মহাত্মার বর্তমান মনোভাবের সমালোচনায় "ডেলী হেরাল্ড" যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তৎসম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী "ডেলী হেরাল্ডের" নিকট নিম্নোক্ত তার প্রেরণ করিয়াছিলেন,—"জগতের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল সমালোচনা আসিতেছে, তন্মধ্যে "ডেলী হেরাল্ডের" মন্তব্যই সর্বাপেক্ষা নির্মম। মনে হয়, ইহার পশ্চাতে অপরের প্ররোচনা আছে—কেন না ঐ মন্তব্যের কোন ভিত্তি নাই।" উত্তরে "ডেলী হেরাল্ড" আজ লিখিয়াছেন, "আমরা গভর্নমেণ্টের অনুরোধে ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছি—এইরূপ মনে করিয়া থাকিলে গান্ধীজী ভুল করিয়াছেন।"

চুংকিং-এর চীনা শ্রমিক সমিতির সেক্রেটারী মিঃ টাই-সুঙ-ফান সম্প্রতি নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত গিরির নিকট লিখিত এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধীর সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারতীয় জনগণ (শ্রমিকগণ সহ) সম্মিলিত জাতিসমূহের পক্ষে যোগ দিবেন বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

২৮শে জুলাই—

লক্ষ্ণৌর সংবাদে প্রকাশ, গত নভেম্বর মাসে কংগ্রেসের মুখপত্র "ন্যাশনাল হেরাল্ড" দৈনিক সংবাদপত্রের ছয় হাজার টাকা জামানত জব্দ করিয়া গভর্নমেণ্ট যে আদেশ দিয়াছিলেন, উক্ত সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে গভর্নমেণ্টের ঐ আদেশের বিরুদ্ধে অযোধ্যার চীফ কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জর্জ টমাসের নিকট এক দরখাস্ত করা হইয়াছে। অযোধ্যার চীফ কোর্ট হইতে গভর্নমেণ্টের উপর নোটিশ জারি করার আদেশ হইয়াছে।

বাঙলা সকার নির্দেশ দিয়াছেন যে, বর্তমানে পেট্রলের অত্যন্ত অভাব হওয়ায় আগামী ১লা আগস্ট হইতে প্রাইভেট মোটর ও ট্যাক্সিকে পেট্রল দেওয়া হইবে না।

এক টাকার নোটের প্রচলন হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শীঘ্রই দুই টাকার নোট বাহির করিবেন। ভারত সরকার এই নোটের আকার এবং নক্সা ইত্যাদি অনুমোদন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ

দেখিতে দেখিতে বৎসর ঘুরিয়া আসিল। আবার সেই ২২শে শ্রাবণ। গত বৎসর এই দিনে, শ্রাবণের এমনই এক মেঘাক্রান্ত দিবসে রবীন্দ্রনাথ মর্তলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই মর্তলীলা সংবরণকে আমরা মৃত্যু বলিব না। বাঙালী মহাপুরুষের মৃত্যু আছে, এ কথা স্বীকার করে না। তাঁহাদের মৃত্যুকে বিজয় বলিয়া থাকে। বাঙালী ইহাই জানে যে, যাঁহারা মহামানব, তাঁহাদের মৃত্যু নাই। তাঁহারা মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতময় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। দেশ এবং কালের গণ্ডীর দ্বারা যিনি ছিলেন ব্যবহিত পার্থিব দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আনন্দময় মূর্তিতে মানবের স্মৃতির রাজ্যে অব্যবহিতভাবে বিরাজ করেন। তাঁহার প্রজ্ঞানময় অস্তিত্বের প্রভাব সকলের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয় এবং সত্য হয়। এই হিসাবেই মহাপুরুষের মৃত্যু—মৃত্যু নয়, তাহা হইল বিজয়।

রবীন্দ্রনাথ মহামানব, রবীন্দ্রনাথ কবি, এবং যিনি কবি, তিনি স্রষ্টা। তিনি গড়েন এবং নিত্য নূতন রসে মানুষের চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া তিনি গড়েন। তাঁহার এ গড়ার শেষ হয় না। তাঁহার জীবনের কাজ যখন শেষ হয় না, তখন জীবনেরও শেষ হয় না। এই হিসাবে ব্যাস আছেন, বাল্মীকি আছেন এবং রবীন্দ্রনাথ আছেন, আর থাকিবেন। তিনি মানুষের অন্তরে অভিনব রসধারা সঞ্চার করিয়া, নূতন জগৎ গঠন করিবেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে হারাইয়াছি, এ কথা আজ বলিব না। শ্রাবণ আকাশের সজল জলদ-জালের অন্তরালে আমরা আদিত্য বর্ণ-রবির নিত্য সত্য ভাস্বর অবদানেরই সন্ধান পাইব। তমের পরপারে সেই মহান্ত পুরুষের ছন্দোময় জীবন ভীতির মধ্যে আমাদিগকে যোগাইবে শক্তি।

ভয় নাই, ওরে ভয় নাই, শুনিতেছ কি কবির সেই বাণী? শুনিতে পাইবে। সে বাণী স্তব্ধ হইবার নহে। আত্মার উৎস হইতে যে বাণী উৎসৃত হয় চিত্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইলে তাহা শোনা যায়। শোন সে বাণী। শুনিবার প্রয়োজন আছে। জাতি আজ মহাসঙ্কট সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। প্রলয়ের কালো মেঘ জগতের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। মানব মহিমাকে পিষ্ট করিবার জন্য স্পর্ধিত পশুবল বজ্র উদ্যত করিয়াছে। এসো আজ মহামানবের অনুধ্যান করি। আমরা সকলে তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হই। তিনি কথা কহিবেন। তাঁহার স্মরণ এবং মননের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহার বচনকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার মত প্রচুর বল লাভ করিব। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ছাড়িয়া যান নাই। এ দেশ, এ জাতিকে তিনি ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। এদেশের জল, এদেশের মাটি, তাঁহার সাধের সোনার বাঙলার আকাশ বাতাসকে তিনি ভুলিতে পারেন না। দেশকে স্মরণ কর, জাতিকে স্মরণ কর, ভাব দেশের কথা, জাতির কথা, তোমার সেই ভাবনার সঙ্গে কবির

ভাবধারা নিত্যসূত্রে যুক্ত হইয়া যাইবে। কবিকে অন্তরে তুমি আপনার করিয়া পাইবে। তোমার সেই বৃহত্তর অনুভাবনার তপস্যার আলোকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই তিরোভাব তিথিতে দীপ্ত হইয়া উঠিবেন। শ্রাবণের উচ্ছল জলরোলে মহাতীর্থ যাত্রীর সঙ্গীত তোমার কানে ঝঙ্কৃত হইবে। সে ঝঙ্কারে জাগিয়া উঠিবে তুমি, জাগিয়া উঠিবে এ জাতি এবং রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জাতির উপদেষ্টা হইয়া অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিবেন। আমরা মানস-নেত্রে জাতির সেই বিজয় অভিযান প্রত্যক্ষ করিয়া বিজয়ী রবীন্দ্রনাথকে বন্দনা করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখিত]

ওঁ

শিলাইদহ।

বিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ—

কলিকাতায় আসিয়া অবধি মীরার জ্বর হয় নাই—মোটের উপরে সে ভালই আছে। ইতিমধ্যে এখানে একটা বিশেষ কাজ পড়াতে আমাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে। আর সপ্তাহখানেকের মধ্যে কলিকাতায় ফিরিতে পারিব।

পর্শু বৌমা একটা চিঠিতে লিখিয়াছেন যে ছেলেদের ছুটি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় চলিতেছে। সামনে একটা বড় ছুটি আসিতেছে এ সময়ে এত বার বার ছুটি হওয়া প্রার্থনীয় নহে। "পর্শু বুধবার ছুটি গিয়াছে, আজ ছুটি, আগামী মঙ্গলবার সংক্রান্তি উপলক্ষে ছুটি, তাহার পরদিন পুনশ্চ ছুটি।"

সত্য এবং বেলার অভাবে ক্লাসের অসুবিধা হইতেছে না?

যদি মীরা ভাল থাকে তবে আমি ফিরিয়া গিয়া ছুটির পূর্বে একবার বিদ্যালয়ে যাইব।

এণ্ট্রেন্স্ ক্লাস এবার ছুটির সময় চলিবে ত?

এখানে আমাদের একজন বড় প্রজা তাঁহার স্ত্রীর নামে Savings Bankএ টাকা জমা রাখিতেন। এক বৎসর হইল তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে নানা অছিলায় তিনি আজ পর্যন্ত টাকা বাহির করিতে পারেন নাই। শুনিয়া আমি ভাবিতেছি যে আমাদের বিদ্যালয়ের টাকা আমাদের নামে সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখিলে কোনদিন এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটে বলা যায় না। আমাদের কৃষিব্যাঙ্কে বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীরূপে আপনার নামে জমা রাখিলে সুদও বেশী পাওয়া যাইবে কোনো কারণে টাকা বাহির করিবার কোনো ব্যাঘাতও ঘটিবে না।

আমি এখানে যে বিশেষ কাজের জন্য আসিয়াছিলাম তাহা সারা হইয়াছে—সম্প্রতি পদ্মার অনুনয়ে আবদ্ধ হইয়া কাজের ছুতা খুঁজিয়া এখানকার মেয়াদ বাড়াইয়া লইতেছি। এই ভাদ্রের ভরা নদীর উপরে মেঘ রৌদ্রবিচিত্র শরতের সমাগম বড়ই ভাল লাগে—দুই মুগ্ধচক্ষু পরিপূর্ণ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে এই অপরূপ সৌন্দর্যের আবির্ভাবকে আমি উপেক্ষা করিতে পারি না—মানবজন্মের মধ্যে এমন মাধুর্যপূর্ণ সুযোগ দুর্লভ—তাই আর সমস্ত ভুলিয়া এই নির্মল আলোকপ্লাবিত অবাধ আকাশের তলে পরিপূর্ণ জলের কলধ্বনি শুনিয়া দিন কাটাইতেছি। আমার মনে হইতেছে যেন ইহার পরে কোনো একটা মহাদিনে এই সমস্ত সৌন্দর্য অভিষিক্ত দিনগুলির কথা কেহ আমাকে বিশেষ করিয়া মনে করাইয়া দিবে;—এই বৃষ্টিধারাধৌত আলোকের

পশ্চাতে গোপনে নিঃশব্দপদে আনাগোনা করিয়া যিনি আমার অন্তঃকরণকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছেন এ সকল দিনের হিসাব তাঁর কাছে আছে। আপনাদের কেমন চলিতেছে? কোথাও কোনো বিঘ্ন নাই ত? বিদ্যালয়ের মর্মস্থানগত সুগন্ধি-পরাগরঞ্জিত বীজকোষটির ভার আপনারা লইয়াছেন—সেখানে যেন বলের বা শান্তির বা মাধুর্যের হানি না হয়। সেখানে যেন বিরোধ বা অহমিকা আসিয়া না পড়ে। অজিতের সংবাদ কি? ইতি ২৯শে ভাদ্র ১৩১৪

ভবদীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রীতি নমস্কার

মেয়ো হাসপাতালের পত্র পড়িয়া দেখিবেন। শনিবারে সুবোধ মল্লিক প্রভৃতি একদল লোক বিদ্যালয় দেখিতে যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। সেইজন্য আমাকে তাহার আগে গিয়া প্রস্তুত হইবার জন্য ছুটিতে হইতেছিল। কাল বিকালে তাঁহাদের পত্র পাইলাম তাঁহারা যাইতে পারিবেন না। ইতিমধ্যে রামমোহন রায়ের স্মরণসভায় বক্তাদের মধ্যে আমার নাম বাহির হইয়া গেছে—আজ সেই সভা। মেজদাদা এই সভায় আমাকে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন—অতএব আজও বাঁধা পড়িয়া গেলাম।

শনিবারে যাইবার কোনো বাধা এখনও দেখিতেছি না! তাই কাল মেলে যাওয়াই ঠিক করা গেল।

হিসাবগুলি সেখানেই আছে—বোলপুরে গিয়া দিব।

মীরার শরীর অনেকটা ভাল আছে। বোলপুরে তাহার যে সমস্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা বন্ধ করিয়াই তবে মীরা সুস্থ হইল। সেই অবধি মীরা এক ফোঁটা ঔষধ খায় নাই, অন্য সমস্ত উৎপাতও ক্ষান্ত আছে। সুবোধ বলেন রোগ নির্ণয়ই ভুল হইয়াছিল। যে চিকিৎসা চলিতেছিল তাহাতে বিপদ ঘটিত। এখানে আসিবার পূর্বে ডাক্তার চন্দনের তৈল দিয়া যে ওষুধ তৈরি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন ভাগ্যে আমি নানা দ্বিধা করিয়া তাহা খাওয়াই নাই। যমের চেয়ে যমের দূতগুলি ভয়ানক—যমের মহিষ দ্বারে আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব করে কিন্তু যমদূতের বাইসিক্‌ল হু হু শব্দে ছোটে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই সংযম পালন করে কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে একদল যে সংযম চর্চা করেন না এবং কেহ কেহ যে বিদ্যালয়ের উচ্চতর ভাবের প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ একথা এখানেও অনেক স্থানে রাষ্ট্র হইয়াছে। যাঁহারা বোলপুরে দুই একদিনের জন্যও যান এই বৈসাদৃশ্য তাঁহাদের চোখও এড়ায় না এবং তাঁহাদের দ্বারা এই সংবাদ মফস্বলেও কোথাও কোথাও প্রচার হইয়াছে।

অধ্যাপকগণ যেদিন যথার্থভাবে বিদ্যালয়ের সহিত সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যোগ দিতে পারিবেন—পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা রাখিবেন না—এবং বিদ্যালয়ের মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা রাখিতে পারিবেন সেইদিন আমি ধন্য হইব তাঁহারাও ধন্য হইবেন। আমি কাহাকেও বিশেষভাবে অপরাধী করিতেছি না—অপরাধ আমাদের প্রত্যেকের। আমাদের মধ্যে যাহার যতটুকু দুর্বলতা রহিয়াছে তাহাই সকলকে দুর্বল করিয়া রাখিয়াছে। আমি যদি ধর্মের আহ্বানে সম্পূর্ণ সাড়া দিতে পারিতাম তবে সে আহ্বান বিদ্যালয়ের কেহই অবহেলা করিতে পারিত না। এইজন্য বিদ্যালয়ের সমস্ত ত্রুটি আমারই নিজের অপরাধকে আমার সম্মুখে সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতেছে—বিদ্যালয়ের যাহা কিছু লজ্জা তাহা সম্পূর্ণ আমারই। নিজেকে বাহিরে প্রতিফলিত করিয়া দেখিবার এই যে উপায় আমার হাতে ঈশ্বর দিয়াছেন ইহার সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া আমি নিজেকে যেন প্রস্তুত করিতে পারি। অসতোমাসদ্গময়। ইতি ১০ই আশ্বিন ১৩১৪

ভবদীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু—

শান্তিনিকেতনে মন্দিরে উপাসনাস্বাধ্যায় পাঠ এবং শাস্ত্রালাপ করিতে পারেন এমন একজন সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত যদি আনিয়া দেন তবে বিদ্যালয়ের কাজও তাঁহাকে দিয়া চালাইয়া লইতে পারি। যদি ভাল শিক্ষিত ধর্মানুরাগী ইংরেজী জানা লোক পান তাহা হইলেও ক্ষতি নাই—স্বাধ্যায় পাঠ শিখিয়া লইতে বেশি দিন সময় লাগে নাই। ইংরেজীজানা বা সংস্কৃতজানা যেমন লোকই পান তাহাতে আমাদের কাজে লাগিবে। বিদ্যালয় শুদ্ধ জড়াইয়া এমন লোককে ৫০, টাকা অথবা তাহার কিছু বেশিও বেতন দেওয়া যাইতে পারে।

আমাদের বাড়ির পুরোহিতটি সৎস্বভাবের লোক নহেন তাঁহাকেও বিদায় করিতে চাই। একজন সংস্কৃতজ্ঞ ভাল লোক পাইলে বড় ভাল হয়। তাঁহাকে প্রত্যহ প্রাতে জোড়াসাঁকোর বাড়ির দালানে উপাসনা, মাঝে মাঝে বুধবারে উপাসনা ও সমাজ অফিসে থাকিয়া তত্ত্ববোধিনীর প্রুফ প্রভৃতি দেখার কাজ করিতে হইবে। আপনার সন্ধানে কেহ আছেন? বেদান্তবিশারদ মহাশয় একাজে কি সম্মত হইতে পারেন? এ লোকটিও যদি সংস্কৃতজানা না হইয়া ইংরেজীজানা হন তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাইঃ—কারণ ছাপানো অনুষ্ঠানপদ্ধতি দেখিয়া পৌরোহিত্য করিতে হয় অল্প সংস্কৃতজানা থাকিলেই চলিয়া যায়।

যদি শাস্ত্রী মহাশয়ের সন্ধানে এরূপ লোক থাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।

জ্ঞানবাবুর পরিবর্তে যাঁহাকে রাখা হইবে তাঁহার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত আমি তাঁহাকে নোটিশ দিতে ক্ষান্ত আছি। একজন রীতিমত গণিতজ্ঞ লোক চাই—এমন লোক যাঁহার পরামর্শে ও চালনায় বিদ্যালয়ের গণিত বিভাগ উন্নতিলাভ করিতে পারে।

আজই কলিকাতায় ফিরিতেছি। কয়দিন অর্শের কষ্টও ভোগ করা গেছে।

সম্মুখে ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ আসন্ন হইয়া আছে শুনিতে পাই এমন দুর্ভিক্ষ বহুদিম ঘটে নাই। এই চিন্তায় আমার মন অত্যন্ত পীড়িত ছিল এমন সময় প্রিয়র চিঠি পাইলাম যে শম্ভুর বোন খেলা করিতে করিতে কাপড়ে আগুন লাগিয়া মরিয়াছে। সেই দৃশ্য দেখিয়া প্রিয় সান্ত্বনার জন্য আমাকে পত্র লিখিয়াছিল। আমি নিজেই তখন বেদনা পাইতেছিলাম। প্রিয়র পত্রের উত্তর দিতে গিয়া আমি নিজের চিত্তকে শান্ত করিতে পারিয়াছি।

দুঃখই আমাদের আপনার ধন—কারণ অপূর্ণতার নিত্য সহচর—আর যাহা কিছু, ঈশ্বর আমাদিগকে দান করিয়াছেন; কেবল দুঃখই আমাদের নিতান্ত স্বকীয় অতএব আমরা বড় জিনিস যাহা কিছু চাই এই দুঃখ দিয়া কিনিতে হইবে। আমাদের ভক্তি প্রীতি ধর্ম ঈশ্বর সমস্তেরই মূল্য দিবার সময় দুঃখ ছাড়া আমাদের আর কোনো যথার্থ নিজস্ব সম্বল নাই। দুঃখ দিয়া আনন্দও কিনিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া দুঃখকে মাথায় করিয়া লইলে তবেই তাঁহাকে কিছু দিতে পারি। তাঁহাকে ফুল দিই সে ত তাঁহারই ফুল—কিন্তু দুঃখ, এ যে আমাদেরই দুঃখ। মা ছেলের জন্য দুঃখ পাইয়াছেন বলিয়াই ত ছেলের উপর তাঁহার অধিকার এত আপন হইয়াছে। ছেলে যদি নিতান্তই আরামের হইত তবে সেই বিলাসের ধনে মাতৃস্নেহের কোনোই গৌরব থাকিত না। ঈশ্বর তাঁহার পরিপূর্ণতার ধন লইয়া আছেন—আমাদেরও অপূর্ণতার ধন আছে—এই ধনে আমরাও ধনী; ইহাই দুঃখ—এই ধনেরই বিনিময়ে আমরা ঈশ্বরের ধন দাবী করিতে পারি—আমাদের আর কিছুই নাই। ইতি ৪ঠা কার্তিক ১৩১৪।—ভবদীয় **শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

ওঁ

শিলাইদহ

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

আপনি অজিতকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিবেন যে ১০০।১৫০ টাকা খরচ করিয়া ঘর করিতে হইলে বিদ্যালয়ের পক্ষে কষ্টকর হইবে। বিদ্যালয়ের নানা প্রয়োজন আছে সে সমস্তও দেখা আবশ্যক। যথা একটা কামারশালা করান প্রয়োজন, তাহা ছাড়া ইঁদারা প্রভৃতি অনেক কাজ আছে। গ্রীষ্মের পূর্বেই রান্নাঘরের বারান্দার চালাটা অগ্নিভয় নিবারণের উপযুক্ত করিতে হইবে। এ ছাড়া কতকগুলি বই কেনা হইয়াছে ও হইবে তাহার মূল্য বাকি আছে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ব্যয়সংক্ষেপের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে উপায় দেখি না—এজন্যে সে যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। এখানে সুবোধেরঘরে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ভূপেশ সর্বদাই একটা পিস্তলে গুলী ভরিয়া বীররসের চর্চা করিয়া এবং নিরীহ চখাচখিগুলিকে ক্ষত ও হত করিয়া আনন্দ অনুভব করে। সুবোধের এক আত্মীয় ভূপেশের হাত হইতে সেই ভরা পিস্তল লইয়া সুবোধের ছেলেমেয়েদের খেলাচ্ছলে ভয় দেখাইতেছিল—তাহারা তখন ভূপেশের কোলে বসিয়াছিল, গুলী ছুটিয়া গিয়া লতুর কপালের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন সুবোধ আমার কাছে বোটে কাজে নিযুক্ত ছিল। ফিরিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই লতুর মৃত্যু হইয়াছে। সুবোধ সহজেই অধৈর্য প্রকৃতি—সে ত নিজের শোকের কাছে একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া আছে—বহু চেষ্টায় তাহার চিত্তে বল সঞ্চার করিতে পারিতেছি না।

প্রাতঃস্নানের সময় পিছাইয়া দিয়া ভালই করিয়াছেন।

আপনি একে একে ছেলেদের হৃদয়কে উদ্বোধিত করিয়া দিবার যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাই বিদ্যালয়ের যথার্থ কাজ। ভিতর হইতে গড়িয়া না তুলিলে শুদ্ধমাত্র বাহিরের শাসন অত্যাচার—এরূপ শাসনে মানুষকে কপট ও ভীরু করিয়া তোলা হয়। মানুষের কল্যাণ করিতে অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন। কাহারো আশা পরিত্যাগ করিবেন না—ফল পাই বা না পাই প্রত্যেক ছাত্রের প্রতিই আমাদের চিত্তকে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিতে হইবে। ইহাই আমাদের তপস্যা—ইহার বাধাও আমাদের কল্যাণসাধন করিবে। খুব করিতেছি এবং খুব পারিতেছি বলিয়া কোনো অভিমান মনে রাখিবার প্রয়োজন নাই। করিব, এই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট—পারিব, এমন সুযোগ নাই বা হইল। সহজে সিদ্ধিলাভ জড়তা ও অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দেয়।

আমি এখানে ভালই আছি। এখানকার নির্জনবাস আমার পক্ষে আবশ্যক ছিল। যখন জনতাও নির্জন হইবে তখন আর আমার কোনো ভাবনা থাকিবে না। ইতি ২৪শে পৌষ ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অমর্ত্য

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

দেখতে দেখতে এক বৎসর হয়ে এল; যা ছিল দুঃসহ শোক, আজ তা জীবনে এনেছে এক নূতন অনুভূতি, তা তাঁর তিরোধানের পূর্বে কখনো মনে করতে পারি নি। হারিয়ে গিয়েও তিনি হারিয়ে যাননি একথা বুঝতে পারছি। মৃত্যুকে তিনি সর্বনাশ বলে মনে করতেন না, ধৈর্যের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীকে গ্রহণ করতে হবে এই ছিল তাঁর শিক্ষা। প্রায়ই বলতেন, "inevitable-এর সঙ্গে তর্ক করে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত কোরো না। যা ঘটবেই, যা আমার হাতের বাইরে, তার সঙ্গে ঝগড়া করে কী হবে? তার চেয়ে মনকে মিলিয়ে নাও। ভাল মন্দ যাই হোক না কেন, মনে কর আচ্ছা তাই সই, তাই হবে।"

ইদানীং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি যে মৃত্যু চাইতেন তা নয়—জীবনকে তিনি ভালবাসতেন। এই পৃথিবীর ছায়া, আলো, সব তাঁর চোখে অপরূপ সুন্দর হয়ে দেখা দিত। কতদিন দেখেছি চুপচাপ বসে আছেন দূরের দিকে তাকিয়ে। যেন কোন কাজ নেই—কোন তাড়া নেই। কি এক আশ্চর্য অচঞ্চলতার মধ্যখানেই তিনি চুপ করে বসে থাকতেন। সে সব সময় যে কোন ধ্যানে ধ্যানস্থ হওয়া—তা নয়, কবিত্বে তন্ময় হওয়া—তাও নয়, শুধু বসে বসে দেখা।

একটা দিনের কথা বলি, মংপুতে সেদিন সুন্দর রোদ টলমল করছে। কাঁচের ঘরে বসে আছেন আরাম চৌকিতে, পায়ের উপর অর্ধস্খলিত চাদর ঢাকা। দুই হাত কোলের কাছে সম্নদ্ধ। সামনের পাতার আলো-ছায়ায় গাঁথা একটা প্রকাণ্ড গাছের দিকে চেয়ে রয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ— শ্রাবণ ১৩৪৯

"দেখ আজ কি সুন্দর রোদ উঠেছে। এই গাছের ফাঁকে আলোছায়ার লীলা আমি দেখছিই দেখছিই—চিরজীবন ধরেই দেখলুম, কতভাবে কত করে দেখা। আমি চলে গেলে এদের এমন করে দেখবে কে?"

শুধু প্রকৃতি নয়, মানুষের মর্মস্থল পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পৌঁছত। মানুষের মন তিনি কি রকম করে দেখতে পেতেন, তাঁর কাব্যেই আছে অজস্র প্রচুর তার পরিচয়।

তবু একটা ঘটনা বলি। তখন তিনি খুব অসুস্থ। একটা প্রকাণ্ড চৌকিতে অবসন্ন আর্ত দেহ এলিয়ে অর্ধজাগরিত হয়ে আছেন। শরীরে যন্ত্রণা। এমন সময় একটি মেয়ে এসে প্রণাম করে দাঁড়াল একটু ক্ষণ। সে চলে যেতেই তিনি তাঁর ক্লান্ত চোখ তুলে বললেন,—

"আচ্ছা ওর কি শ্বশুর বাড়িতে মনের মিল হয়নি? ওর বন্ধনে কি ফাঁক নেই কোথাও?"

এই বলে উত্তরের প্রত্যাশা না করেই চোখ বুজে আবার নিজের অর্ধ অচৈতন্যে ডুব দিলেন। আমিও জবাব দিলুম না—তাঁর অনুমানের সত্যতা আমাকে বিস্মিত অভিভূত করে দিল। কি মমতাময় দৃষ্টিপাত! মানুষের মর্ম পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়ে যায় এক মুহূর্তে!

তাই বলছিলুম—তিনি ভালবাসতেন দেখতে মানুষকে, প্রকৃতিকে, ভালবাসতেন এই জীবনের সব কিছু। কিন্তু তবু

অবসানের দিন অগ্রসর হয়ে আসছে বলে তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন অবশ্যম্ভাবীকে গ্রহণের জন্য। বলতেন,—

"প্রত্যহ চেষ্টা করতে হয় মনকে সরিয়ে নেবার, যে অলীক কম্পমান পটভূমির উপর আমাদের প্রত্যহের জীবন কম্পিত হয়, আমি প্রতিদিন চেষ্টা করি নিজেকে তার থেকে দূরে সরিয়ে নিতে। আমার মধ্যে যে অক্ষয় নিত্য 'আমি' আছে, সে-ই প্রধান হয়ে উঠুক। আর ত সময় নেই। রোজ সকালে উঠে মনে হয় আর ত সময় নেই। যখনই কোনো ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হই কিংবা যখনই আমাকে কেন্দ্র করে কোনো অশান্তি উপস্থিত হয়, আমি সর্বদাই আমার নিজেকে দোষ দিই। মনে হয়, আমার চেষ্টা সফল হয়নি, তা নৈলে আমি যে প্রভাব বিস্তার করি, তার মধ্যে ক্ষোভ স্থান পায় কেন! ক্ষণে ক্ষণে অসীমের সঙ্গে যুক্ত হই, তখন আসে অটল শান্তি, গভীর স্বন্দ্বহীনতা, কিন্তু সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। মৃত্যুর পূর্বে আমার জীবনে সেই বড় আমিকেই প্রধান করে যাব এই আমার সংকল্প।"

এক বৎসর দুঃসহ কষ্ট ভোগ ক'রে যে নূতন অস্তিত্বে আমাদের পরম প্রিয় বিদেহী আত্মা প্রবেশ করেছেন হয়ত তারও গভীর প্রয়োজনীয়তা ছিল। যখন তিনি কষ্ট পেতেন তখন তাঁর দুঃখে মনে হ'তো—কেন এ কষ্ট, এ অবিচার কেন? আজ মনে হয়, তারও হয়ত উদ্দেশ্য ছিল। জীবনকে তিনি জেনেছেন, মৃত্যুকেও তিনি জানলেন পরিপূর্ণ রূপে। দিনে দিনে তার সঙ্গে হোলো পরিচয়।

প্রায়ই বলতেন, "দিয়েছিলেন অনেক, এখন দত্তাপহারক একে একে সব ফিরিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু যদি আমার সব নাও তবু চোখ নিও না, তাহলে এরূপ তোমার দেখবে কে? এই আনন্দময় ভুবন তোমার দেখবে কে?"

> যদি মোরে পঙ্গু কর, যদি মোরে কর অন্ধপ্রায়,
> যদি বা প্রচ্ছন্ন কর নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
> বাঁধো বার্ধক্যের জালে। তবু ভাঙা মন্দির বেদীতে
> প্রতিমা অক্ষুন্ন রবে সগৌরবে, তারে কেড়ে নিতে
> শক্তি নাই তব।

প্রতিমা শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। উজ্জ্বল হয়েছিল তাঁর আনন্দ স্বরূপ। মর্ত্যের প্রতি ভালোবাসা অমর্ত্যের অভিমুখে নিয়ে গিয়েছিল—'সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি।'

শারীরিক দুঃখ তিনি সহ্য করতেন আশ্চর্য নীরবে। কিন্তু তাঁর আক্ষেপ হোতো মানসিক কারণকে কেন্দ্র করে। ঐ যে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে হচ্ছে। অন্যকে বেঁধে রাখতে হচ্ছে, সেবা নিতে হচ্ছে—এইগুলো তাঁর খারাপ লাগত। বলতেন, "চিরদিন ছিলুম নিজের হাতে, এখন দিনে দিনে যে তোমাদের হাতের খোকা হয়ে উঠছি গো। একি ভালো হচ্ছে?" বলতেন—"আমাদের দেশ বুড়ো খোকার দেশ,—চিরজীবন ধরে খোকা দুদু খায় ঢক ঢক। পান দে, তামাক দে, বাতাস কর, জল আন্, গা টেপ, পা টেপ, এই সব অফুরন্ত আদরে আব্দারে পাড়া মাতিয়ে খোকাবাবুর দিন কাটে। বিশ্বাস কর, আমি এ দলে ছিলুম না। চিরদিন অভ্যাস ছিল আত্মনির্ভর থাকবার। কিন্তু এ আমার হোলো কি? এ ঘর থেকে ও ঘর—বিদেশ হয়ে উঠছে। দুহাত দূরে কলমটা পড়ে রয়েছে আনতে পারব না, উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাব, কলম! কলম! তুমি ওমনি ওপাড়া থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে কলমটা এগিয়ে ধরবে। আর আমি পরম গম্ভীর হয়ে—যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়, এমনিভাবে সেই কলম দিয়ে কাব্য রচনা সুরু করব। আর মেজাজের যে রকম অবস্থা হচ্ছে হয়ত-বা একটা ধমক দিয়ে বলতেও পারি—কি, জিনিসপত্র সব হাতের কাছে গোছান থাকে না কেন, হুঁ! এই হলে ঠিক আমার স্বদেশবাসীর মত ব্যবহার করা হয়। দেখ না, সেদিন যখন চেঁচালুম—চশমা; চশমা, তুমি এক মাইল দূরে থেকে ছুটে এসে আমার পকেট থেকে চশমা বের করে দিলে, তখন আমার মুখের ভাবখানা লক্ষ্য করেছিলে?"

এ সব কথা পরিহাসচ্ছলে বলতেন বটে। কিন্তু বেশ বুঝতুম, সাহায্য নেওয়ার অভ্যাস ছিল না কোনোদিন। কোনদিন কাউকে দিয়ে ডিকটেট্ করে লেখাতেন না, বই কাউকে দিয়ে পড়িয়ে শুনতেন না—দুর্বল চোখ নিয়ে কম্পমান আঙ্গুলেও শেষ বছর পর্যন্ত নিজের কাজ নিজেই করেছেন। কপির কাজ পর্যন্ত নিজে করতে চাইতেন।

চাকর বাকর সম্বন্ধেও তাঁর সাবধানতার অন্ত ছিল না। হয়ত কোনো দরকার পড়ল, "আহা থাক না থাক না, এত তাড়া কি, ওরা বিশ্রাম করছে। মাইনে দিয়ে রেখেছি বলেই যে ওদের উপর জুলুম—এ আমার ভালো লাগে না।" সাধারণত বাড়ির কর্তাদের ব্যবহারের সঙ্গে যখন তাঁর তুলনা করি—এত আশ্চর্য বোধ হয়! আমাদের দেশের অনেক বড় বড় লোকেরাও অনাবৃত দেহে সদর দরজায় বসে। স্ত্রী কন্যা ও অন্যান্য পরিজন সব একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে—কখন তাঁদের পান থেকে চুণ খসে! আহার্যের ত্রুটি বিচ্যুতি ললাটে ঘনীভূত করে তোলে ভ্রূকুটি। কিন্তু তাঁর ব্যবহারের ছিল শিল্পীর সুচারু আভিজাত্য। সমস্ত শরীর সর্বদা সুদীর্ঘ পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে থাকত, কখনো চাকরদের দ্বারা কিংবা কারু সামনেই অনাবৃত হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত নিজের সব কাজ নিজেই করেছেন। চলাফেরা কষ্ট সাধ্য, দীর্ঘ দেহ টলমল করত, অতি সাবধানে পদক্ষেপ করতে হত, দু'একবার যে বিপর্যয় ঘটেনি তাও নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কারু সাহায্য নিয়ে চলাফেরা করতেন না। তাঁর রুচিতে বাধত। যে-কেউ যে তাঁকে স্পর্শ করবে, শুশ্রূষা সুরু করে দেবে—সে সম্ভব হত না। এমন কি বেশি লোকজন উপস্থিত থাকলে তিনি খেতেও পারতেন না। বলতেন, "হাঁ করা মুখের চেহারা এমনি কি দর্শনীয়?" কোনো কাজে হৈ হৈ, তাড়া হুড়ো একেবারে পছন্দ করতেন না। কখনো জোরে রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। যখন রাগ করে ধমকাতেন, সেও ছিল সাহিত্যের ভাষা, মনোরম ভঙ্গি ও শব্দবিন্যাস। সর্বদা শান্ত হয়ে, একটি আশ্চর্য দূরত্ব নিয়েই তিনি হাসিমুখে কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে সকলের মাঝখানে বসে থাকতেন: এখন বুঝতে পারি—এ সব কথা লিখে বোঝান কত অসম্ভব।

(শেষাংশ ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রবীন্দ্র স্মৃতি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কবি সতীশচন্দ্র রায়

বরিশালের এক সুদূর পল্লী গ্রামে উজিরপুরে ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ি ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক স্বর্গত কবি সতীশচন্দ্র রায়ের বাড়ি এখানে ছিল। বয়স্ক কলেজের ছাত্রেরা ছুটিতে যখন গ্রামে আসিতেন, তখন আমাদের ইস্কুলের ছেলেদের লইয়া তাঁহারা আবৃত্তি ও অভিনয়ের আয়োজন করিতেন। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি তখন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সুদূর পল্লীগ্রামে তাঁহার বই তখন পৌঁছায় নাই বলিলেই হয়। সেই সময় একবার আবৃত্তি হইল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বনৃত্য

"বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে বাজিছে বিশ্ববাজনা,
উঠিছে চিত্ত করিয়া নৃত্য বিস্মৃত হয়ে আপনা"

গান হইল—

"সুন্দর হৃদি রঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার"

আমার বয়স তখন ৯।১০ হইবে। আবৃত্তি ও অভিনয়ের অনেক কথাই বুঝি নাই। কিছু ছন্দের দোলা ও শব্দের মাধুর্য মনকে মুগ্ধ করিত। কবি সতীশও মাঝে মাঝে আসিতেন। তাঁর আবৃত্তি কি ইংরেজি কি বাঙলা আমাদের কাছে এক অপরূপ ব্যাপার মনে হইত।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার দুই বৎসর আগে গিয়া বরিশাল শহরের ইস্কুলে ভর্তি হইলাম। সেখানে মাঝে মাঝে সভায় রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা হইত। মনে আছে এক সভায় বক্তার প্রবন্ধ পাঠের পর অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় বলিলেন, "রবিবাবু যদি অন্য কবিতা কম লিখে 'কথা'র মত কিছু কবিতা বেশী করে লিখতেন ত দেশের উপকার হত।" কিছু দিন পরে শুনিলাম কবি সতীশ রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়াছেন।

ইংরেজি ১৯০৩ সালের পূজার ছুটিতে বাড়িতে গিয়া এক সমবয়স্ক বন্ধুর সঙ্গে কবি সতীশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তাঁর বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে ছিল। বিজয়ার পরে গিয়াছিলাম বলিয়া দেশের প্রথামত কিছু মিষ্টিমুখ করিতে হইল। তারপর বেলা পড়িয়া আসিলে তিনি আমাদের নিয়া ছাদে গেলেন। আমরা অনুরোধ করায় তিনি তাঁর টালি এডিশন রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী হইতে বুঝাইয়া বুঝাইয়া কয়েকটি কবিতা শুনাইলেন। তার মধ্যে একটি 'গানভঙ্গ'—"গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা।" বলিলেন, "গানের গল্পটি রবীন্দ্রাথ স্বপ্নে পেয়েছিলেন—তিনি দেখেছিলেন যেন তাঁর বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বৃদ্ধ গায়ক বরজলালকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।" আর একটি শুনাইয়াছিলেন 'পুরী হইতে সমুদ্র দর্শনে।' অনেক কবিতার পাশে পাশে সতীশবাবুরহাতে- লেখা নোট ছিল। মনে আছে এই কবিতাটির পাশে [illegible] লেখা ছিল "more sublime than Byron's sea-vision", অর্থাৎ কবি বাইরণের সমুদ্র দর্শনের চেয়ে গম্ভীর 'কথা'র কবিতা শুনিতে চাহিলে তিনি মন থেকেই দুর্গেশ দুমরাজ কবিতাটি আবৃত্তি করেন। এই আলোচনার মধ্যে একসময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, 'রবিবাবুর কবিতার সহজ ভাষা দেখে আগে মনে করতাম মানেটা খুব সোজা, এখন যত বয়স হচ্ছে মনে হয়

আসল মানেটা তত সোজা নয়—গভীর।" এই ছুটিতেই একদিন সতীশবাবু আমায় নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ সঠিক কিনা সন্দেহ হওয়ায় আমি সেদিন যাই নাই। তা হইলে রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রবেশের হয়ত আর একটু সাহায্য হইত এব সতীশবাবুর মত ভাবুকের সঙ্গ আর একদিনের জন্য লাভ করিয়া জীবন ধন্য হইত। কিন্তু আমি কি জানিতাম এ জন্মে আর তাঁর সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হইবে না। ইহার পরে মাঘ মাসেই শান্তিনিকেতনে বসন্ত রোগে তিনি মারা যা (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪)।

কবিদর্শন

১৯০৪ সালের জুলাই মাসে আসিয়া কলিকাতার কলেজে যোগ দিই। বরিশালে থাকিতে যেসব গণ্যমান্য লোকদের না শুনিয়াছিলাম, তাঁদের দেখিবার ও শুনিবার জন্য প্রায় কো সভাই বাদ দিতাম না। তখনকার কালে কলিকাতার ছাত্রদে খেলা ও বায়োস্কোপ এই দুটি প্রধান আকর্ষণ ছিল না। থিয়েটা কিছু কিছু ছিল, আর সভা। সভার প্রতি আমার আকর্ষ আমার যিনি অভিভাবক ছিলেন তাঁর ভাল ঠেকে নাই। সেইজন

সভায় যাইবার দিন তিনি নানারকম বাধা সৃষ্টি করিতেন। কলিকাতায় আসার পর প্রথমে যেদিন রবীন্দ্রনাথকে দেখাশোনার সুযোগ হয়, সেদিন 'স্বদেশী-সমাজ' সম্বন্ধে তাঁর প্রথম বক্তৃতা হইবার কথা। কয়েকজন বন্ধুতে মিলিয়া যথাসময়ে বিডন পার্কের নিকটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে গিয়া দেখি, অনেক লোক বাহিরে দাঁড়াইয়া—পুলিশ কাউকে ভিতরে ঢুকিতে দিতেছে না, কারণ স্থান সমস্তই ভর্তি হইয়া গেছে। শুনিলাম কিছু পূর্বেই কয়েকজন ছাত্রকে পুলিশ চাবুক মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। নিরাশ হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। ইহার কয়েকদিন পরেই কাগজে দেখিলাম হ্যারিসন রোডের কার্জন থিয়েটারে আবার 'স্বদেশী-সমাজ' পড়া হইবে। সেবার আমার হিতৈষী অভিভাবক এমন ফন্দী করিলেন যে, আমাকে একেবারে কলিকাতার বাহিরে এক জায়গায় লইয়া গেলেন। আমি অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া সন্ধ্যার পরেই কলিকাতা পৌঁছিলাম, কিন্তু কার্জন থিয়েটারের কাছে যখন আসিলাম, তখন বাতি নিবাইয়া সভা ভঙ্গ হইয়া গেছে। বালকের কবি দর্শনে এবারেও বাধা পড়িল।

তারপরে দীর্ঘদিন গেল। ১৯০৫ সালের জানুয়োরী মাসে একদিন কাগজে দেখিলাম শ্রীহট্টের লোকদের এক পারিতোষিক বিতরণী সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হইবেন, আর বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বক্তৃতা করিবেন। এবারে সময়ের অনেক আগে সভায় গেলাম, রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম ও তাঁর মৌখিক বক্তৃতা শুনিলাম। এই সময়ে তিনি প্রায়ই লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিতেন। কথাগুলি বা বক্তৃতার ধরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথোচিত চমৎকারিতা কিছুই পাইলাম না। কেবল মনে আছে এই বক্তৃতায় তিনি জাপানী দেশপ্রেমিক যোশিদা তোরোজোর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইনি প্রায় শুধু হাতে সমস্ত দেশ ঘুরিয়া দেশের পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। দেশকে ভালবাসিতে হইলে দেশের জ্ঞান থাকা চাই। ইহার কিছুদিন পরে ক্লাসিক থিয়েটারে "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ" প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই বক্তৃতায় বুঝিলাম রবীন্দ্রনাথ কি বস্তু। বক্তৃতার সময় মনে হইল কোন স্বপ্নলোকের মধ্যে বিচরণ করিতেছি! বক্তৃতার পর শ্রোতারা গানের জন্য দরবার জানাইল। স্টেজের উপর একটি হারমোনিয়াম উপস্থিত হইল। দুই একবার বাজাইয়া কবির তাহা পছন্দ হইল না। তিনি শুধু গলায় গাহিলেন, "আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।" গানটি এত সময়োপযোগী হইয়াছিল যে, বন্ধুরা কেউ কেউ বলিলেন, যে ওটি তখনি বাঁধা হইয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলন

ইহার পর ১৯০৫ সালের বর্ষাকালে বাঙলা দেশে স্বদেশীর বান ডাকিল। কবি বক্তৃতা করিয়া, গান বাঁধিয়া সেই বানকে ফসলের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই সময় কখনো তাঁকে দেখিলাম টাউন হলের বক্তৃতায়, কখনো জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্বোধনে কখনো ডন সোসাইটির ছাত্র মহলে। এই সমিতির ছাত্রদের তাঁর রচিত স্বদেশী গান শিখাইবার জন্য স্বর্গত অজিতকুমার চক্রবর্তী কিছুদিন বিদ্যাসাগর কলেজে যাতায়াত করিতেন। ডন সোসাইটির বৈঠক তখন ঐ কলেজের হলে হইত।

আশ্রম দর্শন

১৯০৭ সালের দোল পূর্ণিমার সময় কোনো বন্ধুর কাছ থেকে পরিচয়পত্র লইয়া আমি প্রথমে শান্তিনিকেতনে যাই। কবির শিক্ষা-সমস্যা প্রভৃতি লেখা হইতে ইতিপূর্বেই তাঁর আশ্রমের আদর্শের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। কিন্তু বাস্তব রূপটি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সে সময় কবি আশ্রমের 'দেহলী' নামক বাড়িতে থাকিতেন। আমি সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কবি তখন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন। এই সময় তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে সাহিত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছিলেন। সম্ভবত ঐ সম্পর্কেই শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন। কবির এক দূর সম্পর্কীয় পিসিমা ও ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ তখন ঐ বাড়িতে তাঁর সঙ্গে থাকিতেন। ভৃত্য ছিল উমাচরণ। রাত্রে আহারের পর শুনিলাম আমাদের উজিরপুরের কবি সতীশচন্দ্রের ভাই ভূপেশবাবু ওখানে থাকেন। তিনিই আমাকে সঙ্গে করিয়া জ্যোৎস্নালোকিত সৌরভপূর্ণ আম্রকুঞ্জের ভিতর দিয়া অতিথিশালায় রাত্রিবাসের জন্য লইয়া গেলেন। পরদিন সকালে আবার কবির সঙ্গে দেখা হইল এবং স্থির হইল আশ্রমে ইতিহাসের অগ্রসর ছাত্ররূপে আমি যোগ দিব।

আশ্রমের কর্মপ্রণালী

কয়েকদিন পরেই আমি আশ্রমের কাজে যোগ দিলাম। ছাত্রসংখ্যা তখন বোধ হয় ৩০।৪০। তখন অধ্যাপক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীজগদানন্দ রায়, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, শ্রীসত্যেশ্বর নাগ, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ আইচ, শ্রীভূপেশচন্দ্র রায়, কবির জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। ছেলেরা সব প্রাক্‌কুটিরেই থাকিত। অধ্যাপকেরা অধিকাংশই ছেলেদের সঙ্গে থাকিতেন। তখনকার কার্যপ্রণালী এইরূপ ছিল। শেষরাত্রে বিছানা থেকে উঠিয়া শৌচাদির জন্য মাঠে যাওয়া, লাইনে দাঁড়াইয়া শুধু হাতে ডাম্বেলের ব্যায়াম, নিজেদের ঘর ঝাঁট দেওয়া, স্নান, কাপড় কাচা, বিছানা রৌদ্রে দেওয়া, উপাসনা, জলখাবার, পাঠ। দুপুরে আহার, নিজ নিজ বাসনমাজা, বিশ্রাম। অপরাহ্ণে আবার পাঠ, জলখাবার, খেলা, সন্ধ্যায় উপাসনা, গল্প, গান, অভিনয়, সভা প্রভৃতি। আহার, ছেলেদের বিচার সভা, ৯টার সময় নিদ্রা। ছাত্রদের পরিচালনা পদ্ধতি এইরূপ ছিল। প্রত্যেক সপ্তাহের জন্য ছাত্রেরা ভোটের দ্বারা নিজেদের মধ্যে একজনকে নায়ক বা ক্যাপ্টেন নিযুক্ত করিত। সেই প্রত্যেক কাজের জন্য বিভিন্ন সময়ে ঘণ্টা বাজাইত লাইন করিয়া ছেলেদের যথাস্থানে নিয়া যাইত। অধ্যাপকদের মধ্যে পালাক্রমে প্রতি মাসে একজন করিয়া অধিনায়ক হইতেন। অধিনায়কের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নায়ক কাজ করিতেন এবং কোনো গোলযোগ উপস্থিত হইলে অধিনায়ক তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। বু[illegible] ছুটির দিনে ছেলেরা অধ্যাপকদের সঙ্গে বিভিন্ন [illegible] [illegible]

বেড়াইতে যাইত। কোপাই, অজয় নদী, পারুল বন, চীপ সাহেবের কুঠি প্রভৃতি বেড়াইবার স্থান ছিল। সেখানে গিয়া গ্রাম থেকে মুড়ি ও পাটালী গুড় (লবাৎ) কিনিয়া খাওয়া আমোদের একটা অঙ্গ ছিল। কোন কোন চতুর ছেলে গ্রামের লোকেদের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া আরো কিছু ভাল খাবার আদায় করিয়া অন্য ছেলেদের ঈর্ষার পাত্র হইত। ছেলেদের মধ্যে বোধ করি অর্ধেকের উপর ছিল পূর্ববঙ্গের। কাজেই আশ্রমের ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে ভাষার বিশেষ মিল ছিল না—মাঝে মাঝে মনে হইত পূর্ববঙ্গের কোন বোর্ডিং ইস্কুলে আছি।

পু—বাবু

কর্মচারীদের মধ্যে পু—বাবু নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি একাধারে ভান্ডার ও রন্ধনশালার পরিদর্শক, ওভারসিয়ার, অতিথি ও রোগীর সেবক প্রভৃতি ছিলেন। এতগুলি কাজ তাঁর হাতে থাকায় এবং তিনি একটু স্থূলকায় থাকায় কোন কাজটিই ভাল করিয়া হইয়া উঠিত না। সেজন্য তাঁকে মাঝে মাঝে অনুযোগ শুনিতে হইত। কিন্তু তিনি কিছুই গায়ে মাখিতেন না। ছেলেদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন বলিয়া অনেক আবদার সহ্য করিতেন। তাঁর নাকটি টীয়াপাখীর ঠোঁটের মত দেখিতে ছিল বলিয়া তাঁর আকৃতির মধ্যে কিছু কৌতুক ছিল এবং মাঝে মাঝে তিনি রঙ্গ-রস করিতে করিতে উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিতেন। শুনিয়াছি, কবি এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে "এই লোকটি আমার মানস লোকে প্রবেশ করেছে—দেখবে এর পরে আমি যে গল্প লিখবো তাতে এ ঢুকে পড়বে।" কিন্তু আমি যতদূর জানি, কবির কোন গল্পে পু—বাবুর ছায়া পড়ে নাই।

গ্রাম-সংগঠন

১৯০৭ সালের মার্চ মাসে আমি আশ্রমে যাইবার পরেই ওখানে আর একটি কাজের পত্তন হয়। কবি তখন গ্রাম সংগঠনের কথা ভাবিতেছিলেন ও দেশকে বলিতেছিলেন কিন্তু সাড়া পান নাই। তাই তিনি আশ্রমের নিকটস্থ ভুবনডাঙ্গা গ্রামে কাজ আরম্ভ করিবার জন্য আমাদের উৎসাহ দিলেন। আমরাও কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র মিলিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংগঠনের এই চারিটি বিভাগ হইল। আশ্রমের মধ্যে এবং ভুবনডাঙ্গার মধ্যে একটু সচ্ছল অবস্থার লোকের ঘরে মুষ্টিভিক্ষার হাঁড়ি রাখা হইল। ছেলেদের ও অধ্যাপকদের পুরাণো কাপড় লইয়া দরিদ্রের জন্য বস্ত্রভান্ডার হইল। অধ্যাপক শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার তত্ত্বাবধায়ক হইলেন। গ্রামের ছেলেদের শিক্ষা দিবার ভার আমার উপর পড়িল। অজিতবাবু, বঙ্কিমবাবু, ভূপেশবাবু, সন্তোশবাবু প্রভৃতি কয়েকজনের হাতে স্বাস্থ্য বিভাগের ভার দিলেন। প্রতিদিন বিকালে জলখাবারের পরে আমি কয়েকটি ছেলেকে লইয়া ভুবনডাঙ্গার ছেলেদের পড়াইবার জন্য যাইতাম। আশ্রমের এক একজন ছাত্র গ্রামের এক একটি ছেলের ভার লইত। সেই তাকে বাঙলা লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখাইত। পাঠের পর কিছুক্ষণ ফুটবল খেলা হইত। তাতে গ্রামের ছেলেরা আনন্দ পাইত। আশ্রমের মত গ্রামেও গাছের তলাতেই আমাদের পাঠ হইত। স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে মাঝে মাঝে গ্রামের রাস্তা ঝাঁট দেওয়া হইত। এই গ্রামে প্রায় প্রত্যেক বাড়ির পাশে একটা করিয়া খানা ছিল। তাতে নানারকম আবর্জনা পচিয়া দুর্গন্ধ হইত—সেগুলি বুজাইয়া ফেলিবার বা পরিষ্কার করিবার জন্য আমরা উপদেশ দিতাম, বর্ষাকালে জল জমিলে মাঝে মাঝে তাহাতে কেরোসিন দিয়া মশক ধ্বংসের চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু ফল বেশি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ

যতদূর মনে পড়ে কবি তখন নিয়মিত কোন ক্লাস লইতেন না। ইহার একটা কারণ হয়ত এই ছিল যে তাঁহাকে প্রায়ই কলিকাতা ও জমিদারী শিলাইদহে দৌড়াদৌড়ি করিতে হইত। তবে মাঝে মাঝে ক্লাসে আসিয়া পড়াশুনা দেখিতেন ও নূতন শিক্ষক আসিলে প্রায় ১০।১৫ দিন নিজে পড়াইয়া ওখানকার শিক্ষা-প্রণালীটি বুঝাইয়া দিতেন। একদিনের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। ভূগোলের একজন নূতন শিক্ষক প্রাককুটিরের উত্তরের বারান্দায় বসিয়া ভূগোল পড়াইতেছেন। কবি আস্তে আস্তে পিছন দিক হইতে দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ শুনিতে লাগিলেন। ছাত্র বা অধ্যাপক কেউ টের পাইলেন না। আমি পাশের ঘরে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলাম। হঠাৎ একসময়ে তিনি ক্লাসের মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং নীহারিকাপুঞ্জ হইতে কি করিয়া পৃথিবী ক্রমে ক্রমে বর্তমান আকার পাইয়াছে তাহা গল্পচ্ছলে বর্ণনা করিয়া গেলেন। ছেলেরা তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। সংসারে তিনি কবি, দার্শনিক, ধর্মোপদেষ্টা, কর্মী, চিত্রকর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁরা তাঁহাকে ছোটছেলে মেয়েদেরও পড়াইতে দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন তিনি কিরূপ পাকা শিক্ষক ছিলেন। একবার তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন "শরীরের খাদ্য সম্বন্ধে শিশুদের লোভ থাকে, আমি বুঝতে পারি না মানসিক খাদ্য অর্থাৎ জ্ঞান সম্বন্ধে মানবশিশুর সেই রকম লোভ কেন হবে না—সবই যথার্থ শিক্ষকের উপর নির্ভর করে।"

শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই নানান্ বই ও সাময়িকপত্র আনাইয়া নিজে পড়িতেন ও অধ্যাপকদের পড়িতে উৎসাহ দিতেন। এ বিষয়ে তাঁর স্বদেশ বিদেশ শত্রুমিত্র ভেদ ছিল না। একসময়ে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে তাঁর মনান্তর হইয়াছিল। তখন দ্বিজেন্দ্রবাবুর ইংরেজি প্রথম শিক্ষার একখানি বই বাহির হয়। বইখানি তিনি কলিকাতা হইতে অধ্যাপক অজিতবাবুকে পাঠাইয়া পত্র দেন তিনি যেন উহা বেশ করিয়া পড়িয়া গ্রহীতব্য জিনিস আশ্রমের অধ্যাপনায় প্রয়োগ করেন। দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রতি বিরূপতার জন্য বইখানির প্রতি অবিচার না করেন।

অপ্রমত্ততা

মনে পড়ে একবার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের রাজদ্রোহ-মূলক প্রবন্ধ লেখার অভিযোগ হয়, তাহাতে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ইংরেজের আদালতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। আদালত অবমাননার অপরাধে বিপিনবাবুর কিছুকালের জন্য জেল হয়। কবি তখন আশ্রমে ছিলেন না। ঐ ঘটনার সংবাদ আশ্রমে পৌঁছিবামাত্র বিদ্যালয় ছুটি দেওয়া হইল এবং আমরা

ছেলেদের লইয়া একটি মিছিল করিয়া মাদল বাজাইয়া স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে বোলপুর ও পাশ্ববর্তী স্থানের অনেক রাস্তা ঘুরিয়া আসিলাম। রাস্তায় চলিতে চলিতে উত্তেজনার মাত্রা একটু চড়িয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারের খবর কবির কাছে যায়। তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আমাদের ডাকিয়া বলেন "উত্তেজনার জন্য কর্তব্য কাজে শিথিলতা করা মাৎলামির সামিল। এখানকার কাজের গুরুত্বকে তোমরা উপলব্ধি করো। আমি বলে রাখছি যদি গভর্নমেণ্ট আমাকেও কোনদিন জেলে দেয় তাহলেও তোমরা উত্তেজিত না হয়ে নিজেদের কর্তব্য কাজ করে যাবে।"

কবিপুত্র শমীন্দ্র

১৯০৭ সালের পুজার ছুটির পরে আশ্রমে গিয়া শুনিলাম কবির ছোট ছেলে শমীন্দ্র মুঙ্গেরে কবির বন্ধু শ্রীশ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাড়ি বেড়াইতে গেছে। হঠাৎ একদিন খবর আসিল সেখানে তার কলেরা হইয়াছে। কবি সেখানে গেলেন। খবর আসিল শমী ক্রমেই ভালর দিকে যাইতেছে। আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। হঠাৎ একদিন তার আসিল "Shami succeeded last night Rabindra Babu reaches Bolepur this midnight."

এই অদ্ভুত তারের অর্থ আমরা কেউ স্থির করিতে পারিলাম না। শেষকালে যেখান হইতে তার পাওয়া গিয়াছিল সেই বোলপুর স্টেশনে গেলাম। তাঁরা বলিলেন প্রথমে মনে হইয়াছিল "Succumbed" কিন্তু তারপরে বুঝিলাম "Succeeded"। বিধাতাপুরুষ বোধ হয় তখন হাসিতে-ছিলেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিপেন্দ্রবাবু বলিলেন "পু—বাবু গাড়ি নিয়ে বোলপুর যাবেন রবিকা এখানে আসেন ভাল—হলে গাড়ি নিয়ে ফিরে আসবেন। তিনি শমীকে নিয়ে কলিকাতায় চলে যাবেন।" পরদিন ভোরে উঠেই আমরা দ্বি-বাবুর কাছে হাজির। তিনি বলিলেন গুরুদেবকে গাড়িতে একা এবং গম্ভীর দেখেই আমি সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পারলুম। আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করিনি। আমাকে কেবল এইটুকু বল্লেন, "কাউকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বারণ করো।" কাজেই আমরা সেদিন কেউ আর তাঁর বাড়ির দিকে গেলাম না। পরেরদিন সকালে দেখি তিনি নিজেই শালবিথীকার তলা দিয়া ধীরে ধীরে আশ্রমের দিকে আসিতেছেন। আমরা গিয়া তাঁকে প্রণাম করিলাম। তিনি ইস্কুলের সম্বন্ধে নানারকম খোঁজ-খবর লইতে লাগিলেন মাঝে মাঝে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সঙ্গে হাস্য পরিহাসও করিলেন। আমাদেরও মনটা একটু হাল্কা হইল। বুঝিলাম গীতা কাকে বলেছেন "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্ন-মনা!" এর কয়েকদিন পরে একদিন আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি গিয়া দেখি দেহলীর বাড়ির নীচের বারন্দায় পূবের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। আমি যাইতে বলিলেন, "আমি ভাবছি শমীর কাপড়চোপড়গুলি তোমার ভুবনডাঙ্গার ছাত্রদের দিয়ে দেবো।" তারপর আমার ইস্কুল কেমন চলিতেছে খোঁজ নিলেন। তারপর দিন আফিস ঘরে কাপড়ের একটি পুটুলি আনিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি চোখের জল রাখিতে না পারিয়া পুটুলি লইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম। তাঁকে কিন্তু একদিনও বিচলিত হইতে দেখি নাই। অনেকদিন পরে শমীর মৃত্যু সম্বন্ধে গুরুদেব একটি ঘটনা বলিয়াছিলেন সেটা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শমী একটি শাদা খাতায় ডায়েরি লিখিত কতকগুলি শাদা পাতায় সে আগে থাকিতে তারিখ দিয়া রাখিয়াছিল। মৃত্যুর পর গুরুদেব সেই ডায়েরী উল্টাইতে উল্টাইতে দেখেন ঠিক যেদিন শমী মারা গেছে সেই দিন পর্যন্ত ডায়েরিতে তারিখ আছে তার পরে আর নাই। গুরুদেব বলিলেন "এর থেকে মনে হয় এমন একজন আছেন যাঁর কাছে আমাদের ভবিষ্যৎও অজানা নয়।"

শমীকে আমি অল্পদিনই দেখিয়াছি। তার স্বাস্থ্য দুর্বল ছিল বলিয়া সে তার পিতার কাছেই থাকিত। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও আশ্রমের নিয়ম কানুন যথাসাধ্য পালন করিত। অতিথিসেবা প্রভৃতি কোনো কোনো কাজ ছাত্রেরা নিজেরাই পালা করিয়া করিত। তার স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া এইরূপ কোনো কাজে তাকে বাদ দিলে সে দুঃখিত হইত আর এইরূপ কাজে ডাকিলে সে আনন্দের সঙ্গে যোগ দিত। ধূলাবালির পরে তার এক আশ্চর্য আকর্ষণ ছিল। আশ্রমের চারিদিকেই তখন শাদা বালির প্রাচুর্য ছিল। সেইরূপ জায়গা দেখিলেই সে তার উপর লুটাইয়া পড়িত। বসুন্ধরার প্রতি তার কবিপিতার ব্যাকুল আসক্তি কি এই বালকের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিত!

একদিনের ঘটনা মনে পড়ে। প্রাক্‌কুটিরের পূর্বদিকের ছোট ঘরটিতে গুরুদেব তাঁর "খেয়া" বইখানি নিয়া বসিয়াছেন। বড়ছেলেরা মেজেতে নিজ নিজ আসন পাতিয়া বসিয়াছে। গুরুদেব "কৃপণ" কবিতাটি পড়িয়া শুনাইলেন। কবিতাটিতে আছে এক ভিখারী ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া দেখে রাজাও তাঁর স্বর্ণরথে চড়িয়া বাহির হইয়াছেন। সে ভাবিল রাজার কাছ হইতে অনেক ধনরত্ন আজ ভিক্ষা পাইবে। কিন্তু রাজার রথ যখন তার কাছে আসিল সে দেখিল রাজা তার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন "আমায় কিছু দাও।" সে অপ্রস্তুত হইয়া ঝুলি হইতে একটি চালের কণা তুলিয়া রাজাকে দিল। হতাশমনে বাড়িতে আসিয়া ঝুলি উপুড় করিয়া দেখে তার মধ্যে একটি সোনার কণা রহিয়াছে। তখন সে বুঝিল রাজ-ভিখারীকে যে চালের কণা দিয়াছে তাই সোনার কণা হইয়া তার কাছে ফিরিয়াছে। তখন সে এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল "তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে।" কবিতাটি পড়ার পর গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী বুঝলে বল দেখি?" কোন ছেলে ওঠে না দেখিয়া কবি নাম ধরিয়া জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন। শমী সামনে বসিয়াছিল। কবি তাকে ধরিলেন। সে স্বভাবত লাজুক ছিল —মুখ খুলিতে চায় না। গুরুদেব বলিলেন "সামনে এসে বসেছ কিছু না বললে ত হবে না।" শেষকালে দাঁড়াইয়া কি একটা বলিয়া সে বসিয়া পড়িল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী একটি ছেলে বলিল, "দেশের কাছে আমরা যখন কিছু চাই তখন দেশ বলেন, আমাকে কিছু দাও। দেশকে আমরা যা দি তাই বহুগুণিত হয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসে।" শেষকালে গুরুদেব বুঝাইয়া দিলেন 'ভাল কবিতার' একটি লক্ষণ এই যে তার নানা রকম

(শেষাংশ ৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমৃণালকান্তি বসু, এম-এ, বি এল

এই প্রবন্ধের "সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ" নামকরণ শুনে কেহ কেহ হয়ত' চোখ কপালে তুলে বলবেন, রবীন্দ্রনাথ আবার সাংবাদিক হলেন কবে? তিনি তো কবি ও সাহিত্যিক। হয়ত' ব'লবেন প্রবন্ধ লেখক নিজে সাংবাদিক বলে রবীন্দ্রনাথকে দলে ভিড়িয়ে কিছু আত্মপ্রসাদ-লাভ করবার চেষ্টায় আছেন। আমি কিন্তু এই প্রবন্ধেই প্রমাণ ক'রে দেব যে, রবীন্দ্রনাথ যে শুধু সাংবাদিক ছিলেন, তাই নয়, সংবাদ সাহিত্যেরও তিনি অন্যতম স্রষ্টা ও পোষ্টা। সাংবাদিকের সংজ্ঞা কি? অভিধানে লেখে যে, সাংবাদিক হয় সংবাদদাতা, না হয় সংবাদ ও সাময়িক পত্র সম্পাদক; অগত্যা নৈয়ায়িক। রবীন্দ্রনাথ অনেক সংবাদই আমাদের দিয়ে গেছেন, ন্যায়ের কূট তর্ক'ও অনেক শুনিয়ে গেছেন, অধিকন্তু তিনি সংবাদ ও সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ (বঙ্গাব্দ ১৩০৮--১৩১২ পর্যন্ত)। এ সম্বন্ধে এক মামলা আদালতে চ'লেছে। বিচারাধীন মোকর্দমার টিকাটিপ্পনী নিষেধ, অতএব সেই প্রচেষ্টা থেকে বিরত রইলাম। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ও কয়েক বৎসর তৎকর্তৃক সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ (ইং ১৮৯৮-৯৯ খৃস্টাব্দে)। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে কেদরানাথ দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত 'ভাণ্ডার' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের কার্যভারও রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন। কিছু দিন তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন।

তবেই দেখুন, সাময়িক পত্রের ঘোষিত সম্পাদক হিসাবেও, রবীন্দ্রনাথ সাংবাদিক ছিলেন। শুধু পত্র-সম্পাদক হিসাবেই যে তিনি সাংবাদিক ছিলেন, তা নয়, বহু সাময়িক পত্রেরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদিত 'ভারতী'তে প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রধান লেখক ছিলেন। প্রতি মাসে তাঁর নিজের লেখাতেই পত্রিকার প্রায় অর্ধেক বোঝাই হ'ত। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' ও অন্যান্য অনেক কবিতা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হ'য়েছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্যের' উপর শ্লেষাত্মক সমালোচনা ক'রে 'ভারতী'তে কবি এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। "কাঁদেন রাঘব বাঞ্ছা আঁধার কুটিরে নীরবে"—এই বাক্য শ্লেষাত্মক বা Parody ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কাঁদেন রাঘব বাঞ্ছা গামছা আনছে কেটা?' সাংবাদিকের শাণিত অস্ত্র বিদ্রূপে ও শ্লেষে কবির দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

উপন্যাস, বড়গল্প ও কবিতা ছাড়া অনেক সাময়িক ব্যাপার নিয়েও রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে প্রবন্ধ লিখতেন। 'ভারতী'তে প্রকাশিত গল্প, কবিতা, সমালোচনা প্রভৃতির উল্লেখ এখানে ক'রলাম না। তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' ও 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থ 'ভারতী'তেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দে 'বালক' নামে শিশুদের একখানি মাসিক পত্রিকার কার্যভার কবি গ্রহণ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী এই পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। বিস্তর সাময়িক প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও রস-চিত্র তাঁর লেখনীমুখে নির্গত হ'য়ে 'বালকে'র কলেবর বৃদ্ধি কোরতো। ১৮৯০ খৃস্টাব্দে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। প্রতি মাসে এই পত্রিকাখানির অর্ধেকের বেশী তিনি একাই পূর্ণ ক'রতেন। এই সময়ে অসংখ্য ছোট গল্প, সাময়িক প্রবন্ধ, সমালোচনা, রাজনৈতিক[illegible]জানিক প্রবন্ধ অফুরন্ত প্রবাহে তাঁর লেখনী থেকে নির্গত হ[illegible] সাধনা'তে তাঁর 'ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী' নিয়মিত

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও নিয়মিত লেখক ছিলেন, তাই নয়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় তিনি 'হিতবাদী' নামক বাঙলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সাপ্তাহিক পত্রে তাঁর বিস্তর সাময়িক প্রবন্ধ ও সমালোচনা প্রকাশিত হ'ত। তাঁর অসংখ্য গল্প, কবিতা প্রভৃতির উল্লেখ এখানে করলাম না, কারণ সেগুলো সাংবাদিক সাহিত্যের গণ্ডীর বাইরে।

কোথায় যেন পড়েছি মনে নাই, একজন বলেছেন, মসীযুদ্ধে যিনি নিপুণ তিনিই প্রকৃত সাংবাদিক। রবীন্দ্রনাথের, মসীযুদ্ধে অসাধারণ নিপুণতা ছিল। তাঁর সংখ্যাতীত প্রবন্ধ থেকে এই নিপুণতার প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকরা কোন না কোন সময়ে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুরধার লেখনীর আঘাত সহ্য ক'রেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'নবজীবন' ও 'প্রচারে' হিন্দু ধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে এই সকল প্রবন্ধের প্রতিবাদ ক'রে লেখনী চালনা ক'রতে থাকেন। এই বাদ-প্রতিবাদ কিছুদিন ধ'রে চলে। পরে বঙ্কিমচন্দ্র কবির প্রশংসা ক'রে একখানি পত্রলেখেন এবং এই বিতর্কের অবসান হয়। চন্দ্রনাথ বসু একবার, ৫২ বছর আগে, বৌবাজার অক্রূর দত্ত লেনের সাবিত্রী লাইব্রেরীর এক অধিবেশনে "হিন্দু বিবাহ" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ, বৌবাজার স্ট্রীটের বিজ্ঞান মন্দিরের এক সভায় ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন। চন্দ্রনাথবাবু বহু শাস্ত্রতত্ত্ব আলোচনা ক'রে বাল্য-বিবাহের পোষকতা করেছিলেন। তিনি বলেন, হিন্দু বিবাহের সম্বন্ধ ইহ-কাল ও পরকালব্যাপী এবং হিন্দু স্ত্রীর মর্যাদা অসীম। প্রতিবাদের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'অতিরিক্ত শাস্ত্রালোচনা ক'রে চন্দ্রনাথবাবু অপচার অর্থাৎ অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হ'য়েছেন। তাই তিনি হয়কে নয় করবার প্রয়াস পেয়েছেন। হিন্দু বিবাহের সম্বন্ধ ইহ-কাল ও পরকালব্যাপী, চন্দ্রনাথবাবুর এই যুক্তি অশাস্ত্রীয়। শাস্ত্রেই আছে, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। অর্থাৎ, হিন্দুর বিবাহ কেবলমাত্র পুত্র লাভের জন্য। পরকালের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই।' রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন, 'হিন্দু স্ত্রীর অসীম মর্য্যাদা নিয়ে চন্দ্রনাথবাবু যে গর্ব ক'রেছেন, তা' ভ্রান্ত। হিন্দু স্ত্রীর মর্য্যাদা [illegible]

যদি কিছু থাকতো তা হ'লে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মপত্নী দ্রৌপদীকে কখনও দ্যুতে বিক্রয় ক'রতে পারতেন না।' চন্দ্রনাথবাবু রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদের উত্তর দেন, গরাণহাটা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর আহূত সুবৃহৎ এক জনসভায়। প্রসিদ্ধ সাহিত্যরথীগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। সেই দীর্ঘ প্রবন্ধের আলোচনা ক'রবার ক্ষেত্র এ নয়। চন্দ্রনাথবাবু বলেন, রবীন্দ্রনাথ একটি শ্লোকের বারবার কান ধরে টেনেও তার মাথাটিকে আনতে পারলেন না। ইহাই বিভ্রাট। তিনি বলেছেন, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। শাস্ত্রকর তার পরই নির্দেশ দিচ্ছেন—'পুত্রে পিন্ড প্রয়োজনম্।' আর এই পিন্ড ব্যাপার বিশ্লেষণ ক'রলেই ইহকাল ও পরকাল এসে পড়ে। যুধিষ্ঠিরের নজির খাটে না। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে ধর্মপুত্রের মতি-বুদ্ধি তখন আচ্ছন্ন হোয়ে গেছে। তিনি তখন আত্মকর্তৃত্বহীন, আত্মহারা। যেমন সাহেবেরা মেম সাহেবদের মর্যাদা দেন ব'লে, কোনো সাহেব মেমের কখনও অমর্যাদা করেন না বলা যায় না, যুধিষ্ঠিরের একমাত্র কার্য দ্বারা হিন্দু সমাজের হিন্দু স্ত্রীর মর্যাদার পরিমাপ হোতে পারে না'। এই বিতর্কের দিনকতক পরে রবীন্দ্রনাথ একদিন পন্ডিতবর হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সঙ্গে চন্দ্রনাথবাবুর বাড়িতে গেলেন। চন্দ্রনাথের দুই হাতে ধ'রে তিনি সুমধুর কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন :

'আমার মাথা নত ক'রে
দাও হে সখা
তোমারই চরণ ধুলোর তলে।'

দুইটি হৃদয় এক হ'য়ে গেল, দ্বন্দ্বেরও সমাধান হোলো।

রবীন্দ্রনাথের মসীযুদ্ধের অবসান এইভাবেই হ'ত। তার তিক্ততা শেষে কিছুই থাকত না।

রবীন্দ্রনাথ যে শুধু বড়র সঙ্গে লড়াই ক'রতেন, তা' নয়, ক্ষেত্র বিশেষে তিনি ছোটকেও ছাড়তেন না। ১৯২২ কি ২৩ সালে মনে নেই, আমি তখন 'বিজলী'র সম্পাদক। জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করি। এই সমস্যাটি তখন প্রবল হ'য়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ মন খুলে অনেক কথা বলে গেলেন। তাঁর কথাগুলো যে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হবে, তা তিনি ভাবেন নাই, আমারও তখন সে রকম কোন মতলব ছিল না। কিন্তু বাড়ি এসে ভাবলাম, রবীন্দ্রনাথের মতামত 'বিজলী'তে ছাপালে মন্দ হয় না। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফা প্রবন্ধে আমার স্বাক্ষরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই আলোচনার কথা প্রকাশ করা হয়। এই তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথের মতবাদ নিয়ে সংবাদপত্রে ও রাজনৈতিক মহলে তুমুল বিতর্ক চ'লতে থাকে। রামমোহন লাইব্রেরীতে আহূত বৃহৎ সভায় আমার এই তিনটি প্রবন্ধের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'মৃণালবাবুর হাতে তিন দফা ঘা খেয়ে আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। আমি ব'লতে পারি না যে, ঐ কথাগুলো আমি বলি নাই, সবই বলেছি, কিন্তু বুড়ো আঙুলের জায়গায় কড়ে আঙুল এসেছে আর কড়ে আঙুলের জায়গায় বুড়ো আঙুল এসেছে।' তাঁর এই গৌরচন্দ্রিকার উত্তরে 'বিজলী'তে আমি লিখি যে, রবীন্দ্রনাথের উক্তি আমি রিপোর্টার হিসাবে লিখি নাই, আমার মনে তাঁর কথাগুলো যে-ভাবে ছাপ দিয়েছিল, তাই ব্যক্ত করেছি মাত্র। এতে আঙুলের অদল-বদল হওয়া অসম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে সমসাময়িক সামাজিক ব্যাপার নিয়ে লেখনী চালনা ক'রতেন তা নয়, রাষ্ট্রিক ব্যাপারেও তাঁর সাময়িক প্রবন্ধের দান সংখ্যায় ও গরিমায় অতুলনীয়। 'ভারতী', 'সাধনা', "বালক", "সঞ্জীবনী", "হিতবাদী", "বঙ্গদর্শন", "ভান্ডার", "তত্ত্ববোধিনী" এবং সর্বশেষ, বোধ হয় সর্বপ্রধান (last though not the Least) "প্রবাসী"তে তাঁর অসংখ্য রাষ্ট্রিক সাময়িক প্রবন্ধ [illegible] হ'য়েছে। সাময়িক বলেই সেগুলি সংগ্রহীত হ'য়ে পুস্তকে নিবদ্ধ হয়নি। কিন্তু তখনকার দিনের পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত প্রবন্ধে উপভোগ ও শিক্ষার বস্তু বিস্তর পেয়েছিলেন। সংবাদ সাহিত্য গোলাপের মতই ফুটে ওঠে আবার গোলাপের মতই শুকিয়ে যায়। সাংবাদিক দিনেকের মত মনোহরণ করেন, পরের দিন তাঁর লেখার স্মৃতি লুপ্ত হ'য়ে যায়। সাংবাদিকের এই ভাগ্যহীনতা রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ ক'রতে পারে নাই, কারণ তিনি সংবাদ সাহিত্যের উপরই তাঁর প্রতিষ্ঠা রেখে যান নাই, তিনি যা রেখে গেলেন তা চিরন্তন, বিস্মৃত হ'বার নয়। দেশবাসী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকেই চেনেন, সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথকে চেনেন না। এই না চেনার মধ্যে অবশ্য অপরাধের কিছু নাই—তবুও কবির পূর্ণাঙ্গ জীবনের বিচার ক'রতে হ'লে আমরা তাঁর সংবাদ সাহিত্যের দিকটা একেবারে বাদ দিতে পারি না। তাঁর সাংবাদিক রচনাবলী ও অসংখ্য সাময়িক প্রবন্ধের সমাদর আজ আর নেই। সেই সব রচনা আজ গবেষণার বিষয় হোয়ে দাঁড়িয়েছে। এইসব রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ ক'রলে আমরা কবির মানসিক গঠন এবং তার ক্রমবিকাশের একটা বিশিষ্ট ধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারি।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রাষ্ট্রীক সাময়িক প্রবন্ধের উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারলাম না। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ক'লকাতার চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্যোগে আহূত এক সভায় রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামক একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। এর তিন মাস পরে কবি 'সাধনা'তে আরও একটি রাষ্ট্রিক প্রবন্ধ লিখেন তার নাম, 'ইংরেজের আতঙ্ক'। 'সাধনায় প্রকাশিত 'সুবিচারের অধিকার', প্রবন্ধটি অনেকের মনে প'ড়বে। এই সময়ে রচিত তাঁর 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির ভেতর আমরা দেখতে পাই, কবি সহজ আরামের ওপর বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন, তিনি কর্মময় বাস্তব জীবন চান, মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দেবার তাঁর প্রবল ইচ্ছা। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বন ক'রে 'সাধনায় তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'সাধনা'র প্রকাশ বন্ধ হ'য়ে যায়। এর পর বছর তিনেক কবি কোন পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না; কিন্তু তাঁর লেখনী সমানেই চ'লছিল। এর পর ১৮৯৮-৯৯ খৃস্টাব্দে তিনি 'ভারতী'র সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন, সে কথা উল্লেখ ক'রেছি। 'সাধনা'র মতো 'ভারতী'তেও রবীন্দ্রনাথ বিস্তর রাষ্ট্রিক প্রবন্ধ লেখেন। বিশেষ ক'রে বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে ভারত সরকার যে ব্যবহার ক'রেছিলেন, কবি তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। নূতন রাজদ্রোহ আইনের প্রতিবাদ জানিয়ে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে কলকাতার টাউন হলে বিরাট জনসভায় 'কণ্ঠরোধ' নামে একটা প্রবন্ধ পাঠ ক'রেছিলেন। তাঁর মুখোপাধ্যায় বনাম বন্দ্যোপাধ্যায় শীর্ষক প্রবন্ধ রচিত হ'য়েছিল রাজা প্যারী মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে। প্যারীমোহন কংগ্রেসের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। আর সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতা। রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথের গণতান্ত্রিক আদর্শের সমর্থক ছিলেন। একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রাজকর্মচারীর স্মৃতি রক্ষার জন্য কে কত টাকা দিতে পারে, এই নিয়ে আমাদের দেশের ভূম্যাধিকারী ধনীদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা সুরু হ'য়ে যায়। এই দাস মনোবৃত্তির সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে কবির 'রাজটীকা' নামক প্রবন্ধে।

এর পরে ছয় বছর আবার রবীন্দ্রনাথের সাংবাদিক জীবনে ছেদ পড়ে। তারপর ১৯০১ খৃস্টাব্দে তাঁর বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মাসিক 'বঙ্গদর্শন' পুনরুজ্জীবিত করেন। এই নবপর্যায় "বঙ্গ দর্শনে"র সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, সেই কথা আগেই উল্লেখ ক'রেছি। অক্ষয়কুমার মৈত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকেরা এই "বঙ্গ দর্শনে" নিয়মিত [illegible]ন। বুড়োর

যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যে নগ্ন রূপ দেখা গিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে কবি একটি তীব্র প্রবন্ধ লেখেন। ১৯০২ খৃস্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে লর্ড কার্জন বিনাকারণে প্রাচ্য দেশীয় লোকদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এতে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথও এই আন্দোলনে যোগদান করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়োরদের সম্পর্কে ইংরেজদের মিথ্যা বর্ণনার প্রমাণ স্বরূপ Herbert spencerএর Facts and Comments থেকে বহু অংশ উদ্ধৃত ক'রে কবি বড়লাটের উক্তির যথোপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন। 'বঙ্গ দর্শনে' ক্রমশ প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস 'নৌকা ডুবি'র কিস্তি মাসের পর মাস দিয়ে যাচ্ছিলেন; আর তা' ছাড়াও ঐ সময়ে "রাজকুটুম্ব", "ঘুষোঘুষি", "ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' প্রভৃতি বহু রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা ক'রেছিলেন। ১৯০৪ খৃস্টাব্দে কবি "বঙ্গ দর্শনে" ইংরেজদের অনুকরণে উদ্বুদ্ধ স্বদেশ প্রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এর কিছুদিন পরে চৈতন্য গ্রন্থাগার সমিতির উদ্যোগে 'মিনার্ভা' থিয়েটারে অনুষ্ঠিত এক সভায় কবি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধ "স্বদেশী সমাজ" পাঠ করেন। বহু সাময়িক পত্রে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে কেদারনাথ দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত "ভাণ্ডার" নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদকত্ব কবি গ্রহণ করেন। 'ভাণ্ডারে' কবি সমসাময়িক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বহু সমস্যা নিয়ে আলোচনা ক'রেছিলেন। এই মাসিক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "রাজা প্রজা" নামক প্রবন্ধটি অনেকের মনে প'ড়বে। এতে তিনি ভারতবর্ষে বৈদেশিক শক্তির অর্থনৈতিক শোষণের বিষয় সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ ক'রেছিলেন।

এ যেন সেদিনকার কথা—স্বদেশী আন্দোলনের সময় কবির লিখিত বহু কবিতা ও সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধের প্রবাহ। রবীন্দ্রনাথের কবি যশ তাঁর অন্যদিককার অবদান ক্ষুণ্ণ ক'রেছে; নচেৎ তাঁর সাংবাদিক প্রবন্ধসমূহ সংখ্যায় ও গরিমায় তাঁকে সাংবাদিক জগতের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রতো। শুধু কেবল গভর্নমেন্টকেই নয়, দেশবাসীকে উদ্দেশ ক'রেও তিনি বহু রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা ক'রেছিলেন। 'দেশ নায়ক' নামক প্রবন্ধে বাঙলার নরম ও গরম দলের মতভেদের নিন্দা ক'রে সকলকে একজন মাত্র নেতার অধীনে মিলিত হ'য়ে সমবেতভাবে স্বদেশ সেবা করবার জন্য তিনি আবেদন জানান।

'প্রবাসী'র প্রায় জন্মকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রধান লেখক ছিলেন। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত প্রবাসীতে তাঁর "ব্যাধি ও প্রতিকার" শীর্ষক প্রবন্ধের তুমুল বিরুদ্ধ সমালোচনা হ'য়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, তৎকালে আমাদের দেশে প্রচলিত রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যে মতভেদ আছে সেকথা উল্লেখ করেন। এই প্রবন্ধের সমালোচনা ক'রেছিলেন বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের মধ্যে কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও গুণগ্রাহী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সাময়িক প্রবন্ধের তালিকা দেওয়াও দুঃসাধ্য। মাত্র সেগুলি একত্র ক'রে প্রকাশ ক'রলে একটি বিরাট গ্রন্থ হবে।

বীরবল অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্রের' সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত। প্রমথ চৌধুরী এই পত্রিকার মারফৎ কথ্য ভাষাকে সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত করবার জন্য ওকালতি করেন। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে একমত হন এবং 'সবুজপত্রে' কথিত ভাষায় রচনা সুরু করেন। সমাজের ভুয়ো আদর্শবাদ ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে 'সবুজপত্র' অভিযান চালিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন উদারনৈতিক মতাবলম্বী ছিলেন ব'লে এই পত্রিকাখানির আদর্শের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তিনি মাসের পর মাস "সবুজপত্রে" গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখতেন। এই পত্রিকাখানিতে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' নামে একটি ছোট গল্প বের হয়। বাঙলাদেশে তখন নারী জাগরণ সুরু হ'য়েছে। একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, শিক্ষিতা, স্বাধীন চিন্তাশীলা নারীর সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংঘর্ষ কি ক'রে বাধে, সেইটাই হ'ল এই গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই গল্পটা নিয়ে খুব আলোচনা হোয়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত "নারায়ণ" পত্রিকায় এই গল্পটিকে ব্যঙ্গ ক'রে বিপিনচন্দ্র পাল "মৃণালের পত্র" বলে একটি গল্প লিখেছিলেন। কবি তাঁর প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। 'সবুজপত্রের', 'বাস্তব' আর 'লোকহিত' এই দুইটি প্রবন্ধে। ১৯১৬ খৃস্টাব্দে তিনি "ছাত্র শাসন" নামে "সবুজপত্রে" একটি প্রবন্ধ লেখেন। এতে ছাত্র সমাজকে দমন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানান। এর কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্সী কলেজের ওটেন সাহেবকে জনকতক ছাত্র প্রহার করে। এই ব্যাপারে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সংস্রবের কথা অনেকের মনে পড়বে। *

*রবি-বাসরের অধিবেশনে পঠিত।

রবীন্দ্রস্মৃতি

(৪৬ পৃষ্ঠার পর)

অর্থ হতে পারে। কেবল দেশ নয়—জ্ঞান বল ধর্ম বল জীবনে যে কোন বড় জিনিস আমরা চাই তাই আমাদের বলে "আমায় কিছু দাও।" আমরা তাকে যা দি তাই বহুগুণিত হয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসে।"

ত্যাগ ও নিরহংকারের একটি দৃষ্টান্ত

এই সময়কার (১৯০৭) আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এবারকার মত শেষ করি। আমি যখন আশ্রমে যোগ দি তখন অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় আশ্রম হইতে ২৫, কি ৩০, টাকা বৃত্তি পাইতেন। তাঁর দুই ভাই তখন আশ্রমে থাকিয়া পড়িত। তখন নিয়ম ছিল আশ্রমের অধ্যাপকেরা একজন আত্মীয়কে বিনাখরচে আশ্রমে রাখিয়া পড়াইতে পারিতেন। সেই অনুসারে অজিতবাবুর মেজোভাই সুজিত আশ্রমে বিনা খরচে পড়িত। ছোটভাই সুশীলকে আশ্রমে আনার পর হইতে অজিতবাবুর স্বল্প বেতন হইতে সুশীলের খরচ পনর টাকা কাটিয়া লওয়া হইত। বাকী দশ পনরো টাকায় তিন ভাইয়ের কাপড়, জামা, হাতখরচ ও বিধবা মার খরচ চলিত। গুরুদেবের কিন্তু ধারণা ছিল দুই ভাইই আশ্রমে বিনা বেতনে পড়িতেছে। কিছুকাল বাদে গুরুদেব একদিন হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিয়া দেখেন এই ব্যাপার চলিতেছে। সেইদিন হইতে ম্যানেজার ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়কে সুশীলের বেতন নিতে বারণ করেন এবং অজিতবাবুর অনুপস্থিতিতে আমাদের কাছে বলেন "এতদিন আমার একটি অহংকার ছিল আশ্রমের জন্য আমিই সবচেয়ে বেশি ত্যাগ করেছি, কিন্তু আজ আমার সে অহংকার চূর্ণ হল—আজ অজিতের কাছে আমার হার হল!"

রবীন্দ্রনাথের গান রচনা

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ কিভাবে দিন যাপন করতেন, কি খেতেন, কখন উঠতেন, কখন ঘুমোতেন, কখন লিখতেন, কি দিয়ে ছবি আঁকতেন, এই রকমের কত প্রশ্ন শান্তিনিকেতনবাসীদের শুনতে হয় এবং আগ্রহ মেটাতে হয়। এর ভিতরে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিও আছেন, আবার অশ্রদ্ধা পোষণ করেন তাও দেখেছি। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখেছি, বিশেষত বাঙলা দেশে যে এত নিকটে থেকেও তাঁকে না জানার অজ্ঞতায় তারা লজ্জিত নয়।

গানের ক্ষেত্রেও অজ্ঞতা প্রচুর। অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথের গানে সুর দেন অপরে। দিনেন্দ্রনাথকে দেশের একদল এখনো জানেন রবীন্দ্রনাথের গানের সুরকার হিসাবে। গান তাঁরা শোনেন, কিন্তু গানের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন না। কিন্তু একদল আছেন, যাঁরা বাইরে থেকে রবীন্দ্রনাথের গান কেবল ভালবাসেন তা নয়, তাঁরা তার আরও ভিতরে প্রবেশ করতে চান। তাঁদের মধ্যে অনেকের মনে এই আগ্রহ দেখেছি যে, কিভাবে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করতেন, সে খবরও তাঁরা রাখতে চান। এমনকি, গান রচনার সময় কি রকমে সুর ভাঁজতেন, সে প্রশ্নও অনেকে করেছেন। তবে অনেকেই আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে, কোন্ গান কি উপলক্ষে, কি ভেবে রচনা করেছেন, এ বিষয়ে যথাসম্ভব তথ্য প্রকাশ করতে।

রবীন্দ্রনাথ—বৈশাখ, ১৯৪০

রবীন্দ্রনাথের গানের বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধে যে সব আলোচনা করেছি, তার থেকেও আশা করি, তাঁর সংগীত রচনার মোটামুটি একটা আভাষ সকলে পাবেন। কিন্তু কোন্ গান কি ভেবে লিখেছেন, এই প্রশ্নের উত্তর সব গানের বেলা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন না কোন ভাবে বাইরের বাস্তব জগত তাঁর অন্তর-জগতে ধাক্কা মেরেছে আগে, তবে খুলেছে তাঁর গানের উৎস। বিভিন্ন ঋতু তাঁর মনে যেভাবে আনন্দ দিয়েছে, সেই আনন্দেই ঋতু-সংগীতগুলি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু 'নটরাজ' গীতাভিনয়ে পাবো গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ঋতুর গান। এর অর্ধেকের বেশী গান তিনি রচনা করেছেন গীতাভিনয়ের প্রয়োজনে, প্রত্যেক ঋতুকে অভিনয়ে বাঁধবার ইচ্ছায়। এমনও দেখেছি, একদিনে পাঁচ-ছয়টি গানও রচনা করেছেন অভিনয়ের তাড়ায়। নাচের মহলা দিতে গিয়ে হয়তো মনে হয়েছে দুটো নাচের মাঝে একটু অবসর দরকার, তখনি ছোট একটি গান লিখে দিলেন। নটরাজের সব নমস্কারের গান প্রায় ঐ জন্যে তৈরী। 'নবীন' নাটকের অনেক গানও এইভাবে রচনা। নৃত্য নাট্যেও দেখেছি অভিনয়ের জন্য বা নাচের সুবিধার জন্যে অনেক গান রচনা করেছেন। বর্ষামঙ্গল বা বসন্তোৎসবে তাঁকে জানানো হয়েছে যে, আমাদের কি রকমের গান প্রয়োজন। অমনি তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়ে গান রচনা করে দিয়েছেন। বহু নাটকের বেলায়ও তাই ঘটেছে। তবে তিনি অনন্যসাধারণ কবি, সেই কারণে বাইরের প্রয়োজনে গান রচনায় হাত দিলেও গানগুলি সেই সময়ের প্রভাবকে অতিক্রম করে সব কালের উপযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে। গানের পিছনে যে ইতিহাস আছে, তা না জেনেও পরবর্তী যুগের শ্রোতার কাছে সে গান সময়ের অনুপযোগী মনে হবে না। রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের রচনা থেকে সুরু করে এই ভাবটি শেষ জীবন পর্যন্ত ঠিক ছিল এবং ধীরে ধীরে অতি পরিষ্কারভাবে একটি সুন্দর পরিণতির পথে এগিয়ে গিয়েছিল।
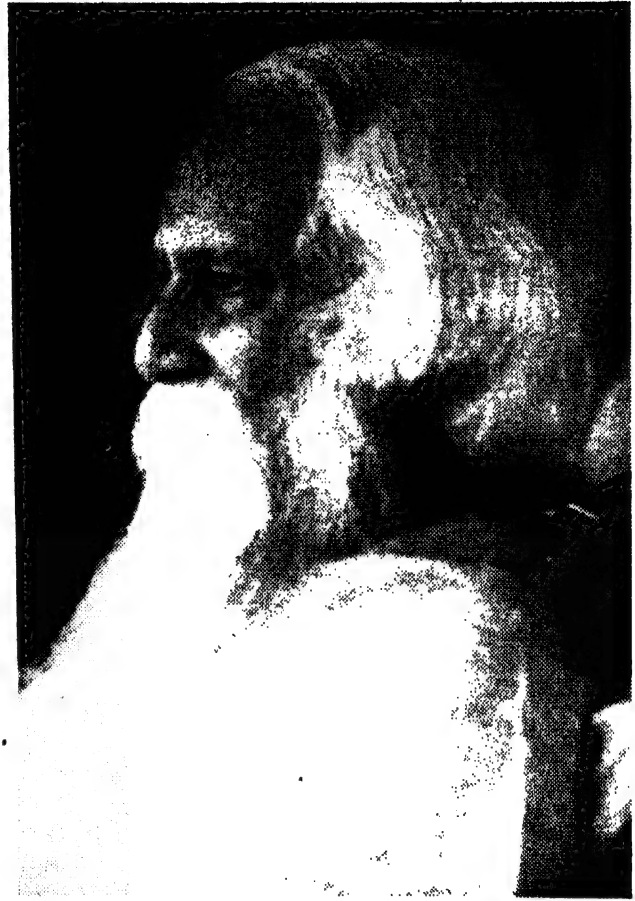
এখানে যে সব গানের কথা উল্লেখ করতে যাচ্ছি, সে গানগুলি আমার উপরের কথার তাৎপর্য আরো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবে। আমরা দেখতে পাবো কি রকমের বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করে গান-গুলি রচিত হয়েও সেই ঘটনা ও সেই কালের অতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৩৩৬ সালে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে নূতন করে যখন ভারতের আইন অমান্য আন্দোলন চলেছিল, অনেকেরই হয়তো মনে থাকতে পারে, সেই বৎসর ভাদ্র মাসে বাঙলার বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন দাস লাহোরে জেলখানার দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদস্বরূপ অনশনব্রত অবলম্বন করেন। প্রতিজ্ঞা করেন, যতদিন না সে ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়, ততদিন তিনি কিছুতেই জেলের কোন খাদ্য গ্রহণ করবেন না। যতীন দাসের এই মৃত্যুপণের সংকল্পে ভারতবাসীর চিত্তে খুব আলোড়ন এনেছিল। দিনের পর দিন একটু একটু করে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই রকম একটা বেদনাদায়ক আবহাওয়ার মধ্যে 'তপতী' লেখা হয়েছিল এবং আশ্রমবাসীদের নিয়ে তার মহলা দিচ্ছিলেন। যতীন দাসের প্রায় দুই মাস অনশনের পরে মৃত্যু নিশ্চয় জেনেও কর্তৃপক্ষ তাঁদের জেদ একটুও বদলান নি। শেষ পর্যন্ত

যতীন দাস পরাধীন দেশের কারাগারের দুঃখ থেকে চিরকালের মত মুক্তি পাবার আশায় ১লা আশ্বিন দেহত্যাগ করেন। এই সংবাদ যখন শান্তিনিকেতনে এসে পেঁছিলো, সেইদিন রবীন্দ্রনাথ মনে যে বেদনা পেয়েছিলেন তা ভুলবার নয়। সন্ধ্যায় 'তপতী' অভিনয়ের মহলা বন্ধ না রাখার কথা হলো। কিন্তু বার বার তিনি তাঁর পাঠের খেই হারাতে লাগলেন, বহুবার চেষ্টা করেও কিছুতেই ঠিক রাখতে পারছিলেন না, অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে মহলা বন্ধ করে দিলেন। সেই রাত্রেই লিখলেন "সর্ব-খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ" গানটি। তপতী নাটকে এটিকে পরে জুড়ে দিলেন। এ গানটি যে তাঁর অন্তরের কি রকম তীব্র বেদনার ভিতর দিয়ে বেরিয়েছিল, আজ সে কথা হয়তো অনেকেই জানে না। সে কথাটি জানা থাকলে এ গানটি সকলের কাছে আরো সত্য হয়ে উঠবে।

১৩২৯ সালে কলকাতায় সেবার বিশ্বভারতীর তরফ থেকে দ্বিতীয়বার 'বর্ষামঙ্গলে'র আয়োজন হোলো. সেবার অনেক নূতন বর্ষার গান রচিত হয়েছিল। আমরা সব গানের দল কলকাতায় কিছু-দিন পূর্বেই জড়ো হয়েছি। খুব জোর মহলা চলেছিল, জোড়া-সাঁকোর বাড়ি সরগরম করে তুলেছিলাম। এর মধ্যে একদিন হঠাৎ ঠাণ্ডায় গুরুদেবের গলা গেল বসে, বর্ষামঙ্গলে তাঁর আবৃত্তি ইত্যাদি ছিল প্রধান আকর্ষণ, অথচ এই ভাঙা গলা নিয়ে মহা ভাবনায় পড়লেন। নানাপ্রকার ওষুধ পাঁচন নিজে খাচ্ছেন, আমাদেরও খাওয়াচ্ছেন, আমাদেরও গলা যাতে না ভাঙে। কিন্তু সেই ভাঙা গলায় একটি গান রচনা করে দিনেন্দ্রনাথ ও আমাদের সকলকে ডেকে শিখিয়ে দিলেন সন্ধ্যায় গাইবার জন্য। গানটি হোলো 'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে'।

১৩২৯ সালে প্রথম শান্তিনিকেতনে নলকূপের সাহায্যে জল সরবরাহের ইচ্ছায় একটি নলকূপ খননের কার্য সুরু হয়। সেই কার্য দ্রুত সম্পন্ন করার ইচ্ছায় অধিক রাত পর্যন্ত তার কাজ চলত। এবং অনেক সময় দেখেছি গ্রীষ্মের ছুটিতে শান্তিনিকেতনের অনেক অধ্যাপক মহাশয়রা এই কূপ খননের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। দিনের পর দিন কুলীদের মত জলে কাদায় কাজে সাহায্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে প্রায়ই দেখতাম সেইখানে, তাঁর উপস্থিতিতে সকলেই কর্মে একটা বড় প্রেরণা পেতেন। এই উৎসাহকে আরো বর্ধিত করার জন্য ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ "এস এস হে তৃষ্ণার জল" গানটি রচনা করলেন।

১৩৪০ সালে বোধ হয় ফাল্গুন মাসে, দ্বিতীয়বার যখন নলকূপের সাহায্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা কৃতকার্য হোলো, সেই সময় নলকূপের কার্যের দায়িত্ব যে বাঙালী ব্যবসায়ীটি গ্রহণ করে-ছিলেন, তাঁকে অভিনন্দিত করার ব্যবস্থা হয়। সেই সভার প্রায় দু ঘণ্টা পূর্বে নলকূপের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গান বেঁধে দিলেন —"হে আকাশবিহারী নীরদবাহন জল"।

১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ শেষবার কলকাতায় 'বর্ষামঙ্গলের' অনুষ্ঠান করেন। সেবার শান্তিনিকেতনে অনেকগুলি বর্ষার গান রচনা করেন। শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান সুন্দর হওয়ায় অনেকে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন কলিকাতাবাসীদের জন্যে সেখানে বর্ষামঙ্গল আয়োজন করতে। রবীন্দ্রনাথ সম্মত হয়ে আমাকে শান্তিনিকেতনের মহলার কাজ চালিয়ে যাবার দায়িত্ব দিয়ে তিনি কলিকাতায় চলে গেলেন কোন কাজে এবং সেখানে একদল গায়িকাকে সংগ্রহ করে তাঁদেরও গান শেখাতে লাগলেন। সেখানকার মেয়েদের গলা ছিল মিষ্টি, কিন্তু তাঁদের কণ্ঠস্বর ছিল অতি ক্ষীণ। প্রথম রাত্রিতে একক কণ্ঠের গান প্রেক্ষাগৃহের শেষ অবধি পেঁছলো না। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের মন খারাপ হয়ে পড়ে। রাত্রে বাড়ি ফিরে আমাকে খবর পাঠালেন, বললেন, "এত খাটুনি সব ব্যর্থ হোলো।" তার পরের কথাবার্তায় মনে হোলো তাঁর মনে ধারণা হয়েছে যে, এবারের গানগুলি রচনার দিক থেকে তেমন ভালো হয়নি, তাই শ্রোতারা তেমন উপভোগ করতে পারলো না। তাঁকে বোঝালাম,

গানের দোষ নয়, গাইয়েদের দোষে এমন হয়েছে। তা সত্ত্বেও বলতে লাগলেন "ঢিমা লয়ের টানা টানা সুরের গানই রচনা করেছি বেশী, জোরালো গানের প্রয়োজন আছে"। সেই রাত্রেই একটি গান রচনা করে, সকলকে ডেকে একসঙ্গে শিখিয়ে, তবে বিশ্রাম করতে গেলেন। গানটির প্রথম লাইন হোলো,—"থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ ঝিল্লি ঝনক ঝননন"। গানটির ভিতর দিয়ে তাঁর তখনকার মনের অবস্থাটা বেশ পরিষ্কার ফুটে বেরিয়েছে।

"মরণ সাগর পারে তোমরা অমর" গানটির কথা অনেকেই হয়তো শুনেছেন। এ গানটি শুনে মনে হবে সাধারণভাবে সব মহা-পুরুষদের কথা ভেবেই লিখেছিলাম। কিন্তু তা নয়, এটি রচনা রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষ্যে। এই গানটির কথা মনে না করতে পারলেই তিনি তাঁর দাদার মৃত্যুর পর লেখা গানটি কি, সেই কথাই বলতেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, "কে যায় অমৃতধামযাত্রী" ধর্মসংগীতটি রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিবসের কথা ভেবে লিখেছিলেন বহুদিন পূর্বে।

অনেকেরই ধারণা "ফাল্গুনী" নাটকের সব গানগুলি নাটকের কথা মনে করেই লিখেছিলেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। সেই ফাল্গুন মাসে ট্রেনে কোথাও গিয়েছিলেন, ট্রেনের সেই দ্রুতচলার গতি তাঁর মনে একটা বিশেষ আবেগের সৃষ্টি করে, সেই আবেগ থেকেই পেলাম দুটি গান, প্রথমটি হোলো "চলিগো চলিগো যাইগো চলে" দ্বিতীয়টি হোলো "ওগো নদী আপন বেগে পাগলপারা।" অথচ ফাল্গুনীতে এ-গান দুটি যেভাবে স্থান পেয়েছে যে, একথা ধরাই যাবে না।

১৩২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ সিন্ধু কাথিয়াবার ভ্রমণ শেষ করে যখন শান্তিনিকেতনে ফিরলেন, তখন সঙ্গে করে এনেছিলেন, কাথি-য়াবারের একটি চাষী পরিবারকে। তাদের একটি ১২।১৩ বৎসরের মেয়ে, দুই হাতে দুই জোড়া মন্দিরা নিয়ে বসে বসে খুব সুন্দর নাচতো। ইচ্ছা ছিল সেই নাচটি শান্তিনিকেতনের মেয়েদের মধ্যে প্রচার করা। আশ্রমবাসী সকলকে দেখাবার জন্যে চৈত্র মাসের শেষে আম্রকুঞ্জে মেয়েটির নাচের আসর বসে, এই নাচ দেখার পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে" গানটি।

প্রায় ষোল বৎসর পূর্বে, তখন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পালিতাকন্যা "নন্দিনী" অতি শিশু, সে রবীন্দ্রনাথের কাছে নানাপ্রকার গল্প শুনতে ভালোবাসতো এবং নিজেও আপন মনে শিশুসুলভ নানা-কথা রবীন্দ্রনাথকে শোনাতো। রবীন্দ্রনাথের কাছে সব সময় সব কথা স্পষ্ট হোতো না, কিন্তু খুব উপভোগ করতেন তার সেই বাক্যালাপ। সেই সময় তার কথা ভেবেই গান লিখেছিলেন, "অনেক কথা যাও যে বলে কোন কথা না বলি, তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।"

১৩৩৩ সালে, প্রবাসী পত্রিকার ছাব্বিশ বৎসর পূরণের আশীর্বাদস্বরূপে রবীন্দ্রনাথ একটি বড় কবিতা লিখেছিলেন। "পরবাসী চলে এসো ঘরে, অনুকূল সমীরণ ভরে" এই কবিতার প্রথম অংশ ও মধ্যের অংশটিকে আলাদাভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, কিছু কথার অদলবদল করে, দুটি গান তৈরী করেন। প্রথম গানটি হোলো ইমনকল্যাণ রাগে—"পরবাসী চলে এসো ঘরে", আর দ্বিতীয় অংশটিতে সুরযোজনা করলেন মিশ্র রামকেলীতে, তার প্রথম লাইন হোলো, "এসো প্রাণের উৎসবে দক্ষিণ বায়ুর বেণুরবে।"

দিনেন্দ্রনাথের একটি পোষা হরিণ হঠাৎ শান্তিনিকেতন থেকে পলায়ন করে এবং পরে দূরবর্তী এক গ্রামে, সাঁওতাল কর্তৃক নিহত হয়। এই সংবাদে দিনেন্দ্রনাথের পত্নী কমলা দেবী অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। সেই হরিণটির মৃত্যুকে লক্ষ্য করে ও কমলা দেবীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় গান রচনা করলেন, "সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে।"

চিত্র শিল্পী শ্রীযুক্ত অসিত হালদার মহাশয়ের একটি ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ গান বেঁধেছিলেন "একলা বসে একে একে

এবং তাঁর অগ্নিময়ী বীণা কোলে সরস্বতীর ছবিকে লক্ষ্য করেই "তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে" গানটির উদ্ভব।

"সমুখে শান্তি পারাবার" গানটির উদ্দেশ্য নিয়ে একটু আলোচনা করবার আছে। একথা আমরা জানি, এ গানটি তিনি "ডাক ঘরের" জন্যেই রচনা করেছিলেন। ১৩৪৬ সালে তিনি প্রায় তিন চার মাস ধরে এই নাটকটির মহড়া দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে বন্ধ থাকতো। পূজার ছুটির পর এ গানটি রচনা করেন। সেই সময় একদিন সকালে বলেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর আর বেশী দেরী নেই, এটি যদিও অমলের মৃত্যুর গান কিন্তু এ গানটি তাঁরও মৃত্যুতে আমরা কাজে লাগাতে পারবো। কারণ তাঁরও ত দিন শেষ হয়ে এলো। এই ঘটনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কখনও তাঁর মৃত্যুর বিষয় নিয়ে অন্তত আমার কাছে কোন কথার উল্লেখ করেন নি। তাই তাঁর জীবনের শেষ হয়ে আসছে শুনে মনে বিশেষ বেদনা বোধ করেছিলাম। এ বিষয় আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরে আলোচনাও করেছিলাম। কারণ আমার জানা ছিল "ডাক ঘর" নাটকটিও তাঁর নিজেরই মৃত্যুর কথা ভেবে লেখা।—এ বিষয়ে একটু পরিষ্কারভাবে বলা প্রয়োজন। ১৩২২ সালে পৌষ মাসে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসীদের সকলের কাছে তাঁর নাটিকার বিষয়ে ধারাবাহিক কতগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ৪ঠা পৌষের বক্তৃতার বিষয় ছিল "ডাক ঘর"। সেই বক্তৃতাগুলি আমার পিতৃদেব তাঁর ডাইরী খাতায় বক্তৃতাকালে লিখেছিলেন। এখানে তার থেকে খানিকটা তুলে দিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—""ডাক ঘর" যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল। তোমাদের ঋতু উৎসবের জন্যে লিখি নি। শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম। প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল, বাইরে, তোমাকে যাবার আগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে—সুদূর সমুদ্রে, সুদূর পর্বতের ইঙ্গিত। সেখানকার মানুষের সুখ দুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। সে সময় বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হোলো। রাত ২।৩টায় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল। আমার, পূর্বে দু' একটি বেদনা এসেছিল। আমার মনে হচ্ছিল, একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু। স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই ভাব। আমার মনে একটা আনন্দ জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যখন ডাকছেন তখন আমার দায় নেই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে, সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে "ডাক ঘরে" কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম। মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হোলো। মনের মধ্যে যা অব্যক্ত, অথচ চঞ্চল তাকে কোনও রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ভিতরের প্রেরণায় লিখলুম। এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য Lyric। এ আলঙ্কারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা। এটা বস্তুতঃ কি? এটা সেই সময়ে আমার মনের ভিতর যে অকারণ চাঞ্চল্য দূরের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, দূরের যাত্রায় যিনি দূর থেকে ডাকছেন; তাঁকে দৌড়ে গিয়ে ধরবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সেই দূরে যাওয়ার মধ্যে রমণীয়তা আছে। যাওয়ার মধ্যে একটা বেদনা আছে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা ততটা ছিল না। চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ তা আমাকে ডাক দিয়েছিল বহুদূরে সে অজানা রয়েছে, তার পরিচয়ের ভিতর দিয়ে সে অজানার ডাক, দূর সেখানে মুগ্ধ করেছে, যাত্রা সেখানে রমণীয়, বহু বিস্মৃত অপরিচিতের মধ্যে যে আনন্দ। সেই যখন অন্তরালে বাঁশী বাজিয়ে ডাক দিল, সে ভাবটি প্রকাশ করলুম। থাকব না থাকব না, যাব যাব, সবাই আনন্দে যাচ্ছে। সবাই ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে আর আমি কিন্তু [illegible] রইলুম। এই দুঃখকে, ব্যাকুলতাকে ব্যক্ত করতে হবে। পারে। এই বেদনা যদি কারুর মধ্যে থাকে তবে সে বুঝতে পারবে এর মর্মটা কী?"

"ডাক ঘর" রচনার এই হোলো প্রকৃত কারণ। এলোক থেকে সুদূর এক অপরিচিত লোকে যাবার প্রেরণাই তাঁকে শেষ জীবনে আবার "ডাক ঘর" অভিনয় করার উৎসাহ যোগায়। "ডাক ঘর" রচনার ভিতরের এই ব্যক্তিগত তথ্যটি তিনি প্রকাশ করেছেন শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত এক পত্রে। গত শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় এই পত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

যে বৎসর 'ডাকঘর' রচনা করেন, সেই বৎসরেরই আশ্বিন মাসে চিঠিটি লেখা:—

কল্যাণীয়াসু,

মা, আমি দূরদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার সেখানে অন্য কোনো প্রয়োজন নাই কেবল কিছুদিন থেকে আমার মন এই বলচে যে, যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব। এর পরে আর ত সময় হবে না। সমস্ত পৃথিবীর নদী গিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্ছে—আমার চারিদিকের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্য মন উৎসুক হয়ে পড়েছে। আমরা যেখানে দীর্ঘকাল থেকে কাজ করি সেখানে আমাদের কর্ম ও সংস্কারের আবর্জনা দিনে দিনে জমে উঠে চারিদিকে একটা বেড়া তৈরী করে তোলে। আমরা চিরজীবন আমাদের নিজের সেই বেড়ার মধ্যেই থাকি, জগতের মধ্যে থাকিনে। অন্তত মাঝে মাঝে সেই বেড়া ভেঙে বৃহৎ জগৎটাকে দেখে এলে বুঝতে পারি আমাদের জন্মভূমিটি কত বড়—বুঝতে পারি জেলখানাতেই আমাদের জন্ম নয়। তাই আমার সকলের চেয়ে বড় যাত্রার পূর্বে এই ছোট যাত্রা দিয়ে তার ভূমিকা করতে চাচ্ছি—এখন থেকে একটি একটি করে বেড়ি ভাঙতে হবে তারই আয়োজন। * * *

ইতি ২২শে আশ্বিন ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ বাইরে লেখার ভিতর দিয়ে এমনভাবে রূপ নিল যে, তখন আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এর কোন যোগ বলে ধরবার উপায় রইল না। এ নাটককে কখনও নিজের দেহের সঙ্গে যুক্ত করে যাবার চেষ্টা তিনি বাইরে করেন নি। অথচ তাঁরই কোন একটি গানকে এভাবে নিজের নামের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে যাবেন এ আমি ভাবতেই পারি না। অন্তত গানে তিনি পূর্বে এমন কাজ কখনও করেন নি। আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে যত গান লিখেছেন কখনও একথা বলেন নি তাদের মৃত্যু ছাড়া সে গান গাওয়া চলবে না। তার পরিচয়ও আমরা সর্বত্রই পাচ্ছি। কেবলমাত্র এই গানটির বেলায় তিনি এভাবে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধ কাজ কি করে করলেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

এখানে বলে রাখি "কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস" গানটি তাঁর পিতার মৃত্যু উপলক্ষে লেখা এবং "কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়" গানটি তাঁর কন্যার মৃত্যুর সময় লেখা। কিন্তু এ গান দু'টি অন্যত্রও গাওয়া হয় কিন্তু গান দু'টি রচনার মূল কারণ বাঙলাদেশে কয়জন জানেন? রবীন্দ্রনাথও কখনও এ বিষয়ে কিছুই বলেন নি এবং গান গাওয়া নিয়ে কোন নির্দেশও দেন নি।

১৩২৯ সালে শান্তিনিকেতনে যখন বর্তমান "শ্রীভবনে"র গোড়া পত্তন হয়, তখন একদল ছাত্রী এসে এই ভবনে যোগ দেন। এই সব ছাত্রীদের দিয়ে Girls Guide তৈরী করবার ইচ্ছায় কলকাতা থেকে একজন ইংরেজ মহিলাকে আনানো হোলো। তিনি একটি Girls Guide-এর দল তৈরী করে চলে যান। এই দলের জন্যে গানের প্রয়োজন যখন হোলো, তখন "অগ্নিশিখা এসো এসো" গানটি লিখে সেই দলের প্রয়োজন মেটালেন। Girls Guide-এর বাঙলা নামকরণ প্রথমে করেছিলেন "গৃহ দীপ" কিন্তু পরে তা বদলে করেন "সহায়িকা"। সেই দল কিছু দিন পরে ভেঙে গেছে। আর কখনও "শ্রীভবনে"র ছাত্রীদের দ্বারা "সহায়িকা" দল গঠিত হয় নি। আজ-

সময় যখন প্রদীপ জ্বালানো হয়, তখন গাওয়া হয়ে থাকে। "সহায়িকা" দলের জন্যে যেমন গান রচনা হয়েছিল তেমনি ১৩৩৭ সালে, জাপানী যুযুৎসু-পালোয়ান টাকাগাকী, শান্তিনিকেতনে যুযুৎসুর দল গঠন করে নানাখানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। সেই সময় প্রদর্শনীর আরম্ভে গান গাইবার জন্যে রচিত হয় "সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান"। প্রথম গাওয়া হয় ১৩৩৮ সালে কলকাতার New Empire রঙ্গমঞ্চে।

দোল পূর্ণিমা রাত্রে উৎসব হয়ে আসছে বহুদিন থেকে। সব বারেই যে তা সুসম্পন্ন হয়েছে তা বলা চলে না। ১৩৩২ সালের দোল পূর্ণিমার ব্যবস্থা একেবারে বন্ধ রাখতে হয়েছিল। সেবারে আম্রকুঞ্জে উৎসব হবে কথা ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রায় দশ এগারটি নতুন গান রচনা করেছিলেন এবং "সুন্দর" নাম দিয়ে নৃত্যাভিনয়ে সম্পন্ন হবে এই রকম ঠিক ছিল। সেই দিন বিকালে যখন আয়োজন সব প্রায় শেষ, পশ্চিমে কালো মেঘ করে এলো এক প্রচন্ড কাল বৈশাখী। তুমুল ঝড় ও বৃষ্টি। নন্দলাল বসু ও সুরেন কর মহাশয়ের দ্বারা বিচিত্র সাজে সজ্জিত আম্রকুঞ্জ একেবারে ওলট পালট হয়ে গেল। আর কোন ব্যবস্থা সম্ভব হলো না। সেই ঝড়ের সময় লিখ্‌লেন "রুদ্র বেগে কেমন খেলা কালো মেঘের ভ্রূকুটি" গানটি। অধিকরাত্রে বর্তমান পুস্তকাগারের উপর তলার লম্বা ঘরে গানের মজ্‌লিস্‌ হলো বৃষ্টির পরে। রবীন্দ্রনাথ এই নতুন গানটি গেয়েছিলেন একলা। সেই বৎসরে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে "সুন্দর" আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। "মাতৃ মন্দির পুণ্য অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে" গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন "বসু বিজ্ঞান" মন্দিরের উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে ১৩৩২ সালে। আবার এটিকে কাজে লাগালেন কথার একটু আধটু বদল করে সেই বৎসরে, যখন বিখ্যাত ইতালীয় পন্ডিত "কার্লো ফরমিকি" সাহেব শান্তিনিকেতনের অতিথি হয়ে এলেন। তাঁকে আম্রকাননে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। "মাতৃ মন্দির" গানটি তখন দাঁড়ালো—

"শান্তি মন্দির পুণ্য অঙ্গন
হোক সুমঙ্গল আজ হে
প্রিয় সুহৃৎপ্রবর বিরাজ হে,
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে।
চির সমুৎসুক তব প্রতীক্ষা সফল কর, লহ প্রেমদীক্ষা
মাল্য চন্দনে সাজ হে, শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে।
জয় জয় বুধোত্তম অতিথি সত্তম
জ্ঞান তাপস রাজ হে॥ জয় হে।
এস আম্র নিকুঞ্জ ভবনে
শিশির সিঞ্চিত স্নিগ্ধ পবনে,
হউক সুন্দর শুভ আতিথ্য,
হোক প্রসন্ন তোমার চিত্ত,
তব সমাগম পুলক দীপ্ত
আজি বন্ধু সমাজ হে।

১৩৪৭ সালের অগাস্ট মাসে যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথকে উপাধি দান করা হয়, সেই উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে যে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল তা সকলেরই জানা আছে। এই উপাধিদান উৎসবে আগত পন্ডিতমন্ডলীকে সম্বর্ধনা করে "মাতৃ মন্দির" গানটিকে আর একবার পরিবর্তন করে গাওয়ালেন।

বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণ করো মহোজ্জ্বল আজ হে
বর পুত্র সংঘ বিরাজ হে।
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ করো, লহ জ্যোতি দীক্ষা
যাত্রী সব সাজ হে
এসো কর্মী, এসো জ্ঞানী, এসো জন কল্যাণ ধ্যানী
এসো তাপস রাজ হে।
এসো হে ধীশক্তি সম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।

"সাত ভাই চম্পা" নাম দিয়ে গগনেন্দ্রনাথের ছবিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ ১৩৩১ সালে একটি বিবাহের উপহারোপযোগী কবিতা লেখেন, সেই ছবিটির সঙ্গে। সেই কবিতাটিকে সুর দিয়ে গানে পরিণত করেন ১৩৪০ সালে, চৈত্র মাসে। এবং পূর্বের কথারও সামান্য পরিবর্তন করেন। আগে কবিতাটি ছিল এ রকমের;—

ওগো বধূ সুন্দরী
নব মধু মঞ্জরী
সাত ভাই চম্পার লহ অভিনন্দন;—
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুন রাত্রে
স্বর্ণের বর্ণের ছন্দের বন্ধন।

মিশ্র ভৈঁরো রাগের সাহায্যে যখন গানে রূপ নিল তখন তার কথা বদলে গিয়ে দাঁড়ালো,—

ওগো বধূ সুন্দরী
তুমি মধু মঞ্জরী
পুলকিত চম্পার লহ অভিনন্দন;—
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুন রাত্রে
মুকুলিত মল্লিকা মাল্যের বন্ধন।

গানে পরিণত হবার পর এর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় একটি লোকনৃত্যের ভঙ্গির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে শান্তিনিকেতনের মেয়েদের জন্যে একটি দলবদ্ধ নৃত্য তৈরী হয়। নাচটি ছিল বেশ জমাট। সুতরাং ১৩৪১ সালের "বর্ষামঙ্গল" উৎসবে এই নাচ কার্যসূচীর মধ্যে যখন রাখা সাব্যস্ত হলো, তখন দেখা গেল গানের কথা বদল না করলে চলে না। অথচ উপরোক্ত গানের ছন্দের সঙ্গে নাচের ভঙ্গি এমন মিলে গিয়েছে যে সে ভঙ্গি অন্য গানের ছন্দে এ রকম ভালো খাপ খাবে না। তখন এই ছন্দে প্রথম বর্ষার গান লিখ্‌লেন তার প্রথম লাইন হলো:—"এসো নিখিলের পিপাসা ভঞ্জন এসো গম্ভীর কান্তি ঘন নীল অঞ্জন ইত্যাদি। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে যখন দেখা গেল নাচের সঙ্গে ঠিক মিলুচে না, তখন আবার বদল করে লিখ্‌লেন,—

তুমি সন্তাপে শান্তি
তুমি সুন্দর কান্তি
তুমি এলে নিখিলের পিপাসা ভঞ্জন।
এঁকে দিলে ধরা বক্ষে
দিক্‌ রমণীর চক্ষে
সুশীতল সুকোমল শ্যামরস রঞ্জন। ইত্যাদি

রাগিণী বদলে গিয়ে হলো বেহাগ। দু' দিন পরে একেই আবার পরিবর্তন করে লিখ্‌লেন—

তুমি তৃষ্ণার শান্তি
সুন্দর কান্তি।
তুমি এলে নিখিলের সন্তাপ ভঞ্জন।
আঁকো ধরা বক্ষে
দিক্‌ বধূ চক্ষে,
সুশীতল সুকোমল শ্যামরস রঞ্জন। ইত্যাদি

একই নাচের জন্যে উপরের গানটি আর একবার নতুন চেহারা ধারণ করলো। চিত্রাঙ্গদা নৃত্য নাট্যের শেষ দিকে সেই গানটিকে রাখা হয়েছে, তার কথা হলো;—

তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি
তুমি এসো বিরহের সন্তাপ ভঞ্জন।
দোলা দাও বক্ষে
এঁকে দাও চক্ষে
স্বপনের তুলি দিয়ে মাধুরীর অঞ্জন।
এনে দাও চিত্তে
রক্তের নৃত্যে
বকুল নিকুঞ্জের মধুকর গুঞ্জন।
উদ্বেল উতরোল
যমুনার কল্লোল,
কম্পিত বেণুবনে মলয়ের চুম্বন;
আনো নব পল্লবে
নর্তন উল্লোল
অশোকের শাখা ঘেরি বল্লরী বন্ধন॥

নাচের উদ্দেশে আরো কত গানের কথা বদল হয়েছে তার কতকগুলি উদাহরণ দিই:—

১। "হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঢেউ" গানটি বদলে হোলো 'হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ' বসন্তের গান।

২। "দেখ দেখ শুকতারা আঁখি মেলি চায়" গানটিকে বদলে করলেন 'চলে ছল ছল নদীধারা নিবিড় ছায়ায়'।

৩। "বাকি আমি রাখব না" গানের কথা বদলে হোলো "আমার এই রিক্ত ডালি।"

৪। "দেখা না দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা" হলো "স্বপন মদির নেশায় মেশা।"

৫। "বসন্তে ফুল গাঁথলো"কে পেলাম "অশান্তি আজ হানলো" রূপে।

৬। "বধূ কোন মায়া লাগলো চোখে" গানের 'মায়া' কথাটি বদলে করা হোলো "বধূ কোন আলো লাগলো চোখে।"

এই সব কটি গানে সুর ছন্দ অবিকল এক, কেবল কথার দ্বারা অর্থের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। উপরের কোন কোন গানে সব কথারই পরিবর্তন করেছিলেন, আবার কয়েকটি গানে সব কথা বদলাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি, কারণ দু' একটি শব্দ বদলেই কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

উপরে এতক্ষণ নাচের কথা ভেবে গানের কথা বদলের নমুনা দিয়েছি। এবারে কয়েকটি গানের নমুনা দিই যে গানগুলি বিয়ের প্রয়োজনে বিয়ের গানে পরিণত হোলো। নববর্ষের উপাসনা উপলক্ষে রচিত "হে চির নূতন আজি এ দিনের প্রথম গানে, জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার পানে", গানটির 'জীবন আমার' কথাটিকে 'জীবন দোঁহার' করে বিয়ের কাজে লাগিয়ে ছিলেন। ১৩৩০ সালের 'নটীর পূজার' গান "ওরে কি শুনেছিস ঘুমের ঘোরে" গানটিকে বিয়ের গান করতে গিয়ে এ ভাবে কথা বদলেছিলেন।

"ওরে কি অপরূপ রূপ দেখো রে
নয়ন এলো জলে ভরে।
এত দিনে তোমায় বুঝি
আঁধার ঘরে পেল খুঁজি,
বঁধু তোমার খুললো দুয়ার
নিল তোমায় আপনা করে।
তোর দুঃখের শিখায় জ্বালরে প্রদীপ জ্বালরে,
তোর সকল দিয়ে ভরিস পূজার থাল রে।
যেন জীবন মরণ একটি ধারায়
তাঁর চরণে আপনা হারায়
সেই পরশে মোহের বাঁধন
রূপ যেন পায় প্রেমের ডোরে।"

গীতবিতানের "স্বার্থককর সাধন" গানটিকে বিয়ের জন্যে কথাকে কি রকম পরিবর্তন করা হোলো, তারও নমুনা দেখাই।

"সার্থক হ'ল সাধন।
তৃপ্তি লভিল তৃষিত চিত্ত শান্ত বিরহ কাঁদন,
প্রাণভরণ দৈন্যহরণ অক্ষয় করুণা-ধন॥
বিকশিত হ'ল কলিকা,
মম কানন করিল রচন নব কুসুমাঞ্জলিকা,
হ'ল সুন্দর গীত-মুখর নীরব আরাধন॥
চরণ পরশ হরষে
লজ্জিত বনবীথিধূলি সজ্জিত কর' কর সে,
মোচন কর অন্তরতর হিম-জড়িমা বাঁধন"।

এবারে গানের সুর বদলের কয়েকটি নমুনা দেওয়া যাক্। গান রচনার সময় দেখেছি, শেখবার সময় যদি কখনো মনোযোগ কম দিয়েছি অমনি মনে করেছেন সুরটা হয়তো আমার মনে সাড়া দেয়নি এবং সুর বদ্‌লিয়ে আর একটি সুর দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। অনেক সময় গান রচনা হয়ে গেলে জিজ্ঞাসা করেছেন গানটি কেমন হোলো। যদি কখনো সংকোচ বশত মতামত না দেবার চেষ্টা করেছি, তখনি ভেবেছেন হয়তো ভাল হয়নি। অন্য সুর দিতে উদ্যত হ'লে বারণ করাতে তিনি উল্টে বলেছেন আমাদের পুরাতনের প্রতি অহৈতুক একটা অনুরাগ আছে। গানে সুর পুন যোজনার দ্বারা গান কখনো খারাপ হতে দেখিনি, বরঞ্চ দেখেছি অনেক সুন্দর হয়েছে। "বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা" গানটি যখন প্রথম রচিত হয় তখন তার রাগিনী ছিল বাহার ও তাল ছিল জলদ তেওড়া, কিন্তু অনেক দিন পরে "বাহার" বদল করে চতুর্মাত্রিক তালে সারি-গানের সুর লাগালেন, তাতে গানটি আরো প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠেছে। বাহার সুরে ও তেওড়া তালে গানটিতে একটা উল্লাসের ভাব ফুটে উঠেছিল। সারি গানের সুরে এসেছে একটা উদাস ভাব।

"আমি যখন ছিলেম অন্ধ" গানটি ১৩৪০ সালে 'রাজা' নাটকে ব্যবহার করেন, কিন্তু গানটি লেখা আরো আগে। প্রথমে এ গানের রাগিনী ছিল কেদারা, 'রাজা' নাটকের সময় তার বদল হয়ে হোলো কীর্তনাঙ্গ সুর এবং ছন্দের ঝোঁকে ও সুরের গঠনে অনেক পার্থক্য দেখা দিয়েছে। কেদারা সুরের কাটা কাটা গতিতে গানের ভিতর জোরের প্রকাশ খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, কীর্তনাঙ্গ সুরে সেটি বদলে গিয়ে বেদনার আভাষটি বড় হয়ে উঠেছে। 'শাপ মোচনের' গান, "হে সখা বারতা পেয়েছি মনে মনে" গানটি ছিল মিশ্র বসন্ত রাগে, তাকে বদল করলেন বেহাগে। আজকাল উভয় সুরেই চলিত আছে। খুসী মত যার যেটা ইচ্ছা গান করে থাকে। এই ভাবের আরো কয়েকটি গানের দু'টি করে সুর ছড়িয়ে আছে।

‘চিঠিপত্র’ও ‘নির্বাণ’

শ্রীপরিমল গোস্বামী

‘চিঠিপত্র’ নামক সদ্যপ্রকাশিত বই-খানায় কবি-পত্নীকে লেখা কবির ৩৬খানা চিঠি স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া কবি-পত্নীর লেখা তিনখানা চিঠিও আছে।

চিঠিগুলো যে সময়ের মধ্যে লেখা (১৮৯০—১৯০১) সে সময়টা কবির নিজের এবং তাঁর কবিমনের পূর্ণ যৌবনকাল। তিনি তখন বিরামহীনভাবে লিখে চলেছেন কবিতা নাটক প্রহসন প্রবন্ধ গল্প গান। এদিকে চলেছে তাঁর ‘সাধনা’ (১৮৯১—৯৫) আর একদিকে তাঁর লাভ হচ্ছে অপর্যাপ্ত সিদ্ধি। একই সঙ্গে তাঁর মনে জেগেছে বর্ষার ভরানদীর বেগ আর বসন্তের বর্ণ-বৈচিত্র্য। ‘কড়ি ও কোমল’, ‘রাজর্ষি’, ‘মায়ার খেলা’, ‘রাজা ও রাণী’ লেখা শেষ হয়েছে। লেখা চলছে ‘বিসর্জন’, ‘মাতৃঅভিষেক’, ‘মানসী’, ‘ইউরোপ যাত্রার ডায়েরী’, ‘চিত্রাঙ্গদা’, ‘গোড়ায় গলদ’, ‘বাল্মীকি প্রতিভা’, ‘সোনার তরী’, ‘বিদায় অভিশাপ’, ‘নদী’, ‘চিত্রা’, ‘চৈতালী’, ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’, ‘পঞ্চভূতের ডায়েরী’, ‘কণিকা’, ‘কথা কাহিনী’, ‘কল্পনা’, ‘ক্ষণিকা’, ‘নৈবেদ্য’ ইত্যাদি।

কবির এই বিরামহীন সৃষ্টির মরসুমে লেখা অনেকগুলো খণ্ড এবং অখণ্ড চিঠি আমরা প্রথম দেখতে পাই ছিন্নপত্রে। এগুলো সম্ভবত চলতি ভাষায় লেখা প্রথম বাঙলা চিঠি। ‘ছিন্ন-পত্রে’র চিঠিগুলো শ্রেষ্ঠ পত্র-সাহিত্য হিসাবে রবীন্দ্র-রচনাবলীর যেমন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, চিঠিপত্রে প্রকাশিত চিঠিগুলোও তাই। আসলে ‘চিঠি-পত্রে’র চিঠিগুলোই ছিন্নপত্র, কেন না এতে এমন চিঠিও আছে যার সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায়নি।

কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবী

পত্নীর কাছে লেখা হওয়া সত্ত্বেও সব চিঠিগুলোকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বললে ভুল হবে, কেন না কবির লেখার সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন বাল্যকাল থেকেই তাঁর মন এমনভাবে গঠিত হয়েছে যার প্রকাশ সব সময়েই একটা পরিমার্জিত সুসমঞ্জস সৌন্দর্য ছাড়া অন্য কিছুর ভিতর দিয়ে হওয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই তাঁর কাব্য আর চিঠির মধ্যে মূলগত কোনো পার্থক্য নেই। যে কথা তিনি কাব্যের ভিতর বলেছেন, যে কথা তিনি বহু প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে বলেছেন, সেই সব অনেক কথারই সুর পাওয়া যায় এই সব চিঠির ভিতর। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত যে দুচারটে কথা থাকলে কোনো লেখা চিঠির পর্যায়ে পড়ে তাঁর অনেক চিঠিতে মাত্র সেই রকম ব্যক্তিগত কথাই আছে। সাময়িক কথা বলতে গেলেই তিনি সর্বসাময়িক কথা বলতে আরম্ভ করেন। সাধারণ কথা তাঁর কলমে সব সময়েই রসাসিক্ত হয়ে অসাধারণ কথা হয়ে ওঠে। এই গুণটি তাঁর কাব্য-জীবনের প্রথম থেকেই ব্যক্ত।

কবি তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে, কাজের ভিতর দিয়ে দেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলবেন, সকল মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় সচেতন করে তুলবেন এই ছিল তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা। জীবনের কোনো বিভাগকেই তিনি তুচ্ছ করে

দেখেননি। সমস্ত দেশের কল্যাণের দায়িত্ব তাঁর উপর আছে একথা তিনি সমস্ত মন দিয়ে বিশ্বাস করতেন। এবং এই কারণেই নিজের পরমাত্মীয়কেও দেশের পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারেন নি। কোনো-না-কোনো দিক থেকে তিনি তাঁকে দেশের পরিবেশে স্থাপন ক'রে, মানব জাতির অংশ হিসাবে দেখে যেন তৃপ্তি পেয়েছেন। নিজের পত্নীর সম্পর্কেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। তাই পত্নীর কাছে লেখা চিঠির প্রায় সবগুলোতেই আমরা এমন সব কথা দেখছি যা তিনি একান্তভাবে শুধু পত্নীকেই বলেন নি; বলবার সময় তাঁর মনে হয়েছে যেন তিনি দেশের সকল গৃহলক্ষ্মীকে উদ্দেশ ক'রে বলছেন।

চিরদিনের প্রচ্ছন্নবাসের পর এই চিঠিগুলো সাধারণের কাছে প্রকাশিত হ'ল। চিঠিগুলো পড়লেই আর সন্দেহ থাকবে না যে এই লেখাগুলোও রবীন্দ্র-রচনাবলীর একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই আমাদের শিরোধার্য হবে।

'চিঠিপত্রে'র মতো বইয়ের আরও একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। কবির কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে হ'লে কবি-সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যত বেশি থাকে, ততই আমাদের বেশি সুবিধা হয়।

কবিতার পিছনে প্রত্যক্ষ প্রেরণা থাকে মাত্র একটি, কিন্তু সেই প্রেরণাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তারও পিছনে রয়েছে হাজার রকমের বিচিত্র ভাবধারা। কাজেই কবির কাব্য যখন আমরা বিচার করতে যাই, তখন দেখতে পাই কোনো ব্যাখ্যা দিয়েই তাকে আমরা চূড়ান্তভাবে ধরতে পারি না। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, কোনো কবিতা যে বিচিত্র রকম ভাবধারার ফলে জন্মলাভ করেছে তাদের সবগুলোকে আমরা একসঙ্গে জানার সুযোগ পাই না। কবির ব্যক্তিগত পরিচয় বেশি পেলেই এইসব ভাবধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের সুযোগও বেশি ঘটে। সুতরাং কবি সম্পর্কে আমরা যত বেশি তথ্য জানতে পারি, ততই আমাদের পক্ষে ভাল। জানলে, কবির কাব্য নিয়ে যাঁরা গবেষণা করবেন, তাঁরা এইসব তথ্য থেকে কাব্যের অনেক উপাদান আবিষ্কার করতে পারবেন, যদিও কাব্যের চূড়ান্ত বিচার তার উপরে নির্ভর করবে না, কেন না কাব্যের চূড়ান্ত বিচার কোনো কিছুর উপরেই নির্ভর করে না, অর্থাৎ চূড়ান্ত বিচার হয় না। আর হয় না বলেই প্রকৃত কাব্যের আকর্ষণ কখনো কমে যায় না।

কবির রচনা ভঙ্গীর সকল বৈশিষ্ট্যই এই চিঠিগুলোর মধ্যে আছে। লঘুগুরু দুই-ই আছে। সাধারণ ঘরোয়া কথাও আছে, তত্ত্বকথাও আছে। কবি-পত্নীর লেখায় কবির ভাষা ভঙ্গীর প্রভাব সুস্পষ্ট।

'চিঠিপত্র' পড়ার পরেই 'স্মরণ' বইখানা আর একবার সবাইকে পড়তে বলি। তাতে 'স্মরণে'র কবিতাগুলো নতুন ক'রে পাঠকের মর্মস্পর্শ করবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তথ্যবহুল আর একখানা বই এই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঠাকুর, বইখানার নাম 'নির্বাণ'।

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রে যা কিছু ঘটেছে—তাঁর জন্ম থেকে আরম্ভ ক'রে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তার কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্তা রাণী চন্দ লিখিত 'ঘরোয়া' বইখানায় কবির জীবনের এমন অনেক কথা আমরা জানতে পারি যা ইতিপূর্বে আমরা জানতাম না। এ ছাড়া কবির সুদীর্ঘ ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বাইরে-থেকে-দেখা চোখে আর কেউ কোনো দীর্ঘ কাহিনী লিখেছেন বলে জানি না। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী কবি সম্বন্ধে কিছু কিছু স্মৃতি কথা লিখেছেন—অল্পদিনের দেখা চোখে আরও অনেকে লিখেছেন, কিন্তু সেগুলো স্বভাবতই স্থানের দিক দিয়ে সংকীর্ণ এবং কালের দিক দিয়েও প্রশস্ত নয়। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত চৌধুরীর লেখা কিছু কিছু পড়েছি, কবির প্রতিদিনের কথা তিনি বেশ চিত্তাকর্ষকভাবে লিখছিলেন। কিন্তু এইসব ছোট লেখা বা 'ইণ্টারভিউ'-জাতীয় লেখা ছাড়া কবি সম্বন্ধে আর কোনো বড় লেখা দেখিনি।

কবি স্বয়ং লিখেছেন 'জীবন স্মৃতি', কিন্তু 'জীবন স্মৃতি' কবির কাব্য জীবনের গোড়ার কথা—ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে বিশ্ব-পৃথিবীর যৌগিক মিলনের ফলে যেখানে যেখানে কাব্যের আলো জ্বলে উঠেছে বেশির ভাগই সেই সব মূল্যবান মুহূর্তের ইতিহাস। তাঁর 'ছেলেবেলা' বইখানাও অস্তাচলের ধারে এসে পূর্বাচলের পানে তাকানো—অতিপরিণত দৃষ্টিতে অপরিণত জীবনটাকে দেখা। সে দেখার মূল্য অন্যরকম। সেটা নিজের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে নিজেকে দেখা, অর্থাৎ এইসব লেখায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সেই পরিমাণেই ব্যক্ত যে-পরিমাণে তা ব্যক্ত তাঁর কবিতা বা গানের মধ্যে। কবিতা বা গানের মধ্যে আমরা যেভাবে কবির পরিচয় পেয়েছি, ঐ দুইখানা বই থেকে আসলে তার চেয়ে খুব বেশি কিছু পরিচয় পাইনি।

কবির কাব্য, গান চিরকাল থাকবে, যুগে যুগে তার নতুন নতুন ব্যাখ্যান হবে, কিন্তু পরিপূর্ণ জীবন কথার অভাবে ক্রমে কবির অসাধারণ চিত্তহারী ব্যক্তিত্বের কথা লোকে ভুলতে থাকবে। কেন না কবির সম্পর্কে যা কিছু লেখা সবই দু'এক দিন থেকে দু'এক বছরের কাহিনীতেই শেষ। কবির সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বটি আজও পর্যন্ত কেউ লেখার ভিতর দিয়ে আমাদের চোখের সামনে ধরার চেষ্টা করেন নি।

আমি বলছি কবির লৌকিক এবং সাধারণ জীবনের কথা। তাঁর সব কিছুই এখন আমাদের জানতে ইচ্ছা করে। তাঁর সম্পর্কে খবরের কাগজে যেসব রিপোর্ট বেরিয়েছে তার বাইরের কথা জানতে ইচ্ছা করে। জানতে ইচ্ছা করে আরও এই জন্য যে বর্তমানে কবি-সম্পর্কে আমরা যে বই বা যে প্রবন্ধ বা বিশেষ ক'রে 'নির্বাণ' থেকে এই ধরণের সংবাদ যেটুকু জানতে পারছি তা এমন মূল্যবান মনে হচ্ছে যে এগুলো পড়তে গেলেই কেবলই এই দুঃখ হচ্ছে যে, আরও বেশি কেন লেখা হয়নি। কবির অন্তরঙ্গ বন্ধুদের এই মহৎ কাজটি বহু দিন আগে থাকতেই আরম্ভ করা উচিত ছিল। হয়তো এখনো কেউ কেউ এই ভারটি নিতে পারেন। একজনের চেষ্টায় সম্পূর্ণ হবে না, কবির সঙ্গে যাঁরা

ছিলেন এবং এখনো আছেন তাঁরা সবাই পৃথকভাবে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা লিখতে পারেন। সবারই কথা বলছি আরও এই জন্য যে যাঁরা কবির সঙ্গে ছিলেন তাঁরা সবাই ভাল লিখতে পারেন এমন প্রমাণ দিয়েছেন।

কবির জীবনের প্রথম দিক সম্বন্ধে তৎকালীন বাঙালী খুব কৌতূহলী ছিল না এটা ঠিক, কেন না রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ছিল সম্পূর্ণ নতুন। সেই নতুনকে মেনে নেবার মতো লোক তখন বাঙলা দেশে অল্প দুচারজন মাত্র ছিলেন, বেশি ছিলেন না, কিন্তু সে দুঃখ স্বয়ং কবিও ভুলে গিয়েছিলেন আমরাও ভুলেছি। নতুনকে মেনে নিতে সব দেশেই অনেক সময় লাগে। তা ছাড়া কবির আবির্ভাবকালে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যাই বা কজন ছিল? কবির প্রথম জীবনে তাই বাঙলা দেশের কৌতূহল কম ছিল। কিন্তু তখনকার লোকের কম থাকলেও আমরা এ যুগে তাঁর প্রথম জীবন সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ যথেষ্ট হয় তো দেখাইনি, কিন্তু দেখানো উচিত ছিল। কবির শেষ জীবনের শেষ কটাদিন বিষয়ে সবারই আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে চরম উদ্বেগ জেগেছিল। কবির শেষ বিদায়, তাঁর প্রতি বাঙলা দেশের ভালবাসা প্রমাণ করে গেছে। সেই শেষ মুহূর্তগুলো যাঁদের ভাষায় সুন্দরভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঠাকুর তাঁদের অন্যতম। তাঁর লেখা 'নির্বাণ' কবির শেষ একটি বছরের ইতিহাস, এবং কবির শেষ কটা দিন সম্পর্কে সম্ভবত এইখানাই একমাত্র বই।

'নির্বাণ' সমস্ত বাঙালীর কৃতজ্ঞতা লাভ করবে। শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঠাকুর কবির সঙ্গে বহুকাল দেশে বিদেশে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, এমন আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি। তিনিই কবিকে দীর্ঘকাল সেবা করেছেন মায়ের মতো। কাজেই তিনি কবিকে জানবার সুযোগ পেয়েছেন আর সবার চেয়ে বেশি। আবার সেই জন্যই কবির জীবনের কোনো অংশ নিরপেক্ষভাবে বাইরের দৃষ্টি দিয়ে দেখা তাঁর পক্ষেই ছিল সব চেয়ে কঠিন। অথচ 'নির্বাণ' বইতে যে ছবিটি তিনি এঁকেছেন তা কবির ছবি হিসাবে সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে।

সব চেয়ে সুখের বিষয় লেখার মধ্যে লেখিকা নিজেকে কোথায়ও প্রধান ক'রে তোলার চেষ্টা করেন নি। নানারকম মন্তব্য বা কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ জুড়ে সেইগুলোকেই প্রধান বক্তব্য হিসাবে খাড়া করেন নি। অর্থাৎ তিনি ইতিহাস লেখারই চেষ্টা করেছেন, কাব্য রচনার চেষ্টা করেন নি। পরমাত্মীয়ের বিয়োগ-বেদনা চেপে রেখে তাঁকে এটা অনেক চেষ্টা করেই করতে হয়েছে, কেন না লেখার মধ্যে নিজের অন্তরকে মুক্ত করলে তিনি যা লিখতে চেয়েছেন তা লিখতে পারতেন না, অন্তত কবি-বিয়োগের এত কাছাকাছি সময়ে তা করতে গেলে বিপদে পড়তেন।

'নির্বাণে'র ভাষা সংযত সরল এবং মধুর। আরম্ভ চিত্তাকর্ষক, সমাপ্তি মর্মস্পর্শী। কবির শেষ স্বাক্ষরের প্রতিলিপি সম্বলিত 'নির্বাণ' কবি-জীবনের শেষ এক বছরের ভোগের ইতিহাস এবং মূল্যবান দলিল, এবং বাঙালী মাত্রেরই অবশ্য পঠনীয়।

অমর্ত্য

(৪২ পৃষ্ঠার পর)

কানে শুনতে এগুলো ছোট ছোট ঘটনা মাত্র; কিন্তু এই সব ছোট খাট ঘটনাগুলোই, একটি সুগভীর বিরাট স্বভাব-অভিজাত হৃদয়ের সূচীপত্র।

কেউ কোনো কষ্ট পাচ্ছে,—কারু অসুখ করেছে এ সংবাদ তাঁর কাছে কখনো অবহেলিত হোতো না। পড়ে থাকত তাঁর আধলেখা লাল রংএর ডায়রীর কবিতার খাতা ম্লান হয়ে। হাতে উঠত টিসুমেডিসিন মেটিরিয়া মেডিকা। মানুষের দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে ঔদাসীন্য তিনি সহ্য করতে পারেন না। প্রায়ই বলতেন,—

"অধিকাংশ মানুষই অপরের দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে এত উদাসীন কেন? বিশেষত আমাদের দেশে মেয়েদের ত চিকিৎসাই হয় না। তারা সকলের সেবা করে বেড়ায় আর তাদের ব্যামো কেউ গ্রাহ্য করবার বিষয় মনে করে না! এ সব ভাবলে ধৈর্য থাকে না আমার।"

তিনি দৈনন্দিন ব্যবহারে সহজ সাধারণ মানুষ ছিলেন, তাই প্রত্যহ তিনি পরমাশ্চর্য হয়ে আমাদের হৃদয়ের সামনে উদ্ঘাটিত হতেন। সে সব দিন চলে গেছে। আজ তার স্মৃতি একটি অখণ্ড উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত আমাদের হৃদয়ে জ্বলছে।

তাঁর সমস্তই অন্য জাতের ছিল। কোনো কারণেই ব্যবহারের ছন্দ পতন হত না। যা স্থূল যা কর্কশ তা তাঁর ঘরোয়া জীবনেও কখনো স্থান পেত না। তাঁর সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয়—কি অদ্ভুত স্থূলতার মধ্যেই আমরা বাস করছি। একটি আশ্চর্য সুরের মত, সংগীতের মত ছিল তাঁর জীবন আর তার পাশেই আমরা যেন এক একটি প্রকাণ্ড গণ্ডগোল।

"দেখা দিল দেহের অতীত কোন্ দেহ এই মোর
ছিন্ন করি বস্তু বাঁধন ডোর।
শুধু কেবল বিপুল অনুভূতি,
গভীর হতে বিচ্ছুরিত আনন্দময় দ্যুতি,
শুধু কেবল গানেই ভাষা যার,
পুষ্পিত ফাল্গুনের ছন্দে গন্ধে একাকার।"

বাইশে শ্রাবণ

অমিয় চক্রবর্তী

সময় যাবার

শান্ত হোক স্তব্ধ হোক, স্মরণসভার সমারোহ
না রচুক শোকের সম্মোহ।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলি লিখে গিয়েছেন, তাই আজ বিশেষভাবে মনে পড়ছে। বারেবারেই নানা-ভাবে তিনি দেশকে বলেছিলেন মৃত্যুকে বড়ো ক'রে দেখো না, তার চতুর্দিকে সভার আয়োজন গ'ড়ে তুলে বাক্যের স্তূপ রচনা কোরো না। নববর্ষের আনন্দ আয়োজনের অঙ্গরূপে তাঁর জন্মদিনকে কেউ স্মরণ করলে তিনি খুসি হতেন, শেষ দিকে শান্তিনিকেতনে তাই করা হত। ভারতবর্ষের আত্মিক উৎসবের প্রথাও এই। বৈশাখী পূর্ণিমায় আমরা বুদ্ধদেবের জন্মকে অভিনন্দিত করি।

তাই আজ না ভেবে পারি না যে ২২শে শ্রাবণ তারিখটাকে ভাষণ সম্ভাষণের কেন্দ্র ক'রে বার্ষিক উৎসব করবার প্রয়াসের মধ্যে আন্তরধর্মের যোগ নেই, বিরুদ্ধতা আছে। বৈশাখের প্রথম দিনে অথবা পঁচিশে বৈশাখে আনন্দ মেলা বসুক, পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা সুন্দর হ'য়ে দেখা দিক, গানের-আলোচনার আসরে মহাজীবনের ঐশ্বর্য সঞ্চারিত হোক্। ২২ শ্রাবণ থাক্ আমাদের সমস্ত দেশের হৃদয়ে, একটি নীরব সাধনার অনুষঙ্গে; সেখানে বহুলতার অবসর নেই, একটি তাপসিক স্থির অগ্নিশিখা জ্বলতে থাক্। এই দিনে ব্রতের আগ্রহ দীপ্ত হ'য়ে উঠুক্ সর্বজনসত্তায়, কঠিনতমের প্রতিজ্ঞা আমাদের চিত্তে অনুষ্ঠিত হোক্।

শক্তির মন্ত্র লাভ করতে হয় নিভৃতে, বাইশে শ্রাবণ তারি দিন। বৎসরে বৎসরে এই দিনে আমরা মহামৃত্যুর সম্মুখীন হব, মৃত্যুকে অতিক্রম করব, যিনি প্রাণের আশ্চর্য প্রতীক সেই কবির অম্লান জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনকে মেলাব। কিন্তু সভায় নয়, সাধনায়; বাক্যে নয়, কর্মে; সৌন্দর্যের সংকল্পে এবং অন্তরের অন্তর্লোকে।

বাইশে শ্রাবণকে চতুর্দিকে যে-ভাবে সভাসমিতি দ্বারা বাত্যাহত করবার লক্ষণ দেখছি তার সঙ্গে যোগ দিতে পারলাম না। বাংলাদেশের অনেকেরই মনে আজ একই বেদনা জাগছে সন্দেহ নেই।

শ্রাদ্ধের হোমানলে আজ জাতীয় চিত্ত শোধিত হবে। বিভাসিত নবীন দিগন্তের পথে আমাদের আহ্বান এসেছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন আমাদের মৃত্যুভয়হীন মুক্তির জীবনে উত্তীর্ণ ক'রে চলুক্॥
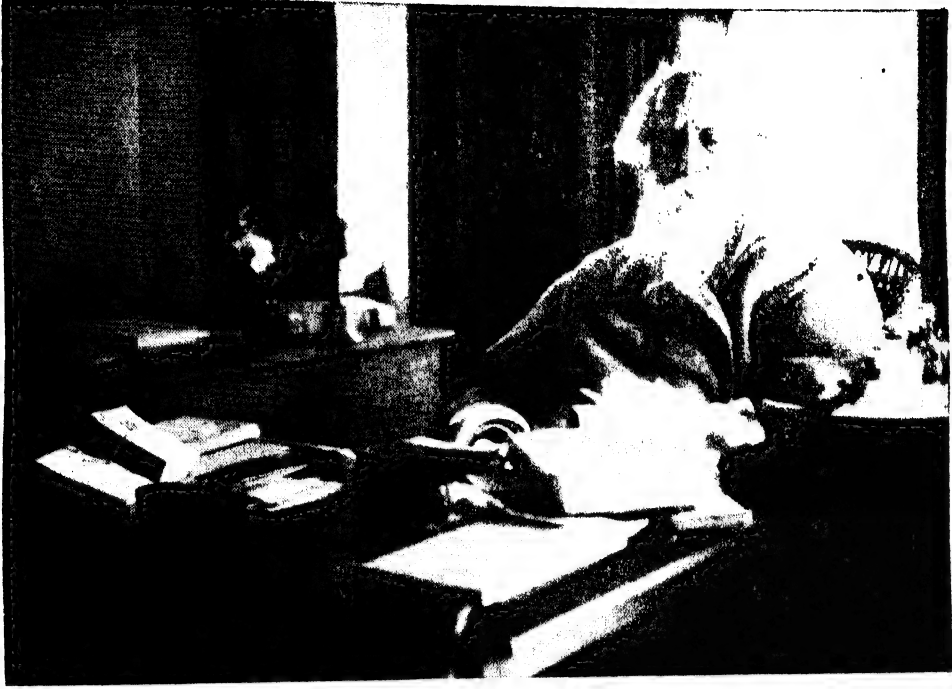
শেষের উত্তর

ভবানী পাঠক

জীবন কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যখন দার্শনিকের চিন্তা হার মানে তখন দ্বিতীয় একটা চিন্তা তাঁদের পেয়ে বসে, মৃত্যু কি? মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে গিয়ে তেমনি তাঁদের যুক্তি চিন্তা ধ্যান মনন একে একে ফিরে আসে জীবনকে চেনবার সন্ধানে। পরশ পাথর খোঁজার মত এই সন্ধানের পালা চলেছে। সন্ধানী শুধু দেখে এক একটা সুখদুঃখের ছোঁয়ায় জীবন অকস্মাৎ সোনা হয়ে উঠেছে, তখন সেই সুখৈক বা দুঃখৈক'কে পরশ পাথরের মত একমাত্র সত্য বলে ধরে নেয়। কিন্তু শীঘ্রই সে ভুল ভেঙে যায়। দ্বিতীয়বার তার ছোঁয়ায় জীবনের সকল ভাবনা আর সোনা হয়ে যায় না। তার এত সাধের পরম পাওয়ার স্বপ্ন আলেয়ার চেয়ে অলীক হয়ে থাকে। তখন আরম্ভ হয় নতুন করে খোঁজার পালা, কিন্তু এ' খোঁজার মধ্যে যেন সেই ভরসার জোর আর থাকে না। এক আশাভঙ্গের অভিমানে সংশয়ের পর সংশয় এসে গ্রাস করে ফেলতে থাকে। কারও সাধনার অবসান হয় সেই সংশয়বাদের পারের কাছে এসে। কেউবা দেখেন জীবন যেন একটা নিষ্ঠুর পরিহাস, কারও কাছে মায়া, কারও কাছে ভ্রান্তি।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে এর মধ্যে কোন একটি পর্যায়ে ফেলা যায় কি? কবি স্বয়ং জীবন ও মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধগুলিতে তিনি তাঁর চিন্তা ও যুক্তির আশ্রয়ে একটা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন। মোটের উপর বলতে গেলে সে তত্ত্বের মধ্যে নতুন কোন জীবনদর্শনের কথা নেই। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ এবং বৈষ্ণবী ভক্তিবাদকে তিনি নবতর এবং উজ্জ্বলতর এক ব্যাখ্যা দিয়ে জিজ্ঞাসু মনের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। এখানে তাই ব্যাখ্যানভাগ শুধু নতুন, ভারতীয় দর্শনের মূলসূত্রটি অবিকল আছে।

কিন্তু কাব্যে, যেখানে তার কল্পনা জীবন ও মৃত্যুর দুর্গম রহস্যলোকের তিমির দুয়ার পার হয়ে কোন স্পষ্ট সত্যকে অনুভবের মধ্যে ধরতে চেয়েছেন, সেখানে সব সময় তিনি তাঁর তাত্ত্বিক রীতিকে মেনে চলতে পারেননি। সহস্রধারায় যে জীবনের নির্ঝরের ছুটে চলেছে, তার বেগ বৈচিত্র্য ও গভীরতা কবির তাত্ত্বিক বিচারকে অতিক্রম ও অভিভূত করে চলে গেছে। নিত্য বা অনিত্যের প্রশ্ন সেখানে কোন উপদ্রব সৃষ্টি করতে পারেনি। সেখানে শুধু জীবনের প্রতি অকুণ্ঠ ও অজস্র অভিনন্দন ছন্দে সুরে গানে ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে। জীবন নিজেই যেন একটি উদ্দেশ্য লক্ষ্য পরিশেষ ও পরমার্থ। জীবন অন্য কিছুর জন্য নয়, জীবন শুধু জীবনের জন্য।

কিন্তু জীবন সম্বন্ধে এই একটা কথাই রবীন্দ্রকাব্যের সকল কথা নয়। ভাদ্রের আকাশের মত কবির মন। ক্ষণে ক্ষণে মেঘরৌদ্রের চকিত পটক্ষেপের মত নানা ভাব হতে রূপে অবিরাম

যাওয়া আসা চলেছে। তিনি দেখেছেন জীবনের সেই বহু বিচিত্রতা—কখনো স্নিগ্ধ, কখনো প্রখর, কখনো বিষণ্ণ। তবে প্রায় সবখানেই কবির কল্পনার ক্লান্তপক্ষ বলাকার দল শুধু 'অজানা হইতে অজানায়' উড়ে গেছে। পরাজয় থেকে যুক্তিবাদী দার্শনিকের কাছে মহাজাগতিক এই পরিদৃশ্য 'মায়া নয় স্বপ্ন নয়' হয়ে দাঁড়ায়, কল্পনার পরাভব তেমনি ডেকে আনে অজ্ঞেয়তার আশ্রয়; নভোচারী পাখী যেন অসীমতাকে ভয় পেয়ে আবার নীড়ে ফিরে এসে শান্ত হয়।

• •

রবীন্দ্রকাব্যে জীবন সম্বন্ধে যত কথা আছে, মৃত্যু সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম নেই। এমন কি জীবন ও সৃষ্টির এই অনির্ণেয়তা অনেক ক্ষেত্রে কবির কল্পনাকে মৃত্যুর প্রশ্নে টেনে নিয়ে গেছে।

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে,
সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি'
দুই ভুজে।
জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।

মৃত্যুও যখন অজ্ঞাত, তখন সেটা ভাল কি খারাপ সে প্রশ্ন আসে না। কিন্তু জীবনের রহস্য খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে, আসলে সে বস্তুও অজ্ঞাত। সুতরাং মৃত্যুও জীবনকে কবি এই অজ্ঞেয়তার বন্ধনে এক করে বেঁধেছেন। মৃত্যুকে জীবন থেকে তিনি ভিন্নতর কিছু বলে আর ধরতে পারছেন না। মৃত্যুকে এখানে তিনি অন্য জীবন হিসাবে ধরে নিয়ে আশ্বাস পেতে চেয়েছেন। তাই আশা করেছেন, মৃত্যুকেও জীবনের মত কেন ভালবাসতে পারা যাবে না? জীবনের বিনাশে মৃত্যু কবি স্বীকার করতে পারে নি।

মৃত্যুর প্রতি কবির এই রকম ভালবাসার উক্তি বিরল নয়। মাঝে মাঝে এই উক্তি এত আন্তরিক হয়ে উঠেছে যে, শুনে মনে হয় জীবনের মহিমা যেন তার তুলনায় অনেক দীন। এক এক সময় মনে হয়, কবি যেন খেই হারিয়ে মৃত্যুর জয়গান করে গেছেন। তিনি একদিন মরণকে 'শ্যাম সমান' দেখেছিলেন। কিন্তু একে যদি 'মরণ বিলাস' বলে অভিহিত করা হয় তবে প্রত্যুত্তর তাঁর প্রচণ্ড 'জীবন বিলাসের'ও কথাও শুনিয়ে দিতে পারা যায়—'শূন্যবোম অপরিমাণ মদ্য সম করিতে পান'; অথবা—

শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যা কিরণের সুবর্ণ মদিরা,
যতক্ষণ অন্তরের শিরা উপশিরা
লাবণ্য প্রবাহ ভরে ভরি নাহি উঠে
যতক্ষণ মহানন্দে নাহি যায় টুটে
চেতনা বেদনাবন্ধ, ভুলে যাই সব
কী আশা মেটে নি প্রাণে, কী সংগীত রব
গিয়াছে নিস্তব্ধ হয়ে কী আনন্দ সুধা
অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের ক্ষুধা
না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে।

জীবনের আনন্দের থলি উজাড় করে আয়ুর প্রত্যেকটি মুহূর্ত সুখী ও সুন্দর হবে, জীবন হবে পরিতৃপ্তির সাধনা—অসাধ অপূর্ণতা ও অতৃপ্তির এখানে স্থান নেই। দুঃখবাদের বিরুদ্ধে জীবনের এই বিদ্রোহ পরিণামে অবসন্ন হয়ে পড়েছে—'মরণ সুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতি শয়নে'। জীবনের প্রসঙ্গে কবিকে প্রত্যেকবার মরণের প্রসঙ্গে চলে যেতে হয়েছে। জীবনের ঝুলন উৎসবে ঘুরে ফিরে সেই বাণী বড় হয়ে উঠেছে—'পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা।'

পরাণ কহিছে ধীরে হে মৃত্যু মধুর
এই নীলাম্বর তব এ কি অন্তঃপুর।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের একটি বড় অধ্যায় এই মৃত্যু-বন্দনা। 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটির মধ্যে এই অনুভব সব চেয়ে স্পষ্ট ও করুণ হয়ে উঠেছে। মৃত্যু জীবনের ব্যতিক্রম নয়, জীবনকে অতিক্রম করেই মৃত্যু, যাকে তিনি 'জন্মান্তের নব প্রভাত' বলেছেন।

জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি—
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তায় গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি॥

এখানে মৃত্যুকে তিনি 'জীবনের বিনাশ'রূপে দেখেন নি, বরং মৃত্যুকে জীবনের অনেক অপূর্ণতার পরিপূরক বলে তাঁর মনে হয়েছে। 'বিদায়' কবিতায়—

ক্ষমা করো ধৈর্য ধরো, হউক সুন্দরতর
বিদায়ের ক্ষণ।
মৃত্যু নয় ধ্বংস নয়, নহে বিচ্ছেদের ভয়
শুধু সমাপন।
শুধু সুখ হতে স্মৃতি শুধু ব্যথা হতে গীতি
তরী হতে তীর,
খেলা হতে খেলাশ্রান্তি, বাসনা হইতে শান্তি
নভ হতে নীড়॥

আর একটা বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। মরণ জীবনেরই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে, মৃত্যুকে জীবনের মত ভালবাসা যায়, এই ধরণের কল্পনা প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত কবির চিন্তায় স্থান পেয়ে এসেছিল। কিন্তু তারপর থেকে এই দৃষ্টি বদলে ক্রমে তত্ত্বগভীর হয়ে উঠতে লাগলো। এক এক সময়, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রসাদে এই 'মৃত্যু' অভিনবরূপে ধরা পড়ে গেছে। কবির ধ্যানেও 'মৃত্যুর মাধুরী' ক্রমেই সংশয়ের স্পর্শে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হলো তুলে,
রচিয়া রাখে নি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে।

মৃত্যুর রাগিণী আর মনকে মাতিয়ে তুলতে পারে না। জীবনের এই ক্ষণিকা মূরতির মুখখানি দেখা চাই। খোলো

খোলো হে আকাশ স্তব্ধ তব নীল যবনিকা। উপনিষদের ঋষির কণ্ঠে এই আকুতি বেজে উঠেছিল। হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য মুখাপিহিতং, এই আবরণ তুলে দেখতে হবে জীবন-স্বরূপকে। 'মৃত্যুঞ্জয়' কবিতায় পাই এই দুঃসাহসী ঘোষণা--

আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চ'লে ।

পৃথিবীকে প্রণতি জানিয়ে কবি শুনিয়ে গেলেন—মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা। মৃত্যু এখানে জীবনের পক্ষে অবান্তর হয়ে উঠেছে। শুধু জীবন—চঞ্চল ক্ষণিক অনিত্য, সুখে দুঃখে, আশা নিরাশায়, দ্বন্দ্বে মিলনে গ্রথিত কতগুলি বৎসরের একটি মালার মত এই জীবন। একেই শ্রেয় বলতে দোষ কি?

আজ আমি কোন মোহ নিয়ে.
আসিনি তোমার সম্মুখে,
এতদিন যে দিন রাত্রির মালা
গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবী করবো না
তোমার দ্বারে।

যাবার দিনে কবি প্রার্থনা করেছেন শুধু কপালে একটি মাটীর ফোঁটার তিলক। যদিও তিনি জানেন যে, এই চিহ্নও মিলিয়ে যাবে, যে-রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে মিশে যায়।

নবজাতক, রোগশয্যা, আরোগ্য ও শেষ লেখা—শেষ দিকের রচনা এই সব লেখাগুলির মধ্যে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে কবির মনের কথা সুপরিণত ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য সংশয়াকুল কবি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, এ সব বুঝি মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ নিপুণ হাতে পাতা। মৃত্যুর সে প্রণয়ের ধরণ ঘুচে গেছে। হৃদয়হীন মহাজনের মত মৃত্যু দ্বারে বসে আছে নিঃশেষে সবটুকু আদায় করে নেবার জন্য।

অজস্র দিনের আলো
জানি একদিন
দু চক্ষুরে দিয়েছিল ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি মহারাজ।
শোধ করে দিতে হবে জানি,......

মৃত্যুর সর্বগ্রাসী রূপ ক্রমে প্রকট হয়ে উঠেছে; কিন্তু তবু ভয় শঙ্কা ও সমর্পণের কথা বড় হয়ে উঠছে না। জীবনের গৌরবের কাছে মৃত্যু তুচ্ছ হয়ে উঠেছে,—

এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি।
এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার॥

শেষ লেখায় এসে এই মৃত্যুকে অস্বীকার করে জীবনের মন্ত্র নতুন সুরে ও ধ্বনিতে শব্দময় হয়ে উঠেছে। কবি জানেন, জীবনের রহস্য ধরা পড়লো না, প্রথম দিনের সূর্য সত্তার নূতন আবির্ভাবে যে প্রথম প্রশ্ন করেছিল, তার উত্তর পাওয়া যায় নি। পশ্চিম সাগর তীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় দিবসের শেষ সূর্য যে শেষ প্রশ্ন উচ্চারণ করেছিল—তারও উত্তর পাওয়া যায় নি। কিন্তু তাতে কী আসে যায়। এই মহা অজানার পরিচয় লাভের সাধনাই মানুষকে টেনে নিয়ে চলেছে। সেইখানে তার নিজের পরিচয় সার্থক। ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—মৃত্যুর নিপুণ শিল্প আঁধারে বিকীর্ণ হয়ে থাক্। শেষের উত্তর যে দেবে সে মৃত্যু নয়, সে জীবন।

জীবন পবিত্র জানি
অভাব্য স্বরূপ তার
অজ্ঞেয় রহস্য-উৎস হতে
পেয়েছে প্রকাশ
জন্মের প্রথম গ্রন্থে নিয়ে আসে অলিখিত পাতা,
দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে
আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে
নিজেরে চিনিতে পারে
রূপকার নিজের স্বাক্ষরে

সাহিত্য সংবাদ

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

রবীন্দ্রনাথের পরলোকযাত্রার প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠানকল্পে **শ্রীশচন্দ্র স্মৃতি রক্ষা সমিতি** কর্তৃক একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছে। ইহাতে সর্বসাধারণ যোগদান করিতে পারিবেন। মনোনীত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধের লেখকদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

নিয়মাবলী:—(১) প্রবন্ধের বিষয়—"ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ"। (২) প্রবন্ধ ফুল-স্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়া লিখিতে হইবে ও অনধিক আট পৃষ্ঠা হইবে। (৩) সমিতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও মনোনীত প্রবন্ধ প্রকাশের অধিকার সমিতির থাকিবে।

আগামী ১৫ই ভাদ্র, ১৩৪৯ মধ্যে প্রবন্ধ নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছান চাই।

ইন্দুলেখা নাগ
C/o. দেবেন্দ্রনারায়ণ নাগ
পোঃ ও গ্রাম—তারাগুনিয়া
(২৪ পরগণা)।

রবি-চক্র

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ঘুরিছে রাত্রি দিন,
রবিরে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিছে
গ্রহেরা শ্রান্তিহীন।
তড়িৎ-লীলায় হয় আলোছায়া,
কভু বাস্তব, কখনো বা মায়া;
জ্যোতির ঝলসে বিলুপ্ত কায়া—
শুধু সাত-স্বরা বীণ
সাতটি রঙের ধনু আঁকে নভে,
কানে দেখি নিশিদিন।

উদয়-অস্ত-কথা,
বিজ্ঞান জানে—অবোধ জনের
চোখের অজ্ঞানতা।
রবি যেথা আছে রবি সেথা রয়,
গ্রহেরা করিছে ঠাঁই-বিনিময়;
কলায় কলায় চাঁদ পায় ক্ষয়,—
সাগর-চঞ্চলতা
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে উঠে উদ্বেল হয়ে;
জোয়ার-ভাটার কথা।

দিবা হ'ল অবসান,
ধরা শুধু তার ফিরায়েছে মুখ,
থামে নি আলোর গান।
ইথরে ইথরে ভাসিতেছে সুর,
অসীম শূন্যে গানে ভরপুর;
ঘুরিছে চক্র, কাছ হয় দূর—
শিহরে গ্রহের প্রাণ;
জ্যোতির বিলাস গগনে গগনে
দিবা হ'ল অবসান।

গ্রহেরা পেয়ো না ভয়,
মনের আকাশে গানের সূর্য
চিরদিন জেগে রয়।
সে আকাশে নাই কোনো দিনখন,
পঁচিশে বোশেখ, বাইশে শ্রাবণ;
শুধু গান আছে তারি গুঞ্জন
ভাসিছে শূন্যময়।
রবির চক্র থামে না কখনো,
গ্রহেরা পেয়ো না ভয়।

রবীন্দ্রনাথ

হুমায়ুন কবির

পূরবে পশ্চিমে আজি অগ্নিগর্ভ জলদ নির্ঘোষে
ধ্বনি উঠে সাবধানবাণী। পুঞ্জীভূত অপমান,
যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা, অন্যায়, দারিদ্র্য, অকল্যাণ
ভস্ম করিবারে জ্বলে বহ্নিকুণ্ড প্রলয় প্রদোষে।
তবু প্রশ্ন জাগে মনে নির্দোষী সে অপরের দোষে
সহিবে নিষ্ঠুর শাস্তি? কার হেন অদৃশ্য বিধান
নির্বিচারে মৃত্যুহানে নরনারী মাসুম সন্তান,
পর্বত কেন্দ্রিত পৃথ্বী টলি উঠে কার অসন্তোষে?

অন্তর্দ্বন্দ্ব বহির্দ্বন্দ্ব কণ্টকিত সংশয়ের দিনে
নবীন আশ্বাসবাণী তবকণ্ঠে ধ্বনিবেনা আর?
তোমার নির্দেশ দীর্ঘ সংগ্রামের পথে বারম্বার
আনিয়াছে নবীন প্রেরণা। আজি যুগ সন্ধিক্ষণে
তুমি নাই। বঞ্চিত বুভুক্ষু রিক্তনিঃস্ব ভাগ্যহীনে
কার কণ্ঠ দিবে ডাক মুক্তিপথে দুর্বার প্লাবনে?

যাঁহারা তাঁহাদের উপদেষ্টা, এই ব্যাপারে আমরা তাঁহাদের যুক্তি-বুদ্ধির বিভ্রম দেখিয়া বিক্ষুব্ধই হইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে এমন প্রচারকার্যের দ্বারা ভারত সরকারের মর্যাদা নিশ্চয়ই বাড়িবে না। এই অসংগত নীতি দেশের লোকের কাছে নিন্দিতই হইবে।

মিঃ আমেরীর ঔদ্ধত্য

ভারতসচিব মিঃ আমেরী গর্জিয়া উঠিয়াছেন। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অপসারিত করিবার জন্য দাবী করিয়াছে। আমেরী সাহেবের মত সাম্রাজ্যবাদীর অন্তরে ক্রোধের উদ্রেক যে করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কংগ্রেসের দাবীর ঔচিত্যকে তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যে পরাধীন একটা জাতির স্পর্ধার পরিচয়ই তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। সে উত্তেজনার অন্ধতায় তিনি হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিয়াছেন,—"যাঁহারা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিঘোষিত নীতির সহযোগিতা করিবেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, তাঁহাদের কার্যের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হইবে, তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য যাহা কিছু করা কর্তব্য, ভারত গভর্নমেণ্ট তাহা হইতে বিচ্যুত হইবেন না।" বলা বাহুল্য, আমেরী সাহেবের এই উক্তি কংগ্রেসকে দমন করিবার সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের খোলা হুকুম ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কিন্তু আমরা এরূপ উক্তির জন্য প্রস্তুতই ছিলাম। ভারতের স্বাধীনতার দাবী সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বর্তমান কর্ণধারদের মতিগতি কিরূপ আমরা জানি, এ সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের মতিগতিও আমাদের অবিদিত নহে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে নীরব ধৈর্যে অপরিহার্যের প্রতীক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য ছিল; কিন্তু আমেরী সাহেব সত্যের অপলাপ করিয়া যেভাবে নিজেদের নীতির সাফাই গাহিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে আমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিতে হইতেছে। আমেরী সাহেব জগতের লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কংগ্রেসের বর্তমান দাবী গৃহীত হইলে ভারত গভর্নমেণ্টের বৃহৎ ও জটিল শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে এবং আকস্মিকভাবে বিকল হইয়া পড়িবে। ভারতসচিবের এই উক্তির ভিতর যুক্তি কিছুই নাই! ভারতের দাবীর অপব্যাখ্যা করিয়া লোককে ভড়কাইয়া দেওয়ার জন্যই যে এই ধরণের ধাপ্পাবাজি, ইহা ছাড়া এমন উক্তিকে অন্য কিছু বলা চলে না। কংগ্রেসের দাবীতে ভারতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কিছু নাই। কংগ্রেস সাময়িকভাবে কেন্দ্রে জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী করিয়াছে। বর্তমান শাসনতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন না করিয়াও কার্যত দেশের লোকের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষে যে বাধা নাই, কংগ্রেস ইহা স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি কংগ্রেসের প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইতেন, তবে মিত্রশক্তির সমরোদ্যমে সহায়তার পক্ষে ভারতে নূতন শক্তি জাগিয়া উঠিত; কিন্তু কথা হইতেছে যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট শুধু সদিচ্ছা প্রকাশে এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিতেই ভারতবাসীদের হাতে প্রকৃত অধিকার প্রদান সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহেন, কার্যত বর্তমানে তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে কোন অধিকার দিতে প্রস্তুত নহেন; এ সম্বন্ধে ভারতের শাসনযন্ত্র আকস্মিকভাবে বিকল হইয়া পড়িবার যুক্তি একান্তই নিরর্থক।

সমরোদ্যম ও ভারত

ভারতসচিব মিঃ আমেরী এবং তাঁহার পক্ষীয়দের আর একটি যুক্তি হইল এই যে, কংগ্রেসের দাবী পরিগৃহীত হইলে ভারতে মিত্রশক্তির সমরোদ্যম এলাইয়া পড়িবে এবং জাপানীরা সরাসরি আসিয়া ভারতবর্ষ দখল করিয়া বসিবে। এই ধরণের যুক্তির অযৌক্তিকতা বিশেষভাবেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। মহাত্মাজী সেদিনই 'হরিজন' পত্রে স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন—"স্বাধীন ভারতবর্ষ মিত্রশক্তিকে যে সাহায্য দিতে পারিবে, তাহার তুলনা নাই। এই সাহায্যের সম্ভাবনা অনেক; সেরূপ অবস্থায় জাপানীদের ভারতবর্ষে কোন রকম সাহায্য পাইবারই কারণ থাকিবে না। জাপান বা অন্য কোন শক্তিকে প্রতিহত করিবার কার্য এখনও ভারতবর্ষে অবস্থিত মিত্রশক্তির সামরিক বলের উপরই নির্ভর করিবে। মিত্রশক্তির সৈন্য বাহিনী আজ যেমন এখানে আছে, তখনও তেমনি থাকিবে এবং যতদিন না যুদ্ধ সমাপ্ত হইতেছে, ততদিন ভারতবর্ষ রক্ষার কাজে তাঁহাদের প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁহারা ভারতবর্ষে থাকিয়া যাইবে।" প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস মিত্রশক্তির সমরোদ্যমকে সর্বাংশে সার্থক করিবার পথই বন্ধুর মত নির্দেশ করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীরা যদি সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সংস্কারবশে তাহা বিপরীত বুঝেন এবং বুঝাইতে চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাদের নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থই বিপন্ন হইবে এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দমননীতির অবতারণায় তাঁহারা অনর্থেরই সূচনা করিবেন।

ভারতের জন্য উদ্বেগ

মিস্ ইলেনোর র‍্যাথবোনের নাম পাঠকবর্গ হয়ত বিস্মৃত হন নাই। ভারতবাসীদের সম্বন্ধে এই মহিলা যে অবমাননাকর বিবৃতি প্রদান করেন, রুগ্নশয্যা হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিবাদ করেন। কবির বহ্নিগর্ভময় সেই উক্তি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নীতির স্বরূপকে উন্মুক্ত করে। কঠোর সত্যের সে শাণিত ছুরিকায় ভারতের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের গ্লানি প্রচারের সমগ্র চক্রান্তজাল ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। এতদিন পরে কুমারী র‍্যাথবোন ভারতের ব্যাপারে আবার মুখ বাড়াইয়া কথা বলিতে আসিয়াছিলেন। তিনি সেদিন এই পরামর্শ প্রদান করেন যে, ভারতবাসীরা ব্রিটিশ প্রভুদের প্রতি যেরূপ অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতেছে, তাহাতে তাঁহাদের সাজা দিবার জন্য ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাহার করা কর্তব্য। লর্ড সভাতেও এই মতের প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়। ভারত গভর্নমেণ্টের ভূতপূর্ব অর্থসচিব লর্ড হেলি, ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জও রাজনৈতিক অধিকারলাভে ভারতবর্ষের অযোগ্যতা...

প্রমাণ করিয়া ভারতের প্রতি তাঁহাদের সদিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, ভারতের শিল্প বাণিজ্যে ব্রিটিশের যে অধিকার রহিয়াছে, তাহা যেন ক্ষুন্ন না করা হয়। ক্রীপস-প্রস্তাবে ইহাই ক্ষুন্ন হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল বলিয়াই তাঁহাদের উদ্বেগ। কিন্তু এ উদ্বেগ মিটিয়া গিয়াছে। ভারতবাসীরাই ক্রীপস-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই ধরণের সঙ্কীর্ণচিত্ততার পরিচয় আমাদের কাছে নূতন নয়। যাঁহারা এখনও ইঁহাদের সদিচ্ছার আন্তরিকতা সম্বন্ধে আশাশীল, আশা করি, অতঃপর তাঁহাদের সে ভ্রান্তি দূর হইবে এবং তাঁহারা বুঝিবেন যে, ভারতবর্ষকে পদানত রাখিয়া প্রভুত্ব উপভোগ করিবার স্পর্ধার এখনও নিবৃত্তি ঘটে নাই। সাম্রাজ্যবাদীদের মনোবৃত্তি সমানই রহিয়াছে।

অতীতের অভিজ্ঞতা

সহকারী ভারত সচিব ডিভনসায়ারের মাননীয় ডিউক মহোদয় সেদিন লর্ড সভায় ভারতের সম্পর্কে যে উদার চিত্ততার অভিনয় করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৃটিশ বণিক স্বার্থকে অটুট রাখিবার পাকাপাকি ব্যবস্থা না আঁটিয়া যাহাতে ভারতবাসীদের হাতে কোন অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া না হয়, লর্ড মহোদয়গণের এই দাবীর উত্তরে তিনি অতীত ইতিহাসের নজীর দিয়া তাঁহাদিগকে ধীরতা অবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, বোস্টন শহরে ব্রিটিশ চা বর্জনের ব্যাপারের পর হইতে এ পর্যন্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া তাঁহার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, এ সব ক্ষেত্রে অধিকার ছাড়িয়া দেওয়াই বৃটিশ স্বার্থরক্ষার পক্ষে সুবিধাজনক। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রাক্কালে বৃটিশ বণিক স্বার্থের সঙ্গে মার্কিন জাতীয়তাবাদীদের সেই সঙ্ঘর্ষ এবং তৎসম্পর্কে বৃটিশের ভ্রান্ত নীতির পরিণতি সম্বন্ধে সহকারী ভারত সচিবের এই উক্তিতে তাঁহার আন্তরিকতা কতটা আছে; এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণই সন্দেহ রহিয়াছে। কারণ, এ ক্ষেত্রে তিনি এবং তাঁহার সহকর্মীদের সত্যই যদি আন্তরিকতা থাকিত তবে আজ তাঁহারা কংগ্রেসের সঙ্গত দাবীকে অগ্রাহ্য করিবার অনিষ্টকারিতাও উপলব্ধি করিতেন। তাঁহাদের ভারত সম্পর্কিত বর্তমান নীতি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আমেরিকা এবং আয়র্লন্ডের ঐতিহাসিক শিক্ষা এখনও তাঁহাদিগকে সংকীর্ণ স্বার্থের সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের অন্তরে বৃহত্তর স্বার্থকে অব্যাহত রাখিবার মত শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিতে সমর্থ হয় নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদিগণ ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁহাদের নীতিতে অতীতের সেই ভ্রান্তিকে অবলম্বন করিয়াই মূঢ় বুদ্ধির পরিচয় প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন।

কমিউনিস্টদের নীতি

ভারতের কমিউনিস্ট নেতারা সম্প্রতি কয়েকটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোশী তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, 'জাতীয় ঐক্য সংগঠন করিয়া এবং মিত্র শক্তির সহিত ভারতের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া আমরা ভারতের দাবী আদায় করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন, এরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্যের জন্য কাজ করাই প্রাথমিক কর্তব্য।' এই জাতীয় ঐক্যের অর্থ কি, সেদিন কলিকাতার একটি জনসভায় পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ণ আরও ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, 'আমরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন চাই; এবং সেজন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মিলন কামনা করি।' বাঙলা দেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হইতেও একটি বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—"অগ্রসরমান জাপ বাহিনী এবং আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতির একমাত্র অস্ত্র হইতেছে জাতীয় সংহতি দৃঢ় করা এবং কংগ্রেস লীগ মৈত্রী স্থাপন করা।" কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রকারান্তরে গৌণ করিয়া কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যগণ জাতীয় ঐক্য স্থাপনের পক্ষে এই ধরণের যে সব যুক্তি উপস্থিত করিতেছেন, আমরা তাহার তাৎপর্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি না। আমাদিগকে খোলাখুলিভাবেই সে কথাটা স্বীকার করিতে হইতেছে। অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শের ক্ষেত্রেই—ঐক্য 'জাতীয়' ঐক্যে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু মুসলিম লীগের আদর্শ অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ নয়—স্পষ্টভাবেই অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রগতিবিরোধী মনোবৃত্তির দ্বারা লীগের আদর্শ প্রভাবিত। মুসলিম লীগের সেই আদর্শ বিদ্যমান থাকিতে, কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের মিলনে জাতীয় ঐক্যের সাহায্য হইতে পারে না বরং স্পষ্টভাবেই তাহা ক্ষুন্নই হয়। এরূপ অবস্থায় জাতীয় ঐক্যের আদর্শ বজায় রাখিয়া মুসলিম লীগের সহিত মিলন প্রত্যাশা করা মায়া মরীচিকার বিভ্রম ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ভারতের বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রভাবহীন মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলনের জন্য অকার্যকর দাবীর উপর জোর না দিয়া কংগ্রেসের প্রস্তাবকে পুরাপুরি সমর্থন করাতেই ভারতের জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হইতে পারে। সংহতি ক্ষুন্ন করাই যাহাদের নীতি, প্রগতির বিরুদ্ধতা করাই যাহাদের আদর্শ ভারতের স্বাধীনতা প্রতিবন্ধকতা করিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের ক্রীড়নকস্বরূপে পরিচালিত হওয়াই যাহাদের ব্যবসায়, তাহাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হইয়া ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টার অযৌক্তিক নীতি কমিউনিস্ট পার্টি পরিত্যাগ করিবেন আমরা ইহাই আশা করি।

মুসলিম লীগের হুমকি—

মুসলিম লীগের সঙ্গে যোগ দিয়া কমিউনিস্ট পার্টির কোন কোন সদস্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার যে যুক্তি তুলিতেছেন তাহা যে কতটা ভ্রান্ত মুসলিম লীগের কর্ণধার জিন্না সাহেবের বিবৃতি হইতেই তাহা স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। জিন্না সাহেব কংগ্রেসের দাবীতে উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, কংগ্রেসের দাবী যদি স্বীকৃত হয়, তবে দশ কোটি মুসলমান তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে দাঁড়াইবে। কারণ তাঁহার মতে সে ক্ষেত্রে পাকিস্থানী প্রস্তাব শুধু ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচনার বহির্ভূত হইয়া পড়িবে, ইহাই নয়, উহা ধ্বংস হইবে এবং উহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। জিন্না সাহেবের এই উক্তিই লীগওয়ালাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট

করিয়া দিয়াছে। কংগ্রেস ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ প্রভুত্বের অপসারণ কামনা করে; জিন্না সাহেবের আশা ভরসা নির্ভর করে ভারতে সেই বৃটিশ প্রভুত্বের উপর; সুতরাং তিনি বুঝিয়া লইয়াছেন যে, কংগ্রেসের দাবী প্রতিপালিত হইলে অর্থাৎ ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব যদি না থাকে, তবে তিনি একেবারেই নিরুপায়। তাঁহার পাকিস্থানী দাবীর পিছনে দশ কোটি মুসলমানের সমর্থনের জোর রহিয়াছে, জিন্না সাহেবের ঐকথা যে একান্তই ফাঁকা তাঁহার এই যুক্তি এবং স্বীকৃতি হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে জিন্না সাহেব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্বেষকে ভাঙ্গাইয়া ভারতের দশ কোটি মুসলমানকে চিরকাল দাসত্বের বন্ধনেই আবদ্ধ রাখিতে চাহেন। এমন ব্যক্তির প্রভাবিত কোন প্রতিষ্ঠানের নীতির সহিত ভরতের প্রকৃত স্বাধীনতাকামীদের নীতির সমন্বয় ঘটা কোনক্রমে সম্ভব হইতে পারে কি না, আমরা দেশবাসীকেই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

বস্ত্রাভাবের আশঙ্কা—

চাউলের মূল্য দিন দিনই চড়িতেছে, লবণের দামও দেড়া হইল, বস্ত্রের সমস্যাও উত্তরোত্তর জটিল আকার ধারণ করিতেছে। বর্তমানে ভারতের কাপড়ের কলসমূহের উৎপন্ন মালের শতকরা ২০ অংশ ভারত সরকারকে যোগাইতে হয়, অতঃপর শতকরা ৩৫ ভাগ যাইবে ভারত সরকারের ফরমাইস মিটাইতে। সুতরাং এখন যে বস্ত্রাভাব আছে অদূর ভবিষ্যতে তাহা আরও গুরুতর হইবে। এই প্রসঙ্গে স্ট্যান্ডার্ড কাপড়ের কথা অনেকেরই মনে পড়িবে। প্রস্তাবানুযায়ী সস্তা দামে ঐ ধরণের কাপড় বাজারে যদি আমদানী করা হইত তবে তাহাতে গরীবের সমস্যা কিছু হয়ত মিটিত; কিন্তু এ পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড কাপড়ের পরিকল্পনা শুধু কথাতেই পর্যবসিত আছে। শুনিতেছি কোন কোন প্রদেশে কি পরিমাণ ঐ ধরণের বস্ত্রের প্রয়োজন ভারত সরকার তাহা জানাইবার জন্য প্রাদেশিক গভর্নমেন্টসমূহের কাছে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু অধিকাংশ প্রাদেশিক গভর্নমেন্টই নাকি এ পর্যন্ত ভারত সরকারের সেই অনুরোধের জবাব দিবার অবসর করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দেশরক্ষার বৃহৎ ব্যাপার লইয়া যাঁহাদের মাথা ঘামাইতে হইতেছে, দেশের গরীবদের বস্ত্রাভাবের সম্বন্ধে ভাবিবার অবকাশ তাঁহাদের কোথায়?

লোকাপসরণের নীতি—

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ভারত সরকারের লোকাপসরণ নীতির তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সম্প্রতি ভারত সরকার ইহার সাফাইস্বরূপে একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। ভারত সরকারের এই বিবৃতিতে দেখা যাইতেছে যে, বাঙলা, উড়িষ্যা, আসাম এবং মাদ্রাজ এই কয়েকটি প্রদেশ এই নীতির গন্ডীর মধ্যে পড়িয়াছে; তন্মধ্যে ভারত সরকার বলিতেছেন যে, ভৌগলিক কারণে বাঙলা দেশের সমস্যাই সর্বাধিক ব্যাপক এবং জটিল। লোকাপসরণ নীতির প্রয়োগ ক্ষেত্রে কিরূপভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রথম দিকটা বাঙলা দেশে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল. এ সম্বন্ধে অভিযোগসমূহের প্রতিকার করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। ভারত সরকার বলিয়াছেন যে, নৌকা অপসরণ করিবার সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল, আবশ্যকীয় প্রয়োজনের ক্ষেত্র বাদ দিয়া যাহাতে এই নীতি প্রযুক্ত করা হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইতেছে। মোটামুটি লোকাপসরণের এই সরকারী নীতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ দিয়া এবং সাময়িকভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া এ সমস্যার সমাধান হইবে না। জমিজমা হারাইয়া যাহারা বেকার হইতেছে, তাহাদের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করা দরকার। সরকার এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, বেকার সমস্যা মিটাইবার জন্য বিমান ঘাঁটির নির্মাণের কাজে লোকদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সমস্যা তদপেক্ষা ব্যাপক। আমাদের মতে ইহার প্রতিকারের জন্য সংগঠনমূলক কর্মপ্রণালী অবলম্বন করা উচিত, তাহাতে স্থায়ী কাজ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও মিটিবে; ইহা ছাড়া কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার হইতে চেষ্টা করা কর্তব্য। সরকারী কাগজপত্রে নির্দেশের অপেক্ষা স্থানীয় কর্মচারীদের দায়িত্ববোধ এবং জনসাধারণের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতির প্রবৃত্তিই এ সব ক্ষেত্রে বেশী কার্যকর হইয়া থাকে; নতুবা সরকারী নির্দেশ সুবিধাজনক হইলেও অনেক ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের পক্ষে সেগুলি কাজে আসে না। সেগুলির সুবিধা লাভ করিতে হইলে লোকজনকে ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়। ক্ষতিপূরণের সম্বন্ধে এই ধরণের অভিযোগ আমরা শুনিয়াছি। এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। দেশের লোকের বর্তমান আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধেও ভারত সরকার কিছু অলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যুদ্ধ সম্পর্কিত লোকাপসরণের জন্য এই সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে নাই; জিনিসপত্রের দর চড়াতে এবং কোন কোন স্থানে গম, চিনি, লবণ এবং কেরোসিন প্রভৃতি জিনিস দুষ্প্রাপ্য হওয়াতেই এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। এ সমস্যা সৃষ্টির প্রধান কারণ যে, গাড়ির অনটন একথাও তাঁহারা বলিয়াছেন। তবে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, সামরিক প্রয়োজনকে গৌণ করিয়াও ক্ষেত্র বিশেষে এই সমস্যার প্রতিকার করিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। বাঙলা দেশের কথা বলিতে গেলে, তাঁহাদের এই আশ্বাস কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের বিশেষ কাজে আসে নাই। পশ্চিম ভারত হইতে লবণ আমদানীর জন্য বিহার সরকার গাড়ি চাহিয়া পাইয়াছেন; কিন্তু বাঙলার ভাগ্যে তাহা জুটে নাই; ফলে জাহাজযোগে লবণ আমদানী করায় বাঙলা দেশের লোকদের দেড় গুণ চড়া দাম দিয়া লবণটুকু পাইতে হইতেছে। সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বাঙলার সমস্যা নিরাকরণে বাস্তবক্ষেত্রে কিছুই কার্যকর হইতেছে না এবং আমাদের বিশ্বাস এই যে, সমগ্র ভারতীয় সমস্যার ভিত্তিতে দ্রব্য সরবরাহ ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে এ সমস্যা মিটিতেও পারে না। বাঙলা দেশের এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিযোগের কারণ রহিয়াছে এবং ভারত সরকার সে দায়িত্ব

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 15th August, 1942 [৪০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভুল পথ—

ভারত গভর্নমেণ্ট কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন পরিসমাপ্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজী, কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ নিখিল ভারতের নেতৃবৃন্দকে, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে, ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস-নায়কদের অনেককেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং এখনও ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার-কার্য চলিতেছে। গভর্নমেণ্টের এই দমননীতি অবলম্বন করিতে দেখিয়া আমরা ভবিষ্যতের ভাবনায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। নিরাশার অনেক কারণ থাকা সত্ত্বেও আমরা আশা করিতেছিলাম যে, শেষ মুহূর্তেও কংগ্রেসের সঙ্গে গভর্নমেণ্টের একটা মীমাংসায় পেঁছা সম্ভব হইবে। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবে সে পথ সম্পূর্ণভাবেই খোলা ছিল বলিয়া মনে করি। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস মিত্রশক্তির সমরোদ্যমকে সর্বাংশে সার্থক এবং শক্তিশালী করিবার জন্য একান্ত আন্তরিকভাবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করিবার জন্যই হাত বাড়াইয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রস্তাবের অপব্যাখ্যা অনেক রকমে হইয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতের সমগ্র শক্তিকে সংহত করিয়া মিত্রশক্তির সমরোদ্যমকে সার্থক করিয়া বৈদেশিক আক্রমণকে প্রতিহত করিবার পক্ষে কংগ্রেসের প্রস্তাবে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা কেহ খণ্ডন করিতে পারেন নাই। স্বাধীন ভারতই যে আন্তরিকতা সহকারে দেশরক্ষার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ী সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এ যুক্তি অকাট্য। এরূপ অবস্থায় ভারত গভর্নমেণ্টের অধিকতর বিবেচনার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল এবং মীমাংসার চেষ্টা করা কর্তব্য ছিল। মহাত্মা গান্ধী সেজন্য আগ্রহান্বিতই ছিলেন এবং তিনি এই আশা করিয়াছিলেন যে, বড়লাটের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আলোচনার একটা সুযোগ লাভ করিবেন। এরূপ অবস্থায় ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে এমন ক্ষিপ্রতার সহিত এই ধরণের দমননীতি অবলম্বন করা দূরদর্শিতার পরিচায়ক হয় নাই, একথা আমাদিগকে দুঃখের সহিতই বলিতে হইতেছে। আমরা এখনও আশা করি যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এবং লর্ড লিনলিথগো অনতিবিলম্বে তাঁহাদের অবলম্বিত এই ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহারা অবস্থার জটিলতা এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। বর্তমানের এমন সঙ্কটজনক অবস্থায় মিত্রশক্তির সমরোদ্যমে সমগ্র ভারতের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ সর্বপ্রথমে প্রয়োজন, রাষ্ট্র-

মহাত্মা গান্ধী

রাষ্ট্রপতি আজাদ

পণ্ডিত নেহরু

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

নৈতিক খ‍ুঁটিনাটি য‍ুক্তিতর্কের উপরে ইহা হইল স‍ুস্পষ্ট সত্য। সেই সত্য গভর্নমেন্টের শ‍ুভব‍ুদ্ধিকে এখনও অভ্রান্তভাবে নিজেদের ব‍ৃহত্তর স্বার্থসিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত করুক।

কংগ্রেসের লক্ষ্য কি ছিল—

কংগ্রেসের বির‍ুদ্ধে ভারত গভর্নমেন্ট দমননীতি অবলম্বন করিবার পর ভারতসচিব আমেরী সাহেব বিলাতে বেতারযোগে এক বক্তৃতায় ভারত গভর্নমেন্টের নীতির সমর্থন করিয়াছেন। তিনি যে ইহা করিবেন, ইহা ধরিয়াই লওয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আমেরী সাহেব আগাগোড়াই ভ্রান্তপথে চলিতেছেন। তাঁহার অবলম্বিত নীতি ভারতের কোন দলেরই এ পর্যন্ত সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। বর্তমান ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ এবং উভয় দেশেরই যাঁহারা কল্যাণকামী, তাঁহারাও অনেকে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে অন‍ুরোধ করিতেছিলেন। সম্প্রতি কলিকাতার সেন্টপলস এবং স্কটিস চার্চ কলেজের তিনজন সহৃদয় ইংরেজ অধ্যাপক তাঁহাদিগের স্বদেশবাসীকে কংগ্রেসের দাবী প‍ূরণ করিতে অন‍ুরোধ করেন। তাঁহারা বলেন, 'ভবিষ্যতে স্বাধীনতা দিব' একথা না বলিয়া যদি বর্তমানেই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়, তবে ভারতবর্ষ ব্রিটেনের মতই স্বাধীনতার শত্র‍ু জাপানের বির‍ুদ্ধে দ‍ৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবে। মাদ্রাজের পাদরী ডাক্তার ফরেস্টার পাটন একটি বিব‍ৃতিতে মিত্রশক্তির সমরোদ্যমে সহযোগিতার দিক হইতে কংগ্রেসের দাবীর যৌক্তিকতার দিকটা বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিয়া একটি বিব‍ৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের দাবী স্বীকারের দ্বারা অশ্বেতকায় জাতিসম‍ূহের মনে এই বিশ্বাস দ‍ৃঢ় হইবে যে, স্বাধীনতার আদর্শের কথা কেবল ম‍ুখের কথা নয়, অধিকন্তু কংগ্রেসের দাবী স্বীকার করিলে ভগবান প‍ৃথিবীর নবজন্মের যে পথ নির্দেশ করিতেছেন, সেই পথেই আমরা অগ্রসর হইব। ডাক্তার এ ভি বেলডেন ইংলন্ডের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। ইনি আপোষ আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধীকে লণ্ডন আমন্ত্রণ করিবার জন্য সম্রাটকে এবং ক্যান্টারবেরীর বড় পাদরীকে অন‍ুরোধ করিয়া তার করিয়াছেন। এই সব ব্যক্তি যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এবং ব্রিটিশ জাতির একান্ত স‍ুহৃদ, এ বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিতে পারিবেন না। কংগ্রেসের প্রস্তাবের লক্ষ্যটি ই'হারা অভ্রান্তভাবে বিচার করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কল্যাণের দিক হইতেই কংগ্রেসের সহিত মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অন‍ুরোধ করিয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাঁহাদের শ‍ুভার্থীগণের উপদেশকে ম‍ূল্য দান করা প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না। ভারত গভর্নমেন্টও কতকটা মনঃকল্পনার বলে পরিচালিত হইয়াই কংগ্রেসের ম‍ুখ্য উদ্দেশ্যকে ভুল করিয়া ব‍ুঝিয়াছেন এবং ভ্রান্তভাবে কংগ্রেসের প্রস্তাবকে চ্যালেঞ্জ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সে প্রস্তাবের মধ্যে 'চ্যালেঞ্জে'র কিছ‍ু ছিল না, বন্ধ‍ু হিসাবে মিত্রশক্তির সমরোদ্যমকে সার্থক করিবার জন্যই ছিল কংগ্রেস নেতৃব‍ৃন্দের প্রস্তাবের আন্তরিক আবেদন। ভারত গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের বির‍ুদ্ধে তাঁহাদের বিব‍ৃতিতে কতকগ‍ুলি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু, সেগ‍ুলি প্রমাণিত করা হয় নাই এবং ভবিষ্যতে কি হইতে পারে, অভিযোগগ‍ুলি এইর‍ূপ অন‍ুমান মাত্র। গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি করিলে ঐ সব অভিযোগের কোন কারণই স‍ৃষ্টি হইতে পারে না। কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল যখন মিত্রশক্তির সমরোদ্যমে সাহায্য করা, তখন কংগ্রেসের সঙ্গে এ বিষয়ে একটা আপোষ-নিষ্পত্তির চেষ্টা করাই সমীচীন ছিল। ভারত এবং ব্রিটিশ উভয়ের কল্যাণকামীমাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন।

সর্দার প্যাটেল

সরোজিনী নাইডু

ভারতসচিবের ভাষ্য—

ভারতসচিব মিঃ আমেরী স্যার স্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাবের প্রশংসা করিয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার স্বদেশবাসীকে এই অপ‍ূর্ব তথ্য জ্ঞাপন করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন যে, সেই প্রস্তাবগ‍ুলি সমগ্র বিশ্বের গণতান্ত্রিক জনমতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। সমগ্র বিশ্বের গণতান্ত্রিক মত বলিতে ভারতসচিব কি ব‍ুঝিয়াছেন বা ব‍ুঝাইতে চাহিয়াছেন, আমরা জানি না; সম্ভবত তিনি ইংলণ্ড এবং আমেরিকাকেই সমগ্র বিশ্বের গণতান্ত্রিকতার প্রতিনিধিস্বর‍ূপে ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে এই দ‍ুই দেশের জনসাধারণও ঠিক খবর জানিবার স‍ুযোগ লাভ করে কি না, ইহা সন্দেহের বিষয় রহিয়াছে। আমেরী সাহেব নিতান্ত স‍ুকৌশলেই স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ‍্সের প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের অভিমতকে "সমগ্র বিশ্বের গণতান্ত্রিক জনমতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা"র বাগাড়ম্বরে চাপা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অবশ্যই ইহা অবগত আছেন যে, ভারতের কোন রাজনীতিক দলই স্যার স্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। সত্যের অপলাপ শ‍ুধ‍ু এই ক্ষেত্রেই ঘটে নাই। কংগ্রেসের প্রস্তাবকে অপব্যাখ্যা করিবার স‍ুযোগও তিনি পরিহার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "কংগ্রেস এই দাবী করিলেন যে, ভারত শাসনের ভার একদল ভারতীয় রাজনীতিকদের হাতেই ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং তাঁহারা দ‍ুনিয়ার কাহারও নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকিবেন না। ইহাতে গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী কাজই করা হইত এবং ইহা ভারতের সাড়ে নয় কোটি ম‍ুসলমানের তথা ভারতের জাতীয়

জীবনের অন্যান্য বহু অংশের প্রতিনিধিদের নিকট কখনই গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারিত না।" কংগ্রেসের প্রস্তাবে ভারতীয় রাজনীতিকদের হাতে ভারতের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিতে বলা হইয়াছিল, ইহা সত্য, প্রকৃতপক্ষে তাহা ক্ষমতা হস্তান্তরেরই দাবী ছিল ; কিন্তু এক্ষেত্রে 'একদল' এই বাক্যাংশের দ্বারা তাঁহার উক্তিটিকে বিশেষিত করিয়া ভারত সচিব এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, কংগ্রেসের নেতারাই নিজেদের হাতে সে কর্তৃত্ব চাহিয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক ইহা নয়। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, মোস্লেম লীগের হাতে সে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিলেও তাহাতে তাঁহাদের আপত্তির কোন কারণ থাকিবে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা চাহেন, ভারতশাসনে ভারতবাসীদের অধিকার। ইহাই যদি গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী হয়, তবে চিরদিন ব্রিটিশ প্রভুত্ব ভারতে অব্যাহত রাখাই কি গণতান্ত্রিকতার মর্যাদা বজায় রাখিবার উপায়? ভারতের সাড়ে নয় কোটি মুসলমান এবং ভারতের অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা কখনই ভারতবাসীদের হাতে ভারতশাসনের অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া সমর্থন করিতে পারিত না বা পারে না, এ তথ্য ভারতসচিব কোথা হইতে লাভ করিলেন? এমন কথার দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মানব-মর্যাদার উপরই আঘাত করা হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির ন্যায় স্বাধীনতা লাভের আগ্রহ ভারতবাসীদের মধ্যেও যে জাগিয়াছে, এ সত্যকে অস্বীকার করিলে সত্যেরই অপলাপ করা হইবে এবং বাস্তব সমস্যার পথ তাহাতে প্রশস্তও হইবে না। উপসংহারে ভারতসচিব এই আশ্বাস বাণী শুনাইয়াছেন যে, বিজয়ের শুভ সময় উপস্থিত হইলে ভারতের রাজনীতিকেরা এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিতে সুযোগ পাইতেন, যাহার ছত্রছায়ায় তাঁহারা শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতসচিবের অভীপ্সিত বিজয়ের সেই শুভ সময়কে সমগ্র ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার দ্বারা সুনিশ্চিত করাই কংগ্রেসের প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিল। "মিঃ গান্ধীর নিজের ও তাঁহার সহকর্মীদের বিনষ্ট সম্ভ্রম পুনরুদ্ধার করা এবং ভারতীয় স্বার্থের রক্ষাকর্তা হিসাবে নিজেদের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, কংগ্রেসের দাবীর ইহাই হইল সার কথা—ভারতসচিবের একথা এমনই অবিশ্বাস্য যে, ভারতের আসন্ন সমস্যা সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা কেহই ইহা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

মৌলিক আবিষ্কার—

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভারতসচিব অনেক অভিযোগই আরোপ করিয়াছেন। ভারত সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগের বীজস্বরূপ বলা যায় তাঁহার বিবৃতিকে। কিন্তু ভারত সরকারের বিবৃতিতে একটি বিশেষত্ব আছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি অভিনব অভিযোগ তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "কংগ্রেস ভারতের মুখপাত্র নয়, তথাপি নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য একচ্ছত্র প্রভুত্বের নীতি অনুসরণ করিয়া ইহার নেতৃবৃন্দ ভারতের জাতীয়তার অগ্রগতির পথে ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। সকল প্রকার গঠনমূলক প্রচেষ্টায় কংগ্রেস বাধা না দিলে ভারতবর্ষ এতদিন হয়তো স্বায়ত্তশাসন লাভ করিত।" ভারত সরকারের এই বিবৃতির উপরের অংশটা স্পষ্টভাবেই বিলাতের বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের কংগ্রেস সম্বন্ধে বহু-ব্যাখ্যাত নীতির গণ্ডীর মধ্যে পড়ে এবং ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সেজন্য তাঁহাদের চিরন্তন দরদেরই উহা পুনরুক্তি মাত্র; কিন্তু শেষাংশটি ভারত সরকারের একেবারে মৌলিক আবিষ্কার। কংগ্রেস যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে, এমন অভিযোগ আমরা এই নূতন শুনিলাম। বড়লাটের শাসন পরিষদ এখন ভারতবাসীদের দ্বারা প্রভাবিত; সেখানে ভারতীয় সদস্যই বেশী। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই নূতন আবিষ্কার সম্ভবত শাসন পরিষদের নূতন ভারতীয় সদস্যদের কৃতিত্বেরই পরিচয়!

জীবনরক্ষার সমস্যা—

দেশরক্ষার বড় সমস্যাকে ছাপাইয়া জীবনরক্ষার সমস্যাই সাধারণের পক্ষে গুরুতর হইয়া পড়িতেছে। সরকারী মূল্য-নিয়ন্ত্রণের সকল ব্যবস্থাই যে অকেজো হইয়া পড়িয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। সরকারের নির্ধারিত মূল্যে তো দূরের কথা, তদপেক্ষা চড়া মূল্য দিয়াও চাউল, লবণ, কেরোসিন তেল পাওয়া যাইতেছে না। কলিকাতার বাজারে চিনি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। চাউলের সম্বন্ধে সরকারের মূল্যনিয়ন্ত্রণ নীতি সার্থক তো হয়ই নাই, পক্ষান্তরে অনর্থেরই সৃষ্টি করিয়াছে। ১লা জুলাই চাউলের যে সরকারী দর বলবৎ হয়, সে দরে শহরে কেহ চাউল পায় নাই। ইহার পরে ২১শে জুলাই সরকার উচ্চহারে চাউলের দর বাঁধিয়াছেন; কিন্তু ফলে সমস্যার সমাধান না হইয়া সমস্যার জটিলতাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারের মূল্যনিয়ন্ত্রণ নীতির বাস্তবতা কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, চাউলের দর উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। এগার টাকার কমে শহরে চাউল মিলিতেছে না অথচ সরকারী ইস্তাহারে বারবার এই কথাই শুনিতেছি যে, চাউলের অভাব ঘটিবে না, চিনি বা লবণের দুঃখ নাই। ভুক্তভোগীদের কাছে সরকারী ইস্তাহারের এই ধরণের উক্তি পরিহাসেরই পর্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে। শুনিতেছি অবস্থার এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বাঙলা সরকার ডিরেক্টর অব সিভিল সাপ্লাইয়ের অধীনে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠান বাঙলা দেশের সর্বত্র গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ ও খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন। এই ব্যবস্থা দেশের লোকদের অভাব পূরণে কতটা সার্থকতা লাভ করে, ইহা না দেখিয়া আমরা এ সম্বন্ধে কোন কথা এখনও বলিতে সাহসী হইতেছি না; অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে সত্যই সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছে। শহরবাসীদের এই সমস্যার দিকে এতদিনে কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমরা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছি। শুনিতেছি, কেরোসিন এবং আটা ময়দার সমস্যা মিটান কিছু কঠিন হইবে; কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সেদিন বলিয়া-

মনে যে, চাউল লবণ দিয়াশলাই চিনি এই সব জিনিসের অভাবজনিত সমস্যা তাঁহারা মিটাইতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। কর্পোরেশন এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, সহরে কর্পোরেশনের যে আটটি বাজার আছে সেইগুলিতে ঐ সব জিনিস সরবরাহ করিবার জন্য গভর্নমেন্টের সহিত তাঁহারা বন্দোবস্ত করিবেন। কর্পোরেশন সরকারের নিকট হইতে মাল লইয়া প্রয়োজন অনুযায়ী সেই সব মাল বাজারের খুচরা দোকানদারদিগকে যোগাইবেন এবং সরকারী বাঁধা দরে যাহাতে বাজারে মাল বিক্রয় হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। সরকারী বাঁধা দরে মাল বিক্রয় করাইতে গিয়া যদি কোন সামান্য রকমের লোকসান হয়, তাহা কর্পোরেশন নিজেদের তহবিল হইতে পূরণ করিবেন কিংবা সরকারের সাহায্য গ্রহণ করিবেন। কর্পোরেশনের এই উদ্যমকে আমরা সমর্থন করি; কিন্তু মূল সমস্যার যে ইহাতে সমাধান হইবে, এরূপ আশা আমাদের খুবই কম আছে। এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে বাঙলা সরকারের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নীতির আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে এবং দেশের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিক হইতে ইহা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

পূজোর কাপড়ের বাজার—

দেশব্যাপী আর্থিক সমস্যায় এবার পূজার আনন্দ উবিয়া গিয়াছে, তবু পূজার বাজারে জিনিসপত্র, বিশেষ করিয়া কাপড়ের টান একটু হইবেই। এতদিন পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড ক্লথ বা সরকারের নির্ধারিত দরে গরীবের কাপড়ের কথাই কেবল শুনিয়া আসিতেছি, উহা চাক্ষুষ করিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটে নাই। হয়ত কোন দিন ঘটিতই না; কারণ, আমরা শুনিয়াছিলাম যে, বাঙলা সরকার এ পর্যন্ত এই প্রদেশের ঐরূপ ধরণের বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা ভারত সরকারকে জানাইবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সম্প্রতি একটি সংবাদে দেখিতেছি বাঙলা সরকার এতদিনে এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং তাঁহারা মোটা ধরণের ১৮ লক্ষ এবং মধ্যম রকমের ৪২ লক্ষ ধুতি ও সাড়ীর ফরমাইস দিয়াছেন। ইহাও প্রকাশ যে, নির্দিষ্ট দরে এই সব কাপড় বিক্রয় করিবার জন্য সরকার ৫৫ জন ব্যবসায়ীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ভারত সরকার এই কাপড়ের দাম নির্দিষ্ট করিবেন এবং তাহা বাজার হইতে কিছু কম হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে গরীবদের পক্ষে আশ্বস্ত হইবার কথা; কিন্তু দ্রব্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারের নীতির ফলাফল দেখিয়া এই আশা কার্যত সার্থক হইবে কি না ইহা এখনও আমাদের কাছে সমস্যারই বিষয় রহিয়াছে।

ককেশাসের লড়াই—

ককেশাসের হিমানীমণ্ডিত শৈলরাজীর পাদদেশে জার্মান বাহিনীর সঙ্গে লালফৌজের লড়াই চলিতেছে। ডন নদীর উত্তর দিকে ভোরনেজের দক্ষিণে লালফৌজ ডন নদীর পশ্চিম পারে পৌঁছিয়া আক্রমাত্মক সংগ্রাম এখনও চালাইতেছে এবং এই উপায়ে মার্শাল টিমোশিঙ্কোর সেনাদলের সঙ্গে মস্কোরক্ষী মার্শাল জুকোভের বাহিনীর সংযোগসূত্র এখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই; কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলে লড়াইয়ের অবস্থা লালফৌজের পক্ষে খুবই খারাপ। জার্মানেরা স্ট্যালিনগ্রাডের সঙ্গে কৃষ্ণসাগরের সংযোগসূত্র রেলপথ কাটিয়া দিয়াছে এবং ইহাতে উত্তর ককেশাস অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে রুশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেবাস্তপোল হইতে রুশ নৌবহর কৃষ্ণসাগরের নোভোরোসিস্ক বন্দরে ঘাঁটি করিয়াছিল। রেলপথ কাটিয়া দেওয়াতে এই বন্দর বিপন্ন হইয়াছে। উত্তর ককেশাসের কুবান অঞ্চলের সমতলভূমিতে রুশ সেনাদল জার্মানদের ট্যাঙ্কের আক্রমণে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইতেছে। ককেশাসের উত্তরেও তেলের খনি রহিয়াছে; এইগুলি জার্মানদের পক্ষে দখল করা সহজ হইবে, তারপরে ককেশাসের শৈলতলে সংগ্রাম চলিবে; প্রকৃতপক্ষে এই সংগ্রাম ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। ডন কসাক এবং কুবান কসাকদের স্থলযুদ্ধে খ্যাতি আছে। তাহারা বীরবিক্রমে সংগ্রাম করিতেছে; কিন্তু দক্ষিণ দিকে জার্মানদের চাপ উত্তরোত্তর প্রবল আকারধারণ করিয়াছে। রুশিয়ায় এই সমস্যা সম্বন্ধে ইতিকর্তব্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মস্কোতে মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক আহূত হইয়াছে। এইটিতে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত হইবে কিনা এখনও বুঝা যাইতেছে না। তবে এইকথা শুনিতেছি যে, মিত্রশক্তির পক্ষে রুশিয়াকে সাহায্য করার জন্য বিপদজনক ঝুঁকি না লইয়া যাহা করা সম্ভব, তাঁহারা তাহা করিতে ত্রুটি করিবেন না; কিন্তু ইউরোপের অন্য স্থানে রণাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া জার্মানদের পূর্বাভিমুখী বাহিনীর উপর চাপ না দিলে রুশিয়ার বর্তমান সঙ্কটের যে সমাধান হইবে, আমাদের ইহা মনে হয় না। ককেশাসের শিখরদেশে জার্মানদের গতি প্রতিহত না হইলে সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে এসিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে সম্প্রসারিত হইবে।

জাপানের ভবিষ্যৎ নীতি

চীনের লড়াইয়ের বেশী খবর এখন পাওয়া যাইতেছে না। জাপানের পরিকল্পিত পশ্চিমাভিমুখী সমরোদ্যমের কোন সাড়া নাই। চীনা মহল হইতে এই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, জাপানীরা রুশিয়া আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে মাঞ্চুকুওতে বিপুল সেনা সন্নিবেশ করিতেছে। স্ট্যালিনগ্রাডের পতন হইলে কিংবা ককেশাস অঞ্চলে রুশিয়া একটু বিব্রত হইলে জাপান ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবে এই আশায় রহিয়াছে কি না, এখনও বুঝা যাইতেছে না। এলুইসিয়ান দ্বীপপুঞ্জে কিছুদিন হইতেই জাপানীরা দশ হাজার সেনা নামাইয়া রাখিয়াছে। আমেরিকা হইতে রুশিয়ায় বেরিং সাগরের পথে সাহায্য যাহাতে না আসিতে পারে, ইহাই বোধ হয় জাপানীদের এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য; সুতরাং রুশিয়ার উপর তাহাদের যে নজর একেবারে না আছে, ইহা বলা যায় না। এদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে জাপানীরা সোলোমন দ্বীপ দখল করিয়া লইয়াছে। সুতরাং অস্ট্রেলিয়া আক্রমণের নীতিও তাহারা প্রত্যাহার করে নাই। সম্প্রতি মার্কিন সেনাদল সোলোমন দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করিয়াছে এবং জাপানীদের সঙ্গে তাহাদের প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে।

(এক)

মেসের ঘরে অনুপম খবরের কাগজের উপর ঝুঁকিয়া গভীর মনোনিবেশ করিয়াছে। তবে যে স্তম্ভগুলির উপর তাহার দৃষ্টি সেগুলি সংবাদের স্তম্ভে নহে, কর্মখালির বিজ্ঞাপন। এই কর্মখালির নোটিশ দেখিবার জন্য তাহাকে খাওয়ার পয়সা বাঁচাইয়া দুইতিনটা করিয়া খবরের কাগজ কিনিতে হয়; আরও দুই পাঁচটা বন্ধুবান্ধবের বাড়ি আর পাবলিক লাইব্রেরী আদি হইতে দেখিয়া আসে। এই বিজ্ঞাপনগুলি বাছিয়া শ্রেণীবিভাগ করিয়া তারপর সেগুলির উপযুক্ত আবেদন পাঠান হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর আবেদনের গৎ প্রায় ঠিকই আছে; সামান্য একটু আধটু অদলবদল করিতে হয় মাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এইরূপ একনিষ্ঠ অধ্যবসায়েরও কোনও ফল হইতেছে না। গত দুই বৎসর ধরিয়া মানে বি এ পাশ করিবার পর হইতেই, অনুপম বেকার। এই অবিচ্ছিন্ন বেকারত্ব তাহার মাথার বিকার সাধনের উপক্রম করিয়াছে।

আজও ভোরে প্রথানুযায়ী অনুপম কর্মখালির তল্লাস করিতেছে। চব্বিশ পঁচিশ বছরের স্বাস্থ্যবান যুবক; উজ্জ্বল শ্যাম গায়ের রং; নাকটা তীক্ষ্ণ, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ। গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, চুল এলোমেলো, দাড়ি বড় হইয়া উঠিয়াছে; ব্লেডের অভাবে কামানো সকল সময়ে সম্ভব হয় না।

এক পত্রিকা রাখিয়া সে অন্যটি ধরিল। কর্মখালির বিজ্ঞাপন-অরণ্যে পরশ পাথর আছে। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। অনুপম কয়টা বিজ্ঞাপন দাগাইয়া রাখিল। সবগুলি কাগজ দাগান হইয়া গেলে তবে কাঁচি বাহির করিবে। অতঃপর চা খাইয়া জবাব লেখা সুরু হইবে। বেকার অবস্থাটা যে কত বেশী এবং কত কঠিন কাজের সময়, অনুপম এক একদিন পরিশ্রান্ত হইয়া ভাবে, তাহা চাকরিতে মজবুত হইয়া বসা সুখী লোকেরা কিছুই বুঝে না!

অনুপম চাকর ভজহরিকে হাঁক দিল। চায়ের বেলা হইয়া গিয়াছে, অথচ হতচ্ছাড়াটাকে না ডাকিলে কোনও দিনই যদি সে ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়। আর এমন বেহায়া; এ বিষয়ে অভিযোগ করিলে মিটিমিটি হাসিয়া জবাব দেয়, "অমন বাঁধা-টাইমে হাজিরে চাও তো বাবু একটা রিষ্ট-ঘড়ি কিনে দাও।" একবার জবাবটা শুনুন, রিষ্ট-ঘড়ি! অনুপমকে চুপ করিয়া যাইতে হয়।

দুই তিনবার হাঁকিবার পরই ভজহরি হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রায় বছর পঞ্চাশের শ্যামবর্ণ গোলগাল লোকটি; মাথায় কিছু খাটো এবং ভুঁড়িটা কিছুটা বাড়ন্ত। সে একটা প্রশান্ত হাস্যে দন্তসমূহ বিকশিত করিয়া কহিল, "এজ্ঞে, কি কত্তে হবে বলো; হাঁক শুনে নীচেথে ছুটতে ছুটতে এনু।"

"তা বেশ করেছো; আর একটু তাড়াতাড়ি ছুটতে চেষ্টা করো, ভুঁড়িটা আরেকটু কমতে পারে।" বলিয়া অনুপম উঠিয়া র‍্যাকেটে টাঙ্গানো পাঞ্জাবীটার পকেটের দিকে অগ্রসর হইল। বিভিন্ন পকেট কতক্ষণ করিয়া হাতড়াইবার পর একটি মাত্র পয়সা বাহির করিয়া আনিয়া কহিল, "আধ পয়সার চা, আধ পয়সার বিস্কুট, আর বাকী যা থাকবে, সবটাই তোর।"

ভজহরি সহাস্যমুখে কহিল, "এজ্ঞে বুজলুম। কিন্তু আজকাল বড্ডই না খেয়ে পয়সা বাঁচাতে আরম্ভ করেচ।"

'বাঁচাতে আরম্ভ করেচি, তোকে বলেচে।' অসন্তুষ্ট সুরে অনুপম কহিল। "দারুণ কিনা আয় করচি যে পয়সা বাঁচাচ্ছি। আবার ঠাট্টা করা হচ্ছে, হতচ্ছাড়া কোথাকার। চাকরি পেলে তোকে আমি দশটাকা বকশিষ না দিই তখন দেখিস্, লক্ষ্মীছাড়া শুধু দু-পাঁচ দিন ধৈর্য ধরে' থাকো। রেলের চাকরিটা না হয়েই যায় না, কাল কি পরশুর মধ্যেই নির্ঘাৎ একটা খবর এসে পড়বে। অন্তত হনলুলু ট্রেডিং থেকে তো একটা পাওয়া যাবেই—এতে সন্দেহমাত্র নেই। তা ছাড়া বুলডগ কোম্পানী বা বাট্টামল চোট্টারাম অথবা 'অগ্নিকাণ্ড ম্যাচ ফ্যাক্টরি'—এন্তার আছে। কোনও না কোনওটা লেগে যাবেই; শুধু দু পাঁচ দিনের অপেক্ষা মাত্র।"

'এজ্ঞে।' বলিয়া প্রবন্ধ ভজহরি এক পয়সার চা-বিস্কুট আনিতে প্রস্থান করিল। অনুপম চেঁচাইয়া বলিল, "আসবার সময় নীচের চিঠির বাক্সে একবার খোঁজ করে' আসিস—শুনলি ভজহরি। ম্যানেজারবাবুকে দেখিয়ে......বেশ ভালো করে' বাক্সটার আনাচ-কানাচ খুঁজে দেখবি......

ঘরের এক কোণায় একটা ছোট তে-পায়াতে একটা পোর্টেবল্ টাইপরাইটার ছিল। এটা বর্তমানে অনুপমেরই; দাম কিস্তিতে পরিশোধ করা হইতেছে। দরখাস্ত লেখার পক্ষে টাইপরাইটার অপরিহার্য বলিয়াই অনুপমকে এই খরচটা বহন করিতে হইতেছে, নতুবা কিস্তি দেওয়া তাহার পক্ষে সহজ কথা নহে। সমস্ত টাকা শোধ করিয়া এটার মালিকত্ব অর্জন করা তারপক্ষে সম্ভব নহে, এটা অনুপম বেশ বুঝে। কিস্তি গুণিয়া দিয়া যতদিন কলটাকে রাখা যায়, তাই লাভ।

অনুপম টাইপরাইটারের মুখে কাগজ গুঁজিয়া দিল।

টাইপরাইটারের টকাটক আর অনুপমের বেসুরো কণ্ঠের সংগীতে চমৎকার জমিয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় ভজহরিকে লইয়া চায়ের প্রবেশ। চা-ই সাধারণত ভজহরিকে লইয়া প্রবেশ করে' কারণ অনুপম একাগ্রচিত্তে এই সময়ে চায়ের প্রবেশই কামনা করে। কিন্তু আজ অনুপম চকিতে দেখিল, ভজহরির হাতে একগোছা চিঠি। একলাফে অনুপম উঠিয়া পড়িল। চায়ের পেয়ালা দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; অনুপম একাগ্রভাবে চিঠিতে ছোঁ মারিল। চায়ের পেয়ালা মাটীতে ছিটকাইয়া পড়িয়া চৌচির হইয়া ভাঙিয়া গেল।

ভজহরি পা বাঁচাইয়া লইয়া কহিল, "কি কান্ড করলেন, দেখুন তো—কম করে' দু-তিন আনা দণ্ডের ফেরে পড়লেন; আধ পয়সার চায়ের জন্যে..."

অনুপম কহিল, "কুছ্ পরোয়া নেই। চিঠি দেখি; একটা চিঠিতে অমন পাঁচশো পেয়ালা কিনতে পারে, জানিস?" ব্যগ্র হইয়া অনুপম চিঠি খুলিতে লাগিল। ভজহরি পেয়ালার ভাঙা টুকরাগুলি কুড়াইতে কুড়াইতে আড়চোখে তাকাইয়া বাবুর মুখে উল্লাসের ছায়া খুঁজিতে লাগিল। কিছুই দেখিতে পাইল না এবং অন্য ঘর হইতে হাঁক আসায় শীঘ্রই সে প্রস্থান করিল।

অনুপম চিঠির পর চিঠি উল্টাইয়া যায়। ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর! ইংরেজিতে কোনওটায় লেখা "দুঃখিত, কাজ খালি নাই।" কোনওটায় বা লেখা "আনাড়ী লোকে আমাদের প্রয়োজন নাই।" একটায় পরের বৎসর আবেদন করিতে বলা হইয়াছে। একটায় লেখা "বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিকে আমরা কোনও মূল্য দেই না।" এটা নিশ্চয়ই কোনও দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়াবার সুযোগ পায় নাই, তাই এই রাগ, অনুপম সিদ্ধান্ত করিল। বাকী চিঠিগুলির কোনওটায় টাকার তাগিদ, কোনওটায় বা কেহ অর্থ সাহায্য চাহিয়াছে—হায়, বেকারের কাছেও সাহায্য চাহিবার মত আকিঞ্চন এদেশে আছে—কোনওটায় বা ক্লাবের চাঁদা বাকী পড়িয়াছে তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। একটির পর আর একটি চিঠি অনুপমকে হতাশ করিতে লাগিল। চিঠি খুলিবার আর উৎসাহ রহিল না। একটা বড় রকম নিশ্বাস ছাড়িয়া সে জানলার ধারে উঠিয়া গেল। সম্মুখেই একটা পার্ক; পুকুরে রূপার জল টলমল করে; গাছে রঙীন ফুল ফুরিয়াছে। এ সকল ডিঙাইয়া অনুপমের দৃষ্টি ওদিকের একটা বাড়ির দোতলার একটি জানালার দিকে যাত্রা করিল। এই জানলার ধারে একটি তরুণী মেয়ে বসিয়া পড়া তৈয়ারী করিতেছিল; প্রতিদিনই করে। অনুপমের দৃষ্টিও অহরহই এদিকে যাতায়াত করিয়া থাকে।

কতক্ষণ অনুপম অমনিভাবে জানলার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। অতঃপর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া টাইপরাইটারের কাছে প্রত্যাবর্তন। টকাটক টকাটক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সাদা কাগজে ব্লু-ব্ল্যাক অক্ষর—সার্,উইথ্ ডিউ রেস্পেক্ট অ্যান্ড আম্বল্ সাব্মিশন আই বেগ্ টু ষ্টেট......

ওদিকের বাড়ির মেয়ের নাম প্রতিভা। দোতলার ঘরের দক্ষিণের জানলার ধারে বসিয়া সে পড়া করিতে ভালবাসে। জায়গাটা পড়িবার জন্য খুবই ভলো তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু একটি অসুবিধা এই যে, দক্ষিণাবাতাসের দরুণ তাহার চোখ প্রায়ই উদাস হইয়া উঠে। আজও চোখ উদাস হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় তাহার পিতৃদেব পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ভদ্রলোক এক সাহেবী মার্চেণ্ট অফিসের কোন এক বিভাগের বড়বাবু। মানুষ জাতির উপর ভুজঙ্গধরবাবুর গভীর অবিশ্বাস। কেরাণীদের অবিশ্বাস করেন বলিয়াই সাহেবেরা তাহাকে এতটা পছন্দ করে। ভুজঙ্গধরও অধীনস্থদের উপর অতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, পাছে কেহ কাজে ফাঁকি দেয়। এই সতর্কতা অভ্যাসগুণে এমনই প্রকৃতিগত হইয়া গেছে যে, মানুষের উপর অবিশ্বাসকে তিনি কর্তব্যের নামান্তর বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বেঁটে মোটা ধূর্ত শৃগালের মতো লোকটি; হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরণে; গায়ে ছিটের শার্ট; জিনিসপত্রের ভারে বুকের পকেটটা ঝুলিয়া থাকে।

বাজার হইতে এইমাত্র ফিরিয়াছেন। রাস্তা হইতে কন্যার পড়িবার জায়গার জানলাটার দিকে নজর করিয়া তাহার চোখের ভাবটা দেখিয়া আশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া সরাসরি উপরে উঠিয়া আসিলেন।

পিছনে আসিয়া হাঁকিয়া কহিলেন; 'কি করা হচ্ছে শুনি?'

প্রতিভা চমকাইয়া উঠিয়া কোল হইতে বইটা তুলিয়া লইল।

'একশো দিন ধরে' বলচি,' ভুজঙ্গধর গর্জন করিতে লাগিলেন, 'টেবিল সরিয়ে নাও, জানলার ধার থেকে সরিয়ে নাও। তা কি শোনা হচ্চে? জানলার কাছে বসে ত্রিভুবনে কার কবে পড়া হয়েছে শুনি? মেসের কুচুণ্ডে অপদার্থ ছোকরাগুলোকে হাঁ করে' তাকিয়ে থাকবার অবকাশ দেওয়া হয় বৈ তো নয়! বড় খারাপ অভ্যেস করে' তুলচো।'

প্রতিভা কোনও জবাব দিল না দেখিয়া তাঁহার হতাশা আরও বাড়িয়া গেল। চীৎকার করিয়া গিন্নীকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কেন সাড়া না পাওয়ায় সারা বাড়ির নিকট অভিযোগ করিতে করিতে রান্নাঘরের দিকে, যেখানে গৃহিণী নিশ্চিন্ত ব্যাপৃত আছেন, প্রস্থান করিলেন।

প্রতিভা ঠিক করিল, চোখকে সে ইচ্ছেমত উদাস হইয়া উঠিতে দিবে না এবং জনলাটা অধিকতর এড়াইয়া চলিবে, অর্থাৎ বাবা বাড়ি থাকিতে জানালার ধারে কদাচ যাইবে না।

ক্রমশ

জামাই ষষ্ঠী

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

ইলিশ মাছ, মাংস, নূতন বেগুন, মিষ্টান্নের হাঁড়ি প্রভৃতি লইয়া প্রিয়নাথ ঘর্মাক্ত কলেবরে বাড়ি ঢুকিলেন।

ওগো শুনছ, এই হাঁড়িটা নামিয়ে নাও দেখি আগে। গেল বুঝি পড়ে—আর কটা নিই!......তবু এখনও আম, দই বাকি রইল। আমের যা দর, উঁকি মেরেছিলুম একবার কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে—আটটার বেশি দিতেই চায় না—

আপন মনেই প্রিয়নাথ বকিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল ইন্দ্রাণীর দিকে। এক হাতে তিনি হাঁড়িটা লইয়াছেন বটে, আর এক হাতে মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতেছেন—নিঃশব্দ কৌতুকের হাসি।

'কি হলো গো তোমার?'

ইন্দ্রাণী হাসিতে হাসিতেই বাকি জিনিসগুলো নামাইয়া লইয়া রান্নাঘরে রাখিলেন। তারপর কহিলেন,—একটা মজা দেখাব? একবার ওপরে এস—

প্রিয়নাথ ইন্দ্রাণীর এই অবস্থায় অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। অপরাহ্নের আর বেশী দেরী নাই, জামাই এখনই আসিয়া পড়িবে—রান্নাবান্না সব এখনও বাকি—এখন কি তাহার মজা দেখিবার সময়?

আরও একবার মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন, কী ব্যাপার বলো তো? আজ তোমার হলো কি?

ইন্দ্রাণী তবুও কোন জবাব দিলেন না, অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাঁহাকে পিছনে আসিতে বলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। অগত্যা প্রিয়নাথবাবুও তাঁহার পিছু পিছু উপরে উঠিলেন এবং দোতলায় সংকীর্ণ বারান্দাখানি পার হইয়া দালানে পৌঁছিলেন।

গলির ভিতরে প্রিয়নাথবাবুর বাড়ি, কিন্তু খুব ভিতরে নয়। মোড়ের একখানি বড় বাড়ির ঠিক পিছনেই তাঁহাদের বাড়িটা পড়ে। সেই জন্য সামনের তিনতলা বাড়িটা বড় রাস্তা আড়াল করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের শয়নকক্ষের একটা জানলা হইতে এক ফালি রাস্তা দেখা যায়। ইন্দ্রাণীর সংকেতমত প্রিয়নাথ নিঃশব্দে শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের নববিবাহিতা কন্যা অনুকণা সেই জানলাটিতে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে বড় রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। অনেকক্ষণ লোহার গরাদেতে কপাল চাপিয়া থাকার ফলে লোহদণ্ডের দুইটা রক্তিম ছাপ নিবিড় হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার কপালের দুইদিকে।

প্রথমে ব্যাপারটা প্রিয়নাথ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু একটু পরে তাঁহার মুখে কৌতুকের হাসি দেখা দিল। তিনি একবার প্রসন্ন-মুখে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর আগের মতই চুপি চুপি নীচে নামিয়া আসিলেন।

ইন্দ্রাণী নীচে আসিয়া মন্তব্য করিলেন, আজকালকার মেয়েদের আর বিয়ে হবার জো নেই! ...ব্যস, বর ছেড়ে আর একটি মিনিটও থাকা চলে না—

প্রিয়নাথবাবু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, দোষটা আজকালকার মেয়েদেরই বটে। তুমি ঠিক ঐ জানলায় অমনি করে দাঁড়িয়ে থাকতে না? যেমন মা তেমনি মেয়ে হয়েছে, ওর আর দোষটা কি?

তিনি ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। ইন্দ্রাণী লজ্জায় লাল হইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার জন্য চা আনিতে গেলেন।

এক মুহূর্ত মুখ-হাত ধুইয়া চা ও জলযোগের পর প্রিয়নাথবাবু আবার বাজারের দিকে বাহির হইয়া পড়িলেন। অনুকণার বিবাহের পর এই প্রথম জামাইষষ্ঠী—অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটিই তিনি রাখিবেন না। আর রাখিবার বিশেষ কারণও ছিল না। প্রিয়নাথের আয় সাধারণ বাঙালীর হিসাবে মন্দ নয়—সন্তান ঐ অনুকণা এবং একেবারে দুগ্ধপোষ্য একটি ছেলে। সংসারে অন্য পোষ্যও বিশেষ ছিল না, একটিমাত্র বিধবা বোন, তাহাতে বরং সাশ্রয়ই হইত। সে বোনেরও স্বতন্ত্র আয় ছিল।

প্রিয়নাথ চলিয়া গেলে ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি কাজে মন দিলেন। অনেক রান্না তখনও বাকি, বেলা আর বেশী নাই। ননদ শান্তির রান্না ভাল, তিনিই রাঁধিতেছিলেন, ইন্দ্রাণীর কাজ শুধু জোগাড় দেওয়া, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে জোগাড় দেওয়াতেই খাটুনি বেশী।

কিন্তু সহস্র কাজের মধ্যেও কথাটা ইন্দ্রাণী মন হইতে দূর করিতে পারেন নাই। বার বার তাঁহার নিজের প্রথম যৌবনের কথা মনে হইতেছিল। ঠিক ঐ বয়সেই তাঁহারও বিবাহ হইয়াছিল এবং ঐভাবেই প্রত্যহ তিনি স্বামীর আগমনের পথ চাহিয়া থাকিতেন। আশ্চর্য! সেই বিশেষ গরাদেই অনু মাথা রাখিয়াছে!........শুধু কি এখানে? পিত্রালয়ে গেলেও তিনি স্বামীর আসিবার দিনটিতে বার বার রাস্তার দিকের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইতেন। এজন্য ভাইবোনদের কাছে কত লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে। ভাগ্যিস তাঁহার বাড়িতে বেশী লোকজন নাই, নহিলে আজ অনুকণারও রক্ষা থাকিত না—

কথাটা মনে হইয়া ইন্দ্রাণী আপনা-আপনিই হাসিয়া উঠিলেন। শান্তি ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, আ মর,—আপন মনে হেসে মরছিস কেন? কি হলো আজ তোর?

দুজনে প্রায় একবয়সী—এজন্য 'তুই-তোকারী'ই চলিত। ইন্দ্রাণী কহিলেন, তোর ভাইঝির কাণ্ডটা একবার দেখে আয় না—সেই থেকে হাঁ করে রাস্তার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে—

শান্তির মুখখানা এক মুহূর্তের জন্য কেমন হইয়া গেল। এ রোগ তাঁহারও ছিল। কিন্তু একটু পরেই হাসিয়া কহিলেন, তাতে হয়েছে কি? তুই থাকতিস না অমনি করে দাদার জন্যে?

ইন্দ্রাণী জবাব দিলেন, আমাকেই কি তোরা ছেড়ে দিয়েছিলি? কম যন্ত্রণা সইতে হয়েছে তার জন্যে?

শান্তি কি একটা উত্তর দিতে গিয়া চাপিয়া গেলেন, কারণ অনুকণা তখন গামছা কাঁধে করিয়া নীচে নামিতেছিল, বোধ হয় গা ধুইতে যাইবে। সিঁড়ির পাশেই রান্নাঘর, নীচে নামিয়া একবার দরজার কাছে থমকিয়া দাঁড়াইল, কি ভাজছ-গা পিসিমা, বেশ গন্ধ ছেড়েছে—

তখনও তাহার কপাল হইতে গরাদের দাগ মিলায় নাই। সেদিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া পিসিমা জবাব দিলেন, তুই সারাদিন আছিস কোথায়? তোর বর খাবে, আমরা খেটে খেটে মরব নাকি? আয় দেখি এদিকে, কোমর বেঁধে লাগ দেখি—

বয়ে গেছে আমার! তোমরা নেমন্তন্ন করেছ, তোমরা বুঝবে—সে মাথা দুলাইয়া কলঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ইন্দ্রাণী কহিলেন, তোরও যেমন। ওর প্রাণ পড়ে আছে সেই জানলার দিকে। তবে নেহাৎ 'ভাবন'টাও না করলে নয়, তাই—

খানিকটা পরে কী একটা কাজে ইন্দ্রাণী উপরে উঠিয়া দেখিলেন, শান্তির ঘরের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াইয়া অনুকণা প্রসাধন করিতেছে—। এই কাজটাতে সে খুব পটু নয়, তবু নিজেই করিতে যায়। চুল বাঁধা আর কিছুতে ঠিক হয় না,

খুলিতেছে, বার বার বাঁধিতেছে। অনুকণা সুন্দরী নয়। মায়ের অসাধারণ রূপের কিছুই সে পায় নাই, বাবার ধাতে গিয়াছে—নিতান্ত সাধারণ চেহারা। কুৎসিত নয়, এই পর্যন্ত। সেই জন্যই তাহার প্রসাধনের সখটা খুব বেশী, কিন্তু পারিয়া ওঠে না।

দালানের ও-পাশে তাহাদের আয়না-বসানো আলমারিতে ইন্দ্রাণীর চেহারাটা প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, এখনও তাহার রূপ-শিখার মত। ললাটে সামান্য দু'-একটি রেখা দেখা দিয়াছে হয়ত, কিন্তু দূর হইতে তাহা কিছুই বুঝা যায় না। সন্তানাদি বেশী না হওয়ায় দেহের বাঁধুনী তখনও ভালই আছে—সামান্য একটু মোটা হইয়াছে বটে, তবে সে কিছু নয়। সেদিকে চাহিয়া মেয়ের প্রতি মমতায় মন ভরিয়া উঠিল। আহা বেচারি, ভগবান উহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন যখন, তখন সাজগোজ একটু দরকার বৈকি!......

তিনি ঘরে ঢুকিয়া সস্নেহে কহিলেন, আয় আমি মাথাটা ভাল করে বেঁধে দিই—

অনুকণা ফোঁস করিয়া উঠিল, হ্যাঁ, তবে হয়েছে আর কি! তোমাদের সে-সব সেকেলে চুল বাঁধা এখনকার দিনে চলে কি না! তাহ'লে আর আমি কারুর সামনে বেরোতেই পারব না—। তুমি যাও, আমি ঠিক বেঁধে নিচ্ছি।

তা বটে!...... মেয়ে বৎসর দুই-তিন ইস্কুলে গিয়াছিল, তাহাতেই এই। ইন্দ্রাণী ম্লান হাসিয়া কহিলেন, একেবারে কারুর সামনে বেরোনো যায় না, হ্যাঁরে—? আমাদের তাহ'লে ঘেরাটোপ পরে থাকা উচিত বল্!......যা খুশী করগে যা—

তিনি ক্ষুব্ধমনেই নীচে নামিয়া আসিলেন। তিনি কি এতই বুড়া হইয়া পড়িয়াছেন যে, সাধারণ কাণ্ড-জ্ঞানও নাই? মেয়ে কি মনে করে তাহাকে? ইন্দ্রাণী হিসাব করিয়া দেখিলেন মাত্র আঠার বৎসর তাহার বিবাহ হইয়াছে—কিন্তু অতও মনে হয় না। মনে হয় এই ত সেদিনের কথা—যখন তিনি নবোদ্ভিন্না কিশোরী! তাঁহাদের প্রণয়লীলা হইতে এখনকার কিশোরীদের প্রণয়লীলা ত কিছুমাত্র স্বতন্ত্র নয়, প্রত্যেক অভিব্যক্তিই ত এক! তবে ইহারা নবীনত্বের কি এত গর্ব করে?

নীচে আসিতেই শান্তি একটা ফরমাস করিলেন, তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, তাহার উত্তরে ইন্দ্রাণী কিছু একটা পরিহাস করিবেন, কারণ ফরমাসের ভিতর অন্য অর্থ ছিল। কিন্তু ইন্দ্রাণী একটাও কথা না কহাতে বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন, কি হলো তার বৌদি, মুখ অত ভার কেন?

ইন্দ্রাণী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, কৈ না, কিছু ত হয়নি।

জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিলেও কথাটা তিনি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিলেন না। কাঁটার মত খচ খচ করিতেই লাগিল। এককালে শুধু তাঁহার রূপেরই গৌরব ছিল না, প্রসাধনেরও ছিল। মনে পড়ে, বিবাহের পরও কত বাড়ির কুমারী মেয়ে 'কনে দেখা' দিবার পূর্বে তাঁহার কাছে প্রসাধনের পাঠ লইয়া গিয়াছে। জবরজঙ্গ তিনি কোন দিনই ভালবাসিতেন না, উগ্র পাউডার বা আলতা বা রঙও তিনি কখনও ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু তবু তাঁহার সহজ, সুন্দর পারিপাট্যে সকলেই তখন মুগ্ধ হইত। অতি বড় খুঁতখুঁতে দৃষ্টির সামনেও তিনি পরীক্ষায় পাশ হইয়াছেন......আর এই কয়টা বৎসর যাইতে না যাইতে তাঁহারই কন্যা তাঁহাকে একেবারে বুড়া-হাবড়ার দলে ফেলিয়া দিল!

অথচ, ঐ অনুকণা জন্মিবার পরই—ঘটনাটা ইন্দ্রাণীর মনে পড়িয়া গেল—তাঁহার সূতিকার মত হইয়া চেহারা খুব খারাপ হইয়া যায়। ঠিক সেই সময় লাহোর হইতে চিঠি আসিল যে, দীর্ঘ বার বৎসর পরে তাঁহার জ্যাঠশ্বশুর বাড়ি আসিতেছেন এবং আসিতেছেন শুধু ইন্দ্রাণীকে দেখিবার জন্যই। শ্বশুর ত ভাবিয়াই আকুল স্পষ্টই একদিন বলিলেন, বৌমা তোমার রূপের কত প্রশংসা করে চিঠি লিখেছি, এখন এই অবস্থায় দেখে দাদা কি মনে করবেন কে জানে!

[illegible]ণী হাসিয়াছিল সেদিন মনে মনে। তাহার পর জ্যাঠশ্বশুর যখন সত্যসত্যই আসিয়া পৌঁছিলেন এবং ইন্দ্রাণীর ডাক পড়িল, তখন ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া শুধু জ্যাঠামশাই-ই বিস্মিত হন নাই, তাঁহার শ্বশুরও হইয়াছিলেন। আড়ালে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, বৌমা, তোমার চেহারা কি ভোজবাজিতে বদলে গেল?

আজ সেই ইন্দ্রাণীকে অপমান করিয়া বসিল ঐ একফোঁটা মেয়ে অনুকণা? হায়রে সতেরো বৎসর! •

সহসা শান্তির কথায় যেন ইন্দ্রাণীর তন্দ্রা ভাঙ্গিল, তুই এবার গা ধুয়ে নিলি না কেন বৌদি, প্রথম জামাইষষ্ঠী, জামাই এসেই ত প্রণাম করবে। তোকে আমাকে দুজনকেই। সন্ধ্যের ত আর দেরি নেই—

তা বটে। ইন্দ্রাণী কহিলেন, তা তুমিই সেরে নিলে না কেন ঠাকুরঝি?

শান্তি হাসিয়া কহিলেন, আমার আর সারাসারি কি, একখানা ধোয়া কাপড় পরা, এইত? নেহাৎ নূতন জামাইয়ের সামনে বেরোনো তাই। রান্নাটা, এদিককার শেষ করে মাংসটা চাপিয়ে একেবারে চান করতে যাব, তুই তখন বরং একটু দেখিস। এখন আমি দেখছি। তাছাড়া সন্ধ্যে হয়ে গেল, মাথা বাঁধবি কখন?

ইন্দ্রাণী অগত্যা হাতের সামান্য কাজটুকু সারিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। অনুকণার প্রসাধন তখন শেষ হইয়াছে, সে ওঘরে গিয়া আবার জানলায় দাঁড়াইয়াছে।

ইন্দ্রাণী মাথা বাঁধার সরঞ্জাম লইয়া আয়নার সামনে আসিয়া বসিলেন। কথাটা তখনও মাথাতে ছিল, তুচ্ছ কথা বলিয়া বার বার মনকে তাড়না করিলেও একেবারে ভুলিতে পারেন নাই, তাই আয়নার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই অকস্মাৎ চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। একবার পিতামহকে ভোজবাজি দেখাইয়াছিলেন, আর একবার পৌত্রীকে দেখাইবেন নাকি? মেয়েকে তাহার ধৃষ্টতার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয় তাহা হইলে। দোষ কি? বেমানান দেখাইবে? কিন্তু কেন?...... কী এমন বয়স হইয়াছে তাঁহার যে, সাজগোজ একেবারেই বাদ দিতে হইবে?

ইন্দ্রাণী মনে মনে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। একটু যে লজ্জাবোধ হইতেছিল না তাহা নয়, কিন্তু তিনি মনকে বার বার বুঝাইতে লাগিলেন যে, ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। জামাইয়ের সামনে একটু পরিষ্কার হইয়া বাহির হওয়াই প্রয়োজন, আর তিনি ত এমন কিছু ঘটা করিতেছেন না। কেহ হয়ত টেরই পাইবে না যে, তাঁহার সেদিনকার বেশভূষায় কিছু পারিপাট্য আছে—

মাথা বাঁধিবার সময় ইন্দ্রাণীর হাত কাঁপিতে লাগিল।

প্রসাধন শেষ করিয়া কাপড় বদলাইতেছেন এমন সময় নীচে জামাতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ঝিকে প্রশ্ন করিতেছে, মা কোথা হরির মা?

দ্রুত হাত চালাইয়া কাপড়-পরা শেষ করিয়া ফেলিলেন তিনি। অনিল ইহারই মধ্যে আসিয়া গেল। সবে ত সন্ধ্যা হইয়াছে। প্রিয়নাথবাবুও ফেরেন নাই যে তিনি অভ্যর্থনা করিবেন। শান্তির তখনও স্নান পর্যন্ত সারা হয় নাই। না, তাঁহাকেই আগে দেখা দিতে হইবে, উপায় নাই—

ততক্ষণে অনিলের পদশব্দ সিঁড়িতে শোনা যাইতেছে। অনুকণা মাথায় কাপড়ের প্রান্তভাগটুকু তুলিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দালানের বড় আলোটা সে আগেই জ্বালিয়া দিয়াছিল—সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উজ্জ্বল আলোতে আগে তাহাকেই নজরে পড়ে, এমনি একটা গোপন ইচ্ছা বোধ হয় ছিল।

হইলও তাহাই। চোখে চোখে মিলিতেই প্রচ্ছন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল দুজনের চোখে। তবু রীতির অনুরোধে অনিল প্রশ্ন করিল, মা কোথায়? তাঁকে প্রণাম করতে হবে যে—

অনুকণা ডাকিল, মা।

মৃদু চাপা কণ্ঠে উত্তর আসিল, এই যে যাই—

তাহার পরই ইন্দ্রাণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

উজ্জ্বল আলো তাঁহারও মুখেচোখে আসিয়া পড়িয়াছে। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেদিকে চোখ পড়িতেই বিস্ময়ে অনিল যেন পাথর হইয়া গেল। শাশুড়ীকে সে ত কয়েকবারই দেখিল, কিন্তু তিনি কি এত রূপসী, আর এত অল্প বয়স? সে পলকহীন চোখে চাহিয়াই রহিল, প্রণাম করার কথা মনেই পড়িল না।

অনুকণারও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সহজ কবরী রচনা, সামান্যতম পাউডার এবং সাধারণ একখানা ঢাকাই সাড়িতে এমন ইন্দ্রজাল রচনা করিতে পারে? আশ্চর্য!.........

ইন্দ্রাণী যখন প্রসাধন করিয়াছিলেন, তখন একমাত্র কন্যার অবহেলার প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছাটাই নেশার মত পাইয়া বসিয়াছিল, আর কোন কথা তাঁহার খেয়াল ছিল না। জামাতার কথাটাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন অনিলের বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চাহিয়া তিনি লজ্জায় মরিয়া গেলেন। ছি, ছি,—জামাই কি ভাবিতেছে।......কেন মরিতে তিনি এ কাজ করিলেন, এখন যে ছুটিয়া পলাইবারও উপায় নাই!

ইন্দ্রাণী মাথা নত করিতে অনিলেরও সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে চারটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল।

পিসিমা কোথায়, মা?

আসছেন বাবা। তুমি ও ঘরে বোসো, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি—বলিয়া তিনি একরকম ছুটিয়াই শান্তির ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। তখন মনে হইতেছে, 'ধরিত্রী দ্বিধা হও'। পিছন হইতে জামাতার কণ্ঠস্বর কানে আসিল, চুপি চুপি অনুকণাকে বলিতেছে, মাকে বেশ মানিয়েছে, না?

একটা শুষ্ক 'হুঁ' বলিয়া অনুকণাও এ ঘরে আসিল। তখন তাহার বিস্ময়, রীতিমত উষ্মায় পরিণত হইয়াছে। সে আসিয়া চাপা গলায় ভর্ৎসনার সুরে মাকে বলিল, ছি ছি, মা, কী করেছ? জামাইয়ের সামনে এমনি করে বেরোয়? কি মনে করলেন উনি বলো দেখি!...... তুমি না হয় লজ্জাসরমের মাথা খেয়েছ, আমরা মুখ দেখাই কি ক'রে?

খুব বিচলিত না হইলে এ ভাষা অনুকণার মুখ দিয়া বাহির হইত না।

জবাব ইন্দ্রাণীর মুখের কাছেই আসিয়াছিল। একবার ভাবিলেন তিনি, যে বলেন, 'কেন রে, আমি ত কিছুই জানি না। তা ছাড়া তোর মত রুজ-লিপষ্টিক-পেন্ট-রংগীন কাপড় কিছুই ত ব্যবহার করিনি। তবে তোর অত ঝাল কেন? কিন্তু কী যেন একটা দুর্নিবার লজ্জা আসিয়া তাঁহার কণ্ঠ রোধ করিয়া ধরিল, তিনি কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। কন্যার উপর বিজয়গর্বের কণামাত্রও তাঁহার ভোগ করা হইল না। দ্রুত পদে নীচে নামিয়া গেলেন।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়া নামিতেই প্রিয়নাথের সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি তখন দ্বিতীয় দফার বাজার সারিয়া ফিরিতেছিলেন। বাড়িতে ঢুকিতে ঢুকিতে প্রশ্ন করিলেন, কী গো, জামাই এসে গেছে নাকি?

তখন আলো-আঁধারে অতটা ঠাওর হয় নাই। এখন উঠানে পা দিতেই ইন্দ্রাণীর দিকে চাহিয়া চোখ ধাঁধিয়া গেল তাঁহার। মুহূর্তের জন্য হয়ত চোখে মুগ্ধ দৃষ্টিও ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে কহিলেন, এ করেছ কি? আজকের দিনে এমনি করে সাজে? জামাই দেখলে কি ভাববে বলো দেখি—। হয়ত মনে করবে যে তুমিই তার মন ভোলাতে চাও—

চুপ!

অকস্মাৎ ইন্দ্রাণী ঢাকাই শাড়ির আঁচলটা গা হইতে খুলিয়া লইয়া চড় চড় করিয়া খানিকটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, তাহার পর হাঁফাইতে হাঁফাইতে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, হ'লো ত? বাপ-বেটীর মনস্কামনা সিদ্ধ হ'লো ত?......এখন হরির মার একখানা ছেঁড়া কাপড় এনে দাও পরি—

হতভম্বের মত খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া প্রিয়নাথ কহিলেন, কী হ'লো আবার?

হবে আবার কি! আমি তোমাদের বাড়ির দাসীবাঁদী, সে কথা ভুলে একখানা ফরসা কাপড় পরেছিলুম, এই ত আমার অপরাধ যাক্—সে অপরাধ আর হবে না। ঐ হরির মার কাপড় পরে জামাইয়ের সামনে বেরোব—

শান্তি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, কী হয়েছে বৌদি?

ইন্দ্রাণী একেবারে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মুখ রাখিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, আমার জামাই হয়েছে ব'লে এয়োস্ত্রীর লক্ষণ করবারও উপায় নেই ঠাকুরঝি, এরা যা মুখে আসে তাই বলে—

(২৫)

মহেশ ব্যস্তভাবে মস্ত বড় মাছ হাতে লইয়া বাড়িতে প্রবেশ করার পথে সুমন্তকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন, মুখখানা গম্ভীর করিয়া কথাটাকে যথাসম্ভব মিষ্ট করিয়া নরমস্বরে ডাকিলেন, "শোন বাবাজী, একটা বড় জরুরী কথা আছে।"

একেবারে "বাবাজি,—"

আহ্বানটা কানে কেমন যেন খট্ করিয়া বাজে। চিরদিন যেখানে চলিয়াছে রেষারেষি, সম্প্রতি মোকদ্দমা করিয়া হারিয়া গিয়া মহেশ রীতিমত আগুনের কুণ্ডের মত হইয়া আছেন, সুমন্তের মুখ পাছে দেখতে হয়, সেইজন্য এদিককার পাঁচিলের দরজা ইট দিয়া গাঁথাইয়া অন্যদিকে দরজা তৈরী করিয়াছেন। সেই মহেশ আজ নিজে গায়ে পড়িয়া বাবাজী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন—এ যেন আকাশের চাঁদ মাটিতে নামিয়া আসা।

সুমন্ত থমকিয়া দাঁড়াইল, বিনীতভাবে বলিল, "আমায় বলছেন কাকামশাই—?"

এই বিনীত ভাবটাও সম্পূর্ণ পরিহাস।

মহেশের আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায়, তথাপি একটু হাসিয়া বলিলেন, "আর কেউ যখন নেই, তখন তোমাকেই বলছি বই কি। হ্যাঁ, বলছিলুম কি,—আমার শ্যালী দুদিনের জন্যে পাড়াগাঁয় বেড়াতে এসেছেন,—তাঁকে চেনো না বোধ হয়; দুই বছর আগে তাঁর মেয়ে শাশ্বতী এখানে এসেছিল, তাকে তো দেখেছিলে। বালীগঞ্জের বিখ্যাত ধনী, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী ব্যবসায়ী মিঃ বোসের নাম না জানে আজ কেবল বাঙলায় কেন, সারা ভারতে এমন লোক নেই। তাঁরই স্ত্রী, মানে আমার শ্যালী কয়েকদিনের জন্যে এই পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে এসেছেন কি না—যে কয়দিন তিনি থাকবেন, সেই কয়টা দিন বাপু তোমায় একটু শান্ত হয়ে থাকতে হবে। মানে সেই যে একদিন যেমন কীর্তন গেয়েছিলে না, তেমন ধারা করলে—"

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া সুমন্ত বলিল, "রামো, কি যে বলেন আপনি কাকামশাই, ভদ্রমহিলা কলকাতা—তার ওপর বালিগঞ্জের লোক, তাঁকে কখনও আমি ত্যক্ত করতে পারি? না না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—তাঁর চোখে আমাদের গাঁকে আমি কক্ষনও ছোট করব না। হ্যাঁ, ও মাছটা পেলেন কোথায়—কিনলেন বুঝি?"

কুণ্ঠিতভাবে মহেশ বলিলেন, "আর বল কেন বাবাজী, রঘু জেলের কাছ হতে আনছি সের তিনেক হবে—দাম বলে কি না গোটা এক টাকা।"

রাগ করিয়া সুমন্ত বলিল, "ক্ষেপেছেন আপনি, আপনার কুটুম্ব এসেছেন, তিনি কি আমারও কেউ নন? আপনাকে ও মাছের দাম দিতে হবে না, ও মাছ আমারই পুকুরের, রঘুর সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। দাম দেন নি তো এখনও?"

মহেশ বলিলেন, "না—"

সুমন্ত বলিল, "দেবেন না। আর উনি যে কয়দিনই থাকুন না, আপনার যা কিছু দরকার হবে, এদিক হতে নেবেন। মাছ হোক, আমার বাগানের তরিতরকারী হোক, আপন পর করবেন না যেন, নিজের বলেই নেবেন। কুটুম্ব,—কখনও আসেন না, দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসে আমাদের মনোমালিন্য ঝগড়াঝাঁটির কথা যেন কিছু না জানতে পারেন। ওঁকে মোটে জানানরই দরকার নেই—এসব আপনার নয়—বুঝলেন তো কাকামশাই—"

দুই পা অগ্রসর হইয়া গিয়া ফিরিয়া সে বলিল, "দেখুন আমার বাগানের তরকারী আমি এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি চুপি চুপি কাকিমাকে একটু বলে রাখবেন—নচেৎ হয়তো হৈ হৈ করে উঠবেন, যাতে নতুন কুটুম্বের কাছে সবই ফাঁস হয়ে যাবে।"

ভারি খুসি হইয়া মহেশ চলিয়া গেলেন।

দীর্ঘ দুই বৎসরের মিলাইয়া যাওয়া শাশ্বতী নূতন করিয়া সুমন্তের মনে জাগিয়া উঠিল।

কি অস্থির প্রকৃতির মেয়ে, এক পলকের দৃষ্টিপাতে সুমন্ত বুঝিয়াছে, এই চঞ্চল মেয়েটি কোনদিন কোন বন্ধন মানিবে না,—কোন বাধা ইহাকে ঠেকাইতে পারিবে না, নিজের বেগে এ ছুটিয়া চলিবে। সুমন্ত বুঝিয়াছে, এ মেয়ে সংসার পাতিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, গঠন ইহার পক্ষে অসম্ভব, এ শুধু ভাঙিবে, সব কিছু গুঁড়াইয়া ছাড়িবে।

সেই শাশ্বতীর মা আসিয়াছেন—

সুমন্ত নিজেই তৎপরতার সঙ্গে বাগানে গিয়া এক ঝুড়ি তরকারী তুলিয়া দিবাকরের মাথায় দিয়া পাঠাইয়া দিল।

থাকমণি তখন রন্ধনে ব্যাপৃত,—মাজা চকচকে হাঁড়িতে ভাজা মুগের ডাল উনানে বসাইয়াছেন—তাহার সুগন্ধে সারা বাড়ি ভরিয়া উঠিয়াছে। মস্ত বড় মাছটা বারান্ডায় পড়িয়া আছে, দাসী মোহিনী পুষ্করিণীতে জল আনিতে গিয়াছে, আসিয়া মাছটাকে কুটিয়া দিবে। ব্রজসুন্দর সম্প্রতি জ্বর হইতে উঠিয়াছে—আহার্যের উপর তাহার এমন দারুণ লোলুপ দৃষ্টি, রান্নাঘরের দরজার পাশে একখানা পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া সে আলুর খোসা ছাড়াইতেছে। এমনই সময় দিবাকর তরকারীর ঝুড়িসহ পৌঁছিল। বারান্ডার একধারে ঝুড়িটা নামাইতেই ব্রজসুন্দরের চোখ পড়িল। দিবাকর কোনদিন এদিকে আসে না—আজ তাহাকে তরকারীর ঝুড়ি মাথায় করিয়া আসিতে দেখিয়া সে বড় কম বিস্মিত হইল না—বঁটিখানা কাৎ করিয়া রাখিয়া বারান্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল।

দুই হাত কোমরে রাখিয়া আদেশের সুরে বলিল, "এসব কি দিবাকর?"

কুণ্ঠিতভাবে দিবাকর বলিল, "বাগানের তরকারী, খোকাবাবু পাঠিয়ে দিলেন।"

দৃপ্তকণ্ঠে ব্রজসুন্দর চেঁচাইয়া উঠিল, "কেন, আমাদের তরকারী কিনবার যোগ্যতা নেই—তাই তিনি দয়া করে বাগানের তরকারী পাঠিয়ে দিলেন? আঃ জুতো মেরে আবার গরু দান—নিয়ে যাও তোমার তরকারীর ঝুড়ি ফিরিয়ে দিবাকর, বাজারে দিলে তবু দুপয়সা আয় হবে এখন।"

সকড়ি হাত ধুইয়া থাকমণি বাহিরে আসিলেন, ততক্ষণে মহেশও সন্ত্রস্তভাবে আসিয়া পড়িয়াছেন।

গালে হাত দিয়ে থাকমণি বলিলেন, 'আ পোড়াকপাল, কতকগুলো কচু-ঘেঁচু আর বেগুন-মুলো—এ সব হবে কি শুনি?"

মহেশ শশব্যস্তে বলিলেন, "আঃ, কি কর তোমরা, একেবারে যে বাজার বসিয়ে দিয়েছো গো, সুমন্ত যা পাঠিয়েছে ঘরে তোল, বেগুন, মুলো, কচু, ঘেঁচুও পয়সা দিয়ে কিনতে হয় তা তো জানিস নেজো, বিনা পয়সায় কিছু মেলে না। পুকুর হতে কলমী শাক খুঁটে আনতে পারলে পয়সা লাগে না, কিন্তু ওই খুঁটে আনা মুস্কিল বলেই না গাঁটের পয়সা ভাঙিয়ে কলমী শাকও কিনতে হয়।"

স্ত্রীর পানে তাকাইয়া রোষকষায়িত নেত্রে বলিলেন, "কুটুম্ব এসেছে বাড়ি, কেলেঙ্কারী না করলে চলবে কেন? তরকারী নিতে গায়ে বাধছে, ওই মাছও তো সুমন্তের পুকুরের মাছ, ওর বেলায় তো বাধছে না।

দিবাকরের পানে তাকাইয়া মুখে এক ঝলক শুষ্ক হাসির রেখা ফুটাইয়া বলিলেন, "তুমি যাও দিবা, এসব গাঁওটুলে মেয়েমানুষের মরিচ-ফোড়ণ দেওয়া কথা নাই বা শুনলে, সুমন্তকেও এসব কথা বলো না বাপু, তোমায় "ব্যগ্রতা" করছি। যেমন আমার কুলধ্বজ ছেলে, তেমনই আমার গুণবতী পরিবার, আমার হাড়মাস ভাজা হয়ে গেল ওঁদের ওই বচনের গুতোয়। যাও বাবা দিবা, তুমি বাড়ী যাও, বলো সুমন্তকে—আমি ভারি খুসি হয়েছি, ভারি আনন্দ পেয়েছি—"

দিবাকর একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। তরকারীর ঝুড়িটা মহেশ ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া তরকারীগুলো নামাইতে নামাইতে বিস্মিত পুত্র ও স্ত্রীর পানে তাকাইয়া সগর্জনে বলিলেন, "তোমাদের আর কি, দিব্যি পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে দুবেলা 'কুঁড়েপাথর' ঠাসবে, আর তার ঠেলা পোয়াতে হবে এই হতভাগার—সে সব এনে যোগাতে হবে,—পান হতে চুণ খসলে নিস্তার নেই। এই যে তরকারী বাজারে গেলে কম সে কম এক টাকায় বিক্রী হতো, নিজে বাজার করি—দর জানি তো। ওই যে গো, তোমার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, জিজ্ঞাসা করে দেখ—মুলো বেগুনের সের কত করে? চিরকাল কখনও দেখিনি সাক মুলো কাঁচকলা সেরে বিক্রি হয়, আমাদের এই গাঁয়ে কালে কালে তাও হল—?"

বলিতে বলিতে তাকাইয়া দেখিলেন—মিসেস বোস ওরফে কাত্যায়ণী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

"বাঃ, চমৎকার মাছ, টাটকা তরকারী তো রায় মহাশয়, এসব পেলেন কোথায়,—বাজারের? কত দাম নিলে বলুন তো?"

একবার স্ত্রী-পুত্রের পানে অপাঙ্গে তাকাইয়া মহেশ হাসিমুখে বলিলেন, "দাম—দাম আবার কিসের? এ আমারই পুকুরের মাছ, আমারই বাগানের তরকারী, এইমাত্র মালি এনে দিয়ে গেল।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মিসেস বোস বলিলেন, "বেশ আছেন আপনারা, পুকুর ভরা মাছ, বাগান ভরা তরকারী গোলা ভরা ধান,—মা লক্ষ্মী আপনাদের মাথায় দু'হাত দিয়ে আশীর্বাদ ধারা ঢেলে দিয়েছেন। আমার সেই ছোট বেলাকার কথা মনে পড়ে রায় মশাই, ওই কোণের তুলসী তলায় রোজ সন্ধ্যেবেলা প্রদীপ দিতুম জেলে, সাঁজের প্রদীপের আলোয় সারাবাড়ী উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। আজ যেখানে আছি, সেখানে দরকার পড়লে ইলেকট্রিক আলো জেলে দেই—চোক ঝলসানো সাদা আলোয় বাইরের আঁধার দূরে হয়, সব গুটিয়ে দিয়ে মনের মধ্যে বাসা বাঁধে। সেই তীব্র আলোয় আমাদের চোখ ধেধে যায়, গেছেও তাই,—তবু পতঙ্গের মত ফিরি সেই আলোরই চারিধারে, পুড়েও মরি।"

ব্রজসুন্দর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "মাসিমা আবার এখানে কেন—? রান্নাঘরের ধোঁয়া, কালি,—যত সব নোংরামির মধ্যে—"

থাকমণি ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "তুই ওপরে যা কাতু, বেরজো এখনই যাবে এখন লাইব্রেরীতে, যা বইটই পাওয়া যায়, এখনই এনে দেবে। যে দু'দিন আমার কাছে এসেছিস্, এর মধ্যে না এসে তফাৎ তফাৎই থাক। আজ বাইশ বছর আগে যে ঘর ছেড়ে গেছিস, সে ঘরে আবার যে তুই ফিরে এলি—অন্ততঃপক্ষে দু'দিনের জন্যেও—সেও যে আমার নিজের আর আমার এই ভাঙ্গা ঘরের অশেষ ভাগ্য।"

মিসেস বোস একটু হাসিলেন, বলিলেন, "দিন রাতের জন্যে আর আমায় ঘরের কোণে বন্দী করে রেখো না দিদি, তোমার এই রান্নাঘরের একটা পাশে আমায় একটু বসতে দাও, আমি একটু প্রাণ খুলে কথা বলি—গল্প করি। এখানে আমি বড়লোকের স্ত্রী নই দিদি, তোমার ছোট বোন কাতু,—সেই রকম ভাবেই আমার সঙ্গে মেশো—কথা বল।"

থাকমণির দুই চোখ সজল হইয়া উঠিয়াছিল, তাড়াতাড়ি একখানা পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া বলিলেন, "তাই বোস কাতু, তাই বোস, আমরা দুই বোনে খানিক সুখ দুঃখের কথা বলি—কি বলিস?"

মিসেস বোস পিঁড়িতে বসিলেন।

(২৬)

নদীর ধারের পথ দিয়া বেড়াইতে আসিয়া মাসিমাকে বাড়ির সামনের পথে ছাড়িয়া দিয়া ব্রজসুন্দর মাছের সন্ধানে চলিয়া গেল।

পথের একটা বাঁক ঘুরিতেই সামনে যে সুপুরুষ দীর্ঘাকৃতি ছেলেটিকে দেখা গেল, তাহার পানে তাকাইয়া মিসেস বোস থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

সুমন্তও মুহূর্তমাত্র থতমত খাইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর অগ্রসর হইয়া আসিয়া আস্তে আস্তে নত হইয়া তাঁহার পায়ের ধুলো মাথায় দিল; একটু হাসিয়া বলিল, "আপনি কাকিমার বোন, সে হিসাবে আমার মাসিমা হন, তাই প্রণাম করলুম।"

মিসেস বোস আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে বাবা, আমি তো তোমায় চিনতে পারলুম না।

সুমন্ত উত্তর দিল, "আমি সুমন্ত, মহেশ রায় আমার কাকামশাই হন।"

"বুঝেছি, আর বলতে হবে না—"

বলিয়া মিসেস বোস একবার তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন।

এই ছেলেটি নাকি গুণ্ডা, ডাকাতের সর্দার। এমন চমৎকার দেহসৌষ্ঠব যাহার, এমন শিশুর মত সরল যাহার অন্তর, এমন চমৎকারভাবে যে হাসিতে পারে, সে হইবে গুণ্ডা, এ একেবারেই অসম্ভব।

মিসেস বোস স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি আমায় দেখে চিনেছো বাবা, আমি তোমায় চিনিনি। কেউ তো পরিচয় করিয়ে দেয় নি—চিনবো কি করে?"

সকৌতুকে হাসিয়া সুমন্ত বলিল, "কিন্তু আমি জানি মাসীমা, কেউ এখানে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিচয় পায়, বাস্তবিক না হলেও বিকৃতভাবে তো নিশ্চয়ই। আপনি এখনও পান নি এতে আমি আশ্চর্য না হয়ে থাকতে পারছি নে।"

মিসেস বোস একটু হাসিলেন মাত্র। বলিলেন, "এসো সুমন্ত, বসে তোমার সঙ্গে দুটো গল্প করি গিয়ে—এখানে আজ কয়দিন এসে পর্যন্ত কারও সঙ্গে মন খুলে দুটো কথা বলতে পেলুম না এই আমার বড় দুঃখ। তোমার সঙ্গে তবু দুটো কথা বলতে পেলে এখন বেঁচে যাব।"

"আমার সঙ্গে কথা—কি যে বলেন মাসীমা—" সুমন্ত টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল—"আমি নাকি মানুষ। আপনারা কত বড়, কত জ্ঞান আপনাদের, কত দেশ ঘুরেছেন, কত জ্ঞানী লোকের সঙ্গে কত কথা আলোচনা করেছেন, আর আমি পাড়াগাঁয়ে ভূত, আমি বেশী লেখাপড়া জানি নে, আমি—"

মিসেস বোস সরিয়া আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইলেন, শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ও ধারণা যদি করে থাকো সুমন্ত, জেনো—মস্ত ভুল করেছো। লেখাপড়া শিখলেই যে জ্ঞান হয়, দেশ বিদেশে ঘুরলে

যা অনেক টাকা থাকলেই যে বড় হয় তা নয়। শিক্ষা মানুষের নিজের মনের সংস্কার, বাইরের কতকগুলো শিক্ষার নামে কুশিক্ষা দিলেই যে সার্থকতা লাভ করা যায় তা নয়। আমি বুঝেছি—আমি সব বুঝেছি সুমন্ত বর্তমান শিক্ষা সভ্যতা আমার আর সহ্য হচ্ছে না বলেই আমি পালিয়ে এসেছি সব ছেড়ে দূরে—অতি দূরে এই পল্লী-গ্রামে—"

বলিতে বলিতে তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন—মুহূর্ত মাত্র নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "আমার ভালো লাগছে না—সত্যই আর ভালো লাগছে না বর্তমানের এই শিক্ষা সংস্কৃতি, বর্তমানের সভ্যতা আচার বিচার। আমি ক্লান্ত সুমন্ত, আমি বড় ক্লান্ত—"

তিনি চোখ ফিরাইয়া দূর আকাশের পানে তাকাইলেন।

দ্রুতপদে ব্রজসুন্দর আসিয়া পড়িল, তাহার মুখে দারুণ বিরক্তির চিহ্ন—

"এখনও দাঁড়িয়ে আছ মাসীমা, এদিকে যে রোদে মাথা পুড়ে যাচ্ছে।"

মিসেস বোস শান্ত হাসিয়া বলিলেন, "না বাবা, এ রোদে মাথা পুড়ছে না, বরং বেশ ভালোই লাগছে। আমার জন্যে তোমাদের এত ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই, মনে করো আমিও এককালে এই ঘরেই ছিলুম, আমার দিন স্বচ্ছন্দে সুখে এখানে কেটে গেছে। সুমন্তের সঙ্গে দেখা হল কিনা তাই দুটো কথাবার্তা বলছি।"

সুমন্তের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "পাড়াগাঁয়ের এই সহজ স্বচ্ছন্দময় জীবনযাত্রা নির্বাহ প্রণালী আমার বড় ভালো লাগে সুমন্ত। প্রত্যেকেরই বাড়ির লাগা এতটুকু জমিও অন্তত পক্ষে থাকে, বড় বাগান বা পুকুরও থাকে যাতে করে তরকারী, মাছ না থাকলেও তাদের বাজারে দৌড়াতে হয় না। রাত দুপুরে বাড়িতে লোকজন এলে এ সব গাঁয়ের লোক ভয় পায় না। বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ, আর গোলার ধানে তাদের ইজ্জত রক্ষা করে। এই মাত্র ব্রজসুন্দরদের বাগান পুকুর দেখে আসছি, বাগানে কি ফসলই যে ধরেছে—চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। মস্ত বড় পুকুরে বড় বড় রুই, কাতলা ডুবছে, ভাসছে, খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে হয়।"

ব্রজসুন্দরের মুখটা লাল হইয়াই ছিল, চকিতে সুমন্তের পানে তাকাইয়া সে অন্য দিকে চাহিল। তাহার ভয় হইয়াছিল এই মুহূর্তে তাহাদের অপদস্থ করিতে সুমন্ত প্রকাশ করিয়া দিবে, বাগান পুকুর সবই তাহার; এককালে মহেশ রায় অবৈধভাবে সব কিছু অধিকার করিয়া থাকিলেও আইনত বর্তমানে প্রমাণ হইয়া গেছে কিছুতে তাহার অধিকার নেই।

কিন্তু মহান সুমন্ত, উদার সুমন্ত—

সে কিছুই প্রকাশ করিল না, অনায়াসে স্বীকার করিয়া লইল সবই মহেশ রায়ের, তাহার নয়। দারুণ উৎসাহ ভরে বলিল, "হাঁ, কাকামশাইয়ের পুকুরের একটা গুণ আছে—মাছ ভারি শিগ্‌গির বাড়ে। এই তো গত বছর ছোট পোনা কয় ঝুড়ি ছাড়া হয়েছিল, এ বছরে সেগুলো, বিশ্বাস করবেন না মাসিমা; এই এত বড় হয়েছে।"

সঙ্গে সঙ্গে সে হাতখানা প্রসারিত করিয়া মধ্যম অঙ্গুলীর আগা হইতে কনুই পর্যন্ত দেখাইল, ব্রজসুন্দরের পানে একবার তাকাইল, "জলের এই গুণ বাড়াবার জন্যে কাকামশাই সে বছর সিঙ্গাপুর না হংকং হতে কি ওষুধ বস্তা বস্তা আনিয়েছিলেন। আমরা তো ভেবেই অস্থির জলে ওই বস্তা বস্তা ওষুধ দিলে যা মাছ আছে সব মরে যাবে। কাকামশাই কেবল হাসলেন—বললেন, "দেখো।" সত্য এখন তাই দেখছি। জমির উর্বরতা বাড়ানোর জন্যেও কাকামশাই বড় কম খরচ করেন নি মাসীমা,—অনেক দেশী বিলিতি প্রক্রিয়ায় তবে ওই জমির মাটি এমন উর্বর হয়েছে, ওতে যা ফেলুন [illegible]

ব্রজসুন্দর সহিতে পারে না, অথচ কোন উপায়ও নাই, সে কেবল গোঁ গোঁ করিল, কি বলিল তাহা বুঝা গেল না।

সুমন্ত সকৌতুকে তাহার পানে একবার তাকাইয়া বলিল, "এবার তবে চলি মাসীমা, আমার আবার ওদিকে কাজ আছে—"

মিসেস বোস বলিলেন, "তাই তো বাবা, আমি ভেবেছিলুম, তোমার সঙ্গে একটু গল্পসল্প করব। তোমার কথাবার্তা আমার বড় ভালো লাগছে। এখানে এসে পর্যন্ত আজ কয় দিন কারও সঙ্গে তেমন করে মিশতে পাই নি, কথা বলতে পাই নি।"

সুমন্ত বলিল, "আপনি তো আর দুদিন আছেন, আমি আসব আবার। আমার এক পুরানো বন্ধু আজ কলকাতা হতে এখানে আসছে কিনা, তাইত আনতে যেতে হচ্ছে, সেইজন্যে আজ একটু ব্যস্ত আছি। কাল পরশু আমি আপনার সঙ্গে আবার দেখা করব।"

মিসেস বোস অন্য মনস্কভাবে বলিলেন, "আমি আর এখানে আছি কই? আজ কয় দিন এসেছি, ওঁরা একটা খবর দিলেন না, নিলেন না! মনটা ছটফট করছে কি হল এই জন্যে। বলতে পারি নে—পাগলি মেয়েটা কোন্ মুহূর্তে হুট করে এসে পড়বে, বলবে এক্ষণি চল, তখন আর তো না বলতে পারব না। দেখেছো কি তাকে—দুই বছর আগে একবার এখানে এসে দিন তিন চার কাটিয়ে গেছলো?"

সুমন্ত উত্তর দিল, "দেখেছি—"

ব্রজসুন্দর তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল, "শুধু দেখা? তখনই তোমার না সেই পা ভেঙে গেছলো সুমন্ত,—একটি পয়সা তখন ছিল না যে ডাক্তার ডাকা হয়, ওষুধ আনা হয়? শাশ্বতী হঠাৎ তোমায় দেখতে গিয়ে দিবার কান্না দেখে তখন তার কাছে যে কুড়ি টাকা ছিল দিয়ে গেল?"

সুমন্তের মুখ অপমানে লাল হইয়া উঠিল, বলিল, "হ্যাঁ সে কথা আমার খুব মনে আছে। তবে ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার পা এমনই ভালো হয়ে উঠেছিল, তাঁর টাকা কিছুই লাগে নি। তুমি বলার পরই আমি আট মাসের সুদ হিসেব করে তোমার দেওয়া ঠিকানায় সে টাকা পাঠিয়েছি। মোট পঁচিশ টাকা প্রাপ্তির রসিদ আজও আমার কাছে আছে। তুমি টাকার তাগাদাই দিয়েছিলে ব্রজ টাকা যে পাঠিয়েছিলুম, রসিদ পেলুম সেটা দেখ নি বুঝি?"

কুণ্ঠিত মুখে মিসেস বোস বলিলেন, "তোমাদের কথা আমি কিছু বুঝতে পারলুম না সুমন্ত, আমায় যদি বুঝিয়ে বল, আমি বুঝতে পারি।"

একান্ত উদাসভাবে সুমন্ত বলিল, "ও এমন কিছু কথা নয় মাসীমা যা আপনাকে জানতে হবে এবং বুঝতেও হবে। ব্রজ বয়সে ছেলেমানুষ না হলেও বুদ্ধিতে ছেলেমানুষ বলে কথাটা বলে ফেলেছে। নচেৎ সামান্য এ কথাটা উল্লেখ না করলেও চলতো। কথাটা না শুনলে আবার কত কি ভাববেন তাই বলি। আমার পা ভেঙে গিয়ে আমি অজ্ঞান হয়েছিলুম, সেই সময় মিস বোস আমাদের দিবাকরকে নাকি কুড়ি টাকা দিয়ে যান। তখন না জানলেও অবশ্য পরে আমি তা জেনেছিলুম এবং টাকা ও সুদ ঠিকমত যেদিন যোগাড় করতে পারলুম সেদিন মনিঅর্ডার করলুম, বস, ফুরিয়ে গেল।"

বিবর্ণ মুখে মিসেস বোস বলিলেন, "শাশ্বতী তো আমায় কিছুই জানায় নি।"

সুমন্ত হাসিয়া বলিল, "এমন কিছু বড় বা গুরুতর কথা নয় যা আপনাকে জানাতে হবে। ছেড়ে দিন ও সব কথা, রোদ ভয়ানক বেড়ে উঠেছে, আপনি বাড়ি যান। আচ্ছা, আমি চলি মাসীমা—"

চট্ করিয়া নিচু হইয়া মিসেস বোসের পায়ে হাত দিয়া সে প্রণাম করিল—

একটু হাসিয়া ব্রজসুন্দরের পানে একবার তাকাইয়া সে হন্ হন করিয়া চলিয়া গেল।

ব্রজসুন্দরের মুখখানা তখন কালো হইয়া উঠিয়াছিল। সে কেবল বলিল, "আসুন মাসীমা—"

"হ্যাঁ চল।"

পুরুষ ও নারী

শ্রীহাসিরাশি দেবী

গ্রাম-সীমান্তে—মজা নদীর ধারে অতীতকালের পচা-পুরাণো ভাঙ্গাচোরা বাড়িটার অবশিষ্ট ঘর কয়খানার একখানায় আবার যেদিন আলো জ্বলে উঠলো, সেদিন পথ-চলতি-দুই একজন লোক সবিস্ময়ে এবং সভয়ে সেদিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং মাতব্বরদের মতামতের জন্য ব্যাপারটাকে রংচংদার ক'রে খাড়া করালেও আসলে কিন্তু যারা এলো, তারা দেবতাও নয়, দানবও নয়—মানুষ! সাধারণ মানুষের মতই মানুষ! এদের একজন—পুরুষ, অপরা নারী।

একটা ভারী সুটকেশ, ট্রাঙ্ক আর বেডিংটাকে ঘরের এক কোণে ঠেলে রেখে আলো জেলে ওরা জেগেই সে রাত্রি কাটাবার ব্যবস্থা ক'রলে।

বর্ষার রাত;

শন্‌শনে হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা মাঝে মাঝে ছুটে আসছে ভাঙা দরোজা জানালা দিয়ে;

মেঝের অর্ধেক ভিজে যাচ্ছে তাতে।

বাকী অর্ধেকের মধ্যে ধুলো আর জঞ্জাল সরিয়ে রাত্রি-বাসের সামান্য আয়োজন করা হ'য়েছে।

বহুদিনের অব্যবহার্য ঘরের কড়িকাঠ থেকে মেঝে পর্যন্ত লম্বমান ঝুলের রাশিতে দোলা লাগছে ঝড়ো হাওয়ার; কম্প্রমান লণ্ঠনের আলোর সঙ্গে দেওয়ালের গায়ে গিয়ে পড়া মানুষ দুটোর ছায়াও কাঁপছে সেই সঙ্গে। দুজনেই ওরা দুদিকে তাকিয়ে কি ভাবছিল কে জানে!

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে পুরুষ ওর হাতের নিভন্ত সিগারেটটাকে ছুঁড়ে ফেলে বললেঃ

"এইখানেই একটু শুয়ে পড় ফল্গু, রাত্রি অনেক হ'য়েছে। আবার শরীর খারাপের ভয় আছে; কারণ, এখন তো আর তুমি একা নও,—তোমার সঙ্গে যে আর একজনও জড়িয়ে রয়েছে—তার জন্যেও যে ভাবতে হবে!"

ক্ষীণ অরুণাভা খেলে গেল ফল্গুর পাণ্ডুর মুখে; বললেঃ—"না, ঘুমাতে আজ আমি পারব না, শুতেও গা কেমন ঘিন্ ঘিন্ ক'রছে এই নোংরার ওপোরে। তার চেয়ে বরং ব'সে ব'সে গল্প ক'রেই রাত কাটাব।"

সান্ত্বনু বাধা দিলেনা তার কথায়, ব'ললেঃ—

"বেশ! কিন্তু কি নিয়ে গল্পটা আরম্ভ করা যাবে শুনি? রাজারাণী আর ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর নিছক ন্যাকামী না আর কিছু?—"

দেওয়ালে পড়া বিভৎস ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে ফল্গুও আর একটু স'রে ব'সলো সান্ত্বনুর কাছ ঘেঁসেঃ—

"না অন্য গল্প বলো, যার ওপোর কিছু বিশ্বাস করা চ'লবে, যেমন, তোমার নিজের জীবনের নানা ঘটনা! আমার সঙ্গে পরিচয় তো মাত্র তোমার তিন বছরের, কিন্তু এর আগে?—"

সান্ত্বনু হেসে উঠলো হোঃ হোঃ ক'রে।

খিলানে খিলানে তার প্রতিধ্বনি মিশে গেল ঝড়-বাতাসের আর্তনাদের সঙ্গে।

আর একবার যেন কেঁপে উঠলো ফল্গু!

সান্ত্বনু ব'ল্‌লেঃ—

বিশ্বাস ক'রতে পারবে আমার কথা?

ফল্গু মাথা নাড়ল;

"পারতেও পারি তো!"

"যদি বলি, আজ যে বাড়িতে রাত্রি যাপন ক'রতে ভয় পাচ্ছ, একদিন এই বাড়িতেই আমার, আমার পূর্বপুরুষদেরও অনেক রাত্রি, অনেক দিন কেটে গেছে, বিশ্বাস ক'রবে সেকথা?"

"অসম্ভব কি? তারপরে?—"

"লক্ষ্মী চঞ্চলা, তাই একদিন দেনার দায়ে সব নীলামে উঠলো; বাবা গেলেন হার্টফেল করে মারা—মাও গেলেন সেই শোকে; আর আমি উঠলাম গিয়ে মামার বাড়ি। তারপর—"

আর একটা সিগারেট সে ধরিয়ে নিলেঃ—

"তারপরে তোমার সঙ্গেই ঠিক আমার ভাব হয় নি, আরো অনেকের সঙ্গেই হোয়েছিল এবং তোমার মত আরো অনেক মেয়েই সময়ের ঘূর্ণাবর্তে প'ড়ে কোথায় ছিট্‌কে গেছে জানিনে, জড়িয়ে আছ এখনও তুমি।—"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফল্গুর বুকখানাকে দুলিয়ে দিলেঃ—

"এ সব কথা তুমি আগে আমাকে বলনি কেন?"

"ব'ললেও বিশ্বাস ক'রতে পারতে তুমি?"

"সে বিচার নির্ভর ক'রছে আমার ওপোর, তোমার ওপোর নয়!"

নির্বাকে সান্ত্বনু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো, আর ফল্গু বসে রইল অন্যদিকে তাকিয়ে।

বাইরে তখনও বর্ষণমুখর রাত্রি মহানন্দে নৃত্য ক'রছিল, আর আকাশের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চিড় খেয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠছিল চোখ ধাঁধিয়ে।

কতক্ষণ এভাবে কেটে গেল তার হিসাব কেউ রাখলে না, কিছুক্ষণ পরে সজাগ হ'য়ে মুখ ফিরালে সান্ত্বনুঃ—

"ফল্গু!"

দুই হাঁটু জড়ো করে, তার মধ্যে মুখ গুঁজে ফল্গু ব'সেছিল নিঃশব্দে; ডাক শুনে মুখ তুলতেই সান্ত্বনু দেখলে ওর চোখের পাতা দুটো ভিজে। আলোটা বাড়িয়ে ওর মুখের সম্মুখে তুলে ধ'রলো সান্ত্বনুঃ—

"কাঁদছো! এত ছেলেমানুষ তুমি? ছিঃ!......

মৃদু সস্নেহ তিরস্কারই বোধহয়!

যার স্পর্শে স্বভাবতই মেয়েরা মনের রাশ হাল্কা ক'রে মুক্তি দেয় জমা করা সমস্ত দুঃখ কষ্টকে।

কিন্তু ফল্গু তা পারলে না, যেন শক্ত হ'য়ে উঠলো নিমেষে! তীব্র দৃষ্টিতে সান্ত্বনুর মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ললে:—

"কাঁদিনি ব'ললে মিথ্যা বলা হবে! কেঁদেছি। কিন্তু হৃদয়ের দিক দিয়ে বিচার ক'রে দেখলেও কান্নাটা অন্যায় হয়নি আশাকরি!"

সান্ত্বনু হাসতে চেষ্টা ক'রলো:—

"হৃদয়! হৃদয় জিনিসটাকে আজও আমি যাচাই ক'রে উঠতে পারিনি ফল্গু, এ ত্রুটি অবশ্য একা আমারই কাউকে তার জন্য কোনওদিন দায়ী করি নি, ক'রবোও না। কিন্তু আজকে আর নয়—আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ বৃষ্টি থেমে গেছে, রাত্রিও শেষ হ'য়ে এলো বোধ হয়।"

ফল্গু এবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রলো;

কিন্তু সমস্ত দেহের ওপোর দিয়ে যেন এইমাত্র তারও... এই ঝড়বৃষ্টির দাপাদাপির নিষ্পত্তি হ'য়ে গেছে, তাই সমস্ত অঙ্গে দারুণ বেদনা। উঠতে সে পারলো না।

ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হ'য়ে গেল;

শুকনো পাতার সঙ্গে শেষ বৃষ্টিবিন্দু ঝরিয়ে প্রভাতী হাওয়া বইল শির শির ক'রে।

ক্ষীপ্রহস্তে সমস্ত ঘরখানাকে যথাসম্ভব সাজিয়ে গুছিয়ে ফল্গু স্নানের উদ্দেশ্যে বার হ'য়ে প'ড়লো বাড়ি ছেড়ে।

রাস্তার ওপাশে ঐ নদী; ওর এপারে ওপারে কতকগুলো মেটে ঘাট দেখা যায়।

মেয়েরা সকালের বাসিকাজের পাট সারতে জমা হ'য়েছে সেই ঘাটে ঘাটে। দুই একটা ছোট জেলে ডিঙি চ'লেছে জাল ফেলার ঠকাঠক শব্দ করতে ক'রতে। ফল্গু নেমে স্নান সেরে নিলে সেই জলে;

তারপরে ভিজে পায়ের দাগ আঁকতে আঁকতে এসে ঢুকলো সেই ভাঙ্গা প'ড়ো বাড়িতে, যে বাড়িতে মাত্র কাল রাত্রে সে এসে উঠেছে;

সংসার তাদের নতুন হ'লেও সান্ত্বনু কোথা থেকে যেন সব সংগ্রহ করে এনেছিল, ওতেই রন্ধন এবং আহারের পর্বও শেষ হ'য়ে গেল ধীরে ধীরে। তারপর আবার সেই মুখোমুখী ব'সে সময় যাপন!

সান্ত্বনু সটান শুয়ে প'ড়লো মেঝের ওপোর একটা সতরঞ্চি পেতে।

ধীরে ধীরে তন্দ্রাতে জড়িয়ে এলো তার দু'চোখ; ফল্গু কিন্তু ঘুমাতে পারলো না; সমস্ত দেহে মনে কেমন একটা অস্বস্তি যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল;

খানিকক্ষণ বারান্দায় পায়চারী ক'রে সে ফিরে এলো ঘরের মধ্যে; বন্ধ করে আনা সুটকেশ খুলে বার ক'রলো খানকয় পড়বার বই; যেগুলোর ব্যবহার তার আজও শেষ হয় নি, আজও যে লিপ্সা তার বুকের মধ্যে বাসা বেঁধে র'য়েছে, এ তারই ছিন্ন-সুর!

বড় স্নেহে, বড় মমতায় ফল্গু ওর সমস্ত পৃষ্ঠাগুলো উল্টে উল্টে দৃষ্টি বুলিয়ে যেতে লাগলো—

বইয়ের ছাপা লেখার পাশে পাশে তার নিজের হাতের সঙ্গে সান্ত্বনুর নোট লেখা ছোট ছোট অক্ষরে, আজও মুছে যায় নি, আজও যে হারানো আশা আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে গুমরে কাঁদে তার ধূলি ধূসরতায় সান্ত্বনুর আদর্শ তার কাছে আজ বিবর্ণ, ম্লান;

দেবত্বের দুরত্ব আজ তার কাছে মনুষ্যত্বের আদিম-প্রকৃতিতে সীমাবদ্ধ, তাই অত্যন্ত নিকটে!

ফল্গু আর ভাবতে পারে না।

নিস্তব্ধে শুনলো দুপুরের তপ্ত হাওয়া এপাশ ওপাশের আমবাগানে যেন তারই মত হাহাকার করে বেড়াচ্ছে।......

—হাত কেঁপে একখানা ভারী বই সশব্দে মেঝের ওপোর আছড়ে পড়তেই সান্ত্বনু ওর তন্দ্রাতুর দু'চোখ মেলে চাইল:—

"আঃ, এখনও ঘুমওনি তুমি? একে কাল সারা রাত্রি জেগে কাটানো হ'য়েছে, নাঃ, তুমিই আমাকে বিপদে ফেলবে দেখছি! আমার কথা শোনো ফল্গু, এদিকে এসো—"

ওর সবল হাতের আকর্ষণে ফল্গুর কাঁধের আঁচল স্থানচ্যুত হতেই সে যেন আতঙ্কগ্রস্ত উন্মাদের মত অস্থির হ'য়ে উঠলো মুহূর্তে!

দুইহাতে আঁচলটাকে সান্ত্বনুর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে ছুটে এলো বাইরের বারান্দায়—সামনে এসে দাঁড়ালো সান্ত্বনু;

দুই চোখে তার বিস্মিত দৃষ্টি!

এ যেন ফল্গুর সঙ্গে তার নূতন পরিচয়;

এ পরিচয়ের সুরু যেন শুধু আজ থেকেই; তবু মনে মনে যেন এরই নূতন অধ্যায়টাকে সে আগাগোড়া পাঠ করে ডাকলে:—

"ফল্গু!"

"কেন?"

ফল্গুর চোখে জল নেই, ভয় নেই, বিস্ময়ও নেই কণ্ঠে। সহজ স্বরেই সে বললে "কেন? কি তুমি ব'লতে চাও আগে শুনি?—"

উদ্যত একটা দীর্ঘশ্বাস যেন বুকের মধ্যে থেমে গেল সান্ত্বনুর; ব'ললে:—

"কিছু না, এমনি ডাকছিলাম—।"

দুই এক পা এগিয়ে গিয়েই সে আবার ফিরে এলো:—

"কিন্তু না ব'ললেও ভুল হয়ে যাবে, মস্তবড় ভুল!"

ফল্গু নির্বাক।

সান্ত্বনুর উজ্জ্বল চোখ দুটো যেন আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল।—

কণ্ঠস্বরের শান্তসুর মিলিয়ে বেজে উঠলো উত্তেজনার উগ্রতা:—

(শেষাংশ ৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ককেশাস

বসুবন্ধু শর্মা

রাশিয়াতে হিটলারের বহু প্রচারিত গ্রীষ্মকালীন অভিযান অনেক দিন হ'ল সুরু হয়েছে। সোভিয়েট প্রবল বিক্রমে হিটলারকে বাধা দিচ্ছে সত্য—কিন্তু তা' সত্ত্বেও নাৎসী সৈন্যদল সোভিয়েট-ভূমিতে যে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ পর্যন্ত রুশ-জার্মান যুদ্ধ যতটা অগ্রসর হয়েছে, তাতে মনে হয় যে, হিটলার সম্প্রতি উত্তর রাশিয়াকে উপেক্ষা ক'রে তাঁর সমস্ত সৈন্যশক্তি নিয়োগ ক'রেছেন দক্ষিণ রাশিয়ার বুকে। মস্কো, লেনিনগ্রাদ প্রভৃতি বড় বড় রুশ শহর রাশিয়ার উত্তর এবং মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত হলেও, রাশিয়ার প্রাণশক্তি নিহিত আছে তার দক্ষিণাঞ্চলে। ইউক্রেনের শস্য আর ককেশাসের তৈল, এ দুটিই রাশিয়ার প্রাণশক্তি। আর একটি (ইউক্রেনের শস্য) ইতিপূর্বেই বুভুক্ষু নাৎসী জার্মানীর করতলগত হ'য়েছে; হিটলারের শাণিত চক্ষু এবার নিবদ্ধ হয়েছে ককেশাসের বুকে। গত দু'মাসের জার্মান অগ্রগতি লক্ষ্য করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ককেশাসের তৈলাঞ্চলই নাৎসী জার্মানীর লক্ষ্যস্থল। এই ককেশাস আক্রমণের সুবিধার জন্যই নাৎসীরা লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলি দিয়ে ক্রাইমিয়া সম্পূর্ণভাবে দখল করেছে; ক্রাইমিয়ার কার্চ উপকূল থেকে ককেশাস অঞ্চলে প্রবেশ করার খুব সুবিধা আছে। কার্চের জার্মান সৈন্যদল যে এখনও ককেশাসে ঢোকার চেষ্টা করছে না, তার কারণ বোধ হয় এই যে, তারা সেনাপতি ফন বকের সৈন্যদলের জন্য অপেক্ষা করছে। ফন বক প্রাণপণ ক'রে তাঁর সৈন্যদল নিয়ে রোস্তভের পথে ককেশাসের দিকে এগুচ্ছেন। ইতিমধ্যেই জার্মানরা রোস্তভ দখল করার দাবী ক'রেছে। তাদের দাবী সোভিয়েট সামরিক মহল সরাসরি স্বীকার না করলেও রোস্তভ শহরে যে বর্তমানে ঘোরতর যুদ্ধ চলছে, সে কথা স্বীকার করেছেন। রোস্তভ গেলে ককেশাসের বিপদ যে আরও বেশী বাড়বে একথা সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষ জানেন। তাই মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যদল প্রাণপণ ক'রে জার্মান সৈন্যদলকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে। জার্মানরা যদি ককেশাসের তৈলাঞ্চল দখল করতে পারে, তবে রাশিয়ার সামরিক শক্তি যেমন পঙ্গু হ'য়ে পড়বে, জার্মানীর সামরিক শক্তি তেমনি বেড়ে বেড়ে। আধুনিক যন্ত্রযুগে তৈল ছাড়া যেমন যন্ত্রশিল্প অচল বর্তমান যান্ত্রিক বাহিনীও তেমনি তৈল ছাড়া অকর্মণ্য। হিটলার জার্মানীর তৈলাভাবের খবর রাখেন—তাই তিনি তাঁর শ্যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন ককেশাসের বুকে—হয়ত বা ককেশাসের ওপারে ইরানের তৈলাঞ্চলও তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি সীমার বাইরে নয়। রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে বর্তমানে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই তার গতি সুনির্ধারিত হ'য়ে যাবে বলে মনে হয় এবং সেই সঙ্গে ককেশাসেরও ভাগ্য নির্ধারণ হবে। যে ককেশাস নিয়ে রুশদের সঙ্গে জার্মানদের এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তারই একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি এই প্রবন্ধে।

পশ্চিমে কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যস্থিত ককেশাস অঞ্চল প্রধানত বন্ধুর এবং পর্বত সঙ্কুল। বর্তমান যুগে তৈলের জন্যই ককেশাস প্রসিদ্ধ; কিন্তু ককেশাসের যে একটা সুদীর্ঘ রোমান্টিক ইতিহাস আছে, এ খবর হয়ত অনেকেই রাখেন না। ককেশাস—স্বপ্নের রাজ্য, স্ট্যালিনের জন্মভূমি, আর্যদের প্রাগৈতিহাসিক বাসস্থান। কত দুঃসাহসী অভিযানকারীর অস্থির পদপাতই যে

তাজাকিস্তান পার্লামেণ্টের দৃশ্য

হয়েছে ককেশাসের বুকে তার সংখ্যা নেই। প্রসিদ্ধ গ্রীক নাটক Prometheus Bound-এ আছে বন্দীবীর প্রমিথিউসকে এই ককেশাস অঞ্চলেই পাহাড়ের বুকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিল—আর ঈগলরা ঠুকরে ঠুকরে তাঁর গায়ের মাংস ছিঁড়ে খেয়েছিল। ককেশাসের পার্বত্য অধিবাসীরা বলে যে, আরারাট পর্বতের চূড়ায় পাথরে তৈরী নোয়ার আর্ক (Noah's Ark) নাকি এখনও আছে। এই সব প্রাগৈতিহাসিক পৌরাণিক কাহিনীতে ককেশাস চিরপ্রসিদ্ধ হ'য়ে আছে।

প্রসিদ্ধ রোমান বিজয়ী বীর পম্পি তাঁর ঈগল চিহ্নিত বিজয়পতাকা ককেশাসের অপর প্রান্তে নিয়ে যেতে পারেন নি। হিটলারের স্বস্তিকা চিহ্নিত জার্মান বিজয়পতাকা এ অসাধ্য সাধন করতে পারবে কি? ককেশাসের লোকেরা বলে যে, তারা নাকি পম্পির নাম এবং তাঁর সৈন্যদলের ক্রমিক সংখ্যা দুর্গম পাহাড়ে গ্রানাইটের বুকে খোদিত দেখতে পেয়েছে। ককেশাসের নিঃসীম নীরবতা গর্বিত রোমান বীরকে শঙ্কিত ক'রে তুলেছিল এবং পর্বতের উপত্যকায় যে সব ককেশীয় তাঁকে উপলক্ষ করে সশব্দে উপেক্ষার হাসি হেসেছিল—তাদের তিনি ক্রীতদাস করে রোমে নিয়ে যান নি। এই ককেশাস অভিযানে পম্পির একটি সৈন্যদল হারিয়ে গেছিল; তাদের বংশধররা আজও যে ভাষায় কথা বলে তার মধ্যে মাঝে মাঝে দু'চারটি ল্যাটিন শব্দ খুঁজে পাওয়া যায়। অনেক জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মতে আর্যদেরও আদিম স্থান ছিল এই ককেশাস অঞ্চল; পরে এই স্থান থেকেই নাকি আর্যরা ইউরোপ ও এশিয়ার নানান দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল প্রয়োজনের টানে।

এর পরের যুগে দেখা যায় যে, প্যালেস্টাইনের ধর্মযুদ্ধ

(Crusade) থেকে পরাজিত হয়ে এসে অনেক খৃস্টান বীর ককেশাসেই ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী ককেশীয় তরুণীর মাদকতাময় আঁখির ইসারায় এই সব ইংরেজ ও ফরাসী খৃস্টান সহীদেরা ভুলে যেতেন তাঁদের দেশের কথা—ভুলে যেতেন তাঁদের অপেক্ষমানা তরুণী স্ত্রীদের কথা! পার্বত্য ককেশাসবাসীরা এখন পর্যন্ত এই সহীদদের তরবারি প্রভৃতি অনেক স্মৃতিচিহ্নই অঙ্গে ধারণ করে এবং স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁদের প্রখ্যাত পূর্ব-পুরুষদের কথা। ককেশাসে ইঙ্গুস্ (Ingoosh) নামে একটি জাতি আছে—নামটার সঙ্গে 'ইংলিস' কথাটার বেশ মিল আছে। এরা প্রত্যেকেই নিজেকে এক একজন রাজা মহারাজা বলে ভাবে বটে, তবু আজও এরা অবশ্য লর্ড পরিবারের সন্তান বলে তাদের দাবী পেশ করেননি। দাবী করলে বৃটিশ লর্ডসভাকে কিছুটা মুস্কিলেই পড়তে হ'ত।

এদের মধ্যে এত ভাষা ও জাতি আছে যে, তাদের কুল-পঞ্জিকা নির্মাণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এমন কি ককেশাস অঞ্চলে একটা জার্মান গ্রামও আছে। এ গ্রামটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও দালান কোঠার দিক থেকেও যেমন জার্মান, ভাষার দিক থেকেও তেমনি জার্মান! আশ্চর্যের কথা নয় কি? এ গ্রামটির অধিবাসী সংখ্যা মাত্র হাজার খানেক; সপ্তদশ শতাব্দীতে জার্মানীর ত্রিশ বৎসরব্যাপী ধর্মযুদ্ধের সময় এরা এসে আশ্রয় নিয়েছিল এই ককেশাসের বুকে। হিটলার যে আজও তাঁর এই অত্যাচারিত আর্য ভ্রাতাভগ্নীদের বলশেভিক দানবের হাত থেকে মুক্তি দিবার জিগির তোলেন নি—এটাই বিস্ময়কর! প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্মৃতি বহন ক'রে এখনও আর্মেনীয়ার অধিবাসীরা বিষণ্ণ চোখে গীত গায়। তাদের পল্লী সংগীতে সেই প্রাচীন ব্যাবিলনের সংস্কৃতি, সভ্যতা আর ঐশ্বর্যের কথা ছড়িয়ে আছে। ইহুদীরা যেমন জিওনের (Zion) গান গায়, এদেরও গানের বিষয়বস্তু হ'ল তেমনি প্রাচীন ব্যাবিলনের রাজধানী মিনেভের হৃত গৌরব। তারা যে সুপ্রাচীন হিটাইট্ জাতির লোক তার সামান্য কিছুটা পরিচয় এখনও আছে, তাদের নাকের আকৃতিতে। এখানে চেঙ্গিস খাঁর বংশধররা যেমন আছে, তেমনি আছে আরবীয় ও ইরানীয় আর আছে সেই সব কসাকের বংশধররা যারা একদিন অত্যাচারী জারের জন্য যুদ্ধ কর্‌তে বাধ্য হ'ত—বাধ্য হত যুদ্ধ-যুদ্ধক্ষেত্রে তদের প্রাণ দিতে। কসাকরা যেন সেণ্টর (Centaur) বিশেষ—দেহের উপরিভাগ মানুষের আর নীচের ভাগ ঘোড়ার। এরা সারা দিনরাত ঘোড়ায় চড়ে থাকে বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। এদের অনেকে আবার জারের অত্যাচারে বিব্রত হ'য়ে তাতার খাঁদের এলাকা পেরিয়ে পালিয়ে এসেছিল এই সব পর্বতসঙ্কুল দুর্গম অঞ্চলে। এককালে ককেশাস অঞ্চলে খাঁদের অধীনে অসংখ্য ছোট-খাটো রাজ্য ছিল; এদের মধ্যে প্রধান ছিল দুটি রাজ্য—জর্জিয়া আর আর্মেনিয়া। কিন্তু প্রবলতর প্রতিবেশী তুরস্ক এবং ইরানের চাপে নিজেদের গৃহ-বিবাদের ফলে এ দুটি রাজ্যও এক সময়ে ভেঙে গেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর জর্জিয়ার এলিজাবেথ্ রাণী তামারার বীরত্বের কাহিনী জর্জিয়াবাসীরা অতি সহজেই ভুলতে পেরেছিল। কেবল ওমর খৈয়ামের সঙ্গে সমান মর্যাদা পেয়ে বেঁচে ছিল রাণীর সভাকবি রুস্তাবালীর কবিতা।

তুরস্ক এবং ইরানের সম্রাটরা এই ককেশাস থেকেই তাঁদের বাছাই করা সৈন্য জোগাড় করতেন। তুরস্কের সুলতানরা এই পার্বত্য ককেশীয়বাসীদের দিয়েই তাঁদের দুর্ধর্ষ দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করতেন। পারস্যের শাহরা ককেশাস থেকে কর-স্বরূপ শুধু যে সোনা এবং মূল্যবান প্রস্তরই দাবী করতেন তা নয়, তাদের হারেমের জন্য সুন্দরী নারীও তাঁরা সংগ্রহ করতেন এখান থেকেই। সুলতান এবং শাহদের মনোনীত ককেশীয়রা মরক্কো, মিশর এবং আরবের শাসনকর্তাও নিযুক্ত হ'ত।

শেষ পর্যন্ত ককেশাসে আধিপত্য করতে এল রুশেরা। পার্বত্য ককেশীয়দের শান্ত করতে, বশ্যতা স্বীকার করাতে রাশিয়াকে বেগ পেতে হয়েছে অনেক। অবশেষে ১৮০৩ খৃস্টাব্দে একজন নির্বাসিত জর্জিয়াবাসী সম্ভ্রান্ত লোকের পৌত্র পল্ জিজিয়ানোভ জর্জিয়া সমেত ককেশাসকে রাশিয়ার একটি প্রদেশে পরিণত করার প্রচেষ্টায় সফল হন। তিনি ছোটখাটো স্বয়ংসম্পূর্ণ খাঁ ও অন্যান্য নেতাদের নির্মূল করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এর ফলে শুধু যে ককেশাস্ রাশিয়ায় এল তাই নয়—রাশিয়াও কিছুটা ককেশাসে গেল। রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি পুশকিন ও লার্মনটভ, তার অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও লেখক-লেখিকা এই দক্ষিণাঞ্চলেই ভীড় জমিয়ে তুললেন। বাতগ্রস্ত এবং অসুস্থ লোকেরা ভীড় জমাতে লাগ্‌লে স্বাস্থ্যকর কিস্‌লোভডস্কের গন্ধকপূর্ণ জলে স্নান করার জন্যে।

উপজাতীয় সর্দারদের দমন করতে এবং দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে তাড়িয়ে দিতে রাশিয়ার প্রায় একশ বছর লাগল। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দের

জর্জিয়ার একটি প্রধান সহরের দৃশ্য

মধ্যে রুশেরা ওদের প্রায় সব ভাল ঘাঁটিই দখল করে নিয়েছিল, দলে দলে উপজাতীয় দুর্বৃত্তদের হত্যা করা হয়েছিল, নির্বাসিত করা হয়েছিল এবং সর্বত্র কশাক সৈন্যদের স্থাপন করা হয়েছিল। সমস্ত ককেশীয় জাতিগুলির মধ্যে আর্মেনিয়দের এই ব্যবস্থায় উপকার হয়েছিল সব চেয়ে বেশী; তারা জারের অধীনে এসে যেন বেঁচে গেছিল, কারণ তুরস্ক সীমান্তের দস্যুরা প্রতি বৎসরই আর্মেনিয়দের দেশ লুণ্ঠন কর্‌ত এবং তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত।

এর পরে ককেশাসে অফুরন্ত তৈল-ভাণ্ডার আবিষ্কার এক বিস্ময়কর ঘটনা। সমস্ত বিদেশী শক্তির দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হ'ল ককেশাসের দিকে। তৈল জিনিসটা চিরকালই পৃথিবীতে ছিল; বাতি জ্বালান প্রভৃতি অতি সাধারণ কাজের জন্যই এই তৈল চিরকাল ব্যবহৃত হ'য়ে আস্‌ছিল। আধুনিক যন্ত্রযুগের আগে বাণিজ্য-দ্রব্য হিসাবে তৈলের ততটা মূল্য ছিল না কোন দিন। যন্ত্রযুগে তৈলের প্রয়োজনীয়তা এত বেশী বেড়ে গেছে, যে যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনে তৈল অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ককেশাসে এই তৈল আবিষ্কারের ফলে রাশিয়া যেন হঠাৎ ধনী হ'য়ে উঠল। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে বাকু,

কৃষ্ণসাগরের তীরে বাটুম প্রভৃতি তৈল-বন্দর হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠল। ককেশাস সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাণস্বরূপে হয়ে দাঁড়াল।

সোভিয়েট রাশিয়ায় যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তনে ককেশাসের তৈলের দান উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ ও আমেরিকাবাসীদের কাছে এই তৈল বিক্রী ক'রে যে লাভ হয়, তার দ্বারা সোভিয়েট রাশিয়া বিদেশ থেকে অনেক বড় বড় যন্ত্রপাতি কিনে থাকে। স্ট্যালিনের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এই ককেশাসের তৈলের জন্যেই যে অনেকটা সার্থকতা লাভ ক'রেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাদের তৈলের প্রমোদ-ভবনে। ককেশাস অঞ্চলে শিক্ষার বিস্তারের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা হ'য়েছে। ককেশাসের মৃদু মধুর রৌদ্রে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মস্কোর তীব্র শীত এবং যন্ত্রের গর্জনের কথা ভুলে যাওয়া খুবই সহজ। ককেশাসের লোকেরা যেন ভিন্ন জগতের জীব: জারের পতন হ'য়ে বর্তমানে রাশিয়ায় যে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনেক ককেশাসবাসী সে খবর রাখারও প্রয়োজন বোধ করে না। শান্ত মধুর স্বপ্নের মধ্য দিয়েই যেন তাদের নির্ঝঞ্ঝাট দিনগুলি কেটে যায়।

তজাকিস্থানে সমবেত কৃষকদের সাধারণ সভা

বিনিময়ে সোভিয়েটের অন্যান্য প্রদেশে যন্ত্রশিল্পের প্রচলন হয়—অনেক স্বদেশপ্রেমিক ককেশীয়ই এটা চাইত না। ককেশাসে সোভিয়েট-বিরোধী একটা দল ছিল ব'লে জানা যায়; তাদের অসন্তুষ্টির মূলে এই তৈল বিনিময়ের প্রশ্নটাও যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারা সোভিয়েটের আওতা থেকে ককেশাসকে মুক্ত করতে চায়—চায় তারা স্বাধীনতা। সোভিয়েটের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, একে বলতে হয় নিছক স্বার্থপরতা—আর এই স্বার্থপর মনোবৃত্তি সাধারণ ককেশাসবাসীদের মনের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

জাতীয়তার বীজ ককেশাসবাসীদের রক্তের মধ্যে নিহিত আছে। ককেশাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক জাতি ও গোষ্ঠী আছে। ককেশাস-বাসীরা নিজেদের রুশ ব'লে পরিচয় দিতে চায় না; তারা জর্জিয়, আর্মেনীয় কিংবা আজারবাইজাসীয়—কিন্তু রুশ নয়। মার্ক্সীয় দর্শনের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব তাদের মনে দৃঢ় মূল প্রোথিত করতে পারে নি। কিন্তু সাধারণভাবে তারা সবাই যে সোভিয়েট রাশিয়ার অধীনে একতাবদ্ধ হ'য়েছে একথা সত্য। এ একতার মূল্য সম্বন্ধেও তারা সচেতন—কিন্তু সেই জন্যে তাদের অন্তর্নিহিত জাতীয়তাবোধ ত্যাগ করতে তারা রাজী নয়।

সোভিয়েট রাশিয়ার অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে ককেশীয়দের একীভূত করার জন্যে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ নানা উপায় অবলম্বন করেছেন। জারের প্রাসাদ এবং তাঁর অধীনস্থ সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের সৌধগুলিকে পরিণত করা হ'য়েছে স্যানাটোরিয়ামে কিংবা শ্রমিকদের

ককেশাসের জাতীয়তাবাদী নেতাদের অধীনে ককেশীয়রা সুখী হবে কিনা সে কথার বিচার না করেও একটা বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়: এই সব নেতাদের অতীত কার্য-কলাপের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সাধারণ ককেশাস-বাসী নরনারীর মনের উপর তাদের কিছুমাত্র প্রভাব নেই। হিটলার এই সব জাতীয়তাবাদী ককেশাস নেতার বড় বন্ধু: মস্কোর সরকারী দপ্তরে এই স্বয়ম্ভু নেতাদের অনেক গোপন দলিলপত্রই জমা আছে। হিটলার এদের পিছনে যত অর্থ ব্যয় করেছেন, সেটা কি শুধু সদাশয়তার বশবর্তী হ'য়ে? ককেশাসের জাতীয়তাবাদের সমর্থনে জার্মানীতে অসংখ্য পুস্তিকা ও পত্রিকা প্রকাশিত হ'য়েছে; প্রায় সব ইউরোপীয় এবং নিকট প্রাচ্যের ভাষায় মুদ্রিত ক'রে এই সব পুস্তিকা বহুলভাবে প্রচারিত হ'য়েছে। এই সব দেখেশুনে মনে হয় যে, হিটলার এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ককেশীয়দের দ্বারা কুইসলিংএর কাজ করাতে চান। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত হিটলার নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সব জাতীয়তাবাদী নেতাকে সমর্থন করে আসছেন।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ তুরস্কই ছিল এই ককেশীয় জাতীয়তা-বাদীদের কর্মকেন্দ্র। তারা বৃহত্তর তুরস্কের অধীনে ককেশীয় যুক্ত-রাষ্ট্র গঠনের জন্য আন্দোলন চালাত। জাতীয়তাবাদীরা আশা করত যে, এই ধর্মযুদ্ধে তুরস্কই হবে তাদের মুক্তিদাতা: জার্মানীর সহ-যোগিতায় তুরস্ক একযোগে সোভিয়েটকে আক্রমণ ক'রে ককেশাসকে বিচ্ছিন্ন করে নেবে—এই স্বপ্নই তারা দেখত। এর পিছনে আর একটা

যুক্তি ছিল এই যে, সোভিয়েট তুর্কিস্থানে তুর্কি জাতীয় লোকের সংখ্যা এক কোটি আশী লক্ষ; কাজেই এদের তুরস্কের অধীনে নিয়ে আসা খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু হঠাৎ ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে তুরস্কে এই জাতীয়তাবাদীদের কার্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেল; কামাল আতাতুর্ক তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি বিশেষ একটি আইন জারী করে ককেশাসের জাতীয়তাবাদী নেতাদের তুরস্ক থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এই নেতাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হল যে, তাঁরা একটি তৃতীয় দেশের আনুকূল্যে এবং প্ররোচনায় তুরস্কের একটি মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবী প্রচার কার্য চালাচ্ছিলেন, এর ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে তুরস্কের সম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। নাম না করলেও এই 'তৃতীয় দেশটি' যে কোন্ দেশ তা অতি সহজেই বোঝা যায়। তুরস্কে তৎকালে ককেশীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন এ. কান্টেমির (A. Kantemir) এবং হায়দার বাম্মাতে (Haidar Bammate)। তাঁরা শান্তিপ্রিয় ব্যবসায়ী ব'লে নিজেদের পরিচয় দিতেন। তাঁরা তাঁদের ব্যবসায় গুটিয়ে বার্লিনে চলে যেতে বাধ্য হ'লেন; বার্লিনে গিয়ে তাঁরা ইউক্রেনের স্বাধীনতা প্রয়াসী আরেকটি বিপ্লবী দলের সঙ্গে হাত মেলালেন। অনেকে মনে করতে পারেন যে ককেশীয় পার্বত্য জাতি বুঝি একমাত্র সোভিয়েটের অধীন ককেশাসেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আরব, মিশর, ইরাক প্রভৃতি অনেক দেশেই এই ককেশীয় জাতি অল্পবিস্তর ছড়িয়ে আছে। ফ্যাসিস্তদের উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি তাদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র এবং প্রচারকার্যে এরা জার্মানদের সহযোগিতা করে আসছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের ইরাকের রসিদ আলী ও তাঁর অনুচরদের কথা মনে পড়ে।

ককেশীয়দের স্বাধীনতার জন্য হিটলারের যে খুব বেশী মাথা-ব্যথা আছে এমন মনে হয় না। তবে তাঁর স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি এই সব বিপ্লবী ককেশীয়দের প্রাধান্য দিয়ে তাঁর নিজের প্রচারকার্য চালান। আজ ককেশাসের যুদ্ধ প্রায় সুরু হ'য়েছে বলা চলে; এ যুদ্ধের গতি কার অনুকূলে হবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমরা তা বুঝতে পারব বলে আশা করি। ককেশাসের তেলের জন্য হিটলার তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন ককেশাসের যুদ্ধে; সোভিয়েট রাশিয়াও তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে হিটলারকে বাধা দেবার চেষ্টা করবে। ককেশাসে শুধু যে রাশিয়ার প্রাণশক্তি নিহিত আছে, তাই নয়; বর্তমান রাশিয়ার অবিসম্বাদী নেতা স্ট্যালিনের জন্মভূমিও এই ককেশাস। ককেশাসের অন্তর্গত জর্জিয়াতে স্ট্যালিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন—তাদের প্রিয় নেতা স্ট্যালিনের জন্মভূমি যাতে জার্মানদের হাতে না যায় তার জন্য লালফৌজ যে অপ্রাণ চেষ্টা করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পুরুষ ও নারী

(৮৩ পৃষ্ঠার পর)

"প্রবৃত্তিকে নির্বাসিত করে যে স্রষ্টা নরনারী তৈরী করেন নি এ জ্ঞান হবার বয়স তো তোমার যথেষ্টই হয়েছিল ফাল্গুনিদেবী! তবে এমনভাবে মেলামেশা করেছিলে কেন?... কেন তবে......

"চুপ করো, ওগো তুমি চুপ করো,—আর না হয় আমাকে মেরে ফেল গলা টিপে, আমি বাঁচি—আমি বাঁচি...

ওর আর্তস্বরের রেশটুকু গলা থেকে না মিলাতে মিলাতে কাঁপতে কাঁপতে ও গিয়ে পড়লো একেবারে নীচে—ভাঙ্গাচোরা ইটের গাদায়!

সান্ত্বনু চীৎকার করে উঠলো:—

"ফাল্গু, একি করলে তুমি?—কি ক'রলে...?

জনশূন্য বাড়িতে তার সে হাহারব আর্তনাদ ক'রে উঠলো খিলানে খিলানে প্রতিধ্বনি তুলে।...

কিন্তু ফল্গুর তরফ থেকে কোনও উত্তর এলোনা, শুধু ওর রক্তাক্ত দেহটা থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগলো থর থর করে!

গ্রামবাসীরা আবার একদিন সবিস্ময়ে দেখলে গ্রাম-সীমান্তের সেই চুণবালি খসা প'ড়ো বাড়িটায় যে দুটি নর ও নারী একদিন অযাচিত ভাবে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে সেই নর আবার ফিরে চলেছে আশ্রয় ছেড়ে; এবার তার হাতে শুধু সেই বইয়ের সুটকেশটা, আর যা কিছু সঙ্গে এনেছিল তার মধ্যে নূতন করে রচনা করে রেখে গেল শুধু একটি সমাধি—এ সমাধি সেই নারীর।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভা

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

১৯০৫ সাল পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের কোন ছাত্র ছিল না। তাঁর প্রথম ছাত্র নন্দলাল বসু ও পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং অতি অল্পকালের ব্যবধানে ভেঙ্কেটাপ্পা, অসিতকুমার হালদার, হাকিম মহম্মদ, শৈলেন্দ্রনাথ দে, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ও সামিউদ্দিন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্ররা কিভাবে তাঁর কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে আমাদের জানা দরকার, কারণ অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা-পদ্ধতি সমকালীন দেশী বিদেশী সকল কলা কেন্দ্র থেকে তফাৎ ছিল।

এই সব ছাত্ররা প্রথম যখন অবনীন্দ্রনাথের কাছে আসেন তখন নূতন তথা দেশী আদর্শের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি মত তৈরি হোয়েছে। নূতন আদর্শের মূলে কথা ছিল ভারতীয়ত্ব অর্থাৎ ভারতীয় চিন্তা ও ভাবের প্রকাশ। সংক্ষেপে—বিলাতি Naturalismএর বিরুদ্ধে ভারতীয় ভাব বা চিন্তাকে ছবির বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করার চেষ্টাই ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির আদর্শ মনে করা হোতো। এখানে বিশেষভাবে একথা স্মরণ রাখা দরকার যে অবনীন্দ্রনাথ যখন রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলী অঙ্কিত করেছিলেন তখন তাঁর প্রেরণা ছিল সম্পূর্ণ রূপ-স্রষ্টার প্রেরণা ; ইউরোপীয় Naturalism বা কোন বিশেষ আদর্শের বিরুদ্ধ মনোভাব থেকে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার গতি পরিবর্তিত হয়নি। চিত্রের আলংকারিক রূপের সৌন্দর্যে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কাজেই অবনীন্দ্রনাথের মনোভাব প্রতিক্রিয়ামূলক ছিল না, কিন্তু কিছুকালের জন্য আমরা অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রতিক্রিয়ামূলক মনোভাবের পরিচয় পাই। এই মনোভাব খুবই স্পষ্টরূপে পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচিত 'ভারত শিল্প পরিচয়' বইখানিতে। প্রতিক্রিয়ার মনোভাবের মূলে হ্যাভেলের প্রভাব স্বীকার করতে হয় এবং সেই সঙ্গে স্বীকার করতে হয় সেই সময়ের উগ্র জাতীয়তাবোধ।

অবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ও হ্যাভেল প্রচারিত আধুনিক ভারতীয় চিত্রের আদর্শের রূপ যতই আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে ততই আমরা এই আন্দোলনের অন্তরালে যে প্রতিক্রিয়ামূলক মনোভাব ছিল তা' বুঝতে পারব। এখন একথা স্পষ্ট যে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্ররা একটা প্রতিক্রিয়ামূলক মনোভাবের মধ্যে এলেন। বাইরের রূপকে অনুকরণ করার চেষ্টা ব্যর্থ। Imitaion আর্ট নয় এই আদর্শই অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাঁর ছাত্ররা পেয়েছিলেন, কিন্তু কিভাবে কোন পথে শিল্প

জেব উন্নিসা : শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাধনার সার্থকতা—এদিক দিয়ে, অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশ কি রকম ছিল ধারণা করা যায় তাঁর ছাত্রদের প্রতি উপদেশ থেকে। তিনি বলেছেন—কেবল গাছপালা ফুলপাতা অনুকরণ করে তোমরা সৌন্দর্যের সন্ধান পাবে না, সৌন্দর্য অন্তরের জিনিস। কবি কালিদাসের মেঘদূতের বর্ষার রসে মনকে সিক্ত কর, তার মেঘের দিকে তাকিয়ে দেখ—অবনীন্দ্রনাথের উপদেশ ছিল এই

রকম। এই উপদেশ থেকে তাঁর উদ্দেশ্য বোঝা কঠিন নয়। তিনি চেয়েছিলেন কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করতে, বাস্তবতা থেকে ভাবের জগতে ছাত্রদের দৃষ্টি ফেরাতে। কিন্তু ভাবের জগতে প্রবেশ করতে পারলেই সব সমস্যা মিটে যায় না। কারণ ভাব ভাষার আশ্রয় ছাড়া প্রকাশিত হোতে পারে না। অন্যের মনের ভাব ভাষার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে মিললে তবে সেই ভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে। তেমনি যে পর্যন্ত না রেখা ও বর্ণের দ্বারা ভাব বাঁধা পড়ছে, সে পর্যন্ত ছবির ভাব, আমাদের মনে জাগবে না।

ভাবের জগতে প্রবেশ করাও যেমন কঠিন, ভাবের সঙ্গে ভাষাকে যুক্ত করবার কৌশল খুঁজে পাওয়াও তেমনি কঠিন। রস সৃষ্টির পথে একমাত্র শিক্ষণীয় বস্তু ভাষা এবং ভাষা ব্যবহার প্রণালী। অর্থাৎ ভাবের স্বভানুযায়ী ভাষা খুঁজে নেওয়া এবং ভাষার স্বভাব বুঝে ভাবকে যুক্ত করা, এই কৌশলকেই আমরা বলতে পারি টেকনিকের জ্ঞান।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের কি করতে হবে বলেছিলেন কিন্তু কিভাবে করতে হবে সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর ছাত্রদের কিছুই বলেননি। কার্যের মধ্য দিয়ে ভাবের রাজ্যে পৌঁছার পথ তিনি দেখিয়েছিলেন অথচ কিভাবে সেই ভাব ছবিতে ধরা দেবে সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই বললেন না। তার পরিণাম কি এইবার আমরা দেখবার চেষ্টা করব।

অবনীন্দ্রনাথের কাছে ১৯০৫ সালে প্রথম যে ছাত্ররা এসেছিলেন, তাঁরা ভারতীয় পদ্ধতির ছবি আঁকা শিখতে এসে সত্যকারের অবনীন্দ্রনাথকেই সকল দিক দিয়ে অনুসরণ করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর ব্যক্তিগত রুচি ও আদর্শ অনুযায়ী ছাত্রদের চালিত করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ভাবের জগতে তরুণ শিল্পীদের কিভাবে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তার পরিচয় পূর্বে দিয়েছি। যারা দেশী চিত্রকর হোতে চলেছে ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে তাদের পরিচয় দরকার, একথা অবনীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। কিন্তু, সাহিত্য কাব্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আইডিয়ার আদর্শ অবনীন্দ্রনাথ যে ছাত্রদের সামনে ধরেছিলেন, তার যেমন প্রয়োজনীয়তার দিক ছিল, তেমনি অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে এই রকম আদর্শের প্রতি আকর্ষণের আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল। এই কারণটি জানতে হোলে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে চিনতে হয়। অবনীন্দ্রনাথের জীবনে সব চেয়ে বড় প্রভাব রবীন্দ্রনাথ, চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের মানসিক বিকাশ সাহিত্যের আবহাওয়া এবং অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা যুগপৎ সাহিত্য ও চিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হোয়েছিল। তাঁর প্রতিভা এমনিভাবে দুই ধারায় বিভক্ত হোয়েছে যে কোনটি তাঁর প্রধান ক্ষেত্র, তাঁর প্রতিভার চরম প্রকাশ—সাহিত্যে কি চিত্রে নিশ্চয় করে বলা সহজ নয়। সাহিত্যিকের অনুভূতি চিত্রকরের দৃষ্টি- এই দুইয়ের মিশ্রণ এবং অন্যদিকে দুয়ের দ্বন্দ্বে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা রূপ পেয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের কবি প্রকৃতি বারবার তরুণ শিল্পীদের মনে কবির ভাব জাগাতে চেষ্টা কোরেছিল। এই জন্যই অবনীন্দ্রনাথের যে আদর্শ তাঁর ছাত্ররা অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বলতে হয়।

পূর্বের আলোচনায় আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, রস সৃষ্টির পথে ভাবই সর্বস্ব নয়, ভাষাই ভাবকে রূপ দেয়। ভাব—একই ভাব (Idia) কেবল ভাষার (ছবির ভাষা সাহিত্যের ভাষা, মূর্তি শিল্পের ভাষা) প্রকৃতি ভেদে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়। আবার একই প্রকৃতি ভাষার স্বভাব পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে ভাবের রূপান্তর ঘটতে বাধ্য। গদ্য পদ্য, দুইয়ের প্রকাশের ভাষা এক, স্বভাব ভিন্ন। অবনীন্দ্রনাথ যে ভাষায় ছবি এঁকেছেন তার স্বভাব যে Realistic ঘেঁসা ছিল, একথা পূর্বেই আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করেছি।

অবনীন্দ্রনাথের ভাবকে তথা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁর ছাত্রেরা অবনীন্দ্রনাথের Realistic স্বভাবের ভাষা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রদের Realistic ভাষার কৌশল (টেকনিক) শেখাননি। কারণ অতি সহজেই পাওয়া যায়—Realistic আর্টের প্রতিক্রিয়ার যুগ তখন। এই জন্য অবনীন্দ্রনাথের স্টাইলের অনুসরণ হয়নি অনুকরণের চেষ্টা হোয়েছিল।

প্রথম ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে হওয়ায় ছবির বিষয় মূলত সাহিত্য কাব্য পুরাণকে আশ্রয় কোরে সুরু হোলো। এবং বস্তু রূপ প্রকৃতির সঙ্গে চিত্রকরদের যোগসূত্র ছিন্ন হোলো। এই সঙ্গে বস্তু রূপ অনুকরণ করা Realistic European Artএর ধর্ম, এই ধারণাও চিত্রকরদের বস্তুজগতের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটতে দেয়নি। অবনীন্দ্রনাথের টেকনিক, স্টাইল এবং Realistic স্বভাব ছবির রূপকে Naturalism ঘেঁসা কোরেছিল অথচ Naturalismএর যে বৈশিষ্ট্য তাও তাতে ছিল না। এই জন্য সে সময়ের চিত্রকরদের চিত্র বস্তুর গুণ (Quality) প্রকাশিত হয়নি, রূপেরই প্রকাশ হয়েছিল। দেখা যায়—ভারতীয় শিল্পের প্রকাশ ভঙ্গীর সঙ্গে এই প্রকাশ ভঙ্গীর কোন মিল ছিল না। ভারতীয় কলা সংস্কৃতির যে আধুনিক রূপ অবনীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হোলো তার প্রভাবে আমাদের Aesthetic Revival সম্ভব হোয়েছে। এই সময় অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ছাত্রদের ছবিতে মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্রভাবে অবনীন্দ্রনাথের আন্দোলন ব্যক্তিগত হওয়ায় ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে প্রথম যুগে আমাদের যোগস্থাপন সম্ভব হয়নি।

পরবর্তী আলোচনায় অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্রদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনার দ্বারা অবনীন্দ্রনাথের Revivalএর রূপকে সম্পূর্ণ কোরে দেখতে পারব।

জার্মান অগ্রগতি

জ্ঞান গুপ্ত

দক্ষিণ রুশিয়ায় জার্মান অগ্রগতি মারাত্মক হয়ে উঠেছে। আজভতীরে ডন নদীর মুখে রস্টভ দখল করে নেওয়ার পর জার্মানরা দ্রুত দক্ষিণে এগিয়ে চলেছে। এ অঞ্চলে তাদের গতি হচ্ছে ককেশাস পর্বতমালার উত্তর পাদমূলে অবস্থিত তৈলখনিগুলির দিকে। মাইকোপ খনির উত্তর-পূর্বে আরমাভির তারা দখল করে নিয়েছে। আরমাভির-এর ৫০ মাইল উত্তরে ক্রপটকিন অঞ্চলেও সোভিয়েট সৈন্য পশ্চাদপসরণ করেছে। ক্রপটকিন তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। স্টালিনগ্রাদের পশ্চিমে ক্লেট্স্কায়াতে রুশরা জার্মান বাহিনীর আর এক বাহুকে রুখছে। এখানে সোভিয়েট প্রতিরোধ অধিকতর দৃঢ়।

আরো উত্তরে অবস্থা সোভিয়েটের অনুকূল। ভরোনেজে লালফৌজ ডন নদী অতিক্রম করে পশ্চিম তীরে লড়াই করছে এবং জার্মানদের অনেক জায়গায় হটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঐ অঞ্চলে সোভিয়েট সৈন্যের যুদ্ধ আক্রমণমূলক।

কুবান নদীর তীরে অবস্থিত। ক্রপটকিন-আরমাভির এই লাইন জুড়ে লালফৌজ হটে গেছে। এখন কুবান নদীর বাঁক ও মাইকোপ তৈলখনির মধ্যে প্রাকৃতিক ব্যবধান শুধু হচ্ছে ছোট্ট লাবা নদী। সুতরাং বর্তমান জার্মান অগ্রগতির হিসাবে মাইকোপ পর্যন্ত পৌঁছতে নাৎসীদের আর বেশী দেরী হওয়ার কথা নয়।

ককেশাসের দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানরা কিছু উত্তরে আর একটা লক্ষ্যেও এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এ লক্ষ্য হচ্ছে বিখ্যাত সমরোপকরণ-কেন্দ্র স্টালিনগ্রাদ। স্টালিনগ্রাদকে তারা সাঁড়াশি-বাহুতে চেপে ধরবার জন্যে উদ্যোগী হয়েছে। স্টালিনগ্রাদের দক্ষিণপশ্চিমে ডন নদীতীরে সিমলিয়ানস্কায়ায় প্রাণপণে বাধা দেওয়ার পর রুশরা কোটেল-নিকোভো পর্যন্ত হটে গেছে। কোটেলনিকোভো অঞ্চলে এখন

বর্তমানে লালফৌজের পক্ষে ঘনায়মান অন্ধকারে কয়েকটা আলোর রেখা রয়েছে। একটা ভরোনেজ। এখানে যদি তারা পাল্টা অভিযান আরম্ভ করে জার্মান বাহিনীর বাঁ-পাশকে বিপর্যস্ত করে ফেলতে পারে, তাহলে দক্ষিণে জার্মান অগ্রগতি বানচাল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভরোনেজে সোভিয়েট পাল্টা আক্রমণ এখনও ব্যাপক অভিযানে পর্যবসিত হতে পারেনি। অভিযান শীগ্‌গির আরম্ভ হবার মতো লক্ষণও এখনও দেখা যাচ্ছে না। তবে ভরোনেজে তারা সুবিধে করায় লাভ হয়েছে এই যে, জার্মানরা কীলক ঢুকিয়ে মধ্য এবং দক্ষিণ দুই সোভিয়েট রণাঙ্গনকে এক সঙ্গে বিপন্ন করে তুলতে পারছে না। মস্কো ও দক্ষিণ রুশ কেন্দ্রগুলির মধ্যে ভরোনেজ চাবিকাঠির মতো। তা ছাড়া ভরোনেজ এলাকা থেকে লালফৌজের পক্ষে পাল্টা অভিযান করার সম্ভাবনা সব সময় থাকে।

আর একটা ভরসার কথা—নাৎসীদের সমস্ত রণাঙ্গনে গত বছরের মতো যুগপৎ আক্রমণ চালাবার অক্ষমতা। মস্কো-লেনিনগ্রাদ-মুরমানস্কের দিকে জার্মান অভিযান স্থগিত রয়েছে। সুতরাং গত বছরে জার্মানীর যে সীমাহীন সমর ক্ষমতার আভাষ ছিল, এ বছর তা নেই। সোভিয়েট জার্মানীর শক্তির একটা সীমা বুঝতে পারছে, যার ফলে অন্যান্য রণাঙ্গনে সোভিয়েট সুবিধে করে নিতে পারে।

সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, জার্মানরা দ্রুত অগ্রসর হলেও কোথাও সোভিয়েট বাহিনীকে পরিবেষ্টন করতে পারেনি। লালফৌজকে ছিন্নভিন্ন করে' ফেলবার যে আশা জার্মানরা করেছিল ... হিস

জান—এই তিনটি সাধারণতন্ত্রের মধ্যে এক আজেরবাইজানেই ১৯৩৪ সালে ২ কোটি টনের বেশী তেল উৎপন্ন হয়। (১৯৪০ সালে মোট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টনের বেশী তেল সোভিয়েট ইউ-নিয়নে উৎপন্ন হয়েছে)। কয়েকটা পাইপ-লাইন দিয়ে এই তেল নিয়ে আসা হয়। তার মধ্যে নিম্নলিখিত লাইনগুলির নাম করা যেতে পারে: বাকু-বাটুম লাইন, গ্রোজনি-মাকাচ-কালা লাইন, গ্রোজনি-আরমাভির-তুয়াপসে লাইন আরমাভির-রুদোভায়া লাইন, গুরেভ-ওরস্ক্ লাইন।

ককেশাসের তেল এবং অন্যান্য কাঁচা মাল বেশী পরিমাণে নিয়ে আসবার জন্যে ১৯৪০ সালে পাঁচটি নতুন রেলওয়ে লাইনের নির্মাণ শেষ হয়: কৃষ্ণসাগর তীরে তুয়াপসে থেকে ...

উত্তর ককেশাস উপকূলে নভোরোসিস্ক প্রধান নৌঘাটি হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে জার্মানরা ক্রাসনোডার ও আরমাভির দখল করায় নভোরোসিস্ক ঘেরাও হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। নভোরোসিস্কের যদি পতন হয়, তাহলে সোভিয়েট নৌবাহিনীকে আরো দক্ষিণে বাটুম বা আর কোনো জায়গায় সরে যেতে হবে। আর ককেশাস যদি জার্মান পদানত হয় তাহলে? কৃষ্ণসাগরীয় নৌবাহিনীর অবস্থা সেক্ষেত্রে কি হবে সেটা চিন্তনীয়।

ককেশাস যদি বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে সোভিয়েট সমর-শক্তির আর একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি হবে। ককেশাস প্রধান তৈল-কেন্দ্র এবং সমরশিল্পের পক্ষে আবশ্যক বহু খনিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে এখানে উৎপন্ন হয়। তেলের ক্ষতিটাই হবে সব চেয়ে সাংঘাতিক। ককেশাসিয়ার জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজেরবাই-

করেছেন। ... ১৭ ভাগ উৎপন্ন হয় ককেশাসের বাইরে। ইতিমধ্যে অন্যান্য জায়গায় আরো খনি চালু হয়েছে। ককেশাস বিচ্ছিন্ন ... হাতছাড়া হ'লে যে বিপদ দেখা দিতে পারে তা বিবেচনা করে সোভিয়েট গভর্নমেন্ট অনেক আগে থেকেই অন্যান্য অঞ্চলে তৈ... আহরণে মনোনিবেশ করেছেন। কিন্তু মুস্কিল হবে জার্মানী যদি ককেশাস দখল করে নিয়ে তেলের খনিগুলো ব্যবহার কর... পারে। সেক্ষেত্রে জার্মান যান্ত্রিক শক্তির পরমায়ু অনেক বে... যাবে। একমাত্র আশা এই যে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ও সোভিয়ে... নরনারী 'পোড়ামাটি'র নীতি অনুসরণ করে তেলের খনিগুলো এমনভাবে ধ্বংস করে দেবে যে সেগুলো জার্মানীর কাজে আস... বহুদিন সময় নেবে; কিংবা হয়তো সেগুলোকে জার্মানরা ... কাজেই লাগাতে পারবে না।

বরষায়

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

বাদল দিনের ক্ষণিক অরুণাভাসে
দিয়াছিলে দেখা ঊষার উদয়াচলে,
হাসি মুখখানি কাজল মেঘাঞ্চলে
ঝাঁপিলে সহসা না জানি কি সন্ত্রাসে!
কি আঁধার আজি মোর চরাচর গ্রাসে,
ডুবিল ধরণী তোমার নয়নজলে
শ্বসিয়া শ্বসিয়া পবন কি যেন বলে,
অস্ফুট বাণী মরে দীর্ঘশ্বাসে।

শূন্যে এ ঘরে একা ব'সে চেয়ে রই
আকাশের পানে। অঝোরে ঝরিছে বারি,
অজানা ব্যথায় শুধু নিরাকুল হই,
আঁখিধারা তব মুছাতে নাহিক পারি।

আমি দর্পণ, বুকে ধরি আলো আঁধি
তোমারি মুখের, সেই সাথে হাসি কাঁদি।

পনেরোই আগষ্ট

(শ্রীঅরবিন্দ জন্মদিনে)

জ্যোতির্মালা দেবী

ক্ষণেক নিস্তব্ধ হও, হে পৃথ্বী-মানসী
হে ভারত, স্বপনের সুশুভ্র আধার!
যে অবগুণ্ঠনে তব অস্ফুট উষসী
কুণ্ঠিত করেছে দূর-আকাশের প্যার,
ছিন্ন করি—দাও তারে আলোকে জনম।
ভাস্বর ললাটে অগ্নি, আঁকিয়া বেদনা
ডুবিয়ো না নিরাশায়; হের, অনুপম

মহাসূর্যমানবের অনন্ত-এষণা
ফুটিয়াছে দিনবৃন্তে যুগপদ্মপ্রায়;
সুন্দর বসেছে ধ্যানে যুগান্তনিভৃতে,
সৌরভে ও সুরে তার নিশি ভেসে যায়!
এ জয়ন্ত প্রভাতের জাগ্রত রবিতে
হে তাপসি, হোক বিশ্বে বিভা-উম্বোধন,
জাগো দেবী স্বপ্নদীপা—ভারত স্বপন!

পূর্বে কীটপতঙ্গদের আত্মগোপন-কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এবার জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীরা

'পত্রগুচ্ছ' পতঙ্গের আত্মগোপন

কিভাবে শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কৌশল অবলম্বন করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করছি। প্রাণীতত্ত্ববিদেরা বলেন, প্রাণীর দেহের এই বিচিত্র বর্ণচ্ছটা কেবল তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়তা করে না। এই বর্ণচ্ছটার একটা প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে। সেই উদ্দেশ্য—প্রাণীজগতকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা এবং জীবন ধারণের জন্য শিকার অনুসন্ধানে সহায়তা করা। প্রাণীজগত যদি দৈহিক বর্ণবৈচিত্র্যের অধিকারী না হ'ত তাহলে তাদের বংশ যে একে একে লুপ্ত হয়ে যেত এ ধারণা করা একেবারে ভুল হবে না।

আফ্রিকার বনজঙ্গলে চিতা বাঘের সন্ধান ক'রে তার আলোক চিত্র সংগ্রহ করা ফটোগ্রাফারের পক্ষে খুবই কষ্ট কর। বুনো ঘাসের রং আর চিতাবাঘের দেহের উপরি ভাগের চাকা চাকা দাগগুলি চিতাবাঘকে এমনভাবে লুকিয়ে রাখে যে, শিকারীর সতর্ক চোখও শিকারকে অতিক্রম ক'রে চলে যায়।

পল্লীগ্রাম অঞ্চলে অনেকেই লাউডগা সাপ দেখেছেন। কিন্তু বনলতার মধ্যে লাউডগা সাপ যখন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আশ্রয় নেয় তখন তার অনুসন্ধান করা বৃথা। এই সাপের দৈহিক গঠন এবং বিচিত্র চিহ্নগুলি সাপকে আত্মগোপনে সাহায্য করে। বনলতার মধ্যে বিশ্রামরত অথবা শিকারের জন্য অপেক্ষমান লাউডগা সাপের উপস্থিতি না বুঝতে পেরে অনেকেই আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। দৈহিক বর্ণচ্ছটা প্রাণীকুলকে যেমন আত্মরক্ষায় সহায়তা করেছে আবার তেমনি জীবন ধারণের জন্য শিকার হত্যারও সুবিধা দিয়েছে।

'বহুরূপী' জীবের নাম অনেকেই শুনেছেন। বহুরূপী গিরগিটিরই স্বগোত্র। ক্যামোফ্লেজ ব্যাপারে বহুরূপী জীবের সঙ্গে কোন জীবের তুলনা হতে পারে না। অন্য প্রাণীরা নিজেদের দেহের বর্ণের সঙ্গে যেখানে মিল খায় এমন একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যেই কেবল আত্মগোপন করতে পারে। ভিন্ন অবস্থার পটভূমিকায় তাদের স্বরূপ ধরা পড়ে। কিন্তু 'বহুরূপী' জীব সর্বত্রই যে-কোন অবস্থার পটভূমিকাতেই আত্মগোপন করতে পারে। বহুরূপীর দেহ কি সত্য সত্যই বিভিন্ন বর্ণে রূপান্তরিত হয়? ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। এদের দেহের আঁষ এত মসৃণ এবং স্বচ্ছ যে, যে-কোন রং এদের আঁষে প্রতিফলিত হয়ে 'বহুরূপী'কে বহুরূপে রূপান্তরিত করে।

জিরাফ বৃহৎ প্রাণী। এদের আত্মগোপন করা খুবই মুস্কিল ভাবছেন। কিন্তু যখনই এরা বড় বড় গাছের গুঁড়ি গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াবে, তখন আপনার চোখ এদের হারিয়ে ফেলবে। জেব্রার লম্বা ডোরা আত্মগোপন করতে সাহায্য করে লম্বা বুনো ঘাসের জঙ্গলে। বাঙলাদেশের ডোরা-কাটা বাঘগুলি ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে শিকারীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে আবার চুপ ক'রে শিকারের অপেক্ষায়ও থাকে। পক্ষীজগতেরও আত্মগোপন একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃতি তাদের পালকের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা দিয়ে এ কাজে সহায়তা করেছে। জলের মধ্যে উজ্জ্বল বর্ণের পাতলা মাছগুলিকেও অদ্ভুতভাবে আত্মগোপন করতে দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়।

নদীর বালিয়াড়ীর ধারে ধারে অসংখ্য ছোট ছোট পাখীদের পথচারীর আবির্ভাবে ভয় পেয়ে বালির নীড় ছেড়ে উড়ে যেতে দেখা গেছে। এদের পালকের রং এমন অদ্ভুত যে, খুব কাছে না গেলে তাদের উপস্থিতি ধরা পড়ে না। তাই হঠাৎ দু'পাশ থেকে পাখীদের ত্বরিৎগতিতে উড়ে যাওয়া দেখে পথচারীরা প্রথমে ভীত হয়ে পড়ে।

অনুসন্ধিৎসু মানুষ কিন্তু ভীত হয় না। তারা প্রাণী-জগতের এই আত্মগোপন কৌশল আবিষ্কারের মোহে অতল সমুদ্রের তলদেশে, দুর্লঙ্ঘ্য পার্বত্য শিখরে, দুর্গম অরণ্যে অভিযান করে। সে অভিযানের সমাপ্তি হয়, কখনও কখনও দুর্ঘটনার মুখো, কিন্তু মানুষ বিপদের কথা ভেবে অবসর নেয় না। সে অভিযানেরও শেষ হয় না।
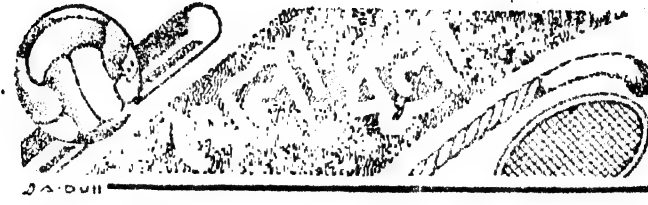
আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা শেষ হইতে চলিয়াছে। তিনটি মাত্র খেলা বাকী আছে। এই তিনটি খেলা শেষ হইলেই শীল্ড বিজয়ী নির্ধারিত হইয়া যাইবে। কোন দল এই সম্মান লাভ করিবে তাহা এখনও বলা কঠিন। সেমি-ফাইনালে তিনটি স্থানীয় দল, মহমেডান স্পোর্টিং, ইস্টবেঙ্গল ও রেঞ্জার্স উঠিয়াছে। মহীশূর রোভার্স বাহিরের একমাত্র দল যাহা সেমি-ফাইনালে খেলিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। মহমেডান স্পোর্টিং দলকে মহীশূর রোভার্স দলের সহিত ও ইস্টবেঙ্গল দলকে রেঞ্জার্স দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। এই চারিটী দলের বিভিন্ন রাউণ্ডের খেলা দেখিয়া যেরূপ ধারণা হইয়াছে তাহাতে বলা যায় যে, মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ফাইনালে বোধ হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। কারণ মহীশূর রোভার্স দলের পক্ষে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করা একরূপ অসম্ভব। মহীশূর রোভার্স দলের আক্রমণভাগ ভাল হইলেও রক্ষণভাগ এতই দুর্বল যে, মহমেডান স্পোর্টিং দলের ন্যায় একটি শক্তিশালী দলের সহিত সম-প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব নহে। অপর দিকে রেঞ্জার্স দলের পক্ষেও অনুরূপ মন্তব্য করা চলে। লীগ প্রতিযোগিতার সময় রেঞ্জার্স কোন খেলাতেই ইস্টবেঙ্গল দলের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। লীগ প্রতিযোগিতার সময় পর পর দুইটী খেলায় রেঞ্জার্সকে পরাজিত করিয়া ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড়গণ যে ভরসা ও সাহস লাভ করিয়াছেন শীল্ড প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল খেলার সময় তাহাই জয়লাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে। এই উক্তি করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে রেঞ্জার্স ক্লাবের উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শনের সম্ভাবনা আছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড়গণ ক্লাবের ইতিহাসে এই বৎসর নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিতে চলিয়াছে। লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। শীল্ড প্রতিযোগিতায় কোন বৎসর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে সেমি-ফাইনালে খেলিবার সৌভাগ্য হয় নাই। এই বৎসর তাহাও অর্জন করিয়াছেন। ফাইনালে খেলিয়া শীল্ড বিজয়ীর সম্মান লাভের জন্য এই ক্লাবের খেলোয়াড়গণ আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন ইহা আশা করা কোনই অন্যায় হইবে না। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব গত বৎসরের শীল্ড বিজয়ী। সুতরাং এ বৎসর তাঁহারা সেই গৌরব অর্জনের জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং শীল্ড ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মধ্যে যে তীব্র প্রতিযোগিতা হইবে সেই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল এই দুইটী দলই স্থানীয় দল। সেই হিসাবে এই দল দুইটীর মধ্যে যে কোন দল শীল্ড বিজয়ী হইলে স্থানীয় ক্রীড়ামোদিগণ বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ লাভ করিবেন।

সাম্প্রদায়িক ক্রীকেট খেলা

"বোম্বাই পেন্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সাম্প্রদায়িক বিষ ক্রীড়ামোদিগণের ও সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিতেছেন এবং সেই জন্য এই প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়া উচিত। এমন কি এই জাতীয় যে সকল প্রতিযোগিতা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় তাহাও বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।" এই আন্দোলন গত কয়েক বৎসর হইতেই আমাদের শুনিয়া আসিতে হইতেছে। এই সকল আন্দোলনকারিগণ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করিতে বাধ্য করিয়াছে। রাজা মহারাজারা যাঁহারা ভারতের বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়গণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন তাঁহাদের পর্যন্ত বাধ্য করা হইয়াছে তাঁহাদের পালিত খেলোয়াড়গণকে ঐ সকল প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে না দিতে। এই সকল ব্যবস্থা ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বিবৃতি প্রভৃতি পাঠ করিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়াছিল যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যতগুলি প্রতিযোগিতা ভারতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সে সকল বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা সেইরূপ ধারণা করি না। উপরন্তু ঐ সকল প্রতিযোগিতা বন্ধ করা আন্দোলনকারীদের পক্ষে কখনও সম্ভব হইবে না, ইহাই আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম। আমাদের সেই উক্তি অনেকেরই হাস্যোদ্রেকের কারণ হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই তাঁহারা লজ্জিত হইয়াছেন। আমাদের উক্তিই শেষ পর্যন্ত ঠিক হইল। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনার পর প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বোম্বাই পেন্টাঙ্গুলার এমন কি ঐ জাতীয় সকল স্থানের সকল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ঐ সকল অনুষ্ঠান বর্তমানে অনুমোদন করিতেছেন তবে স্মরণ থাকে যেন যুদ্ধের অবসানের পর তাঁহারা পুনরায় তাঁহাদের মত পরিবর্তন করিতে পারেন। অর্থাৎ যুদ্ধের অবসানের পর পুনরায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে পুনরায় বিচার করিয়া নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। তাঁহাদের গৃহীত প্রস্তাব পাঠ করিলে ইহাই মনে হয় যে, গুরুতর পরিস্থিতির জন্যই ইতিপূর্বে তাঁহারা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহা স্থগিত রাখিলেন। ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্তাগণের বুদ্ধির তারিফ করিতে হয়। এতদিন যে ব্যবস্থা জাতীয় স্বার্থহানিকর বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহা বর্তমান গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়া তলাইয়া গেল। ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। আমরা না বলিলেও দুর্মুখ যাঁহারা অথবা যাঁহারা সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত খেলাধূলার সমর্থক, তাঁহারা বলিবেন "গুরুতর পরিস্থিতি ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভ্যগণকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করিল।" আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিবেন "বেচারা সাব কমিটির সভ্যগণ! ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কার্যকারী সমিতি ইহাদের নিয়োগ করিয়াও উপেক্ষা করিলেন? অনুষ্ঠান বন্ধ করা যখন সম্ভব নহে পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন, তখন সাব-কমিটি গঠন করার কি দরকার ছিল?"

৪ঠা আগস্ট

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, ক্লেটস্কায়া অঞ্চলে ইতালীয় বাহিনী ট্যাঙ্কের সাহায্যে একটি জনপদ আক্রমণ করে, কিন্তু তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হয়। কুশ্চেভস্কায়া অঞ্চলে ঘোরতর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়। সালস্ক অঞ্চলে লাল ফৌজ কয়েকবার শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং পরে পিছু হটিয়া নূতন ঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, ডনের বাঁকের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একটি বড় জার্মান ট্যাঙ্ক বহর অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। সোভিয়েট ডাইভ বোমারু বিমানসমূহ দিবারাত্রি ট্যাঙ্কগুলির উপর আক্রমণ চালাইতেছে এবং যে সকল জার্মান বিমান ট্যাঙ্কগুলিকে আকাশপথে তৈল সরবরাহের চেষ্টা করিতেছে, রুশ বিমানসমূহ তাহাদের সহিত মরিয়া হইয়া সংগ্রাম করিতেছে।

৫ই আগস্ট

রুশ রণাঙ্গন—উত্তর ককেশাসের তৈলখনি অভিমুখে ধাবমান ফন বকের পানৎসের বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী পুনরায় পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। জার্মানরা এক বিরাট অর্ধবৃত্তের আকারে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতেছে। এই অর্ধবৃত্তের দক্ষিণ প্রান্ত আজভ সাগরে সন্নিবিষ্ট এবং বাম প্রান্ত ভরোশিলভস্ক-এর মধ্য দিয়া রোস্টভ-বাকু রেলওয়ের আর্মাভিরের দিকে সম্প্রসারিত। জার্মানরা আর্মাভির হইতে ১৩ মাইল দূরবর্তী এক স্থানে পৌঁছিয়াছে' বলিয়া এক্সিস পক্ষ হইতে দাবী করা হইয়াছে।

অদ্য বার্লিন হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, ত্বরিৎ আক্রমণে ক্রাসনোডার হইতে প্রায় ৩৫ মাইল উত্তর-পূর্বে এবং মাইকপ হইতে ৩০ মাইলেরও কম দূরে অবস্থিত ক্রোপটকিন রেলওয়ে জংসন অধিকার করা হইয়াছে। মস্কো হইতে বলা হইয়াছে যে, ক্রোপটকিনের প্রায় ৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বেলায়াগ্লিনা অঞ্চলে যুদ্ধ চলিতেছে।

মস্কোর ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ক্লেটস্কায়া অঞ্চলে জার্মানদের চারি দফা আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। সিমলিয়ানস্কায়া অঞ্চলের একটি রণাঙ্গন হইতে সোভিয়েট বাহিনী নূতন ঘাঁটিতে সরিয়া আসিয়াছে। বেলায়াগ্লিনা অঞ্চলে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চালাইবার পর রুশ সৈন্যগণ নূতন ঘাঁটিতে হটিয়া আসিয়াছে। সালস্ক এলাকায় সোভিয়েটেরা আরও পশ্চাদপসরণ করিয়াছে।

৬ই আগস্ট

জাপানীরা পাপুয়ায় অবতরণ করিয়াছে এবং বিমানপথে পোর্ট মোরসবি হইতে মাত্র এক ঘণ্টার পথ দূরে আসিয়া ঘাঁটি তৈয়ার করিয়াছে। তাহারা মোরসবি বন্দরের ৬০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

৭ই আগস্ট

রুশ রণাঙ্গন—স্ট্যালিনগ্রাদ হইতে একশত মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত কোটেলনিকোভো রেল স্টেশনটির জন্য একটি বড় রকমের ট্যাঙ্ক যুদ্ধ চলিতেছে। এখান হইতে ফন বক স্ট্যালিনগ্রাদের অভিমুখে এক ষাঁড়াশী অভিযান চালাইবার আয়োজন করিতেছেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষীয় হেডকোয়ার্টার হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপানীরা অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে টিমর ও ডাচ নিউগিনির মধ্যবর্তী টেনিম্বার, কেই ও আরু দ্বীপ দখল করিয়াছে।

চীনা সংবাদ সরবরাহ বিভাগের লণ্ডনস্থিত ডিরেক্টর মিঃ জর্জ ইয়ে অদ্য বলেন যে, সুদূর প্রাচ্যের রুশ সীমান্তের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। জাপান যেরূপভাবে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে, তাহাতে রুশিয়ার পূর্ব সীমান্তের সমুদ্রতটবর্তী প্রদেশসমূহের উপর আক্রমণ সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে।

চুংকিংয়ের খবরে প্রকাশ, আরও দুইটি জাপানী ডিভিসন ইন্দোচীনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা লইয়া তথায় জাপানীদের মোট চার ডিভিসন অর্থাৎ এক লক্ষ সৈন্য মোতায়েন হইল। ইহাতে বুঝা যায় যে, জাপানীরা ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোচীন হইতে কুনমিং আক্রমণ করিবে।

৮ই আগস্ট

রুশ রণাঙ্গন—উত্তর ককেশাসের কুবান এলাকায় জার্মানরা মাইকপ তৈলখনি অঞ্চলের ৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন আর্মাভির অধিকার করার দাবী করিয়াছে। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে জার্মান বাহিনী সালস্ক হইতে আর্মাভির এবং কুবান শস্যক্ষেত্র ও তৈলখনি অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মার্শাল টিমোশেঙ্কো প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাইতেছেন এবং পুনরায় পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়াছেন।

৯ই আগস্ট

রুশ রণাঙ্গন—'রয়টারে'র বিশেষ সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, ৭ই আগস্ট রাত্রি হইতে উত্তর ককেশাসের পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। রাশিয়ানরা ক্রোপটকিন এলাকায় পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। ক্রোপটকিন রোস্টভ রেলপথের আর্মাভির-এর ৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। রেলপথ ধরিয়া উত্তর-পূর্বে ৯৫ মাইল দূরবর্তী স্ট্যালিনগ্রাদ অভিমুখে জার্মান অগ্রগতি রোধের চেষ্টায় সোভিয়েট বাহিনী কোটেলনিকোভোর চতুর্দিকে ঘোরতর সংগ্রামে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

১০ই আগস্ট

রুশ রণাঙ্গন—ভরোনেজের দক্ষিণে শক্তিশালী সোভিয়েট সৈন্যদল কতকগুলি স্থানে ডন নদী অতিক্রম করিয়া রণাঙ্গনের দক্ষিণ দিকে প্রসারিত করিতেছে। সোভিয়েট সৈন্যেরা কয়েকটি জনপদ পুনরধিকার করিয়াছে এবং শত্রুকে কয়েক মাইল পশ্চিমে হটাইয়া দিয়াছে।

১১ই আগস্ট—

রুশ রণাঙ্গন—রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, স্ট্যালিনগ্রাদের প্রবেশপথসমূহ অধিকারের সংগ্রাম পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়াছে। জার্মাণরা তাহাদের সৈন্যদল পুনর্গঠন করিয়া দলে দলে নূতন সৈন্য আমদানী করিয়া গতকল্য ডন বাঁকে পুনরায় আক্রমণ সুরু করে। ক্লেটস্কায়ার ঘাঁটিসমূহের দক্ষিণপার্শ্বভাগ হইতে প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু হইয়াছে। এই স্থান হইতে তাহারা ডন বাঁকে পূর্বতম প্রান্তভাগে পৌঁছিবার জন্য চাপ দিতেছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর কয়েকবার হাতবদল হয়। জার্মানরা স্ট্যালিনগ্রাদ রেলপথ ধরিয়া আরও অগ্রসর হইবার উদ্দেশ্যে কোটেলনিকোভোর উত্তর-পূর্বে বিরাট ট্যাঙ্ক বাহিনী ও দলে দলে অন্যান্য শ্রেণীর সৈন্য প্রেরণ করিতেছে। কয়েকদিন পূর্বে জার্মানরা সোভিয়েট ঘাঁটিসমূহে একটি কীলক প্রবেশ করায় উহার যোগাযোগ ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত বহু জার্মান প্যারাসুট সৈন্য অবতরণ করে। তাহাদিগকে ত্বরায় বিনাশ করা হয়। 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, স্ট্যালিনগ্রাদ অধিকারের জন্য যে সংগ্রাম সুরু হইয়াছে, তাহার অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে।

৪ঠা আগস্ট

বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিন ঘণ্টাকাল আলোচনা চলে। মহাত্মা গান্ধী বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন।

ওয়ার্কিং কমিটির এলাহাবাদ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর খসড়া প্রস্তাব আলোচনা সম্বলিত কাগজপত্র, ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশিত হইয়াছে। গত ২৬শে মে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অফিসে খানাতল্লাসীর সময় পুলিশ ঐ সকল কাগজপত্র হস্তগত করিয়াছিল।

৫ আগস্ট

ভারতবর্ষ যাহাতে কার্যকরীভাবে সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের মিত্র হইতে ও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে সক্ষম হয়, তজ্জন্য বৃটিশ শক্তির অপসারণের জন্য কংগ্রেসের দাবী ও কংগ্রেসের মনোভাব নূতন করিয়া পুনরায় বর্ণনা করিয়া অদ্য বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে গ্রেট বৃটেন এবং সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের নিকট কংগ্রেসের দাবী গ্রহণের জন্য শেষ আবেদন জানান হইয়াছে। প্রস্তাবে এরূপ বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ গভর্নমেন্টের আচরণের জন্য প্রয়োজন হইলে কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এক গণ-সংগ্রাম আরম্ভ করিবে। প্রস্তাবটি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠকে উত্থাপন করা হইবে।

৭ই আগস্ট

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতিতে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে, তাহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ এক ঘণ্টা ৪০ মিনিটকাল ধরিয়া বক্তৃতা করেন। মৌলানা আজাদের বক্তৃতার পর মহাত্মা গান্ধী বক্তৃতা প্রসঙ্গে আসন্ন সংগ্রামের গুরুত্ব ও কংগ্রেসকর্মীদের দায়িত্বের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাহা সমর্থন করেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের প্রথম বাৎসরিক অনুষ্ঠান কলিকাতায় ও শান্তিনিকেতনে যথোচিত গাম্ভীর্য ও আন্তরিকতার সহিত উদ্‌যাপিত হয়। কলিকাতা ও শহরতলীর শত সহস্র নরনারী কবির বাসভবনে, শ্মশানভূমিতে ও বিভিন্ন জনসভায় যোগদান করিয়া কবির অমর স্মৃতির প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। কবির অমর কীর্তি স্মরণকল্পে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত উহাতে পৌরোহিত্য করেন।

৮ই আগস্ট

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে ওয়ার্কিং কমিটির মূল প্রস্তাব বহু ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে—মাত্র ১৩ জন সদস্য বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। রাত্রি ১০ ঘটিকায় নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়। মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটির মূল প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী প্রথমেই বলেন,—"আন্দোলন আরম্ভ করিবার পূর্বে বড়লাটের সহিত দেখা করিবার জন্য আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করিব।" মহাত্মা বলেন, "এই আন্দোলনে আমি আপনাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেছি। আপনাদের অধিনায়ক হিসাবে নহে,—আপনাদের নিয়ন্তা হিসাবে নহে,—আপনাদের সকলের অধম ভৃত্য হিসাবেই আমি আপনাদের নায়কত্ব গ্রহণ করিতেছি।"

কেন্দ্রীয় সরকার এক আদেশ জারী করিয়া কোন মুদ্রাকর, প্রকাশক অথবা সম্পাদককে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অনুমোদিত গণআন্দোলন অথবা উক্ত আন্দোলনের বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে কোন তথ্য সংক্রান্ত সংবাদ (জনসাধারণের বক্তৃতা এবং বিবৃতিও ইহার আমলে পড়িবে) (১) সরকারী সূত্রে অথবা (২) এসোসিয়েটেড প্রেস, ইউনাইটেড প্রেস কিম্বা ওরিয়েণ্ট প্রেস অব ইণ্ডিয়া, কিম্বা (৩) সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র কর্তৃক যথাবিধি নিযুক্ত কোন সংবাদদাতার (যাঁহার নাম, তিনি যে জেলায় কাজ করেন, তথাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তালিকাভুক্ত আছে) মারফৎ না পাইলে ছাপাইতে কিম্বা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্তৃক ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুমোদিত হইবার পর অদ্য রাত্রিতে সপারিষদ বড়লাট এক প্রস্তাবে কংগ্রেসের প্রস্তাবে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং উহা দ্বারা যে 'চ্যালেঞ্জ' করা হইয়াছে, তাহা প্রতিরোধ করার দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করেন।

৯ই আগস্ট

অদ্য প্রাতে মহাত্মা গান্ধী, রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, আচার্য জে বি কৃপালনী, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, মিঃ আসফ আলি, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া, ডাঃ সৈয়দ মামুদ সহ ওয়ার্কিং কমিটির সমুদয় সদস্যকে বোম্বাইয়ে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে বোম্বাই হইতে স্পেশাল ট্রেনে পুণায় লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহাদিগকে যারবেদা জেলে নেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

অদ্য অপরাহ্ণে বিরলা ভবনে (বোম্বাই) শ্রীযুক্তা কস্তুরবাঈ গান্ধী, মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পিয়ারীলাল ও ডাঃ সুশীলা নায়ারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বোম্বাইতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণসহ মোট ৪৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত নেতাদের মধ্যে বোম্বাইয়ের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি জি খের, বোম্বাইয়ের মেয়র মিঃ ইউসুফ মেহেরালী, প্রাক্তন মন্ত্রী মিঃ মোরারজী দেশাই, প্রাক্তন মন্ত্রী মিঃ ইয়াসীন নুরী, মিঃ হাতী সিং, মিঃ নগিনদাস মাষ্টার ও মিঃ এস কে পাতিল, শ্রীমতী মণিবেন প্যাটেল প্রভৃতি আছেন।

পাটনায় ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আমেদাবাদে পুলিশ বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার শ্রীযুক্ত মাভলঙ্কার এবং দরবার গোপালদাস দেশাই সহ মোট ১৭ জন কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

এলাহাবাদে যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার বাবু পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন এবং প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুকে গ্রেপ্তার করিয়া নৈনী সেণ্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

পুণায় পুলিশ মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত এন ভি গ্যাডগিল এবং শ্রীমতী প্রেমকণ্টক প্রমুখ মোট ১৬ জন কংগ্রেসকর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

লাহোরে এ পর্যন্ত ১৮ জন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী গ্রেপ্তার

আছেন। ইঁহাদের মধ্যে লালা দুনিচাঁদ এম এল এ, দৈনিক তাপ'-এর ম্যানেজিং এডিটার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র প্রভৃতি আছেন।

কটকে ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীযুত নিত্যানন্দ কানুনগো, গান্ধী সেবা সঙ্ঘের নেতা শ্রীযুত গোপবন্ধু চৌধুরী, তাঁহার পত্নী শ্রীমতী রমা দেবী এবং শ্রীযুত নবকৃষ্ণ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হায়দরাবাদ রক্ষা নিয়মাবলী অনুসারে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কলিকাতায় রামনাথ সিং ও দেবকীনন্দন সিং নামক দুইজন কংগ্রেসকর্মীকে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ওয়ার্ধায় যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের প্রথম সত্যাগ্রহী শ্রীযুক্ত বিনোবা ভাবে ও অপর দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নাগপুরে ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীযুত সি জে ভারুকা সহ কংগ্রেস নেতা এবং কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ে শ্রীযুত সি বি গুপ্ত এম এল এ এবং শ্রীযুত এ কে নায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কাণপুরে পণ্ডিত বালকৃষ্ণ শর্মাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মাদ্রাজে বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুত পি এম আউদী কেলপ্পান নাইকারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের একটি সংবাদে প্রকাশ, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনযায়ী বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে।

এলাহাবাদের সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ স্বরাজ ভবন এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যালয় দখল করিয়াছে। পুলিশ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যালয় তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

আমেদাবাদের খবরে প্রকাশ, পুলিশ কংগ্রেস ভবন তল্লাসী করিয়াছে এবং উহা দখল করিয়াছে।

নাগপুরের খবরে প্রকাশ, মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও উহার অধস্তন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে পুলিশ কর্তৃক বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ১২ বার গুলী বর্ষণের ফলে পাঁচজন নিহত এবং ২০ জন আহত হইয়াছে। ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হওয়ায় আরও ৩৫ জন আহত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৫ জন পুলিশ কনেস্টবল। বোম্বাই শহরে সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে। বোম্বাইয়ে এ পর্যন্ত ১৪৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পুণায় কংগ্রেস ভবনের সম্মুখে এক জনতার উপর পুলিশের গুলী চালনার ফলে দুই ব্যক্তি আহত হয়; তন্মধ্যে একজন হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

আমেদাবাদে গান্ধী রোডে এক উচ্ছৃঙ্খল জনতার উপর পুলিশের গুলী চালনার ফলে এক ব্যক্তি নিহত ও আর এক ব্যক্তি আহত হয়।

১০ই আগস্ট—

বঙ্গীয় সরকার সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুযায়ী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি অবস্থিত বাড়িও বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্থান বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

বিহার, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা এবং সিন্ধুর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহ বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী যে সকল কংগ্রেসী নেতা ও বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল ঃ—

পাটনা—বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। গৌহাটি আসাম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি মৌলবী মহম্মদ তায়েব উল্লা প্রাক্তন অর্থসচিব মিঃ ফকরুদ্দিন আলী মহম্মদ, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম মেধি, ডাঃ হরেকৃষ্ণ দাস ও শ্রীযুক্ত লীলাধর বড়ুয়া। কাশী—যুক্ত প্রদেশের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত সম্পূর্ণানন্দ, খেদনলাল, তারাপদ ভট্টাচার্য। মোরাদাবাদ—যুক্তপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম এবং আরও পাঁচজন কংগ্রেসকর্মী। কটক—শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বসু, প্রাণনাথ পট্টনায়ক, উমাচরণ পট্টনায়ক, মৌলবী মহম্মদ আতাহার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক এবং লোকনাথ মিশ্র প্রভৃতি। মাদ্রাজ—মিঃ সি এন মথুরঙ্গ, শ্রীযুক্ত ভক্ত বৎসলম। বোম্বাই—শ্রীযুত ধীরুভাই দেশাই। কালীকট—মিঃ কে মাধব মেনন এবং মিঃ কে এ দামোদর মেনন। বেরার হইতে শ্রীযুক্ত ব্রিজলাল বিয়ানীর গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বোম্বাই, পুণা ও আহমদাবাদে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশ গুলী চালনা করে। বোম্বাইয়ে দুইদিনের হাঙ্গামায় ১৫ জন নিহত ও বহু লোক অহত হইয়াছে। পুণা ও লক্ষ্ণৌয়ে ছাত্রদের শোভাযাত্রার উপর পুলিশ গুলী চালায়। পুণায় দুইজন ছাত্র আহত হয় এবং লক্ষ্ণৌয়ে কয়েকজন ছাত্র আহত হয়। দিল্লীতে ছাত্রগণ সমবেত হইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ফলে বৃটিশ সৈন্য মোতায়েন করা হয়।

মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হওয়ায় অদ্য কলিকাতায় বড়বাজার অঞ্চলে কয়েকখানি দোকান বন্ধ ছিল। কলিকাতার অন্যান্য অঞ্চলেও অদ্য দোকানপাট বন্ধ ছিল। কলিকাতার কতকগুলি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অপরাহ্নে তাহাদের ক্লাশ হইতে বাহির হইয়া আসে এবং একটি ক্ষুদ্র মিছিল বাহির করিয়া শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে।

বোম্বাইয়ের সমস্ত বাজার বন্ধ ছিল। অদ্য হইতে আগামী ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত ছয় দিন করাচীর তুলার বাজার বন্ধ থাকিবে। অদ্য প্রাতে পুরাতন দিল্লীর অধিকাংশ স্কুল, কলেজ ও দোকানপাট বন্ধ ছিল। নাগপুরের এম্প্রেস মিল ও মডেল মিলের সমগ্র শ্রমিক প্রায় এক ঘণ্টাকাল মিলে থাকিবার পর বাহির হইয়া আসে।

১১ই আগস্ট—

বোম্বাই সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে পুনরায় ভীষণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। দাদার, মাতুঙ্গা, প্যারেল প্রভৃতি এলাকার রাস্তায় রাস্তায় অগণিত বহ্ন্যুৎসব আরম্ভ হয়। এই সমস্ত অঞ্চলে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটিয়া ফেলা হয়। অফিসের কর্মচারিগণকে অফিসে যাইতে নিষেধ করা হয়। ট্রেন, ট্রাম এবং বাস চলাচলের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশ ও সৈন্যদল জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে গুলী চালায়। ফলে ১৩ জন নিহত ও ৩০ জনেরও অধিক লোক আহত হয়।

বোম্বাই সরকার এক বিশেষ আদেশ জারী করিয়া বোম্বাই আমেদাবাদে পিকেটিং করা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

পাটনা, দিল্লী, মাদুরা, কাণপুর, ওয়ার্ধা, নাসিক প্রভৃতি স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশ গুলী চালনা করে। ফলে পাটনায় পাঁচজন নিহত ও ১৪ জন আহত, দিল্লীতে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত, মাদুরায় তিনজন নিহত ও ২২ জন আহত, কাণপুরে এক ব্যক্তি নিহত, ওয়ার্ধায় এক ব্যক্তি নিহত ও দুইজন আহত এবং আগ্রায় কয়েকজন আহত হয়।

কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত সত্যমূর্তিকে মাদ্রাজে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বাঙলার কয়েকজন সদস্যকে ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী হাওড়া স্টেশনে গ্রেপ্তার করা
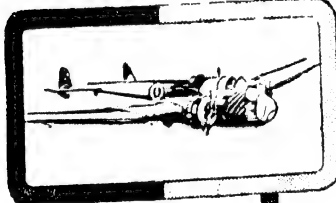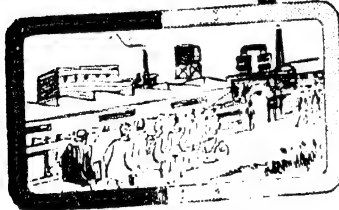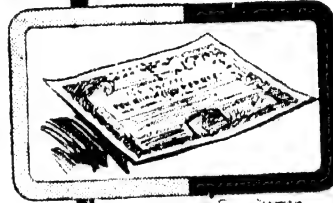
বোম্বাইয়ে কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহারের ফলে একজন দেশসেবিকা অচৈতন্য হইয়া পড়িলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তাহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতেছে

পণ্ডিত নেহেরু, মিঃ ডাঃ রাঃ সমিতির অধিবেশনে যোগদানের জন্য যাইতেছেন। দুই পার্শ্বে দেশসেবিকারা পণ্ডিত নেহেরুকে অভ্যর্থনা জানাইতেছে

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ৫ই ভাদ্র, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 22nd August 1942 [৪১শ সংখ্যা

পরলোকে মহাদেব দেশাই

গত ১৫ই আগস্ট শ্রীমহাদেব দেশাই পরলোকগমন করিয়াছেন। কুড়ি বৎসরের অধিককাল মহাদেব মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারীস্বরূপে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের মত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে মহাদেবও গ্রেপ্তার হন এবং বন্দী অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। কোথায় মৃত্যু ঘটিয়াছে, সরকারী সংবাদ নিয়ন্ত্রণের গোপন রীতির জন্য তাহা জানিবার উপায় নাই। এইরূপ একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ শিষ্যের মৃত্যু যে মহাত্মার পক্ষে কত গভীর বেদনার, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সমস্ত দেশও বেদনা বোধ করিবে সন্দেহ নাই। মহামানব দেশপ্রেমিক মহাত্মাজীর সেবার ভিতর দিয়া মহাত্মাজীর সাধনাকে আপনার করিয়া লইয়া মহাদেব সমগ্র দেশকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, সমগ্র দেশ আজ তাঁহার মৃত্যুতে একজন নিষ্ঠাবান্ নিরভিমান দেশপ্রেমিককে হারাইল এবং মহাদেবের মৃত্যুজনিত এই ক্ষতি সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

মৃত্যুকালে শ্রীযুক্ত দেশাইয়ের বয়ঃক্রম ৫২ বৎসর হইয়াছিল; তাঁহার এই মৃত্যুকে অকাল মৃত্যুই বলিতে হইবে। দেশের স্বাধীনতা শ্রীযুক্ত দেশাইয়ের লক্ষ্য এবং সাধনা ছিল। দেশের স্বাধীনতা লাভ তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহা অত্যন্তই দুঃখের বিষয়। ভারতের স্বাধীনতার অভিযানপথে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, দেশবাসীর পক্ষে ইহাই একমাত্র সান্ত্বনার বিষয়। শ্রীযুক্ত দেশাইয়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমরা আমাদের গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

আত্মপ্রতারণা—

সম্প্রতি ইণ্ডিয়া অফিস হইতে ভারত-সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ব্যাপক বিশৃঙ্খলার কথা মিথ্যা, আন্দোলন পল্লী-অঞ্চলে প্রসারিত হয় নাই এবং সমর-প্রচেষ্টায় বিন্দুমাত্রও বিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছে না। ভারতসচিব আমেরী সাহেব উল্লসিত হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন, "এ যাত্রার মত ভারতবর্ষ রক্ষা পাইল।" কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে এই ধরণের বিবৃতির উদ্দেশ্য কি আমরা জানি না। আমরা দেখিতেছি, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দমননীতি অবলম্বন করিবার ফলে ভারতব্যাপী বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। গভর্নমেণ্ট পূর্ব হইতেই সতর্ক হইয়া অননুমোদিত সংবাদ প্রচার বন্ধ করিবার পাকা ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে যে সব খবর প্রকাশিত হইতেছে, সেগুলি সরকারী কর্মচারী-দের দ্বারা পরীক্ষিত; কিন্তু সেই সব খবর হইতেও দেশব্যাপী বিক্ষোভের যেসব বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা অত্যন্তই শোচনীয় এবং একথা সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে এরূপ বিক্ষোভ দেখা যায় নাই। ভারতসচিব বলিতে পারেন, অবস্থা আয়ত্তাধীন্ হইয়াছে এবং আমরা স্বীকার করি, গভর্নমেণ্টের হাতে সকল ক্ষমতাই যখন আছে, তখন তাঁহারা কঠোর দমননীতি অবলম্বন করিয়া অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনিতেও পারেন; কিন্তু অবস্থা তেমন-ভাবে আয়ত্তের মধ্যে আনার অর্থ কি? মাদ্রাজের উদারনীতিক দলের নেতা শ্রীযুক্ত বেঙ্কটরাম শাস্ত্রী সত্যই বলিয়াছেন, "বর্তমান বিশৃঙ্খলা বর্ধিত ও ব্যাপ্ত হউক কিংবা দমন করিয়া চাপিয়াই দেওয়া হউক, এ উভয়ের পরিণামই অতি ভয়ঙ্কর হইবে।" স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর ন্যায় মডারেট দলের নেতাও সেই কথাই বলিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন, "দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে অতিরঞ্জিত না করিয়াও অথবা তাহার গুরুত্ব হ্রাস না করিয়াও আমার নিকট অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর বলিয়াই বিবেচিত হয়। কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা সাময়িকভাবে অশান্তি দমিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে লোকের মন হইতে বিদ্বেষ ও হিংসা দূর হইতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না।" ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের অনুসৃত দমননীতির মহিমা লইয়া যতই আত্মপ্রবঞ্চনা করুন, স্যার তেজবাহাদুর যাহা আশঙ্কা করিয়াছেন, প্রকৃত সমস্যা হইল সেইখানে। কংগ্রেস মিত্রশক্তির সমরোদ্যমে সমগ্র ভারতের স্বতঃ-স্ফূর্ত সহযোগিতা লাভের পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন, সমস্যা হইল এই যে, দমননীতিতে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি না। ভারতসচিব আমেরী ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আগাগোড়া অন্ধ দৃষ্টি লইয়া চলিতেছেন; তিনি ভারতের বর্তমান অবস্থার গুরুত্বকে অপব্যাখ্যা করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও সকলে তাহা পারিতেছেন না।

আমেরী সাহেবের নিজের দেশের লোকেরাও অনেকে ভারতের বর্তমান অবস্থার জন্য উদ্বেগ বোধ করিতেছেন। এ উদ্বেগ শুধু ভারতের স্বার্থের জন্যই নয়, নিজেদেরও স্বার্থের জন্য। বরং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দমননীতির ফলে স্যার তেজবাহাদুর যে আশংকা করিতেছেন, বিলাতেও ঐ সব চিন্তাশীল লোকও তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছেন; তাঁহারা বুঝিতেছেন, অবস্থা আয়ত্তে আনাই একমাত্র কথা নয়, তদপেক্ষা প্রয়োজন হইল মিত্রশক্তির সমরোদ্যমে সমগ্র ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা লাভের; দমননীতির সাহায্যে অশান্তির প্রকটরূপ অর্থাৎ বিক্ষোভকর কাজগুলিই সাময়িকভাবে বন্ধ করা যাইতে পারে; কিন্তু দেশের লোকের মনের মধ্যে একটা চাপা বিরোধের ভাব থাকিয়াই যায় এবং সে ভাবটা সম্মিলিত শক্তির সমরোদ্যমের সার্থকতার পক্ষে নিশ্চয়ই অনুকূল হইবে না। মনস্তাত্ত্বিক এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়াই বহু বিশিষ্ট ইংরেজও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অনুসৃত বর্তমান নীতির তীব্র নিন্দা করিতেছেন। মাদ্রাজের খৃস্টান ছাত্রী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক মিস মারজরী সাইকস সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"সমস্যাকে এইভাবে জটিল করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, বরং ধৈর্য এবং সহানুভূতির সহিত নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ভারতের সত্যকার নেতাদের হস্তে প্রকৃত অধিকার ন্যস্ত করিলেই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইত।" 'স্টেটসম্যান'-পত্রে জনৈক 'ইংরেজ সৈনিক' ভারত সম্পর্কে আমেরী সাহেবের নীতির তীব্র নিন্দাবাদ করিয়া লিখিয়াছেন,—পরাধীনতা যে কি বস্তু, আমরা ইংরেজ আমরা কোন দিন তাহা উপলব্ধি করি নাই এবং তাহা উপলব্ধি করি নাই বলিয়াই এই সব বিষয়ে অন্যের মনোভাবের গভীরতাও আমাদের পক্ষে ধারণা করা কঠিন।' সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারত-প্রবাসী ইংরেজগণও স্বাধীনতার দাবী সম্বন্ধে ভারতের জনমতের গভীরতা অনুভব করিতে সক্ষম এবং সেই স্বাধীনতার যাঁহারা দাবী করিতেছেন, সেই মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রতি জনগণের বিশ্বাস ও ভালবাসার পরিমাণও তাঁহারা জানেন, জানেন বলিয়াই ভারতসচিবের অনুসৃত বর্তমান নীতিতে এবং ভারতের দাবী উপেক্ষায় ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের একগুয়েমীতে তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ভারতের নেতাদের ন্যায় তাঁহাদেরও বিশ্বাস এই যে, কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিয়া আপোষ-মীমাংসার পথ ছিল প্রশস্ত পথ এবং মিত্রশক্তির বিজয়লাভের পক্ষেও সেই উপায়ই ছিল কার্যকর উপায়।

আপোষ-নিষ্পত্তির উপায়

আপোষ-নিষ্পত্তির উপায় এখনও আছে কি না, এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু প্রভৃতি ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বদল সম্মেলনের যে প্রস্তাব ইতঃপূর্বে করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাঁহারা সেই প্রস্তাব লইয়া পুনরায় উপস্থিত হইয়াছেন। স্যার সপ্রু বলেন, "রাজনীতি ক্ষেত্রে এখন তাড়াতাড়ি কোনও মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।" এক সেই উপায়েই জনসাধারণের মনোভাব পরিবর্তিত হইতে পারে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ও তাহা সুদৃঢ় করিবারও উহাই একমাত্র উপায়। দূরদৃষ্টি ও সৎসাহসের সহিত গঠনমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ইহাই উপযুক্ত সময়।" আমরা জানি না, স্যার তেজবাহাদুরের এই অনুরোধ রক্ষিত হইবে কি না; কারণ সুস্পষ্টভাবে সে অনুরোধকে উপেক্ষা করিয়াই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট দমননীতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী স্যার তেজবাহাদুরের প্রস্তাবিত সর্বদল সম্মেলনে যোগদান করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং আপোষ-মীমাংসার পথ প্রশস্ত করিবার উদ্দেশ্যেই বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে আরও পরামর্শ করিবার সুযোগ চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। কংগ্রেস-প্রস্তাবে মিত্রশক্তির সমরোদ্যমে সাহায্য করিবার জন্য যে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছিল, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাহা স্বীকার করিয়া লন নাই। কিন্তু স্বীকার না করিলেও সত্যের কোন হানি হইতেছে না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলে সমগ্র ভারতে তাঁহাদের প্রতি সহযোগিতার সংকল্প-শীলতা যে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিত তাহা মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্য; ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের ভ্রান্তি যদি উপলব্ধি করেন এবং তাঁহাদের নীতির পরিবর্তন সাধন করিতে প্রস্তুত থাকেন, তবেই এখনও তাহা সার্থক হইয়া উঠিতে পারে এবং আপোষ-নিষ্পত্তি সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সে ভ্রান্তির নিরসন বলিতে বুঝিতে হইবে, সর্বপ্রথমে বন্দী কংগ্রেস নেতৃবর্গকে মুক্তিদান এবং ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতি। তাঁহারা এই দুইটি কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিলেই মিত্র-শক্তির সমরোদ্যমে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে ভারতের সামরিক সহযোগিতা সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসা সহজেই হইতে পারে; কারণ সে বিষয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কিংবা মিত্রপক্ষের অন্যান্য শক্তির মধ্যে মতের কোন পার্থক্য নাই।

দরদের দরদী—

বিলাতের শ্রমিক দলের দরদের মাত্রা কতখানি, আমাদের জানিতে বাকী নাই। কিছুদিন পূর্বে বিলাতের শ্রমিক দল ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের দমন নীতিরই সমর্থন করিয়াছেন এবং কংগ্রেসের উপর দোষ চাপাইয়া সে দরদ জাহির করিয়াছেন। সম্প্রতি বিলাতের শ্রমিক দলের অন্যতম নেতা মিঃ আর্থার গ্রীনউডের এক বেতার বক্তৃতায় ভারতের প্রতি দরদ উথলিয়া উঠিয়াছে। ভারতের প্রতি প্রীতির আবেশে তিনি গদ গদ ভাষায় বলিয়াছেন, "ফ্যাসিস্ট এবং নাৎসী দল পরাজিত হইলে জগতের স্বাধীনতা যখন সুনিশ্চিত হইবে, তখনই আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারিব 'স্বাধীন ভারত' দীর্ঘজীবী হউক।" ভারতের জন্য দরদী এই ব্রিটিশ শ্রমিক বন্ধুকেও ভারতবাসীরা এই প্রশ্ন করিতে পারে যে, কেন "স্বাধীন ভারত দীর্ঘজীবী হউক," উচ্চকণ্ঠে এ কথাটা এখন বলিতে আটকাইতেছে কে? ভারতবর্ষ তো ফ্যাসিস্ট কিংবা নাৎসীদের দখলে যায় নাই? ইংরেজের

উদার শাসনের ছত্রছায়াতলেই রহিয়াছে। উচ্চকণ্ঠে ব্রিটিশ জাতি যদি ঐ ঘোষণাটি আগে করে, তবেই ফ্যাসিস্ট এবং নাৎসীদের পরাজয় স্বাধীনতালব্ধ ভারতবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় সম্ভব হইতে পারে। মহাত্মা গান্ধী জাগতিক অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, কংগ্রেস-প্রস্তাবে ইহার পরিচয় পাইয়া মিঃ গ্রীনউড বিশেষ কষ্ট অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু আমরা বলি, জাগতিক অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধিতে মহাত্মাজীর কিছু ভুল হয় নাই। তিনি সেই গুরুত্ব বুঝিয়াই, সমস্যা সমাধানের সুনিশ্চিত উপায়স্বরূপে ভারতের স্বাধীনতা দাবী করিয়াছেন। মিঃ গ্রীনউড তাঁহার স্বজাতীয় সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষুদ্র স্বার্থগত সংস্কারবুদ্ধি যদি পরিহার করিতে পারেন, তবেই সে সত্য ধরিতে পারিবেন। মহাত্মাজীর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মিঃ গ্রীনউডের এই কষ্ট তাঁহার নিজের সংস্কারপ্রসূত, উহার বাস্তব কোন ভিত্তি নাই।

ভারতের দাবী সম্বন্ধে চীন—

চীনের জাতীয় দলের সরকারী মুখপত্র 'সেণ্ট্রাল ডেলী নিউজ' সম্প্রতি ভারতের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্মিলিত শক্তির সমরোদ্যমেরই সহায়ক; সুতরাং তৎপ্রতি আমাদের সহানুভূতি না থাকিবার কোন কারণ নাই।" চীনের জাতীয় দল ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, এই মন্তব্য হইতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়; মিত্রপক্ষের অন্তর্ভুক্ত শক্তিবর্গ মানব-স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিকতায় সমর্থক বলিয়া নিজদিগকে প্রচার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের অন্য কেহই কংগ্রেসের দাবীকে এমন দৃষ্টিতে দেখিতেছেন না; অন্ততঃপক্ষে আমাদের কাছে যে, সব সংবাদ পেশীছিতেছে, তাহাতে আমরা তেমন পরিচয় পাইতেছি না। আমেরিকার গণ-তান্ত্রিকতায় খ্যাতি আছে, স্ট্যালিন পরিচালিত রুশিয়া সাম্যবাদের সমর্থক। এই দুই দেশের কোন স্থান হইতেই সুস্পষ্টভাবে ভারতের স্বাধীনতার সমর্থনের সাড়া মিলিতেছে না। পরধীনতার বেদনা মার্কিনবাসীদের বুঝা উচিত, কারণ এ সম্বন্ধে অতীতের অভিজ্ঞতা তাঁহাদের রহিয়াছে। কিন্তু আমেরিকার মনোবৃত্তি এক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ষোল-আনা সমর্থক দেখা যাইতেছে। রুশিয়ার সংবাদপত্রসমূহে কংগ্রেসের দাবীকে প্রাধান্য না দিয়া ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নীতির পক্ষেই প্রচারকার্য চালান হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কংগ্রেসের তরফ হইতে মহাত্মা গান্ধী মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং মার্শাল চিয়াং কাইসেকের নিকট যে অনুরোধপত্র প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, আমরা শুনিতেছি, ঐ পত্র তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু তাহা তাঁহাদের নিকট পেশীছিবে কি না বলা যায় না; কারণ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে পরিগৃহীত প্রস্তাবের সমস্তটা এবং তৎসম্বন্ধে কংগ্রেস নেতৃবর্গের বক্তৃতাদি ঠিকভাবে আমেরিকা এবং রুশিয়া প্রভৃতি দেশে পেশীছিয়াছে কি না, তৎসম্বন্ধে সহযোগী 'স্টেটসম্যান' পর্যন্ত সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের পক্ষের কথা প্রচারিত হইবার সুবিধা ঐ সব দেশে না থাকিলেও স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস প্রমুখ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মুখপাত্রগণ কংগ্রেস দমনের পক্ষে আমেরিকার নিকট যে সব ওকালতি করিতেছেন, তাহাতে পরোক্ষভাবে মার্কিনবাসীরা ভারতের প্রকৃত সমস্যা কতকটা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। রুশিয়ার কাছে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বড়কর্তারা এই ধরণের ওকালতি করিবার ততটা গরজ বোধ করিতেছেন না। সুতরাং ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মূল নীতির সম্বন্ধে রুশ রাজনীতিকদের মোটামুটি অভিজ্ঞতা থাকিলেও কংগ্রেসের দাবী সম্পর্কিত বিশেষ অবস্থা বুঝিয়া উঠিবার পক্ষে তাঁহাদের তেমন সুযোগ হয়ত ঘটিতেছে না। কিন্তু এই বিশেষ অবস্থার কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতের স্বাধীনতা দাবীর সম্পর্কে এ পর্যন্ত সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের কোন সহানুভূতি-মূলক মনোভাবের পরিচয় আমরা পাই নাই, ইহাই হইতেছে লক্ষ্য করিবার বিষয়। সম্প্রতি এই মর্মে একটি সংবাদ আসিয়াছে যে, মার্কিন সরকার ভারতে প্রেরিত মার্কিন সৈন্য-দিগকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, তাহারা যেন ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ না করে। এই সংবাদটি কিছু অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ভারতের বর্তমান সমস্যার সমাধান এবং তদ্দ্বারা মিত্রশক্তির সমরোদ্যমে সমগ্র ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা লাভের দিক হইতে এমন প্রস্তাব কিছুই সহায়ক হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। কংগ্রেস-প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিলেই সমস্যার প্রকৃত সমাধানের পথ প্রশস্ত হইতে পারে। মিত্রশক্তির সমরোদ্যমকে সার্থক করিবার আন্তরিকতা লইয়াই যে কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা দাবী করিতেছেন, আমেরিকা পর্যন্ত নিতান্ত স্পষ্ট এই সত্য উপলব্ধি করিতেছে না; ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ভারতের সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিবার জন্য বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়াও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে অসম্মত হইতেছেন। সম্প্রতি একটি সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, মার্কিন গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ হাল নাকি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রতিনিধিদিগকে জানাইয়াছেন যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে যাহাতে আপোষ নিষ্পত্তি হয়, সেজন্য ঐ দুই পক্ষকে তাঁহারা সাহায্য করিতে ইচ্ছুক। মার্কিন গভর্নমেণ্ট কি ভাবে এই সাহায্য করিতে চাহিতেছেন, এ সংবাদে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে যদি তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে রাজী করিতে পারেন, তবেই আপোষ নিষ্পত্তি সম্ভব হইতে পারে। ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি বা গ্যারাণ্টী প্রভৃতিতে সমস্যার সমাধান হইবে না।

সঙ্কল্প

গত ১৭ই আগষ্ট কলিকাতার সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী এবং সম্পাদকগণ একটি সম্মেলনে সমবেত হইয়া এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন যে, বর্তমান রাজনীতিক অবস্থা এবং সরকারী সংবাদ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে

বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের মতে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং জনসাধারণের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য অব্যাহত রাখিয়া সংবাদপত্র পরিচালনা করা সম্ভব নহে; এজন্য ২১শে আগস্ট হইতে তাঁহারা সংবাদপত্র প্রকাশ স্থগিত রাখিবেন। কলিকাতার জাতীয়তাবাদী সব সংবাদপত্রই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত মর্যাদাপূর্ণ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সংবাদ নিয়ন্ত্রণে ভারত গভর্নমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে যেরূপ কঠোরতার সঙ্গে বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, তাহাতে কোন সংবাদপত্রের পক্ষেই আত্মমর্যাদা বজায় রাখা সম্ভব নহে এবং জনসাধারণের প্রতি সংবাদপত্র হিসাবে তাঁহাদের যে কর্তব্য, তাহাও তাঁহারা প্রতিপালন করিতে পারেন না। সংবাদ প্রকাশ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থার অনুসরণ করিতেছেন, তাহার মূলে কোন যুক্তি নাই বা নীতিও নাই। এমনকি, বাঙলার প্রধান মন্ত্রী যিনি সংবাদ নিয়ন্ত্রণের এই দুর্দৈবের ফলে তাঁহার পক্ষ হইতেই জনসাধারণকে এই অনুরোধ করিতে হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন পুলিশের গুলীচালনার ফলে হতাহত ব্যক্তিদের নামধাম প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি দিনের পর দিন একটা সম্মানজনক আপোষ করিবার জন্যই গভর্নমেণ্টকে পরামর্শ দিয়া আসিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের সে উপদেশে কর্ণপাত করা দূরের কথা, ভারত গভর্নমেণ্ট উত্তরোত্তর সংবাদপত্রসমূহের মর্যাদায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া নিতান্ত নির্বিচারে তাঁহাদের কণ্ঠরোধের উপরই জোর দিতেছেন। এরূপ অবস্থায় সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ করা ছাড়া আর কি উপায় আছে? গভর্নমেণ্টের বর্তমান মনোভাবের পরিবর্তন না ঘটিলে প্রতিকার এই পথে হইবে কি না জানি না, তবে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে ইহাই একমাত্র পথ।

মূল্য নিয়ন্ত্রণের জের

ভারত গভর্নমেণ্ট সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই আর এক দফা মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন আহ্বানের আয়োজন করিতেছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। বর্তমান মূল্য নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়াই বোধ হয় এই ব্যবস্থা করা হইতেছে। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৪২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ভারত গভর্নমেণ্ট তিনটি এই ধরণের সম্মেলন শেষ করিয়াছেন; কিন্তু সমস্যা মিটে নাই, আবার একটি সম্মেলন আহ্বান করিলেও সমস্যার কতটা সমাধান হইবে, সে সম্বন্ধে আমাদের সত্যই সন্দেহ হইতেছে; কারণ বাঙলাদেশের অবস্থা দেখিয়া তো আমাদের স্পষ্টই মনে হইতেছে যে, মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবস্থার কোন অংশই হ্রাস করিতে সমর্থ হয় নাই, বরং অবস্থার গুরুত্বই উহাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারাও কেহ কেহ সেই রকমই মনে করিতেছেন। চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভ্রাট এ পক্ষে সব চেয়ে বড় প্রমাণ। বাঙলা সরকার চাউলের যে দর নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, কলিকাতার বাজারে সে দরে চাউল পাওয়া যায় না; প্রকৃতপক্ষে গভর্নমেণ্ট যে শ্রেণীর চাউলের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন, দর বাঁধিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে সে শ্রেণীর চাউল কলিকাতা শহরের বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। কলিকাতার প্রধান প্রধান চাউল ব্যবসায়ীরা বলিতেছেন, কলিকাতার বাহিরে কোন কোন স্থানে তাঁহাদের অনেক চাউল কেনা রহিয়াছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সে চাউল রপ্তানি করিতে দিলেই তাঁহারা কলিকাতায় আনিয়া সরকারের বাঁধা দরে চাউল বিক্রয় করিতে পারেন। ইহারা সে অনুমতি কেন পাইতেছেন না ইহা বুঝা দুষ্কর। কলিকাতায় চাউলের দর বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলেও দর ক্রমেই চড়িতেছে, ফলে কলিকাতায় সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি এবং মফঃস্বলের কর্তৃপক্ষের রপ্তানি নিরোধের ব্যবস্থা দুইয়ে মিলিয়া লাভখোরদেরই সুবিধা করিয়া দিতেছে। প্রকৃতপক্ষে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের এই ব্যবস্থা কার্যকর করিতে হইলে শুধু কলিকাতা শহরকেই মূল্য নিয়ন্ত্রণ বেষ্টনীর দ্বারা ঘিরিয়া রাখিলে চলিবে না, যে সব জায়গায় মাল প্রচুর পরিমাণে জমা আছে, সেই সব জায়গা হইতে অভাবগ্রস্ত স্থানসমূহে ন্যায়সংগত মূল্যে মাল সরবরাহের ভাল ব্যবস্থাও করিতে হইবে। বাঙলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি চিনি, ময়দা, নারিকেলের তৈল, কয়লা, কেরোসিন তৈল, এসব দিক হইতে ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু চাউলের ব্যাপারে এ নীতির ব্যর্থতাই সবচেয়ে সংকটজনক আকার ধারণ করিয়াছে, অথচ বিষয়টি প্রধানত বাঙলা সরকারেরই ব্যাপার। এখনও যদি বাঙলা সরকার তাঁহাদের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির এ গলদ সংশোধন না করেন, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিক হইতেও দেশে গুরুতর সংকট দেখা দিবে। আমরা এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি সমধিক আকৃষ্ট করিতেছি।

দেশব্যাপী অর্থসংকট

দেশব্যাপী অর্থসংকট নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। আবশ্যক জিনিসপত্রের মহার্ঘতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, কোন কোন জিনিস একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জানুয়ারী মাসের পর হইতে এদেশের লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় পূর্বাপেক্ষা শতকরা ৪৪, টাকা হারে বাড়িয়াছে, সেই অনুপাতে ইংলণ্ডের লোকের বাড়িয়াছে শতকরা ২০, টাকা হারে; অথচ ইংলণ্ডের লোককে অন্নের জন্য বাহিরের আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়, আর এদেশের অন্নসমস্যার সমাধান প্রধানত এদেশের উৎপন্ন শস্যের দ্বারাই হইয়া থাকে। কিন্তু দেশের লোকের এই যে দারুণ দুঃখ-দুর্দশা, ভারত গভর্নমেণ্টের দৃষ্টিতে তাহা পড়িতেছে না। পক্ষান্তরে তাঁহাদের মতে দেশের আর্থিক অবস্থার যুদ্ধের কল্যাণে উন্নতি ঘটিয়াছে। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টেও ভারতের আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের সেই আশাশীল মনোভাবের অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, দেশরক্ষা সম্পর্কে শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণ নীতির ফলে এবং বাহির হইতে বিদেশী মাল আমদানীর পথ রুদ্ধ হওয়াতে ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। এই ধরণের উক্তি দেশের লোকের নিকট প্রকৃতপক্ষে পরিহাস-স্বরূপই মনে হইবে।

শিল্পাচার্য নন্দলাল

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

শ্রীনন্দলাল বসু

দর্শক হিসেবে বাইরে থেকে যাঁরা শান্তিনিকেতনকে দেখতে আসেন, তাঁরা এখানকার সাজগোজের সহজ অনাড়ম্বর ভাবটি লক্ষ্য করে মুগ্ধ হন। শান্তিনিকেতনের উৎসবে, অভিনয়ে, নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েও আমরা সেই পরিচয়টি দেখতে পাই। এইরূপ অনাড়ম্বর সজ্জার মধ্যে আছে একটি সুন্দর অথচ সংযত রুচির প্রকাশ। এর মধ্যে অনাবশ্যক জাঁকজমকের কোন চেষ্টা নেই। শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় এই যে সহজ সৌন্দর্যের বিকাশ তার মূলে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ও তার পরেই শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। শান্তিনিকেতনে সংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছে দিনেন্দ্রনাথের যে স্থান ছিল, রূপ সজ্জায় নন্দলালের স্থানও সেইরূপ, কিন্তু এর ভিতর একটু পার্থক্য আছে। দিনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে নিজের মনে করে কর্মক্ষেত্রে তাকে চালু করবার প্রধান সহচর হয়েছিলেন, কিন্তু নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের চিন্তা বা ইচ্ছাকে নিজের সৃষ্টির সামর্থের দ্বারা প্রকাশ করেছেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তাকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে অনুভব করেছিলেন, তাকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপদান করার পথে নন্দলালকে না পেলে কতখানি কৃতকার্য হোতো এবং রবীন্দ্রনাথের মত এমন একজন ঋষির দ্বারা চালিত না হলে নন্দলালের এই প্রতিভার বিকাশ কোন পথে যেতো তা কে জানে। নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে পাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মনে কি প্রকার আগ্রহ জেগেছিল, যদি তার প্রকৃত ইতিহাস ভবিষ্যতে প্রকাশ পায় তবে তার পরিচয় পাবো এবং রবীন্দ্রনাথ কি চোখে নন্দলালকে দেখতেন তাও জানতে পারব। নন্দলাল বলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে রেখেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে শান্তিনিকেতনে থাকা সম্ভব হয়েছিল।

দেশের শিল্পরসিক মহল জানে নন্দলাল বড় চিত্রকর, কাগজের উপর তুলি ও রংয়ের সাহায্যে ছবি আঁকাই তাঁর সাধনা। এচিং, দেয়ালচিত্র ও নানা টেকনিকের সাহায্যে ছবি আঁকায় তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। কিন্তু তাঁর আলংকারিক প্রতিভার যে অসাধারণ বিকাশ দেখা যায় সেদিকে দৃষ্টি পড়েছে খুব অল্প কয়েকজনেরই। তাঁর সেই আলংকারিক প্রতিভার বিকাশের একদিক হোলো নাট্যাভিনয় ও উৎসব ইত্যাদির যাবতীয় রূপসজ্জা। শান্তিনিকেতনের অভিনয় ও উৎসবের আলোচনা কেউ কেউ করেছেন, কিন্তু এখানকার এই রূপ-সজ্জার পিছনের প্রকৃত ইতিহাসটি যে কি সে বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে অল্পই।

শান্তিনিকেতনে যে সৌন্দর্যের সাধনা চলেছে তার মূল কারণ হোলো শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক আবেষ্টন। এখানকার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত, বসন্ত, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, নির্জন নিশীথ রাত্রি বা পূর্ণিমার রাত্রি সবই সকলের মনের উপরে বিশেষ ছাপ রেখে যায়। অথচ রবীন্দ্রনাথ এখানে আনন্দের যে আয়োজন করলেন, সে এই প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে নয়, সম্পূর্ণ এর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে। সুতরাং এই আনন্দের আয়োজনের সঙ্গে যে রূপসজ্জার আয়োজন হয়েছে তাতেও যদি মিল না থাকে তবে সে সৌন্দর্যের সৃষ্টি সার্থক হবে না। সচরাচর শান্তিনিকেতনের বাইরের সাজ-সজ্জায় আমরা যে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন দেখি সে সৌন্দর্যের সৃষ্টির মধ্যে শহরের বাইরে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে তার স্থান নেই। সুতরাং শহরে যে সমস্ত রূপ-সজ্জার আয়োজন হয় তা একদিক থেকে শুধু শহুরে জীবনেরই উপযোগী। কিন্তু শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক অনুষ্ঠানে তার স্থান অত্যন্ত অনাবশ্যক। সেই জন্য শান্তিনিকেতনের 'বর্ষা-মঙ্গল' বা 'বসন্তোৎসব' যে ভাবে জমে ওঠে ও প্রাণ স্পর্শ করে শহুরে উৎসবে আমরা তা পাই না, সেখানে দেখি সে উৎসবের কঙ্কালটিকে। শান্তিনিকেতনের রূপসজ্জার আদর্শের এই হোলো মূল কথা। নন্দলালের শান্তিনিকেতনে যোগদানের পূর্বে এখানে শান্তিনিকেতনের অনুপযোগী কলকাতার আদর্শেই সাজ-সজ্জার আয়োজন করা হয়েছিল। তিনি আসার পরে তার বদল সুরু হয়।

নন্দলাল কলকাতায় তাঁর গুরুর সাহায্যে এই রূপসজ্জার পথে যে নির্দেশ পেয়েছিলেন তাকে অবলম্বন করেই শান্তি-নিকেতনে নিজের শক্তিতে একটি বিশেষ ছাপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বিগত মহাযুদ্ধের পরে নন্দলাল শান্তি-নিকেতনে প্রবেশ করেন শিল্পাচার্যরূপে। তাঁর আগমনের পূর্বে শান্তিনিকেতনের অভিনয় উৎসবাদির সাজসজ্জা কি রকমের

নন্দলাল বস্

ছিল তা জানা দরকার। তখন দেখেছি সর্বত্রই বাস্তবতার একটা অস্বাভাবিক অনুকরণ-স্পৃহা অতি প্রবলভাবে বিরাজ করছে। প্রথম যখন কলকাতার রঙ্গমঞ্চে 'ফাল্গুনী' অভিনয় হোলো তখন নাটকের গীত ভূমিকায় "আকাশ আমায় ভরল আলোয়" কয়েকটি মেয়েকে উড়নির দ্বারা প্রজাপতির মত ডানা করে দেওয়া হয়েছিল। কারণ গানটি ছিল প্রজাপতির। আরও অনেক-কিছু ছিল যা এখানে বলার প্রয়োজন নেই। শারদোৎসব নাটকে দেখেছি রঙ্গমঞ্চের পিছনে শরৎকালের বাস্তব রূপ ফোটাবার জন্য শিউলিগাছ, কাশবন, কাপড় বিছিয়ে দিয়ে তার দুইপাশে সবুজঘাসের চাপড়া মাটির ঢিপি ও নানা গাছপালা বসিয়ে শরতের নদীকে প্রকাশ করা হোতো। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' বইয়ে আমরা দেখেছি যে একসময়ে কলকাতার ঠাকুরবাড়িতে অভিনয়ে বাস্তব রূপ ফোটাবার জন্য কি অসম্ভব অর্থব্যয়ই না হোতো।

শিল্প সমালোচকেরা বলেন ভারতবর্ষের আলংকারিক শিল্প পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় চিত্রে এর স্থান অতি গভীর ও সহজ হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের লোকেরা কাপড়ের উপর যখন জন্তু বা জানোয়ার এ'কেছে তখন সে জানোয়ার কাপড়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, অর্থাৎ আমরা দেখতে পাবো কাপড়ের বুনুনির ভিতর দিয়ে জন্তুটিকে ভিন্ন আকারে। সেই জন্তুকেই আবার চাটাইয়ের উপর দেখব, চাটাইয়ের বুনুনীর সঙ্গে আরেক রূপে। ভারতের যেখানে যে ধরণের পাথর মেলে শিল্পীরা তা দিয়েই মূর্তি গড়েছে তার পাথরত্বকে বজায় রেখে। অর্থাৎ উপকরণকে অতিক্রম করে বা ঢাকা দিয়ে কোন অলংকারই বড় হতে পারে নি। স্থানকাল পাত্র ভেদে এই আলংকারিক শিল্প কিভাবে রূপ গ্রহণ করে তার একটি সুন্দর উদাহরণ দেখাই। বাঙলা দেশের হিন্দুদের যে কোনো মঙ্গল কাজে আমরা দেখি, গৃহের প্রবেশপথের দুপাশে, কলাগাছের নীচে দুটি কলসী বা ঘটের মুখে আম্রপল্লব ও ডাব রাখা হয় এবং চালবাটার সাহায্যে আল্পনা দেওয়া থাকে। কলাগাছ বা মঙ্গল-ঘটের সঙ্গে অনুষ্ঠানের ক্রীয়াকাণ্ডের যে যোগই থাকুক না কেন এটি যে আমাদের বাঙালী জাতির আলংকারিক মনোবৃত্তির একটি বিশেষ উদাহরণ সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কলাগাছ, মাটির কলসী, আমপাতা ও ডাব বাঙলার অতি সহজলব্ধ জিনিস। সুতরাং প্রাচীন শিল্পীরা যে তাঁদের মঙ্গলঘট সাজাতে এই ক'টি জিনিসকে কাজে লাগাবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। প্রচুর ধান যে দেশের প্রধান শস্য সেখানে চালবাটার সাহায্যে আল্পনা দেওয়াও সহজ ছিল। আমাদের পূজা পার্বণের মধ্য দিয়ে এই প্রকার বহু আলংকারিক শিল্পের নিদর্শন আমরা যেমন পাই, তেমনি অন্য প্রদেশে যা অতি সহজে মেলে তাকেই তারা তাদের উৎসবের আলংকারিক শিল্পে স্থান দিয়েছেন। আলংকারিক শিল্পে নন্দলাল যে এই একই পথে চলেছেন শান্তিনিকেতনের অভিনয় উৎসবের রূপসজ্জায় আমরা তাই দেখলাম। এটিকেও নন্দলাল একটি বড় রকমের শিল্পসাধনা বলে মনে করেন।

গত ১৯।২০ বৎসর ধরে নন্দলালকে আমরা দেখছি আমাদের সব কিছু আনন্দের আয়োজনের পিছনে। একদিকে রবীন্দ্রনাথ যেমন নাট্য, নৃত্যনাট্য ও গীতাভিনয়ের সৃষ্টিতে তন্ময়, সেই সঙ্গে দেখেছি নন্দলালকে, মহড়ার সময় অতি সন্তর্পণে নিজেকে আড়ালে রেখে, নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণে মগ্ন। মনের ভিতর কল্পনার তুলিতে সেই সময় সাজসজ্জার একটি একটি করে ছবি এ'কেছেন। দেখেছি অভিনয় বা উৎসবে সেই সব কল্পনাকে বাইরে যখন প্রকাশ করতেন তখন কি রকম মত্ত থাকতেন তিনি প্রকাশের প্রেরণায়। এখনো আশ্রমের উৎসব প্রাঙ্গণের ও অভিনেতাদের সাজসজ্জা তিনি নিজের হাতে সম্পন্ন করেন। শান্তিনিকেতনে নানা প্রকার অভিনয় নৃত্য ইত্যাদি উপলক্ষে বরাবরই তাঁর হাতে সাজবার সৌভাগ্য আমার

নন্দলাল নিজের হাতে সাজাইয়া দিতেছেন

হয়েছে। তখন দেখেছি ছবি আঁকতে তিনি যে রকম আনন্দ পান ঠিক সেই আনন্দেই তিনি আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে একের পর এক করে সবাইকে সাজিয়েছেন, কত রঙীণ বস্ত্রে, কত রকম ফুলে ও কতরকম নিজ হাতে গড়া গয়নায়।

আজকে যাকে একভাবে সাজালেন কালকে আবার তাকে বদলালেন। এইভাবে তাঁর সৃষ্টির কাজ চলতো। তিনি সাজের মধ্যে অনাবশ্যক জাঁকজমকের দ্বারা চোখ ঝল্‌সাবার চেষ্টা করেন নি। যে সাজ আসল মানুষকে ঢেকে ফেলে, সে সাজের তিনি একেবারেই পক্ষপাতী নন। তাঁর সাজে আছে রঙের ছন্দ-বোধ, পরিচ্ছদের ভাব ও দেহের ছন্দে সাম্য।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে রাজা আছে, রাণী আছে, মন্ত্রী আছে, চর দূত ইত্যাদি আরো কত চরিত্র আমরা দেখতে পাই। কিন্তু নন্দলাল যখন তাদের সাজিয়েছেন, তখন সে সাজ যে কোন্‌ দেশী রাজার বা মন্ত্রীর বা চরের তা কি কেউ ভেবে দেখেছেন? এখানকার নাচের সময় ছেলে মেয়েদের যে সাজ দেখা গেছে সে সাজও অভিনব। মাথায় পাগড়ী বাঁধা ভারতবর্ষের একটা চিরন্তন রীতি। কিন্তু নন্দলাল যে পাগড়ী বাঁধেন অভিনয়ের সাজে তা সম্পূর্ণ নতুন। তাই দেখি পাগড়ী বাঁধতে গিয়েও তিনি তাঁর রচনা-শক্তির বৈচিত্র্য প্রকাশ করেছেন। অল্প খরচে সামান্য পিস্‌বোর্ডের উপর সোনালী রূপালী ও নানা রঙের কাগজের সাহায্যে তাসের দেশের তাসেদের যে অপূর্ব সাজ তিনি রচনা করেছিলেন তা কখনো ভুলবার নয়। তাসের দেশেই প্রথম বুঝেছিলাম যে বড় কবি ও বড় শিল্পীর রচনা যখন এক সঙ্গে মিশে যায় তখন সে রচনা কত সুন্দর হতে পারে। দরকারী বস্ত্র বা গয়নার অভাবে তিনি নিজে কলাগাছের কান্ড কাটিয়ে তা থেকে সাদা অংশটি কেটে গয়না করেছেন। শিরীষ গাছের শুকনো পাতলা ফলগুলিকেও তিনি ব্যবহার করেছেন গয়নার মত। এ রকম দুঃসাহসিক পরীক্ষা আর কোথাও হয়েছে কিনা জানি না। তাঁর কাছে ফুল বা ফুলের মালাই হোলো শ্রেষ্ঠ গয়না। তালপাতা, খেজুরপাতা তাঁর হাতে পড়ে পাংক্তেয় হয়েছে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের সাজে। অভিনয়ে বা নৃত্যে অনাবশ্যক দামী গয়না বা জরি ও পুঁতির জমকালো সাজের তিনি ঘোর বিরোধী। শান্তিনিকেতনের মেয়েদের অভিনয়ের সাজে খাঁটি দেশী নানাপ্রকার সুন্দর, ভাল শাড়ির ব্যবহার তিনি ভাল-বাসেন। তবুও এখানে মেয়েরা কখনো কখনো দামী পশ্চিমা ঘাঘরা বা জর্জেট কাপড় দিয়ে তৈরী রং বেরং-এর ঘাঘরা ব্যবহার করেছে। তার নমুনা আমরা 'চন্ডালিকা' নৃত্য নাট্যের সাজেই দেখেছি। এই ব্যতিক্রম সেই মেয়েদের ঐকান্তিক ইচ্ছায় বা আগ্রহেই ঘটেছে। অভিনয় বা নৃত্যে অভিনেতাদের মধ্যে যার রং কালো, তাকে তিনি রং মাখিয়ে ফরসা করার দুর্বলতাকে মনে স্থান দেননি। তিনি কালোকেই এমন সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন যে সেই কালো রঙের সৌন্দর্যে সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি মনে করেন, কোন কিছুকে যদি তার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে, তার ভিতরের সৌন্দর্য ফোটানো না যায়, তবে সে রচনার বা সাজের কোন সার্থকতা নেই। যে তা পারে সেই হোলো প্রকৃত শিল্পী। নন্দলালের মধ্যে আছে এই ধরণের শিল্প-প্রতিভা। তাঁর প্রতিভার বড় পরিচয় হোলো, তাঁকে যে অবস্থায় যেখানেই লোকে কিছু শিল্পকলার নিদর্শন ফোটাতে বলুক না কেন তিনি তাতে কখনো অকৃতকার্য হন না। কারণ তাঁর কাছে মূল্যবান উপকরণের কোন মূল্য বা মোহ নেই। অতি সামান্য নগণ্য তুচ্ছ, অপ্রয়োজনীয় বলে যা আমাদের কাছে হেয় তাঁর হাতে পড়ে সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজে তারা উচ্চ স্থান পায় ও মূল্যবান হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছায় গড়া, কলাভবনে বাগান যেভাবে রূপ নিয়েছে দেখে মনে হবে না যে এটি মানুষের চেষ্টায় গড়া। সে বাগান নানারকমের যোগ্য অযোগ্য ফুল ফলের গাছে ভর্তি। কোনটিই অবহেলার বস্তু হয়ে ওঠেনি। তিনি বহু অর্থব্যয়ে, এদেশের মাটির অযোগ্য ক্ষীণ-প্রাণ গাছ এনে তাঁর কলাভবনের বাগানে লাগিয়ে তিনি তাকে একটি ছোটখাট মোগল আমলের বাগানে পরিণত করার চেষ্টা করেন নি। এ বাগান দেখে মনে হবে এ বীরভূম মাটিরই যোগ্য। এই বাগানের ভিতরকার চলার পথগুলো অদ্ভুত। মাপ্‌জোক্‌ করা কোন বড় রাস্তা এতে নেই। এতে আছে পায়ে হাঁটা সরু রাস্তা। সেগুলো যেভাবে এ'কেবেঁকে গেছে পথচারীরা সেভাবেই সময় সংক্ষেপের জন্য তার উপর দিয়ে চলবে। অর্থাৎ বহু বিচিত্র গয়নায় সজ্জিত অহংকারী নারীর মত, গয়নার গর্ব তার কোনরকম সাজসজ্জায়ই প্রকাশ পায় না।

অজয় নদীর বালুচরে মূর্তি-অঙ্কনরত নন্দলাল

কয়েক বৎসর পূর্বে যখন ভারতীয় জাতীয় মহাসভার বিরাট প্রাঙ্গণ সাজাবার জন্য দেশবাসীর তরফ থেকে মহাত্মা গান্ধী নন্দলালকে আহ্বান করেছিলেন, তখন তিনি এ কথাই

প্রমাণ করেছিলেন যে, আমাদের দরিদ্র গ্রামবাসীরা যে আবেষ্টনের মধ্যে বাস করে, অর্থাৎ তাদের চারিদিকে যেসব জিনিস সহজে মেলে তা দিয়েই মহাসভার অঙ্গণকে অতি সুন্দর করে সাজান চলে। সেখানে সাজালেন গরুর গাড়ির রথ, গ্রামের চাষীদেরই নানারঙের বস্ত্রে ও অলংকারে। বাঁশ, চাটাই, শর, খড় দিয়ে সাজালেন সেখানকার সব তোরণ ও ঘর বাড়ি। এবং চোখে আঙুল দিয়ে দেশবাসীকে দেখিয়ে দিলেন যে প্রকৃত শিল্পীর দৃষ্টি থাকলে আমাদের দেশে সৌন্দর্য সৃষ্টির যে সহজ উপাদান চারিদিকে রয়েছে তাকে অবহেলা করে, বাইরের ধনের আড়ম্বরের প্রতি তাকাবার কোন প্রয়োজন হয় না। তাঁর মত একজন শিল্পী কেন জাতীয় মহাসভাকে সাজাবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, এ বিষয়ে একদল লোকের আপত্তি ছিল। তাঁরা বলেছিলেন যে এ কাজে তাঁর মত শিল্পীর মর্যাদা থাকে না। কিন্তু এই কাজের ভিতর দিয়ে শিল্পসাধনার যে আদর্শটিকে তিনি দেশের সামনে ধরে-ছিলেন তাঁরা তাঁর কাজের সেদিকটাকে একেবারেই ধরতে পারেন নি। আজো পেরেছেন কিনা জানি না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সে কথা বুঝেছিলেন বলেই তাঁকে এই কাজের ভার দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে নন্দলালই এই কাজের একমাত্র উপযোগী ব্যক্তি।

দেশে কোন কোন স্বদেশ প্রেমিকদের মুখে অভিযোগ শুনেছিলাম যে নন্দলালের মত শিল্পীরা দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্খার সঙ্গে একতালে যদি না চলতে পারেন, তবে তাঁদের শিল্পসাধনার সার্থকতা কি? শিল্পীর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া তাঁর মনকে আঘাত করে ও শিল্পীর শিল্পপ্রচেষ্টায় তা প্রকাশ পায়। কিন্তু বড় শিল্পসৃষ্টি সেই সাময়িক আবহাওয়ায় জন্মলাভ করেও চিরকালের জগতে স্থান গ্রহণ করে। সৌন্দর্যবোধহীন দেশবাসীর চিত্তে সৌন্দর্যের অনুভূতিকে জাগানো কি দেশ-সেবার দিক থেকে একটা বড় কাজ নয়? তা ছাড়া সৌন্দর্যের সৃষ্টি যে ব্যয়বহুল নয় দেশবাসীকে সে শিক্ষাও তিনি কংগ্রেসের কাজে ও শান্তিনিকেতনের উৎসবের সাজসজ্জার দ্বারা বিশেষ করে বোঝাতে চেয়েছেন।

আমি মনে করি আমাদের দেশের শহুরে শিক্ষিত ধনী অধিবাসীদের চেয়ে অশিক্ষিত দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে সৌন্দর্য-বোধ অধিক পরিমাণে উন্নত ও মার্জিত। পল্লীগ্রামে দারিদ্র্য যত প্রবলই হোক না কেন তার মধ্যেই গ্রামবাসীরা তাদের বাড়ি ঘরের প্রত্যেকটি কাজেই যেভাবেই হোক একটু না একটু আলংকারিক মনোবৃত্তির ছাপ ফুটিয়ে তুলবেই। নিজেদের ব্যবহারের কাপড় জামা, বসবার চৌকি, চাটাই, বাসনপত্রে, দরজায় ঘরের চালে ইত্যাদি নানাদিকে এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। এই কারণে আজকাল মুষ্টিমেয় একদল শিক্ষিতরা গ্রামবাসীদের অনুকরণে গয়না, জামা, কাপড় ইত্যাদি ব্যবহার করে নিজেদের উন্নত রুচিবোধের পরিচয় ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে। এই গ্রামবাসীদের মত এতটুকু শিল্পবোধও আমাদের তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যে দেখা যায় না। তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কোন বস্তুতেই তারা নিজেদের শিল্পবোধের পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম। সব সময় বাইরের মার্জিত শিক্ষিত শিল্পী এসে তাদের প্রয়োজন না মেটালে তাদের বাড়ি, তাদের সাজসজ্জাতে অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর রুচির পরিচয়ই প্রকাশ পায়। অর্থশালী শিক্ষিতরা অর্থব্যয়ের মাপকাঠিতেই শিল্পরুচিকে বিচার করেন বলে তাঁদের সাজসজ্জায় মাত্রাবোধের অভাব অতি দৃষ্টিকটু হয়ে দেখা দেয়।

চাল, ডাল, তিল, শর্ষে ইত্যাদির আলপনা

শান্তিনিকেতনে গত ২০ বৎসর নন্দলাল কেবল নিজের মনে রং ও তুলির সাহায্যে ছবি আঁকেন নি, এখানকার উৎসব-বেদী, প্রাঙ্গণ, উৎসবগৃহ সাজিয়েছেন, এখানকার আশেপাশের নানাপ্রকার প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে। খোয়াই-এর কাঁকরের লাল রং, ধানক্ষেতের সাদামাটির রং, উৎসব প্রাঙ্গণে ব্যবহার করেছেন। আলপনা রচনা করলেন চাল, ডাল, তিল, শর্ষে দিয়ে বা রঙীণ পাথরে মাটি ঘসে। কখনো দেখেছি ফুলপাতা বা ফুলের পাপড়িও ব্যবহার করেছেন আলপনার জন্য। এখানকার যে ঋতুতে যে ফুল পাওয়া যায় তাকেই উৎসবের কাজে লাগিয়েছেন। শ্রীনিকেতনে দেখেছি আচার্যের বেদীর নীচে নানা তরিতরকারি ফলমূলে সাজিয়েছেন। কেন না সেগুলিই সেখানকার সাজের উপযুক্ত উপাদান বলে তিনি ভাবেন।

একটা কথা উঠতে পারে যে, যে ঋতুতে যে ফুল পাওয়া যায় তা দিয়ে শান্তিনিকেতনের প্রথম জীবনের সাজসজ্জাও তো রচিত হয়েছে। কিন্তু তাতে আমরা দেখেছি ফুল ব্যবহারকালে পরিমাণ বোধের অভাব। তখন অপর্যাপ্ত ফুল দেখে আনন্দ পেতাম, কিন্তু এখন সেই সব ফুলের অপব্যবহারের কথা মনে পড়লে লজ্জা হয়। বাঙলা দেশের বহু শহরে দেখেছি নাচের বেলায় মেয়েরা মাথায়, গলায়, হাতে, কোমরে অনাবশ্যক ফুলের মালা জড়িয়েছে, দেখতে সুন্দর লাগবে বলে। অপর্যাপ্ত ফুল বা ফুলের মালা গলায় বা হাতে দিলেও সব সময় তাতে রুচি-বোধের খুব ভাল পরিচয় ফুটে ওঠে না। তার জন্য চাই সৌন্দর্য-বোধ। যতটুকু দরকার তার বেশী ব্যবহার না করে সেই-টুকুকেই কিভাবে সাজালে উভয়ের মধ্যে একটা মিলনের সুন্দর

(শেষাংশ ১১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জয়যাত্রা

শ্রীসুবোধ বসু

২

গায়ে সাহেবী পোষাক চড়াইয়া বেলা আন্দাজ সাড়ে দশটায় অনুপম পঞ্জিকানুযায়ী শুভমুহূর্তে চতুর্দিকে দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বগলে এক গাদা খামে পোরা দরখাস্ত ; এগুলির কিছু বা পোস্টাফিসে কিছু-বা খবরের কাগজের বক্সে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে; অতঃপর দু'একটা না-জানা অফিসে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহাদের বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিবে। এমন রোজই করে ; তাই গায়ে সাহেবী জামাকাপড়।

পার্কটার ভিতর দিয়া সে ট্রাম রাস্তার দিকে অগ্রসর হইল। এটি সামান্য ঘুর-পথ হইলেও, অনুপম এ রাস্তায় যাতায়াত করিতেই পছন্দ করে। মুখটা সিধা রাখিয়া অবলীলা-ক্রমে চোখ দুইটা ঘুরাইয়া ওপাশের বাড়ির জানালাটা দেখিয়া লইল। হতাশ হইল ; জানালার ধার শূন্য। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইল। একটু দূর যাইয়া থামিয়া সে আর একবার তাকাইয়া দেখিল। এবারও হতাশ হইতে হইল। অগত্যা আবার আগাইয়া চলিল। এইরূপ বারবার তিনবার করিবার পর নীতি-বোধের সূত্র অনুযায়ী ফললাভ। এইবার পিছনে তাকাইয়াই দেখে, জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে ও-বাড়ির মেয়েটা; সুতরাং অতিক্রান্ত পথেই ফিরিয়া আসিবার প্রয়োজন হইল অনুপমের। কাছাকাছি আসিয়া যেন হঠাৎ তাকাইয়াছে এমনই করিয়া দৃষ্টিটাকে দোতলার জানালাতে তুলিয়া দিল এবং প্রতিভার সাথে চোখাচোখি হইতে এমন একটা ভাব করিল যে, দালানটা কতটা উঁচু তাহাই সে হিসাব করিয়া দেখিতেছে। অতঃপর পার্কের এ-প্রান্তে আসিয়া পুনর্বার ট্রাম ধরিবার জন্য তাহাতে সে-পথেই ফিরিতে হইল। মুখটা না ঘুরাইয়া আর একবার বাতায়নপথবর্তিণীকে দেখিয়া লইল এবং আবার ঘুরিয়া যাওয়াটা নিতান্তই হাস্যকর দেখাইবে এই সিদ্ধান্ত করিয়া ট্রামে যাইয়া চাপিল।

জি পি ও-তে দশটা চিঠি ছাড়িবার পর ক্লাইভ স্ট্রীট দিয়া সোজা হাঁটিয়া আসিয়া অনুপম একটা বড় দালানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বিভিন্ন কোম্পানীর বোর্ডগুলির উপর একবার দ্রুত চোখ বুলাইয়া লইয়া লিফ্‌টে গিয়া চড়িল।

যে কোম্পানীর নামটা দেখিয়া আসিয়াছিল, সেটা তে-তলায়। দরজার সম্মুখে সগুম্ফ ভুঁড়িশোভিত দারোয়ান বসিয়াছিল, অনুপম তাহার কাছে যাইয়া কহিল, বড়া সাব্‌কো ভেট করেঙ্গে।

প্রশ্ন হইল, কেয়া কাম ?

অনুপম অম্লানবদনে কহিল, এটর্ণী অফিস্‌সে আয়া হুঁ।

এবং দারোয়ানের হাতে একটা কার্ড গুঁজিয়া দিল। তাহাতে প্রয়োজনের জায়গাটায় লেখা—ব্যক্তিগত প্রয়োজন। এসব তাহাকে হাতে-কলমে শিখিতে হইয়াছে। সে যদি দারোয়ানকে বলিত যে, সে চাকরির উমেদার, চাকরির জন্য বড়সাহেবের সাথে দেখা করিতে আসিয়াছে, তবে তাহাকে চৌকাঠ অতিক্রম করিতে দেওয়া হইত না। আর কার্ডে—ব্যক্তিগত প্রয়োজন লেখাই নিরাপদ। 'ব্যক্তিগত প্রয়োজন' কথাটা এমনই ব্যাপক এবং অস্পষ্ট যে, এমন প্রয়োজনে আসা কাহাকেও দেখিতে অস্বীকার করিতে চাওয়া স্বাভাবিক নহে। অনেক অভিজ্ঞতার পরেই অনুপম এই ফরমুলাটি ঠিক করিয়াছে।

দেখা মিলিল। পাইপ্-মুখে বড়সাহেব বিস্মিত চোখে তাকাইয়া রহিলেন এবং অনুপম অসম্ভব রকম দ্রুতভাবে গড়-গড় করিয়া তাহার নিজস্ব গুণাবলীর কথা বিবৃত করিয়া যাইতে লাগিল। সে জানে, অর্ধ মিনিটের মধ্যে এই বিবৃতি সারিতে না পারিলে সারিবার আর অবকাশ পাওয়া যাইবে না ; তাই পূর্ব হইতেই সে নিজের কৃতিত্ব-নামা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু ফল হইল না। আবেদন শুনিয়া সাহেব কহিল, দুঃখিত। আমার কাছে কাজ নেই। তুমি এবার যেতে পার।

অনুপমও সহজে ছাড়িবার নয়। চলিয়া যাইতে বলা সত্ত্বেও সে নানা রকম ওকালতি করিল, কিন্তু কিছুই সুবিধা হইল না। সাহেবের মুখে অধৈর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনুপম মরিয়া হইয়া কহিল, এসব কোয়ালিফিকেশান সত্ত্বেও যদি চাকরি না দাও, তবে কাজের সুযোগ কোথায় পাব শুনি ? স্টেট্ থেকে তো চাকরি জোগাড় করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই, তাই যাঁরা শিল্পপতি......

সাহেব বলিল—প্লিজ, অর্থাৎ এইবার বেরিয়ে যাও।

অনুপমেরও ধৈর্য শেষ হইয়া আসিয়াছে। চাকরি চাহিতে আসা ভিক্ষা চাহিতে আসা নহে ; সে কাজ করিয়াই মাহিনা নিতে চায়। সেও টেবিলের উপর একটা ঘুষি লাগাইয়া কহিল, অল্ রাইট। কিন্তু অল্ রাইট্ মোটেই নহে। উত্তেজনার ঘোরে সে দোয়াতদানের উপর ঘুষিটা নামাইয়াছিল। চমকাইয়া দেখিল, টেবিলের উপর, ফাইলের গায়ে, সাহেবের জামায় কালি ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। অনুপম মুহূর্তে চম্পট দিল।

এইরূপ প্রত্যহই ব্যর্থতা আসে ; উমেদারির জীবনই এই। এতদিনে অনুপমের এসব কতকটা যেন গা-সহা হইয়া গিয়াছে। নহিলে প্রতিদিন ব্যর্থ হইয়া প্রতিদিন নূতন উৎসাহে সে এই-রূপ অনিশ্চিত অভিযান চালাইতে পারিত না। কোনও দিনই কি ইহার অবসান হইবে, অনুপম ভাবে।

রাত হইয়াছে। ক্লান্ত ব্যর্থ অনুপম ধীরে ধীরে আসিয়া

লেসের ধারের পার্কটায় প্রবেশ করিল এবং প্রতিভাদের বাড়ির ধারে একটা খালি বেঞ্চ দেখিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া পড়িল। শুনিতে পাইল গান। বুঝিল কে গাহিতেছে। সে অবহিত হইয়া গান গিলিতে লাগিল।

সামনে দিয়া বারবার যাতায়াত করিতেছে এই ছোকরাটা কে? অনুপম ইহাকে ইতিপূর্বে আরও দুয়েক দিন লক্ষ করিয়াছে। ফাঁপানো, বব্‌করা চুল, ঘুমাইয়া-পড়া গোছের চোখ, মেয়েলি হইবার অসম্ভব রকম চেষ্টা, চাদর মাটিতে লুটাইতেছে, পায়ে লপেটা, বগলে ক্যাম্বিসের সরু লম্বা খাতা। বারবার হাঁটিয়া যাইতেছে এবং ফিরিয়া আসিতেছে। ও-বাড়ির জানালাটা লক্ষ্য নয় তো, অনুপম অসন্তুষ্টভাবে ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিল এবং অতঃপর ইহার লক্ষ্যস্থান সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ হইয়া উঠিল। অনুপম ঈর্ষায় এবং বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল।

তাহার সমুখ দিয়া যাইতে যাইতেই ছোকরা একটা অনাবশ্যক লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া দিল। অনুপম আরও জোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তাহাকে ভেংচাইয়া দিল। ছোকরা হাঁ করিয়া জানালার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া অনুপম জোরে গলা-খাঁকারি দিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, ব্যাপারটা সর্বসাধারণে পছন্দ করিতেছে না। এইরূপ করিলে আর কি করিয়া পারা যায়। তাছাড়া অনুপম এমনি বিরক্তি-তীক্ষ্ণ রোষকষায়িত চোখে তাকাইতেছে যে, বব্‌-এর অধিকারী অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। নিম্নস্বরে সে অনুপমকে অভিসম্পাত দিতে লাগিল এবং প্রস্থান করিল। কিন্তু সম্পূর্ণ চলিয়া গেল না; পূর্ব হইতে স্থিরীকৃত এক ঘাঁটিতে—অর্থাৎ একটা ঝোপের আড়ালে অপসরণ করিল। সেখান হইতে সারসের মত গলা বাড়াইয়া সে ও-বাড়ির জানালার দিকে যথাসাধ্য দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া চলিল।

গান অনেকক্ষণ শেষ হইয়াছে। অনুপম বহুক্ষণ জানালা-মুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের আলোতে ও-বাড়ির মেয়েটাকে চমৎকার দেখাইতেছে।

প্রতিভার চোখ আবার উদাস হইয়া উঠিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু তাহার বাবা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। এক মুহূর্ত খোলা জানালাটার দিকে শঙ্কিতভাবে তাকাইয়া তিনি আদেশ করিলেন—'জানলাটা বন্ধ করে দেওয়া হোক।' আর কথা বলিলেন না। জানালাটা বন্ধ হইল এবং ভুজঙ্গধর গজর গজর করিতে করিতে নীচে নামিয়া আসিলেন। রান্নাঘরের কাছে আসিয়া হাউ-মাউ করিয়া কতক্ষণ গিন্নীকে শাসাইলেন এবং দুমদাম করিয়া পার্কের দিকে রওনা হইলেন।

'এখানে মোশায়ের রোজ সন্ধ্যেবেলা দাঁড়িয়ে থাকা হয়, কেন?'

চমকাইয়া পাশে তাকাইয়া অনুপম দেখে ও-বাড়ির কর্তা। 'মানে গিয়ে', থতমত খাইয়া সে কহিল, 'হলো কি, এই একটু সন্ধ্যার হাওয়া। মানে—সহসা সে একটু জোর ফিরিয়া পাইল। তেজের সঙ্গেই সুরু করিল, 'এটা তো গিয়ে একটা পার্ক, সাধারণের পার্ক......দাঁড়িয়ে থাকতে কারুর হুকুম নিতে হবে নাকি?'

'কিন্তু ঐ বাড়ির জানালাটা পার্ক নয়,'—ভুজঙ্গধর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'ওটা আমার বাড়ির অন্তর্গত। ওটা দিয়ে আমার পরিবারে দৃষ্টি নিক্ষেপ পার্কে বেড়ানোর মধ্যে পড়ে না। সেটা যেন হুঁস্ রাখা হয়।' অতঃপর স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে—'এ-যুগে মেয়েদের ঘরে রাখা কি সোজা ব্যাপার; তার উপর এমনভাবে অত্যাচার করলে কি করে প্যারি বলো তো হে, ছোকরা?'

'ঐ জান্‌লার ধারে বসে যিনি গান করেন,' সস্মিত অনুপম কহিল, 'উনি আপনার মেয়ে বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। নয়তো কি গায়ে পড়ে পরের জন্যে কোঁদল করতে এসেছি।' ভুজঙ্গধর ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কহিলেন।

'আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন?'

'কোথাকার নির্লজ্জ হে তুমি ছোকরা?'

'কেন?'

'আবার কেন?' ভুজঙ্গধর চেঁচাইয়া কহিলেন। 'এরই মধ্যে এদ্দুর বেড়েছ! কি করা হয় তোমার?'

'আজ্ঞে, বর্তমানে বেকার।' অনুপম স্বীকার করিল, 'তবে অনেক দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে, একটা শীগ্‌গিরই লেগে যাবে আশা করচি। অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছি কিনা!'

'বেকার!' ভুজঙ্গধর সবিস্ময়ে কহিলেন, 'তোমার আস্পর্ধাটা কি রকম বলো তো! বেকারের কাছে মেয়ের বিয়ে দেবো বলে পয়সা খরচ করে তাকে কলেজে পড়াচ্ছি? দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে! লেগে যাবে! চাকরি তোমার মামার বাড়ির মোন্ডা কিনা! দেখো, পার্কে যত খুসি বেড়াও আপত্তি নেই, কিন্তু কাল থেকে ঐ জান্‌লাটার দিকে যেন তাকান না হয়। ওটা সরকারী জিনিস নয়, সাবধান করে দিয়ে গেলাম।'

ভুজঙ্গধর বীরদর্পে প্রস্থান করিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অনুপমও পা বাড়াইল। মনে মনে কহিল, চাকরি একটা পেতেই হবে; চাকরি না পেলে কোনও দিকেই কোনও আশা নেই...... এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়...... **(ক্রমশ)**

শিল্পাচার্য নন্দলাল

(১১২ পৃষ্ঠার পর)

রূপ ফুটে উঠতে পারে শিল্পীর দৃষ্টি ছাড়া এ ঠিক করা অতি কঠিন কাজ।

আজ যে শিল্পচর্চা শান্তিনিকেতনে অনেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে, সে কাজ একদিন এত সহজ ছিল না। তাকে সহজ করে তুলতে নন্দলালকে বহু বৎসর সাধনা করতে হয়েছে। সেই সাধনার ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে শান্তিনিকেতনে ও বাইরে বহু শিল্পী কাজ করে চলেছেন। এখানকার শিক্ষার মধ্যে বড় হয়ে শিল্পীরা নন্দলালের মত বড় হোন বা না হোন কিন্তু তারা নন্দলালের শিক্ষাধীনে থেকে যে রুচিবোধ নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন এবং দেশের নানা জায়গায় তাকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন ভারতীয় সংস্কৃতির জগতে সেইটিই হোলো মস্ত বড় কাজ। এবং যেদিন দেশের মন ভারতীয় শিল্পসাধনার দিকে আরো জাগ্রত হয়ে উঠবে তখন বুঝবে নন্দলালের স্থান কোথায়—এ যুগের এই অভিনয় উৎসব ইত্যাদির দিক থেকে।

রাজু

শ্রীনিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঙার ঘাটে খেয়া পার হইবার পরেই রাজুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

দূরের সন্ধ্যা প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছে। সামনে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা সোজা বহিয়া গিয়াছে সম্মুখের গ্রাম আগড়া দুগপুরের দিকে। বরেন্দ্রভূমির স্বভাবশুষ্ক রুক্ষ লাল মাটির কাঁকর ছাওয়া দীর্ঘ প্রান্তর দুই পাশে রাখিয়া আমাদের গরুর গাড়িখানা মন্থরগতিতে আগাইয়া চলিয়াছে।

চমৎকার একটা আবছা সন্ধ্যার আমেজ লাগিয়াছে চারিদিকে। অস্পষ্ট অন্ধকার আর বিলীয়মান সূর্যের শেষ রেখা মিলিয়া দূরের ঝাঁকড়া গাছের মাথাগুলো কেমন সুন্দর রহস্যময় হইয়া ছবির মতো ফুটিয়া উঠিয়াছে। ওপাশের গ্রামখানা এখনো নীরব হইয়া ওঠে নাই। সাঁওতালদের বস্তিতে হয়তো একটা উৎসব হইবে আজ—বাঁশি আর মাদলের ছন্দময় একটা সুর থাকিয়া থাকিয়া সেদিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। এই মুহূর্তের শান্ত অচঞ্চল পরিবেশের সহিত সমানে তাল রাখিয়া আমাদের গাড়িখানাও যেন সহজ একটা চলার ছন্দ আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে।

হঠাৎ পিছনে চাহিয়াই চমকিয়া উঠিলাম। কে যেন আমাদের গাড়ির একেবারে সংলগ্ন হইয়া অনুসরণ করিয়া আসিতেছে।

—কে ?

—চিনলেন না? একটা পরিচিত হাসির শব্দ ঃ আমি রাজু। এই আজই খালাস পেয়ে বালুরঘাটের জেল থেকে ফিরছি কর্তা।

চিনিলাম। সেই রাজু। আজ প্রায় বছর দশেক আগে ইহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। নিতপুর বন্দরের দক্ষিণটা ঘিরিয়া, সারা বালা-শহীদ গ্রামের কোল ঘেঁষিয়া, 'দিয়াড়া' বা যাযাবর মুসলমানদের যে বস্তি শীতলীর বিল পর্যন্ত প্রসারিত, রাজু তাহারই জনৈক অধিবাসী। বয়স তাহার চল্লিশের এধারে হইবে না, রগের কাছে চুলে পাক ধরিয়াছে, কিন্তু এ বয়সেও অমন স্বাস্থ্যসুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা রীতিমতো বিরল। এই রাজুকে লইয়া কতবার যে শিকারে গিয়াছি! বিলের বাঁকে বাঁকে কলমীর দামে কেলিমত্ত বালি-হাঁসের ঝাঁক তাহার সন্ধানী চোখে যেমন পড়িত, অমন আর দেখি নাই। এক বৈঠা ডিঙিখানাকে খালি একটা বাঁশের 'চটানে'র সাহায্যে অমন ক্ষিপ্র, সক্রিয় রাখিতে তাহার জুড়ি মেলে না। বিশেষ করিয়া গুলী ছুড়িবার পর আহত অর্ধমৃত কোদালঠোঁটি আর দীঘলি হাঁসগুলাকে ডুব-সাঁতার কাটিয়া সে যেরূপ অদ্ভুত চাতুর্যের সাথে সংগ্রহ করিয়া আনিত, সেক্ষেত্রে যে কোনো শিকারীর পক্ষেই তাহাকে সঙ্গী-রূপে পাওয়া যে বিশেষ ভাগ্যের ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহমাত্র থাকিতে পারে না।

কিন্তু ইহার আগেও আমি রাজুকে চিনি।

সত্যই, ভগবানের সৃষ্ট এই মানুষগুলো যেন এক স্বতন্ত্র উপাদানে তৈরি। বক্ষের সাহস ইহাদের অবিবেচকের মতো এমন দুরন্ত, জীবনের মায়াটা সময়ে সময়ে সহসা এমন সহজ তাচ্ছিল্যে ইহারা ত্যাগ করিতে পারে যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। গাড়িতে বুলবুলচণ্ডী স্টেশনের পথে যাইতে একবার এমন দেখিয়াছিলাম।

ভোরের গাড়ি ধরিতে হইবে। দীর্ঘ ষোলো মাইল রাস্তা, রাজু সন্ধ্যার পরেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল। সেদিনটা কী তিথি মনে নাই, তবে এটুকু স্মরণ আছে, সম্পূর্ণপ্রায় একখানা চাঁদ পরিচ্ছন্ন আকাশে সেদিন সুন্দর শোভা পাইতেছিল। বন্দর ছাড়িয়া খেয়াঘাট, খেয়া পার হইয়া খানিকপরে এ অঞ্চলের বিখ্যাত আড়িয়ল বিল, তাহারই পরে একটানা দীর্ঘ মাঠ ধরিয়া গোপালপুরের রাস্তা। দীর্ঘ, সতেজ নিবিড় বিন্যার জঙ্গল, তাহারই মধ্য দিয়া সরু লিকের পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গিয়াছে।

গাড়ির ঝাঁকানির ছন্দোময় তালে হয়তো ঘুমাইয়া পড়িয়া-ছিলাম। হঠাৎ একটা প্রবল ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, পাঁচনিখানা বাঁহাতে লইয়া রাজু ছইয়ের ভিতর হইতে লম্বা বল্লমখানা টানিয়া বাহির করিতেছে। তাহার চোখের দিকে একবার দৃষ্টি পড়িতে শিহরিয়া উঠিলাম। অমন হিংস্র লোলুপ, অমন ক্রূর পিপাসু দৃষ্টি আমি আর দেখি নাই। একটা নিশাচরের ক্ষুধিত দৃষ্টির মতোই তাহা শাণিত। এই মুহূর্তে একটা মানুষের বুক চিরিয়া ও যেন রক্তপান করিতে পারে, বুকের কলিজাটা ছিঁড়িয়া কামড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে ও।

গা কাঁপিয়া উঠিল। রাত্রি দুইটার কম নয়। কান্তগড়ের খাঁড়ি এ এলাকার প্রসিদ্ধ স্থান। চতুর্দিকে জনমানবের সাড়া-বিহীন এই বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে আজ পর্যন্ত কত নিরীহ যাত্রী ডাকাতের হাতে পড়িয়া অসহায় কাতর আর্তনাদ করিয়াছে, জীবন এবং যথাসর্বস্ব দান করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভাবিতে আমার সর্বদেহ যেন আচ্ছন্ন পঙ্গু হইয়া গেল, চেতন লোকটা লুপ্ত হইয়া অচেতন লোকের দুঃস্বপ্ন আমি যেন জাগিয়া জাগিয়া দেখিতেছিলাম।

তাহারা সংখ্যায় কম হইবে না। অন্তত জনদশেক নগ্নপ্রায় ব্যক্তি মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া একটা উঁচু ঢিবির আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের পেশীসবল বক্ষ এবং হিংস্র-কুটিল মুখের উপর চাঁদের আলো ছিট্‌কাইয়া পড়িতে তাহা আরও ভীষণ দেখাইতেছিল।

গরু দুইটা হয়তো আসন্ন বিপদ পূর্বেই অনুমান করিতে পারিয়াছিল। গতি শ্লথ করিয়া তাই তাহারা হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ককণ্ঠে রাজু গর্জন করিয়া উঠিল, কে রে? যেমন আছিস, অমনি দাঁড়া।

যাহারা আসিতেছিল, সে কথার খুব মূল্য দিল না। অন্তত পরোয়া যে খুব করিতেছে তাহাও বুঝা গেল না। কেননা যেমন আসিতেছে, তেমনই তাহারা আরও নিকটে আগাইতে লাগিল। খালি রুক্ষ হইতে লাগিল তাহাদের কুটিল মুখশ্রী,

উজ্জ্বল হাসিয়া আর দীর্ঘ লাঠি ক্রমেই নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল।

ভাবিয়া দেখিয়াছি, বাহিরের প্রয়োজন এবং ঘটনার চাহিদা মিটাইতে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি মানুষের বাহিরটাকে কেমন বিচিত্র ও বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। তাই জন-হীন নিশুত রাতে অনন্ত উদার আকাশতলে অসহায়ভাবে দাঁড়াইয়া আমি সেদিন যেমন অনিবার্য সর্বনাশের শঙ্কায় ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছিলাম, আমার সমস্তটা দেহমন দুর্বল অবসাদে যেমন ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল, রাজুকে কিন্তু এমনটা দেখি নাই। সে যেন ক্রোধ হিংসা বিদ্রোহের একটা জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

দেখিলামও তাই।

সামান্যতম চিন্তার অবকাশ না দিয়া রাজু মুহূর্তে বল্লমটা টানিয়া লইয়া ঋজু হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, হিংসা উত্তেজনায় দেহটা তাহার এই মুহূর্তে ফুলিয়া যেন দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। মাথাটা সে সামান্য নামাইয়া ক্ষিপ্রহাতে সম্মুখের লোকটার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া বল্লমখানা সবেগে নিক্ষেপ করিয়া দিল। সন্ধান অব্যর্থ, একটা ভীষণ চীৎকারে চারদিক কাঁপাইয়া লোকটা সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল।......

......সে কাহিনী বর্ণনা করিবার মতো নয়। আজ দীর্ঘ বারো বছর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্মরণ হইলে এখনও তাহা বুকের রক্তে উচ্ছ্বাস জাগাইয়া তোলে। রাজুর সহজ সাধারণ দেহের আড়ালে অমন একটা হিংস্র ভীষণ দুরন্ত মন যে এতদিন লুকাইয়া বাস করিতেছিল, বিস্ময়-ভয়ে অভিভূত সেই আমার প্রথম আবিষ্কার। আমার সামান্য সহায়তার প্রয়োজন সেদিন সে বোধ করে নাই, চরম বিপদের মুখে দাঁড়াইয়াও অমন দুঃসাহসী স্বাবলম্বন এবং কর্তব্যকে সে যেমন অসংকোচে বাছিয়া লইল, ভাবিতে আজও শ্রদ্ধায় মাথাটা নুইয়া পড়ে।

স্বপ্নই হয়তো দেখিতেছিলাম। আর রাজুকে পাইয়াছিল খুনের নেশায়। পশু উত্তেজনার প্রবল বিক্রমে চরকির মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া মানুষ যে অমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে পারে, সেদিনই প্রথম দেখিলাম। দুর্দান্ত অসুরের বিক্রমে সে মাতিয়া উঠিয়াছিল, যেমন ক্ষিপ্র তাহার আক্রমণ, তেমনি সার্থক নিপুণ কৌশল। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছত্রভঙ্গ ডাকাতের দল প্রাণ লইয়া সরিয়া পড়িল। শুধু দেখিতেই পারিতাম। ব্যর্থ উত্তেজনার অবসাদে দেহমনের সকল সংযমের বাঁধন মুক্ত হইয়া সেই দেখিবার অদ্ভুত অনুভূতির কথা আমার জীবনে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আবার গাড়ি সে ছাড়িয়া দিল। সহজ নির্বিকার তাহার মুখে উত্তেজনার এতটুকু চিহ্ন নাই, এ যেন একটা রাতের দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া ওঠা মাত্র। দিয়াশলাই জ্বালাইয়া একটা বিড়িও ধরাইল সে, পরে গরুর লেজ মোচড়াইয়া আবার স্টেশনের পথে গাড়ি হাঁকাইয়া দিল। তাহার কণ্ঠে গুণগুণ করিতেছিল একটা হাল্কা গানের সুর, অলস অনাসক্তভাবে যেমন লোকে গাহিয়া থাকে।

এ সেই রাজু। সেই রাজু আজ জেল হইতে সদ্য বাহির হইয়া আসিতেছে।

সত্যই একেবারে হুবহু সেই মানুষটি। সেই আশা-আনন্দ সুখ-দুঃখে নির্বিকার সহজ মুখখানা ঠিক তেমনই রহিয়াছে। খালি চোখের কোণে আজ তাহার কেবল খানিকটা ক্লান্তির ছাপ নামিয়াছে। বয়সের রেখাটা কুটিল হইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়াছে প্রশস্ত কপালখানার উপর দিয়া, ফুলানো হাতের গুলিখানার উপরে চামড়াগুলি ঢিলা হইয়া গিয়াছে, কয়েকটা রগ তাহারই মধ্য হইতে উদ্ধত অবিনয়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

জানিবার কৌতূহল হইলেও সংকোচ বাধা দিতেছিল। রাজুই বলিয়া ফেলিল সে কাহিনী। তাহার কুচক্রী শ্যালক এবং শ্বশ্রুমাতা কেমন করিয়া বিপত্নীক রাজুর যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইবার ষড়যন্ত্র করিতেছিল। কিছু রূপার গহনা ছিল তাহাদের মেয়ের, তা ছাড়া গাড়ি আর হাল বাহিবার একমাত্র মহিষ জোড়ার প্রতি শ্যালক কালু মণ্ডলের যে বহুদিন হইতেই লোলুপ দৃষ্টি ছিল, একথা পাড়ার কে না জানে? সেবার সাপাহারের মেলায় সে শ্যামরতনের কাপড়ের মাল টানিবার ভাড়া পাইয়াছিল, তিনদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, খড়ের চৌচালা ঘরখানা একেবারে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। ক্ষেতের শশা-বেগুন প্রায়ই তাহার ভোগে লাগিবে না, অথচ বন্দরে কাহারও বাড়ির ঘটিটা চুরি হইলেই পাড়ার লোকে একজোটে তাহার কুযশ গাহিবে। ইহাদের মিথ্যা প্ররোচনা এবং ষড়যন্ত্রে অবশেষে দারোগা সলিম মিঞা চোরাই মাল রাখিবার অভিযোগে তাহাকে নয় মাস জেল ঘুরাইয়া আনিল।

কথাগুলার অর্থহীন ধ্বনিগুলিই কানে যাইতেছিল মাত্র। আমার মনটা তখন দূরে—বহুদূরে অতীতে—ফিরিয়া গিয়াছিল। সেদিনের মতো আজও আকাশে চমৎকার চাঁদ জাগিয়া আছে, বিলীয়মান আলো আর আসন্ন অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে স্বপ্নাতুর ম্লান পৃথিবী যেন আমার দিকে চাহিয়া আছে। গাড়ি চলিয়াছে, দুলাইয়া দুলাইয়া সৃষ্টি করিয়াছে এক অপূর্ব ছন্দের দোলা, আর তাহারই তালে তালে আমার মনটা বেদনামন্থর শোক-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে যেন। সত্যই পৃথিবীতে গুণীর আদর নাই, মিথ্যা আর অনাচার যেখানে প্রধান ঠাঁই জুড়িয়া আছে, সেখানে এই জাতীয় জীবনের আহুতি নিত্য যে কতো হইতেছে, কে বলিবে? রাজুকে আমি জানি, দেখিয়াছি উহার প্রশস্ত উদার মহান্ মনটাকে। আমাকে ফেলিয়া প্রাণ লইয়া সেদিন সে অসংকোচে পলাইতে পারিত, কিন্তু যে মহান্ উদারতা এবং বিপুল কর্তব্যের প্রেরণায় ঐ মনটা স্থান-কাল ভুলিয়া অমন নাচিয়া উঠিতে পারে, আর যাহাই করুক, চুরি করিবার মতো নীচ প্রবৃত্তি তাহার মনে বাসা বাঁধিতেই পারে না।

বলিলাম, আয়রে রাজু। গাড়ির পেছনটায় উঠে বোস্ ওখানে। পথ তো কম হবে না, সারা রাত হাঁটবি কী করে?

রাজু রাজী হইল না। সস্ত্রীক চলিয়াছি, হয়তো তাহাতেই তাহার সংকোচ। বলিল, না বাবু, এই তো ক-ক্রোশ বা পথ। একটু জোর পা চালিয়ে চললেই হবে। হাম্রা ছোট-লোক বাবু, গাড়ি বাইতে পারি, চড়তে শিখিনি।

(শেষাংশ ১২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২৭

দ্বিতলে নির্বাচিত ঘরটিতে বসিয়া মিসেস বোস অমিয় নিমাই চরিতখানা পড়িতেছিলেন। মোটরের হর্নের শব্দ দূরে শুনা যাইতেছিল—হঠাৎ সে শব্দ কানে আসিতে তিনি অন্যমনস্কভাবে জানালা পথে বাহিরের পানে চাহিলেন, যদিও সে জানালা হইতে পথ দেখা যায় না।

মনের ভুল মনে করিয়া তিনি আবার পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন।

একটু পরেই মনে হইল কে লম্ফে লম্ফে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল, তাঁহার রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল—"মা, ওমা"—

"কে রে কে—শাশ্বতী"—

মা যেন এই ডাকটিরই অপেক্ষা করিতেছিলেন, বইখানা পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিলেন।

শাশ্বতী একেবারে দুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল বুকের উপর মুখখানা রাখিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ আমি। বাবা এতদিন এখানে এই পাড়াগাঁয়ে থাকতে পারলে মা—এই মশা, মাছি, ম্যালেরিয়া, খানা পুকুর,—এই জঙ্গল অসভ্য অশিক্ষিত লোকজন"—

মিসেস বোসের মুখে হাসি, চোখে জল—

মেয়েকে নিজের বিছানায় বসাইয়া বলিলেন, বোস্ বাপু, বেশী পাকা কথা বলিস নে। ভালো না লাগলে কি এতদিন রয়েছি, পনেরো দিনের জায়গায় মাসখানেক হয়ে গেল না?"

শাশ্বতী হিসাব করিয়া বলিল, "পরশু কুড়ি দিন হয়েছে মা।"

মিসেস বোস অভিমানের সুরে বলিলেন, "আমি না হয় লোকের কথা শুনে তোর বাপের ব্যবহারে রাগ করে চলে এসেছি। তোরাও তো একটা খোঁজ নিস নি শ্বতি, একটা পত্রও তো দিস নি। পাড়াগাঁ হলই বা, এর এই পানা পুকুর, বন জঙ্গল, মশা মাছি, সবই আমার ভালো লাগছে, মনে করছি আর কিছুদিন এখানে কাটিয়ে যাব। লোকে চেঞ্জের জন্যে যে দার্জিলিং, সিমলা যায়, তার চেয়ে এই পাড়াগাঁ আমার অনেক ভালো। তোমাদের মত আমরা তো শহরের বুকে জন্মাইনি শ্বতি, আমরা জন্মেছি এবং পাড়াগাঁয়ে এখানকার আকাশ বাতাশ, জল, লোকজন"—

অসহিষ্ণু শাশ্বতী বাধা দিল, "থাক মা থাক, তোমার পাড়াগাঁয়ের প্রশংসা আর আমার ভালো লাগে না। মানুষই না হয় এখানে হয়েছো, শিক্ষা তো তোমার শহরে,—কাজেই পাড়াগাঁয়ের এত প্রশংসা তোমার আমি সইতে পারিনে। যা এখানকার লোকজন, না পারে কথা বলতে, না জানে কোন ভদ্র-আচরণ—"

মিসেস বোস বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু এখানে আমায় ঠিক অতটা কষ্ট সইতে হয় নি শ্বতি, একটি ছেলে সুমন্ত—কি খাসা ছেলে তোকে কি বলব। ভগবান যাকে ভালো করেন, তার সবই ভালো। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। লেখাপড়ায় সে ম্যাট্রিকটাও পাশ করে নি, তবু কি জ্ঞান তার, অনেক বি এ, এম এ ডিগ্রি পাওয়া ছেলেকে সে হার মানিয়ে দেবে। ভাগ্যি ওই ছেলেটি আছে তাই রক্ষা, নচেৎ আমায় এতদিন কবে এখান হতে পালাতে হতো।"

সুমন্ত—

নামটা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বতীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল, মা তাহা লক্ষ্য করেন নাই।

মনের জড়তা দূর করিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গিতে শাশ্বতী বলিল, "ও মাগো, সেই গুণ্ডা ছেলেটি তোমার কাছে যে দেবতা-বিশেষ হয়ে দাঁড়ালো মা। উঃ, আমি তাকে যে দুদিন দেখেছি—এমন অসভ্য চাষা—আলগা গা, সর্বদা যেন মারামারি করার জন্যে প্রস্তুত, দেখলে যেন গায়ে জ্বর আসে—"

মিসেস বোস বলিলেন, "তুমিও বা কি কম যাও মা—সে ছেলে, তবু তার মানায়, কিন্তু তুমি যে মেয়ে—গুণ্ডামি তো তোমার মানায় না শ্বতি, তবু তুমি গুণ্ডামি করতে ছাড়ো না।"

শান্তভাবে হাসিয়া শাশ্বতী বলিল, "না মা, তুমি এখন দেখো, আমি খুব ঠাণ্ডা হয়েছি, আরো ঠাণ্ডা হব। তোমাদের কথা কোনদিনই তো শুনি নি, এখন হতে তোমাদের কথা শুনব বলে আমি ঠিক প্রতিজ্ঞা করেছি। তার সাক্ষী দেখ—তোমাদের মান রক্ষা করতে টুক করে বিয়ে পর্যন্ত করে ফেলেছি—"

"বিয়ে করেছিস—সে কি কথা রে—?"

মায়ের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে—

সোল্লাসে শাশ্বতী বলিল, "হ্যাঁ মা, সত্যিই বিয়ে করে ফেলেছি। কাল বিয়ের পর্ব মিটিয়ে আজই তোমায় নিতে

এসেছি, এখন তুমি না গেলে তো চলবে না মা, ঘর সংসারের কাজ আমায় শিখাতে হবে তো—" সে হাসিয়া উঠিল—

মা কন্যার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন, দৃষ্টিতে দারুণ অবিশ্বাসের ছায়া—

ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "তুই কি বলছিস শ্বাতি, তোর বিয়ে হয়েছে, একি কথা বলছিস?"

শাশ্বতী অন্যমনস্কভাবে জানালাপথে বাহিরের পানে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তাহার পর মুখ ফিরাইল, স্থির দৃষ্টি মায়ের মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "সত্য কথাই বলছি মা,—আমার বিয়ে হয়ে গেছে। তোমার কোন ভয় নেই মা, রীতিমত হিন্দুমতেই বাবা নিজে আমার বিয়ে দিয়েছেন, রীতিমত সম্প্রদানও করেছেন। তুমি তো জানো—বাবা বাইরে পুরো সাহেব হলেও অন্তরে পুরো হিন্দু, অনুষ্ঠানের এতটুকু বাদ তাঁর কাজে থাকবার যো নেই।"

মিসেস বোস একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, তোমার বাপ তোমায় সম্প্রদান করেছেন। আমার শুধু একটা কথা মনে হচ্ছে শ্বতি, আমায় তোমরা কেউ একটিবারের জন্যে জানালে না, একটি খবর দিলে না।"

একটি মেয়ে দূরে চলিয়া গেছে, তাহার বিবাহ হইয়াছে সে সংবাদ পাইয়াছেন তাহারই পরে, আর একটি মেয়ে—তাহার বিবাহ কাল হইয়াছে, স্বামী নিজে বিবাহ দিয়াছেন, সম্প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে কেহ একটা সংবাদও দিল না—

একি ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত?

যাহাই হোক, বেদনা কতখানি বুকে বাজিয়াছে, তাহা তিনিই জানেন—।

শাশ্বতী বুঝিল, বলিল, "দুঃখ করো না মা, তুমি আমার ভার বাবার পরে দিয়ে এসেছিলে, বাবাকে বিব্রত হতে দেখে আমি নিজে তাঁকে ভারমুক্ত করলুম—। বাবার কর্তব্য তিনি করে গেছেন, এখন বাকি আছে তোমার কর্তব্য—এখন আমায় গড়ে তুলতে হবে চালাতে হবে তোমাকেই কি না।"

মিসেস বোস বলিলেন, "বুঝেছি। কিন্তু বিয়ে হল কোথায়, কার সঙ্গে—?"

শাশ্বতী মহাকোলাহল তুলিল, "ওমা, তাও জানো না—সেই যে স্বাতীর সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিক হয়েছিল—তোমাদের অরুণ ঘোষ গো, বাবার বন্ধুর ছেলে, বাবা তাকে কথা দিয়েছিলেন জামাই করবেন, স্বাতী তো ইচ্ছামত বিয়ে করে বসলো, বাবার মুখ রাখতে আমিই শেষটায় বিয়ে করে ফেললুম—"

বলিতে বলিতে সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল—"ও মাগো, সে যা মজার বিয়ে, তুমি মোটে ধারণাই করতে পারবে না। বাবাকে তো জানো, সব দিক দিয়ে খাঁটি সাহেব হয়েও হিন্দুয়ানী ছাড়তে পারেন নি—তাই না বাড়িতে হলো বিরাট আয়োজন, ভাটপাড়া হতে এলেন বাবার কোন্ আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো গুরুঠাকুর, আর এলেন বাবার এক পিসিমা, তিনি নাকি কোথায় নবদ্বীপ না শান্তিপুরে থাকতেন—বাবা তাঁকে নিজে গিয়ে নিয়ে এলেন,—ও কি মা, তুমি অমন করছো কেন,—কাঁদছো?"

শাশ্বতী মায়ের মুখের পানে উৎসুকভাবে চাহিল।

মিঃ বোস গুরুদেবকে ভাটপাড়া হইতে আনিয়াছেন, যে পিসিমার সহিত কোনকালে কেবল মাসিক অর্থসাহায্য করা ছাড়া সম্পর্ক ছিল না, তাঁহাকে নিজে গিয়া হয়তো হাতে পায়ে ধরিয়া কলিকাতায় আনিয়াছেন, অথচ এখানে এত কাছে স্ত্রীকে একটি খবর দেন নাই, একটিবার ডাকেন নাই—তুমি এসো, তোমার কন্যার বিবাহ তুমি নিজে দাও।

অভিমানে মিসেস বোসের অধরোষ্ঠ কাঁপিতেছিল, অতি-কষ্টে তিনি নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া শুধু একটু হাসির রেখা মুখে ফুটাইয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, "কাঁদব কোন্ দুঃখে শ্বাতি? এ যে আমার পক্ষে আনন্দের কথা—অতি আনন্দের কথা, তিনি নিজে বরকর্তা হয়ে তোর বিয়ে দিয়েছেন, হিন্দু ধর্মমতে তোকে নারায়ণ সাক্ষী রেখে সম্প্রদান করেছেন, এ যে আমার বড় শান্তির কথা—তাঁর আশা পূর্ণ হয়েছে, তোকে নিয়ে তিনি কষ্ট পান নি—তাঁকে জ্বলতে হয় নি—"

বলিতে বলিতে অবাধ্য অশ্রু বাধা মানিল না—চোখ ছাপাইয়া হঠাৎ শাশ্বতীর হাতের উপর ঝরিয়া পড়িল।

ব্যাকুলভাবে মাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া শাশ্বতী বলিল, "তোমার আনন্দ হচ্ছে, তবু তুমি কাঁদছো কেন মা—?"

চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া মিসেস বোস বলিলেন, "না শ্বাতি, কাঁদব না মনে করলেও কি জানি কেন যে চোখে জল আসে। আসল কথা—আমার মনটা এখানে এসে পর্যন্ত কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে, অতি অল্পেই আঘাত পাই, চোখেও জল আসে।"

রুষ্টকণ্ঠে শাশ্বতী বলিল, "তোমাদের গাঁয়ের লোক-গুলোই ভারি দুর্বল মা, কথায় কথায় ওদের চোখে জল আসে। তোমার এখানে এই আবহাওয়ার মধ্যে আসা মোটেই উচিত হয় নি মা; এতদিন তোমার নিজে চলে যাওয়া উচিত ছিল। বাবাকে আমি আগেই বলেছিলুম, বাবা আমায় বললেন—'থাক, সংসারের জ্বালায় বড় জ্বালাতন হয়ে দুদিন বিশ্রাম করতে গেছে,—দুদিন থেকে আসুক।' তুমি নিজের ইচ্ছেয় চলে এসেছো মা, আমাকেও তো একখানা পত্র লিখতে পারতে, আমি নিজে গাড়ি নিয়ে আসতুম। যাক, এখন ওঠো, এখনি তোমায় যেতে হবে।"

শঙ্কিত হইয়া মিসেস বোস বলিলেন, "তাই কি হতে পারে শ্বাতি, যেখানে আছি আজ পনেরো কুড়ি দিন, এত সুখে স্বচ্ছন্দে রয়েছি, সেখানে কাউকে কিছু না বলে টপ করে চলে যাওয়াটা কি ভালো—না সেটাতে ভদ্রতা রক্ষা হয়?"

মায়ের বুকের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া আবদারের সুরে শাশ্বতী বলিল, "আমি কিন্তু কোন কথা শুনব না, কারও বাধা মানব না, আমার মাকে আমি ঠিক আজই নিয়ে যাব, এ কথাটা তুমিও বুঝো, ওঁদেরকেও দয়া করে বুঝতে বলো।"

মেয়ের আবদারে মা কেবল একটু হাসিলেন।

বাধা লাগিয়াছে স্বামীর ব্যবহারে, শাশ্বতী আসিয়া

তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া তাঁহার বুকে মুখ রাখিয়া তাঁহার বুকের জ্বালা জুড়াইয়া দিল।

এই মুহূর্তে তাঁহার মনে হইল—তাঁহার আর কিছু না থাক, আছে তাঁহার সন্তানের ভালোবাসা, আর কেহ না থাক, আছে তাঁহার একটি সন্তান। যাহাকে একদিন নিজের আদর্শে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সে চলিয়া গেল বহুদূরে, আর যাহাকে কোনদিন বাঁধিতে পারেন নাই, যে ছিল অশিষ্ট অশান্ত অতি চঞ্চল, অচঞ্চলারূপে সেই আসিয়া ধরা দিল?

তাঁহার দুইটি চোখ অল্পে অল্পে ঝাপসা হইয়া উঠে।

২৮

হাঁপাইতে হাঁপাইতে স্থূলাঙ্গিনী থাকমণি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়াই দরজার কাছে বসিয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ দম লইয়া বলিলেন, "এই দেখ, এই দুঃখেই না উপরে উঠতে চাইনে, মোটা মানুষের পক্ষে এই সিঁড়ি পার হয়ে উপরে আসা কি পোষায়?"

শাশ্বতী হাসি চাপিয়া বলিল, "না এলেই হতো মাসিমা, এতটা কষ্ট করে উপরে আসা সত্যিই তোমার আর মানায় না।"

থাকমণি হাসিয়া বলিলেন, "তাই কি হয় মা—তুমি এসেছো শুনলুম, তাই না রাঁধতে রাঁধতে ছুটে এলুম। তুমি ছুটতে ছুটতে একেবারে উপরে চলে এলে, জুতোর শব্দ শুনে ঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, কে এলো। সে আবার এক নতুন ঝি, লোকও চেনে না, হাঁ করে শুধু চেয়েই রইলো। এই ব্রেজো এলো, বাইরে মোটর দেখে—দৌড়ে এসে খবর দিলে, তাই ছুটে এলুম।"

শাশ্বতী বলিল, "আমি যে এখনই নীচে যেতুম মাসিমা, মাকে নিয়ে যেতে এসেছি কি না, তোমায় আগে যে বলতেই হবে।"

"কি রকম?"

থাকমণি দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "তোমদের বাপু সবই অদ্ভুত, বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে গাড়ি এনে হাজির করেছো, এখনি তোমার মাকে নিয়ে যাওয়া চাই।"

শাশ্বতী নরম সুরে বলিল, "কিন্তু আমরা এসেও পড়ি যে অমনি হুট করে। আমি যেদিন এসেছিলুম, নিজে পর্যন্ত জানতুম না—শেষ পর্যন্ত তোমারই এই গ্রামে এসে পড়ব। মা তবু ওখানে বলে বার হয়েছে। যাই হোক, মা যেমন এসেছেন হুট করে চলে যাবেন; ওদিকে আবার চলছে না কিনা!"

বলিতে বলিতে সে একখানা হাত মায়ের দিকে মেলিয়া দিয়া বলিল,—"দেখ না, এই কয়দিনে কেমন রোগা হয়ে গেছি। আরও যদি বাবার চেহারাখানা দেখ মা, সত্যি তুমি চমকে যাবে, মনে হবে বাবা যেন কতকাল রোগে ভুগে উঠেছেন।"

মিসেস বোস অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

থাকমণি সদুঃখে বলিলেন, "তা তো হবেই, বাড়ীর গিন্নী না থাকলে সবারই সেই দশাই হয়। এই করেই না আমার একবার তোর বাড়িতে যাওয়া হয় না কাতু। কতবার মনে করেছি, গংগাস্নানের যোগে তোর বাড়িতে গিয়ে একবার গংগাস্নান করব—"

বাধা দিয়া মিসেস বোস গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "তা তুমি গেলেই তো পারো দিদি, অমনি তোমায় কালিঘাট, তারকেশ্বর, মদনমোহন, সিদ্ধেশ্বরী সব কিছু আমি নিজে সংগে নিয়ে দেখিয়ে আনতে পারি।"

বিস্মিত শাশ্বতী মায়ের মুখের পানে তাকাইল।

দুই বৎসর পূর্বে তাহার যে মা ছিলেন, আজ সে মায়ের আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। হোক না সহোদরা ভগিনী, মাতৃস্নেহে তাহাকে লালনপালন করিয়া সেই দিদি তাঁহার বিবাহ দিলেও বর্তমান সভ্যসমাজে পল্লীবাসিনী সেই নারীকে দিদি বলিয়া মানিয়া লইবার সাহস তাঁহার ছিল না। সেদিন দিদি তাঁহার বাড়িতে যাইবেন শুনিয়া তিনি প্রমাদ গণিয়াছিলেন, আজ তিনিই তাঁহাকে নিজের বাড়িতে যাইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

থাকমণি ভগিনীর কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে মাথা দুলাইলেন, ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "যেতে কি পারিনে, অনায়াসে যেতে পারি, তবু যেতে পারিনে শুধু ওই বুড়ো আর রুগ্ন ছেলেটার জন্যে। কে দেখবে, কেই বা ক্ষিদের সময় দুটি ভাত দেবে, সেই ভাবনায় আমার এই সংসার ছেড়ে একটি পা নড়ার যো নেই। একবার দু দিনের জন্যে গিয়েছিলুম মাহেশ রথ দেখতে, তাতে চোখের জল রাখা যায় না। সেই হ'তে প্রতিজ্ঞা করেছি, না মরলে আর এখান হ'তে বার হব না।"

শাশ্বতী বলিল, "যাক, তুমি যেয়ো না বাপু, তুমি এখানেই জন্ম জন্ম বাস কর। মাকে নিয়ে যেতে পারবো তো —বল?"

মিসেস বোস মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "শুধু সেজন্যেই নয় দিদি, মেয়ের আমার হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেছে, তাই আমায় নিয়ে যেতে এসেছে, না গেলে কোন কাজকর্ম হবে না।"

বিস্ফারিত চোখে থাকমণি বলিলেন, "হঠাৎ বিয়ে কি রকম? মা রইলো এখানে, বাপ গির্জায় গিয়ে না মসজিদে গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলে?"

শাশ্বতী উত্তর দিবার আগেই মিসেস বোস বলিলেন, "গির্জাতেও নয়, মসজিদেও নয়—আমার এক পিসশাশুড়ী নবদ্বীপে থাকেন, তাঁকে এনে হিন্দুমতেই তোমার ভগ্নীপতি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।"

থাকমণি একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, "এমনি রাগ, তবু তোকে একটা খবর দিলে না কাতু—?"

মিসেস বোস অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন, শাশ্বতীও উঠিয়া গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল।

পথের পানে চাহিতে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল সুমন্তের দরজার পানে; সুমন্ত ও আর একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছে, উভয়েরই হাতে চাপূর্ণ গ্লাস—সম্ভব তাহারা কাপে চা খায় না, গ্লাসে খায়।

অপরিচিত লোকটির মুখ যেন পরিচিত বলিয়া মনে হয় —শাশ্বতী চেষ্টা করিয়া মনে করিতে লাগিল।

একজনের কথা মনে হয় ;—

অনেকদিন—বোধ হয় দুই বৎসর আগেকার কথা—শাশ্বতীর বন্ধু অরুণার বাড়িতে সে যেন ইঁহাকেই দেখিয়াছিল, এই লোকটির অদ্ভুত প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া শাশ্বতী আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। অরুণা মহাড়ম্বরে গল্প জুড়িয়াছিল, তাহার অমলদা নাকি সমুদ্রের বুকে সাঁতার দিয়া যায়, স্বদেশী হাঙ্গামায় মারামারি করিয়া পাঁচ বৎসর জেলে ঘানি ঘুরাইয়াছে, পাথর ভাঙ্গিয়াছে, মাটি কোপাইয়াছে। সে স্থায়ীভাবে কোথাও থাকিতে পারে না, চলার পথে দু একদিন কোথাও থামিয়া থামিয়া যায় মাত্র। আট বৎসর পরে অরুণার অমলদা তাহাদের বাড়িতে একদিন মাত্র থাকিয়া পরদিন কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছিল, দীর্ঘ দুই বৎসর পরে তাহাকে শাশ্বতী দেখিতে পাইল এই যদুরহাটি গ্রামে—একটা বাড়ির বারান্দায় চা-পান করিতে রত অরুণার অমলদাকে।

মুহূর্তে তাহাদের পানে তাকাইয়া শাশ্বতী ফিরিল। শুনিল, তখন থাকমণি বলিতেছেন, "ও মা বিয়ে হ'ল, মাথায় সিঁদুর নেই, হাতে লোহা নেই। তোর সিঁদুর কৌটাটা দে কাতু, পরিয়ে দেই। আর ওই যে তাকের ওপর সিঁদুরের চুপড়িটা রয়েছে, ওর মধ্যে লোহা আছে, আমার হাতে দে বাপু।"

শাশ্বতীকে নিকটে ডাকিয়া থাকমণি বসাইলেন, একখানা চিরুণী দিয়া মাথার সমুখদিকটা আঁচড়াইয়া দিয়া বলিলেন, দাও বাপু সিঁথেয় সিঁদুর দাও, হাতে লোহাটা পর—বিয়ে যে হয়েছে, মানুষ দেখলে তা তো কিছু বোঝা যায় না।"

হাসি চাপিয়া শাশ্বতী সিঁথেয় সিঁদুর দিল, হাতে লোহা পরিল। ছোট আয়নাখানা তাহার ভ্যানিটিব্যাগ হইতে বাহির করিয়া নিজের সিঁথের পানে চাহিয়া বলিল, "অবশ্য দিতে হল মাসিমা—আমি কিন্তু এই বন্দিনী অবস্থাটা নিজে প্রণিধান করতে বা অপরকে প্রত্যক্ষ করাতে মোটেই ইচ্ছুক নই। অজকাল ইতিহাস কি প্রমাণ করেছে জানো—সিঁদুর পরলে বা একটা লোহা হাতে পরলেই যে আমাদের স্বামী দেবতাদের আয়ু বাড়বে, না পরলে কমবে—তা নয়। এটা হচ্ছে আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের জাতির একটা পরাধীনতার চিহ্ন।"

থাকমণি বিকৃতমুখে বলিলেন, "জানিনে বাপু তোমাদের ওই পরাধীনতা আর স্বাধীনতার কথা। চিরকাল জেনে আসছি বিয়ে হলেই মেয়েদের সিঁথেয় সিঁদুর পরতে হয়, হাতে লোহা রাখতে হয়। আজকাল আবার শুনেছি মেয়েরা সিঁদুরও পরে না, লোহাও নেয় না। অমন শিক্ষার মুখে আগুন, যা মেয়েদের মেমসাহেব করে তোলে, ঘর ভুলিয়ে বাইরে টানে।"

শাশ্বতী চোখ টিপিয়া বলিল, "যা বলেছো মাসিমা, আমায় কিন্তু ওদের দলে ফেলতে পারো না। তার সাক্ষী দেখ—যেমন বলেছো তেমনই সিঁদুর পরেছি, হাতে লোহাও পরেছি, কি বল মা—?"

হাসিয়া উঠিয়া সে মায়ের কোলে মুখ লুকাইল।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় শাশ্বতী মাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইবে কথা ঠিক হইল।

শাশ্বতী বলিল, "যাক্, জীবনে আর কোন দিনই তো এখানে আসা হবে না ; আজ সারাদিনটা থেকে গ্রামখানাকে আরও একবার দেখে নেওয়া যাবে কি বল মা?"

মহেশ বলিলেন, "সন্ধ্যের সময় মোটর চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে বরং বিকেলে বার হলেই হতো মা।"

শাশ্বতী বলিল, "কোন ভয় নেই মেশোমশাই, আমি অনেক রাত্রেও মোটর চালিয়েছি, কোনদিনই তো কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি, আমি ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাবো, বাড়ি গিয়ে পৌঁছতে এক ঘণ্টাও দেরি হবে না।" (ক্রমশ)

রাজু

(১১৬ পৃষ্ঠার পর)

ম্লান অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। দূরের গাছগুলা মাঠের অস্পষ্টতায় বিলীন হইয়া যাইতেছে। গাড়ি চলিতেছে, আর তাহারই পেছনে ঝাঁকুনির দোলায় দোলায় জেল-ফেরৎ রাজুর দেহটা অস্পষ্ট স্বপ্নময় হইয়া আমার চোখের উপর ফুটিয়া উঠিতেছে। আমার ভাবিতেই রোমাঞ্চ লাগিতেছে, এ সেই রাজু।

ঘুম আসিয়াছিল।

লীলা ধড়্মড়্ করিয়া আমাকে ঠেলিয়া তুলিল, চোর—আমার পায়ে স্পষ্ট হাতের ছোঁয়া লাগল। ভয়ে সে আরো সংলগ্ন হইয়া বসিল।

পাশেই বন্দুক। টর্চ জ্বালিয়া পকেট হইতে টোটা বাহির করিয়া দুইটা নল ভরিলাম। গাড়োয়ানটা বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তৎক্ষণে জাগিয়াছে। ছইয়ের ভিতর হইতে বন্দুক হাতে আগাইয়া আসিয়া টর্চ জ্বালিলাম। আকাশে ম্লান জ্যোৎস্না নীরব পৃথিবীকে পুণ্যস্নান করাইতেছে। মনে হইল, কে যেন অদূরে ছোট ঝোপের আড়ালে দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বন্দুকটা দৃঢ়হাতে ধরিয়া আলো জ্বালিলাম। কিন্তু সে আলো কাহার গায়ে পড়িতেই সংকুচিত বাতিটা নিবিয়া গেল। বন্দুক রাখিয়া ছইয়ের ভিতর চলিয়া আসিলাম।

পেছনে বাঁধা সুটকেশটা গিয়াছে।

এ যেন আমারই লজ্জা। কে যেন নিষ্ঠুর হাতুড়ির ঘায়ে আমার সমস্ত মনোলোকটাকে চূর্ণ নিষ্পেষিত করিয়া দিল। সমস্ত মনটা জুড়িয়া খাঁ খাঁ করিতে লাগিল রিক্ততার একটা দুঃসহ গ্লানি।

প্রিয়তমের চিঠি

শ্রীগৌরীশংকর ভট্টাচার্য

বিবাহের অভিনব অঞ্জন সবে লেগেছে নবদম্পতীর দেহে মনে। বিয়ের বড় পর্ব অর্থাৎ বৌভাত সারা হ'য়ে গেছে কিন্তু আত্মীয় পরিজনে বাড়ি তখনও সরগরম। সারাটা দিন অদর্শন বড়ই দুঃসহ। তাই তারা যুক্তি ক'রে চিঠি লেখার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। অবসর পেলেই খানিকটা লেখে আর যথাস্থানে রেখে দেয়। সুযোগ পেলেই খোঁজ করে, উত্তরটা এসে জমা হ'ল নাকি—অনেকক্ষণ ত হ'য়ে গেছে। তাদের ডাকবাক্স এবং পোস্ট অফিস বৃদ্ধা ঠাকুমার ঘরের একটি নির্দিষ্ট কোণের খোপ। নাতি আর নাত্ বৌয়ের এই অভিনব প্রণয়লীলা বুড়িকে বহু যুগের ওপারে নিয়ে যায়। এদের ঘন ঘন এ ঘরে আসা যাওয়া আর সলজ্জ হাসির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি নূতন ক'রে যৌবনের স্বপ্ন রাজ্যে টেনে নিয়ে যায় ঠাকুমাকে। এরা আসে যায়, কিন্তু খাটের উপর বিছানার সাথে মিলিয়ে যাওয়া দেহটার দিকে চাইবার অবকাশ এদের নাই। প্রমিতা আসে—সটান কোণে গিয়ে ব্লাউজের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে টেনে বার করে রঙীন একখানা কাগজ, সেটা রাখে, আর হাতড়ায় ঐটুকু জায়গাটা বার বার—যদি কোন কাগজপত্র না পায় ত' বৃদ্ধার দিকে একবার চায়—'সে এসেছিলো?' এই তার বক্তব্য, তবে মুখ ফুটে বলে না। বৃদ্ধা বলেন—'ওলো, আসেনি, এলে কি আর আমি লুকিয়ে রাখব?'

অতুল সটান এসে ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করে—'আমার চিঠি আছে ঠাকুমা?' বলেই একবার নির্দিষ্ট স্থানটা ভালো করে দেখে নেয়। তারপর চলে যায়, দাঁড়ায় না একটুও।

মাঝে মাঝে বৃদ্ধার কৌতূহল হয়, কী এরা লেখে এত? কিন্তু সে নিছক কৌতূহল, তার বেশি কিছু নয়।

সেদিন রাত তখনও গভীর হয়নি। সন্ধ্যা ছাড়িয়ে রাত্রির বিকাশ শুরু হয়েছে। বৃদ্ধা আপনার বিছানায় ছিল শুয়ে। কি যেন তার ভাবনা তার ঠিক নেই। আবোল্ তাবোল্ আপন মনের সঙ্গেই বকে চলেছে সে। হঠাৎ মনে হ'ল, আচ্ছা আমার নামটা যেন কী! কমলা—হ্যাঁ কমলাই বটে। কতদিনের পুরাণো মরচে পড়া নামটা। বহুদিন হ'ল এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ ত ও নামে ডাকে না......ঠাকুমা সে।

তারপর একে একে ধীরে ধীরে ভেসে আসে অতীত দিনের ইতিহাস হ'য়ে যাওয়া স্মৃতিগুলি।

সেই একবার সে লিখেছিলো চিঠি—কি সুন্দর চিঠি! কত যে কথা তার মধ্যে আছে। ঠিক যদিও তার ভাষাটা মনে আসছে না, যদিও বক্তব্যগুলো স্বচ্ছ হ'য়ে নেই তবু যেন তার সৌরভে কমলা পাগল হ'য়ে উঠল।

সে বিছানা ছেড়ে দেওয়াল ধ'রে দাঁড়াল, আস্তে আস্তে গিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল, তারপর জানলাটাও। কোমরের একটা দড়িতে বাঁধা চাবির গোছা থেকে একটা চাবি বেছে নিলে প্রদীপের আলোর সামনে ধ'রে।

বাক্স খুলে কমলা কাপড় চোপড় নামাতে লাগল—এক একখানা কাপড় যেন কত কথাই কইছে। এখানা সেই সেবারে সে দিয়েছিল কিনে সাধের সময়, কে যেন ব'লেছিল এখানা পরলে কমলাকে মানায় ভালো।......আর, আর এখানা? কেন, সেই একবার পুজোর সময় দেওয়া।......এমনি আরো কত কথাই এই এতটুকু বাক্সের বন্ধ বাতাসের কণায় কণায় জমে আছে। প্রদীপটা একটু উস্কে দিয়ে কমলা চেপে বসে মাটির উপর।

সব তলায় একটা ছোট্ট সাবানের বাক্স, তার ওপরকার ডালাটার কোণগুলো খুলে গেছে, সেই ডালাটা তুলে কমলা কতকগুলো কাগজপত্র বার করে।

চোখে আজকাল আর সে ভালো দেখতে পায় না, চশমা দিয়েও না—তায় আবার রাত্রিবেলা। এটা ওটা দেখতে দেখতে অনেকটা সময় কেটে গেল। নজরে না বুঝলেও প্রতি পত্রের ছত্রগুলো যেন তার কণ্ঠস্থ, আন্দাজে আবছা আবছা অক্ষরগুলো ধরে সে পড়ে ফেলে সেখানা।

কিন্তু। সেই চিঠিখানা কোথায় গেল!......অসামান্য কিছুই নয়, নিতান্ত সাধারণ একটি দম্পতীর যৌবন কালের প্রণয়পত্র, তার মধ্যে এমন আর কি থাকতে পারে—অবৈধ প্রেম হ'লেও বা কথা ছিল।

সেই বিশেষ পত্রখানি কমলা অনেক কষ্টে খুঁজে বার করলে। ঘাটাঘাটি ক'রে কাগজখানার গায়ে ঢেঁড়সের গায়ের মত রোঁয়া উঠে খস্‌খসে হ'য়ে গেছে। হাতের ঘামে আর তেলে তার উপর চটা হ'য়ে ময়লা জমেছে। কমলা সেটা পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেল। তার বুকের মধ্যে দোল দিল। মলিন পত্রখানি সে বুকের মধ্যে চেপে ধরে। অনাস্বাদিত আনন্দের অনুভূতিতে থর থর আবেগে কম্পিত হস্তে মুখের উপর সে সেখানা চেপে ধরে, কত-দিনের পরিচিত একটা গন্ধ! আঃ। আরামের নিশ্বাস ফেলে বাঁচে কমলা।

চিঠি। তার চিঠি। সে লিখেছিল। কমলাকেই লিখেছিল সে চিঠি।

কমলার বেশ মনে পড়ে—সে অপেক্ষা করেছিল সেদিন কখন ডাক পিওন আসবে—যেমন যৌবন কালে তরুণীরা করে থাকে অপেক্ষা দয়িতের বারতার জন্য, তেমনি। দুদিন হ'ল তার চিঠি আসার তারিখ পেরিয়ে গেছে, আজ নিশ্চয়ই আসবে।

পিওন এসে ডাকল—দিদিমণি! গাঁয়ের পিওন রমানাথ, সেবার বেচারী ভুগে ভুগে মারা গেল—আহা!

তারপর এই চিঠি এলো। এটা ভালো লাগে বেশি ক'রে, কারণ এটার মধ্যে তার দেহের যেন চিহ্ন আছে। চিঠিখানা লিখে সে রেখেছিল বুক পকেটে, গরমের ঘামে যে অক্ষরগুলো মুছে গিয়েছিল তার জন্যে কমলার দুঃখ নেই।......সে আবার নাকের কাছে কাগজখানা তুলে ধরে—একটা সোঁদা গন্ধ। এত ভালো লাগে তার এই গন্ধটা, তার গায়ের ঘামের গন্ধ যে। কাগজখানা সে দেহের উপর একবার বুলিয়ে আবার চোখের সামনে তুলে ধরল।

কতক্ষণ যে এমনি আচ্ছন্নভাবে কেটেছিল কমলার খেয়াল ছিল না। তার সম্বিত ফিরল যখন হঠাৎ দরজায় ঘা পড়ল। শব্দে প্রদীপের শিখাটা কেঁপে যায়। কমলা তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র সামলে উঠে পড়ল।

কমলার দুয়ার খুলতে একটু দেরী হয়। প্রমিতা ঢুকে জিজ্ঞাসা করে, কী করছিলেন ঠাকুমা—এতক্ষণ ধ'রে দরজা বন্ধ করে?

ঠাকুমা?—হ্যাঁ ঠাকুমাই ত সে। সে বলে, "এই তোর অমুকের চিঠি পড়ছিলুম ভাই,—"

ব'লে সে বিছানায় আশ্রয় নেয়।......জানলার পাশে সরষের তেলের পিদিমটা মিট্‌মিট্ ক'রে জ্বলছে। সমস্ত ঘরটা আলো-ছায়ায় মেশানো রহস্য লোকের মতই আচ্ছন্ন। কতকালের এই ঘর-খানা, এর কড়ি বরগায় প্রাচীন কালের ছাপ, আলকাতরা দেওয়া মোটা মোটা কাঠের কড়িগুলোর উপর পুরু হ'য়ে সিঁদুর দিয়ে মাঙ্গলিক লিপি চর্চিত। আগেকার কালের অনুষ্ঠানলিপি এখনও এর বুকে লেখা আছে। এত বড় ঘরে মাত্র দুটি জানলা, তার একটি বারোমাস বন্ধই থাকে কারণ কমলার হাঁপানিটা বারোমেসে আর জানলাটা মাথার গোড়ায়। ওপাশে স্তূপীকৃত পুরাতন পঞ্জিকা স্তরে স্তরে সজানো রয়েছে। প্রাচীন হাতে-লেখা পুঁথিগুলোর

কাপড়ের মোড়কে ময়লা ধরেছে, বইয়ের পাতাগুলো লাল হ'য়ে গেছে ধুলোয়, অযত্নে। কতদিন এগুলোর দিকে কেউ নজর দেয় না। কমলার চোখের সামনে অকস্মাৎ এই অতি কদর্য ঘরটা কুসুম গন্ধে সুরভিত হ'য়ে উঠল। এ ঘরেই তাদের ফুলশয্যা হয়েছিল। ওই যেখানটায় পিলসুজটার তেলে মাটি তেলচিটে হ'য়ে গেছে ওখানেই ছিল তার মাথাটা......। তারপর কমলার মন চলে গেল আরও আরও গভীরে।......এ কী পুলক শিহরণ জাগে তার মনে?

কে যেন ঘরে ঢুকল।......অতুল এসেছিল, কাজ সেরে চ'লে গেল। কমলা ভাবে, অনবরত এরা চিঠি লেখে দু'জনে......আচ্ছা এরা কি লেখে এত? নবযুগের ধারা কি সেই পুরাতন আদিকালের পথ বেয়ে চলে, না নতুন কোন পন্থা এদের আছে প্রণয় পদ্ধতির।

কতকাল আগেকার কথা, তারা লিখিত চিঠি যখন দু'জনে দূরে থাকত, কাছাকাছি থেকে নয়। কিন্তু এরা—এরা সাম্প্রতিকের প্রতীক, এদের প্রেমোন্মেষের চেহারায় কি জোগালো মহাকাল কোন নতুন অস্ত্র, যার পরিচয় তারা—অতীত কালের পুরাতনেরা, পায়নি হয়ত। হয়ত সে যুগের দোষ সেটা।

এ যুগে জন্মালেই বোধ হয় ছিল ভালো।......কি লেখে এরা এত? দেখলে হয় এদের ধারা। কমলা হয়ত কল্পনাও করতে পারে না—এমন সব কথা এরা লেখে অথবা নেহাতই সাধারণ কথা। কমলার কৌতূহল অদম্য হ'য়ে উঠল, আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে এসে অতুলের রেখে যাওয়া চিঠিখানা মুঠোয় পুরে সে সটান বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। চিঠিখানা বালিশের তলায় লবঙ্গ আর তালমিছরি যেখানে থাকে—সেখানে লুকিয়ে রাখে। কাল দিনের আলোয় চশমা দিয়ে দেখবে সে এ যুগকে।

এইটুকু ওঠা-নামাতে যথেষ্ট পরিশ্রম হ'য়েছিল,......শুয়ে শুয়ে কাসিটা বাড়ল। টানের জোর এতই হ'তে লাগল যে, কমলা দুহাত দিয়ে বুক চেপে মুখ গুঁজরে গোঁ গোঁ করতে থাকে।

প্রমিতা আপন কাজে এসেছিল। চিঠি না পেয়ে সে একটু হতাশ হ'ল।......সে দেখেছে অতুলকে আসতে অথচ চিঠি নেই? বেরিয়ে যাবার সময় একবার ঠাকুমার কাছে এলো। তাকে দেখে কমলার কাসি যেন আরও বেড়ে যায়। কিন্তু তারই এক ফাঁকে কমলা বলে, "আমি কি তোর চিঠি লুকিয়েছি মনে করছিস্। এত অবিশ্বাস যার—যা সরে যা। আমার অত দায় পড়েনি। আমি দম বন্ধ হ'য়ে মরে যাচ্ছি, উঁর......" আর কিছু শোনা যায় না, কাসির শব্দে চাপা পড়ে। প্রমিতা লজ্জিতভাবে চুপ ক'রে থাকে।

তার এই ঠাকুমাটিকে ভালই লাগে অথচ সারাদিন নানা কাজের ফাঁকে এদিকে মনোযোগ দেবার অবসর যদি-বা সামান্য থাকে, তা তখন সবাই যেন নতুন বৌকে চোখের আড়াল করতে চায় না। আহা একলাটি এই বুড়ো বয়সে এঁ'র কি কষ্ট! একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে প্রমিতার অন্তর হ'তে।......নাঃ সে কিছুতেই বুড়ো হবে না, তার আগেই মরে যাবে; যেমন ক'রেই হোক্ সে মরবে তার আগে।

পরদিন ঠাকুমার হাঁপানি খুবই বাড়ল। প্রমিতার উপর আদেশ হল 'বুড়িকে মাঝে মাঝে দেখো বৌমা।'

প্রমিতা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। অতুল আসে এ ঘরে ঘন ঘন। এদিকটা বড় কেউ মাড়ায় না। প্রমিতা বৃদ্ধাকে যত দেখে তার চেয়ে বেশি দেখে আপনার নববিকশিত যৌবন-মদিরা মাখা দেহ আর মনকে। অতুলের কাছে তার অভিনন্দন আপনাকে সার্থক করে তুলেছে,—এ যেন কিসের একটা অব্যক্ত মধুর অনুরণন।...... ওপাশে থেকে থেকে বৃদ্ধা কেসে ওঠে, কী দীর্ঘকাল চলে একটানা ঘরর ঘরর হাঁপানির শব্দ! প্রমিতার থেকে থেকে গা ছম্ ছম্ ক'রে ওঠে, ভয়ে সে শিউরে ওঠে—এর চেয়ে মরণ ভালো। তার দুঃখ হয় বৃদ্ধার জন্য।

স্বার্থপর জাত মানুষ। বিবাহের পর দিনের বেলায় আলাপ করবার মত একটা নিভৃত কক্ষ পেয়ে প্রমিতার মনে হয়,—কোথায় যেন কণ্টক র'য়ে গেছে,—এই বুড়ি যদি না থাকত তবে নিরবচ্ছিন্নতা—কথাটা মনে হ'তেই মনকে সে শাসন করে দেয়।...... ওপাশ থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বৃদ্ধা ডাকে—দিদি, ওদিদি, আমায় একটু বাতাস কর না ভাই! কই, কইরে......নেই বুঝি কেউ। আমাকে একলা ফেলে রেখে সবাই পালিয়েছে! পালিয়েছে সব—এরা আমাকে মেরে ফেল্‌বে ঠিক ক'রেছে। উঃ, গেলাম, মাগো—"

এমন সময় অতুল ঢোকে ঘরে। শেষের কথাটা কানে যেতেই সে রসিকতা ক'রে বলে, "তোমার প্রাণ কি অত সহজে বেরোয়? আমাদের ফলার খাওয়া আর এ কাঠামোয় হবে না।"

কমলা একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। অতুলের চোখে মুখে কৌতুকের জোয়ার; কমলা আর তাকাতে পারে না। মৃত্যু পথ-যাত্রীকে এর চেয়ে আর কি বলে মানুষ ব্যথা দিতে পারে? কমলা আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। এবারে কাস্‌তে কাস্‌তে দম বন্ধ হ'য়ে গেল বুঝি। প্রমিতা ছুটে আসে। তার হাতটা আপনার শীর্ণ কঙ্কালসার হাতে মুঠো ক'রে ধরে কমলা আপনার পাঁজরা বেরুনো বুকের মধ্যে চেপে ধরল।......এ যাত্রায় আর বাঁচবার আশা নেই।

সাতটা দিন কোনরকমে কাটল টাল-মাটাল ক'রে। কিন্তু আট দিনের দিন বৃদ্ধার শেষ-নিশ্বাসটুকু ফুরিয়ে গেল। নতুন যুগের নবদম্পতীর প্রণয়ালাপ আর দেখা হ'য়ে উঠল না তার।

সেদিন সকালে তার পরিত্যক্ত বিছানাগুলো বাইরে বার ক'রে দিল প্রমিতা,—এ ঘরটা পরিষ্কার করা দরকার কি-না, তাই।

হঠাৎ একটা তোষকের ভাজ থেকে একটা ভারি কি পড়ল। প্রমিতা কুড়িয়ে নিল—চশমার খাপ, তার মধ্যে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা চশমা, গোটাকয় মরচেপড়া ছুঁচ; আর একটা মোড়কে হয়ত মিছরি আছে। প্রমিতার নজরে পড়ল একটা ময়লা তেলচিটে কাগজ। সে তাড়াতাড়ি তুলে নিল। এই কাগজটার সঙ্গে আর একটা টাট্‌কা রঙীন কাগজও পাওয়া গেল। সেখানা দেখেই সে চিনলে অতুলের হাতের ডাগর ডাগর মুক্তোর মত ঝক্‌ঝকে লেখা। ময়লা কাগজটা তার অজ্ঞাতেই পড়ে গেল, অতুলের চিঠিখানা পড়ল খুলে, তারপর সেখানা ব্লাউসের মধ্যে পুরে আবার কাজ করতে লাগল। একবার মনে হ'ল—এটা এখানে এলো কেমন করে? তারপর সে ঝাঁট দিয়ে ঘরের সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার ক'রে ফেল্‌লে। এক ফাঁকে অতুল এসে বলে গেল,—'গিন্নি, অত কাজ ক'র না।'

কমলা ঝাঁটাটা নেড়ে বলে—'কাজের সময় ইয়ার্কি ভালো নয়।' ঝাঁটার ডগায় প'ড়ে সেই তেলচিটে কাগজখানা একবার আট্‌কে গেল তারপর আবার টান দিতেই সেখানা বাইরে চলে গেল,—বৃদ্ধার শেষ চিহ্ন—প্রিয়তমের চিঠি।

অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রমণ্ডলী

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

যদিও প্রাচীন আখ্যান ইতিহাস সব কিছুর মধ্য দিয়ে চিত্রকরদের মনকে ভারতীয় আদর্শের সংগে যুক্ত করবার চেষ্টার দ্বারা রুচির পরিবর্তন ঘটেছিল, ভারতীয় প্রকাশভংগীকে অবনীন্দ্রনাথের ছাত্ররা অনুসরণ করতে পারেন নি। এই জন্য ব্যক্তিগত রুচির দ্বারা

অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত

অবনীন্দ্রনাথের ছাত্ররা চালিত হয়েছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন ভাবধারার সংগে যুক্ত হওয়ার চেষ্টায় পরিণামে কেবলমাত্র কাব্যকে অনুসরণ করার চেষ্টায় পরিণত হোলো কি ভাবে, আর একটু অগ্রসর হোলেই আমরা দেখব। এই সময়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য বাঙলা দেশের নব্য শিক্ষিত তরুণ মনকে সম্পূর্ণ প্রভাবান্বিত করেছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এই দিক দিয়ে চিন্তা ও ভাবে একদল চিত্রকর রবীন্দ্র-কাব্য থেকে প্রেরণা পাবার চেষ্টা করেছিলেন, বলা বাহুল্য রবীন্দ্র-কাব্যের ভাব দিয়ে চিত্রকে সরস কোরতে তাঁরা চেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্য দিয়েই আধুনিক চিত্রে প্রথম allegoryর প্রকাশ দেখা দিয়েছে এই allegoryকেই তখন লিরিক গুন বোলে ভুল করা হয়েছিল। তথাকথিত লিরিক গুণের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আমরা পাই অসিতকুমার হালদারের চিত্রে।

অসিতকুমারের অঙ্কিত "সুরের আগুন" Nature Mystry, মেঘের খেয়া ইত্যাদি চিত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু চিত্রকরে যে ভাষা, রূপ, রং, রেখা ইত্যাদি সে ভাষায় সাহিত্যের ভাব রূপান্তরিত হয়নি, কবি জনোচিত চিন্তাকে কেবল মাত্র অনুসরণ করবার চেষ্টাই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনুরক্ত সাহিত্যিক সমাজ এই ছবিগুলিকে এক সময়ে বিশেষ আদর দিয়েছিলেন; কিন্তু অসিতকুমারকে যদি এইসব চিত্র এবং তার অঙ্কিত এই জাতীয় অন্যান্য চিত্র দিয়ে বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে সাময়িক রুচির নিদর্শন ছাড়া ছবিগুলিতে অন্য মূল্য কম। সত্যকারের অসিতকুমারের বৈশিষ্ট্য বা তার লিরিক মনোভাবের প্রকাশ আমরা পাই, নর্তকী, মা যশোদা, অশোক বনে সীতা ইত্যাদি তাঁর প্রথম যুগের ছবি এবং পরবর্তী কালের রাসলীলা, রাই রাজা, নিগ্রো ক্রীতদাসী প্রভৃতি চিত্রে। এই ছবিগুলি দিয়ে অসিতকুমারের প্রতিভা আমরা বুঝতে পারব।

অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তী চিত্রকরদের মধ্যে কাব্য ভাবকে অনুকরণ করবার যে চেষ্টা দেখা যায় সে ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব গৌণ, এইসব চিত্রকর অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসিতকুমারের অনুগামী। চিত্রকর ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রথম যুগে অসিতকুমারের ন্যায় জনপ্রিয় ছিলেন না। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম অনুবর্তিদের মধ্যে ক্ষিতীন্দ্রনাথ যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপস্রষ্টা সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবের আর একদিক আমরা ক্ষিতীন্দ্রনাথের প্রসংগে বুঝবার চেষ্টা করব। ক্ষিতীন্দ্রনাথের ছবিকে এ পর্যন্ত সমালোচকরা ভক্তিরস প্রধান বলে এসেছেন। সে যাই হোক তার ছবিতে মাধুর্য একটা বড় আকর্ষণ। চিত্রকর নিজে বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্য জীবন তাঁর ছবির প্রধান বিষয়। সাহিত্য বিষয়কে এমন সর্বাংগ সুন্দর কোরে চিত্রের ভাষায় রূপান্তরিত করবার শক্তি অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদের মধ্যে কমই দেখা যায়। ছবির বিষয় ধর্মভাব ইত্যাদি সব কিছু ছাড়িয়ে পল্লী জীবনের অন্তরংগ পরিচয় তাঁর ছবিতে পাওয়া যায়।

দীর্ঘকাল Indian Society of Oriental Artএ শিক্ষকতা করায় বহু ছাত্রদের উপর ক্ষিতীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। অধিকাংশ স্থলেই এইসব ছাত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতিধ্বনি মাত্র। অবনীন্দ্রনাথের অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় ক্ষিতীন্দ্রনাথও অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কণ রীতি গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু বর্ণের আলংকারিক প্রয়োগ অবনীন্দ্রনাথের Wash ব্যবহার সত্ত্বেও ছবির নিজস্ব রূপ ক্ষুন্ন হয়নি। অবনীন্দ্রনাথের বর্ণ ব্যবহার রীতির এবং তাঁর Style-এর বিশ্লেষণ পূর্বেই করেছি। তথাকথিত Wash অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তী চিত্রকরদের ছবিকে অন্ধকার বর্ণ বৈচিত্র্যহীন করেছিল এই জিনিসটিকে সাধারণে Mystic নাম দিয়েছিলেন। কাগজের উপর ঘোলাটে রঙের পোঁচ এবং তারি মধ্যে দিয়ে ঝাপসা রূপের আভাস এইটাই ছিল কথাকথিত অবনীন্দ্রনাথের ঢং। অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের ঢং নামে তাঁরা বিকৃতি atmospheric Effect দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথের ছবিতে এই বিকৃতি দৈবাৎ দেখা যায়। ক্ষিতীন্দ্রনাথের বর্ণ প্রয়োগ এবং অবনীন্দ্রনাথের 'ভারত-মাতার' বর্ণ প্রয়োগের মধ্যে তুলনায় দেখা যায় দুইয়ের চরিত্রে কত মিল আছে। কেবল ক্ষিতীন্দ্রনাথের চিত্র বর্ণ বৈচিত্র্য দিয়ে নূতনত্ব দিয়েছে। নন্দলাল বসু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও অসিতকুমার ব্যতীত অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের ছাত্রদের বিশেষ মূল্য ইতিহাসের দিক দিয়ে সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের পথে হলেও এই সকল চিত্রকরদের চেষ্টা কোন দিক দিয়েই তুচ্ছ করা যায় না।

শিক্ষকরূপে ভারতের সর্বত্র নূতন আদর্শকে জনপ্রিয় করবার জন্য এঁদের চেষ্টা ও ব্যক্তিগত প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার। উত্তর ভারতে সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত জয়পুরে শৈলেন্দ্রনাথ দে দক্ষিণ ভারতে ভেঙ্কেটাপ্পা (Mysore) সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে নূতন আবহাওয়া এনেছিলেন (ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব পরে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।) অনেক দিন পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্রদের সম্বন্ধে সাধারণের যোগ ছিল

অত্যন্ত অল্প। ভারতের বাহিরে হ্যাভেল, কুমারস্বামী, Woodroff ও সিস্টার নিবেদিতার লেখার মধ্য দিয়ে কিছু প্রচারের চেষ্টা হয়েছিল; কিন্তু দেশের সঙ্গে এই সব চিত্রকরদের যোগ ছিল অতি অল্প। ১৯০৭ সালে নূতন চিত্রকরদের সংঘ (Indian Society of Oriental Art) হ্যাভেল, woodroff ইত্যাদির ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এই সংঘ প্রধানতঃ হোয়েছিল চিত্রকরদের কতকগুলি সুযোগ দেওয়ার জন্য। কিন্তু স্বদেশী যুগের নানা চেষ্টারই একটা অংশরূপে হ্যাভেল ইত্যাদি এই সংঘকে গড়তে চেয়েছিলেন। এই সংঘের প্রথম প্রদর্শনের যে পরিচয় আমরা পাই তাতে দেখা যায় প্রদর্শনী গৃহ কেবলমাত্র দেশীয় ছবি দেখানর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, দেশীয় রুচির আদর্শ তাঁরা দিতে চেয়েছিলেন গৃহসজ্জায় দেশীয় সংগীতে। নিমন্ত্রিত বাঙালী সভ্য দেশীয় পরিচ্ছদে প্রদর্শনীতে এসেছিলেন, সমসাময়িক সংবাদপত্রে দেশী পরিচ্ছদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল নূতন চিত্রকরদের ছবি সাধারণের সামনে প্রদর্শিত করার সুযোগ দেওয়া এবং চিত্রকরদের পৃষ্ঠপোষকতা করা। যাঁদের উদ্যোগে এই সংঘের গোড়া পত্তন হয়েছিল তাঁরাই ছিলেন প্রথম এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক। দীর্ঘকাল এই অল্প কয়জন পৃষ্ঠপোষক নূতন দলের চিত্রকরদের সকল দিক দিয়ে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। যাঁরা এই সংঘের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁদের একদল ছিলেন ধনী আধুনিক ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বদেশী মনোভাবাপন্ন বাঙালী এবং অপর দল ছিলেন উডরফ, নিবেদিতা, হ্যাভেলের ন্যায় ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত বিদেশী। সত্যকারের শিক্ষিত সাধারণের সঙ্গে যোগ স্থাপন করবার পথে এই সংঘের চেয়ে প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তা বেশি মূল্যবান। সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পত্রিকার সাহায্যে অবনীন্দ্রনাথের অনুবর্তী চিত্রকরদের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে বহু চিত্র রসিক আছেন, যাঁদের আধুনিক ভারতীয় চিত্রের সঙ্গে পরিচয় প্রবাসী বা Modern Review মারফৎ। পত্রিকার সাহায্যে নূতন আদর্শের ছবি যেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তেমনি ছবির ভাবের ব্যাখ্যা আরও মনোরম ছিল। Indian art Society-র দেয়ালে ঝোলানো ছবির প্রদর্শনী তখন খুব অল্প লোকেই দেখতেন।

Oriental art Society-র প্রতিষ্ঠার প্রায় দশ বৎসর পরে এই কেন্দ্রে ভারতীয় আদর্শে চিত্রবিদ্যা শেখানোর ব্যবস্থা হয়। Oriental Societyর প্রথম শিক্ষক নন্দলাল বসু। অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবের আর একটি দিক বোঝা যাবে Societyর ছাত্রদের কাজের মধ্য দিয়ে। সোসাইটির ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, বীরেশ্বর সেন, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী সারদাচরণ উকিল, পুলিন দত্ত ও জি নাটেশান প্রভৃতি। সাধারণ রুচি (Popular Test)কে এঁরা যে প্রভাবান্বিত করেছেন এবং Popular Test যে এই সব চিত্রকরদের খুবই প্রভাবান্বিত করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সব চিত্রকর যদিও অবনীনাথের অঙ্কন রীতিই গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে এদের শিক্ষা নন্দলালের কাছে। একই সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের প্রভাব এই সব চিত্রকরদের মধ্যে দেখা যায়। জাপানী প্রভাবের আলোচনা পূর্বেই হয়েছে; কিন্তু সত্যকারের জাপানী নিকৃষ্ট প্রভাব এবং বিলাতি Illustrationএর অনুকরণ এই সময়ের কয়েকজন চিত্রকরের মধ্য দিয়েই এসেছে।

বীরেশ্বর সেন, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এবং পরলোকগত সারদাচরণ উকিল -বিশেষভাবে বীরেশ্বর সেন ও দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর কাজে জাপানী প্রভাব বলতে আমরা যা দেখি, সে জিনিস সত্যকারের আধুনিক জাপানী ধাঁচের বিলাতি Illustrationএরই নকল। অবনীন্দ্রনাথের অনুগামী বলে খ্যাত এই দুই চিত্রকরের ওপর বিলাতি Illustrationএর প্রভাব এল কি কারণে? যেমন সাহিত্যগত ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে allegoryর দিকে আমাদের চিত্রকররা ঝুঁকে ছিলেন, তেমনি তথাকথিত বাস্তব কদর্যতাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টাই আমাদের চিত্রকরদের মধ্যে Pretty ভাব দেখা দিয়েছিল---সুন্দর (Beauty) এবং চাকচিক্য (Pretty) দুই-এর পার্থক্য কোথায় বলার এখানে দরকার নেই।

চাকচিক্যের (Pretty) প্রতি কি রকম আমাদের চিত্রকররা ঝুঁকেছিলেন, Indian art Society-র ১৯১৬-১৯১৯ সালের চিত্রকরদের মধ্যে তা প্রথম দেখা যায়। অজন্তার গহনা মোরাল ছবির সোনা ব্যবহারের অনুকরণ ইত্যাদি, কতকগুলি অলঙ্করণ রীতি এইসব চিত্রকর ছবির থেকে বাছাই করে, ছবি অলংকৃত করবার চেষ্টা করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবে যেমন ছবি কাব্য ঘেঁসা হয়েছিল, তেমনি এই অলঙ্করণের মনোভাব নন্দলালের অনুকরণ করতে গিয়ে এইসব চিত্রকরদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। বাইরের জগতের সঙ্গে এদের পরিচয় ছিল না, কেবল চিত্র সংস্কৃতির মধ্যে যেটুকু তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল সেইটুকুই তাঁরা প্রকাশ করেছিল, অর্থাৎ এই সব চিত্রকরদের ছবিতে ব্যক্তিগত রুচি প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। এই সময় বিখ্যাত ফরাসী আলঙ্কারিক চিত্রকর এডমন্ড ডুলাকের মধ্যে বীরেশ্বর সেন তাঁর আদর্শ পেয়েছিলেন। এডমন্ড ডুলাকের ছবির প্রভাব ও অনুকরণ দুইই বীরেশ্বর সেনের ছবিতে পাওয়া যাবে। প্রকৃতির সঙ্গে যোগ ছিন্ন হওয়ায় কি অবস্থা হয় বীরেশ্বর সেন এবং অবনীন্দ্রনাথের অনুগামী বহু চিত্রকরের নাম দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। দেবীপ্রসাদের মনোবৃত্তি অত্যন্ত বাস্তব ধর্মী। কিছুকালের জন্য অবনীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের ছবি অর্থাৎ ১৯২০ সালের অঙ্কন ভঙ্গী তিনি অনুকরণ করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের ছবির আলোছায়ার সমাবেশ ইত্যাদি গুণ এই চিত্রকরকে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু এদিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে বুঝতে পারা কেন দেবীপ্রসাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, তা অবনীন্দ্রনাথের স্টাইলের সম্বন্ধে পূর্ব আলোচনাতে বলা হয়েছে। ছবির আলোছায়া সত্ত্বেও এবং আলংকারিক রূপ প্রধান না হলেও অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে আলংকারিক বাঁধন বিশেষভাবে বর্ণের আলংকারিক বিন্যাস তিনি একেবারে উপেক্ষা করেন নি। অবনীন্দ্রনাথের আলোছায়া অনুকরণ করবার চেষ্টায় দেবীপ্রসাদের ছবি যা রূপ পেল তার সঙ্গে বিলাতি ছবির তফাৎ অল্পই। এ ছাড়া ইংরেজ চিত্রকর Russel Tuintএর ছবি এবং জাপানি জনপ্রিয় ছবির প্রভাব তার মধ্যে সহজেই পাওয়া যাবে। এই দুই চিত্রকরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম এইজন্য যে, আমাদের মধ্যে Prettyness এবং নূতন করে Naturalism-এর ঝোঁক এনেছিল প্রধানত এই দুই চিত্রকর। Indian Art Societyতে যেসব চিত্রকর যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সকলের তুলনায় প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছবিতে সত্যকারের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তাঁর ছবির প্রধান রসগ্রাহী, কবি ও চিত্রসমালোচক J. H. Cussins প্রমোদকুমারের ছবিকে ভাবের দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। সে দিক দিয়ে না দেখলেও প্রমোদকুমারের ছবির আলংকারিক গুণ তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে কমই পাওয়া যায়।

এইবার অবনীন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারতীয় শিল্পের ধারা ও পরিণতি সম্বন্ধে মীমাংসায় পৌঁছানো যেতে পারে। প্রথম যুগের চিত্রকরদের কাছ থেকে এসেছে সাহিত্য বা দার্শনিক চিন্তাকে অনুকরণ করার চেষ্টা, তারি প্রভাবে এসেছে allegory। সাহিত্যিকদের সমালোচনার মধ্য দিয়ে ছবির লিরিক গুণ দেখাতে গিয়ে ছবির বিষয় ব্যাখ্যা শুনতেই আমরা অভ্যস্ত হয়েছি।

অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথের স্টাইলের প্রভাবে ছবিতে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়েছে Surface Qualityর পরিবর্তে Natural Effectএর দিকে চিত্রকরদের আকৃষ্ট করেছে। আবার Naturalism বিজাতীয় এই আদর্শ সামনে থাকায় Natureএর রূপ কে

দেখা হয় নি, কেবল অবনীন্দ্রনাথের ছবির কতকগুলি Mannerism-এর অনুকরণ হয়েছে। সেইজন্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল ব্যতীত অবনীন্দ্রনাথের সমস্ত অনুবর্তিদের চিত্রের বর্ণ প্রয়োগের পার্থক্য দৈবাৎ দেখা যায়। সবশুদ্ধ মিলিয়ে দেখা যায় Naturalism এবং ভাবের দৈন্য দূর করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ধারায় অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে সাহিত্যিক ব্যাখ্যা শোনা ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখবার কিছু নেই, বিশেষভাবে যেখানে কবির ভাবকে চিত্রিত করার চেষ্টা না করে আখ্যান বস্তুকে কেবলমাত্র রূপের সাহায্যে প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। যেমন শৈলেন দে অঙ্কিত মেঘদূতের চিত্রাবলীতে এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের প্রচারিত আদর্শের বিকৃতি কি কারণে ঘটেছিল সেই দিকটাই প্রধান করে দেখানো হল। এইবার অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার ক্রম পরিবর্তনের পরিচয় দিলে অবনীন্দ্রনাথও তার অনুবর্তিদের মধ্যে ব্যবধান আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

১৯১০ সালে অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের স্টাইলের পরিণতির পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি। ওমর খৈয়ামের চিত্রাবলীতে যেমন তার স্টাইলের পরিণতি ঘটেছে তেমনি তাঁর ছবির একটি অধ্যায়ের শেষ এইখানেই। কারণ ওমর খৈয়ামের কাল পর্যন্ত যেটুকু সাহিত্যের অবলম্বন ছিল ১৯১১ সালের আঁকা ছবিতে তার ব্যতিক্রম দেখি। এই সময়ের ছবিতে পারিপার্শ্বিক জগৎ ও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশেষভাবে ১৯১১ সালে পুরী ভ্রমণের পর অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে বিষয়ের বিচিত্রতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'কাজরী নৃত্য', 'দেবদাসী' বঙ্গ রঙ্গালয়ে নটনটীর ব্যঙ্গ চিত্রাবলী, বহুদৃশ্য চিত্র, জীব জন্তুর চিত্র, রবীন্দ্র নাট্য ফাল্গুনীর চিত্রাবলীর কোনটিই কাব্য ঘেঁসা অথবা allegory নয়। প্রতিদিনের দেখা পরিচিত জগৎকেই তাঁর অনুভূতির রসে সিক্ত করে প্রকাশিত করেছেন। তারপর ১৯২০-৩০ সাল পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের আর এক নূতন অধ্যায়। এই সময় চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে বর্ণের সংযোগ এবং ঔজ্জ্বল্যের দিকে নূতন করে দৃষ্টি দিয়েছেন দেখা যায়। বিষয় যেমনই হোক, পোট্রেট অঙ্কনের প্রতি অবনীন্দ্রনাথের মন যে আকৃষ্ট হয়েছে নিঃসন্দেহে সে কথা বলা চলে। 'ত্রয়ী' (গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, এণ্ড্রুজ) 'শিব শিমন্তিনী,' 'আলমগীর' এবং এই সময়ের ছবি যে কোন নামেই পরিচিত হোক, ছবির মূল আকর্ষণ পোট্রেট। অর্থাৎ এই সময়ে বিচিত্র গঠনের মুখ ও মুখের বিচিত্রভাব অবনীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। অবনীন্দ্রনাথের মন পোট্রেটের প্রতি কতদূর আকৃষ্ট হয়েছে কয়েক বৎসরের ব্যবধানে আমরা তা

অশোক বনে সীতা — শিল্পী : অসিতকুমার হালদার

আরও স্পষ্টরূপে দেখেছি। তার দৃষ্টান্ত আছে ১৯২৫ সালের মধ্যে অঙ্কিত Pastel Portrait গুলিতে।

এই সময়ের Pastel Portraitগুলির বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন এইজন্য যে, প্রথম যুগের আদর্শের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার মনোভাব ছিল, যে মনোভাব নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ 'ভারত শিল্প' লিখেছিলেন, ধীরে ধীরে তিনি সেই বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন।

তারপর অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের অভাবনীয় পরিবর্তন আমরা পাই তাঁর ১৯৩০ সালের অঙ্কিত আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলীতে। আরব্য উপন্যাসের বাধাহীন কল্পনা সম্ভব অসম্ভবে জড়িয়ে আশ্চর্য কল্পনার জগৎ তৈরী হয়েছে, ঘটনার সমাবেশের জন্য যার তুলনা নেই। অবনীন্দ্রনাথের আরব্য উপন্যাসের চিত্রের মধ্য দিয়ে আর এক কল্পনার জগতের সাক্ষাৎ আমরা পাই। একান্তভাবে রূপে বর্ণে যা প্রকাশিত হয়েছে যে কল্পলোক থেকে আরব্য উপন্যাসের সৃষ্টি, সেই জগতেরই আলোকজ্জ্বল বিচিত্র জীবনকে যেন আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। লেখকের ভাষায় যা প্রকাশিত হয়নি, ছবিতে তারি সাক্ষাৎ আমরা পাই, এই আশ্চর্য কল্পনাশক্তি অবনীন্দ্রনাথের

একান্ত নিজস্ব। তাঁর সাহিত্য রচনায় এই কল্পনার আশ্চর্য ক্ষমতা আমরা দেখেছি। আরব্য উপন্যাসের গল্পাংশ অবনীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দিয়েছিল, তার কারণ তাঁর অসাধারণ এবং একান্ত নিজস্ব কল্পনা এবং আরব্য উপন্যাসের কল্পনা দু'এরই প্রকৃতি এক। এই ছবি-গুলির করণকৌশল বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব তাঁর প্রথম জীবনের দেশী ছবির যে আলংকারিক বাঁধন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, সেই আলংকারিক বর্ণ সংযোগ এবং বাঁধন ফিরে এসেছে। Atmosphire-এর আবরণে মিলিয়ে গেছে, অর্থাৎ spaceকে দেখাবার চেষ্টা নেই। Surfaceএর মূল্যই প্রধান হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের ছবিকে যারা ব্যাখ্যার সাহায্যে বুঝবার বা বোঝাবার চেষ্টা করেন, যারা অবনীন্দ্র-নাথের ছবির সংগে কোন তত্ত্ব যুক্ত করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে চান, তারা অবনীন্দ্রনাথের ছবির প্রতি অবিচার করেন। অবনীন্দ্র-নাথের ছবির বিষয়বস্তুকে অনুভব করতে পারলেই তাঁর প্রতিভার ঐশ্বর্য আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হবে।

অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিচিত্র প্রকাশের যে ইংগিত দেওয়া হল, তার কোন দিকই তাঁর অনুবর্তিদের প্রেরণা দেয় নি। তাঁর স্টাইল ও তাঁর কল্পনার ব্যর্থ অনুকরণ কিভাবে হয়েছে তার পরিচয় আমরা পূর্বে দিয়াছি। এই ব্যর্থ অনুকরণের মধ্য দিয়েই অবনীন্দ্র-নাথের আদর্শ জনপ্রিয় হয়েছে, অর্থাৎ রুচির আদর্শ তৈরী করেছেন তাঁর অনুকারকরা এবং সেই রুচির আদর্শ নিয়েই অবনীন্দ্রনাথকেও বিচার করা হয়েছে। তাই সাহিত্যিক ব্যাখ্যার সাহায্যে ভারতমাতা, 'পদ্মপাত্রে অশ্রুবিন্দু,' 'আলমগীর' জনপ্রিয় হয়েছে। যেখানেই তাঁর চিত্র রচনা ব্যাখ্যার গণ্ডি ছাড়িয়ে অনুভবের ক্ষেত্রে পৌঁছেছে সেখানে তাঁর ছবির রসিক আজও অতি অল্প। তেমনি অবনীন্দ্রনাথের সংগে তার অনুবর্তিদের অবস্থার পার্থক্য এইখানে। অনুবর্তিরা সাময়িক রুচিকেই অনুসরণ করেছিলেন। প্রত্যেক প্রতিভাবান রসস্রষ্টা এবং তাঁর অনুবর্তিদের মধ্যে এই পার্থক্য চিরকালের। একজন চাহিদা আনে, অন্য দলের কাছে চাহিদা আসে, তাঁরা তাই পূরণ করেন। ভারতীয় চিত্রের সমজদার পৃষ্ঠপোষকের চাহিদাকে উপেক্ষা করবার মত ব্যক্তিত্ব এই সব চিত্রকরের থাকলে ভারতীয় শিল্পে অবনীন্দ্রনাথের আন্দোলনের এই অবস্থা কখনই হোত না।

পরলোকে মহাদেব দেশাই

মহাত্মা গান্ধীর সহিত মহাদেব দেশাইয়ের শেষ ছবি : বোম্বাইয়ের নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতিতে মহাত্মার সহিত কংগ্রেস প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন

সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীযুত মহাদেব দেশাই গুজরাটের অন্তর্গত সুরাট জেলার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে তিনি এম এ পাশ করেন। ইহার দুই বৎসর পর ওকালতী পাশ করিয়া তিনি আমেদাবাদে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তখন হইতে বরাবর তিনি মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী-রূপে কাজ করিয়া আসিতেছেন। মহাত্মাজীর অন্তরংগ সহচরদের মধ্যে তিনি একজন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি 'হরিজন' পত্রিকা ও এলাহাবাদের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' কাগজের সম্পাদক, 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও 'নবজীবন' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং এক বৎসরের জন্য হোমরুল লীগের অর্গেনাইজিং সেক্রেটারী ছিলেন। শ্রীযুত মহাদেব দেশাই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করেন। লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে তিনি উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মাজীর সংগে তিনিও গ্রেপ্তার হন। অনেকবার তিনি কারাবরণ করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের জন্য অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কিত আপত্তিকর ইস্তাহার প্রচারের অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাঁহার ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও দুইশত পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়।

শ্রীযুত দেশাই বার্দোলী সত্যাগ্রহের ইতিহাস, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জীবনচরিত এবং 'টু সার্ভেণ্টস অব গড' নামে সীমান্ত গান্ধী ও তাঁহার ভ্রাতা খান সাহেব সম্বন্ধে বই লিখেন। গুজরাটি ভাষায় গদ্য লেখকদের মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। শ্রীযুত মহাদেব দেশাই ভাল বাংগলা জানিতেন। গান্ধীজী মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনিতে চাহিলে তিনি গুজরাটি ভাষায় [illegible] কবিতা অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। মহাত্মা এণ্ড্রুজ ও রবীন্দ্রনাথের শেষ অসুখের সময় তাঁহাদের খবর জানিবার জন্য গান্ধীজী তাঁহাকে বাংগলা দেশে পাঠাইয়াছিলেন। বহু সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থের তিনি গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী, একমাত্র পুত্র ও কন্যা বিদ্যমান আছেন।
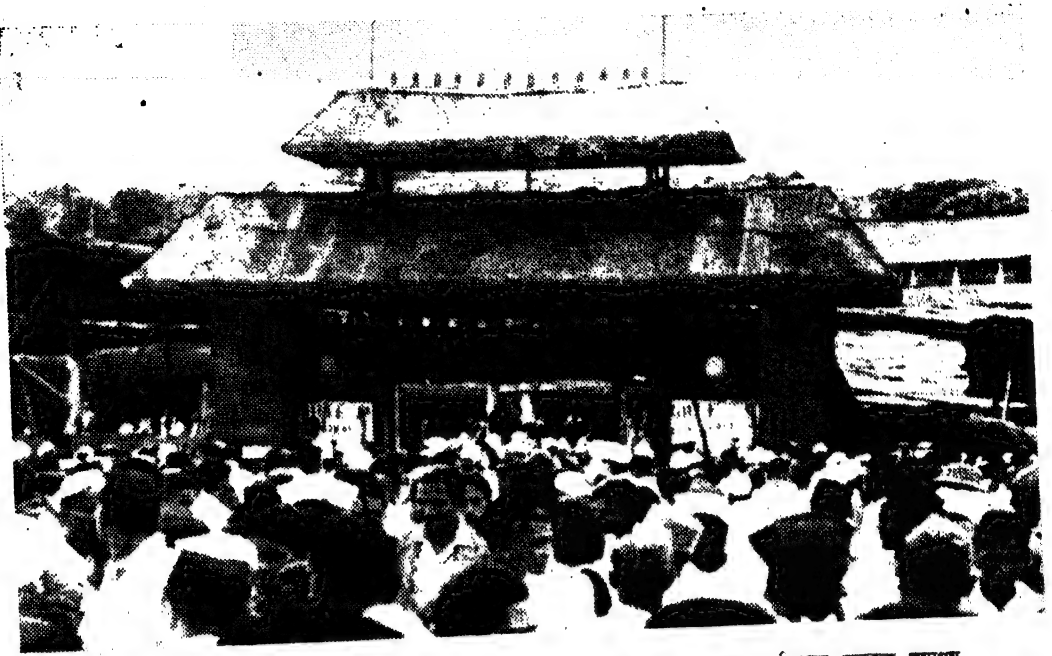
বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সংঘের অধিবেশনের দৃশ্য : সভামণ্ডপের সম্মুখে বিপুল জনতার সমাগম

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সংঘের অধিবেশনে 'বন্দেমাতরম' গানের সময় দণ্ডায়মান নেতৃবৃন্দ।
বামদিক হইতে : পণ্ডিত নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, মহাত্মা গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি আজাদ

বৃদ্ধ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

প্রশ্ন জাগে মনে
এখনো রয়েছি বেঁচে কেন, কী কারণে ?
এ জীবনে কি কাজ আমার
যার লাগি এখনো লভিনি বহিষ্কার
এ সংসার হ'তে লোকান্তরে ?
আমার জীবন দীপ আজিও নিষ্কম্প শিখা ধরে,
হই অন্তঃসার শূন্য জরাজীর্ণ, ভগ্ন অকিঞ্চন
তথাপি শমন
এখনো আসেনি কেন লইতে আমারে
পরপারে ?
শুনেছিনু 'গ্রীষ্মকালে দীর্ঘদিন শীতে বিভাবরী,
পরপীড়কেরা প্রায় বেঁচে রয় বহুকাল ধরি'।
তাই কি রয়েছি হেথা অপরেরে শুধু দুঃখ দিতে,
অন্য কোনো কাজ নাই মোর তরে এই ধরণীতে ?

সত্য বটে, আছে মোর বাঁচিবার সাধ,
আছে শত অপরাধ
যার তরে দুঃখ পাই নিজে আর দুঃখ দিই পরে,
তবু জানি রয়েছে অন্তরে
উপবাসী প্রেম
আলস্যে ঔদ্ধত্যে স্বার্থপরতায় তারে হারালেম।
আজি এ বুভুক্ষু প্রাণ নম্র অনুরাগে
দিতে চায় নিতে চায় প্রাণরস, তাই ভিক্ষা মাগে
আয়ু, শুভ যোগাযোগ, খণ্ডিতে অন্তিম প্রতিকারে
পূর্বকৃত দুরাচার পাপ,
চিত্তে মোর জাগে অনুতাপ,
আত্মপরে জুড়াইতে চাই,
বাঁচার মতন যেন কর্মে প্রেমে বাঁচিবারে পাই।

জীবনের প্রারম্ভে

প্রায় দুইশত কোটী বৎসর পূর্ব থেকে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে গ্রহরূপে বিরাজমান। পৃথিবীতে কি জীবনের লক্ষণ

এ দুটী গাছের পাতা নয় প্রজাপতি

ঐ সময় থেকেই দেখা দিয়েছে? না। কেননা তখন পৃথিবী জ্বলন্ত পিণ্ডমান ছিল। ঠিক সূর্যের মত অবস্থা ছিল তার। লৌহ পরিশোধনের নিমিত্ত চুল্লীর ভিতরের অবস্থার ন্যায় তখন পৃথিবীতে ছিল উত্তাল তরঙ্গ আর বিপুল অগ্ন্যুচ্ছ্বাস। লক্ষ লক্ষ বৎসর পৃথিবীর অবস্থা এই ভাবে চলেছিল আর পৃথিবী ধীরে ধীরে তাপ হারাতে লাগল। ভীষণ জ্বলন্ত পিণ্ড ক্রমে কঠিন আকার ধারণ করল। আমরা যে বিশাল জলরাশি এখন দেখতে পাই তা তখন অতি উত্তপ্ত বাষ্পমাত্র ছিল। পৃথিবী ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস এবং বাষ্পও ঠাণ্ডা হ'তে লাগল। বাষ্প থেকে মেঘ এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি সম্ভব হ'ল। এই জলরাশি ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রস্তর ধৌত ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগল অথবা এক স্থানে জমতে লাগল। এইরূপে পৃথিবীতে দেখা দিল বিভিন্ন জলরাশি।

এই তো গেল পৃথিবীর গোড়ার কথা, কিন্তু প্রাণ এলো কোথা থেকে? তখন জড় পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। এই জড় থেকে প্রাণের সৃষ্টি কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল?

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীশ্চান প্রভৃতি ধর্মবাদী বিশ্বস্রষ্টাকেই সকল রকম প্রাণের আবিষ্কর্তারূপে মনে ক'রে আগের প্রশ্নের কিছু উত্তর সংগ্রহ করলেন। তাঁদের মতে গাছ, লতা, কীট-পতঙ্গ, মাছ, জন্তু, পাখী, মানুষ প্রভৃতি এক দিনেই সৃষ্টি হয়েছিল। এইরূপে কল্পনার সাহায্যে পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম স্পন্দন নির্ণয় করা সম্ভবপর বটে, কিন্তু বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সত্যের সম্মুখীন হ'লে উপরোক্ত মতবাদসমূহ সম্পূর্ণ অলীক বলেই প্রতিপন্ন হবে। ভূমধ্যস্থ প্রস্তরসমূহে পুরাতন জীবগণের যে চিহ্ন পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে আধুনিক জীবগণের অসাদৃশ্যই বেশী ক'রে লক্ষ্য হয়। সুতরাং আজিকার মানুষ বিশ্বস্রষ্টা কর্তৃক পুরাতন জীবগণের সঙ্গে একত্রে সৃষ্ট হয় নাই—কেননা মানুষের ইতিহাস প্রাণের ইতিহাসের তুলনায় অল্প কয়েক যুগের।

বৈজ্ঞানিকগণ অবশ্য আজও ঠিক ক'রে বলতে পারে না কবে এবং কি ক'রে জড় থেকে জীবের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারউইন সাহেবের মতে পৃথিবীর প্রথম জীব অপরিস্ফুট আকারের ছিল এবং ইহা ছিল অতি সূক্ষ্ম এবং অপরিণত। এই জীবটীর মাত্র একটি কোষ ছিল। প্রাণীদেহের কোনও অংশ যদি সূক্ষ্মভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়, তবে সেই অংশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর দেখা যায়। ইহার প্রত্যেকটিকে একটি কোষ (Cell) বলে। মানবদেহে এইরূপ কোটী কোটী কোষ আছে। কিন্তু প্রথম জীবটির মাত্র একটি কোষ ছিল। কোষের উপাদানে জলের ভাগ সবচেয়ে বেশী। সুতরাং ডারউইনের মতবাদ হিসাবে বলা যায় যে, প্রথম জীবন সম্ভব হয়েছিল জলে।

বিভিন্ন জীবের রক্তের জলীয় ভাগ (Serum)-এর উপাদান প্রায় অল্পবিস্তর সমুদ্রের জলের উপাদানের সঙ্গে এক। (অবশ্য জীবন আরম্ভ হবার সময়কার সমুদ্রের জলের উপাদান এখানে বুঝতে হ'বে। সমুদ্রের জলে বিভিন্ন প্রকারের লবণ আছে, তাদের হ্রাস বৃদ্ধিই সমুদ্র জলের বিভিন্নতার কারণ। এখানকার সমুদ্রের জল, আগেকার সমুদ্রের জল থেকে বিভিন্ন।) সে হিসাবেও মনে করা যেতে পারে যে, জীবনের উৎপত্তি হ'য়েছিল জলে—সমুদ্রের জলে।

প্রথম জীবন সম্বন্ধে আজকাল ডারউইনের মতবাদ সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। এই মতবাদ সকল রকম বৈজ্ঞানিক সত্যের সম্মুখীন হ'তে পারে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম, এ ডি-লিট

কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, দেশে সাহিত্য সম্মেলনের ত অভাব নাই,—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ন্যায় বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এখনও বর্তমান আছে, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন রহিয়াছে, বঙ্কিম সাহিত্য সম্মেলন আছে, তাহা ছাড়া আরও আছে রবীন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ, বিভিন্ন জেলার সাহিত্য সম্মেলন, বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃক অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলন এবং আরও কত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্য বাসর ও সাহিত্য সম্মেলন। এতগুলি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান বর্তমান থাকিতে আবার পৃথকভাবে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, দেশে বহু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান আছে,—একথা সত্য এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বারা যে বঙ্গভাষা ও বাঙলার সংস্কৃতির প্রসারের যথেষ্ট সাহায্য হইতেছে একথাও সত্য; কিন্তু বঙ্গভারতীর কণ্ঠহারের মধ্যমণিস্বরূপ যে বৈষ্ণব সাহিত্য, এই সকল সাহিত্য সম্মেলনে তৎসম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা প্রায়ই হয় না। সাহিত্য সম্মেলন মাত্রেরই এখন অনেকগুলি করিয়া শাখা ও উপশাখা থাকে; যথা,—সাহিত্য শাখা, কথা-সাহিত্য শাখা, লোক-সাহিত্য শাখা, শিশু-সাহিত্য শাখা, মহিলা-সাহিত্য শাখা, গীতি সাহিত্য শাখা, দর্শন-শাখা, বিজ্ঞান-শাখা, অর্থনীতি-শাখা, ইতিহাস-শাখা এবং আরও কত কি। কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্য শাখার অস্তিত্বের সন্ধান কোথাও বড় একটা মিলে না। প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন স্থানে বৈষ্ণব কবিগণের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হয় বটে, কিন্তু সাহিত্য জগতে বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের বিরাট অবদানের তুলনায় তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং বৈষ্ণব লেখকগণের দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্যের সবিশেষ আলোচনা ও প্রচারের জন্য পৃথকভাবে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের আবশ্যকতা যে আছে, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

ইহার পর স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, বৈষ্ণব সাহিত্য বলিতে আমরা কি বুঝি? সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ না করিয়া স্থূলভাবে বলা যাইতে পারে যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করিয়া বাঙলাদেশে যে বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই নাম বৈষ্ণব সাহিত্য। ভাষার দিক দিয়া ইহার দুইটি বিভাগ—একটি সংস্কৃত, অপরটি বাঙলা। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ দাস ও শ্রীগোপাল ভট্ট এই পঞ্চ গোস্বামী এবং মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর, রায় রামানন্দ, প্রবোধানন্দ সরস্বতী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণের রচিত অতি উপাদেয় সংস্কৃত গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন না করিলে বৈষ্ণব সাহিত্যের রস সম্পূর্ণ আস্বাদন করা যায় না। সুতরাং বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনে গোস্বামী ও মহান্তগণের সংস্কৃত গ্রন্থাবলীরও যাহাতে সম্যক্ আলোচনা হয়, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্তব্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সংস্কৃত সাহিত্যের এই বিরাট অংশ সাধারণ পণ্ডিতমণ্ডলীর ও শিক্ষা বিভাগের কর্ণধারগণের দ্বারা এক প্রকার অনাদৃত হইয়াই আছে। কিছুকাল পূর্ব হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষায় ও বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতির উপাধি পরীক্ষায় বৈষ্ণবদর্শন অন্যতম পাঠ্য বিষয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র ঐ বিষয় পরীক্ষা দিয়া থাকেন। গোস্বামিগ্রন্থের আলোচনা ও প্রচারের পক্ষে ইহা আদৌ পর্যাপ্ত নহে। অপর দিকে বহুকাল হইতে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ ও বি-এ পরীক্ষার জন্য কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য, শিশুপাল বধ প্রভৃতি কাব্য ও শকুন্তলা, রত্নাবলী, কিরাতার্জুনীয়, বিক্রমোর্বশী প্রভৃতি নাটকের পঠন-পাঠন চলিয়া আসিতেছে। অথচ সেখানে রূপগোস্বামীর হংসদূত ও উদ্ধব-সন্দেশ-এর ন্যায় কাব্য, ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব-এর ন্যায় নাটক, জীব গোস্বামীর মাধবমহোৎসব কাব্য, কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী কাব্য প্রভৃতির স্থান নাই। এই অবাঞ্ছিত অবস্থার যাহাতে আশু প্রতিকার হয়, সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার জন্য আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়িতেছে। বহু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির প্রদত্ত অর্থে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ও গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনেকগুলি লেকচারার বা বিশেষজ্ঞের পদ সৃষ্ট হইয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনার জন্য এইরূপ কোন ব্যবস্থা আজও হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে স্বনামখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তার পর এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন কিছুর পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বৈষ্ণব সমাজে বিত্তশালী ব্যক্তির অভাব নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ প্রদান করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচারের পথ যে সুগম ও প্রশস্ত হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশদ আলোচনা আপনারা এই সম্মেলনের মূল সভাপতি ও বিভিন্ন শাখার সভাপতিগণের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিবেন। আমি শুধু এখানে উহার কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শনের চেষ্টা করিব।

কালের পৌর্বাপর্য বিচারে বৈষ্ণব সাহিত্যকে তিনটি বিভিন্ন যুগে ভাগ করা যাইতে পারে,—(১) প্রাক্-চৈতন্য যুগ, (২) চৈতন্য-যুগ ও (৩) চৈতন্যোত্তর যুগ।

প্রাক্ চৈতন্য যুগের বা শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবি মাত্র চারিজন: জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও মালাধর বসু বা গুণরাজ খান। বিদ্যাপতি মিথিলার অধিবাসী হইলেও, বাঙালী কোনদিনই তাঁহার উপর নিজের দাবী ছাড়ে নাই এবং ছাড়িবেও না। কান্তকোমল পদাবলীর রত্নখনি জয়দেবের গীত-গোবিন্দ পদাবলী সাহিত্যের অগ্রদূত; আর চণ্ডীদাসের ত তুলনাই নাই। তাঁহার গীত এখনও বাঙালী মাত্রেরই "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" প্রাণ আকুল করিয়া তোলে। অবশ্য বর্তমানে বহু চণ্ডীদাসের সমস্যা দেখা দিয়াছে। কিন্তু চণ্ডীদাস বলিতে আমরা বুঝি সেই প্রেমিক কবিকে, যাঁহার প্রাণরসে ভরপুর গান শুনিয়া দারুণ বিরহেও শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অনাবিল আনন্দলাভ করিতেন। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রচিত সর্বপ্রথম বাঙলা কাব্য।

যে সকল ভক্ত কবি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক অথবা অব্যবহিত পরকালবর্তী, তাঁহাদিগকে "চৈতন্যযুগের কবি" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই কবিগণের মধ্যে বৃন্দাবনের পূর্বোক্ত পঞ্চ গোস্বামী, "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত"কার বৃন্দাবন দাস, "চৈতন্য মঙ্গল" প্রণেতা লোচন দাস, "চৈতন্য চরিতামৃত" প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সুপ্রসিদ্ধ কড়চাকার মুরারি গুপ্ত, "চৈতন্যচন্দ্রামৃত" প্রণেতা প্রবোধানন্দ সরস্বতী, "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" নাটকের রচয়িতা স্বনামখ্যাত কবিকর্ণপুর, "শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল" প্রণেতা মাধব আচার্য ও "শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী" নামে পরিচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদক রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, বিখ্যাত পদকর্তা নরহরি সরকার ঠাকুর, বাসুদেব ঘোষ,

গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বসু রামানন্দ প্রভৃতির নাম বৈষ্ণব সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই সুপরিচিত। বস্তুত "শ্রীচৈতন্য যুগ"ই যে বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ, তাহা বোধ হয় সুদীর্ঘ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও গোস্বামিগণের অপ্রকটের পর হইতে বৈষ্ণবদাসের "পদকল্পতরু" সংকলনের কাল পর্যন্ত প্রায় দুইশত বৎসরের ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে যে সকল বৈষ্ণব গ্রন্থকারের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব কবি বলা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে চরিত শাখায় "প্রেমবিলাস" প্রণেতা নিত্যানন্দ দাস, "কর্ণানন্দ" প্রণেতা যদুনন্দন দাস ঠাকুর, "ভক্তি রত্নাকর" ও "নরোত্তম বিলাস"এর গ্রন্থকার নরহরি চক্রবর্তী, "বংশী শিক্ষা" রচয়িতা প্রেমদাস মিশ্র, "অনুরাগবল্লী" প্রণেতা মনোহর দাস ও বাঙলা "ভক্তমাল" প্রণেতা কৃষ্ণদাস বাবাজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পদাবলী বিভাগে জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, রায় শেখর, সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ দাস বা গোবিন্দ কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, জগদানন্দ, যদুনন্দন, উদ্ধব দাস ও রাধামোহন ঠাকুর সমধিক বিখ্যাত। বৈষ্ণব জগতের অন্যতম উজ্জ্বলরত্ন শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরকেও এই যুগের কবি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। মনীষিপ্রবর বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও এই যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। একাধারে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ভক্তির সমাবেশের জন্য বৈষ্ণব সমাজে তিনি রূপগোস্বামীর অবতাররূপে সম্মানিত। হরিবল্লভ-ভণিতাযুক্ত তৎকর্তৃক সংকলিত "ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি" পদাবলী সংগ্রহের আদি গ্রন্থ। এই যুগের অপর বৈশিষ্ট হইতেছে বাঙলা পদাবলীর সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন। সুপ্রসিদ্ধ রাধামোহন ঠাকুর স্ব-সংকলিত পদামৃত সমুদ্রের সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করিয়া বাঙলা ভাষাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ঊনবিংশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণব সাহিত্যের সহিত জনসাধারণের বিশেষ কোন সংযোগ ছিল না। উহার পঠন-পাঠন মুষ্টিমেয় ভজনানিষ্ঠ বৈষ্ণব গোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে কতিপয় সুশিক্ষিত ও ভক্ত বাঙালীর প্রচেষ্টায় বৈষ্ণব সাহিত্যের পঠন-পাঠনের পুনঃ প্রবর্তন হয়। ইহাকে বৈষ্ণব সাহিত্যের নব্যযুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগ এখনও চলিতেছে। নব্যযুগের বৈষ্ণব লেখকগণের মধ্যে "চৈতন্য চরিতামৃত" সম্পাদক স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত, গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বধামগত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, সুবিখ্যাত "অমিয় নিমাই চরিত" প্রণেতা ভক্ত প্রবর শিশিরকুমার ঘোষ ও "গৌরপদ তরঙ্গিনী" সংকলয়িতা জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনে বহু ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

কিন্তু এখনও বহু হস্তলিখিত বৈষ্ণবগ্রন্থ অপ্রকাশিত রহিয়াছে এবং কতকগুলি বিখ্যাত গ্রন্থ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর কৃষ্ণলীলামৃত, শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কৃত কড়চা, গোবিন্দ কবিরাজের সংগীতমাধব নাটক ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর "দশম চরিত"এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় মুদ্রিত বৈষ্ণবগ্রন্থ নব সংস্করণের অভাবে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। অপ্রকাশিত পুঁথির প্রকাশ, অনাবিষ্কৃত গ্রন্থগুলির অনুসন্ধান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা আশু আবশ্যক। এই তিনটি বিষয়ের প্রতি সমবেত সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে বাঙলার জাতীয় ইতিহাসের বহু উপকরণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ঐগুলি নিপুণতার সহিত সংগ্রহ করিয়া যদি পর্যায়ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় তাহা হইলে বাঙালী জাতির প্রায় ছয়শত বৎসরের একখানি সুন্দর সামাজিক ইতিহাস সংকলিত হইতে পারে। এদিকে অনুসন্ধিৎসুগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কি প্রাচীন, কি আধুনিক, যে যুগেরই হউন না কেন, এমন বাঙালী সাহিত্যিক অতি অল্পই আছেন, যাঁহার উপর বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রভাব পড়ে নাই। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া শ্যামাসংগীত রচয়িতা রামপ্রসাদ সেন ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, পাঁচালিকার দাশরথি রায় এমন কি মাইকেল মধুসূদন, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের উপর পর্যন্ত বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। বৈষ্ণব সাহিত্য বাঙলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। শিক্ষিত ও স্বদেশপ্রেমিক বাঙালী যদি দেশের এই অমূল্য সম্পদের সন্ধান না রাখেন তবে তাহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আজকাল দেশের নানাস্থানে হরিসভা ও বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠ হইতেছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে দেশের জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রচার হয়, সে কার্যে তাঁহাদেরই অগ্রণ হওয়া উচিত। আর মাত্র একটি বিষয় নিবেদন করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। কি প্রাচীন, কি আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যের উর্বর ক্ষেত্রে বহু আগাছার জন্ম হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, বৈষ্ণব সাহিত্য বৈষ্ণবধর্মের ধারক ও বাহক। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষা কৃপাপ্রাপ্ত গোস্বামী মহোদয়গণ স্ব স্ব গ্রন্থে যে সকল সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার বহির্ভূত বা বিরোধী কোন নূতন মত যে গ্রন্থে আছে, তাহা প্রকৃত বৈষ্ণব সাহিত্য পদবাচ্য হইতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আউল, বাউল ও সহজিয়া প্রভৃতি কতিপয় অপ-সম্প্রদায়ের লোকেরা রূপগোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাস ও নরোত্তম দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণের নামে এমন কতকগুলি জঘন্য গ্রন্থ চালাইয়া আসিতেছে যে, তাহা পাঠে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি মার্জিতরুচি পাঠকের অশ্রদ্ধারই উদ্রেক হয়। আধুনিক যুগেও বহু গবেষক-যশপ্রার্থী ব্যক্তি কয়েকখানি জাল বৈষ্ণবগ্রন্থকে সম্বল করিয়া বৈষ্ণবধর্মের গ্লানি প্রচার করিতেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে ক্ষেত্র হইতে এই সকল আগাছা সমূলে উপড়াইয়া ফেলার একান্ত প্রয়োজন। যে সকল বৈষ্ণব ভজনানিষ্ঠ ও সুপণ্ডিত, এ কার্য একমা তাঁহাদের দ্বারাই সম্ভব। তাঁহারা তাঁহাদের পরমপ্রিয় বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য এ বিষয়ে যত্নবান হউন, ইহ আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

পৃথিবীর সর্বত্র আজ রণদামামার নির্ঘোষ শোনা যাইতেছে শান্তি ও মৈত্রী আজ জগৎ হইতে বিলুপ্তপ্রায়। বৈষ্ণবধর্মের ভি শান্তি ও মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব সাহিত্যের বাণী, শান্তি ও প্রেমের বাণী। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেম-প্রচারক শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই বৈষ্ণব সাহিত্য মন্দিরের সর্বপ্রধান দেবতা। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে, বাঙলা দেশে ও বাঙালী জাতির মধ্যে এই প্রেমাবতারের আবির্ভাব হইয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা করিতে যাইয়া বাঙালী যদি মহাপ্রভুর প্রেমের বাণী নিজের অন্তরের মধ্যে শুনিতে পায়, তবেই বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা তাঁহার সার্থক হইয়া উঠিবে। মহাপ্রভু কর্তৃক প্রচারিত প্রেমের বাণী দেশ ও কালের ঊর্ধে। সে বাণী সকল দেশের ও সর্বকালের জন্য শ্বাশ্বত সত্য। অশান্তিময় জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আজ আবার তেমনই প্রেমাবতারের প্রয়োজন। আসুন, বৈষ্ণবপ্রবর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া মরমী বৈষ্ণব কবির ভাষায় আজ আমরাও বলি,—"হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও। বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥ —(গোবিন্দ ঘোষ)।

---

*বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

নূতন নিষেধাজ্ঞা

কিছুকাল যাবৎ ভারত সরকার বৈদ্যুতিক কারেণ্ট কম খরচ করবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে এই উপদেশ-বাণী প্রচার করছেন যে, "Switch off at Home, Switch on in Industry"। এর উদ্দেশ্য, বৈদ্যুতিক শক্তিকে আলো জ্বালিয়ে খরচ না করে জমিয়ে রাখা, যাতে সেই শক্তিকে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নিযুক্ত ক'রে ভারতের সামরিক উদ্যমকে অধিকতর বলশালী করে তোলা যায়। সিন্ধু গভর্নমেণ্ট ভারত সরকারের এই বাণীকে পালন করবার জন্য অধিকদূর অগ্রসর হয়েছেন। সিন্ধু প্রদেশের কয়েকটি ছায়াচিত্র গৃহের উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারী করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বৈদ্যুতিক কারেণ্ট বাঁচাবার জন্য ছায়াচিত্র প্রদর্শনী কমিয়ে ফেলতে হবে। অর্থাৎ যে সব চিত্রগৃহ দিনে তিনবার ক'রে শো' দিত, তারা এখন থেকে একবারের বেশী ছবি দেখাতে পারবে না। সিন্ধু সরকার হঠাৎ কেন যে এই নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তা বুঝে ওঠা দুষ্কর, তবে এই নিষেধাজ্ঞার ফলে যে স্বল্প পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি বাঁচবে, তাতে গভর্নমেণ্টের সমর-শক্তি-বৃদ্ধির কতটুকুই বা কাজে আসবে সে প্রশ্নই বার বার মনে জাগছে।

সিন্ধু গভর্নমেণ্টের এই সিদ্ধান্তকে স্থিরমস্তিষ্কে যদি বিচার করে দেখা যায়, তাহলে আমরা দেখি যে, সিনেমা প্রদর্শনী বন্ধ করে বৈদ্যুতিক কারেণ্ট বাঁচিয়ে ভারতের সমর-প্রচেষ্টার যতটুকু না লাভ হবে তার শতগুণ বেশী লোকসান হবে এই সব ভারতীয় ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির। ভারতের সিনেমা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ইতিমধ্যে নানা সরকারী নিষেধাজ্ঞা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে, তার উপর এই সব নতুন ও উদ্ভট নিষেধাজ্ঞার বোঝা তাদের পক্ষে ক্রমশই মারাত্মক হয়ে উঠবে। বিশেষ করে সিন্ধু প্রদেশের সিনেমা প্রতিষ্ঠান যখন এখনও শৈশবাবস্থায়, সুতরাং এই ধরণের নিষেধাজ্ঞা এই প্রদেশের পক্ষে ক্ষতিকর। ভারত সরকারের এই সমরোদ্যমের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলবার নেই, কিন্তু ভারতের এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করাকে আমরা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি না। সিন্ধু গভর্নমেণ্টের এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সেই কারণে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

ছায়াচিত্র সংবাদ

শ্রীসুশীল মজুমদারের পরিচালনায় এম পি প্রডাকসন্সের
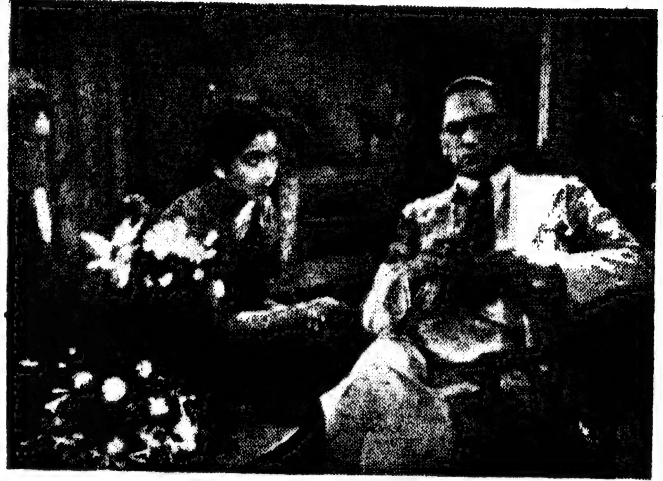
ভারতলক্ষ্মীর আগত 'জীবন সঙ্গিনী' চিত্রের কোন একটি দৃশ্যে প্রতিমা দাশগুপ্ত এবং ছবি বিশ্বাস

পরবর্তী ছবির কাজ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শুরু হয়েছে। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন কানন, জ্যোতিপ্রকাশ ও অহীন্দ্র প্রভৃতি।

* * * * * * * *

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র ভদ্রের পরিচালনায় উইরেকা পিকচার্সের প্রথম চিত্র 'স্বামীর ঘরের' নিয়মিত সুটিং আরম্ভ হয়েছে। এই ছবিতে নরেশ মিত্র, কানু বন্দ্যো, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি রয়েছেন।

* * *

চিত্ররূপ লিমিটেডের প্রথম চিত্র 'বন্দিনী' শ্রীযুত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলেছে। দুই মাসের মধ্যে ছবির অর্ধেক কাজ শেষ করে আনা হয়েছে। এই ছবিতে একটি বিরাট খেলার দৃশ্য তোলা হয়েছে যা দর্শকদের কাছে নূতনত্ব দিতে পারবে। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন জহর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, রেণুকা, শান্তি, নরেশ মিত্র প্রভৃতি।

ই আগস্ট

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, ক্রেটস্কায়া াকায় জার্মানদের সোভিয়েট ব্যূহ ভেদের বে-পরোয়া চেষ্টা ব্যর্থ রয়া দেওয়া হয়। কোটেলনিকোভোর উত্তর-পূর্বে সোভিয়েট হিনী প্রবল আক্রমণ চালাইয়া প্রতিপক্ষের সমূহ ক্ষতি সাধন করে। ান এলাকায় জার্মান অগ্রগতি বহুলাংশে মন্থর হইয়া আসিয়াছে। ইকপ এলাকায় জার্মান আক্রমণ প্রতিহত হয়। ককেশাস পর্বত-ার উত্তর সানুদেশে যুদ্ধ চলে।

মিঃ চার্চিল

মঃ স্ট্যালিন

লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ব্রিটিশ বিমানবাহী াহাজ "ঈগল" (২২৬০০ টন) ভূমধ্যসাগরে একটি ইউবোটের াক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে।

গতকল্য কিয়াংসি প্রদেশে জাপ বিমানঘাঁটি নানচাংয়ের উপর ার্কিন বোমারু বিমানসমূহ হানা দেয়।

চুংকিংয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে চীনা সামরিক মুখপাত্র ানান যে, ফুকিয়েন অভিযানের জন্য জাপানীরা তোড়জোড় রিতেছে।

১৩ই আগস্ট

রুশ রণাঙ্গন—মস্কো রেডিওতে ঘোষণা করা হয় যে, জার্মান-গণ ভরোনেজ অঞ্চলে আরও পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। চেরকাস্ক অঞ্চলে সোভিয়েট সৈন্যদল পিছু হটিয়া নূতন ঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মার্শাল টিমোশেঙ্কোর ট্যাঙ্ক বাহিনী কোটেলনিকোভো অঞ্চলে জার্মানদিগকে পরাজিত করিয়াছে। স্ট্যালিনগ্রাদ অঞ্চলে জার্মানদের প্রবল আক্রমণ সত্ত্বেও সোভিয়েট প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চুংকিং-এর সংবাদে বলা হয় যে, জনৈক সামরিক মুখপাত্র আজ প্রকাশ করিয়াছেন যে, টনকিন উপসাগরে জাপানীরা যে সমস্ত জাহাজ সন্নিবেশ করিয়াছে, ঐগুলিতে তাহাদের বিশ সহস্রাধিক সৈন্য রহিয়াছে। লিনচোয়ান সম্পর্কে উক্ত মুখপাত্র বলেন যে, চীনাগণ লিনচোয়ান শহরের দুই কিলোমিটারের মধ্যে রহিয়াছে। লিনচোয়ানে জাপানীদের মোট সৈন্যসংখ্যা বিশ সহস্রাধিক হইবে বলিয়া মুখপাত্র অনুমান করেন।

১৪ই আগস্ট

রুশ রণাঙ্গন—রয়টারের সংবাদদাতা জানাইতেছেন, জার্মানরা রেল লাইন ধরিয়া কাস্পিয়ান সাগর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে বটে, তবে সোভিয়েট বাহিনী এখনও প্রচণ্ডবিক্রমে উত্তর-পশ্চিম ককেশাসে, মধ্য কুবানে তাহাদের ঘাঁটিসমূহ রক্ষা করিতেছে। কোটেলনিকোভোর উত্তর-পূর্বে সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনীর প্রবল গোলা বর্ষণের ফলে জার্মানরা তাহাদের বিরাট ট্যাঙ্ক আক্রমণ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে বাধ্য হয়।

ব্রিটিশ নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গত কয়েকদিন যাবৎ পশ্চিম ও উত্তর ভূমধ্যসাগরে নৌযুদ্ধ চলিতেছে। সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ক্রুজার 'ম্যাঞ্চেস্টার' জলমগ্ন হওয়ার সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষের বিপুল শক্তি সমাবেশ সত্ত্বেও মাল্টায় শক্তিবৃদ্ধির জন্য সৈন্য এবং সমর ও খাদ্য-ভাণ্ডার মাল্টায় পৌঁছিয়াছে।

মার্কিন নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, বর্তমানে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের জন্য জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে বিরাট যুদ্ধ চলিতেছে।

১৫ই আগস্ট

রুশ রণাঙ্গন "রেড স্টার" পত্রিকায় বলা হয় যে, কোটেল-নিকোভো হইতে স্ট্যালিনগ্রাদের বিরুদ্ধে জার্মানদের অভিযান প্রতিহত হইয়াছে।

মিশর রণাঙ্গন মধ্য প্রাচ্যের সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১৪ই আগস্ট রাত্রিতে সমগ্র রণাঙ্গনে ব্রিটিশ রক্ষিবাহিনীর কর্ম-তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। তাহারা প্রতিপক্ষের ঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ চালায় ও বহু সৈন্য হতাহত করে। পশ্চিম মরুভূমিতে বিমান বাহিনীর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর একটি স্কোয়াড্রন পূর্ব ভূমধ্যসাগরে রোডস দ্বীপের উপর গোলা-বর্ষণ করে।

লণ্ডনে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, হিটলার রুশ রণাঙ্গনের জন্য হাঙ্গারীর নিকট আরও সৈন্য চাহিয়াছেন এবং বিনিময়ে হাঙ্গারীকে শ্লোভাকিয়া দিতে চাহিয়াছেন।

১৬ই আগস্ট

রুশ রণাঙ্গন—মস্কো রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, জার্মানরা তাহাদের সৈন্যদিগকে পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কোটেল-নিকোভোর উত্তর-পূর্বে পুনরায় আক্রমণ শুরু করিয়াছে। গতকল্য ক্রেটস্কায়ার দক্ষিণ-পূর্বে জার্মানরা একশত ট্যাঙ্কের সাহায্যে পর পর চারবার আক্রমণ চালায়, কিন্তু তাহারা ডন বাঁকের সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করিতে অসমর্থ হয়। ককেশাস পর্বতমালার সানুদেশের সর্বত্র বিশেষভাবে মিনারালনিভোদী এলাকায় ঘোরতর সংগ্রাম চলে।

মার্কিন নৌ বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ৮ই আগস্ট কিস্কার উপর মার্কিন বিমানের আক্রমণের সময় একখানা

জাপ ডেস্ট্রয়ারের উপর আঘাত করা হয় এবং ডেস্ট্রয়ারটিতে আগুন ধরিয়া যায়। এইখানি লইয়া চারিখানি জাপানী ডেস্ট্রয়ার ঘায়েল করা হইল। কিস্কার প্রধান জাপ ঘাঁটির উপর প্রায় তিন হাজার বোমা বর্ষণ করা হয়।

জেঃ ওয়াভেল

১৭ই আগস্ট

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সৈন্যেরা মাইকপ পরিত্যাগ করিয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "মাইকপ তৈলখনির সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সমস্ত মজুত তৈল যথাসময়ে সরাইয়া লওয়া হয় এবং তৈলকূপগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়।" ককেশাসের মিনারালনিভোদী এলাকায় ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। মাইকপের তৈল-সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া জার্মানরা মিনারালনিভোদী হইতে ১৪০ মাইল দূরবর্তী গ্রোজনী তৈলখনি এলাকায় পৌঁছিবার জন্য বিরাট ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত পদাতিক বাহিনী রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছে। কুবান প্রদেশের ক্রাসনোডার এলাকায় বিপুল জার্মান যন্ত্রসজ্জিত পদাতিক বাহিনী যুদ্ধে রত হইয়াছে। এই স্থানে প্রতিপক্ষ কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী নভরোসিস্ক বন্দর অধিকারের চেষ্টায় যুদ্ধ শুরু করিয়াছে। মস্কোর ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ক্রাসনোডার এলাকায় জার্মান আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে। ডন বাঁক হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, নদীর দক্ষিণ তীর এবং ৪০ মাইল পূর্বদিকবর্তী শিল্পপ্রধান শহর স্ট্যালিনগ্রাদ দখল করার জন্য জার্মানরা ক্লেটস্কায়া এলাকায় নূতন করিয়া প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করিয়াছে। ২৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমদিকবর্তী ভরোনেজ এলাকায় জার্মানরা দ্বিগুণতর উৎসাহে আক্রমণ চালাইয়াছে।

মস্কোতে মিঃ চার্চিল ও মঃ স্ট্যালিনের মধ্যে চারিদিনব্যাপী আলোচনা হয়। মিঃ হ্যারিম্যান, স্যার এলান ব্রুক, জেনারেল স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল এবং স্যার আলেকজান্ডার ক্যাডোনা আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন। মঃ মলোটোভ এবং মার্শাল ভরোশিলভও সোভিয়েটের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের কথা ঘোষণা করিয়া এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এই সময় হিটলার-প্রভাবিত জার্মানী ও উহার সমর্থক অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করা হয়। উভয় গভর্নমেন্ট সর্বশক্তি ও উদ্যম নিয়োগ করিয়া এই যুদ্ধ পরিচালনা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

চীন রণাঙ্গন—চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জাপানীরা টুংসিয়াং হইতে লিনচোয়ান অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। টুংসিয়াং লিনচোয়ানের অনুমান দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। গুয়ানের নিকট (শহরের দক্ষিণ-পূর্বে) যুদ্ধ চলিতেছে। নানচাং হইতে জাপানীরা লিনচোয়ানের উত্তর-পশ্চিমে ফু নদীর পশ্চিম তীরে ইয়ার পর্বতের নিকট চীনা ঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। পূর্ব চেকিয়াং প্রদেশে সিংটিয়েন-এ জাপানীরা পরাজিত হইয়াছে এবং ফু নদীর তীর দিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে ওয়েনচাও অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করিতেছে এবং চীনারা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

নিউ ইয়র্কের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, মার্কিন সৈন্যেরা সলোমনে পাঁচ হাজার বর্গমাইল স্থান দখল করিয়াছে বলিয়া ওয়াশিংটনে বেসরকারী সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। প্রকাশ, মার্কিন সৈন্যেরা সলোমন যুদ্ধে ধীরে ধীরে জাপানীদিগকে হটাইয়া দিতেছে। মিত্রপক্ষের আক্রমণ আট দিন হইল চলিতেছে। যদিও ওয়াশিংটনে সরকারী সমর্থন পাওয়া যাইতেছে না, তথাপি মনে হয়, কয়েকটি দ্বীপ বোধ হয় ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষ কর্তৃক সম্পূর্ণ অধিকৃত হইয়াছে।

১৮ই আগস্ট

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১৭ই আগস্ট রাত্রে সোভিয়েটবাহিনী ক্লেটস্কায়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে, কোটেলনিকোভোর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এবং মিনারালনিভোদী ও ক্রাসনোডারাঞ্চলে সংগ্রাম করে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ক্লেটস্কায়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে লালফৌজ প্রচণ্ড বিক্রমে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম চালাইতেছে। জার্মান ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক পদাতিকবাহিনীর বিরুদ্ধে লালফৌজ কোটেলনিকোভোর উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে। ক্রাসনোডার অঞ্চলে একটি জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে এবং এই যুদ্ধে ৬০০ জার্মান সৈন্য নিহত হইয়াছে। মিনারালনিভোদী অঞ্চলেও জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করা হইতেছে। মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েটবাহিনী স্ট্যালিনগ্রাদের সম্মুখে ঘোরতর যুদ্ধের পর আরও জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। গতকল্য সোভিয়েটবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া জার্মানদের অগ্রগতি বন্ধ করে। ককেশাসে পার্বত্য অঞ্চলে প্রধান যুদ্ধ চলিতেছে এবং উভয়পক্ষেই বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে। ক্রাসনোডার অঞ্চলে জার্মানগণ কুবান নদী অতিক্রম করিয়া রাশিয়ানদের উপর চাপ দিতেছে। 'রয়টারের' সামরিক সংবাদদাতা লিখিতেছেন—জার্মানরা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া স্ট্যালিনগ্রাদের সম্মুখে এবং ককেশাস অভিমুখে যে প্রবল আক্রমণ চালাইতেছিল, উহার তীব্রতা কমিয়া যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। স্ট্যালিনগ্রাদের বিরুদ্ধে তাঁহার বিরাট আক্রমণ হইতে ফন বক যে ফল লাভের আশা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পান নাই। এখন তিনি ভল্গায় বিরাট সরবরাহ বন্দর আস্ত্রাখানএর দিকে প্রবল আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। ইহা মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা হইতে পারে; হয়ত তিনি স্ট্যালিনগ্রাদের উপর সামনা সামনি এক নূতন আক্রমণের জন্য তাঁহার বিপর্যস্ত সৈন্য দলকে পুনঃ সংগঠন করিতেছেন।

লণ্ডনের এক সংবাদে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জেনারেল অকিনলেকের স্থলে জেনারেল আলেকজান্ডার মধ্য প্রাচ্যের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জেনারেল রিচির স্থলে লেঃ জেনারেল মণ্টেগোমারীকে অষ্টম আর্মির অধিনায়ক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

মৌচাক:—সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার। প্রকাশক এস সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ২৸৹ আনা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা।

ছেলেমেয়েদের সচিত্র 'মৌচাক' পত্রিকা বর্তমান বৎসরে ২৩শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এই দীর্ঘ দিনের শিশু-সাহিত্য সাধনায় 'মৌচাকের' দান অফুরন্ত। ইহার বিশেষত্ব বাঙলা সাহিত্যে যাঁহারা খ্যাতি অর্জন করিয়া বাঙলা সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই 'মৌচাক' পত্রিকায় নিয়মিত রচনা পরিবেশন করিয়া শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। বিবিধ রচনা সম্ভারে এবং গঠন সৌষ্ঠবে বাঙলা শিশু-সাহিত্য জগতে 'মৌচাক' পত্রিকা অন্যতম স্থান অধিকার করিয়া আছে। এতদিনের একটি পুরাতন পত্রিকা শিশু-সাহিত্যে বিরল।

আলোচ্য শ্রাবণ সংখ্যা হইতে খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস "মাঝির ছেলে" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীবিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস "হীরামাণিক জ্বলে" ধারাবাহিকভাবে চলিতেছে। ইহা ছাড়া শ্রীসুনির্মল বসু, শ্রীনৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়, শ্রীবিমল দত্ত, শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখাতে 'মৌচাক' সমৃদ্ধ হইয়াছে। খেলাধূলা ছেলেমেয়েদের নির্দোষ আনন্দ দেয়। কর্তৃপক্ষ এই আনন্দ থেকে ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করেন নি। 'মৌচাকের' 'খেলাধুলো' বিভাগের বিশেষত্ব—সেখানে খেলার বিভিন্ন খবর ছাড়াও কিভাবে বিভিন্ন খেলা আয়ত্তে আনা যায়, সে সম্বন্ধে সচিত্র আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা যে ছেলেমেয়েদের বিশেষ আকর্ষণীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা 'মৌচাকের' মত একটি প্রথম শ্রেণীর শিশু পত্রিকার বহুল প্রচার আন্তরিকভাবে কামনা করি।

ঋগ্বেদ—। প্রথম অষ্টক—প্রথম অধ্যায় । শ্রীমতিলাল দাশ। প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্তক পাবলিসিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ মহাশয় অতি দুরূহ কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। বেদের পঠন ও পাঠন বাঙলা দেশে প্রচলিত করিবার উদ্দেশে সমগ্র বেদের পদ্যানুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে তিনি কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই পদ্যানুবাদের সংগে মন্ত্র ও সায়নের অন্বয়মুখী টীকাও থাকিবে। এই অনুবাদ ৬৪ খণ্ডে ৬৪ অধ্যায় বাহির হইবে—প্রত্যেক অধ্যায়ে এক একটি বেদ বিষয়ক প্রবন্ধ থাকিবে।

বেদ সুদুর্বোধ। বেদের অনুবাদ ঠিক হয় না ; প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মনকে তন্ময় করিয়া বেদের মন্ত্রার্থকে উপলব্ধি বা দর্শন করিতে হয়। ইহা কঠোর সাধনার স্তর এবং আনন্দ রসে নিমগ্ন হইয়া অব্যক্ত অনুভবগম্য ব্যাপার ; ভাষায় প্রকাশ করিবার বস্তু নয়। কারণ, বৈখরী স্তরে অর্থাৎ সাধারণ ভাষার স্তরে বেদকে আনা যায় না। অনুবাদে বেদের বহিরার্থভাবই ব্যক্ত হইতে পারে অথচ তাহারও যে প্রয়োজন না আছে, ইহা নয়। অন্ততঃপক্ষে বেদ সাধনার পক্ষে জাতির চিত্তবৃত্তি তাহাতে উন্মুখ হয়। বেদের সর্বপ্রথম বংগানুবাদ করেন স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়। তাঁহার সে অনুবাদ বাঙলা ভাষায় অমূল্য সম্পদস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রও বেদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় বেদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সে অনুবাদ তিনি পরিসমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। পণ্ডিত সারদাকান্ত বেদশাস্ত্রী সাম বেদের অনুবাদ আরম্ভ করেন। কিন্তু দাশ মহাশয়ের অনুবাদ পদ্যানুবাদ, দুরূহতা এখানে আরও বেশী। মন্ত্রের পূর্ণ দ্যোতনাটি ভাষায় আনাই যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে পদ্যের মধ্যে আনিতে হইলে, ছন্দের মধ্যে তাহাকে ধরিতে হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক ; নহিলে দুর্বিগ্রাহ্য রস-গাম্ভীর্যের হানি ঘটাই ষোল আনা সম্ভব এবং তাহা বিপজ্জনক। গুরূপদিষ্ট পথে অগ্রসর না হইলে এ আশঙ্কা করার কারণ এড়ান সম্ভব হইতে পারে না এবং জলের মত বুঝিবার জিনিস বেদ নয়, হইতেও পারে না। এ সাধনায় গূঢ়তা থাকাই বরং ভাল। এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়াই ভাগবত বলিয়াছেন, ভূমার সংগে সাধকের চিত্তকে যুক্ত করিয়া ভগবানই অনন্তশক্তির দ্বারা বেদার্থের বিস্তার করিয়া থাকেন। তিনিই বেদবিৎ। ব্রহ্মার হৃদয়ে তিনিই বেদকে বিস্তার করিয়াছিলেন এবং ভগবদ্দর্শনের সেই প্রত্যক্ষতার রসই ছন্দে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কীর্তিত হইয়াছিল।

দাশ মহাশয় বিষয়ের গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছেন। বর্তমান সংস্করণের মুখবন্ধস্বরূপ বেদতত্ত্ব পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। আমাদের মতে সায়নের ভাষ্যের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এই সংগে থাকিলে বিষয়টির গুরুত্ব সমধিক রক্ষিত হইত, অবশ্য পুস্তকের আকার কিছু বাড়িত ; কিন্তু ব্যাপারটিও বৃহৎ। দাশ মহাশয়ের পদ্যানুবাদ সরল এবং মধুর হইয়াছে ; কিন্তু অন্তর্গূঢ়তার রস অনুবাদের মধ্যে অক্ষুন্ন রাখিবার দিকে অধিক দৃষ্টি রাখা আমরা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ছন্দের সংগে মনের গভীর স্তরে নিবিড় রস-স্পর্শ-মাধুর্যের মধ্যেই এমন অনুবাদের সার্থকতা নির্ভর করে। দাশ মহাশয়ের কৃত ঊনবিংশ সূক্তের অনুবাদ এ সম্বন্ধে আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে সহজ ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে বেদের স্বচ্ছন্দ রসকে মূর্ত কঠিন। আমরা আশা করি, দাশ মহাশয়ের গভীর অনুধ্যান তেমন ক্ষেত্রেও বাগার্থের প্রতিপত্তি সাধন করিয়া অমৃতময় এবং ছন্দোময় অনুভবে পাঠকদের চিত্ত উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হইবে। এমন অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে তাহা যে বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে একটি অমূল্য সম্পদস্বরূপে পরিগণিত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা সর্বান্তঃকরণে এই শুভ প্রচেষ্টার সার্থকতা কামনা করি।

মহাভারতী—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী। দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম দেড় টাকা। প্রকাশক—প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি যতীন্দ্রমোহনের পরিচয় বাঙলা দেশের লোককে দেওয়া আমরা বাহুল্য মনে করি। তাঁহার "মহাভারতী"র দ্বিতীয় সংস্করণ হইল দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। 'শবরীর প্রতীক্ষা'র রসতত্ত্ব যাঁহার অন্তর্দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হইয়াছে, তাঁহার কবিতা পাঠকপাঠিকাগণ নিজেরাই আস্বাদ করুন—ইহাই আমাদের অনুরোধ। 'মহাভারতী'র উপসংহারে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'কৃষ্ণা' অপূর্ব এবং অনবদ্য। বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে এমন কাব্যগ্রন্থের সমাদর হইবে, আমরা ইহাই আশা করি। কারণ, দেশ এবং জাতির অন্তরের একান্ত ব্যাপ্তিরসের অনুভূতিতে প্রত্যেকটি কবিতাই মধুর এবং সে মাধুর্য প্রখর ও উজ্জ্বল।

জীবন সংগ্রাম—শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু। প্রকাশক—দত্ত ব্রাদার্স, জলপাইগুড়ি। দাম এক টাকা বারো আনা।

মামুলী ছকের উপরে বায়স্কোপী ঢং-এ লেখা উপন্যাস। মুন্সীয়ানার অভাবে উপন্যাসখানা তেমন উৎরে নাই। লেখকের ভাষার সম্পদ আছে ; কিন্তু সস্তা হা-হুতাশের উপর-টপ্‌কা আলংকারিতার এমন আধিক্য আজকাল অচল। মানব চরিত্র বিশ্লেষণে অন্তর্দৃষ্টির গাঢ়ত্ব আরও কিছু প্রয়োজন। ছাপায় ভুল অনেক। তাড়াতাড়ি করিয়া ছাপাইবার কি উদ্দেশ্য ছিল বুঝা গেল না।

শিশু ভগবান—শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত। মূল্য এক টাকা। প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

শিশু-সাহিত্যে লেখকের হাত আছে। স্বাভাবিক এবং সাধারণ ঘটনাগুলির ভিতর দিয়া শিশু-মনের যে মাধুর্য-ছন্দ তিনি কবিতাগুলির ভিতর জাগাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা চিত্তকে মুগ্ধ করে। শিশু-ভগবানের এই বন্দনা গান সত্যই ভাগবত প্রেমের রসে পাঠকপাঠিকার চিত্তকে আপ্লুত করিবে। শিশুর রঙ্গময় অঙ্গ-বিভঙ্গিতে ভাগবতী লীলার সৌন্দর্য ও মাধুর্যেরই তাঁহারা সন্ধান পাইবেন।

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ১২ই ভাদ্র, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 29th August 1942 [৪২শ সংখ্যা

ভারতের দাবী

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস আমেরিকার 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রে সম্প্রতি ভারতের বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ভারতে অবলম্বিত ব্রিটিশ নীতির পক্ষে ওকালতি করিবার কাজে কিছুদিন হইতে স্যার স্ট্যাফোর্ড প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিকে তাঁহার এই প্রচেষ্টারই অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। স্যার স্ট্যাফোর্ড কংগ্রেসের দাবীর বিরুদ্ধে মামুলি যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীদের স্বাধীনতার দাবীর প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণই সহানুভূতি আছে; কিন্তু বর্তমানের এই অবস্থায় ব্রিটিশ প্রভুত্ব যদি ভারতবর্ষ হইতে অপসারিত করা হয়, তবে ভারতবর্ষে কোন গভর্নমেণ্ট থাকিবে না, কোন শাসনতন্ত্র থাকিবে না, ইহা এনার্কিস্টদের আদর্শ হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে ভারতের কোন কল্যাণ ঘটিবে না। এমন অবসরে জাপানীরা ভারত আক্রমণের জন্য প্রবল রকমে প্রলুব্ধ হইবে। যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র ভারতবাসীদিগকে যে তাঁহাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র গঠনে নিজেদের মধ্যে একমত হইবার সুযোগ দান করা হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং সেকথা নূতন করিয়াও বলা হইতেছে না ইত্যাদি। ভারতবর্ষ হইতে বর্তমানে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অপসারিত হইলে ভারতবর্ষে কোন গভর্নমেণ্ট থাকিবে না এবং ভারতবর্ষে অরাজকতারই সৃষ্টি হইবে, স্যার স্ট্যাফোর্ডের এ যুক্তি ভারতসচিব আমেরী সাহেবের যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি মাত্র; কিন্তু এ যুক্তির কোন মূল্য নাই। কংগ্রেসের দাবীর সম্বন্ধে যাঁহারা ওয়াকিবহাল ব্যক্তি, এমন ধাপ্পাবাজীতে তাঁহাদের চোখে ধূলা দেওয়া চলে না। কংগ্রেস বাস্তবিকপক্ষে ব্রিটিশের হাত হইতে ভারতবাসীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে বলিয়াছে মাত্র। গভর্নমেণ্ট উড়াইয়া দিতে দাবী করে নাই। কংগ্রেসের দাবী প্রতিপালিত হইলে জাপানীরা ভারত আক্রমণে সুবিধা পাইবে, এমন যুক্তি আরও উদ্ভট। জাপানীরা যাহাতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে সুবিধা না পায় এবং তেমন কোন বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া মিত্রশক্তির সমরোদ্যমে সমগ্র ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা করা সম্ভব হয়, কংগ্রেসের দাবীর প্রধান উদ্দেশ্য হইল তাহাই। ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ সাম্রাজ্যবাদের সংস্কারাচ্ছন্ন যুক্তিতর্কের জালে সমরোদ্যমে ভারতবাসীদের আন্তরিক সহযোগিতার এই সমস্যাটিকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু ইহাতে মূল সমস্যার সমাধান হয় না এবং কংগ্রেসের দাবী যে তাঁহাদের বৃহত্তর স্বার্থেরই অনুকূলে, একটু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, এ সত্যটি উপলব্ধি করিতেও কোন বেগ পাইতে হয় না। যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবার ব্রিটিশ রাজনীতিকদের যে একান্ত আগ্রহের অভিব্যক্তি, স্যার স্ট্যাফোর্ডের ভাষার মধ্যে এখন পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে একটি নূতন বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। তাঁহার কথার মধ্যে ভাষার যে কূটকৌশলটা আছে, তাহা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সরাসরি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে সে ক্ষেত্রেও যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইবে, স্যার স্ট্যাফোর্ড এমন কথা বলেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার এই বিবৃতিতে 'স্বাধীনতা' কথাটাই ব্যবহার করা হয় নাই, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার, এই কথা ব্যবহার করা হইয়াছে। এই যে 'স্বায়ত্তশাসন', ইহাও যে ভারতবাসীদিগকে দেওয়া হইবে, এমন কথা তিনি বলিতেছেন না। তাঁহার কথা হইল এই যে, স্বায়ত্তশাসনসম্মত শাসনতন্ত্র গঠনে একমত হইবার জন্য তখন ভারতবাসীদিগকে সকল রকম সুবিধা দান করা হইবে। সুতরাং দিল্লী এখনও যেমন বহু দূরে, যুদ্ধের পরেও তেমনি দূরেই থাকিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থের দরদ যেভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছেন এবং এখনও যে দরদ দেখাইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের মনের মত 'ঐক্যমত' ভারতবাসীদের মধ্যে কোনদিন ঘটা সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। শুধু ভারতবর্ষ কেন, জগতে এমন কোন দেশই নাই, যেখানে কোন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে দেশের যত লোক সব একমত হইতে পারে; স্যার স্ট্যাফোর্ডের নিজের দেশ ইংলণ্ডেও নয়। স্যার স্ট্যাফোর্ড প্রমুখ ব্রিটিশ রাজনীতিকদের এই শ্রেণীর উক্তি ভারতের বর্তমান সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবে না, পক্ষান্তরে জটিলতাই বৃদ্ধি করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ভারতের ঐক্য

ভারতসচিব মিঃ আমেরীর বক্তৃতা পড়িতে গেলেই আমাদের ভয় হয়; কারণ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার

নামে ভারতের জাতীয় সংহতি ছিন্ন করিবার কূটকৌশল কথার ভিতর দিয়া খাটান তাঁহার বক্তৃতার প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য। মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গ্রেপ্তারের পর আমেরী সাহেব বেতারযোগে বিলাতে যে বক্তৃতা করেন, নয়াদিল্লীর রাজনীতিক মহলও তাহাতে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ এবং ভারতসচিবের বক্তৃতার ভাষাটা শোচনীয় হইয়াছে বলিয়া তাঁহারাও নাকি দুঃখ করিয়াছিলেন। ইহার পর ভারতসচিব সেদিন বিলাতে সামরিক বিদ্যায় শিক্ষানবীশ ছাত্রদের সভাতে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। এ বক্তৃতার ভাষা উপরে উপরে দেখিতে অনেকটা সংযত; কিন্তু কৌশলটি তাহার মধ্যেও রহিয়াছে, তবে সূক্ষ্মভাবে আছে। এই বক্তৃতায় আমেরী সাহেব ভারতের স্বাধীনতার কথা তুলেন। তিনি বলেন, আভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার মত যথেষ্ট ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে; ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের দৃষ্টিতে ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব উপলব্ধিতে দৃষ্টির প্রাখর্য এবং তজ্জনিত স্বাধীনতা লাভে তাঁহাদের অযোগ্যতার সম্বন্ধে সদুপদেশ আমরা আজ নূতন শুনিতেছি না; কিন্তু আর কতদিন শুনিব? ইঁহাদের মুখে এই ধরণের উপদেশ শুনিলে আমাদের মনে একটা প্রশ্নই উঠে। তাঁহাদিগকে আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, তাঁহারা এ ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কি করিয়াছেন এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার পক্ষেই বা তাঁহাদের সুদীর্ঘ ভারত শাসনের অভিভাবকত্বকালে ভারতবাসীদিগকে সামরিক শিক্ষালাভের কতটা সুযোগ দেওয়া হইয়াছে? দূর অতীতের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। মিণ্টোর শাসনের পর হইতে ভারতবর্ষে যে কয়েক দফা শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাম্প্রদায়িকতার ভেদনীতি প্রয়োগ করিয়া ভারতবাসীদের ঐক্যের পথে ক্রমাগত অন্তরায়ই সৃষ্টি করা হইয়াছে; সমর-বিভাগের প্রকৃত কর্তৃত্ব ভারতবাসীর হাতে কোনদিন দেওয়া হয় নাই এবং দেশপ্রেমকে ভিত্তি করিয়া দেশরক্ষার জন্য সামরিক স্পৃহাকে সমগ্র জাতির অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত করিবার সকল পথ কর্তারা শঙ্কার দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন এবং এখনও দেখিতেছেন। এই যুদ্ধের সঙ্কটের মধ্যেও সমর শিল্প সংগঠনের কাজেও ভারতবাসীরা যোল আনা সুবিধা পাইতেছে না; এমন ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভে ভারতবাসীদের অনৈক্যজনিত অযোগ্যতার যে সব যুক্তি ব্রিটিশ রাজনীতিকরা বিশেষভাবে, আমেরী সাহেবের মত ভারতবাসীদের দরদে দরদী মহাপ্রাণ পুরুষেরা কথায় কথায় তুলিয়া থাকেন, তাহার জন্য দায়িত্ব কাহাদের? ভারতবাসীদের ঐক্যের জন্য ইঁহাদের সদিচ্ছা এবং সদুপদেশ অজস্র ধারায় প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু ইঁহাদেরই কথাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সে সব উপদেশ কিছুই কাজে আসিতেছে না। পক্ষান্তরে ভারতবাসীদের মধ্যে ইঁহাদের মতে অনৈক্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। এরূপ অবস্থায় ভারতবাসীরা আর কতদিন নিজেদের ভিতর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই সব মনীষীকে মূল্যবান মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিতে বলিবে? সুতরাং ভারতবাসীদের ঐক্যের জন্য মাথা না ঘামাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের বৃহত্তর সাম্রাজ্য স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিলেই ভাল হয়—ভারতবাসীদের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক।

ভারতের রাজনীতি ও চীন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্ট ইতিপূর্বে এই ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতে যে সব মার্কিন সেনা আছে, তাহারা ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করিবে না। সম্প্রতি মার্শাল চিয়াং কাইসেক ভারতে অবস্থিত চীনা সৈন্যবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ এবং সৈনিকদের কাছে তারযোগে একটি বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। এই বার্তায় তিনি বলিয়াছেন যে, তাহারা যেন ভারতের কোন রাজনৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে কিংবা কোন আন্দোলনে জড়িত না হয় এবং ভারতের রাজনীতি সম্বন্ধে অবিবেচিতভাবে কোনরূপ সমালোচনা না করে। মার্শাল চিয়াং কাইসেক চীনা সৈন্যদিগকে ভারতবাসীদের প্রতি সৌজন্যপরায়ণ হইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ভারতের বর্তমান রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট সেক্রেটারী মিঃ কর্ডেল হাল যে কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে ধরিবার ছুঁইবার মত বরং কিছু পাওয়া যায়; কিন্তু মার্শাল চিয়াং কাইশেকের এ উক্তির মধ্যে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। কংগ্রেসের দাবীর সহিত ভারতে মিত্রশক্তির সমরোদ্যমের সাফল্যের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে; সুতরাং এই দিক হইতে ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য মার্শাল চিয়াং কাইশেকের চেষ্টা করিবার যৌক্তিকতা স্পষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু সেনাদলের প্রতি এই বিবৃতিতে অন্য একটি দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক ব্যাপার সম্পর্কে তেমন কোন কথা অপর দেশের একজন রাষ্ট্রনায়কের নিকট হইতে আশা করা যায় না। মার্কিন দূত মিঃ উইলকি চীনে আসিতেছেন, ঐ সময় ভারতবর্ষের সম্পর্কে কথা উঠিতে পারে, ইহা শুনা যাইতেছে। সে যাহাই হউক, মার্শালের এই উক্তিতেও ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহার সৌহার্দ সূচিত হইতেছে। ভারতের জাতীয়তাবাদী দল চীনের প্রতি সর্বতোভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন। মার্শালের এই উপদেশ ভারতবাসী ও চীনাদের মধ্যে প্রীতির সূত্র দৃঢ় করিতে সাহায্য করিবে।

সংবাদপত্রের সমস্যা

সংবাদপত্রগুলি কতদিনে প্রকাশিত হইবে, এ সম্বন্ধে অনেকেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন এবং বর্তমানের এই সঙ্কটজনক অবস্থায় এজন্য উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক। বাঙলা দেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি সব এক কথায় লোকপ্রিয়, যত গুলি পত্রিকা, সব বন্ধ রহিয়াছে; ইহার ফলে নানারূপ গুজব রটিতেছে এবং তদ্দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইতেছে। সুতরাং দেশের শান্তিরক্ষার দিক হইতেও এ সমস্যা সামান্য নহে। শুধু বাঙলা দেশে নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি কতকগুলি সরকারী সংবাদ-নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রতিবাদে, কতকগুলি দমননীতির প্রভাবে বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু বাঙলা দেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের

ন্ধবন্ধ ক্রিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে এবং তাহা বিদেশী ংবাদিক মহলেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ইংলন্ডের ংবাদিকদের দৃষ্টিও এদিকে পড়িয়াছে এবং এ সম্বন্ধে তাঁহারা টিশ সাম্রাজ্যের সকল সাংবাদিকদের একটি বৈঠক আহ্বানের য়োজনীয়তার কথাও কেহ কেহ উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু ংবাদপত্রের এই যে সমস্যা, এখন পর্যন্তও তাহার সমাধানের াশু সম্ভাবনার কোন পরিচয় আমরা পাইতেছি না। বাঙলা রকার এ সম্বন্ধে একটি বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই ঠকে সাংবাদিকদের অভাব-অভিযোগগুলি তাঁহারা জানিতে হেন, জানিয়া সেগুলির সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন, এই শ্বাস দেন এবং সেগুলি তাঁহাদিগকে জানান হইয়াছে। কিন্তু মস্যাটি শুধু বাঙলার নয়, ইহা নিখিল ভারতীয়, সুতরাং ারত সরকারের উপর এ সম্বন্ধে দায়িত্ব রহিয়াছে। শুনিতেছি, ত সোমবার নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারতীয় সাংবাদিক সম্মেলন ইতেও সাংবাদিকদের অভাব-অভিযোগগুলি ভারত সরকারকে নানান হইয়াছে এবং সেগুলির সম্বন্ধে তাঁহারা বিবেচনা রিবেন বলিয়াছেন; বাঙলা সরকার এবং ভারত সরকারের এই বেচনার ফল কি দাঁড়ায়, তাহার উপর সংবাদপত্রসমূহের পুনঃ কাশ নির্ভর করিতেছে। বাঙলার সাংবাদিকগণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ রিয়াছেন, বিশেষ বিবেচনা সহকারে এবং অন্য কোন উপায় না েখিয়াই তাঁহাদিগকে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছে। রকারের বিবেচনার ফলে সম্মানজনকভাবে সংবাদপত্র পরি-লনার সুবিধা যদি তাঁহারা লাভ করেন, তবে সংবাদপত্রের ভতর দিয়া দেশসেবার ব্রত পুনরায় গ্রহণ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াই আছেন।

ককেশাসের লড়াই

ককেশাস অঞ্চলের লড়াইয়ের অবস্থা দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির এই প্রশ্নের গুরুত্ব বিশেষভাবে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। জার্মান সেনাদল ক্রাস্নাডোর দখল করিয়াছে। এই স্থানটি জার্মানদের হাতে যাইবার ফলে ককেশাসের উত্তর অঞ্চলে রুশিয়ার কৃষ্ণসাগরের উপকূলভাগে নোভোরোসিস্ক এবং টুয়াপসে এই যে দুইটি বন্দর, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অভিযানকারী জার্মান বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হইবার পক্ষে আতঙ্ক সৃষ্টি করিতেছিল, সেই দুইটি বিপন্ন হইয়াছে এবং উত্তর হইতে সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে সে দুইটি কতদিন আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, এ বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ সৃষ্টি করিয়াছে। কুবানের দক্ষিণ অঞ্চলে জার্মানদের প্রচণ্ড অগ্রগতির পক্ষে প্রধান অন্তরায় ছিল, রুশিয়ার কৃষ্ণসাগর তীরস্থ ক্রাস্নাডোর-মাইকপ—এই বেষ্টনী। মাইকপের তৈলকেন্দ্রটি জার্মানেরা আগেই দখল করিয়াছে; দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ককেশাস শৈলশ্রেণীর প্রান্তভাগ পর্যন্ত কাস্পিয়ান হ্রদের উপকূলভাগে অগ্রসর হইবার পক্ষে জার্মানদের এখন বিশেষ কোন বাধা নাই; কারণ অস্ট্রোখানের দক্ষিণে এদিকে আর রেললাইন নাই; সুতরাং উত্তর হইতে সৈন্য আমদানী করাও কঠিন। এই সব দিক হইতে ককেশাস অঞ্চলে রুশিয়ার অবস্থা অত্যন্তই সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে। ককেশাসের তৈলপ্রধান অঞ্চলের কতকটা ইতিমধ্যেই জার্মানদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। রুশ সেনাদল সাফল্যের সঙ্গে সেগুলি নষ্ট করিয়াছে, ইহা সত্য হইলেও এগুলি হস্তচ্যুত হওয়াতে সমর-সঙ্গতির দিক হইতে রুশিয়ার যে অভাব ঘটিল, তাহার গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না। জার্মান বাহিনী যদি ককেশাস অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে পারস্যের সীমান্তভাগেই আসিয়া পড়িবে এবং পূর্ব দিকে জাপান ও পশ্চিম দিকে জার্মান—উভয় দিক হইতেই সমভাবে ভারতের পক্ষে সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিবে।

গিরিপথে জার্মান বাহিনী

ককেশাসের পাদদেশে সংগ্রাম চলিতেছে। সংবাদে দেখা যাইতেছে, পার্বত্য অঞ্চলে এই লড়াই কতকটা খণ্ড খণ্ডভাবে হইতেছে এবং কসাকেরা যত রকমে সম্ভব সঙ্কীর্ণ গিরিপথ-সমূহের ভিতরে থাকিয়া শত্রুর অগ্রগতিতে বাধাদানের চেষ্টা করিতেছে। জেনারেল ভন বক সোজাসুজি ককেশাস অতিক্রম করিতে উদ্যম করিবেন, এমন সম্ভাবনার কথা শুনা যাইতেছে। ককেশাসের উত্তর-পশ্চিম অর্থাৎ কৃষ্ণসাগরের দিকটা অত্যন্তই দুর্গম, এই অঞ্চলে গিরিপথ খুব কম আছে, যে কয়েকটি গিরিপথ আছে, তাহাও খুব উঁচু দিয়া। গ্রীষ্মের সময় কিছুদিন এই সব গিরিবর্ত্ম দিয়া যাতায়াত সম্ভব হয়। ককেশাসের দক্ষিণ-পূর্বদিকে অর্থাৎ কাস্পিয়ান হ্রদের অঞ্চলেই শৈলশ্রেণীর বিস্তার সঙ্কীর্ণ; এজন্য রুশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল হইতে ককেশাস অতিক্রম করিবার অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পথ এই দিকেই কয়েকটি রহিয়াছে। ভন বকের দৃষ্টি এই দিকে রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। কাস্পিয়ান হ্রদের উপকূলভাগ ঘেঁসিয়া যদি তিনি ককেশাস পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, তবে জর্জিয়ার ভিতর দিয়া তিফলিস পর্যন্ত সেনা সঞ্চালনের উপযুক্ত ভাল রাস্তা পাইবেন এবং এইভাবে এশিয়ার পশ্চিমভাগে জার্মানেরা আসিয়া পড়িবে। ফন বকের লক্ষ্য রহিয়াছে এই পথের দিকে। কিন্তু ককেশাস অঞ্চল অতিক্রমের উপযুক্ত অনুকূল আবহাওয়া দীর্ঘ সময় থাকে না। রুশ পক্ষ এই আশা করিতেছেন যে, শীত আসিয়া পড়া পর্যন্ত তাঁহারা জার্মানদের গতি প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবেন এবং স্টালিনগ্রাদের যদি পতন না ঘটে, তবে তাঁহাদের এ সম্ভাবনা একেবারে অমূলকও বলা যায় না। ইরাকের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল নুরীপাশা সেদিন একটি বক্তৃতায় জার্মানদের ককেশাস শৈলশ্রেণী অতিক্রমের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, যদি তাঁহারা ককেশাস অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় এবং ইরাকের সীমান্ত দেশে পেঁছে, ইরাক মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিয়া জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবে। ইরাকের প্রধান মন্ত্রী বলেন, ককেশাসের শৈল-প্রদেশ অত্যন্ত দুরধিগম্য স্থান, রুশ সেনাদল এখানে শত্রুর গতি প্রতিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। তাঁ এই অনুমান কতটা সত্য, ভবিষ্যতের উপর তাহা

করিতেছে, আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানসম্মত সমরকৌশলের কাছে প্রাকৃতিক বাধার মূল্য যে অনেক কমিয়া গিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

ইরাক ও ইরাণে সমরোদ্যম

ককেশাস অঞ্চলের অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই সম্ভবত ইরাক এবং ইরাণে সমরোদ্যম পরিচালনায় নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ইরাক এবং ইরাণের সমরোদ্যম পরিচালনার ভার ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেলের হাতে ছিল; তৎপরে সে ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া সেই ভার মিশরে যুদ্ধ পরিচালনারত জেনারেল অকিনলেকের উপর দেওয়া হয়। সম্প্রতি এই ভার জেনারেল হেনরী মেটল্যান্ড উইলসনের হাতে স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা এশিয়া এবং আফ্রিকায় ইংরেজের তিনটি স্বতন্ত্র রণাঙ্গন প্রতিষ্ঠা করা হইল। একটি স্থাপিত হইল মিশরে, একটি ইরাক এবং ইরাণকে কেন্দ্র করিয়া, অপরটি ভারতবর্ষে; দুইটি রণাঙ্গন জার্মানদের বিরুদ্ধে এবং একটি জাপানের বিরুদ্ধে। রয়টারের সামরিক সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, ইরাক এবং ইরাণের সামরিক অবস্থার গুরুত্ব বর্তমানে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্মানেরা এখন বিমানপথে এক ঘণ্টার মধ্যে পারস্যের সীমানায় হানা দিতে পারে; সুতরাং পারস্য এবং ইরাকে স্বতন্ত্রভাবে একজন সেনাপতির উপর ষোল আনা ভার দেওয়াই উচিত হইয়াছে। জেনারেল হেনরী উইলসন ইহার পূর্বে মিশরে ছিলেন। গত বৎসরের প্রথম দিকে বেনগাজীর দিকে ব্রিটিশ সেনাদল যে অভিযান করে, তিনি সেই অভিযান পরিচালনা করেন। সামরিকগণের বিশ্বাস, ইরাক ও ইরাণের সীমান্তের এই নূতন ব্যবস্থা ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল সাহেব সম্প্রতি মস্কো যাইবার পথে এই দুই সীমান্ত পরিদর্শন করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহারই ফল। সামরিক বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, ককেশাস অঞ্চলের এই নূতন পরিণতির অবস্থায় জাপানীদের দৃষ্টি পূর্বাঞ্চলে ভারতের দিক হইতে সিঙ্গাপুরের দিকে কিংবা উত্তরে চীনের দিকে ঘুরাইয়া লওয়াই প্রধান কর্তব্য হইবে। সর্বতোভাবে এশিয়ার নূতন সামরিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার জন্য ইংরেজপক্ষ প্রস্তুত হইতেছে, প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌবহর এবং বিমানবহরের তৎপরতাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দ্বিতীয় রণাঙ্গনের মহড়া

মিত্রশক্তি সম্প্রতি একটি বিশেষ সাহসিকতাপূর্ণ কাজ করিয়াছে। মিত্রশক্তির সেনাদল নৌবল এবং বিমানবলে বলীয়ান হইয়া জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সের উপকূলভাগস্থ ডিপি অঞ্চলে হানা দেয়; শুধু হানা দেয় না, ট্যাঙ্কসহ সেনাদল তীরে অবতরণ করে, শুধু অবতরণই করে না, সকাল হইতে প্রায় ৯ ঘণ্টা পর্যন্ত তীরে থাকিয়া জার্মানদের সঙ্গে লড়াইও চালায়। তাহাদের গোলন্দাজ বাহিনীর ক্ষতিসাধন করে এবং ইহার পরেও বীরত্বপূর্ণভাবে ইংলন্ডের উপকূলভাগে প্রত্যাবর্তন করে। ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল কিছুদিন হইল মস্কো হইতে স্ট্যালিনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন; ইহার পরেই এত বড় একটা ব্যাপার। ইহাতে মনে হইয়াছিল যে, বহুপ্রত্যাশিত দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি বুঝি বাস্তব আকার ধারণ করিল; কিন্তু মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীর সাফল্যের সঙ্গে ইংলন্ডের উপকূলে প্রত্যাবর্তনের পর শুনা যাইতেছে যে, ইহা দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি ঠিক নয়, তবে এই ব্যাপারকে তাহার মহড়া বলা চলিতে পারে। এই অভিযানের ফলে ব্রিটিশ সামরিকগণ নাকি এই মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন যে,—"জার্মানদের উপকূল রক্ষার ব্যবস্থা সত্ত্বেও যথেষ্ট রকম বিমানবহরের সাহায্য পাইলে ফ্রান্সের উপকূলের কয়েক মাইলের মধ্যে বড় রকমের একটা নৌবহর রাখা সম্ভব হইতে পারে।" এ সম্ভাবনা কতদিনে সত্যে পরিণত হইবে, লক্ষ্য করিবার বিষয়।

অতি উল্লাসে আশঙ্কা

আমেরিকার ব্রিটিশ দূত লর্ড হালিফ্যাক্স ইংলন্ড ঘুরিয়া সম্প্রতি আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ডিপি আক্রমণকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির পূর্বোদ্যম বলা চলে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, সে বিষয়ে তিনি কিছু বলিতে পারেন না; তবে ডিপি আক্রমণের সাফল্যে ইংলন্ডে খুবই উল্লাসের সাড়া পড়িয়াছে, এ কথাটা অস্বীকার করা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থ নিউজিল্যান্ডের দূত মিঃ ওয়াল্টার ন্যাস কিন্তু এই অতিরিক্ত উল্লাসকে ভাল চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, মিত্রশক্তির সকলে যদি এই বিশ্বাস করিয়াই বসিয়া থাকে যে, তাহাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত, তবে তেমন অতিরিক্ত আশাবাদের ফলে হয়ত মিত্রপক্ষের পরাজয়ই ঘটিবে। শত্রুপক্ষের বলের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহাকে প্রতিরোধ করিতে সম্মুখীন হওয়াই সাফল্যলাভের পক্ষে সহায়ক হইয়া থাকে। ব্রিটিশ পক্ষের সমর বিভাগীয় প্রচারকগণ মিঃ ন্যাসের এই উক্তির ঔচিত্য উপলব্ধি করিবেন, আশা করা যায়।

সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে স্যার আজিজুল

ভারতবর্ষের হাই কমিশনার স্যার আজিজুল হক সম্প্রতি বিলাতের সাউথ ফিল্ডের মসজিদে ভারতীয় সেনাদলকে উদ্দেশ করিয়া একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি বিশ্বের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মের অবদানের উল্লেখ করিয়া বলেন, "ভারতবাসীরা পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় সভ্যতার পরিবর্তে নিজেদের ধর্মজীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নহে। যিনি যে ধর্মাবলম্বী হউন না কেন, তিনি যদি যথাযথভাবে সেই ধর্ম প্রতিপালন করিয়া চলেন, তবে সভ্যতার পক্ষে তাহা সহায়কই হইয়া থাকে।" স্যার আজিজুলের এই উক্তিতে আমাদের আপত্তি করিবার কিছুই নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ধর্মের নামে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি, ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্য, বৃহত্তর স্বার্থের পরিবর্তে সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ধুয়া তুলিয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে যেখানে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়, সেখানে যে ধর্মের মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ করা হয়, স্পষ্ট ভাষায় এ কথাটা বলিবার সাহস অনেকেরই থাকে না। বর্তমানে তেমন সাহস প্রদর্শনের আবশ্যক, তা বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে। ধর্মের প্রশংসার চেয়ে অধর্মের বিরুদ্ধতা করিবার উপযুক্ত লোকেরই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

২৯

সুমন্ত কেবলমাত্র বেহালাটার ছড়ির আঘাত দিয়াছে—এমনই সময় দরজার উপর আসিয়া দাঁড়াইল শাশ্বতী।

একটা মানুষের উপস্থিতি অনুভব করিয়া সুমন্ত বেহালায় সুর সাধিতে সাধিতে বলিল, "এত দেরী করে এলে অমু, বেলা তিনটে বাজে, খাওয়া দাওয়া না করে এই তিনটা পর্যন্ত—"

শাশ্বতী বাধা দিল, "আমি আপনার অমু নই—আমি শাশ্বতী, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"শাশ্বতী—"

বিস্মিত সুমন্ত মুখ তুলিল, বেহালা সন্তর্পণে কোলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "ও, আপনি? আসুন—বসবেন?"

অভদ্রোচিত উক্তি—লোকটা কোন কালেই ভদ্র হইল না। অন্ততঃপক্ষে কোন ভদ্র মহিলাকে দেখিয়া সন্ত্রস্তভাবে উঠিতে হয়, তাহাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিতে হয়, সে সব করা দূরে থাক, সে প্রশ্ন করিল—বসবেন?"

শাশ্বতী বলিল, "না, আমি বসতে আসি নি।"

সুমন্ত তাহার মুখের পানে চাহিল, "কোন দরকার আছে আমাকে?"

শাশ্বতী একেবারে ফাটিয়া পড়িল, "আপনার আমাকে অপমান করার হেতু কি? আমি আপনার কাছে টাকা চেয়েছিলুম?"

সুমন্ত বুঝিল, শাশ্বতী ঝগড়া করিতে আসিয়াছে—সে ঝগড়া করিবে না বলিয়া সেই মুহূর্তে মনে মনে শপথ করিয়া বসিল।

শান্তকণ্ঠে বলিল, "না চাইলেও আমাকে ধার শোধ দিতে হবে না? আপনি কি বলতে চান আমি ঋণী হয়ে থাকব আপনার কাছে?"

শাশ্বতী অকারণ নিজের মাথায় লম্বা বেণী স্কন্ধের উপর দিয়া সামনের দিকে আনিয়া টানাটানি করিতেছিল; দেখিয়া মনে হয় নিজের দেহে ব্যথা দিবার ইচ্ছাটাই তাহার বেশী।

সে বলিল, আপনার কাছে সুদ চাওয়া হয়েছিল।

আবার কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

সুমন্ত মাথা নাড়িল—"না—"

শাশ্বতী শক্ত হইয়া বলিল, "পাঁচ টাকা ভিক্ষাস্বরূপে কে পাঠিয়ে দিতে বলেছিল?"

সুমন্ত একটু হাসিয়া বলিল, "কেউ না আমার বিবেক আমায় এই টাকা পাঠাতে অনুপ্রাণিত করেছিল।"

"আপনার বিবেক—"

শাশ্বতী তীক্ষ্ম কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল—আপনার "আবার বিবেক আছে?"

সুমন্ত বেহালাটা তুলিয়া লইয়া ছড়ি ঠিক করিতে করিতে বলিল, "আমার তো মনে হয় আছে, লোকে কি ভাবে না ভাবে সেটা অবশ্য আমার জানা নেই।"

সে বেহালায় ছড়ির আঘাত করিতেই বেহালা আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

শাশ্বতী হাত জোড় করিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "দোহাই আপনার, ওই যন্ত্রটাকে এখন রাখুন, আমি চলে গেলে ওটা বাজালেও চলবে।"

বেহালা নামাইয়া রাখিয়া কতকটা হতাশভাবে সুমন্ত বলিল, "নাঃ, আপনি দেখছি একেবারে কালাপাহাড়। গানবাজনা যারা ভালো না বাসে, শাস্ত্রে তাকে শয়তান বলে, তা জানেন? আপনাদের ঝাড়েরই এই দোষ মজ্জাগত। বুঝুন ব্যাপারখানা, সেদিন এখানে পালাকীর্তন হল—মহিষাসুর বধ পালাকীর্তন, আপনার মাসিমার নাকি মূর্চ্ছার উপক্রম, মেসো তাই এসে দাঁড়াইলেন। একেবারে সংহার মূর্তি ধরে—এই মারেন তো এই মারেন। কারো করতাল ছুড়ে ফেলেন, কারোও শ্রীখোলে লাথি মারতে যান, কারও ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে শেষে আমায় কীর্তন বন্ধ করতে হল—বুঝলেন?"

বিস্মিত শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করিল—"মহিষাসুর বধ পালাকীর্তন—আর কোন পালা পেলেন না বুঝি?"

বিনীতকণ্ঠে সুমন্ত বলিল, "আমাদের ধরণই ওই আমরা মহিষাসুর বধ পালাকীর্তন, সূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদ পালাকীর্তন, মন্থরার বিলাপ কীর্তন—এই সবই গাই। যাদের কেউ জায়গা দেয় না, যারা বিশ্বে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, আমরা তাদের দুঃখগাথা গাই বুঝলেন?"

শাশ্বতী আর হাসি চাপিতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত হাসির স্রোত বহাইয়া দিল।

সুমন্ত বলিল, "না না, হাসবার কথা নয় মিস বোস, আপনি যদি আজ থাকতেন, আমি আপনাকে আজই সারারাত্রিব্যাপী যে কোন একটা পালাকীর্তন শুনিয়ে দিতে পারতুম। থেকে যান না আজ রাতটা তবু গাঁয়ের একটা স্মৃতি নিয়ে যাবেন।"

শাশ্বতী মাথা নাড়িল, "রক্ষে করুন, আর কীর্তন শুনতে হবে না; যা সব পালার নাম করেছেন, তাতেই আমার বুঝতে বাকি নেই। এখানে না শুনে বরং আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ করছি, আমাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়ে আপনাদের কীর্তন একদিন শুনিয়ে আসবেন, বাবা, আমার স্বামী সবাই শুনতে পাবেন, আপনার দল বিশেষভাবে পুরস্কৃত হবে কথা দিচ্ছি।"

"স্বামী" কথাটা শুনিয়া সুমন্ত ভালো করিয়া শাশ্বতীর পানে চাহিতে তাহার সিমন্তে সিন্দুর দেখিতে পাইল।

সে শান্তকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, আপনার যাঁরা নিজের লোক তাঁরা বেশ মোটা গোছের পুরস্কার দেবেন জানি, তবে কথা হচ্ছে, পুরস্কার পাওয়ার আগেই আমাদের শ্রীঘরে যেতে হবে। এ সব পালাকীর্তন পাড়াগাঁয়ে বরং তবু চলতে পারে, আপনাদের বালিগঞ্জের লোকেরা প্রথম সূত্রপাতেই পুলিশ ডাকবে।

শাশ্বতী বলিল, "সে ব্যবস্থা আমি করব, আপনাকে তার জন্যে ভাবতে হবে না। যাক, এখন যা বলতে এসেছি—দেখুন, আপনি সত্যই আমাকে বড় বেশী রকম অপমান করেছেন সুদের পাঁচ টাকা দিয়ে। এটা সত্যি কথা—সুদের আশায় আমি আপনাকে টাকা দেই নি। তারচেয়ে বরং এক কাজ করবেন, এই পঁচিশটা টাকা রাখুন, একখানা কাপড় কিনে আমার বিয়ের উপহার বলে পাঠিয়ে দেবেন বালিগঞ্জের ঠিকানায়—যা আমি ব্যবহার করতে পারব, পাঁচজনকে দেখাতেও পারব—বুঝলেন?

সে কয়েকখানা নোট সুমন্তের কোলের উপর ফেলিয়া দিল।

বিবর্ণ হইয়া গিয়া সুমন্ত বলিল, "বিয়ের নিমন্ত্রণ তো আমি পাইনি।

একটু হাসিয়া শাশ্বতী বলিল, "সে শুধু আপনি নন, আমার মা পর্যন্ত জানেন না, আজ মাত্র আমার মুখে শুনলেন। এ যে বিয়ে—এর কথা না বলাই ভালো। একটা কথা কেবল মনে রাখুন সুমন্তবাবু, বাবার কথা রাখতে আমার বিয়ে—বিয়ের বর যে—সেও জানতো না, আমি অবশ্য জানতুম।"

বলিতে বলিতে সে হাসিল, বলিল, "যাক গিয়ে একখানা কাপড় বরং পাঠাবেন, দেখতে ভালো দেখাতেও ভালো।"

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ পাইয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল—।

সুমন্ত বেহালাটা নীচে নামাইয়া বলিল, "এসো অমল—। মিস—না মিসেস—"

শাশ্বতী বলিয়া দিল "মিসেস ঘোষ—"

সুমন্ত ত্রুটি সারিয়া বলিল, "হ্যাঁ, মিসেস ঘোষ, ইনি আমার বন্ধু অমল সেন—আর অমল ইনি—"

অমল হাস্যমুখে বলিল, "পরিচয় না দিলেও চিনতে পারব মনে হয়। তবে আগে চিনতুম মিস বোস কিম্বা শাশ্বতী বলে, আর এখন নতুনভাবে মিসেস ঘোষ বলে চিনতে হচ্ছে এই যা পার্থক্য। তারপর বিয়েটা হল কবে—আর কার সঙ্গে?"

শাশ্বতী মুখ ফিরাইল, বলিল, "বিয়ে হল মাত্র কাল, আর হল ডাক্তার অরুণ ঘোষের সঙ্গে—"

"অরুণ—অরুণ—"

অমল ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু সে যে একেবারে ইউরোপীয়ানদের ওপরে যায়, তার সঙ্গে ঠিক বনিয়ে থাকা বাঙ্গালীর মেয়ে তুমি—পারবে তো?"

শাশ্বতী হাসিয়া উঠিল, "না পারি ডাইভোর্স হবে।"

অমল সুমন্তের পাশে বসিয়া বলিল, "সেটাও বিশেষ সুবিধাজনক নয়—যদিও মুখে বেশ বলা যায়, কাজে করাই মুস্কিল। আসল কথা—লোকটা বড় আত্মভোলা, কাজকে এত বড় করে দেখে যার কাছে আর কিছুই তার দাঁড়ায় না। সেদিক দিয়ে যদি মানিয়ে চলতে পারো—"

শাশ্বতী সংক্ষেপে বলিল, "দেখা যাক—"

কথার মোড় ফিরাইয়া সে বলিল, "তারপর আপনি এখানে কয়দিন এসেছেন অমল দা?"

মনে মনে হিসাব করিয়া অমল বলিল, "তা আজ এক সপ্তাহ হবে।"

শাশ্বতী বলিল, "এখনও কি সেই কাজে ঘুরছেন?"

অমল জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার পানে তাকাইল।

শাশ্বতী বলিল, "আপনার দেশপ্রেম, দেশসেবার কথা বলছি।"

অমল হাসিয়া উঠিল, বলিল, "সেটা একেবারে অনর্থক—না শাশ্বতী?"

শাশ্বতী বলিল, "আপনি এক্সট্রিমিস্ট—অর্থাৎ একেবারে চরমপন্থী—অর্থাৎ—"

অমল বলিল, "অর্থাৎ পুলিশ আর জেল?"

শাশ্বতী বলিল, "হ্যাঁ, ওসব ছেড়ে দিন না অমল দা, অনর্থক কেন এমন করে কষ্ট পান?"

অমল বলিল, "কেন যে যাই তা তুমি বুঝবে না শাশ্বতী সে সব বুঝবে সুমন্ত, বুঝবে এই দেশের সেই সব মেয়েরা, যারা দেশকে ভালোবাসে, দশকে ভালোবাসে—কেবল নিজেকে নিয়েই যারা বিব্রত নয়। তুমি কিম্বা তোমার অরুণের দল তা বুঝবে না, বুঝবার শক্তিও তোমাদের নাই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি শাশ্বতী, নিজেকে ছাড়িয়ে বাইরের দিকে কোন দিন তাকিয়েছ কি?"

শাশ্বতী অবাক হইয়া গিয়া বলিল, "মানে বুঝলুম না অমল দা।"

অমল হাসিল, বলিল, "বুঝবার মত যোগ্যতা হয়তো তোমারও আছে, কিন্তু তোমাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর তলায় সে বোধশক্তি তলিয়ে গেছে। জানিনে কোনদিন বুঝবার শক্তি তোমার হবে কিনা, তোমার চোখ ফুটবে কিনা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার সুমতি হোক, তুমি সত্যকে চিনতে পারো। নিজেকে ছাড়িয়ে বাইরে তোমার দৃষ্টি ছড়িয়ে যেন পড়ে।

শাশ্বতী মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ভগবানকে আপনি মানেন অমল দা,—"

অমল বলিল, "আমার ভগবান বলে কিছু না থাকলেও তোমার থাকতে পারে। আমার কথায় বলবে শাশ্বতী, আমার ইহকাল আছে, পরকাল নেই, কাজেই আমার ভগবানও নেই, ওসব আমি কোনদিন বিশ্বাসও করিনে।"

দূরে ব্রজসুন্দরের আহ্বান শুনা গেল—"শাশ্বতী চায়ের জন্যে মা ডাকছেন যে—"

শাশ্বতী সচকিত হইয়া উঠিল—দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "আচ্ছা, আজকের মত নমস্কার। আর কোনদিন এখানে যে আসা হবে সে আশা নেই, তবু বলি আপনারা যদি কলকাতায় যান, বালিগঞ্জে একবার যাবেন, একবার দেখা করবেন।"

সে ফিরিয়া নামিল।

অভিভূতের মত সুমন্ত বসিয়াছিল, হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিল, "আপনার টাকাটা—"

শাশ্বতী ফিরিয়া বলিল, "কাপড় কিনে পাঠাবেন।"

৩০

অদ্ভুত মানুষ ডক্টর অরুণ ঘোষ—

নিজের কাজ, নিজের ল্যাবরেটারী লইয়াই তিনি মহাব্যস্ত, সর্বদা তন্ময়—তাহার বাহিরে যে সংসার আছে, সমাজ আছে, স্ত্রী আছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই।

শাশ্বতী যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেছে, স্বামীর সহিত তাহার সম্পর্ক বিন্দুমাত্র নাই। বিবাহের পর একদিন মাসীমা সিঁথিতে সিঁদুর দিয়াছিলেন, সে সিঁদুর সে কলিকাতায় আসিবার পথেই মুছিয়া ফেলিয়াছে, হাতের লোহাটা টান দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

মিসেস বোস নিঃশব্দে কন্যার পানে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার নীরব দৃষ্টি বুকে বিঁধিয়াছিল বলিয়াই শাশ্বতী মাকে বুঝাইয়াছিল—"আমাদের বিয়ে যদিও হিন্দু মতে হয়েছে মা, তবু আমরা যে এক জায়গায় থাকব না এ কথাবার্তা হয়ে গেছে ডক্টর ঘোষের সঙ্গে। এতে তিনি বরং খুব আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়েছেন মা, তিনিও নাকি এইরকমই চেয়েছিলেন।"

মিসেস বোস গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন, একটিও কথা তিনি বলেন নাই।

বাড়িতে পৌঁছাইয়াই দেখিতে পাইলেন মিঃ বোসকে বাড়ির সামনে। তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। গাড়ি থামিতে তিনি আগাইয়া আসিলেন।

গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া শাশ্বতী দুই হাতে পিতাকে জড়াইয়া ধরিল, উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিল, "এই দেখুন বাবা,

মাকে নিয়ে এসেছি। আমি বলেছিলুম না, আমি ঠিক মাকে নিয়ে আসব,—আপনারাই বরং বলেছিলেন—"

মিঃ বোস কন্যার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া সস্নেহে বলিলেন, "বেশ করেছো মা, তুমি যে আনতে পারবেই, তা আমি জানতুম। আচ্ছা যাও মা, তুমি এবারে বিশ্রাম কর গিয়ে।"

মিসেস বোসকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "এসো কেটি, আড়ষ্ট হয়ে গাড়িতে বসে-থাকার কোন দরকার তো নেই, তোমার শূন্য ঘরে তুমি আবার এসে বসো, তোমার কাজ তুমি নাও।"

মিসেস বোস নিঃশব্দে নামিলেন, নিঃশব্দে নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত বাড়ি সচঞ্চল হইয়া উঠিল, শাশ্বতীর অশ্রান্ত পদক্ষেপে, গানে, হাসিতে সমস্ত বাড়ি পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

মিঃ বোস তখনই নিজের কাজে বাহির হইয়া গেলেন, ফিরিয়া যখন আসিলেন, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ নিঝুম।

দ্বারোয়ান দরজা খুলিয়া দিল,—মিঃ বোস সন্তর্পণে বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। আগেই বুটজোড়াটা খুলিয়া স্যাণ্ডেল পায় দিলেন, ভারি বুটের শব্দে যেন কাহারও ঘুম না ভাঙ্গিয়া যায়।

আহার্য তাঁহার ঢাকা থাকে, তিনি নিজেই এ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাজ যখন বেশী পড়ে, ফিরিতে এমনই রাত্রি হয়, হয়তো কোন কোন রাত্রে ফেরাও হয় না। তাঁহার আহার্য লইয়া কেহ যেন বসিয়া না থাকে, এই ছিল তাঁহার কথা। মিসেস বোস এখানে থাকিতে ফিরিতে কদাচ রাত্রি হইলেও আহার্য গরমে রাখার ব্যবস্থা ছিল, শাশ্বতীর এ সব দিকে খেয়াল ছিল না, পিতাও সেজন্য কোনদিন কোন অনুযোগ করেন নাই।

আস্তে আস্তে নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি একখানা চেয়ারে বসিলেন; সামনে টেবলের উপর সংরক্ষিত আহার্যের ঢাকাটা কেবলমাত্র খুলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এমনই সময় প্রবেশ করিলেন মিসেস বোস—

সবিস্ময়ে মিঃ বোস বলিলেন, "এ কি কেটি, তুমি এখনও ঘুমোও নি?"

"না—" মিসেস বোসের কণ্ঠে দৃঢ়তা, তিনি আসিয়া টেবলের ধারে দাঁড়াইলেন, মিঃ বোসের আহার্যের ঢাকা তুলিয়া ফেলিয়া নিস্তব্ধে পলকহীন নেত্রে স্বামীর পানে তাকাইলেন।

সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মিঃ বোস সহ্য করিতে পারিলেন না তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কেবল মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

মিসেস বোস রুক্ষ্মকণ্ঠে বলিলেন, "এ রকম করে পয়সা উপার্জন করার কারণটা কি শুনতে পাই? তোমার এ পয়সা ভোগ করবে কে?"

জিজ্ঞাসু নেত্রে মিঃ বোস পত্নীর পানে তাকাইলেন।

আহার্যগুলি দেখাইয়া মিসেস বোস রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "সেই সন্ধ্যেবেলাকার তৈরী খাবার, এই রাত্রে ঠান্ডা হিম হয়ে গেছে, এই রকম খাবারই আমি গিয়ে পর্যন্ত খাওয়া হচ্ছে তো?"

মিঃ বোস মাথা নত করিয়া রহিলেন।

মিসেস বোস বলিলেন, "বসো, আমি স্টোভ জেবলে খাবারগুলো গরম করে দেই—"

তাড়াতাড়ি স্টোভ জ্বালিয়া তিনি আহার্যগুলো গরম করিয়া দিয়া বলিলেন, "খাও, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, আবার জুড়িয়ে যাবে এখন।"

মিঃ বোস এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, পত্নীর কথায় আহার্য মুখে দিয়া বলিলেন, "আমার একটুও কষ্ট হয় না কেটি। বড়লোকের ঘরে জন্মাই নি তো—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটতে হয়েছে, কতদিন খাওয়া হয় নি—কাজেই ঠান্ডা খেতে একটুও কষ্ট হয় না।"

রুক্ষ্মকণ্ঠে মিসেস বোস কেবলমাত্র বলিলেন, 'হ্যাঁ, তা জানি—"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, বয়স যত বাড়ছে, কাজের নেশাও তত বাড়ছে, নয়? নূতন যৌবন ফিরে পাচ্ছো বোধ হয়?"

মিঃ বোস সংক্ষেপে বলিলেন, "কতকটা "

মিসেস বোস চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আহার সমাপ্ত করিয়া মিঃ বোস বলিলেন, "নাও, আর তো ভাবনার কারণ নেই, শোও গিয়ে, রাত জাগলে অসুখ হবে।"

তিনি একটা সিগারেট ধরাইলেন। প্রতিদিন শয়নের মুহূর্তে একটা করিয়া সিগারেট খাওয়া তাঁহার স্বভাবগত একটা অভ্যাস।

মিসেস বোস উঠিলেন,—দুই পা গিয়া আবার ফিরিলেন, শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "আমি তোমার কৈফিয়ৎ চাই—"

"কৈফিয়ৎ ?" বিস্মিত হইয়া মিঃ বোস বলিলেন, "কিসের কৈফিয়ৎ দেব?"

মিসেস বোস বলিলেন, "তোমার কাজের।"

মিঃ বোস একটু হাসিলেন, বলিলেন, "আমার কাজ বাইরের, ঘরের ভিতরকার নয় কেটি, আমার সংসার হতে কাজের জগতের তফাৎ অনেকখানি এবং বার্তা সেখানে পেণছায় না, সেখানকার বার্তা এখানে পেণছাবে না এই আমি চাই, এখনও চাচ্ছি।"

অসহিষ্ণুভাবে মিসেস বোস বলিলেন, "ভুল বুঝো না, আমি তোমার বাইরের কাজের কৈফিয়ৎ কোনদিনই চাইনি—চাইব না! আমি কৈফিয়ৎ চাচ্ছি তোমার সেই কাজের যে কাজের ফল আমার জগতে যুগান্তর এনেছে—আমার একটিমাত্র আলো নিভিয়ে দিয়েছে—"

"বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

"তোমার জগৎ, তোমার আলো—"

মিঃ বোস বিস্মিতভাবে পত্নীর পানে তাকাইলেন।

মিসেস বোস কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন,—"হাঁ, তুমি আমার শেষ আশা ভরসা যা ছিল তা নষ্ট করেছো,—আমার নির্ভরযোগ্য স্থান এতটুকু রাখো নি—আমার—"

অকস্মাৎ তাঁহার চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া তিনি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পার্শ্বের চেয়ারখানার উপরে বসিয়া পড়িলেন।

মিঃ বোস হাতের সিগারেটটা ফেলিয়া দিলেন, নিঃশব্দে তিনি ঘরের মধ্যে কয়েকবার পায়চারী করিয়া বেড়াইলেন।

মিসেস বোসের নিকটে আসিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পত্নীর মাথার উপর হাতখানা রাখিয়া ব্যথিতকণ্ঠে বলিলেন, "সুখে-দুঃখে কোনদিন যে ভগবানের নাম মুখে আনিনি কাত্যায়নী, আজ সেই ভগবানের নাম করেই বলছি—আমাকে যতটা নির্দয়, যতটা নিষ্ঠুর বলে তুমি জেনেছো, বাস্তবিক আমি তা নই। বলতে পারো তুমি, আজ বাইশ বছরকার বিবাহিত জীবনে কয়দিন তুমি আমার কাছ হতে অসৎ ব্যবহার পেয়েছো? বাইরের যত বড় আঘাত যত বড় বেদনা এসেছে আমি বুক দিয়ে সবগুলিকে ঢেকে ফেলেছি, তুমি দেখেছো শুধু আমার হাসিমুখ। আজও তাই হতো কাত্যায়ণী, আমার হাসিমুখই তুমি দেখতে পেতে, কিন্তু আমাদের সন্তানেরা—আমাদের দুইটি মেয়ে আমার হাসির উৎসমূলে নিদারুণ আঘাত করে সে উৎসধারা শুকিয়ে দিয়েছে।"

হাত সরাইয়া লইয়া তিনি বুকের উপর দুই হাত আড়াআড়ি করিয়া রাখিয়া আবার খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিলেন।

ফিরিয়া আসিয়া মিসেস বোসের সামনে তিনি দাঁড়াইলেন, সগর্জনে বলিলেন, "বলতে পারো কেটি, কেন সন্তানেরা জন্মায়? ওরা যদি না জন্মাতো—তোমার আমার মধ্যে এতটুকু ব্যবধান জাগতো না—আমাদের দীর্ঘ কাজের অবসরে যে সময়টুকু পেতুম, নিজেদের কথায় কেটে যেতো। পিতামাতার কাছে সন্তান ভগবানের আশীর্বাদ নয় কেটি, ওরা অভিশাপ, জীবন্ত অভিশাপ—"

এ ঘরের কথাবার্তার শব্দে পাশের ঘরে শাশ্বতীর ঘুম ভাঙিগয়া গিয়াছিল, সে উঠিয়া আসিয়া পিতার রুদ্রমূর্তি দেখিয়া আশ্চর্যভাবে তাকাইছিল—;

"বাবা—"

মিঃ বোসের শেষ কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সে দ্রুত ঘরে প্রবেশ করিয়া দুই হাতে পিতাকে জড়াইয়া ধরিল—।

"কে—শ্বতি—শাশ্বতী—"

অকস্মাৎ মিঃ বোসের যেন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, কন্যার স্নেহালিঙ্গনের মধ্যে সুপ্ত পিতা জাগিয়া উঠিল—।

"তুমি ঘুমাও নি মা—?"

কন্যার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মিঃ বোস বলিলেন, "রাত যে অনেক হয়েছে, এখনও ঘুমাওনি?"

শাশ্বতী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "ঘুমিয়েছিলুম বাবা, আপনার চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে।"

আশ্চর্য হইয়া গিয়া স্ত্রীর পানে তাকাইয়া মিঃ বোস বলিলেন, "আমি কি চীৎকার করেছি কেটি? না, আমি তো আস্তে আস্তে কথা বলেছি, পাছে তোমার ঘুম ভাঙ্গে তাই বুট খুলে রবারের স্লীপার পায়ে দিয়েছি—দেখ।"

মিসেস বোস ততক্ষণে চোখমুখ মুছিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছেন। ধরাকণ্ঠে বলিলেন, "হয়তো একটু জোরেই কথাবার্তা বলেছে, যাতে শাশ্বতীর ঘুম ভেঙ্গে গেছে। আচ্ছা, তুমি শোও, আমরা যাই। এসো শাশ্বতী, আমরা ঘুমাই গিয়ে—"

শাশ্বতী বলিল, "তুমি যাও মা, আমি বাবাকে শুইয়ে রেখে তবে যাব। বাবা ঐ এক রকমের মানুষ মা, আজ দশ পনেরো দিন বাবা বিছানায় শোন না—আমার ঘর হতে শুনতে পাই, বাবা ঘরের মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, এসে বাবার মাথা ধুইয়ে দিয়ে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যাই, তবে বাবা ঘুমান। তুমি শোও গিয়ে মা, আমি বাবাকে শুইয়ে রেখে যাচ্ছি।"

মিসেস বোস শুষ্ক নেত্রে দেখিতে লাগিলেন—এতটুকু শিশুকে ধমক দিয়া মায়ে যেমন বাধ্য করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া ঘুম পাড়ান, শাশ্বতী তেমনই করিয়া পিতার মাথা ধোয়াইয়া মুছিয়া তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইল। আলো নিভাইয়া মাকে লইয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল, "এবার যদি কোন শব্দ পাই, তা হলে ভালো হবে না বাবা, আপনাকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে এর পর বাধ্য হয়ে আপনার কাছে আমায় সারারাত বসে থাকতে হবে।"

ব্যস্ত হইয়া মিঃ বোস বলিলেন, "না না, তুমি কান পেতে শুনো আমার ঘর হতে শব্দ পাচ্ছো কিনা।"

শাশ্বতী ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিয়া গেল।

ক্রমশঃ

তুরস্কে শিক্ষার ব্যবস্থা

রেজাউল করীম এম, এ বি-এল

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে সমগ্র তুরস্ক সাম্রাজ্যে বিদ্যানিকেতনের সংখ্যা খুব কম ছিল। যাহা ছিল, তাহা নিতান্ত প্রাচীন ধরণের। প্রাচীন মাদ্রাসা ও মক্তব, দু'একজন অল্প বেতনের শিক্ষক, কয়েকটি ছাত্র, দু'একখানা ধর্মপুস্তক, ইহাই ছিল সে-যুগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপাদান। ইহাতে না ছিল কোন আদর্শ, না ছিল কোন সজীবতা। মৃত্যুর পাণ্ডুরতা সর্বত্র বিরাজমান ছিল। কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর কামাল দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিলেন। তাঁহার প্রথম দৃষ্টি পতিত হইল শিক্ষা সংস্কারের উপর। তাঁহার চেষ্টায় বিদ্যালয়সমূহের প্রাচীন আদর্শ পরিত্যক্ত হইল। নূতন আদর্শে প্রত্যেক বিদ্যালয় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে দেশের চারিদিকে আধুনিক ধরণের বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপিত হইল। মাত্র পনর বৎসরের মধ্যে তুর্কী গণতন্ত্র বর্তমান প্রণালীতে জনশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইল। নিম্নের হিসাব হইতে বুঝা যাইবে, কিরূপ দ্রুতবেগে তুরস্কে শিক্ষার প্রসার হইতেছে। ১৯২৩-২৪ সালে সমগ্র তুরস্কে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৫৮৫৪৮, তন্মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ২৯৩৯৩৪ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৬৪৬১৪। কয়েক বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৯৩৫-৩৬ সনে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৭০৫২৭ হয়। তন্মধ্যে ৫১৫২৭৪ ছাত্র এবং ২৫৫২৫৩ ছাত্রী। বর্তমান বৎসরে এই সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে।

রাষ্ট্রের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে যেসব বিদ্যালয় কাজ করিতেছে, সেগুলির শিক্ষার ব্যবস্থা বহু পরিমাণে উন্নত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক গভর্নমেণ্ট দেখিল যে, দেশের শিক্ষা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়িয়া আছে। ভূতপূর্ব গভর্নমেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ কিছু করেন নাই,—সেই আদিম আমলের ব্যবস্থা যুগ-যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছিল। বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান ব্যক্তিগত সাহায্যে বহু মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেগুলিতে সাধারণত ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইত ; আরবী ও পারসী অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। কোথাও কোথাও প্রাথমিক গণিত শিক্ষা দেওয়া হইত। গ্রাম্য স্কুল ও পাঠশালাগুলি মসজিদের সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে তিনি বুঝিলেন যে, সর্বত্র একই ধরণের ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থা হইত। এই ত গ্রামের অবস্থা। বড় বড় নগরে বৈদেশিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফরাসী, ইতালী, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, আমেরিকা ও ইংলণ্ড এই কয়েকটি দেশের মিশনারি প্রচারকগণ তুরস্কের বিভিন্ন নগরে বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এগুলিতে প্রত্যেক সংশিলষ্ট দেশের নিজস্ব ধারা ও আদর্শ অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত তুর্কি-খৃষ্টান ও ইহুদী মাইনরিটিদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল। এই সব শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মশিক্ষা বিস্তার করা। কামাল পাশা যখন রাষ্ট্রের ক্ষমতা হাতে লইলেন, তখন পর্যন্ত সমগ্র দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। তিনি এই বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোলের মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল সুগঠিত ও আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থার বিধান করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, সর্বত্র একই ধরণের ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন না করিলে দেশের জাতীয় শক্তি দৃঢ় হইবে না, জাতির সংহতি স্থায়ী হইবে না এবং শিক্ষা কার্যকরী হইবে না। তাই তাঁহার প্রেরণায় গণতান্ত্রিক তুরস্কের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ধর্ম-নিরপেক্ষ ও সকলের উপযোগী একই শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার করিতে হইবে। প্রাচীনপন্থি মাদ্রাসাগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইল। কতকগুলি শিক্ষাবিদদের সহযোগিতায় রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা কারিকুলাম রচিত হইল এবং সাধারণ আদেশ জারি করা হইল যে, প্রত্যেক স্কুল ও পাঠশালাকে এই কারিকুলাম অনুসারে চলিতে হইবে ; নতুবা কাহাকেও স্কুল চালাইবার অধিকার দেওয়া হইবে না। অনেকে মনে করেন যে, তুরস্ক হইতে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কথাটা ঠিক নহে। ইহা অবশ্য সত্য যে, সাধারণ শিক্ষানিকেতনে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। তবে ধর্মশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার জন্য একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে, সেইখানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে বহু ছাত্র ধর্মশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। তুরস্কের সাধারণ শিক্ষার কাঠামো তুরস্কের প্রকৃতির অনুরূপ আদর্শে গঠিত। কিন্তু ইহার উপরিভাগ ইউরোপীয় আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। ছাত্রগণ সাধারণত সাত বৎসর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এখানকার শিক্ষা পাঁচ বৎসরে সমাপ্য। কিন্তু কৃষিজীবিদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা তিন বৎসরে সমাপ্ত হয়। অধিকাংশস্থলে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক পাঠ শেষ করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হয়। এখানকার পাঠ সচরাচর তিন বৎসর। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত সর্বত্র এই ধরণের শিক্ষানীতি প্রচলিত হইয়াছিল। পরে উহা ১৯৩৮ সালে একটু পরিবর্তন হয়। এই বৎসর মধ্যশিক্ষা দুইভাগে বিভক্ত হয়ঃ—(১) সাহিত্যিক, (২) বৈজ্ঞানিক। বর্তমান যুগের অভিনব শিক্ষা-পদ্ধতি এই দুই বিভাগেই অনুসৃত হইয়া থাকে।

মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্রগণ আঙ্গোরা অথবা ইস্তাম্বুলের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এখানে সাহিত্য, আর্ট, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, আইন, ধর্মতত্ত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। * প্রত্যেক বিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার জন্য উন্নত ধরণের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সব সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত সরকারের অধীনে চাকুরী করিবার উপযুক্ততা লাভ করিবার জন্য কতকগুলি বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। গৃহ নির্মাণ, ব্যবসায়, ফ্যাক্টরী, কৃষি প্রভৃতি সব বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে শিক্ষা দিবার জন্য অভিনব ও সহজ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে।

সমগ্র দেশে শিক্ষা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়িয়াছিল সেই জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে বহু অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা, সুযোগ্য শিক্ষক, বিদ্যালয়োপযোগী গৃহ পাঠোপযোগী পুস্তক—এসব কিছুই ছিল না। কলেজের জন্য ভা অধ্যাপক ছিল না, প্রয়োজনমত ট্রেণিং কলেজ ছিল না। শিক্ষকে অভাব দূর করিবার জন্য প্রথম প্রাচীন গ্রাজুয়েট ও সিভি অফিসারদের মধ্য হইতে শিক্ষক ও অধ্যাপক বাছিয়া লওয়া হইল কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশীয় অধ্যাপকগণকে শিক্ষার ভার দেও হইল, বিশেষত, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারে। প্রাথমিক কাজ এ ভাবে চলিয়া গেল। কিন্তু ইহা সমগ্র জাতির প্রয়োজন মিটাই পারিবে না। সুতরাং উপযুক্ত অধ্যাপক ও শিক্ষক সৃষ্টির চে হইতে লাগিল। বহু ছাত্র বিদেশে শিক্ষা লইতেছিল, তাহারা ফির আসিলে অভাব বহুলাংশে দূর হইল। বর্তমানে বিদেশীয় শিক্ষ গণের সংখ্যা একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। দেশের লোক ধীরে ধী শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেছে। বিদ্যালয়ের উপযোগী গৃহ নির্মাণে জন্য বাজেটে বহু টাকার বরাদ্দ করা হইয়া থাকে। তাহার ফ নানাস্থানে বহু নূতন গৃহ ও গবেষণাগার নির্মিত হইয়াছে। ব লাঘব করিবার জন্য সরকার কতকগুলি প্রাচীন গৃহকে বিদ্যাল পরিণত করিয়াছেন। খলিফার যুগে সমরমন্ত্রীর জন্য যে অট্টালি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার একাংশে আজ ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠিত। ইহার সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে কতকগুলি নূতন অট্টালিক

নির্মিত হইয়াছে। সেখানে এই সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়---প্রাণীতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব ইত্যাদি।

১৯২৮ সালে আরবী বর্ণমালার পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণমালা প্রবর্তনের পর নানাদিকে অসুবিধা দেখা দিল। হঠাৎ দরকারী পুস্তক পাওয়া গেল না, ভাল লাইব্রেরী ও পাঠাগার ছিল না। এগুলির অভাব সংবাদপত্র কতকটা দূর করিত। কিন্তু দেশজোড়া অভাব দূর হইল না। হঠাৎ বর্ণমালা পরিবর্তন এক অভিনব ব্যাপার। এক প্রভাতে হঠাৎ তুরস্ক ঘোষণা করিল যে, আর আরবী বর্ণমালা চলিবে না। এই বিধান দ্বারা তুরস্কের শত শত শিক্ষিত লোক হঠাৎ অশিক্ষিত বলিয়া ঘোষিত হইলেন। কারণ, যাঁহারা লাটিন বর্ণমালা জানিতেন না, তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া বর্ণমালা শিখিতে হইল, ছেলেদের 'অ, আ, ক, খ' শিক্ষার মত। একেই ত দেশে শিক্ষা কম ছিল, তার পর আবার একদল পূর্ণবয়স্ক শিক্ষিত লোকের নূতন করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইল। কিন্তু কামাল ইহাতে দমিলেন না। ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণবয়স্কদের শিক্ষার জন্য দেশময় বিরাটভাবে প্রচারকার্য আরম্ভ হইল। কামাল নিজে গ্রামে গ্রামে গিয়া জনসাধারণকে লাটিন বর্ণমালা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই সব উদ্যমের অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল। প্রথম কয়েক মাস দেখা গেল সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র ব্যতীত পড়িবার মত আর কোন পুস্তক রহিল না। তার পর ধীরে ধীরে বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক দেখা দিল। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যে দেশে লাটিন বর্ণমালা প্রচলিত হইয়া গেল। যুক্তাক্ষরবিহীন ছাব্বিশটি অক্ষর ব্যবহারের ফলে তুরস্কে ভাষা শিক্ষার খুব সুবিধা হইয়াছে। ইহা লিপির মধ্যে সরলতা আনিয়াছে। এই সরলতার জন্য শিক্ষাদানও খুব সহজ ও সংক্ষেপ হইয়াছে। এই পরিবর্তন আর একটি উপকার করিয়াছে। প্রাচীন ও নব্য তুর্কির মধ্যে এমন একটা ব্যবধান আনিয়া দিয়াছে যে, বর্তমান তুর্কি যুবকগণ আর প্রাচীনের মোহে আকৃষ্ট হয় না, নব্য-তুরস্ক প্রাচীন পন্থা হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া নবযুগের আদর্শে গঠিত হইতে লাগিল।

১৯২১ সালে জনসাধারণের অধিকাংশ অজ্ঞতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত ছিল। নবীন রাষ্ট্র অশিক্ষা দূর করিয়া শিক্ষা প্রচারকে একটা প্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিল। প্রথমে সৈন্য ও চাষীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ও ব্যবসায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইল। কতকগুলি স্বেচ্ছাসেবককে গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, তাহারা বালকবালিকা ও পূর্ণবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ও শিক্ষানিকেতন স্থাপিত হইল। এই সব প্রতিষ্ঠানে ত্রৈবাৎসরিক পাঠ-ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে। যাহাতে একজনও নিরক্ষর না থাকে, তৎপ্রতি সরকারের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ভার সাধারণ নাগরিকদের উপর দেওয়া আছে। আর উচ্চ শিক্ষার ভার স্বয়ং সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের সর্বত্র একই নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয়, কোথাও তাহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। কোথাও কোথাও বৈদেশিক স্কুল এখনও টিঁকিয়া আছে; কিন্তু সেখানে তাহারা নিজস্ব প্রথা অনুসরণ করিতে পারে না। উহারা তুরস্কের সাধারণ কারিকুলাম অনুসরণ করিয়া থাকে। আঙ্গোরা ও ইস্তাম্বুলে যে বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহা ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতেছে। ১৯২৩-২৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৯১৪ এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে তথায় ৭৪৭৮ জন ছাত্রছাত্রী পড়িত; বর্তমানে তাহাদের সংখ্যা প্রায় আট হাজার হইয়াছে। তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বড় বড় অধ্যাপক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আন্তর্জাতিক জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বহু বিদেশী অধ্যাপকও আছেন। ইঁহারা অল্প দিনের চুক্তিতে নিযুক্ত হন। তাঁহারা শিক্ষা দিবার ধারা শিখাইয়া দিয়া অথবা নূতন কোন বিষয়ে শিক্ষকগণকে উপযুক্ত করিয়া তুলিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। আবার কেহ কেহ থাকিয়া যান এবং তুরস্ক ভাষা শিক্ষা করিয়া কোন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ইঁহারা কোনরূপ রাজনীতি প্রচার করিতে পান না।

তুরস্কে শিক্ষা সাধারণত অবৈতনিক। বিদ্যালয়সংলগ্ন বোর্ডিং গৃহের জন্য কিছু খরচ ছাত্রদের নিকট হইতে লওয়া হয়। কিন্তু বেতন বাবদে কোন ফি লওয়া হয় না। সাধারণ বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষা দিবার অনুমতি নাই; তবে প্রাইমারি বিদ্যালয়ে কিছু কিছু ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। ইস্তাম্বুলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার বিভাগ আছে। সেইখানে বহু মুসলমান ছাত্র অধ্যয়ন করে। প্রাথমিক ও উচ্চ কলেজে সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মধ্যশিক্ষায় সহশিক্ষার ব্যবস্থা নাই। কতকগুলি বিশেষ ধরণের ব্যবসায় ও বৃত্তি যাহা কেবলমাত্র পুরুষদের উপযোগী, সেখানেও সহশিক্ষার ব্যবস্থা নাই। ইহা ব্যতীত সর্বত্র সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে শিক্ষার প্রত্যেক স্তর উত্তীর্ণ হইয়া যদি কেহ আর না পড়ে, তবে সে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইলে যদি কেহ আর অগ্রসর না হয়, তবে সেও কিছু কিছু উপায় করিতে পারে। এইভাবে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত কিছু বৃত্তিশিক্ষা দেওয়া হয়। বস্তুত তুরস্কে শিক্ষা বিষয়ে এক মহা বিপ্লব সাধিত হইয়াছে। তুরস্কের মানসিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনীতিক, প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তুরস্ক আজ প্রত্যেক বিষয়ে আধুনিক হইয়াছে। তাহার অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়া মনে হয় তাহার ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল, আরও গৌরবময়।

ক্ষতিপূরণ

শ্রীজগদিন্দ্র মিত্র

বাড়ির সামনে ছোট পুকুর, পিছনে আমজামের বাগান। ঘরে সিয়াই ক্ষেত দেখা যায়—চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ! সেই কে চাহিয়া থাকিতে চরণদাসের বড় ভাল লাগে, অপূর্ব আনন্দে রীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। পাকাসোনার উজ্জ্বল আভায় একদিন ই সবুজ ধানের সবুজ কোমলতা হারাইয়া যাইবে। এবং সেই দিনের াগমন প্রতীক্ষায় ধানের কচি শীষগুলি যেন আশায় আশায় াঁপিতেছে। সেই দিন সফল হইবে তাহার সোনার স্বপ্ন!

বাপ থাকিতে এদিকে সে বড় আসে নাই। তাহার বাপকেই চাষ াবাদের সব হাঙ্গামা বহন করিতে হইয়াছে। তাহার মৃত্যুর পর সকলের ভার আসিয়া পড়িল চরণদাসের উপর। ভাসা ভাসা দেখা ড়া কোন অভিজ্ঞতা তাহার নাই। প্রথমে একটু মুস্কিলেই সে ড়িল।

পাশেই কাকার হিস্যা। একেবারে লাগালাগি নয়, তবে ব্যবধান ূর সামান্য।

কাকাকে গিয়া বলিল,—"কি করবো, কাকা!"

কাকা মধুসূদনের ভর্তি সংসার। ক্ষেতের ধানে কুলায় না, ন্যদিকেও কিছু না দেখিলে তাহার চলে না। প্রায় সকল সময়ই াকে বাহিরে বাহিরে।

মধুসূদন কহিল,—"কি করবো, মানে?"

—"এই ক্ষেত!"

একটু চুপ থাকিয়া মধুসূদন কহিল—"চাষার পুত! ক্ষেত দিয়ে ক করবো, মানে! দে বিক্রি করে; তারপর ব্যস, বাবু সেজে বেড়াও। ইলে বাপদাদার নাম থাকবে কি করে।"

মধুসূদনের কথার ধরণ-ই ঐ রকম। কথা বলে অল্প কিন্তু াহার ধার এবং ভার থাকে বেশী।

চরণদাস ক্ষেত বিক্রি করিল না, তবে বাগী বন্দোবস্ত করিয়া াসিল। কিছুই তাহাকে করিতে হইবে না, ফসলের অর্ধেক পাইবে। াড়িতে কেহ নাই। বাপ মরিয়াছে প্রায় বছর খানেক। দুই বোন রের ঘরে। নিজেদের সংসারের জাল ছিঁড়িয়া যে একবার আসিয়া ন কয়েক থাকিয়া যাইবে, এমন উপায় নাই। অগণিত ছেলে লেসহ সুখ দুঃখের নানা আবর্তে জড়াইয়া গিয়াছে। আগের ভাবও বদলাইয়া গিয়াছে, এখন আর কাহারো দিদি তাহারা নয়, ৃহিণী এবং মা!

মা মরিয়াছে অতি শৈশবে। একটু গল্প করিবার মত কেহ াই। কাকিমা মাঝে মাঝে আসেন সত্য, কিন্তু সাংসারিক কাজের থায় এই অল্প মুহূর্তগুলি এত আটসাট থাকে যে গল্প করিবার কটু নিশ্চিন্ত বিচ্ছেদও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কথা বলিবার ৎসাহ কাকিমার মুখের দিকে চাহিলেই শুকাইয়া যায়। কাকার লেমেয়েরা আসিয়া কোলাহলে বাড়িটাকে কিছু সময়ের জন্য শব্দময় রিয়া তুলে কিন্তু লোভ তাহাদের কামরাঙা গাছের উপর। চুপিচুপি াসিতে হয়, অতএব চরণদাসকে এড়াইয়া চলে। একটানা নীরবতার ক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা চরণদাসের শূন্য মনকে এই আলো আঁধারময় গতের রূপরস হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে। জগতের সকল ঐশ্বর্য াহার কাছে ব্যর্থ হইয়া যায়। বাবা থাকিতে ছোটখাট ক্ষণ উত্তেজনায় মন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত, এখন ইহা আর তাহার মনে কান উত্তেজনা আনিয়া দিতে পারে না। তাহার মন ক্ষণে স্তব্ধ, ক্ষণে দাস, ক্ষণে বিরক্ত হইয়া উঠে।

এই মনের অবস্থা! তখন চলিল বড়দিদির ওখানে। বড়-দিদিকে তাহার ভাল করিয়া মনে নাই। তাহার জ্ঞানবোধের আগেই চলিয়া গিয়াছে অন্যের বাড়ি।

চরণদাসকে দেখিয়া দিদি একটু বিস্মিত হইল, কহিল,—"ওমা, চরণ দেখি! ইস্ কত বড় হয়ে গিয়েছিস্! কেমন আছিস্?"

—"ভাল।"

—"আয় আমার সাথে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?"

কয়দিন এখানে কাটিল মন্দ নয়। দিদির ছোট ছোট কথা ও ছেলেপুলের অবিরল কোলাহলে অনেকটা সে স্বস্তি পাইল। কিন্তু ইহাও বেশী দিনের জন্য নয়! বাড়ি ছাড়িয়া কোনদিন সে থাকে নাই। বাপ থাকিতেও বাহিরে থাকিতে দেয় নাই। বাড়ির জন্য তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। এক দুর্বার টান তাহার মনে তীব্র হইয়া উঠে। মনে হয়, বাড়ির মাটি তাহাকে ডাকিবার ভাষা না পাইয়া স্তব্ধ-অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে। গাছের পাতাগুলি কাঁপিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। শূন্য ঘরের হাহাকার সে যেন স্পষ্ট শুনিতে পায়। বাড়ি তাহাকে চায়!

দিদিকে বলিল,—"আমি কাল বাড়ি যাবো।"

দিদি অবাক হইয়া বলিল,—"বাড়ি যাবি! সেখানে একলা যে থাকবি! না-না, এমন কথা বলিস্ নে। বাড়িতে এমন কি!"

চরণদাস কোন উত্তর দিল না। দিদির কাজ ছিল অনেক, কথা আপাতত সেইখানেই শেষ হইল। সারাদিন দিদি আর অবসর পায় না। ধান সিদ্ধ করিতে হয়, চাউল ভানিতে হয়, তাছাড়া ঘর-লেপা, পাক করা ইত্যাদি কাজের সীমা সংখ্যা নাই। রাত্রিতে খাওয়ার পর চরণকে কাছে ডাকিয়া বলিল,—"সত্যি তুই বাড়ি যাবি?"

চরণ কহিল,—"হ্যাঁ, দিদি।"

"কিন্তু ওখানে তুই থাকবি কি করে। এখানে থাক্ না বাড়ির সব বন্দোবস্ত উনি করে দেবেন।"

—"তা হয় না দিদি।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া দিদি বলিল,—"কতদিন পরে তোকে দেখেছি। মাঝে মাঝে একবার দেখে যাস্। কাল যাবি কিরে, আরো দুদিন থাক্। নুরো ধান মাত্র পড়েছে, তুই পিঠে খেতে ভালবাসিস্। কিছুই তোকে খাওয়াতে পারলাম না।"

দিদির চোখ অশ্রুসজল হইয়া আসিল।

ছোটদিদি তাহার চেয়ে ছয়-সাত বছরের বড়। পাঁচ-ছয় মাইল দূরে এক গ্রামে বিবাহ হইয়াছে। বেশি দূরের সম্বন্ধে তাহার মার আপত্তি ছিল, বলিয়াছিলেন, কাজ নাই দূরের কুটুম্বিতায়। কাছে থাকিলে বছরে দুই-একবার দেখাশুনা করিতে পারা যায়, কি হইবে যদি দূরে সুখেই থাকে। এই তো টেঁপি এখন পর। কতদিনের মধ্যে একবার দেখিতে পারেন নাই। আনাইবার হাঙ্গামাও অনেক নিজেও আবার যাইতে পারেন না। ছেলে একটু চালাক চতুর হইলে মেয়ের জন্য ভাবনা কি! আর জামাই বনমালী হইয়াছে চালাক-চতুরই। শহরে থাকিয়া ঠিক মুহুরীগিরি নয়, আশে-পাশের গাঁয়ের মামলা তদারক করে। এই সূত্রে শহরে অনেক উকিল-মোক্তারের সহিত তাহার পরিচয়।

চরণদাসের এই দিদি প্রায় বছর তিনেক হয় কলেরায় মারা গিয়াছে। বনমালী আবার বিবাহ করিয়াছে। মৃত দিদির সতীনকে সে ডাকে, দিদি। বয়সে ছোট হইলে কি হইবে, সীতা দিদিগিরির পুরো আধিপত্যের একবিন্দু অধিকার ছাড়িতেও রাজি নয়।

সীতা রান্না করিতেছিল, মাথায় ঘোমটাটানা।

কহিল,—"কিগো মশাই, পথ ভুলে নাকি!"

চরণদাস কহিল,—"কেন দিদিকে কি দেখতে আসতে পারিনে।"

—"তবু যাহোক্ দিদিকে যে মনে পড়েছে। ওমা, দাঁড়িয়ে কেন? বসতে আজ্ঞা হোক্। পিঁড়ি পেতে দিতে হবে নাকি!"

চরণদাস হাসিয়া কহিল,—"মন্দ কি!"

—"আমারই অন্যায় হয়েছে। পোড়াকপাল! তবু ভাল যে চেয়ার চেয়ে বসনি! কি করবে, গরীব বোন। বস, এই যে পেতে দিলাম পিঁড়ি।" একটু থামিয়া বলিল,—"কোথায় ছিলে এতদিন,—বৌ-এর খোঁজে?"

—"বৌ পাবো কোথা!"

—"এ কি রকম তোমার কথা চরণ; বৌ-এর অভাব কি! দিদিকে খাওয়াও, পাড়াপড়শি দু'একদিন পেটভরে খাক্, তবে তো বৌ আসবে।"

সীতার কথার নমুনা এই রকম। কথায় কোন জড়তা নাই, ব্যবহারে কোন সংকোচ নাই; পরিপূর্ণতার তৃপ্তিতে সে যেন সম্পূর্ণ।

দুপুরের পরেই সীতার অবসর। পান চিবাইতে চিবাইতে চরণদাসের ওখানে উপস্থিত হইল। সাথে শচীরাণী। ডাগর ডাগর চোখ, লজ্জায় নতমুখি।

সীতা কহিল,—"আ-লো, রাখ্ লো এত ঢং! ও কি তোকে খেয়ে ফেলবে?"

শচীরাণী আরো লজ্জা পাইয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"কি যে তুমি বলো!"

—"আমি বলি ভাল কথা! এই যে চরণ তুমি আবার যাচ্ছ কোথা?"

চরণ উঠিয়া যাইতেছিল, আমতা আমতা করিয়া কহিল,—"না, বাইরে যাচ্ছিলাম, বড় গরম!"

সীতা হাসিয়া উঠিল, কহিল,—"তোমার যে গন্ডারের চামড়া, তাতে আবার গরম! এতক্ষণ বুঝি গরম লাগেনি!—একে চিনতে পারো?"

শচীরাণীর লজ্জানত মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিবার ইচ্ছা চরণদাসের মনেই রহিয়া গেল। কম্প্রনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া এক বেপথুমানা কিশোরী। কোনদিন তাহাকে দেখে নাই। কি উত্তর দিবে সে!

সীতা কহিল,—"বেশী চিনে আর কাজ নেই। আ-লো পোড়ারমুখি, এদিকে দেখ না চেয়ে—ও আমার ভাই!"

শচীরাণী মুখ তুলিয়া একটু চাহিল। চরণদাসের সহিত চোখাচোখি হইতেই ফিক্ করিয়া হাসিয়া মাথা নত করিল।

আরো কয়েকবার দেখা হইয়াছে শচীরাণীর সাথে। সরম-রোমাঞ্চিত লাবণ্যপুষ্ট দেহ নিয়া সে দূরে দূরেই রহিয়াছে। স্নিগ্ধ-হাসিতে হৃদয়ের সমস্ত কোমলতা বিচ্ছুরিত করিয়া সে ক্ষান্ত রহিয়াছে। তাহার কাছে বড় আসে নাই। অতি সাধারণ কথার বেশী বলে নাই।

কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাপুঞ্জ অতি স্পষ্ট হইয়া চরণদাসের মনে আনিয়া দিল এক অদ্ভুত সাড়া। সে বুঝিতে পারে না, এ কি! ভোরের আকাশের গায়ে ফুটি-ফুটি আভার মত এক অস্ফুট আশার আলোকে তাহার মন উজ্জ্বল হইয়া উঠে। রক্তপ্রবাহের মধ্যে সে সুপ্ত এক সুরের মৃদু ঝঙ্কার শুনিতে পায়। শচীরাণীর এক অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি আস্তে আস্তে তাহার কাছে জীবন্ত হইয়া উঠে। আরো জীবন্ত হইয়া উঠুক্, আরো-ও;—চরণদাসের মনে এই কামনা প্রবল হইয়া উঠে।

বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। হাল-চাষের কাজে সে মাতিয়া রহিল কয়েকদিন। জমি-বাগিচা কাহাকেও সে দেয় নাই। কাজের চাপে সীতাদিদির বাড়ি সে যাইতে পারে নাই। আসিল অনেকদিন বাদে।

দুপুরবেলা। বিছানায় শুইয়াও ঘুম আসিতে চাহিল না। বর্ষার আসন্ন সমাগমে মাছও ভাল পাওয়া যায় না। একটা বঁড়শী নিয়া আসিয়া বসিল সীতাদিদির পিছনের পুকুরে।

একটু পরে আসিল শচীরাণী। সাথে কেহ নাই, কহিল,—"কি মাছ ধরলেন?"

—"কিছুই না!"

—"কিন্তু বসে আছেন তো অনেকক্ষণ ধরে।"

চরণদাস হাসিয়া কহিল,—"মাছ ত আর আমার অধীন নয়, কি করবো—খাচ্ছে না যে!"

শচীরাণী মৃদু হাসিয়া কহিল,—"কিন্তু আপনি আপনার অধীন,—উঠে আসুন। কি করবেন আর বসে—মাছে খাবে না।" একটু চুপ রহিয়া বলিল,—"আপনার বাড়ি কতদূর?"

—"বেশী দূর নয়—পাঁচ মাইল হবে।"

—"কি করে যান?"

—"এখনও হেঁটে যাওয়া যায়, কিন্তু বর্ষায় যেতে হয় নৌকায়। যাবে একদিন আমাদের বাড়ি?"

শচীরাণীর মুখ লজ্জাভারে আরক্ত হইয়া গেল, কহিল,—"যান!"

চরণদাসের কিন্তু ভাল লাগিল খুব এবং ভাললাগার খুশীতে তাহার মন পূর্ণ হইয়া রহিল অনেকদিন। সমস্ত চিন্তার উপর অপরূপ কোমলতার রোমাঞ্চ পরশ সে অনুভব করে। নীরবতার মাঝে বিকশিত হইতে থাকে মনোরম কল্পনার মোহময় আবেশ। বড় ভাল লাগে তাহার তখন। একবার তাকায় তখন সবুজ ক্ষেতের দিকে। সুন্দর এক স্বপ্ন সফল হইবার অগ্রবাণী নিয়া ক্ষেত তাহার কাছে মূর্ত হয়—ধানের সহস্রকম্প্র শীষে যেন পরম প্রীতি ভরে এই স্বপ্নকে বাজন করিতেছে। চরণদাস বিপুল খুশীতে হতবাক্ হইয়া দেখে। তাহার গোপন অব্যক্ত ইচ্ছার এক বাস্তব রূপ তাহার সামনে ঐ ধানভরা ক্ষেতে যেন সত্য হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষেত তাহার মনের সকল কামনা যেন জানিতে পারিয়াছে—কিছুই আর গোপন নাই। এখন সে বুঝিতে পারিয়াছে তাহার বাবা মাটির মায়ায় কি করিয়া সকল ক্লান্তিকে সহ্য করিয়াছে, মাটির সপ্রীত সহানুভূতিতে কি করিয়া সকল কষ্ট, অনটন জয় করিয়াছে। মাটির নীরব ভাষায় কি করিয়া ভবিষ্যতের আশার বাণীর বার্তা পাইয়াছে। মাটি তাহাদের আপন, মাটি তাহাদের পরমবন্ধু!

অলসভাবে সে শুইয়া থাকে। এক কামনার গুনগুন্ সুর তাহার মনে ঘুমপাড়ানির গানের মত বাজিতে থাকে। বুঝিতে পারে না, কোথায় সে সুরের উৎস। কাজ করিতে গিয়া সে উন্মনা হইয়া যায়, একবার বসে, একবার শোয়। এইভাবে চলে তাহার দিনের মুহূর্তগুলি। কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে তাহার মন। রিক্ততার জমাট অন্ধকারে কি না-পাওয়ার বেদনা যেন হাহাকার করিয়া মরে। শচীরাণীকে কাছে পাইবার ইচ্ছা তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠে। এক দুর্জয় সংকল্প মনে উদিত হইয়া আবার মিলাইয়া যায়। এইভাবে চলে তাহার দিন।

মনের এই অবস্থা মুক্ত হইল একদিন প্রচণ্ড জিদ্‌রূপে; তাহার ইতিহাসটা এই :

মধুসূদন উত্তেজিতভাবে আসিয়া কহিল,—"চরণ!"

—"কি কাকা!"

—"বাড়িতে বসে বসে কি করিস্?"

চরণদাস কিছুই বুঝিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

মধুসূদন কহিল,—"আয় আমার সাথে ক্ষেতে! দেখে যা, হারামজাদা!"

মাঠে আসিয়া চরণদাস আরো বিস্মিত হইয়া গেল। চারিদিকে

সবুজ ধানের শীষ, বাতাসে দুলিতেছে। ইহার মধ্যে তাহার কাকার উত্তেজিত হইবার কি কারণ রহিয়াছে বুঝিতে পারিল না।

ডান পাশে হরি নমশূদ্রের ক্ষেত এবং সেইদিক দিয়া বেড়া। চরণদাসকে সেইখানে নিয়া মধুসূদন কহিল,—"এই দেখ্, শালাদের কান্ড!"

চরণ কহিল,—"কি?"

—"আবার বলছিস্, কি! হারামজাদা, বেড়া ওদের এইখানে ছিল নাকি? এই দেখ্ তোর ক্ষেতের উপর এসে পড়েছে—ভাল করে চেয়ে দেখ।"

বেড়া তাহার সীমানায় আসিয়াছে সত্য; কিন্তু পরিমাণ বেশী নয়।

চরণদাস কহিল,—"কি করবো।"

—"কি করবো, হারামজাদা!" মধুসূদন বোমার মত ফাটিয়া পড়িল,—"কি আর করবি? যা, নাকে তেল দিয়ে ঘুমুগে! যা খুশী কর। ইচ্ছে হয় মর—আমার কি!" মধুসূদন রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

চরণ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জমির অতি সামান্য অংশই বেড়ার মধ্যে পড়িয়াছে। কিন্তু ক্ষেতের দিকে একবার চাহিয়া তাহার মনে হইল, এই অঙ্গচ্ছেদে ক্ষেত যেন অপমানের ক্রন্দনভারে ম্রিয়মাণ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—অসহায়তার ব্যথায় মৌন সে। চরণদাস সহ্য করিতে পারিল না। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বেড়া ভাঙিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। রাগ তাহার এইখানেই থামিতে চাহিল না, যে তাহার স্বপ্নবিলাসী মনের অকপট সাথীর উপর অন্যায় অধিকারের গ্লানি আনিয়া দিয়াছে, তাহাকে সাজা দিবার এক দুর্বার জিদ্ চরণদাসের মনে তীব্র হইয়া উঠিল। চলিয়া আসিল বনমালীর কাছে।

বনমালীও ক্ষেপিয়া উঠিল, কহিল,—"দাও মামলা করে।"

—"মামলা!"

—"হ্যাঁ, নইলে ও বেটা ঠিক হবে না। শালাদের একবার মজা দেখিয়ে দিই! একি মগের মুলুক!"

চরণদাস খুশী হইয়া কহিল,—"বেশ, তাই দাও। নমসুত বেটা যেন টের পায় মজাটা।"

মামলা রুজু হইয়া গেল এবং ইহার উত্তেজনায় চরণদাসের মনে আর কোন ভাবই বড় হইয়া উঠিতে পারিল না। বরং মনের অতৃপ্ত অবচেতন কামনাগুলি তাহাকে এইদিকে কর্মব্যস্ত করিয়া রাখিল। সাক্ষী যোগাড় করে, শহরে গিয়া মামলা তদারক করে। বেশীর ভাগই সে থাকে সীতাদিদির বাড়ি।

মামলার নেশায় সে মাতিয়া উঠিল।

বনমালী একদিন কহিল,—"আরো টাকা লাগবে।"

—"টাকা?"

—"হ্যাঁ, টাকা! মামলা হলো টাকার খেলা—কতভাবে, একে দিতে হয়, ওকে দিতে হয়।"

চরণদাস কহিল,—"টাকা পাবো কোথায়?"

—"একথা বললে চলবে না, চরণ। মামলার মাঝে পিঠটান দিলে লোকে যে হাসবে। একটা বন্দোবস্ত করতেই হবে।"

—"তুমি বরং এখন চালিয়ে দাও।"

বনমালী হাসিয়া কহিল,—"কি যে কথা তোমার! আমার কাছে টাকা থাকলে কি তোমার কাছে আর চাই? দেখি, একটা বন্দোবস্ত করা যায় কিনা।"

টাকা অবশ্য পাওয়া গেল গণেশ পোদ্দারের কাছে। ইহার জন্য ফসলসমেত জমি তাহার কাছে বন্ধক রাখিতে হইল। টাকা দিতে পারিলে তো কোন কথাই নাই, না দিতে পারিলে, সুদ বাবদ জমির ফসলের অধিকারী সে হইবে।

চরণদাস প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিল এবং বেদনাবোধও করিয়াছিল। কিন্তু তাহা অল্প সময়ের জন্য। জিদের বিপুল ব্যাপ্তিতার মধ্যে এই অনিচ্ছার বুদ্বুদ্ অচিরেই লয় হইয়া গেল হরি নমশূদ্রকে শিক্ষা দিতে হইবে!

কয়েকদিন পর পরই শহরে যাইতে হয়—বনমালী সঙ্গে যায় কোনদিন ফিরে রাত্রে, কোনদিন বা পরের দিন।

সীতা একদিন বলিল,—"বারে, তোমরা ভারি মজা করে বেড়াচ্ছ; আমরা কি দোষ করেছি—আমরাও যাবো।"

চরণদাস কহিল,—"কোথায় যাবে দিদি?"

"কেন শহরে যাবো। আমি যাবো, শচীও যাবে। না, না বললে শুনবো না। আমাদের নিতেই হবে—এবার ছাড়ছি নে।"

চরণদাস হাসিয়া কহিল,—"না ছাড়লে আর কি করা যায় বেশ, একদিন চল। সবাই একসঙ্গে বেড়াতে গেলে চমৎকার হবে দিদি!"

সেই রকমই বন্দোবস্ত হইল। বর্ষাকাল, ঘরের বাহির হইলে নৌকা ছাড়া উপায় নাই। শহর খুব দূরে নয়, নৌকায় বোধ হ ঘণ্টা চারেক লাগে। ঠিক হইয়াছে, আগের দিন দুপুরে খাওয় দাওয়া সারিয়া রওনা হইবে, ফিরিয়া আসিবে পরের দিন। খাবা খাওয়ার বন্দোবস্ত নৌকায়ই থাকিবে।

রোদের তেজ কমিয়া আসিতেই নৌকা-ভ্রমণের আরাম চমৎক হইয়া দেখা দিল। চরণদাস বাইরে ছই-এর উপর চুপ করিয়া বসি রহিল। উপরে দিগন্তব্যাপী নীল আকাশের গায়ে শীতলতার আমে লাগিয়াছে, চারিদিকে অকুণ্ঠ প্রসন্নতার ছাপ। খুশীর তুলি-লিখ কামনার বিচিত্র বর্ণবিন্যাস চিত্রিত করিয়া দিতে লাগিল তাহ মুগ্ধ মনকে।

শচীরাণী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, চরণদাস তাহা লক্ষ্য ক নাই।

শচীরাণী আস্তে আস্তে কহিল,—"কি করছেন?"

চরণদাস কহিল,—"বাইরে বসে আছি। বড় ভাল লাগ তোমার কেমন লাগছে?"

—"ভালই। কিন্তু এতদিন তো আমার খোঁজ একবা নিলেন না!"

—"কাজে যে আজকাল বড় ব্যস্ত আছি।"

—"আমি কিন্তু খোঁজ নিই।"

—"সত্যি?"

—"কেন, মিথ্যে বলছি নাকি!"

চরণদাস কহিল,—"মিথ্যে হবে কেন। আচ্ছা, শচীরাণী—!

শচীরাণী মৃদুস্বরে বলিল—"বলুন।"

—"তুমি আমার বাড়ি যাবে?"

শচীরাণীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। একটু চুপ রহিয়া নতম বলিল,—"নিলে নিশ্চয়ই যাবো।"

চরণদাস একটু সরিয়া আসিল, আস্তে আস্তে বলিল "সীতাদিদি কি বলছে, জানো তুমি?"

হাসিয়া মৃদুস্বরে শচীরাণী কহিল,—"জানি।"

—"কেমন হবে।"

লজ্জায় নত হইয়া শচীরাণী কহিল,—"যান্!"

চরণদাস হাসিয়া কহিল,—"এতে লজ্জা পাচ্ছ কেন তু অঘ্রাণ মাসে ধান পাবো। সেই আশায় আছি। বিক্রি করে টাকা পা এতে খরচ কুলিয়ে নিতে পারবো। কি বলো তুমি?"

শচীরাণী একটু চুপ রহিয়া বলিল,—"কিন্তু শুনেছি, আপনি বন্ধক দিয়েছেন।"

চরণদাস হাসিয়া কহিল,—"তার জন্য ভাবনা কি। ি ব্যাটাদের একটা সাজা দেওয়া দরকার।"

কথাটা চরণদাস তখন হাসিয়া উড়াইয়া দিল সত্য; কিন্তু হইতে একেবারে বিদায় করিতে পারিল না। মামলার চিন্তার ম

শচীরাণীর লজ্জানত মুখের কোমল মায়ায় তাহার মন ভরিয়া রহিল। পাকা ধানের মঞ্জরে কবে তাহার ক্ষেত সজ্জিত হইয়া উঠিবে, সেই চিন্তায় তাহার মন ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠে। দেরি তাহার সহিতে চাহিতেছে না।

ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে শচীরাণীর সাথে তাহার দেখা হইয়াছে। বেশী কথা বলিতে পারে নাই। সরম-পুলকের বিপুলতায় তাহার সমস্ত কথা নির্বাক হইয়া গিয়াছে।

একবার হয়ত কাছে আসিয়া বলিয়াছে,—"কেমন আছেন?"

চরণদাস বলিয়াছে,—"ভাল। তুমি কেমন?"

একটু হাসিয়া সে বলিয়াছে—"খারাপ থাকবো কোন্ দুঃখে! আচ্ছা, আপনার মামলার কি হয়েছে?"

—"মামলা চলছে। কিন্তু এত ব্যস্ত হচ্ছ যে!"

—"ব্যস্ত না ছাই! অঘ্রাণ মাসের আর বাকি বেশী নাই।"

সত্যি অগ্রহায়ণ মাসের আর বেশী বাকি নাই। এদিকে মামলাও শেষ হয় নাই। টানিয়া টানিয়া কেবল লম্বা হইয়া চলিয়াছে। শীঘ্রই মামলা শেষ হইবে এবং ক্ষতিপূরণও সে পাইবে, এই আশ্বাস ধনমালী তাহাকে দিয়াছে। এই আশায় চরণদাস বুক বাঁধিয়া আছে—ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়া সে জমি মুক্ত করিয়া আনিবে। চরণদাস চিন্তিত হইয়া উঠিল—ইহার মধ্যে মামলা যদি শেষ না হয়, তবে হইবে কি? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, না হউক শেষ, শালা হরি নমস্তকে শিক্ষা দিতেই হইবে। টাকার ব্যবস্থা একটা হইবেই। জিদের আগুন আবার জ্বলিয়া উঠিল তাহার মনে। আবিল ধূঁয়ায় শচীরাণীর মায়া আস্তে আস্তে ফিকা হইয়া গেল। প্রধান হইল জিদ্, আর জিদ্।

বিচার শেষ হইল অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকে। তখন ধান কাটা আরম্ভ হইয়াছে। হরি নমস্তের কয়েক টাকা জরিমানা হইয়াছে, ইহা হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ চরণদাস পাইয়াছে পাঁচ টাকা। টাকার অঙ্কটা তাহার কাছে তখন বড় নয়, হরি নমস্তের সাজা হইয়াছে—এই আনন্দে সে অধীর হইয়া উঠিল। তাহার জিদ্ বজায় রহিয়াছে—এই তাহার জয়!

সকলে বলিল,—"এবার একটা ভোজ দাও।"

চরণদাস খুশীর সহিত কহিল,—"নিশ্চয়ই!"

বাড়ি আসিতে দেখিতে পাইল তাহার ক্ষেতে ধান কাটা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। গণেশ পোদ্দারের লোক ধান কাটিয়া নিতেছে। টাকা সে দিতে পারে নাই। তাহার সেই একান্ত আপনার মাটি, আজ পর হইয়া গিয়াছে।

চারিদিকে সোনার মত পাকা ধান। এই পাকা ধানের সবুজ রঙএ তাহার এতদিন মনে হইয়াছে, সমস্ত ক্ষেত জুড়িয়া রহিয়াছে শুধু শচীরাণীর এক অশরীরী মূর্তি। পাকা ধানের মৌন অপেক্ষায় চাহিয়া রহিয়াছে, ভাষাহীন এক স্তব্ধ আশায় তাহার উন্মুখ-চঞ্চল মন মধুর ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ। কিন্তু এতদিনের সেই স্বপ্নের আজ একি হইল পরিণতি! জিদের আগুনে সে এতদিন পুড়িয়া মরিতেছিল, ক্ষেতের দিকে একবার চাহিয়া সে দেখে নাই। আজ তাহার মনে হইল, সামনের ঐ লোকগুলি মুঠি মুঠি ধান কাটিয়া শচীরাণীর এই কল্পমূর্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতেছে। অসহায় সে, তবু আশাভরে আরো ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া রহিয়াছে।

চরণদাস আর নিজকে সামলাইতে পারিল না। চোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সদ্যপ্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের পাঁচ টাকা বারে বারে শক্ত মুঠিতে চাপিয়া ধরিয়াও নিজের মনকে শান্ত করিবার কোন শক্তিই সে খুঁজিয়া পাইল না। বিমূঢ়ের মত অনেকক্ষণ ক্ষেতের দিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্যি মানুষ নিষ্ঠুরও নয়, বোকাও নয়—বড় জেদি! জিদ্‌টা তাহার বেশী। জিদ্-পূরণই তাহার সমস্ত ব্যথা, দুঃখ, দৈন্য এবং আশাভঙ্গের একমাত্র ক্ষতিপূরণ!

সাহিত্য সংবাদ

তৃতীয় বার্ষিক সাহিত্য এবং শিল্প প্রতিযোগিতা

প্রবন্ধ—(ক) পুরুষদিগের জন্য (পুরস্কার—রৌপ্য পদক), বাঙলা গল্প ভাল লাগে?—কার?—কেন? বা সাহিত্যে নোবেল—পুরস্কার-প্রাপ্ত কোন্ লেখককে ভাল লাগে?—কারণ কি? বা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প সম্পর্কে আলোচনা ও মন্তব্য। (খ) মহিলাদিগের জন্য (পুরস্কার—রৌপ্য পদক), আধুনিক তরুণী কোন্ পথে? বা বর্তমান যুগে দ্রৌপদীর আদর্শের সার্থকতা কি? (গ) বার বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালকবালিকাদিগের জন্য (পুরস্কার—রৌপ্য পদক), ভাল বনাম খারাপ ছেলে বা মেয়ে বৈষয়িক প্রবন্ধ অথবা গল্প। গল্প—সর্বসাধারণের জন্য (পুরস্কার—রৌপ্য পদক), মামুলী মোহ-মিলনাত্মক বা প্রগতির কুরুচি-সম্পন্ন চিত্র ব্যতীত—যে কোন সামাজিক গল্প বা হাস্যোদ্দীপক গল্প বা কোন অভিনব ঘটনা অবলম্বনে গল্প। কবিতা—সর্বসাধারণের জন্য পুরস্কার—রৌপ্য পদক), বর্ণনামূলক বা হর্ষপ্রধান। আলোকচিত্র (ফটোগ্রাফী)—সর্বসাধারণের জন্য পুরস্কার—রৌপ্য পদক)। নারী-শিল্প—কেবলমাত্র স্থানীয় মহিলাদিগের জন্য (পুরস্কার—রৌপ্য পদক), যে কোন ছুঁচের কাজ। চিত্র প্রবন্ধাদি পাঠাইবার শেষ তারিখ ২২শে আশ্বিন, শুক্রবার, সন ১৩৪৯।

শ্রীনীহার বন্দ্যোপাধ্যায়,
সম্পাদক—কেলাবাগান বালক সঙ্ঘ,
পোঃ আঃ বৈদ্যনাথ-দেওঘর।

সাহিত্য প্রতিযোগিতা

চন্দননগর 'ঝরণা সাহিত্য সঙ্ঘের' ষষ্ঠ বার্ষিক উপলক্ষে সাহিত্য প্রতিযোগিতায় সর্বসাধারণকে আহ্বান করা হইতেছে।

প্রবন্ধঃ—১। মহামানব ও সাধারণের চক্ষে রবীন্দ্রনাথ। ২। কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যের ধারা। ৩। কবি ও ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ এবং কি হিসাবে তিনি বিখ্যাত "?"। ৪। "?" কোন নির্দিষ্ট বিষয় নাই। ফুলস্কেপের ১০ পৃষ্ঠার অনধিক হইবে।

গল্পঃ—১। "?" শিশুদের উপযোগী মনোবিশ্লেষণমূলক। "?" যে কোন বিষয়। "ঐ" ৮ পৃষ্ঠার অনধিক হইবে।

সমালোচনাঃ—১। দেবদাস। ২। বড়দিদি। "ঐ" ১৪ পৃষ্ঠার মধ্যে।

নাটকঃ—১। সামাজিক। "ঐ" ১৬ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না।

কবিতাঃ—১। "?" কোন বিষয় নাই। গদ্য কবিতা চলিবে না। "ঐ" ২ পৃষ্ঠার মধ্যে।

ছবিঃ—রঙীন। ফটোঃ—বিশেষ কোন আকারের প্রতিকৃতি।

বিঃ দ্রঃ—সর্বোৎকৃষ্ট লেখার জন্য রৌপ্য পদক। কোন বিভাগে ৬ জনের কম প্রতিযোগী থাকিলে ২য় পুরস্কার দেওয়া হইবে না। কোন প্রকাশিত (?) রচনা চলিবে না। লেখার নকল রাখিয়া ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার গুঁই, প্রধান সম্পাদক, 'ঝরণা সাহিত্য সঙ্ঘ', তেমাথা জি টি রোড, চন্দননগর।

৩

মেসের সিঁড়ির ধারে পার্কের সেই ছোকরার সঙ্গে দেখা। সেও এই মেসেই থাকে। অনুপম কিন্তু আজই তাহাকে এই মেসের বাসিন্দা বলিয়া জানিল। পরস্পর আক্রোশ-ভরা দৃষ্টি বিনিময় হইল, তারপর প্রথমেই অনুপম গটগট করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। পিছনে পিছনে ক্রোধ-ভরা মুখে উঠিতে লাগিল বব্-করা চুল।

উপর তলায় একপ্রান্তে অনুপমের ঘর। জুতার হিলে মেঝেটাকে সচকিত করিতে করিতে সে যাইয়া ঘরে ঢুকিল। বব্ পিছনেই আসিতেছিল; সে আবার সারসের মত গলা লম্বা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘরের নম্বরটা দেখিয়া লইল। সে উপর তলায় থাকে। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করা মাত্র অনুপমও পা টিপিয়া টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং পিছু পিছু উপরে গিয়া প্রতিদ্বন্দ্বির ঘরের সঙ্গে পরিচয় করিয়া আসিল।

অতঃপর নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া অনুপম ভজহরিকে জরুরী হাঁক দিল।

'একশো আঠার নম্বরে কে থাকে জানিস?'

'তা আর জানিনে। উনি হলেন গিয়ে শিহরণবাবু।'

'কি করে উল্লুকটা?'

'উনি ছড়া লেখেন, যাকে তোমরা বল কবিতে; আর কিছু করেন না।'

'ওটা একটা মুখপোড়া হনুমান, বুঝলি?'

'এই যে বললেন উনি—উ দিয়ে কি জানি বললেন......'

'আলবৎ উল্লুক। হনুমানও। দুটোই।'

'এজ্ঞে বুঝেচি।'

'তবে যাও, এবার ভাত নিয়ে এস।'

অনুপম টাই খুলিতে খুলিতে জানাল্যার কাছে আগাইয়া গেল। মনে মনে কহিল, যাক, ওটাও বেকার; নইলে প্রায় ভাবিয়ে তুলেছিল।

একশো আঠার নম্বর ঘরে কবি শিহরণ কবিতা লিখিতেছেন। উনি স-মিল এবং অ-মিল দুই রকমের কবিতাই লেখেন। এখন স-মিল কবিতা লিখিতেছিলেন। এক লাইন কবিতা লেখেন এবং পরের পাঁচ লাইন কাটিয়া রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে প্রাগৈতিহাসিক বা পশ্চাতৈতিহাসিক জন্তুজানোয়ার তৈয়ারি করেন। লিখিয়া রাখিয়াছেন—'নাম যার প্র'ভা (প্রতিভার কাব্য-রূপ ছন্দ মিলাইবার জন্য) এবং অনেক জীবজন্তু সৃষ্টি করিবার পর লিখিলেন, 'নিশ্চিত সে সুমিষ্ট স্বভাবা।' সুন্দর মিলিয়াছে। কবি হৃষ্ট হইয়া অন্য লাইন খুঁজিতে লাগিলেন। লাইন না পাওয়া গেলেই কবি কবিতার খাতার পাতা উল্টাইতে থাকেন। দ্রুত বিলীয়মান পাতাগুলিতে কতগুলি অধুনাতম কবিতার নাম দেখা গেল—'পরাণ কলির বুলবুলে'; 'চিত্ত বৃক্ষের কপোতী', 'জিনিয়াস' (এটা প্রতিভার ইংরেজী তর্জমা); 'প্রাণ ডাহুকী'; 'দিল সাহারা'; 'ডাস্টবিন' এইসব। একটি গদ্য বা অমিল কবিতা নমতার সঙ্গে পড়িয়া দেখিলেন:—

চাঁদের মুখ
মরা মাস
বন্যার ভাপসা গন্ধ
চামেলীর ডগা
মেঘের মসৃণতা
প্রেয়সী.........

স-মিল কবিতাটি আবার হাত দিয়াছেন। দেখেন বারান্দা দিয়া ভজহরি যাইতেছে। ডাকিলেন, ভজহরি শুনে যাও; এসো ত্বরা করি; ৯১ নম্বরে কে থাকে?

'এজ্ঞে, অনুপমবাবু।'

'চায়াটা কি করে?'

'চাকরির চেষ্টা করচেন।'

'ওটা একটা গুণ্ডা বই আর কিছু নয়, বুঝেছ?'

'এজ্ঞে বুঝেছি।'

পরের দিন। বেলা এগারোটা বাজে; অনুপমের দরখাস্ত টাইপ কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই। ভজহরি ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, 'এজ্ঞে, কিস্তির টাকার জন্য টাইপ কলের লোক এসেচেন।

ফুল-স্টপ্‌টার উপর একটা জোর টিপ লাগাইয়া অনুপম কহিল, বলগে আমি বাড়ি নেই।

'সে কি কথা বাবু,' ভজহরি কহিল, 'আপনি পরশু তে আজকে আসবার কথাই বলে দিয়েছিলেন। আমি ভাবলুম

কিস্তিটা বুঝি সত্যি শুধিয়ে দেবেন; নইলে কি বলি, বাড়িতেই আছেন।'

'বলে দিয়েচিস তো', হতাশায় টাইপ রাইটারের চাবি হইতে আঙ্গুলগুলি সরাইয়া আনিয়া অনুপম কহিল, 'জ্বালালি ভজহরি, একদম জ্বালিয়ে মারলি। যাও, ছুটে যাও, বল গিয়ে, একটু-মাত্র আগেই দেখেছিলে, এখন এসে আর দেখতে পেলে না। বলে ম্যানেজারের ঘর থেকেই বিদেয় করে এস।' সঙ্গে সঙ্গে সে গায়ে পাঞ্জাবি চড়াইতে লাগিল। কহিল, বড্ড টানাটানি যাচ্ছে, বুঝলি না ভজহরি। আমি পেছনের দোর দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ি, তুই লোকটাকে সামলা গিয়ে।

ভজহরির কথা শুনিয়া পাওনাদার কড়া করিয়া কহিল, 'আচ্ছা ভদ্দরলোক যা হোক। কিস্তির পয়সা দেওয়ার মুরোদ নেই, টাইপরাইটার কেনার সখ। যতসব জোচ্চুরির কাণ্ড। ব'লো পরশু আবার আসব। কিস্তির পয়সা পাওয়া যায় ভাল, নইলে টাইপরাইটার সঙ্গে করেই নিয়ে যাব। তখন আর কাঁদুনি গাইলে চলবে না। বুঝেচ?'

ভজহরি কহিল, এজ্ঞে বুঝেচি। এবং পাওনাদার পিছন ফেরা মাত্র ভজহরি মুখ ভেংচাইয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে সে কিছুই বুঝে নাই।

অনুপম রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি হানিয়া সে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ পথ বাছিতে লাগিল এবং গাছের আড়াল পাওয়া যাইবে ভাবিয়া দ্রুত পার্কের মধ্যেই ঢুকিয়া পড়িল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, ধূর্ত পাওনাদার পিছন হইতে আসিয়া খপ্ করিয়া হাতটা চাপিয়া ধরিবে।

বই বগলে ও-বাড়ির মেয়ে পার্কের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া কলেজে চলিয়াছে। পিছনে পিছনে তাহাকে অনুসরণ করিতেছে কবি শিহরণ। তার দিকে আড়চোখে চাহিয়া ত্রস্ত হরিণীর মত ও-বাড়ির মেয়ে পার্কটা তাড়াতাড়ি পার হইবার চেষ্টায় দ্রুত হাঁটিয়া চলিয়াছে।

ডাকিয়া কবি-সুলভ ভাষায় শিহরণ কহিল, 'দেবি, তোমার জন্য কবিতার ছন্দে এই লিপি আমার; একে অবমাননা করো না'। শিহরণের হাতে রঙিন খাম।

কলেজের মেয়ে প্রতিভার চোখ এখন আর উদাস নহে। ভয়ে মুখ বেগুনী, ঠোঁট কম্পমান, চোখে ভয়-চকিত দৃষ্টি।

শিহরণ পিছনে ছুটিতে ছুটিতে কহিল, 'প্রাণের পুজোর নৈবেদ্য সাজিয়ে এনেচি, ছন্দের কুসুমে ভক্তির ডোরে মালা গেঁথে এনেছি, দেবি। একে গ্রহণ করো।'

শঙ্কিত, পাংশু মুখ, কলেজের মেয়ে প্রতিভা এইবার তাহার কলেজিয়ানা বিসর্জন দিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। কবি দমিলেন না। তিনিও ছুটিলেন। বব্-চুল ফুলিয়া ফুলিয়া উড়িয়া উড়িয়া উঠিতেছে; চাদর আলুণ্ঠিত চোখের চাওয়া গদগদ।

পাওনাদার-তাড়িত অনুপম এই কবির সাথেই 'কলিশান' ঘটাইয়া বসিল। ফলে পেলব দেহ কবি প্রণয় নিবেদন ভুলিয়া ধরাশায়ী হইলেন। অনুপম ভাবিয়াছিল, পাওনাদার। সে চোখ বুজিয়া কহিল, উঃ, খুন, দিন দুপুরে খুন।'

কবি ধরা হইতে কহিলেন, 'অসভ্য, ব্রুট!'

এইবার অনুপম চোখ মেলিল। দেখিল, পাওনাদার নহে; কবি। সে আশ্বস্ত হইল। উদারতার সঙ্গে কহিল, 'দুঃখিত,' এবং হাত বাড়াইয়া দিল। কবি কিন্তু সে হস্ত গ্রহণ করিলেন না, কহিলেন, ব্রুট ব্রুট ব্রুট! এবং উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'দেখ' রাগিয়া অনুপম কহিল, 'গালাগালি আমি সহ্য করি না। অ্যাকসিডেণ্ট ইজ অল্‌ওয়েজ এন্ অ্যাকসিডেণ্ট।' ফের কিছু বলবে তো এক থাবড়া লাগাব।'

কবি চোখ বুজিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, ব্রুট ব্রুট ব্রুট।

অনুপম থাবড়া দিল না, নিঃশব্দে কবির গ্রীবাখানা ধরিয়া এক ধাক্কা দিল; কবি তিন হাত দূরে গিয়া ভূমি শয্যা লইলেন।

তাহাকে চোখ দিয়া অনুসরণ করিয়া অনুপম এইবার চমকাইয়া উঠিল। দেখিল অদূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ও-বাড়ির ঐ মেয়েটা; ভারি একটা তৃপ্তির আনন্দ ওর মুখে; ভূমিশায়ী কবির অবস্থা দেখিয়া সে যেন অকৃত্রিম তৃপ্তি পাইয়াছে।

একটু লজ্জিত হইয়া অনুপম কহিল, 'ওঃ, আপনি। দেখলেন তো ওর কাণ্ডটা না দেখে একটু গায়ে এসে পড়েছিলাম, চাষার মতো গালাগালি অরম্ভ করে দিল। আপনি তো দেখেচেন, কিছু অন্যায় করেচি?'

প্রতিভা সাক্রোশে কহিল, 'ঠিকই করেচেন। বেশ করেচেন।'

'ওটা' অনুপম কহিল, 'একটা লক্ষ্মীছাড়া বেকার কবি। আমিও বেকার, মানে বর্তমানে বেকার, তবে কবিতা লিখতে চেষ্টা করি না।'

প্রতিভা কহিল, 'আপনি কাছেই থাকেন বুঝি? প্রায়ই তো আপনাকে দেখতে পাই।'

'আমিও তো আপনাকে', অনুপম কহিল। 'কিন্তু কি জানেন, যদিও জানি, পার্কে এলেই আপনাকে দেখা যাবে, তবু বেশী সময় করতে পারিনে আসবার। চাকরির খোঁজ করছি কিনা, দরখাস্ত টাইপ করতে বড্ড বেশী সময় নেয়। তা ছাড়া ঘোরাঘুরি করতে হয়। আপনি কলেজে পড়েন বুঝি?'

'হ্যাঁ, থার্ড ইয়ারে।'

'আমি সিক্‌সথ ইয়ারে। তবে পড়ি না, চাকরির খোঁজ করি। ইউনিভার্সিটিতে বিস্তর মাইনে বাকি পড়ে গেছে। কে জানে নাম কেটে দিয়েছে কিনা। দিকগে। খুব জোর চাকরির খোঁজ করচি। শীগগিরই একটা পেয়ে যাব। রোজ এক ডজন করে দরখাস্ত দিই কিনা।...চাকরি পেলে, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করব, বুঝলেন।'

প্রতিভা কহিল, 'ওরে সর্বনাশ, সে চেষ্টা করবেন না। আমার বাবা ভারি কড়া মানুষ। আচ্ছা যাই—নমস্কার।'

'নমস্কার।'

অনুপম তাকাইয়া দেখিল, কবি কখন নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছে। বিজয়োল্লাসে অনুপমের বুকটা কয়েক ইঞ্চি ফুলিয়া উঠিয়াছিল; সে পাওনাদারের ভয় বিস্মৃত হইয়া সামনের বেঞ্চটায়ই বসিয়া পড়িল। তার প্রায় একটা গান গাহিতে ইচ্ছা হইল।

ক্রমশ

মিছরে আমগাছ

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

রতন সামন্ত এসে ঘাড় নুইয়ে হাত জোড় করে বললে, বাবু পেরণাম।

গুড়গুড়ির নলের মুখ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বিশ্বজিৎ বললে, এই যে রতন!

—আমারে ডাক্তি পাঠাইলেন?

সত্যিই এসে পড়ল অবশেষে, এমনি হতাশভাবে বিশ্বজিৎ বললে, হ্যাঁ।

রতন বললে, কি করতি হবে কর্তা, হুকুম করুন।

বিশ্বজিৎ রতনের দিকে চেয়ে দেখলে। এর পূর্বে এমন দীর্ঘাকৃতি, বলবান লোক তার চোখে পড়েনি। যেমন পুরো সাড়ে ছ' ফিট লম্বা, তেমনি জোয়ান। সে কাঠুরিয়া, সুন্দরবনের কাঠ কাটে, আর ভারী ভারী কাঠের মোট অবলীলাক্রমে নৌকায় বয়ে আনে। শরীরের প্রত্যেকটি পেশী যেন প্রকট। স্বল্প গোঁফের নীচে কাঁচা-পাকা ছাঁটা দাড়ি। পরনে আট হাত কাপড়। হাতে এক দীর্ঘ কুড়ুল, যেমন ভারী, তেমনি মজবুত; তার অধিকারী ছাড়া আর কেউ তা ব্যবহার করতে পারে না। বিশ্বজিৎ শুধালে, এধারে কোথায় গিয়েছিলে রতন?

কাঠ কাট্তি, বাবু। মজুমদাররা কাঁটালগাছ কিনেছেন; তক্তা করবেন বলে খবর দিইলেন। অর্ধেক পথ গিচি, তারকের সংগে দেখা, ক'লে, আপনি নাকি ডেকেছেন। ছুট্তি ছুট্তি আলাম। আপনার কাজ সকলের আগে।

সে কি, তাঁর কাজ ফেলে এলে?

আসব না, কর্তাবাবুর আমলে কত খাইচি, নিচি, ভোলব ক্যামনে?

আমার কালকে হ'লেও চলবে।

কাজটা কি, ক'ন, দেখে নেই। পান্তা খেয়ে এসে কাল সকাল থেকে লাগব।

তোমার যা কাজ রতন, গাছ কাটতে হবে। কাঠের দরকা'র। পারবে?

রতন হেসে বললে, দেখেন দিনি, তা আর পারব না। তবে আজকাল আমার ফুরসৎ খুব কম, বাবু। বাদার থেকে এ বছরে আর কাঠ আসবে না। আজকাল সকলে আমায় ডাকতিছে। তার পর খানিক থেমে শুধালে, বাগানের কোন্ গাছটা কাটবেন?

বিশ্বজিৎ তাড়াতাড়ি বললে, পুকুরের ধারের মিছরে আমগাছটা।

রতন সবিস্ময়ে বসে পড়ে বললে, বলেন কি কর্তা, পুরানো দিনের ভারী গাছ ওটা। আর গাছটার আম যে বড় মিষ্টি। ছেলে-বেলায় কত কুড়িয়ে খাইচি। ওটারে কাটবেন?

গাছ বুড়ো হ'য়ে গেলে আম আর তেমন ভাল হয় না, রতন! ঘন ডালপালায় পুকুর ধারটাও অন্ধকার হ'য়ে আছে। চারদিক থেকে একটু আলো বাতাস খেলুক। গাছটা কেটে দাও।

রতন উত্তর দিলে আজ্ঞে কর্তার। তাহ'লে কাল সকাল থেকে লাগব।

ভাই লাগিস, আমি কিন্তু এখানে থাকতে পারব না।

কেন বাবু, আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

আজ বিকেলের ট্রেনে কলকাতায়, ইতিমধ্যে তুই কাজ সেরে রাখিস।

রতন হেসে বললে, আমরা চাষার ছেলে, গাছের মর্ম বুঝি। থাকলি বাবুর মনে বড় কষ্ট লাগবে।

হ্যাঁ, চোখের উপর আর ফলন্ত গাছটাকে কাটা দেখতে পারব না।

ভারী পুরানো গাছ ওটা, রতন অনুযোগ করলে।

বিশ্বজিৎ ইঙ্গিতটা না বুঝে বললে, তোকে ডবল জনের দাম দেব।

রতন হিসেব করে বললে, আট গণ্ডা পয়সা, তাই হবে কর্তা। আসি, পেরণাম।

রতন বিদায় নিলে বিশ্বজিৎ বসে ভাবতে লাগল। যুদ্ধের হিড়িকে জ্বালানি কাঠের চালান বন্ধ। সুন্দরবন থেকে আর নৌকা বোঝাই মাল আসছে না। বর্ষাও দেখতে দেখতে এসে পড়ল। এ বছর বাগানের গাছ কেটেই কাঠের জোগাড় দিতে হবে। জল না থাকলেও চাল ফুটিয়ে খাওয়া যায়, কিন্তু কাঠ না পেলে জ্বাল দেবার উপায় নেই। বিশ্বজিৎ পড়েছে চিন্তায়। যুদ্ধের জন্য সে শহর থেকে গ্রামে বাস করতে এসেছে। তার ইচ্ছে, সে চাষ করবে। তবে চাষ করতে গেলে সেখানে বাস করতে হয়, যেমন রাঁধতে গেলে কাঠের দরকার। কিন্তু কাঠ জোগাড় হবার উপায় কি? পাড়াগাঁ এমন একটা জায়গা, যেখানে পয়সা হ'লেও সময়মত জিনিস না কিনে রাখতে পারলে, আর তা মেলা দুর্ঘট।

সে মনে করেছে, মিছরে আমগাছটা কেটে ওখানে সে একটা খুব ভাল কলমের চারা শিয়ালদার হাট থেকে কিনে এনে বসাবে। প্রাচীন গাছটার ডালপালায় আচ্ছন্ন পুকুরধারের ঘোরাল আঁধারটাও যাবে। কলমের চারা বছর দুইয়ের ভেতর ফলে মিছরে আমের অভাব দূর করবে। শহরে থাকতে অভ্যস্ত বিশ্বজিতের স্ত্রী মণিমালার নাকি গা ছমছম করে পুকুরে নাইতে যেতে। গাছের অন্ধকার শাখায় বক বসে থাকে, মনে হয়, যেন সাদা কাপড়-পরা পেত্নী। প্রকৃতপক্ষে তার অনুযোগেই বিশ্বজিৎ এ-কাজে অগ্রসর হয়েছে, আর সংগে সংগে গাছ কাটার যত অনুকূল যুক্তির উদ্ভব হয়েছে তা থেকে। কিন্তু বিশ্বজিতের কোমল মন। লোকটা বড় সেণ্টিমেণ্টাল। অত পুরানো গাছ কাটা নাকি হত্যারি সামিল। সে সময়ে সে সামনে উপস্থিত থাকতে পারবে না। তাই সে কলকাতায় ছুটতে চায়। নবাব বাদশাজাদারা যখন কারো প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতেন, ঘাতক কাজ শেষ করত কারাপ্রাচীরের অন্তরালে—তাঁদের সামনাসামনি সে শোচনীয় দৃশ্য দেখতে হ'ত না। অনেক সময় মন-গড়া অভিযোগ তাঁরা করতেন বিবেককে শান্ত করতে—এও যেন ঠিক তেমনি। তার কাঠ দরকার। অন্য গাছ কাটা চলত, কিন্তু সে হবে না। পুকুরধারের ঘোরাল অন্ধকার ভাবটা দূর করা চাই-ই। প্রচুর রোদ হাওয়া লাগলে পুকুরের জল ভাল থাকবে। মিছরে আমগাছ কাটার তার তেমন ইচ্ছে নেই। কিন্তু আসল কথা, মণিমালার ইচ্ছা তার ইচ্ছার চেয়েও বেন প্রবল।

আড়াই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টার মধ্যে বিশ্বজিৎ গ্রাম থেকে কলকাতায় পৌঁছে গেল। তালা দেওয়া দরজা খুলে তার বাড়িতে ঢুকল। দুমাসেই ঘরগুলোয় ধুলো জমে গেছে। রাত্রে আর স্বহস্তে খাবার তৈরীর ঝঞ্ঝাট নেই। মণিমালা টিফিন কেরিয়ারে ক'রে রাতের মত পরটা, তরকারি মিষ্টি দিয়েছে। তাই কিছু খেয়ে, জল পান করে, সে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল নির্জন বাড়িতে। কিন্তু তার ঘুম এল না। মাথার ভেতর যেন দপ্ দপ্ করতে লাগল। ভাবলে, বোধ

হল, গাড়িতে অনেকটা মাঠের খোলা হাওয়া লেগে স্নায়ুতন্ত্রী চঞ্চল হয়েছে। সে হাত-পা ও ঘাড় ভাল ক'রে ঠান্ডা জলে ধুয়ে, এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু তবুও তার তন্দ্রা এল না। সে ক্যাম্প-চেয়ারটায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। ধোঁয়ার মত তার ভাবনাগুলো তাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন ক'রে চারদিক থেকে যেন ঘিরে এল। তার কানে এল মিষ্টিগলায় কে যেন বলছে, কি সুন্দর মিছরির টুকরার মত আমগুলো। গাছটা কোথায় পেয়েছিলে গো তুমি?

বিশ্বজিৎ একটু তাকিয়ে দেখলে তার ঠাকুরমা! কিন্তু আশ্চর্য, বুড়ি ত নয়, একটি ঘোমটা-পরা কিশোরী বউ।

গম্ভীর গলায় ঠাকুর্দা উত্তর দিলেন, কাজের খাতিরে সাত ঘাটের জল খেয়ে ঘুরে মরছি। কি জানি কোন্ দেশের আম খেয়ে আঁটি ফেলেছিলুম—তাই কি আজ মনে আছে?

ঠাকুরমা তেমনি ক'রে বললেন, আমি ত এ বাড়িতে এসে ঐ রকমই গাছটাকে দেখছি বরাবর।

ঠাকুর্দা বললেন, আমিও তাই। বোধ হয় বাবার আমলের। বড় গাছপালার সখ ছিল তাঁর। মুর্শিদাবাদে তাঁর ছিল শ্বশুরবাড়ি। নবাবের রাজত্ব......আমগাছের বড় তদ্বির সেখানে। হয়ত কোনো এক গ্রীষ্মকালে আমের তত্ত্ব পাঠিয়েছিলেন তাঁর শ্বশুরমশায়. সেই আঁটি পড়ে গাছ হয়েছে।

ঠাকুরমার গলা আবার শোনা গেল, কিন্তু যাই বল তুমি, কলমের চারা ও নয়। তাহ'লে এতদিন বেঁচে থাকত না—এমন মহীরুহও হ'তে পারত না।

ঠাকুর্দা সমর্থন ক'রে বললেন, ঠিক বলেছ, ও আঁটির গাছ। —কি মিষ্টি, অনেক আম হয়, আর কি তার স্বাদ বলত! মনে হয় এমনটি যেন আর কোথাও খাইনি—গলার স্বর আর শোনা গেল না।

এবার দেখা গেল, কতকগুলো ছোট ছেলেমেয়ে শুয়ে রয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের রাত, প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, বাইরে ঝড় হচ্ছে। বিশ্বজিৎ তাদের সবাইকে চিনতে পারলে। তার বাবা, কাকারা, পিসিরা—বিছানায় শুয়ে। কিন্তু দশ-বারো বছরের বেশী বয়েস যেন তাদের কারো নয়। এতক্ষণ সব জেগে উঠে কথাবার্তা সুরু করেছেন। একটি মেয়ে বলছে, দেখ্না ভাই হীরু, রাত্রের ঝড়ে মিছুরের আমতলা বিছিয়ে রয়েছে, কিন্তু ভারতদাদা আমাদের উঠতে দিচ্ছে না। ও আগে গিয়ে কুড়ুবে বলে। হীরালাল বয়সে ছোট, কিন্তু ডাংপিটে, বয়সে বড় হ'লেও ভারতকুমার তাকে ভয় করে চলে। পিঠোপিঠি ভাই, তাই দাদা বলে সে তাকে ডাকে না।

হীরালাল বলে উঠল, এই ভারত, আগে উঠেছিস কি মেরে পিঠে দরমা বুনে দেব। চুপ করে শুয়ে থাক্।

ভারতকুমার অনুযোগ করে বললে, বা-রে, আমি শুয়ে থাকি, আর তোমরা উঠে সব আম কুড়িয়ে নাও।

হীরালাল বললে, মিছুরে আম ভাগ হবে সবার মধ্যে। একলা তোমাকে নিতে দেব না।

ভারতকুমার বললে, ভাগটাগ বুঝিনে। যে যা পাবে, নেবে ; সব তার। আমি একলা উঠব, দেখি তুই কি করিস।

হীরালাল ধীরভাবে বললে, আমার যে কথা সে কাজ, উঠলেই টের পাবি।

হীরালালের ভয়ে আর ভারতকুমার গাত্রোত্থানের ভরসা পেলে না।

তার পর সে দৃশ্য বদলে অন্য দৃশ্য জেগে উঠল। দেখলে তারা ভাইবোন মিলে মিছুরে আমতলায় ঝোপ-ঝাপে আম খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখন সে কলকাতায় পড়ে। গরমের সময় বাড়ি এসেছে। প্রতি সকাল বেলায় মিছুরে আমতলায় আম খুঁজে বেড়ায়, আর কাঠমল্লিকা ফুলের গন্ধ শোঁকে। মনটা তখন ছিল খুব সরল। কি ভেবে, কি জন্যে, কি কাজ করছে, নিজে তা জানে না। পাড়ার ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ খুব ভোরে আম কুড়াতে আসত। কারও কারও সঙ্গে তার ঝগড়া হ'ত। কিন্তু ঊষার ভাইকে সে বারণ করেনি কোনোদিন। তাকে বারণ করলে বোনটির আসা পাছে বন্ধ হয়, এই ছিল ভয়। সকালে আমতলায় গিয়ে তাদের দেখলেই তার মন খুসী হ'য়ে উঠত। তলায় কিছু না পেয়ে যেদিন মুখ আঁধার ক'রে ঊষা বাড়ি ফিরছে দেখত, সে সইতে পারত না। ছুটে গিয়ে নিজের হাতের আম তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলত, ঊষা, আজ তুমি কিছু পাওনি না?,

ঊষা কাঁদ কাঁদ সুরে বলত, কিচ্ছুটি না, দাদাবাবু!

কিন্তু আম পেলেই সে হেসে ফেলত। ঊষার মুখের হাসি দেখতে সে এমন অনেক ঘুস দিয়েছে।

পরের মুখে হাসি দেখতে নিজের এই ত্যাগস্বীকার, এর নাম কি, তখন সে জানত না। কিন্তু তখন তাতেই ছিল তার পরম আনন্দ। —মিছুরের আমকে উপলক্ষ্য ক'রে তার কিশোর বেলার এই হৃদয়ের খেলা ছিল শতগুণ মিষ্টি!

বাবা, ওঠ ওঠ, তুমি দাঁড়াবে, আর আমরা মিছুরে আম কুড়ুব! বেলা হ'লে সব লোকে কুড়িয়ে নিয়ে যাবে যে! মেয়ের ডাকে বিশ্বজিতের ঘুম ভেঙে গেল।

আঃ, তোরা বড় বিরক্ত করিস! এখনো রাত রয়েছে কত। মিছুরে আম কুড়াতে গিয়ে কি শেষে সাপের ঘাড়ে পা দিবি?

বিশ্বজিৎ চোখ রগড়ে বিছানায় উঠে বসল। এযে কলকাতার বাড়ি। এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল। রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। বাইরে কাক ডাকছে। দেশে ফেরবার এখন একটা গাড়ি আছে বটে—ছ'টায় ছাড়বে। এখনি তার যাওয়া দরকার। কিন্তু তবুও বাড়ি পোঁছুতে সেই ন'টা। ততক্ষণ বোধ হয় সব শেষ হ'য়ে যাবে! না ও হ'তে পারে। রতনের আজকাল খুব কাজ পড়েছে। সে যদি অন্য জায়গায় লেগে থাকে ত বাঁচোয়া। হয়ত কাজটা হাতে রাখবার জন্য কাল আসব বলেছে। সে ত মজুরদের চেনে। কিন্তু সেটা অনিশ্চিত। খাওয়া-দাওয়া করে, বাড়ির কাজকর্ম সেরে, ন'টায় সে আসতে পারে—ফুরণের কাজ ; সেইটাই ক্ষীণ আশা। সে আর কালবিলম্ব না করে, হাত মুখ ধুয়ে, বেরিয়ে পড়ল ট্রেন ধরতে।

অধস্তন পুরুষ ভাল ফল পাবে, এই আশা ক'রে তার প্রপিতামহ ভিটে বাড়িতে যে আমগাছ ক'রে গিয়েছিলেন, সেই অমৃত ফল বৃক্ষকে রক্ষা করা তার কর্তব্য। তাঁর স্নেহের দানের মর্যাদা সে রাখবেই। দীর্ঘ দিনের বংশপরম্পরায় যার সঙ্গে সম্বন্ধ তার হত্যার আদেশ তাকে প্রত্যাহার করতেই হবে। মনে হ'ল গাছটা যেন সজীব মানুষের মত মিনতিকরুণ ক্রন্দনবিজড়িত কণ্ঠে তার মনের কানে অনবরত গুঞ্জন করছে, আমাকে মের না, আমাকে মের না, দু'শত বৎসর অতিক্রম ক'রে তোমার পূর্বপুরুষের অমর আশীর্বাদ ফলরূপে বহন ক'রে আনছি আমি তোমার জন্যে, আমাকে বরণ কর, আমাকে বাঁচাও!

ভাবতে ভাবতে বিশ্বজিতের চোখে জল এসে পড়ল। গাড়িতে বসে বিশ্বজিৎ দেখলে তার পরিচিত একজন যাচ্ছে দেশে। সে বললে, বিশ্বজিৎবাবু যে! আপনার মুখ-চোখ এত বসে গেল কেন, কোনো অসুখ করে নি ত?

বিশ্বজিৎ অপ্রতিভ হাসি হেসে বললে, না, রাতে ঘুম হয়নি বোধ হয়, তাই! এস না।

লোকটি লগ্নী কারবার করে, বললে, সময়টা বড় খারাপ পড়েছে। সব জিনিসেরই দাম ডবল। দেড়া মাশুলের গাড়িতে বসে নষ্ট করবার মত পয়সা নেই ভাই, তোমাদের কি, জমিদার মানুষ। বলে সে ছুটে থার্ডক্লাস গাড়িতে গিয়ে উঠল। বিশ্বজিৎ মৃদু হেসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। সে এখন একলা থাকতে চায়। সে ভেবেছিল, শত স্মৃতিবিজড়িত গাছটা কাটতে বারণ ক'রে গ্রামে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দেবে। কিন্তু তাদের গ্রামে পোস্টঅফিস নেই। আদেশ পোঁছুবার অনেক আগেই কাজ শেষ হবে। তখন ভাগ্যের উপর নির্ভর করে নিজের যাওয়াই ভাল। তার মনে হ'তে লাগল, গাড়িটা

যেন যথেষ্ট জোরে চলছে না। সে যদি কোনো গতিকে এয়ারোপ্লেনে করে এই মুহূর্তেই দেশের বাড়িতে উপনীত হ'তে পারত, তাহ'লে বাড়ি পৌঁছিয়েই নির্মম রতনের হাত থেকে সুতীক্ষ্ম কুড়ুলটা ছিনিয়ে নিত।

রেল লাইনের ধাতব-সংঘর্ষের শব্দের মধ্যে সে যেন শুনতে পেল, কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটার ঠকাঠক্ আওয়াজ।

এতক্ষণ বোধ হয় রতন সামন্তের প্রচণ্ড কুঠারাঘাতে প্রকাণ্ড প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মত মিছুরে আমগাছের বিরাট ডালপালা-সমন্বিত দীর্ঘদেহ থর থর ক'রে কাঁপছে! মড় মড় শব্দে ভেঙে পড়ল বোধ হয় এইবারে। ছিন্ন ভিন্ন দেহীর সুতীব্র, অব্যক্ত আকুল আর্তনাদের অশ্রুত রোল উঠেছে চারদিক ব্যেপে।

পুরুষ পরম্পরায় প্রতি বৎসর যে গাছ অমৃত ফল উপহার দিয়ে তাদের সেবা ক'রে এসেছে, না ভেবে চিন্তে তাকে কেটে ফেলবার আদেশ দেওয়ার ভেতরে সে যেন হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা ও অকৃতজ্ঞতার কাজ করেছে বলে বিবেক প্রতি মুহূর্তে তাকে দংশন করতে লাগল। তার মনে হ'তে লাগল, সে দুর্বৃত্ত, কৃতঘ্ন!

বিশ্বজিৎ স্টেশনে পৌঁছিয়ে, গাড়ি থেকে নেমে ঊর্ধশ্বাসে বাড়িমুখো ছুটতে লাগল। রাস্তার লোকজন অবাক্ হ'য়ে তার পানে রইল তাকিয়ে। সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই। তখন তার কানের ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করছে। মাথার ভেতর শুধু আওয়াজ হচ্ছে ঠকাঠক্, ঠকাঠক্! সে চেঁচিয়ে উঠতে চাইলে, ওরে থাম, থাম! শুধু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না। সে ছুটতে ছুটতে বাড়ির ঠাকুর-দালানের কাছে গিয়ে মূর্ছিত হ'য়ে পড়ল। জ্ঞান ফিরে এলে দেখে তাকে ঘিরে উদ্বিগ্ন জনতা। বাড়ির সব লোকজন তার মুখে চোখে জল দিয়ে পাখার হাওয়া করছে। পাশেই যেন মূর্তিমান জহ্লাদ দৈত্যের মত দীর্ঘাকৃতি রতন সামন্ত কুড়ুল কাঁধে দাঁড়িয়ে।

সম্বিত পেয়ে, চোখ মেলে বিশ্বজিৎ ক্ষীণকণ্ঠে শুধালে, রতন, কাজ শেষ ত?

রতন ঝুঁকে পড়ে ঘাড় নুইয়ে বললে, পেরণাম কর্তা, আগে সুস্থ হোন, বলতেছি।

বিশ্বজিৎ ম্লান হেসে বললে, গাড়ি থেকে নেমেই তোমার গাছ কাটার ঠকাঠক্ আওয়াজ আমি শুনতে পেয়েছিলাম রতন!

রতন বললে, সকালে গাছ আমি কাটিচি......দোষ নেবেন না!

উদাসীনভাবে বিশ্বজিৎ বললে, না, আমিই ত তোমায় হুকুম দিইচি!

রতন বললে, তবে সেটা মজুমদারদের কাঁটালগাছ!

নিজের কানকে যেন বিশ্বজিতের বিশ্বাস হ'ল না, আনন্দে শব্দ বেরুল, কি বল্‌লি?

সভয়ে অথচ দুঃখিতভাবে রতন বললে, আপনার হুকুম আজ আমি তামিল করতে পারি নি কর্তা, ঘাট হয়েছে মাপ করতি হবে। ফলন্ত গাছটারে সকাল বেলা কাটতি মন সরল না। তার ওপর মজুমদাররা বড্ড পেড়াপেড়ি করতি লাগলেন। তাই তেনাদের কাজে আগে লাগলাম। আপনি যে এত আগে আসে পড়বেন, খেয়াল ছিল না। ভাবলাম দুপুরির পর দেখা যাবে।

বিশ্বজিৎ লাফিয়ে উঠে বললে, বেশ করেছিস, রতন বাঁচালি!

রতন সামন্ত তার মুখের পানে বিস্ময় বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

বিশ্বজিৎ বললে, আমি মত বদলেছি, আর মিছুরে আমগাছ কেটে কাজ নেই। তবে দুনো মজুরীই তোকে দেব। ওর গোড়াটা খুঁড়ে দিবি চল, বর্ষার জল ধরতে হবে। বর্ষার শেষে সার মাটি দিয়ে ভাল ক'রে গোড়া বেঁধে দিবি, বুঝলি।

রতন ঘাড় নেড়ে, সানন্দে বললে, যে আজ্ঞে কর্তা!
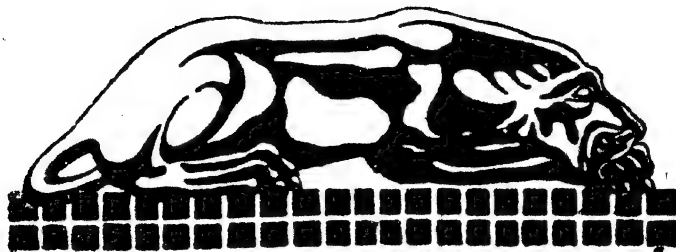
তামাক

সুনীলকুমার মিত্র

আগে বলা হোত যে, তামাকপানের অভ্যাস প্রথমে আরম্ভ হয়েছিলো, মিশরে, বা গ্রীসে অথবা রোমে। কিন্তু এখন অনুসন্ধানাদি ক'রে একরকম স্থিরভাবেই জানা গেছে যে, আগে ওসব দেশে ধূমপানের ব্যবস্থা ছিলো বটে, তবে সেটা তামাকের নয়, অন্য কোন জাতীয় পত্রের। যাঁরা তামাকের ইতিহাস সম্বন্ধে খুঁটিনাটি দেখাশোনা বা গবেষণাদি ক'রেছেন, তাঁরা বলেন, প্রথম তামাক পান আরম্ভ হয় আমেরিকায়—আমেরিকা পূর্ব গোলার্ধের সাথে পরিচিত হবার বহু পূর্ব হতেই। তখনকার অধিবাসিগণের মধ্যে তামাকপান প্রচলন ছিল এবং তামাক সেবনকে নেওয়া হ'ত ধর্মের অনুষ্ঠান হিসাবে। ফেয়ারহোল্ট সাহেবকৃত 'তামাকের ইতিহাস' নামক পুস্তকে বলা হয়েছে যে, ইউরোপীয়েরা ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কিউবা দ্বীপে রেড্ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে তামাক সেবনের প্রচলন প্রথম লক্ষ্য করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ তাম্রকপাতাকে চুরুটের মত ক'রে পাকিয়ে নিয়ে, তারপর তার মুখাগ্নি ক'রে ধূমপান করত। খাস আমেরিকায় তখন একটা 'y' চিহ্নিত ফাঁপা নল ব্যবহার করা হ'ত, তামাক সেবনের জন্য। এই নলকে বলা হোত 'ট্যোব্যাগো'। যে পাতা সেবন করা হ'ত, তার নাম ছিল 'আপোওয়াক'।

কলম্বাস্ বা তাঁর পর যাঁরা আমেরিকায় গিয়াছিলেন, তাঁরা আমেরিকা থেকে তামাক সেবনটা বেশ ভাল ক'রেই শিখেছিলেন। কিন্তু তাঁরা আপোওয়াক্ উদ্ভিদ্ সঙ্গে আনেননি। তারপর ১৫৬০ খৃস্টাব্দে Harnandez-de-Tobdo নামে এক চিকিৎসক ভদ্রলোক আমেরিকা থেকে ওই উদ্ভিদ্‌টি ইউরোপে নিয়ে আসেন। ইউরোপে এইটি হচ্ছে প্রথম তামাক চাষের সূত্রপাত। de-Tobdo মহাশয় উদ্ভিদ্‌টি তাঁর নিজ দেশ স্পেনে নিয়ে যান। ভদ্রলোকটি স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ্ কর্তৃক প্রাকৃতিক ধনসম্পদ্ অনুসন্ধানার্থে মেক্সিকোয় প্রেরিত হয়েছিলেন। ফিরবার পথে তিনি আপোওয়াক্ উদ্ভিদ সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন। ১৫০০ খৃস্টাব্দের কিছু পরে Jean Nicot কর্তৃক উক্ত উদ্ভিদ্ তাঁর স্বদেশ ফ্রান্সে আনীত হয়। স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে যখন আমেরিকা থেকে ১৫৮৬ সালে ইংলন্ডে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁর এক সহকারী র‍্যালফ্ লেন আপোওয়াক্ উদ্ভিদ্‌টিকে সঙ্গে ক'রে আনেন। তাঁর উদ্ভিদ্ আনবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইংলন্ডে এর চাষ কিছু আরম্ভ হয়, আর তামাক সেবনটা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ ক'রতে থাকে। এই অভ্যাসটি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিলো। এর ফলে তামাক সেবনের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসান হয়েছিলো। রাজা প্রথম জেমস্ তামাকের শুল্ক পাউন্ড প্রতি দুই পেন্স হ'তে ক্রমে ছয় শিলিং দশ পেন্স পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য এই বর্ধিত শুল্ক দিতে হ'ত শুধু উপনিবেশে বর্ধিত তামাকের উপর। স্পেন ও পর্তুগালের তামাক তখনও পাউন্ড প্রতি দুই পেন্স শুল্ক হিসাবে আমদানী করা হ'ত। এই যে বিরাট শুল্ক বসান হ'য়েছিল ঔপনিবেশিক তামাকের উপর, তার ফলে ইংলন্ডে তামাকের চাষ আরম্ভ হ'ল। কিন্তু এতেও তামাক ব্যবসায়ী বা তামাকপায়িগণ রেহাই পেলেন না। প্রথম জেমস্ সরাসরি আদেশ জারি ক'রলেন যে, তামাকের চাষ ইংলন্ডে বন্ধ থাকবে। একটা কারণ অবশ্য দেখান হ'য়েছিল। ইংলন্ডের তদানীন্তন রাজার তামাকের উপর এত ঘৃণা ছিল যে, তিনি স্পষ্টভাবে বললেন, তামাক চাষের অর্থ হচ্ছে যে, ইংলন্ডের শস্যশ্যামলী ক্ষেত্রের অপব্যবহার। এটাই ছিল কারণ। ইংলন্ডে অবশ্য কখনও সোজাসুজিভাবে সরকার কর্তৃক তামাক সেবন নিষিদ্ধ হয়নি। যদিও সরকার তামাকটাকে দেশ হ'তে তাড়াতে চেয়েছিলেন। এই একই সময় অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরস্ক ও পারস্যে আইন দ্বারা তামাকপান নিষিদ্ধ ছিল; সেবনের শাস্তি ছিলো প্রাণদন্ড। কালক্রমে পৃথিবীর সকল দেশে তামাকের অভ্যাস ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্তত তামাক সেবনের উপর আর নিষিদ্ধ হবার আইন জারি হয়নি। আমাদের দেশেও তামাকপানের অভ্যাসটি অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। ভরতবর্ষে গড়ে এখন প্রত্যেক পরিবারের একজন করে অন্তত তামাক সেবন করে থাকেন।

এইবার পৃথিবীর তামাক উৎপাদনের কথা ভাবা যাক। প্রায় ২৬ লক্ষ টন শুষ্ক তামাকপাতা প্রতি বৎসর উৎপন্ন হয়, তার মধ্যে একমাত্র চীনদেশ হতেই পাওয়া যায় ৬ লক্ষ ৩০ হাজার টন। আর সব প্রধান প্রধান তামাক উৎপাদনকারী দেশসমূহে কত তামাক (শুষ্ক পাতা হিসাবে) প্রতি বৎসর উৎপন্ন হয় তার একটা ক্ষুদ্র তালিকা দেওয়া গেল।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৫,৮০,০০০	টন
ব্রিটিশ ভারত	৫,৬০,০০০	"
রাশিয়া	১,৭০,০০০	"
ব্রেজিল	১,০০,০০০	"
জাপান ও কোরিয়া	৮২,০০০	"
ডাচ ইষ্ট ইন্ডিজ্	৫২,০০০	"
গ্রীস্	৪৫,০০০	"
তুরস্ক	৩৪,০০০	"

নারীদিগের মধ্যে তামাক সেবনের প্রচলন বেড়ে গেছে সিগারেট্ তৈরী হবার পর হ'তে। সিগারেট্ তৈরী না হ'লে বোধ হয় পাইপ বা চুরুটের উপর নারীদিগের এত আগ্রহ দেখা যেত না।

গড়পড়তা দেখা যায় গ্রেট ব্রিটেন আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরাই বেশী করে সিগারেট্ পান করে থাকে, আর চুরুট্ ব্যবহার সব চেয়ে বেশী হয় হল্যান্ডে।

কয়েকটি দেশের লোক কি পরিমাণে সিগারেট্ আর কি পরিমাণে চুরুট প্রতি বৎসর পান করে থাকে তার একটা হিসাব নীচে দেওয়া গেল।

	বৎসরে জনপ্রতি	
	সিগারেট্	সিগার
ইংলন্ড	৮১১	৪
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৭১৪	৬২
জার্মানী	৫০০	১০৩
ইতালী	৩৭২	৩৯
হল্যান্ড	৩৪১	১৫৭
ফ্রান্স	৩২৬	১০

আমেরিকায় সিগারেট ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। আশা করা যায় শীঘ্রই আমেরিকার সিগারেট ব্যবহারের অঙ্কটা ৮৫০-এ দাঁড়াবে। সিগারেট তৈরীও হয় ওদেশে অনেক। বৎসরে ১০৪,০০০,০০০,০০০ টি।

নাচারাল অর্ডার (ইহা উদ্ভিদ্ জগতের ভাগবিশেষ) সোলানাসির অন্তর্গত 'নিকোটিয়ানা' জাতীয় উদ্ভিদ্ আছে। এই নিকোটিয়ানার বহু প্রকারভেদ আছে। এই বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে মাত্র তিনটি তামাকের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই তিনটির নাম হচ্ছে—নিকোনিয়ানা ট্যাবাকম্, নিকোটিয়ানা রাস্টিকা এবং নিকোটিয়ানা পার্সিকা। তামাক বলতে আমরা বুঝি উপরোক্ত তিনটি

উদ্ভিদের শুষ্ক পত্র। আমেরিকায় নিকোটিয়ানা ট্যাবাকম্‌ই প্রচলিত ছিলো এবং এখন এই উদ্ভিদ্‌ই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। প্রায় ৭০টি বিভিন্ন ধরণের নিকোটিয়ানা ট্যাবাকম্‌ উদ্ভিদের চাষ আমেরিকায় হয়ে থাকে। নিকোটিয়ানা ট্যাবাকমের চাষ আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র হচ্ছে; আর এখন পৃথিবীতে যত তামাক তৈরী

তামাক গাছ

হয়, তার প্রায় ৭৮ ভাগ আসে নিকোটিয়ানা ট্যাবাকম্‌ উদ্ভিদ্‌ থেকে। আফ্রিকা, এসিয়া ও ইউরোপে নিকোটিয়ানা রাস্‌টিকার চাষ হয়ে থাকে। মেক্সিকোতেও এই গাছ একটি বহুবর্ষী জীব হিসাবে বন্য গাছপালার ন্যায় জন্মায়। এটা নিকোটিয়ানা ট্যাবাকম্‌ হতে অধিকতর সহনশীল—সেইজন্য বোধ হয় আমেরিকার বাহিরে এর চাষ বেশ ভালভাবেই বাড়ছে। এই গাছের পাতাগুলি ডিমের আকারের, পাতা কাণ্ডের সংগে একটি মৃণাল দ্বারা আবদ্ধ। এই উদ্ভিদ্‌ হতেই তুরস্ক, সিরিয়, হাঙ্গেরিয়ান ও ল্যাটাকী (Latakia) জাতীয় তামাক পাওয়া যায়। নিকোটিয়ানা পারসিকা সাধারণত পারস্য দেশেই জন্মায়। এর থেকে 'সিরাজ' নামে খুব মিঠে এক জাতের তামাক পাওয়া যায়।

ট্যাবাকম্‌, রাস্‌টিকা বা পারসিকা এই তিন প্রকারের নিকোটিয়ানাই বহুবর্ষী। কিন্তু প্রতি বৎসরই উদ্ভিদের বীজ হতেও তামাক সংগ্রহ করা হয়। আবার নূতন করে চাষের আরম্ভ হয়।

বিভিন্ন ধরণের নিকোটিয়ানা ট্যাবাকম্‌ উদ্ভিদ্‌ উচ্চতায় দুই ফুট হতে নয় ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাতাগুলি ডিম অথবা বর্শাফলকের আকার পেয়ে থাকে এবং বেশ চওড়া আর ছড়ানো হয়। 'পত্রসজ্জা' (Phyllotaxy) অনুসারে প্রতি প্রথম পাতার ঠিক উপরেই নবম পাতাকে দেখা যাবে। ফুলগুলি হয় বেশ বড় আর সামান্য লালচে; ফুলগুলি থাকে এক স্থানে। পাতা ও মৃণালের উপর রোঁয়া আছে। রোঁয়াগুলি বেশ নরম আর কোমল।

নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশসমূহেই নিকোটিয়ানা উদ্ভিদ্‌সকল বেশী করে জন্মায়। এই উদ্ভিদের চাষের জন্য যে মাটির দরকার তাতে প্রচুর ক্ষার থাক্‌লে আর মাটি বেশ আর্দ্র আর হাল্‌কা থাক্‌লে সব চেয়ে ভাল ফসল হয়। তামাকের দাহ্যগুণ তামাকস্থিত অজৈব উপাদানসমূহের প্রকৃতি এবং তাদের সংযোগের (State of combination) অবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই সকল উপাদান গঠনে এবং তামাক উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সারের যথেষ্ট প্রভাব আছে। সারে (fertiliser) সামান্য পরিমাণে পটাশ ও ম্যাগনেশিয়া থাকলে তামাকের জ্বলার ভাবটা ভাল হয়। মাঝামাঝি পরিমাণে চূণ থাকলে উপকারী হয়; সারের মধ্যে চূণ থাকলে তামাকের ভস্মকে শুভ্রতর করে। ক্লোরিণ এবং সালফেট্‌ থাকলে তামাকের জ্বলার কাজটা খারাপ হয়ে যায়। সেই হেতু পটাশিয়াম্‌ সালফেট্‌ জাতীয় সার তামাক উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক। ক্লোরিণজনিত খারাপ অবস্থা অতিরিক্ত পটাশের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়।

সার না দিলে জমিতে উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী কিছুই থাকে না। সেইজন্য ভাল ফসল পেতে হলে জমিতে উপযুক্ত সার দেওয়া একান্ত আবশ্যক। বিভিন্ন ধরণের তামাক উদ্ভিদের বৃদ্ধির কাল বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এক ধরণের প্রধান বৃদ্ধি হয় গ্রীষ্মের দশ-বার সপ্তাহের মধ্যে। আর এক ধরণের বৃদ্ধি হয় আরও সময় নিয়ে। প্রথম ধরণের উদ্ভিদের বৃদ্ধি মাত্র দশ-বার সপ্তাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেইজন্য এদের আহার সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী যত্ন নেওয়া হয়, অন্যান্য উদ্ভিদের তুলনায়। ঠিক বৃদ্ধির সময় যাতে আহার ঠিকমত পায়, সেটা দেখা একান্ত কর্তব্য সেইজন্য এই সকল উদ্ভিদের জন্য সার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় উত্তর প্রদেশসমূহে অন্য সকল স্থান অপেক্ষা গ্রীষ্মের অবস্থিতি কম। সেইজন্য গ্রীষ্ম যাতে বৃথা চলে না যায়, আগে হতে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার দিয়ে রাখা হয়।

কৃষির প্রকার এবং আবহাওয়ার অবস্থা যে সকল উদ্ভিদে উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে, তামাক উদ্ভিদ তাদে মধ্যে অন্যতম। দেখা যায় যে, কিউবা দেশের চুরুটে তামাকের মসৃণ পাতা যে বীজ হতে উৎপন্ন হয়, সেই বীজ যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলে রোপন করা হয়, তবে কয়ে বংশ পরে উদ্ভিদের পাতা মোটা হয়ে যায়। এই পাতা কিউ দেশের পাতা অপেক্ষা একেবারে ভিন্ন। বলা যেতে পারে কিউবা দেশীয় উদ্ভিদের সংগে আমেরিকার উত্তর ভাগে উদ্ভিদের বর্ণসংকর উৎপত্তির (Cross fertilisation) ফলে হয় উপরোক্তরূপ নূতন ধরণের উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে। কি বর্ণসংকর উৎপত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করলেও তামাক পাত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিভিন্ন ধরণের নিকোটিয়া ট্যাবাকম্‌ উদ্ভিদ্‌ বর্ণসংকর উৎপত্তির প্রতি আগ্রহশীল। এ আগ্রহশীল যে একটি পছন্দসই প্রকারকে পরিবর্তনের হাত হ'তে বাঁচাতে হ'লে একই ক্ষেত্রে দুই ধরণের ট্যাবাকমের চাষ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

ক্ষেত্র, আবহাওয়া এবং বর্ণসংকর উৎপত্তি—এই তি বিভিন্নতার (Variants) সাহায্যে শত শত প্রকারের উদ্ভি হয়ে থাকে। সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ দুই প্রকার হতে বর্ণসংক উৎপত্তির সাহায্যে নূতন উৎকৃষ্টতর প্রকারের আবির্ভাব সম্ভবপ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারউইন সাহেবের কয়েকটী বিখ্যাত পরী এই তামাক চাষের উপরেই করা হয়েছিলো।

উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ ঠিক্ মত হ'লে পর তামাকের চাষ সহজসাধ্য ব্যাপার।

তিন লক্ষ থেকে চার লক্ষ তামাক উদ্ভিদের বীজ ওজন করলে এক আউন্সের মত হয়। এই এক আউন্স বীজ যদি পঞ্চাশ বর্গ গজ জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে তা' থেকে প্রায় চল্লিশ হাজার তামাক উদ্ভিদ্ পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ্। এর ছাল ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়) এবং hickory (মার্কিন দেশের একপ্রকার বাদাম জাতীয় বৃক্ষ) কাষ্ঠের আগুনে শুষ্ক করা হয়। পাতাগুলিকে ঝুলিয়ে কাঠের ধোঁয়া দেওয়া হয়—এর ফলে শুষ্ক তামাক পাতায় creosoteএর মতো গন্ধ পাওয়া যায়। এই রকমভাবে শুকিয়ে নিলে পাতার জলীয় বাষ্পের এবং শুষ্ক উপাদানের পরিমাণ কমে যায়। পাতায় যে শ্বেতসার আছে তা ক্রমে

ব্রহ্মদেশের মেয়েরা চুরুট তৈরী করছে

যদি চুরুট করবার ইচ্ছা থাকে তবে প্রতি উদ্ভিদে মাত্র ১৫ হতে ২০টি পাতা বাড়তে দেওয়া হয়। আর যদি সিগারেট করবার ইচ্ছা থাকে তবে মাত্র ১০টি হতে ১২টি পাতা বাড়তে দেওয়া হয়। তারপর পুষ্পপ্রসূ কান্ডটিকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হবার আগেই উদ্ভিদ্ হতে পৃথক্ করা হয়। উদ্ভিদে পরগাছা দেখা দেবার আগেই সেগুলিকে সরিয়ে ফেলার বন্দোবস্ত করতে হবে।

তামাক পাতার শুষ্ককরণ (curing) একটা শক্ত বিষয়। এই কাজে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ বৈজ্ঞানিক শক্তি থাকা চাই। বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন প্রকারের তামাকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে। সাধারণত যে নিয়ম পালন করা হয়, তাই সংক্ষেপে বল্‌বো।

যখন ফসল পাকে, তখন উদ্ভিদ্‌টিকে কেটে ফেলা হয় এবং যত্ন সহকারে ঐগুলিকে পরিষ্কার মাটিতে রাখা হয়। নরম ও দুর্বল করবার জন্য আর পাতাগুলি যাতে নুইয়ে পড়ে তার জন্য পাতাগুলিকে রৌদ্রে রাখা হয়। ছিন্ন উদ্ভিদ্‌কে অবশ্য বেশীকাল রৌদ্রে রাখ্‌লে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য সবচেয়ে ভাল হয় যদি গরম অথচ মেঘাবৃত দিন পাওয়া যায়। বাইরে শুষ্ক করবার যে নিয়মই অনুসরণ করা যাক্ না কেন, শেষকালে ফসলকে বিশেষভাবে নির্মিত শুষ্ক করবার আচ্ছাদনের মধ্যে রাখা হয়। এখানে ফসলকে হয় বাতাসের দ্বারা নতুবা সংযুক্ত নলে গরম বায়ু চালিত করে ফসলকে শুষ্ক করা হয়। কয়েক প্রকারের তামাক পাতাকে sassafras (উত্তর আমেরিকার এক প্রকার ক্ষুদ্র

গ্লুকোজে (গ্লুকোজ এক প্রকার শর্করা জাতীয় পদার্থ—আঙুরের রসে নির্মিত) পরিণত হয়। এবং গ্লুকোজ পরবর্তী উচ্ছলন বা রস নির্গমন প্রক্রিয়ার দ্বারা অঙ্গারাম্ল (Carbon dioxide), জল প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইয়া পত্র হতে অদৃশ্য হয়। এই অবস্থায় যদিও পত্রস্থিত অ্যালবিউমিনয়েড্ (ডিম্বের শ্বেত অংশ সদৃশ পদার্থ) সমূহ অ্যাসপারাজিন্ ও তার সদৃশ অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তথাপি পত্রের যবক্ষার যানের (যবক্ষার যান—nitrogen) পরিমাণ কম হয় না। এই যে এতগুলি পরিবর্তন দেখা গেল তামাক পাতার মধ্যে একে বর্ণনা করা হয়েছে কেবলমাত্র শুষ্ক করার এবং অম্লযানের সঙ্গে মিশ্রণের ফল বলে। কিন্তু Mr. Fear তাঁর "Tobacco Leaf" নামক পুস্তকে বলেছেন যে তামাক পাতার যে পরিবর্তন তা' জীবাণু দ্বারা সাধিত নয় বটে, তবুও উহা জৈব-রসায়নের প্রক্রিয়ার ফল—কারণ পত্রকোষসমূহে প্রোটোপ্লাজম্ (জীবনের মূলীভূত উপাদান) যতক্ষণ জীবিত থাকে কেবল ততক্ষণই এই পরিবর্তন সাধিত হয়। পাতাকে যদি ঠান্ডা করা যায় বা ক্লোরোফরম্ দ্বারা অসাড় ক'রে ফেলা যায় তবে প্রোটোপ্লাজমের মৃত্যু ঘটে—তারপর পাতাকে আর সাধারণ উপায়ে শুষ্ক ক'রে রাখা যায় না। শুষ্ক করবার সময় তাপকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

একের পর এক কি কি নিয়ম পালন করতে হয় তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল। নিয়মগুলি আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ভার্জিনিয়া প্রদেশের R. A. Ragland কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে।

১। প্রথমে পাতাগুলিকে দুর্বল করা হয়। তামাক উদ্ভিদ্ ছিন্ন করবার পরই, তাদের তিন ঘণ্টার জন্য ৯০° ফারেনহাইট্ তাপে রাখা হয়। তারপর তাপ আস্তে আস্তে বাড়ানো হয় প্রায় ১২৫° ফাঃ পর্যন্ত। এর উপর তাপ উঠালে পাতা সে তাপ সহ্য করতে পারে না, ঝল্‌সে যায়। কয়েক মিনিট বাদে তাপ কমিয়ে আবার ৯০° করা হয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাতার কোষগুলি উন্মুক্ত হয় এবং জল বের হয়ে পড়ে।

২। এর পর পাতাকে পীতবর্ণযুক্ত করা হয়। এর জন্য ৯০° তাপ এবং ৪ হ'তে ৮ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন।

৩। পীতবর্ণ বজায় রাখার জন্য প্রথমে পাতাকে ১০০° তাপে রাখা হয় এবং শেষে ১২০° পর্যন্ত তাপ বৃদ্ধি করা হয়। মধ্যবর্তী সময় ১৬ থেকে ২০ ঘণ্টা।

৪। পাতাগুলিকে শুষ্ক করবার জন্য ৪৮ ঘণ্টার জন্য ১২০° থেকে ১২৫° তাপের প্রয়োজন।

৫। কাণ্ড আর মৃণাল শুষ্ক ক'রতে প্রায় ৯/১০ ঘণ্টা সময় লাগে। প্রথমে ১২৫° তাপ দরকার। তারপর ঘণ্টায় ৫° হিসাবে তাপ বৃদ্ধি করা হয়। ১৭০° থেকে ১৮০° পর্যন্ত তাপ হলেই এই প্রক্রিয়ার শেষ হয়।

পাতাগুলি শুষ্ক এবং শক্ত করবার পর প্রথম যে দিন বাতাসে বেশ জলীয় বাষ্প থাকে, সেদিন যে চালা ঘরে পাতাগুলিকে রাখা হয়েছে, সেই স্থানে বাতাসকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। এর ফলে বাতাস হতে পাতাগুলি অনেক পরিমাণে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে এবং শেষে নরম হয়।

তারপর চালার মধ্যে যে বাঁশের মাচায় পাতাগুলিকে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে নিচে আনা হয় এবং কাণ্ড থেকে তাদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। তারপর পাতার তারতম্য হিসাবে পৃথক করার কাজ। ঈষৎ আর্দ্র তামাক পাতাগুলি গোলার মেঝেয় জড়ো করা হয়। এখানে তাপ বৃদ্ধি পায়। তাপ বৃদ্ধির ফলে যে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাকে বলা যেতে পারে তামাকের রস নির্গমন অথবা স্ফুটন। ১৩০° তাপের সময় পাতাগুলিকে নূতন ক'রে সাজান হয়—মধ্যের পাতাগুলিকে বাইরে আনা হয়।

স্ফুটনের সময় তামাক পাতা হতে যে বাষ্প পাওয়া যায়, তাকে শীতল করে M. Betting নামে জনৈক বৈজ্ঞানিক ৯১·৫° তাপে অত্যন্ত ক্ষারপূর্ণ একটি তরল পদার্থ (আপেক্ষিক গুরুত্ব—০·০১৯৮) লাভ করেন। এই তরল পদার্থের মধ্যে অ্যামোনিয়া, নিকোটিন্, অ্যালকোহল এবং অ্যাসিটোন্ নামক পদার্থ সকল পাওয়া যায়।

তামাক পাতার যে উজ্জ্বল বাদামী রং অনেকে দেখেছেন, সেটা পাওয়া যায় পাতা শুষ্ক করে আর স্ফুটনের সাহায্যে। এই দুই প্রক্রিয়ার ফলে পাতার মধ্যেকার অ্যালবিউমিনয়েডসমূহ (তামাক পাতায় এদের উপস্থিতি অত্যন্ত আপত্তিজনক) সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হয়, যবক্ষারযানঘটিত উপাদানসমূহের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বের হয়ে যায়—খানিকটা যায় অ্যামোনিয়া হিসাবে আর খানিকটা যায় অতিরিক্ত নিকোটিন্ হিসাবে।

এই হচ্ছে তামাক পাতা তৈরী করবার সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়াসমূহ, আর তাদের দ্বারা ঘটিত রাসায়নিক গোলোযোগসমূহ। পাতাগুলির উপযুক্ততা দেখে সিগারেট বা চুরুটের মশলা হিসাবে তাদের ব্যবহার করা হয়। এখানে এইটুকু বলে শেষ করা ভাল যে, চুরুটের সবচেয়ে ভাল তামাক পাওয়া যায় কিউবা দেশে আর সিগারেটের তামাক সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে ভার্জিনিয়া প্রদেশের।

প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা

ভানু গুপ্ত

প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ মূলত দ্বীপের যুদ্ধ; যে যুদ্ধে প্রধান শক্তি হল নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী। গত ন'মাস ধরে এই ধরণের যুদ্ধই প্রশান্ত মহাসাগরে হয়ে আসছে। আর সেই সংগে সংঘর্ষ বিক্ষুব্ধ জলরাশির আবর্তনে ভেসে উঠছে একটার পর একটা

দেওয়া যাক। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোর একটা ভৌগোলিক পরিচয় বর্তমান যুদ্ধের মধ্যে জানা দরকার। তাতে সামরিক অবস্থান এবং প্রশান্ত পরিস্থিতির অস্পষ্টতা অনেকটা দূর হবে। জাপান আক্রমণ করাবর আগে প্রশান্ত মহাসাগরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে

কোনটা বহুশ্রুত, কোনটা স্বল্পশ্রুত, কোনটা জাভা, সুমাত্রা, সেলিবিস, গুয়াম, হনলুলু, ইত্যাদি অনেক দ্বীপ। এতদিন যেসব ...র মনে একটা অস্পষ্ট রোমাণ্টিক ...আজ অস্ত্রফলকের মুখে এক ভয়াল ...ণা সুঠাম তরুণী, দৃঢ়পেশী পুরুষ ...হাওয়ায় কাঁপা নারকেল শীর্ষের ...গীত, লাল প্রবাল আর সুগন্ধি ...অজ বিলীন। এখন শুধু ...র হিসাব, জায়গা দখল ও বেদ-...ই আগন্তুকের পরস্পর বিরোধী ...নে এসে কঠিন মাটিতে পা

রকম রাজ্যভাগ ছিল, সেই ভাবেই এখানে দ্বীপগুলোর উল্লেখ করা ভালো। কারণ যুদ্ধ এখনও চলছে, একটা জায়গা আজ যার দখলে আছে কাল তার দখলে থাকছে না। আর কোন্ জায়গায় কার অধিকার কায়েম হল সে মীমাংসা হবে যুদ্ধের অবসানে, যুদ্ধের মধ্যে নয়। এ ছাড়া সব খবরও আমরা যথাসময়ে পাই না। জাভা, সুমাত্রা, সেলিবিস জাপানীদের কবলে গেছে তা আমরা জানি; কিন্তু ব্রিটিশ সলোমন দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত দ্বীপ যে তারা দখল করে নিয়েছিল, এমন কোন স্পষ্ট খবর আমরা মার্কিন পাল্টা আক্রমণের আগে জানতাম না। গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জের মেকিন দ্বীপ জাপানীদের পদানত হয়েছে, এ সংবাদ সম্প্রতি টের পেলাম যখন ঐ দ্বীপে মার্কিন নৌসৈনিকেরা গিয়ে অতর্কিত হানা দিল। সুতরাং পূর্বেকার রাজনৈতিক বিভাগই অনুসরণ করা বিধেয়।

১৫ ২... করবার ... দেওয়া হয়। আগেই উদ্ভিদ... দেবার আগেই সেগু... তামাক পাতাও... এই কাজে জ্ঞান, অভিজ্ঞ... বিভিন্ন দেশে এবং ... নিয়ম আছে। সাধারণ... সংক্ষেপে বলবো।

যখন ফসল পাকে, ... এবং যত্ন সহকারে ঐগুলিকে ... দুর্বল করবার জন্য আর পা... পাতাগুলিকে রৌদ্রে রাখা হয়। রৌদ্রে রাখলে ফসল নষ্ট হয়ে যা... যদি গরম অথচ মেঘাবৃত দিন পাও... যে নিয়মই অনুসরণ করা যাক ... বিশেষভাবে নির্মিত শুষ্ক কর... হয়। এখানে ফসলকে হয় বাতা... গরম বায়ু চালিত করে ফসলকে শুষ্ক, তামাক পাতাকে sassafras (উত্তর

তবে যে জায়গা হাতবদল করেছে বলে' জানা গেছে, তার সে ভাগ্যের উল্লেখ করা যাবে।

গত ডিসেম্বরে জাপানী আধিপত্য বিস্তার আরম্ভ হওয়ার আগে প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপরাজ্য ছিল ইংলণ্ডের, আমেরিকার, হল্যাণ্ডের, পর্তুগালের, ফ্রান্সের ও জাপানের। অনেক আগে জার্মানীরও ছিল ; কিন্তু গত মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর তার দ্বীপগুলো বিজয়ী বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। সুবিধার খাতিরে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজের (ডাচ নিউ গিনি নিয়ে) দ্বীপগুলোকে একটা থোক হিসেবে ধরে ফরাসী ইন্দোচীন, মালয় ও শ্যামের সঙ্গে একত্রে 'সুদূর প্রাচ্য' বলে অভিহিত করা হয়। ব্রিটিশ দ্বীপ বোর্ণিও (মালয় ও সুমাত্রার পূবে এবং সেলিবিসের পশ্চিমে), পর্তুগীজ দ্বীপ টিমর (জাভা দ্বীপ মালায় পূর্ব প্রান্তের ঠিক নীচে এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার উপরে) এবং মার্কিন দ্বীপপুঞ্জ ফিলিপিন (ফরাসী ইন্দোচীনের পূবে, সেলিবিস ও বোর্ণিওর উপরে এবং ফর্মোসার নীচে)—এই দ্বীপগুলোকে উপরোক্ত গণ্ডীর মধ্যে ধরা হয়। এসব দ্বীপ বর্তমানে জাপানের দখলে, এ সংবাদ সকলেরই জানা আছে। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজের সুমাত্রা, জাভা, মাদুরা, বাঙ্কা, বোর্ণিওর কতকাংশ, সেলিবিস, মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জ, টিমরের কতকাংশ, বালি, লম্বক—এ দ্বীপগুলো সুপরিচিত। ফিলিপিনের সাত হাজারের বেশী দ্বীপের মধ্যে লুজন, মিন্দানাও, সামার, পানে, নেগ্রস, পালাওয়ান, মিন্দোরো, সেবু—এ দ্বীপগুলোর নামও সম্প্রতি যুদ্ধের ঢক্কানিনাদে বিশ্বময় বিঘোষিত হয়েছে।

অস্টেলিয়া, অস্ট্রেলিয়ান নিউগিনি এবং নিউগিনি ও ফিলিপিনের পূর্বদিকে সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপকে একত্রে বলা হয় "ওশেনিয়া।" (নিউ গিনিতে আগে জার্মানীর যে অংশ ছিল তা গত মহাযুদ্ধের পর অস্ট্রেলিয়ার ম্যাণ্ডেট-শাসনে দিয়ে দেওয়া হয় ; নিউ গিনির পূব-দক্ষিণ অংশ পাপুয়া আগে ছিল খাস ব্রিটিশ শাসনাধীন, সেটা ১৯০৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার হাতে দেওয়া হয়)। "ওশেনিয়ার" দ্বীপপুঞ্জগুলো নৌ ও বিমান ঘাঁটি স্থাপনের পক্ষে খুব উপযোগী। সে জন্যে এদের সামরিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই সীমার মধ্যে জাপানের তিনটি দ্বীপপুঞ্জ আছে ; এগুলো সে গত মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর কাছ থেকে পেয়েছিল। এ তিনটে দ্বীপপুঞ্জ হচ্ছে মারিয়ান বা লাড্রোন, কারোলাইন এবং মার্শাল। টোকিও ইওকোহামার দক্ষিণ দিকে প্রশান্ত মহাসাগরে খাস জাপানের অন্তর্গত যে বোনিন ও ভলকানো দ্বীপপুঞ্জ আছে মারিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ঠিক সেই লাইনেই আরো দক্ষিণে অবস্থিত। এর অবস্থান মার্কিন দ্বীপ-গুয়ামের মাথার উপরে। এর ১৪টা দ্বীপের মধ্যে সিপান-এর নাম উল্লেখযোগ্য। কারোলাইন মারিয়ানের (এবং গুয়ামের) একটু দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। পূর্ব ও পশ্চিম কারোলাইন নামে বিভক্ত এই দ্বীপপুঞ্জে ত্রুক, পোনাপে, পালাউ ও ইয়াপ উল্লেখযোগ্য। কারোলাইনের পূর্বে মার্শাল। এই দুই দ্বীপপুঞ্জের বিস্তার পূবে-পশ্চিমে দুই হাজার মাইল। মার্শাল-এ দুটি দ্বীপ-শৃঙ্খল আছে ; নাম—রাডাক (১৩টি দ্বীপ) ও রালিক (১১টি দ্বীপ) ; প্রধান দ্বীপ জালুইৎ।

কারোলাইন ও মার্শালের দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে একটা ব্রিটিশ অধিকৃত দ্বীপের মালা আছে। পশ্চিম থেকে পূবে এর পাঁচটা ভাগ হচ্ছে—(১) অস্ট্রেলিয়ান নিউগিনি ; (২) বিসমার্ক দ্বীপমালা ; আগে জার্মানীর ছিল, এখন অস্ট্রেলিয়ান ম্যাণ্ডেটে ; (৩) সলোমন ও সাণ্টা ক্রুজ ; (৪) নাউরু ; আগে জার্মানীর ছিল এখন ব্রিটেনের ম্যাণ্ডেটে ; ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড একত্রে এই ম্যাণ্ডেটি শাসন পরিচালনা করে ; নাউরু সাণ্টা ক্রুজের খাড়া উত্তরে ; (৫) গিলবার্ট ও এলিস দ্বীপপুঞ্জ। এই ব্রিটিশ দ্বীপমালা যেন উত্তরের জাপানী দ্বীপমালার সম্মুখবর্তী প্রথম ব্যূহ। নিউগিনির নীচে রয়েছে খাস অস্ট্রেলিয়া। সাণ্টা ক্রুজের দক্ষিণে এবং অস্ট্রেলিয়ার পূর্বে রয়েছে নিউ হেব্রাইড্‌স্ দ্বীপপুঞ্জ (যুক্ত ইঙ্গ-ফরাসী শাসন) ; তার পূর্বে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ এবং ফিজির পূর্ব-দক্ষিণে টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জ (দুটোই ব্রিটিশ), আর টোঙ্গার উত্তরে পশ্চিম সামোয়া দ্বীপপুঞ্জ (নিউজিল্যাণ্ডের ম্যাণ্ডেট)।

বিসমার্ক দ্বীপমালার মধ্যে প্রধান প্রধান দ্বীপ হচ্ছে নিউ ব্রিটেন, নিউ আয়র্ল্যাণ্ড, লাভোঙ্গাই, ডিউক অফ্ ইয়র্ক দ্বীপপুঞ্জ, এড্‌মিরালটি দ্বীপপুঞ্জ, মুসাউ দ্বীপপুঞ্জ, গার্ডনার দ্বীপপুঞ্জ, ভিটু দ্বীপপুঞ্জ, নিনিগো দ্বীপপুঞ্জ। সলোমনের দ্বীপগুলোর কয়েকটার নাম বুগেনভিল, বুকা, তুলাগি, গুয়াদালকানার। সাণ্টা ক্রুজের মধ্যে আছে সাণ্টা ক্রুজ, উটুপুয়া ও ভানিকোরো। গিলবার্ট ও এলিসের মধ্যে আছে ফুনাফুটি, নুই, ফ্যানিং, ওয়াশিংটন, ওশেন, ক্রিশ্চান, মেকিন মারাকেই। নিউ হেব্রাইডস্-এ এস্পিরিটু সাণ্টো, মালেকুলা, এপি আম্ব্রিম ; ফিজিতে ভিটি লেভু, ভানুয়া লেভু, রোটুমা ; এবং টোঙ্গাতে টোঙ্গাটাবু, হাপাই, ভাভাউ উল্লেখযোগ্য।

ফরাসী অধিকারের আসল এলাকা অনেক পূবে দিকে অবস্থিত। এর মধ্যে আছে তাহিতি, মার্কেশাস ও তুয়ামোতু দ্বীপপুঞ্জ। পশ্চিমে অস্ট্রেলিয়া-ফিজি এলাকায়ও ফ্রান্সের রাজ্য আছে। নিউ হেব্রাইড্‌স্-এ ফ্রান্সের অংশ আছে ; এখন স্বভাবতই ব্রিটিশ কর্তৃত্ব এখানে সর্বেসর্বা। নিউ কালেডোনিয়া সম্পূর্ণ ফ্রান্সের ; কিন্তু জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা হিসাবে মার্কিন সৈন্যেরা কিছুদিন পূর্বে এই ফরাসী রাজ্য দখলে নিয়েছে। নিউ কালেডোনিয়া নিউ হেব্রাইড্‌স্-এর একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হচ্ছে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। হংকং থেকে একেবারে সোজা পূবে ৪৯৫০ মাইল দূরে হাওয়াই-এর অবস্থান। এখানে বিরাট নৌঘাঁটি পার্ল হারবারের নাম সকলেই শুনেছেন। এর রাজধানী হনলুলু ওয়াহু দ্বীপের উপর অবস্থিত। অন্য কয়েকটা দ্বীপের নাম হাওয়াই, মাউই, কাউয়াই, মলোকাই, লানাই। একদম উত্তরে বেরিং সাগরের নীচে এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ আলস্কার দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁকা মালার মতো বিস্তৃত। এর আত্তু, কিস্‌কা, ফক্স দ্বীপ এবং সামরিক ঘাঁটি ডাচ হারবার উল্লেখযোগ্য। দূরে দক্ষিণে রয়েছে পূর্ব সামোয়া ; এই দ্বীপ ব্রিটিশ টোঙ্গা এবং নিউজিল্যাণ্ডের ম্যাণ্ডেট শাসিত পশ্চিম সামোয়ার সংলগ্ন। হনলুলু এবং সামোয়ার মধ্যে প্রায় ২০০০ মাইলের ব্যবধান ; কিন্তু এই বিরাট সমুদ্র ব্যবধানের মধ্যে ছড়ানো আছে, মধ্য পলিনেশিয়ার স্পোরেড্‌স্ এবং ফিনিক্স দ্বীপপুঞ্জ। স্পোরেড্‌স্-এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা দ্বীপ আছে ; তার নাম সামারাং। ফিনিক্স দ্বীপপুঞ্জ ব্রিটিশ শাসনাধীন বটে ; কিন্তু এর দুটো ছোট দ্বীপ ক্যাণ্টন ও এণ্ডার বেরীর স্বত্ব নিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতান্তর আছে। বর্তমানে এই মর্মে একটা মিটমাট হয়েছে যে, "দীর্ঘকালের জন্যে" এই দুটো দ্বীপের উপর রাজ ক্ষমতার প্রশ্ন স্থগিত থাকল ; তবে প্রত্যেক জাতি অপর জাতিকে অসামরিক বিমান চলাচলের সুবিধা দেবে। এখন ব্রিটেন ও আমেরিকা মিত্র হওয়ায় কি ব্যবস্থা হয়েছে জানা যায়নি।

হাওয়াই এবং ফিলিপিনের মধ্যে তিনটি মার্কিন দ্বীপ আছে। এগুলো ঠিক সরল রেখায় অবস্থিত নয়—পূব থেকে পশ্চিমে এগুলো হচ্ছে মিডওয়ে (হাওয়াই-এর কিছু উত্তর-পশ্চিমে), ওয়েক (মিডওয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে) এবং গুয়াম (ওয়েকের দক্ষিণ-পশ্চিমে)। এদের তিন হাজার মাইল সমুদ্র-ব্যবধানের মধ্যে আশে পাশে শুধু জাপ অধিকৃত ভূমি। সুতরাং ওয়েক ও গুয়াম বর্তমান যুদ্ধের প্রথমভাগেই জাপানের পক্ষে দখল করে নেওয়া কঠিন হয়নি।

চান্‌হু-দাড়ো

ভবানী পাঠক

ধনধান্যে সমৃদ্ধ, হাসি আনন্দ কলরবে মুখরিত একটি নগর। শান-বাঁধানো বড় বড় রাস্তা, সমস্ত দিন পথ দিয়ে কর্মব্যস্ত নরনারীর আনাগোনা। হাতি ঘোড়া ও মানুষ-টানা বড় বড় রথের আকারে গাড়ি বোঝাই পণ্য সামগ্রী আসে আর যায়। বড় বড় অট্টালিকার বাতায়নপথে সংগীতের সুশব্দ ও নৃত্যপরা ললনার নূপুর নিক্কন শোনা যায়। বিচিত্র কারুকার্যে খচিত প্রত্যেকটি ভবনদ্বার। দূর সিরিয়া বাবিলন ও মিশর থেকে পণ্যসম্ভার নিয়ে শহরের সদাগর ছেলেরা বছর শেষে ঘরে আসে। নরনারী প্রত্যেকের পরিপাটি বেশভূষা, গায়ে দামী পাথর ও ধাতুর তৈরি নানা অলংকার ও আভরণ। এই নগরে অস্ত্রের ঝনঝনা শোনা যায় না। মানুষের মনে রাজ্যজয়ের কোন তাড়না নেই,—তারা চায় সুখে ও শান্তিতে ভরা নিরূপদ্রব জীবন। কোন প্রাচীর বা পরিখা দিয়ে নগরকে ঘিরে রাখা হয়নি।

সেদিন ভোরে, সিন্ধুনদের পূর্ব-প্রান্তে দেওদার বনে ঘুম-ভাঙা পাখির ডাকের সংগে সূর্য উঠছে। অকস্মাৎ সারা নগরের বুক ভেদ করে এক আর্তনাদ বেজে উঠলো। দস্যুরা হানা দিয়েছে। পশ্চিম গিরিমালার সহস্র গুহাকন্দর ও বালুকা-প্রান্তর থেকে নানা ভয়ানক হিংস্র আয়ুধে সজ্জিত দস্যুর দল লুব্ধ জন্তুর মত এই সুসভ্য নগরের পথে ঘাটে অতর্কিতে এসে ছড়িয়ে পড়েছে। হত্যার উৎসবে লাল হয়ে উঠলো নগরের কঠিন পাথরের পথ। দস্যুরা আগুন লাগিয়ে দিল—নগরের সেই দারুময় শিল্পশোভা ভস্মে অংগারে ঝরে পড়তে লাগলো।

নগরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, এক তরুণী নটী। উৎসব-রজনীর শেষে তার ক্লান্ত ঘুমন্ত দেহভার পড়েছিল নৃত্যকক্ষের মেঝের ওপর। গায়ের আভরণগুলি খুলে রাখারও সময় হয়নি। হঠাৎ ঘরের সিঁড়িতে শোনা গেল উন্মত্ত দস্যুদের চীৎকার। একজন দস্যু একহাতে এসে ধরলো নটীর গলার মণিময় মালা, আর একজনের হাতের উদ্যত খড়্গ নির্মমভাবে এসে আঘাত করলো তরুণীর অংগে।

তরুণী দস্যুদের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে রক্তাক্ত-দেহে ছুটে পালাচ্ছে। তার গলার হার ছিঁড়ে মণিশিলাগুলি খসে ঝরে পড়ছে পথের ওপর। পেছনে ধাবমান দস্যুরা উল্লাসে চীৎকার করে কুড়িয়ে নিচ্ছে তার দেহচ্যুত যত রত্ন আভরণ। তরুণী নটী তবু ছুটে পালাচ্ছে আশ্রয়ের জন্য, প্রাণরক্ষার জন্য।

বড় রাজপথের পাশে নেমে গেছে সরু একটা গলি। সেখান দিয়ে কিছুদূর গিয়ে একটা অন্ধকারময় মণ্ডপ। সেখান থেকে একটা পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে নীচে। সিঁড়ির শেষে একটা গোপন কুঠুরি, তার পাশেই একটি জলভরা কূপ।

পাঁচ হাজার বছর আগে তৈরী হয়েছিল এই জলকূপ। সিন্ধু দেশের পল্লী রমণীরা সেই কূপ থেকে আজ আবার জল তুলছে

এক আঁজলা ঠাণ্ডা জল খেয়ে তরুণী সেখানে বসে পড়লো। পেছনে উন্মত্ত দস্যুদের রব আর শোনা যায় না। ওপর দিকে তাকালে দেখা যায় পুঞ্জে পুঞ্জে ধূমকুণ্ডলী আকাশ ছেয়ে ফেলছে! সমস্ত নগর পুড়ছে।

এখনো দেহে প্রাণ আছে। তরুণী একবার চেষ্টা করলো, সে ওপরে উঠবে আবার। সেই নিহত নগরের চিতাবহ্নি শান্ত হলো কি না। কিন্তু বৃথা! এক-পা দু'পা করে কয়েক সিঁড়ি ওপরে উঠেই তার শেষ নিশ্বাস বাতাসে মিশে গেল। নগরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী সেই তরুণী নটী পড়ে রইল সেই সিঁড়িতে মাথা রেখে।

তারপর, এক দুই তিন করে সাতটি হাজার বছর কেটে গেছে। কিন্তু তরুণী নটী তেমনি পড়ে রয়েছে সিঁড়িতে মাথা রেখে। আজও তাকে দেখতে পাওয়া যায়।

যে কাহিনী বলা হলো, তা আদৌ রূপকথা নয়। এটা

ইতিহাসের কথা, আমাদেরই ভারতের ইতিহাস। অতীত ভারতের এক গৌরবময় যুগে, হঠাৎ একদিন এমনই এক দুঃখকর ট্রাজেডি নেমে এসেছিল। এই কাহিনী কোন শিলালেখ বা তাম্রলেখে পাওয়া যাবে না। মাটি খুঁড়ে এই কাহিনীকে হাড়গোড় সুদ্ধ পাওয়া গেছে। প্রাগার্য ভারতের সভ্যতা অর্থাৎ সিন্ধুসভ্যতার লীলানিকেতন মহেঞ্জো-দাড়োর স্তূপ খনন করে এই তরুণীর অস্থি আবিষ্কৃত হয়েছে। সাত হাজার বছর আগে সেই দুর্ভাগিণী ঠিক যেভাবে সিঁড়ির ওপর মাথা রেখে মরেছিল, আজও তাকে সেইভাবেই পাওয়া গেছে। হাঁটুটি এখনো যেভাবে রয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মরবার আগে সে হামা দিয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করেছিল। তার নাম ধাম গোত্র সঠিক জানা যাবে এমন কোন প্রমাণ সেখানে নেই। জীবনে কোন্ দুঃসহ ব্যাথা বা ঘটনা তার জীবনে এমন করুণ পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল তা জানা যায় না। কিন্তু তার গায়ে অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন থেকে এবং আরও নানা প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে, তার জীবনের ঐ ট্রাজেডির কাহিনী কল্পিত হলেও একান্ত অসম্ভব নাও হতে পারে।

বড় বিস্ময়কর এই সিন্ধু সভ্যতা। দুঃখের বিষয় এত বড় একটি কীর্তির সম্বন্ধে কোন লিখিত পরিচয় কোথাও কিছু পাওয়া যায় নি। সিন্ধুনদের সারা উপত্যকা জুড়ে যে সভ্যতার বিস্তার ছিল, যে মানুষেরা দূর বাবিলন মিশরের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রাখতো, যাদের শিল্পরুচি এত উন্নত ছিল, যারা এত উন্নত নগর পত্তন করার মত পূর্তেতত্ত্ব আয়ত্ত করেছিল তাদের জীবনের ছবি শুধু আমরা কল্পনা করে নিই। তাদের নামধাম আচার ব্যবহার ভাষা পরিচ্ছদ—কোন কিছুরই বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় না।

সিন্ধু-সভ্যতার প্রসঙ্গে আমরা প্রায়ই দুটী স্থানের নাম শুনে থাকি—সিন্ধুর মহেঞ্জোদাড়ো ও পাঞ্জাবের হরপ্পা। কিন্তু এই দুটী স্থানের খননের ফলে যা কিছু জানা গেছে, সেখানেই প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণা শেষ হয়নি। নতুন নতুন জায়গা বেছে নিয়ে সমাধিস্থ সিন্ধু সভ্যতাকে মাটী খুঁড়ে বার করার প্রয়াস চলেছে। এর মধ্যে চান্হু-দাড়োর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৪ সালে আর্থিক অসুবিধার কারণে ভারত গবর্ণমেণ্ট সিন্ধুসভ্যতা সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্য স্থগিত করে দেন। কিন্তু একটী মার্কিণ প্রত্নতাত্ত্বিক পরিষদ ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে নিজ ব্যয়ে এই খনন কার্য চালাবার অনুমতি লাভ করেন। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ডাঃ ই ম্যাকের পরিচালনাধীনে নতুন করে কাজ আরম্ভ হয়। এর আগে ডাঃ ম্যাকে সুমেরীয় সভ্যতার কীশ সহরের খনন কার্য করে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। চান্হু-দাড়োতে ১৯৩০ সালে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার দুজায়গায় দুটো স্তূপ অল্প অল্প খুঁড়ে পরীক্ষা করেছিলেন। শ্রীযুক্ত মজুমদার যে সার্ভে করেছিলেন তার মধ্যে দু'নম্বরের স্তূপটি হলো সবচেয়ে বড়। এই স্তূপটি সমভূমি থেকে প্রায় সাড়ে তেইশ ফুট উঁচু। পাঁচ মাস খননকার্যের ফলে প্রায় ১৭ ফুট স্তূপ সরানো হয়। বর্তমানে স্তূপটি প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্তূপের শীর্ষদেশ এখন প্রাচীন শহরের অট্টালিকা, স্নানাগার, পথ ও পয়ঃপ্রণালীর নিদর্শন নিয়ে প্রকাশিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু যতখানি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী এখনো আত্মগোপন করে রয়েছে আরও গভীর ভূস্তরে। অনুমান, আরও উনিশ ফুট নীচে পর্যন্ত গেলে প্রাচীনতম শহরটীর নিদর্শন পাওয়া যাবে। এই স্তরে স্তরে বিন্যস্ত এক একটী পুরাতন শহরের সমাধি দেখে মনে হয় যে যুগে যুগে সিন্ধু নদীর প্লাবন এই সভ্যতার কেন্দ্রের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এক একটী প্লাবনের পর আবার সেখানে পলি পড়েছে এবং মানুষ আবার নতুন করে এসে নগর পত্তন করেছে। উনিশ ফুট গভীর একটী কুঁয়োর মত গর্ত খুঁড়ে নিম্নস্তরের নগরগুলির এই পরিচয় পাওয়া গেছে। গর্তের তলায় কতগুলি ছোট ছোট পানপাত্র পাওয়া গেছে। এই পানপাত্রগুলির আকৃতি একটু অদ্ভুত। মনে হয় মহেঞ্জোদাড়োর প্রাচীনতম স্তরের শহর থেকেও এই নিদর্শনগুলি কিছু প্রাচীনতর। কিন্তু আরও গভীর স্তরে না পৌঁছলে স্পষ্ট করে কোন ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না।

চান্হু-দাড়োতে প্রাপ্ত (১) এবং (২) তামার তৈরী ক্ষুর, (৩) যাঁতাওয়ালী (পুতুল), (৪) মাছ ধরার বঁড়শী, (৫) মাটির তৈরী বিচিত্র উপাধান

চানহুদাড়োয় সবচেয়ে ওপরের স্তরটীতে যেসব মাটীর পাত্র, সীল ও হাতিয়ার পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় এই নগরটি মহেঞ্জোদাড়োর সমসাময়িক ছিল। একই জাতি দুই শহরে বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু চানহুদাড়োর যে পরিচয় পাওয়া গেছে তা থেকে একে মহেঞ্জোদাড়োর চেয়ে একটু গরীব শহর বলেই মনে হয়। সড়কগুলির গঠন, ড্রেণের গঠন এবং জল নিষ্কাশনের জন্য মাটীর পাইপের ব্যবহার—এই সব আরও নানা পূর্তকার্যের মধ্যে উভয় শহরের সাদৃশ্য প্রমাণিত করে। চানহুদাড়ো শহরের লোকেরা অধিকাংশই শিল্পজীবী বা কারিগর ছিল বলে ধারণা হয়। এর বৈশিষ্ট্য হলো পুতুল শিল্প। এত বিচিত্র রকমের খেলনা মোহেঞ্জোদাড়োতে দেখা যায় সভ্যতায় এইরকম ষাঁড়ে-মানুষে লড়াই খেলা প্রচলিত ছিল। আর একটি সীলের ছাপে আঁকা আছে, একজোড়া দেবী মূর্তি (Goddess) বটগাছের দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

সিন্ধু সভ্যতার ভাষা সম্বন্ধে এখনো তেমন মর্মোদ্ধার সম্ভব হয়নি, তবে কতকগুলি লিপি পাওয়া গেছে। লিপিগুলি থেকে তাদের লিখন পদ্ধতির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। একটি মাটির তৈরী দোয়াত পাওয়া গেছে, এর গঠন ঠিক আধুনিক কালের দোয়াতের মত।

ধাতু দ্রব্যের মধ্যে প্রধানতঃ তামা ও ব্রঞ্জের ব্যবহার ছিল। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক কালের পাথরের হাতিয়ারের ব্যবহার

চানহুদাড়োতে প্রাপ্ত (১) পুতুল, (২) লিপিযুক্ত একটি সীল মোহর, (৩) রঙীন মৃৎকুম্ভ, (৪) মাটির তৈরী খোলা ড্রেন পাইপ, (৫) মাটির তৈরী আস্ত ড্রেন পাইপ

না। চানহুদাড়ো থেকে বহু খেলনাসামগ্রী পণ্য হিসাবে নানা জায়গায় রপ্তানি হতো। খেলনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো —মাটীর তৈরী চারচাকাওয়ালা গাড়ী। একটী ব্রঞ্জের তৈরী খেলনা গাড়ী পাওয়া গেছে। আধুনিক ভারতে টোঙ্গা বা এক্কা গাড়ীগুলির যেরকম গঠন, এই খেলনা গাড়ীর গঠনও সেই প্রকার। তাছাড়া খেলনার মধ্যে রঙীন গুলি, ঘুটি, ঝুমঝুমি ও জন্তুজানোয়ার তৈরী করা হতো।

মহেঞ্জোদাড়োতে যেমন নানারকম খেলাধুলোর পদ্ধতির নিদর্শন পাওয়া গেছে, এখানে সেরকম বিশেষ কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মোহেঞ্জোদাড়োতে দাবা খেলার প্রচলন ছিল। সীলগুলির মধ্যে বিবিধ জন্তুর প্রতিকৃতি ছাপা হতো—বেঁটে শিংওয়ালা ষাঁড়, হাতী, বাঘ ও গণ্ডার। একটি সীলের ছবি হলো, একটি ষাঁড় বা বাইসন একটি মানুষকে পদদলিত করছে। ক্রীট তখনো উঠে যায়নি, পাথরের তৈরী বাঁকানো ছুরি বা দা'য়ের ব্যবহার গৃহস্থালীর কাজে খুবই ব্যবহৃত হতো। চানহুদাড়োতে পাথরের হাতিয়ারের চেয়ে ধাতুর তৈরী জিনিষপত্রের ব্যবহার বেশী ছিল। কুঠার, বেলচা, বঁড়শী, ক্ষুর, ছুরি, হাতের বালা, আংটি প্রভৃতি বহু ব্রঞ্জ ও তামার সামগ্রী পাওয়া গেছে। বল্লমের ফলা এবং তীরের ফলা কতকগুলি পাওয়া গেছে। কিন্তু এর সংখ্যা এত কম যে এই প্রাচীন মানুষেরা যোধৃজাত ছিল বলে মনে হয় না—অথবা তাদের জীবনে কোন বহিঃশত্রুর উৎপাত হয়তো বিরল ছিল। নগরের চারিদিকে কোন প্রাচীরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। চানহুদাড়োতে বহিঃশত্রুর আক্রমণে খুব বড় রকম কোন লুঠতরাজ বা অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে নগরটি যখন

(১৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কলিকাতার বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য আই এফ এ-র পরিচালকগণ সকল ফুটবল প্রতিযোগিতা এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখিয়াছিলেন। এই জন্য গত সপ্তাহে আই এফ এ শীল্ড অথবা আই এফ এ-র পরিচালিত কোন ফুটবল প্রতিযোগিতাই অনুষ্ঠিত হয় নাই। সোমবার, ২৪শে আগস্ট আই এফ এ-র কার্যকরী সমিতির এক সভা হয় এবং ঐ সভায় মঙ্গলবার হইতে সকল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হয়। আই এফ এ শীল্ডের সেমি-ফাইনাল ইস্টবেঙ্গল ও রেঞ্জার্সের খেলা ২৬শে আগস্ট ও ফাইনাল খেলা ২৯শে আগস্ট অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই সংবাদ সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের আনন্দের ও উৎসাহের কারণ হইবে সন্দেহ নাই। এই বৎসর কোন প্রতিযোগিতাই শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে না, ইহাই সকলে ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন। তবে আমাদের আশঙ্কা হয় যে, ক্রীড়ামোদিগণ এই সকল খেলার সংবাদ ঠিক সময় জানিতে পারিবেন কি না! জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী সকল সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ রহিয়াছে। সংবাদ সরবরাহের যখন ঠিক ব্যবস্থা নাই, তখন এইরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হওয়ায় ক্রীড়ামোদিগণ অনেকেই যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার খেলা দেখিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

আই এফ এ শীল্ড ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার শেষ মীমাংসা দেখিবার জন্য ক্রীড়ামোদিগণ বিশেষভাবেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিজয়ী দলও বিপুল জনসমাগমের সম্মুখে গৌরব অর্জন করিলে নিজেদের ধন্য মনে করেন। কিন্তু যেরূপ অবস্থার মধ্যে এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে দর্শক সমাগম বিশেষ হইবে বলিয়া মনে হয় না। আই এফ এ-র কর্তৃপক্ষগণ সংবাদপত্রের অভাবে প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়াও জানা যায় নাই। এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা উৎসাহহীন নীরবতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা খুবই দুঃখের বিষয়।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

আন্তঃপ্রাদেশিক সন্তোষ মেমোরিয়াল ফুটবল প্রতিযোগিতা আগস্ট মাস হইতেই আরম্ভ হইবে বলিয়া স্থির ছিল। বোম্বাই প্রদেশ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে না বলিয়া ইতিপূর্বেই জানাইয়া দিয়াছেন। মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি প্রদেশের ফুটবল পরিচালকগণও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙলা প্রদেশের পরিচালকগণ তাঁহাদের অনিচ্ছা জ্ঞাপন না করিলেও যতদূর অনুমান হয় যোগদান করা সম্ভব হইবে না বলিয়া চিন্তা করিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় এই বৎসর আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। জাতীয় আন্দোলনের ফলে সারা ভারতব্যাপী যে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিয়াছে তাহার মধ্যে এইরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও সমীচীন হইবে না।

বাঙলার সন্তরণ অনুষ্ঠান

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ এই বৎসরের সন্তরণ মরসুম বৃথা নষ্ট হইতে দিবেন না বলিয়া যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে বর্তমানে শৈথিল্য দেখা দিয়াছে। বর্তমান অবস্থায় পুনরায় নীরবতার আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়াই তাঁহারা স্থির করিয়াছেন। এই জন্যই সাধারণ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হইল কি না অথবা যদি ঐ সভা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে ঐ সভায় কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন তাহা কিছুই জানিতে পারা গেল না। সারা দেশব্যাপী বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না ইহা সাধারণে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারে। সুতরাং তাঁহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় লজ্জিত হইবার কোনই কারণ ঘটে নাই। মরসুমের প্রথমে নীরব থাকিয়া শেষ সময়ে অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত হওয়াই তাঁহাদের পক্ষে উচিত হয় নাই। এই বৎসর তাঁহারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন তাহাতে আশা করা যায় তাঁহারা আগামী বৎসরে ঠিক সময়ে সচেতন হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। সাঁতারুগণ যাঁহারা উক্ত পরিচালকগণের জন্য এই বৎসর হতাশ হইলেন তাঁহারা সকল দুঃখ সকল হতাশ ভুলিয়া যাইবেন যদি আগামী বৎসর মরসুমের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পান যে, বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন পূর্ব হইতেই মরসুমের সকল কার্যতালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

ইয়ঙ্গার কাপের খেলা

ইয়ঙ্গার কাপ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান ও মহালক্ষ্মী স্পোর্টিং দলের খেলাটি পুনরায় অনুষ্ঠিত হইবার নির্দেশ আই এফ এ-র পরিচালক কমিটি দিয়াছিলেন। সম্প্রতি জানিতে পারা গেল মোহনবাগান ক্লাব মহালক্ষ্মী স্পোর্টিং ক্লাবকে ওয়াক ওভার দিয়াছেন। মোহনবাগান ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণ মহালক্ষ্মী স্পোর্টিংকে এই সুবিধা দিয়া প্রকৃত খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিয়াছেন। আই এফ এ-র কর্তৃপক্ষগণ সুবিচার না করিলেও মোহনবাগান ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণের ব্যবস্থা সেই অন্যায় প্রতিকারে সহায়তা করিল। সিনিয়ার ও খ্যাতনামা ক্লাব হিসাবে তাঁহাদের ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

"দেশ" রবীন্দ্র স্মৃতি-সংখ্যায় 'সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ'

মাননীয় "দেশ"-সম্পাদক-মহাশয় সমীপেষু—

আপনার 'রবীন্দ্র স্মৃতি-সংখ্যা' পড়িয়া আনন্দ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের চিঠি'-গুলি তাঁহার জীবনের পূর্ণ পরিচয় লাভের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' ও শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথের গান রচনা' তথ্যসমৃদ্ধ। শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর "চিঠিপত্র" ও "নির্বাণ" পুস্তক দুইটির সশ্রদ্ধ আলোচনা সুখপাঠ্য। কিন্তু আশ্চর্য হইয়াছি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু এম্ এ, বি এল রচিত 'সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ' পড়িয়া। এমন অক্ষম রচনা বড় বেশী চোখে পড়ে না। একটি বিষয়ে কিছু না জানিয়া প্রবন্ধ লেখা এ-দেশে বিরল নহে, কিন্তু এই লেখাটি সেইরূপ সকল লেখাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত—বলিতে আমার স্বভাবতঃই সংকোচ হয়,—কবির দেহত্যাগের পর প্রকাশিত 'ক্যালকাটা ম্যুনিসিপ্যাল গেজেট' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার 'রবীন্দ্র-জীবনপঞ্জী' ("Rabindranath Tagore: A Chronicle of Eighty Years: 1861—1941") হইতে সংকলিত। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে ঐখানেই। সে জীবন-পঞ্জীতে ছিল শুধু তথ্যের সমাবেশ। সেই পুত্তলিকায় 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করিতে হইলে যে কারিগরী প্রয়োজন মৃণালবাবুর তাহা না থাকাতে তাঁহার হাতে প্রতিমা গড়িয়া উঠে নাই—প্রাণহীন মৃত্তিকাপিণ্ড মাত্রই রহিয়াছে। আর যেখানেই তিনি আপনার কল্পনা বা সীমাবদ্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া কিছু যোগ বিয়োগ করিয়াছেন সেইখানেই গোলযোগ করিয়া বসিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে, "রবীন্দ্রজীবনী"-লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় কবির অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত কোন একটি পত্রিকাতে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই বহু কাল্পনিক আখ্যান ব্যাখ্যানের সৃষ্টি হইবে। কবির দেহান্ত ঘটিবার এক বৎসর যাইতে না যাইতেই সুবিখ্যাত সাংবাদিক মৃণালকান্তি বসু মহাশয়ের দ্বারাই সেই কার্য ঘটিবে এমন আশঙ্কা অবশ্য আমি করি নাই। কিন্তু দেখিতেছি, তিনি বড় সুন্দর একটি গল্প রচনা করিয়াছেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত "হিন্দু বিবাহ" লইয়া রবীন্দ্রনাথের বাদানুবাদের উল্লেখ করিয়া মৃণালকান্তিবাবু লিখিতেছেন:—

> "এই বিতর্কের দিন কতক পরে রবীন্দ্রনাথ একদিন পণ্ডিতবর হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সঙ্গে চন্দ্রনাথবাবুর বাড়ীতে গেলেন। চন্দ্রনাথের দুই হাত ধরে তিনি সুমধুর কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন:
>
> 'আমার মাথা নত করে
> দাও হে সখা
> তোমারই চরণ ধূলার তলে'
>
> "দুইটি হৃদয় এক হ'য়ে গেল, দ্বন্দ্বেরও সমাধান হোলো!"

কিন্তু আমাদের সন্দেহের সমাধান করে কে? যে গান রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিলেন ১৯১০ খৃষ্টাব্দে "গীতাঞ্জলি"-তে, রচনা করিলেন ১৯০৬ কি ১৯০৭-এ সে গান তিনি চন্দ্রনাথবাবুকে 'সখা' সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া (চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কবির অপেক্ষা অন্ততঃ কুড়ি বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন) কেমন করিয়া গাহিয়া উঠিলেন ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে? আচ্ছা, তাহাও যেন হইল, কিন্তু "গীতাঞ্জলি"র ঐ গানটির—সর্বপ্রথম গানটির—অমন দুর্দশা করিলেন কি করিয়া মৃণালকান্তিবাবু? তাঁহার যদি ছন্দজ্ঞান থাকিত, তবে তিনি কবির কণ্ঠে এমন পঙ্গু ছন্দ আরোপ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। কিন্তু মৃণালবাবুর কান নাই, সুতরাং সে বালাইও নাই।

মৃণালবাবুর অজ্ঞতার শেষ এখানেই নহে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়-সম্পাদিত "সবুজ পত্র" পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্প লইয়া যে আলোচনা সে সময়ে ঘটিয়াছিল তাহার কথা বলিতে গিয়া তিনি লিখিতেছেন:—

> "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় এই গল্পটিকে ব্যঙ্গ করে বিপিনচন্দ্র পাল 'মৃণালের পত্র' বলে একটি গল্প লিখেছিলেন।"

ঠিক খবর! মৃণালবাবু "ম্যুনিসিপ্যাল গেজেট" হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন,—সুতরাং কোন ভুল নাই। কিন্তু তাহার তথ্যটি কোথায় পাইলেন তিনি?—

> "কবি তাঁর (বিপিনবাবুর) প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন—'সবুজ পত্রের' 'বাস্তব' আর 'লোকহিত' এই দুইটি প্রবন্ধে।"

আশ্চর্য গবেষণা! মৃণালবাবু শুনিয়া বিস্মিত হইবেন কি যে, ঐ দুইটি প্রবন্ধের সহিত 'স্ত্রীর পত্র' বা 'মৃণালের পত্র' কোনটিরই কোনো সম্বন্ধই নাই? কবি কোনদিনই বিপিনবাবুর কোন সমালোচনার উত্তর দেন নাই। মৃণালবাবু যদি 'বাস্তব' বা 'লোকহিত' প্রবন্ধ দুইটি পড়িয়া দেখিবার পরিশ্রমটুকু স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে এমন অদ্ভুত ভুল তিনি করিতেন না। কিন্তু তাহা হইলে অবশ্য তাঁহার এই প্রবন্ধ—'সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ'—লেখা হইত না।

আর পুঁথি বাড়াইব না। মৃণালবাবু আমার প্রীতিভাজন বন্ধু; সংবাদপত্রক্ষেত্রে তিনি আমার অগ্রজ। তাঁহাকে আর দুঃখ দিব না। তবে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের "রবীন্দ্রনাথের গান রচনা" প্রবন্ধে যে একটি ভুল আছে তাহা সংশোধন করিয়া দিলে আশা করি তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না। "মাতৃমন্দির পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে" গানটি বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষ্যে ১৩৩২ সালে রচনা করেন নাই;—ঐটি রচিত হইয়াছিল ১৯০৫ কি ১৯০৬-এ বরোদার গাইকোয়াড় সয়াজীরাওকে যখন কলিকাতার ভারত-সংগীত-সমাজে সম্বর্ধনা করা হয় সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে। তখন গানটির প্রথম লাইন ছিল:—

> বঙ্গ-মন্দির পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল
> আজ হে
>
> *　*　*　*
>
> জয় বরোদারাজ হে!

শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নিকট রক্ষিত কবির পাণ্ডুলিপিসংগ্রহে পেন্সিলে লেখা কবির গানটি দেখিয়াছি।

শ্যামবাজার, কলিকাতা।　　ভবদীয়—
৮ই ভাদ্র, ১৩৪৯॥　　অমল হোম

১৯শে আগষ্ট

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট সৈন্যদল ক্রেট্‌স্কায়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল হইতে নূতন ঘাঁটিতে সরিয়া আসিয়াছে। জার্মান ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক পদাতিক বাহিনীর সহিত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হইবার পর সোভিয়েট সৈন্যেরা হঠিয়া আসিতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে ৮ শত জার্মান নিহত হইয়াছে।

পূর্ব ককেশাসের গ্রজনী তৈলখনির বিপদাশঙ্কা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, উক্ত তৈলখনির ১৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকবর্তী পিয়াটিগোরস্ক্ এলাকায় রুশিয়ান সৈন্যদিগকে হঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জার্মানরা রণক্ষেত্রে দলে দলে রিজার্ভ সৈন্য আমদানী করিতেছে।

অদ্য সম্মিলিত বাহিনীর হেড্ কোয়ার্টার হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মঙ্গলবার শেষ রাত্রিতে অধিকৃত ফ্রান্সের দিয়েপ এলাকায় সম্মিলিত বাহিনী হানা দেয়। উক্ত এলাকায় ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কোন কোন স্থানে আক্রমণকারী সৈন্যদলকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হয়। আক্রমণে যে সব সৈন্য যোগ দিয়াছে, তন্মধ্যে প্রধানত কানাডিয়ান, ব্রিটিশ স্পেশ্যাল সার্ভিস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেঞ্জার ব্যাটালিয়ানের একটি দল ও একদল ফরাসী সৈন্যও আছে। ব্রিটিশ নৌবহরের রক্ষণায় এই সম্মিলিত বাহিনী দিয়েপের উপকূলে অবতরণ করে।

চীন রণাঙ্গন—চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, চীনা বাহিনী ওয়েন্‌চাও পুনরধিকার করিয়াছে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম চেকিয়াং-এর উইং জাপ বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, মিশর হইতে মস্কো যাত্রার সময় মিঃ চার্চিল পশ্চিম মরুভূমি পরিদর্শন করেন।

২০শে আগষ্ট

রুশ রণাঙ্গন—ককেশাসে সোভিয়েট সৈন্যেরা ক্রাস্‌নোডার পরিত্যাগ করিয়াছে। ক্রাস্‌নোডার একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংসন। উহা কবান নদীর তীরে অবস্থিত। ক্রাস্‌নোডার হইতে সোভিয়েট বাহিনী সরিয়া আসায় কৃষ্ণসাগরীয় গুরুত্বপূর্ণ সোভিয়েট নৌ-ঘাঁটি নভোরোসিস্কের নূতনভাবে বিপদাশঙ্কা দেখা দেয়। প্রায় সম্পূর্ণরূপে শত্রু-সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত এবং ককেশাসের মূল বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েট সৈন্যেরা সংখ্যাগুরু শত্রু-সৈন্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রায় দুই সপ্তাহকাল যাবৎ ক্রাস্‌নোডার রক্ষা করে।

মিত্রপক্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরস্থ হেড্ কোয়ার্টার হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সলোমন দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে নৌযুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার "ক্যানবেরা" নামক ক্রুজার জলমগ্ন হইয়াছে।

২১শে আগষ্ট

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, জার্মানরা ক্রেট্‌স্কায়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়া ডন নদী অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু রুশ বাহিনীর প্রবল পাল্টা আক্রমণে জার্মান সৈন্যদের অধিকাংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। শত শত জার্মান সৈন্যকে ডনের প্রবল স্রোতে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, সম্মিলিত বাহিনী অধিকৃত ফ্রান্সের দিয়েপে যে আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছে, তাহার ফলে উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে। শত্রুপক্ষের ৭১খানি বিমান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে। সম্ভবত আরও এক শত শত্রু-বিমান ধ্বংস, না হয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সম্মিলিত বাহিনীর ৯৫খানি বিমান খোয়া গিয়াছে। দিয়েপের যুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য সন্ধ্যায় প্রায় পাঁচ শত জঙ্গী বিমান চারিভাগে বিভক্ত হইয়া উত্তর ফ্রান্সে আক্রমণ চালায়।

একখানা মার্কিন পত্রিকা বুধবারের কমাণ্ডো আক্রমণকে ইউরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির রিহার্সালরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

২২শে আগষ্ট

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, ক্রাস্‌নোডারের দক্ষিণ এলাকায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর সোভিয়েট বাহিনী একটি নূতন ঘাঁটিতে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে।

সলোমন দ্বীপপুঞ্জের যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌ-বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত বৃহস্পতিবার (২০শে আগষ্ট) সাত শত জাপানী পুনরধিকৃত এলাকায় অবতরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। ৬৭০ জন জাপানী নিহত ও বাকী ৩০ জন বন্দী হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌ-বাহিনীর ২৮ জন নিহত ও ৭২ জন আহত হইয়াছে।

২৩শে আগষ্ট

ব্রেজিল জার্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। সম্প্রতি এক্সিসপক্ষীয় সাবমেরিনের আক্রমণে ব্রেজিলের পাঁচখানি জাহাজ জলমগ্ন হয়।

রুশ রণাঙ্গন—স্ট্যালিনগ্রাদের সম্মুখভাগের সংগ্রাম এরূপ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে যে, গত কয়েক মাসের দুর্ধর্ষ সংগ্রামকে উহা ছাড়াইয়া গিয়াছে। নদীর পশ্চিম তীরে সোভিয়েট বাহিনী ডন বাঁকের সমগ্র অঞ্চলব্যাপী রণাঙ্গনে দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ চালাইতেছে। জার্মানরা ডন নদী অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে। ককেশাস রণাঙ্গনে জার্মানরা ক্রিম্‌স্কায়া ও কুরচানস্কায়া শহর দখল করিয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছে। ক্রিম্‌স্কায়া শহরটি নভোরসিস্ক হইতে রেল লাইনের বরাবর ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত।

২৪শে আগষ্ট

লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইরাণ ও ইরাককে এক সেনাপতিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া জেনারেল হেন্‌রী মেটল্যাণ্ড উইলসন্‌কে উহার সর্বোচ্চ সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

রুশ রণাঙ্গন—ফন্ বকের পানৎসের বাহিনী স্ট্যালিনগ্রাদকে দুই দিক হইতে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে এবং একটি অঞ্চলে তাহারা শহরের ৪০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। অদ্যকার সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, জার্মানরা স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে গুরুত্বপূর্ণ কোটেল্‌নিকোভো এলাকায় কীলকের আকারে ট্যাঙ্ক বাহিনী লইয়া প্রবেশ করিয়াছে। প্রকাশ, পূর্ব ককেশাসে পিয়াটিগোরস্কের দক্ষিণ-পূর্বে রুশ সৈন্যেরা আর একটি স্থান হইতে সরিয়া গিয়াছে। 'রয়টারের' সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, স্ট্যালিনগ্রাদ পৌঁছিবার উভয় দিকস্থ পথের অবস্থাই গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরও শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে।

চীন রণাঙ্গন—চীনা সেনাবাহিনী ইংটান ও ইউসান পুনরধিকার করিয়াছে।

শ্রীপদামৃত মাধুরী (মাধুরী নাম্নী—সরল ব্যাখ্যা সম্বলিত মহাজনী পদাবলী) চতুর্থ খণ্ড। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম এ সম্পাদিত। মূল্য তিন টাকা, চারি খণ্ড একত্রে দশটাকা। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীপদামৃত মাধুরীর চতুর্থ খণ্ড পাইয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই খণ্ডে আরও মহাজনপদ দিবার ইচ্ছা ছিল।............. এবং পরিশিষ্টরূপে রূপানুরাগ, কলহান্তরিতা ও রাসের গানগুলি প্রাচীন ও অপ্রকাশিত পদ দিব মনে করিয়াছিলাম; তাহা না দিতে পারায় যে দুঃখ তাহা মনেই রহিয়া গেল। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় জগতে আবার শান্তি স্থাপিত হইলে, পরিশিষ্টরূপে যদি আর একটি খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হয় তাহা হইলে আমার চেষ্টার অভাব হইবে না।" মহাজন পদাবলী বাঙলা দেশের এবং বাঙালী জাতির অমূল্য সম্পদ। পদামৃত মাধুরীর চারিখণ্ডে প্রায় আড়াই হাজার পদ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু আরও অনেক পদ এখনও অপ্রকাশিতভাবে লোকচক্ষুর অগোচরে রহিয়াছে; পরম ভক্ত এবং প্রবীণ সাহিত্যিক খগেন্দ্রবাবুর চেষ্টায় সেগুলি পুনঃ প্রকাশিত হইয়া বাঙলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিবে, আমরা এই আশায় রহিলাম।

বৈষ্ণব মহাজনগণের পদ ইতঃপূর্বে কয়েকজন সংকলয়িতা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু পদামৃত মাধুরীর বিশিষ্টতা এই যে, এ গ্রন্থের সংকলয়িতাদ্বয় নিজেরা ভক্ত, ভাবুক, কবি এবং বিশেষভাবে কীর্তন-রস-রসিক। পদামৃত মাধুরীতে রসের অভিব্যক্তি এবং ধারাক্রমে পদগুলি সাজানো হইয়াছে। বৈষ্ণব সাধকদের মতে বৃন্দাবন লীলা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা একই। মহাপ্রভুর লীলা বৃন্দাবন-লীলারই বিবর্ত-বিকাশ। পদামৃত মাধুরীতে রস-বিস্তার সূত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার মূর্তীভূত এই ব্রজমাধুরীর ভাববৈচিত্র্যের দিকটা আস্বাদন করা সকলের পক্ষে সহজ হইবে। আলোচ্য সংস্করণের আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পদগুলি অবিকৃত আছে; অনেক সংস্করণেই ঐ দিকে ততটা লক্ষ্য করা হয় নাই। যাঁহারা রসিক এবং রসবেত্তা, পদ-রচয়িতার মূল ভাষাটি অবিকৃত রাখিবার গুরুত্ব তাঁহারা উপলব্ধি করিবেন। ভাষা পরিবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পদের ছন্দ-মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায় এবং পদকর্তার অনুধ্যেয় রসতত্ত্বই বিকৃত হইয়া পড়িবার আশঙ্কার কারণ ঘটে। মহাজন পদাবলীর কয়েকটি সংস্করণে আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছি এবং সেজন্য আমাদের যে দুঃখ না হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারি না; কারণ শব্দার্থের সংযোজনা যে স্বতঃস্ফূর্ত রস-সূত্র হইতে ঘটে—'শব্দ অর্থ দুই শক্তি' যেখানে 'নানা রস করে ব্যক্ত' একমাত্র দ্রষ্টা এবং স্রষ্টারই তাহা নিজস্ব; সাধারণের পক্ষে শ্রৌত পাণ্ডিত্যের জোরেও সেখানে পৌঁছা সম্ভব হইতে পারে না; সুতরাং সংশোধনের নামে এমন ক্ষেত্রে লঘুতা মারাত্মক হইয়া পড়ে। শ্রীপদামৃত মাধুরীর সংকলনে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং আধুনিক অপ্রচলিত শব্দসমূহ বুঝিবার জন্য ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এ ব্যাখ্যারও বিশিষ্টতা আছে; পদামৃত মাধুরীর 'মাধুরী' ব্যাখ্যা কোথাও মূলকে অতিক্রান্ত করে নাই, আচ্ছাদন করে নাই। সেই ব্যাখ্যা সম্যক অথচ সুসংযত এবং ভাবানুগ। খগেন্দ্রবাবু প্রথিত যশা পণ্ডিত ব্যক্তি; কিন্তু ইহা শুধু ব্যাখ্যা-কারের পাণ্ডিত্যেরই পরিচায়ক নহে, তাঁহার রসোপলব্ধিরও পরিচয় ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে এবং বিশিষ্ট সাধনসূত্রেই সে রসোপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে। খগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, 'শ্রীরাধা-কৃষ্ণের চিন্ময়ী লীলার কণিকামাত্র আস্বাদন করিবার সম্ভাবনা আমার ন্যায় ভজনবিহীন ব্যক্তির পক্ষে স্বপ্নেরও অগোচর; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি যে এ রসের কতখানি রসজ্ঞ, পদামৃত মাধুরীতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা বলিব তাঁহার সাধনা সার্থক হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় পদকর্তাদের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ পরিচয় পাঠকদিগকে পদগুলির ভাষার ভাবধারা অনুসরণে সাহায্য করিবে। পদামৃত মাধুরী বাঙলা ভাষার একটি অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সুন্দর।

চিত্রভানু—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। প্রাপ্তিস্থান—কবিতা ভবন, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। শ্রীসুধীরচন্দ্র কর, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্তিত)। শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত প্রচ্ছদপট। মূল্য চার আনা।

কবিতার বই। কয়েকটি কবিতা আছে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-মাধুর্য অবলম্বন করিয়াই কবিতাগুলি রচিত। লেখক রবীন্দ্রনাথের বাণীর ভিতর দিয়া তাঁহার কবিমূর্তি—অমৃতমূর্তি উপলব্ধি করিয়াছেন এবং পাঠক-পাঠিকাদিগকে কাব্যছন্দে কবির সেই অমৃতময় রূপটি দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরাগী বাঙলায় 'চিত্রভানু'র সমাদর হইবে। এ লেখায় প্রকৃত কবিত্বরস আছে।

ডিমিট্রভের ইউনাইটেড ফ্রন্ট—গিরীন চক্রবর্তী। মূল্য চার আনা। প্রকাশক—নিশানাথ সরকার, কলিগ্রাম লাইব্রেরী, ২০, স্কট লেন, কলিকাতা।

সুবিখ্যাত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডিমিট্রভের 'ইউনাইটেড ফ্রন্টের' এই বংগানুবাদখানা পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। কমিউনিস্ট পার্টি বর্তমানে সরকারের নিষেধ-বিধি হইতে মুক্ত—এ সময়ে এই পুস্তকখানা প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার দেশে প্রগতিশীল মনোভাব প্রচারে সাহায্য করিয়াছেন। 'বৈপ্লবিক মতবাদ শুধু মাত্র কতকগুলি শুষ্ক বুলি নয়', 'কতকগুলো ভুয়ো ফরমুলা দিয়ে লোকের মস্তিষ্ক যেন ভারাক্রান্ত করা না হয়'—, যাঁহারা বৈপ্লবিক মতবাদের পথে প্রকৃত কর্মী তাঁহারা ডিমিট্রভের এ সব কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন এবং বুঝিবেন যে, গোড়ায় জাতীয়তার উপর জোর না দিলে আন্তর্জাতীয়তার নীতি জন সাধারণের চিত্তের যোগসূত্রে শক্তি হয় না। ডিমিট্রভ সেই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "কমিউনিস্টদের উচিত জাতির অতীত বিপ্লব ও গৌরবের সংগে জন-আন্দোলনের সংযোগ সাধন করা। শুধু সংকীর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নিয়ে মেতে থাকলেই চলবে না। যদিও কমিউনিস্টরা সব সময় বুর্জোয়া-ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদকে চাপা দেবার চেষ্টা করেন তবু জাতির অতীত গৌরবকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে না। আন্তর্জাতিকতায় সবাইকে শিক্ষিত করা যেমন তাদের কর্তব্য, তেমনই বর্তমানের সংগে সম্বন্ধ রেখে জাতীয়তাবাদকে গড়ে তোলাও তাদের কর্তব্য।" এই প্রসংগে ডিমিট্রভ লেনিনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। লেনিনের সে উক্তি এই—"আমরা কি জাতির অতীত পৌরুষের গৌরব-বোধে বিমুখ? কখনই নয়। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে নিশ্চয়ই আমরা প্রাণ দিয়া ভালবাসি।" আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। বর্তমান জগতের কথা, দেশের কথা এবং জাতির অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তার ক্ষেত্রে ইহাতে গভীরতার সৃষ্টি হইবে।

প্রকৃতির পরিকল্পনা—শচীন্দ্রমোহন মিত্র। মূল্য দশ আনা। ইস্ট বেঙ্গল প্রেস, ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

পুস্তকখানাতে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পদার্থের গঠন, আলোকের কথা, সৌরজগতের কথা, নক্ষত্রের কথা, বিশ্ব কি ক্রম-বর্ধমান, পৃথিবীর কথা, নভঃরশ্মির কথা, তেজস্ক্রিয় ধাতুর কথা—পুস্তকখানাতে এই কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। আলোচ্য বিষয়গুলি কঠিন; কিন্তু এমন সব শুষ্ক বিষয়ও সরস করিয়া বলিবার সুন্দর ক্ষমতা লেখকের আছে। পুস্তকখানা পড়িলে অনেকেই লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই। ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ১৯শে ভাদ্র, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 5th September, 1942. [৪৩শ সংখ্যা

সংবাদপত্রসমূহের পুনঃ প্রকাশ

মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নিখিল ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার কংগ্রেস কমিটিগুলিকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপে দেশের নানা স্থানে নানা আকারে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সরকার তখন দমননীতি লইয়া অবতীর্ণ হন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রসমূহের উপর একান্ত অবমাননাকর কঠোর বিধিসমূহ প্রবর্তিত করা হয়। বলা বাহুল্য, ইহার পূর্বেই সংবাদপত্রগুলির উপর বহুসংখ্যক কঠোরবিধি আরোপ করা হইয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ আরম্ভ করা হইয়াছে। স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র পরিচালনার মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া এ দেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহকে অনেক নির্যাতন এবং লাঞ্ছনা বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। এই প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়াও জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ তাঁহাদের দেশসেবা ব্রত পরিপালন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু নূতন যে সব কঠোর বিধিবিধান প্রবর্তন করা হয়, তাহাতে কোন-ক্রমেই এই ব্রত পরিপালন করিবার সম্ভাবনা বা সুযোগ সংবাদপত্রসমূহের পক্ষে আর থাকে না। এরূপ অবস্থায় মর্যাদাবুদ্ধিসম্পন্ন সাংবাদিকদের পক্ষে সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ করা ব্যতীত উপায়ান্তর রহিল না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকখানি সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ হইল ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ হইল বাঙলা দেশে। সরকারী নীতির প্রতিবাদস্বরূপে বাঙলা দেশে ১৫খানা সংবাদপত্রের প্রকাশ একযোগে বন্ধ হইল। গত ১২ই ভাদ্র, শনিবার বাঙলা দেশের এই ১৫খানা সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং পরিচালকগণ একটি বৈঠকে সমবেত হইয়া পত্রিকাগুলি পুনঃ প্রকাশ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এ স্থলে প্রশ্ন উঠিবে এই যে, এত দিন সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ রাখিবার পর ইঁহারা সেগুলি পুনরায় প্রকাশ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন কেন? তবে কি ইঁহাদের যে সব অভাব অভিযোগের কারণ ছিল, সেগুলি দূর করা হইয়াছে এবং সাংবাদিকের স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা লইয়া অতঃপর এই অধীন দেশে তাঁহাদের পক্ষে সংবাদপত্র পরিচালনা করা সম্ভব হইবে? এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বাঙলা দেশে এই সব জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিলেও সমগ্র ভারতের সাংবাদিক-দের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ ছিল এবং তাঁহারা যে সব নীতির প্রতিবাদে সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ করিয়াছিলেন, ভারত সরকারের সহিতই মুখ্যভাবে সেগুলির সংস্রব রহিয়াছে। বাঙলার সাংবাদিকগণ যে দিন বৈঠকে সমবেত হইয়া সংবাদ-পত্র পুনঃ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেই দিনই নয়াদিল্লী হইতে নিখিল ভারতীয় সম্পাদক সম্মেলনের পরিগৃহীত সিদ্ধান্ত তাঁহাদের নিকট পেঁাছে। নিখিল ভারতীয় সম্পাদক সম্মেলনের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে জানান হয় যে, পাঁচ দিন ধরিয়া অবিরত আলোচনা চালাইবার পর তাঁহারা একটি সিদ্ধান্তে পেঁাছিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত সরকার নূতন বিধিবিধানগুলি প্রত্যাহার করিতে সম্মত হইয়াছেন। অতঃপর কতকগুলি সংবাদ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য একপক্ষে ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার —অন্য পক্ষে সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ মতে কাজ করিবার একটা ব্যবস্থা হইবে এবং ইঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংবাদসমূহের প্রকাশ নিয়ন্ত্রিত হইবে। এই ব্যবস্থার পরিণতি কি দাঁড়াইবে আমরা এখনও বলিতে পারি না এবং এ ব্যাপারে অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের মনে আদৌ আশার সঞ্চার করে না। তথাপি অতীতের কথা এক্ষেত্রে না তুলিয়া আমরা ভবিষ্যতের অপেক্ষায় থাকিলাম। এই তো গেল ভারত সরকারের দিক হইতে ব্যবস্থা। ইহার পর প্রাদেশিক সরকার অর্থাৎ বাঙলা সরকারের কথা। কোন কোন ক্ষেত্রে সংবাদ নিয়ন্ত্রণে বাঙলা সরকারের নীতির কঠোরতা ভারত সরকারকেও ছাড়াইয়া যাইতেছিল এবং সমগ্র ভারতে প্রবর্তিত ব্যবস্থার সঙ্গে বাঙলা দেশের অবস্থা বেখাপ্পা হইয়া উঠিতেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপে কংগ্রেসের আন্দোলন সম্পর্কে সরকার কর্তৃক যাঁহারা গ্রেপ্তার হইতেছেন, তাঁহাদের নাম প্রকাশ সম্পর্কে নিষেধ-বিধির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙলা দেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের প্রকাশ বন্ধ হইবার পর এই সব সমস্যার আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে বাঙলা দেশের

প্রধান মন্ত্রী পর পর সাংবাদিকগণের দুইটি সম্মেলন আহ্বান করেন। শেষ দিনের বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী সাংবাদিকগণকে এই আশ্বাস প্রদান করেন যে, অতঃপর যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইবে, তাঁহাদের নাম প্রকাশে বাঙলা সরকারের আপত্তি থাকিবে না। নাম প্রকাশ সম্পর্কিত এই যে নিষেধাবিধি—ইহার মূলে কোন সঙ্গতি ছিল না, যুক্তি ছিল না—একথা সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু ইহাই একমাত্র অভিযোগ নয়। অভিযোগের কারণ আরও রহিয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী সেগুলির সম্বন্ধে এই কথা দেন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন এবং প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিবেন। বাঙলা সরকার এবং ভারত সরকারের এই আশ্বাস এবং প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই সাংবাদিকগণ সংবাদপত্র পুনরায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ এখন সরকারের শুভবুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। সরকার যদি সাংবাদিকদের মর্যাদা স্বীকার এবং দেশের প্রতি কর্তব্য প্রতিপালনে তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধি পরিচালনার স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া না লন, তবে সাংবাদিকগণও তাঁহাদের পথ—সে পথ যতই বিঘ্নসঙ্কুল হউক না কেন, তাহা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

সমস্যার গোড়া

দেশ এবং জাতির বহু মতের অনুবর্তন করাই সংবাদপত্রসমূহের প্রধান কর্তব্য। রাষ্ট্র এই পথ অনুবর্তন না করিয়া বরং চলিতে পারে; অন্তত কিছুদিন নিজেদের কাজ চালাইয়া যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয়। কারণ, রাষ্ট্রের পিছনে কামান বন্দুকের জোর থাকে। কিন্তু সংবাদপত্রের সে শক্তি নাই, সংবাদপত্রের শক্তি জনসাধারণের সহযোগিতার শক্তি — এ শক্তি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। এরূপ ক্ষেত্রে জনমতের সঙ্গে রাষ্ট্র-নায়কদের যেখানে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেখানে সংবাদপত্র-সমূহের পক্ষে কর্তব্য অত্যন্ত কঠোর হইয়া পড়ে। ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের বর্তমান সমস্যার মূল কারণ রহিয়াছে এইখানে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারত শাসনে বর্তমানে যে নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের মুখপত্রস্বরূপে ভারতসচিব কিংবা স্যার স্ট্যাফোর্ড যে কৌশলে যেমনভাবেই ওকালতি করুন না কেন, সে নীতি ভারতের জনমতের সমর্থন লাভ করে নাই এবং তাহার ফলে উত্তরোত্তর বিক্ষোভেরই সৃষ্টি হইতেছে; কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এ সত্যকে স্বীকার করিতেছেন না। তাঁহারা সেই ভ্রান্ত নীতিরই অনুসরণ করিয়া জিদ্ ধরিয়া চলিয়াছেন। ফল তাঁহাদের পক্ষেও যে ভাল হইতেছে না, ইহা তাঁহারা বুঝিতেছেন না। দমননীতির প্রয়োগে বিক্ষোভের বাহিরের দিকটাই তাঁহারা বন্ধ করিতে পারেন, কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নীতির প্রতি জনসাধারণের মনের বিরূপ ভাব তাহাতে দূর হয় না; অথচ ভারতে মিত্রশক্তির সমরোদ্যমকে সর্বাংশে সার্থক করিতে হইলে আন্তরিক এই সহানুভূতি এবং সহযোগিতারই একান্ত প্রয়োজন। সে সহযোগিতা করিবার জন্যই সমগ্র ভারত উন্মুখ হইয়াছিল; এবং কংগ্রেসের প্রস্তাবের ভিতর দিয়া সেই আগ্রহেরই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল; কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভুল বুঝিলেন। তাঁহারা অন্যপথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা যদি উদার চিত্ততার সহিত ভারতের দাবীকে স্বীকার করিতেন তবে বর্তমানের এই সমস্যা আদৌ দেখা দিত না এবং সংবাদপত্রসমূহের পক্ষেও এতটা সঙ্কটের সৃষ্টি হইত না। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এখনও যদি তাঁহাদের নীতির ভ্রান্তি উপলব্ধি করেন এবং ভারতবাসীদের আন্তরিক সহযোগিতা লাভের বাস্তব পথে মিত্রশক্তির সমরোদ্যমকে সার্থক করিবার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন, তবেই ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের বর্তমান সমস্যার সম্যক্ সমাধান হইতে পারে, নহিলে সম্মুখে তাঁহাদের পথ সম্পূর্ণ বিঘ্নসঙ্কুল এবং সর্বাধিক অন্ধকারেই সমাচ্ছন্ন।

নেতাদের সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা

মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নিখিল ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিবার পর ভারত সরকার তাঁহাদের সম্বন্ধে সংবাদ গোপনের নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন; বলা বাহুল্য এই ধরণের সংবাদ গোপনের নীতির ফল কোন দিনই ভাল হয় না। এ ক্ষেত্রেও নেতাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে নানারকম উৎকণ্ঠা জনসাধারণের চিত্ত চঞ্চল করিয়া তোলে। নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলন, এই বিষয়ের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহারা নেতাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে মাঝে মাঝে বুলেটিন অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রকাশ করিবার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন। তদনুসারে বোম্বাই সরকার সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সম্বন্ধে একটি ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। এই ইস্তাহারে জানা যাইতেছে যে,-ইঁহারা বোম্বাই সরকারের এলাকার মধ্যে আছেন এবং ভাল আছেন। তাঁহাদের সুখ সুবিধার জন্য যাহা প্রয়োজন তাঁহাদিগকে সবকিছুই দেওয়া হয়। দেশের লোক সরকারের এই ব্যবস্থায় কিছু আশ্বস্ত হইবে; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, নেতারা কোথায় আছেন তাহা জানাইতে এবং তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তাঁহাদিগকে মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ করিতে দিতেই বা সরকারের আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? মহাত্মা গান্ধীর কথা ছাড়িয়াই দিলাম; তিনি গোপন নীতির চিরকালই ঘোর বিরোধী। তিনি যাহা করেন, যাঁহারা তাঁহার প্রতিপক্ষ তাঁহাদিগকে সব খোলাখুলিভাবে জানাইয়াই করেন। ইহাই তাঁহার নীতি। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যগণও সকলে ভারতের শীর্ষস্থানীয় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহারা গোপন নীতির সমর্থন করিবেন, সরকারের এমন সন্দেহ করা উচিত নয় এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে সকল রকম গোপন নীতি সরকারের পরিহার করা কর্তব্য। কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির পুনরালোচনা আরম্ভ করিবার মত শুভবুদ্ধি বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কতদিনে হইবে আমরা জানি না। জানি না কতদিনে তাঁহারা ইঁহাদিগকে মুক্তিদান করিবার ঔচিত্য উপলব্ধি করিবেন। আমাদের মতে ভারতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার পক্ষে তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত পথ; কিন্তু যতদিন পর্যন্ত বৃটিশ গভর্নমেণ্ট সে পথ অবলম্বন না করেন

ভারত সরকার ততদিন পর্যন্ত নেতাদের সম্পর্কে গোপন নীতি পরিহার করুন; তেমন কাজ শান্তিরই সহায়ক হইবে, সন্দেহ নাই।

ভারত সম্বন্ধে বার্নার্ড-শ

গত ২৫শে আগস্ট ইন্ডিয়া লীগের উদ্যোগে ভারতবর্ষের সম্পর্কে গভর্নমেন্টের বর্তমান নীতির অবলম্বনের জন্য লন্ডনে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। প্রসিদ্ধ মনীষী বার্নার্ড-শ এই সভায় একটি বাণী প্রেরণ করেন। তিনি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া বলেন, "তিনি যে প্রস্তাব লইয়া ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন, ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী মন্ত্রীদের সকলের সম্মতির দ্বারা তাহা সমর্থিত ছিল। মিশরের ফেরোয়া মুসাকে যে অধিকার দিতে চাহিয়াছিলেন, ঐ প্রস্তাবেও ভারতবাসীদিগকে তদপেক্ষা বেশী কিছু দিবার প্রস্তাব করা হয় নাই। কিন্তু এ সবই কাটিয়া যাইবে, আয়র্লণ্ডে যেমন গিয়াছে, তেমনই যাইবে। সব ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থায় পরিণামে যাহা ঘটে ভারতেও তাহাই ঘটিবে। আপোষ-আলোচনার এই ব্যাপার গোড়া হইতে ভালভাবে চালাইলে ভারতবাসীরা যে পরিমাণ স্বাধীনতা পাইলে সন্তুষ্ট হইত, তাহার অপেক্ষা তাহারা বেশী স্বাধীনতা লাভ করিবে।" মিঃ বার্নার্ড-শএর এই উক্তির তাৎপর্য বৃটিশ রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন কি? তাঁহার উক্তি নিশ্চয়ই চার্চিল সাহেব এবং তাঁহার সহকর্মীদের পক্ষে প্রিয় হইবে না। মহাভারতে বিদুরের একটি উক্তি আছে। উক্তিটি রাজনীতিরই সম্বন্ধে। বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁহার ভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—'অপ্রিয়ং চাপি পথ্যং চ বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।' যে কথা অপ্রিয় অথচ উপকারী তাহার সম্বন্ধে বক্তা এবং শ্রোতা দুই-ই দুর্লভ। ভারতের জননায়কগণ বন্ধুস্বরূপে বৃটিশ গভর্নমেন্টকে যে অপ্রিয় সত্যকথা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন। মিঃ শয়ের উক্তিও বন্ধুস্বরূপেই উক্তি। নিজেদের স্বদেশের এই বিশিষ্ট চিন্তানায়কের উক্তির অন্তর্নিহিত সত্য যদি বৃটিশ গভর্নমেন্টের ভ্রান্তি নিরসন করিতে কিছু সাহায্য করে, তবে আমরা সুখী হইব।

আসামের মন্ত্রিসভা

অবশেষে স্যার মহম্মদ সাদুল্লার নেতৃত্বে আসামে নূতন মন্ত্রিমন্ডল গঠিত হইয়াছে। গত আট মাস ধরিয়া পর পর আসামের দুইজন গভর্নর এই শুভদিনকে নিকটবর্তী করিবার জন্যই সকল রকমে চেষ্টা করিয়াছিলেন; সুতরাং আসামের এই নূতন মন্ত্রিসভা গঠনে গভর্নর স্যার এন্ডরু ক্লো যে উল্লসিত হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। আসামের প্রধান মন্ত্রীস্বরূপে বারংবার আসাম ব্যবস্থা পরিষদের বহুসংখ্যক সদস্যগণের দ্বারা নিন্দিত এবং ধিক্কৃত স্যার মহম্মদ সাদুল্লার পক্ষে এতদিন পরে খুব সুযোগ মিলিয়াছে। সরকারের দমন নীতির কৃপায় আসাম ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেস সদস্যগণ অনেকেই কারারুদ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার নীতি জনসাধারণ কর্তৃক যতই নিন্দিত হউক না কেন, সে ক্ষেত্রে স্বাধীনচেতা স্বদেশ সেবকগণের প্রতিপক্ষতার আশঙ্কা এখন আর তেমন নাই এবং যদি তেমন আশঙ্কার কারণ ঘটে, ভারতরক্ষা বিধানের অস্ত্র হাতেই আছে। সে ক্ষেত্রে উড়িষ্যার মন্ত্রিমন্ডলের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আসামের নবগঠিত মন্ত্রিমন্ডলও বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবেন। ব্যবস্থা-পরিষদের কয়েকজন সদস্যকে আটক করিলেই তাঁহাদের বিপদ এড়ান সম্ভব হইবে। সুতরাং স্যার মহম্মদের পক্ষে এবার সুবিধা আছে ইহা স্বীকার করি, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এইভাবে কয়েকজন পরানুগ্রহ-প্রত্যাশীকে নিজের পক্ষে বাগাইয়া স্যার মহম্মদ সাদুল্লা কতদিন নিজের মন্ত্রিমন্ডল বজায় রাখিতে পারিবেন, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হইতেছে। দেশের লোক নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে এখন সচেতন হইয়াছে। স্যার মহম্মদ দেশবাসীর স্বার্থকে পদদলিত করিয়া বিদেশীদের স্বার্থ পুষ্ট করিবার নীতি লইয়া যদি পুনরায় আসরে অবতীর্ণ হন, তবে পূর্বের উপচারেই তাঁহাকে আরও এক দফা পুরস্কৃত হইতে হইবে।

একমাত্র কর্তব্য

নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হইয়া গেল। এই অধিবেশনের গুরুত্ব এই দিক হইতে যে, ভারতের বর্তমান সমস্যা সমাধানের পক্ষে যে পথ একমাত্র পথ, মহাসভা তাহা অভ্রান্ত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদের পরিগৃহীত প্রস্তাবে বলিয়াছেন—"বর্তমানের সমরোদ্যমে ভারতবর্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা লাভ করিবার একমাত্র পথ হইল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া এবং জাতীয় গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার দাবী প্রতিপালন করা। ইংলন্ড এবং ইংলন্ডের অন্যান্য মিত্রশক্তির স্বার্থ সম্যকরূপে রক্ষা করিতে হইলে ভারতবাসীদিগকে রাজনীতিক পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা কর্তব্য, তবেই ইংলন্ডের কোন শত্রু-শক্তির পক্ষে ভারতের অধিবাসীদিগকে প্রলুব্ধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।" প্রকৃতপক্ষে হিন্দু মহাসভার পরিগৃহীত এই যে প্রস্তাব, এই প্রস্তাবের তাৎপর্যের সঙ্গে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের কোন পার্থক্য নাই। মহাসভা এই সঙ্গে তাঁহাদের পরিগৃহীত প্রস্তাবে আরও একটি কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলিয়াছেন, ভারতের বর্তমান এই সঙ্কটকালে জাতীয়তার সূত্রে অখন্ড ভারতের সংহতি যাহাতে শিথিল হয়, এমন দাবী কোন দলকেই উত্থাপন করিতে দেওয়া কিংবা জাতীয় গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার পরিপন্থিতা করিতে দেওয়া কর্তব্য হইবে না। এই প্রসঙ্গে মোশেলম লীগের দাবীর কথা আসিয়া পড়ে। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গ্রেপ্তার হইবার পূর্বে একথা স্পষ্টভাষাতেই বলিয়াছিলেন যে, বৃটিশ গভর্নমেন্ট যদি ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন, তবে সাময়িক গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার ভার যদি মোশেলম লীগের উপরও দেওয়া হয়, তাহাতেও কংগ্রেসের কোন আপত্তির কারণ থাকিবে না; কিন্তু মোশেলম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বাই

অধিবেশনে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের এই উদার আদর্শকে নিতান্ত নির্লজ্জভাবে উপেক্ষা করা হইয়াছে। লীগওয়ালারা এই দাবী করিয়াছেন যে, লীগের উদ্যোগে গঠিত সাময়িক গভর্নমেন্টে যে সব রাজনীতিক দল যোগদান করিবেন, তাঁহাদিগকে পূর্ব হইতেই এই একরারনামা লিখিয়া দিতে হইবে যে, তাঁহারা লীগের পাকিস্থানী নীতির সমর্থন করিবেন: অন্য কথায় ভারতের জাতীয় সংহতি বিচ্ছিন্ন করা এবং মধ্যযুগীয় অন্ধ সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কাইয়া রাখাই হইল লীগের মুখ্য উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের লীগ দলের সেক্রেটারী সৈয়দ মহম্মদ হোসেনেরই ভাষায় ভারতের চির পরাধীনতাই হইল মোস্লেম লীগের একমাত্র কাম্য। লীগ ভেদ-বিভেদ এবং দ্বেষ-বিদ্বেষকেই ভারতে চিরন্তন করিতে চাহেন। আধুনিক সভ্য জগতে মানুষের আদর্শ, যে আদর্শে জগতের মোস্লেম রাষ্ট্রসমূহ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, লীগের আদর্শ সম্পূর্ণ তাহার প্রতিকূলে। এরূপ অবস্থায় লীগের আদর্শের সঙ্গে ভারতের কল্যাণকামী কোন দল বা সম্প্রদায়েরই মিল হইতে পারে না। ভারতের শক্তি ঐক্যেরই শক্তি, সমরোদ্যমে ভারতের শক্তির অনুকূলতা যাঁহারা লাভ করিতে চাহেন, লীগের পৃষ্ঠপোষকতার পথে তাঁহারা নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থকে কিভাবে বিপন্ন করিতেছেন, এখনও তাহা উপলব্ধি করিবেন কি? সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিদ্বেষের অজুহাতে রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতা লাভে ভারতের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করিবার পাণ্ডিত্য ফলাইবার সময় এখন আর নাই। প্রবল শত্রু বলিতে গেলে পূর্ব এবং পশ্চিম দুই দিক হইতে ভারতের দ্বারে হানা দিয়াছে। এসময় অখণ্ড ভারতের ঐক্যের আদর্শ স্বাধীনতার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করিয়া না ধরিলে শুধু ভারতের দিক হইতেই নয়, মিত্রশক্তির স্বার্থের দিক হইতেও অবস্থা অভিভাবকোচিত আত্মগর্বের সঙ্গে দূরে দাঁড়াইয়া উপভোগ করিবার মত নিশ্চয়ই রহিবে না। নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্বন্ধে সময়োচিত সতর্কবাণী সাহসিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

আমেরিকা ও ভারত

আমেরিকার 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা মিঃ হার্বার্ট মেথুস সম্প্রতি ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। সেদিন করাচীর সাংবাদিকদের এক সভায় তিনি ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অবস্থার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। মিঃ মেথুস বলেন, ভারতবাসীদের রাজনীতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি মার্কিনদের সম্পূর্ণই সহানুভূতি আছে; কিন্তু আমেরিকার সরকারী মহলের এই ধারণা যে, ভারতের এই সব ঘরোয়া ব্যাপারের সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কার্যে হস্তক্ষেপ না করাই উচিত। ভারতবর্ষ ব্রিটেনের অধীন দেশ, সুতরাং স্বাধীন দেশ বা জাতির সঙ্গে মানবতার হিসাবেও জগতের যে সম্পর্ক রহিয়াছে, ভারতবাসীদের তাহা নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণের মতলব হইল ইহাই এবং এই মতলব বজায় রাখিবার গরজেই চার্চিল সাহেবের মুখে আটলাণ্টিক চুক্তির ব্যাখ্যায় এবং ততোধিক স্পষ্টভাবে ইঙ্গ-রুশ চুক্তির সর্তের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের মনোবৃত্তির সম্বন্ধে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মার্কিন জাতিও যদি ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকদের এ মতের সমর্থন করেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় হইবে। মার্কিন জাতি বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে না হউক, অন্তত পরোক্ষভাবে জগতের পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতাকে সমর্থন করিয়াছে, এ প্রসঙ্গে আয়র্লণ্ডের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু মানবতার সে দিকটাও বর্তমান ক্ষেত্রে একমাত্র প্রশ্ন নয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বর্তমানে মার্কিন জাতির স্বার্থের সঙ্গে ভারতের রাজনীতিক সমস্যার প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক ঘটিয়াছে। আমেরিকা আজ ফ্যাসিস্ট এবং নাৎসী শক্তি-বর্গের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত। সে সংগ্রামের সফলতাও সমগ্র ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার উপর নির্ভর করিতেছে; সুতরাং সম্মিলিত শক্তির বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে ভারতের এই সমস্যা সমাধানের জন্য মার্কিন জাতির চেষ্টা করিবার পক্ষে প্রবল যুক্তি রহিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্ট সম্প্রতি মার্কিনস্থ ব্রিটিশ দূত লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের সঙ্গে কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করেন; কিন্তু সময়ের অভাববশত তখন ভারতের সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিতে পারেন নাই। ইহাতে মনে হয়, ভারতের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা মিঃ রুজভেল্ট উপলব্ধি করেন, তবে সম্ভবত সে প্রশ্নের গুরুত্ব ততটা উপলব্ধি করেন না; কারণ এ বিষয় সম্বন্ধে তেমন গুরুত্ব যদি তিনি উপলব্ধি করিতেন, তবে সেজন্য সময় করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত। যাহা হউক, ইহা তবু মন্দের ভাল। কিন্তু যে রুশিয়ার নাম শুনিলে এদেশের কেহ কেহ ভাবাবেগে অধীর হইয়া পড়েন, সেই রুশিয়ার গভর্নমেণ্ট কিংবা সেই গভর্নমেণ্টের নায়ক স্ট্যালিন তো ভারতের সম্বন্ধে একেবারেই নীরব। পৃথিবীতে ভারতবর্ষ বলিয়া কোন একটা দেশ যে আছে এবং সে দেশের লোকের যে কিছুমাত্র রাজনীতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, সম্প্রতি কয়েক বৎসরের মধ্যে রুশিয়ার ছোট বড় কোন রাজনীতিকের মুখে আমরা তেমন বোধের পরিচয় পাই নাই। সে হিসাবে মার্কিনকে প্রশংসাই করিতে হয়; কিন্তু নিন্দা বা প্রশংসা বর্তমানে বড় কথা নয়, প্রধান কথা হইল কাজ। আমরা আশা করি, মার্কিন জাতি এবং মার্কিন গভর্নমেণ্ট সমরোদ্যমের বাস্তব সফলতার দিক হইতে ভারতের স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবেন এবং ভারতবর্ষের সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বর্তমান শোচনীয় মনোভাবের যাহাতে পরিবর্তন সাধিত হয়, সেজন্য চেষ্টা করিবেন। মার্কিন গভর্নমেণ্টের দূত হিসাবে মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকি চুংকিংয়ে আসিতেছেন; চুংকিংয়ের পথে তিনি ভারতবর্ষেও আগমন করিবেন। মিঃ উইলকি যখন ভারতে আসিতেছেন, তখন ভারতের সরকারী মহলের সঙ্গে সমর-প্রয়োজনের দিক হইতে ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার কথাবার্তা হইবে বলিয়া মনে হয়। আমরা আশা করি, ঐ সময় কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ তাঁহাকে দান করা হইবে এবং আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য এই সূত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে নূতন উদ্যমের অবতারণা করা হইবে।

মান্দ্রাজ ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ইংরেজি ১৯১৯ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসে রবীন্দ্রনাথ মান্দ্রাজ ও মৈসুর ভ্রমণে যান। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৯শে মার্চ তারিখে বিচিত্রা গৃহে একটি বক্তৃতা দেন। তাহার সার মর্ম নীচে দেওয়া হইল।] —শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"দক্ষিণ ভারতের লোকের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার শক্তি আমাদের চেয়ে বেশি আছে, সেখানকার প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের মত ক্ষণস্থায়ী হয় না। জাতীয় শিক্ষা নিয়ে আজকাল মান্দ্রাজে অনেকে ভাবচেন এবং কতকগুলি বিদ্যালয় হয়েছে। মসলিপত্তনের উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে কারপেট-বোনা প্রভৃতি শেখানো হয়। সেখানে য়ুরোপ থেকে শিক্ষিত অনেক লোক ত্যাগ স্বীকার করে কাজ করচেন। আমি সময়ের অভাবে সেখানে যেতে পারিনি। স্ত্রীশিক্ষা পুরুষদের মত হওয়া উচিত নয় এ নিয়েও খুব আলোচনা চলচে। বোম্বাইতে অধ্যাপক কারভের স্ত্রী-বিদ্যালয় কুটিরে আরম্ভ হয়েছিল। এখন ওদের লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি। ওসব জায়গায় টাকার অভাব হয় নি। বাঙলাদেশে দেখতে পাই একমাত্র সাহিত্য-পরিষদ বাড়িঘর করে শক্ত হয়ে বসতে পেরেছে আর সবই দুদিনে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের জিত আছে। সেটা দক্ষিণের বড় বড় লোকও স্বীকার করেন। বাঙলার Originality (স্বকীয়তা) ও বড় Vision (দৃষ্টি) ওখানে নেই। তাঁরা বলেন বাঙলা থেকে আমরা আইডিয়া ও inspiration (প্রেরণা) চাই।

দাক্ষিণাত্যের এই দৃঢ়নিষ্ঠতার কারণ আমার মনে হয় ওদের চরিত্রে একটি অকৃত্রিম সারল্য আছে। এটি বালকের ভাব —এটি নিন্দার বিষয় নয়। এর মধ্যে মানুষের বেড়ে ওঠবার রহস্যটি নিহিত আছে। এই অকৃত্রিম সারল্য মানুষকে যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা দান করে, কোনো কিছু গড়ে তোলবার পক্ষে তা অত্যাবশ্যক। বাঙালীর চরিত্রে বিচার বুদ্ধির (critical spirit) প্রাবল্যের জন্য এই সারল্যজনিত দৃঢ়নিষ্ঠতার অভাব ঘটেছে। তাই কাজে নাববার আগেই আমাদের নানান প্রশ্ন জাগে আর নাববার পরে পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষে মঙ্গলকর্ম দেখতে দেখতে ভেঙে যায়। অবশ্য সত্যকে উন্মুক্তভাবে দেখার জন্যে বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন খুবই আছে। একে বাদ দিলে চলবে না। কথা এই যে এই দুটির সামঞ্জস্য করা চাই। তা অসম্ভব নয়।

এই সারল্যের পরিচয় আমি মান্দ্রাজের সর্বত্রই পেয়েছি, কিন্তু বিশেষ করে পেয়েছি মৈসুরে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দলে দলে ছেলেরা আমার কাছে এসেছে, সকলেরই মুখে এক কথা "আমাদের পরামর্শ দিন—বলুন আমাদের কি করতে হবে।" মৈসুরে এই ভাবটির আধিক্যের কারণ আমার মনে হয় ওদের উপর আমাদের মত বাইরের কোনো চাপ নেই। প্রভুত্ব বলে একটা জিনিস আমাদের উপরে থাকাতে ক্রমাগত আমাদের অপরের মন জোগাতে জোগাতে রফা নিষ্পত্তি করতে করতে চলতে হয়। এই দাসত্ব থেকেই আমাদের ক্ষুদ্রতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি খোরাক পাচ্ছে। মৈসুরে এ বালাই নেই। সেখানকার মহারাজারা গত দুই তিন পুরুষ ধরে মহদাশয় লোক। তাঁরা অন্য কোনো কোনো রাজাদের মত আফিং খেয়ে ঘুমিয়ে বা পোলো খেলে, শিকার করে ইংরেজ মেয়েদের সঙ্গে নৃত্য করে, প্রজাদের কল্যাণের প্রতি উদাসীন হয়ে জীবন কাটিয়ে দেন নি। সেইজন্যে শেশাদিরি আয়ার প্রভৃতির মত বড় বড় administrator (শাসনকর্তা) সেখানে অবাধে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছেন। মৈসুরের প্রাকৃতিক অবস্থানটিও খুব অনুকূল। দক্ষিণ ভারতের একটি উচ্চ মালভূমির উপরে এটি অবস্থিত। সেখান থেকে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি চারিদিকে প্রবাহিত হয়ে গেছে। এই উচ্চতার জন্যে মৈসুর নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া লাভ করেছে। প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগাবার দিকে সেখানে বিশেষ দৃষ্টি। আমরা এখানে অনেক দিন থেকেই এ বিষয়ে আলোচনা করছি, বক্তৃতা করছি, পরস্পরকে খোঁচাখুঁচি করচি, কিন্তু কোনো পক্ষই কাজে নাবছি না। এদিকে মৈসুরে কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। কাভেরী নদী থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়ে মৈসুর শহরে নানা কাজে লাগানো হয়েছে। কথা হচ্ছে অন্যান্য নদী থেকেও শক্তি নিয়ে মৈসুরের গ্রামে গ্রামে তাকে ব্যবহার করা হবে। এতে করে মানুষের পরিশ্রম যে কি বহু পরিমাণে বেঁচে যাবে তা মনে করলে আনন্দ হয়। বৈদ্যুতিক শক্তিকে এইভাবে সমগ্র দেশের সমগ্র কাজে লাগানো আমেরিকায় প্রত্যক্ষ করে এসেছি। চন্দন কাঠ আগে জার্মানিতে গিয়ে তেল তৈরি হয়ে আসতো—এখন মৈসুরেই তেল তৈরী করার ব্যবস্থা হয়েছে। দেশের খনি ও খনিজ দ্রব্য যাতে বিদেশীর পকেট ভর্তি না করে মৈসুরের লোকদেরই কাজে আসে তারও আয়োজন চলছে। এইরূপে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারের পূর্ণ ভোগ লাভ করা কম সৌভাগ্যের কথা নয়, আমরা ত এখানে একথা কল্পনাই করতে পারি না।

এই সমস্ত কারণে মৈসুরের লোকের মনে স্বাধীন দেশের মত একটা মস্ত ভরসা আছে। সেই আশা এদের বড় জিনিসের প্রতি শ্রদ্ধা দিয়েছে, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা দিয়েছে, সারল্য দিয়েছে। তারা জানে তাদের সামনে কোনও কৃত্রিম বাধা নেই। এই আশাই তাদের motive power (চলবার শক্তি)। এর আবেগে তারা নতুন নতুন পরীক্ষার ভিতর দিয়ে চলেছে। ওদের য়ুনিভার্সিটিও সেইরূপ একটি এক্সপেরিমেণ্ট (পরীক্ষা)। ওরা যে কি চায় তা ভাল করে জানে না, কিন্তু চলেছে। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই আমাদের একটি হাঁফ ছাড়বার জায়গা হয়েছে, আশা করি যদি কোনও আকস্মিক কারণে অন্যথা না ঘটে একদিন মৈসুর ভারতবর্ষের সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রস্থান হয়ে উঠবে এবং বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারতকে ছায়া দেবে, আশ্রয় দেবে।

বাংলাদেশের একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানকার দেশভক্তি কোনও প্রাদেশিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়—সমস্ত ভারতবর্ষের

ঐক্য বোধ এখানে যেমন সহজ হয়েছে অন্যান্য প্রদেশে তা হয় নি। তাই আমি মৈসুরের মহারাজাকে বলেছি, "আপনারা যদি সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে পৃথক্ হয়ে কেবল মৈসুরকেই বড় করতে চান, তাহলে আমাদের দেশের মনীষীদের এখানে পাঠাতে আমরা কুণ্ঠা বোধ করব। যেমনতর বৃটিশ মিউজিয়ামে ভারতবর্ষের অনেক তাম্রশাসন, প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি আছে, কিন্তু তা স্বদেশী ঐতিহাসিকদের কোনও কাজে আস্‌ছে না, এরকমভাবে একান্ত ক্ষতি স্বীকার করতে আমরা রাজি নই।"

আইডিয়া এবং বড় vision (দৃষ্টি) বিষয়ে মান্দ্রাজের সঙ্গে বাংলার এই পার্থক্যের কারণ সেখানকার অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমার মনে হয় এর কারণ বাংলা পলি মাটির দেশ—এখানে পাথর নেই। কোনও রকমে ইট কাঠ দিয়ে যে মন্দির এখানে তৈরি হয় দু তিন পুরুষের মধ্যে বট অশ্বত্থ তার ভিতরে শিকড় চালিয়ে ভেঙে চুরে ফেলে। প্রকান্ড প্রকান্ড পাথরের মন্দির মান্দ্রাজকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে, এক সময়ে সৌন্দর্য বোধের স্বাভাবিক তাগিদে এগুলি নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এখন সে তাগিদ নেই—কেবল পুরাতনের পুনরাবৃত্তি চলছে। প্রাচীন এই পাথরের চিরন্তন মূর্তি ধরে দুঃস্বপ্নের মত সমস্ত দেশকে অভিভূত, সম্মোহিত করে রেখেছে। আমি ওখানে থাক্‌তেই শুনলুম একজন ধনী শেঠ একটি নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করার জন্যে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এইরূপে যে দেবতা মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের সেবা চান তাকে বঞ্চিত করে পাথর যক্ষের মত সমস্ত দেশের ধনকে আঁকড়ে আছে। শুনলুম পূর্বে দেশে যখন দুর্ভিক্ষ হত তখন রাজারা মন্দিরের ধন খরচ করে লোকরক্ষা করতেন—পরে ক্রমে ক্রমে সেই ধার শোধ করতেন। কিন্তু এখন এ প্রথা উঠে গেছে—এখন জীবনের সচলতার পরিবর্তে মৃত্যুর অচলতা এই ধনকে অধিকার করেছে।

জাতি ভেদের সুসম্পূর্ণ চেহারা যদি দেখ্‌তে হয় ত মান্দ্রাজে যেতে হয়। আমাদের এখানে বরং ও সম্বন্ধে একটু অসঙ্গতি আছে। মাদ্রাজ জাতি ভেদকে একেবারে তার logical sequenceএ (ন্যায়সঙ্গত পরিণতিতে) নিয়ে গেছে। এই প্রথার অনিষ্টকারিতাও সেখানকার লোকেরা উপলব্ধি করচেন। কারণ সমাজ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন তার দেহের টুকরোগুলো স্বতন্ত্র থাক্‌লেও তত আসে যায় না, কিন্তু সে যখন চল্‌তে চায়—রাজনীতি ক্ষেত্রেই হোক বা অন্য কোথাও হোক—তখন সেই টুকরোগুলো নড়নড় করতে থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমরাও একথাটা উপলব্ধি করেছিলুম, তাই ওখানকার একজন উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ non-Brahmin movement (অব্রাহ্মণ আন্দোলন) সম্বন্ধে আমায় বলেছিলেন, "I hate it—আমি এবে ঘৃণা করি, কারণ এর সঙ্গে রাজনীতি মিশেছে—এরা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও গভর্নমেন্টের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন—but still I welcome it—কিন্তু তবু আমি এর অভ্যুদয়ে আনন্দিত।"

আমি ওখানে থাক্‌তে একটা অদ্ভুত নালিশ হয়েছিলে একজন নীচ জাতীয় ডাক্তার একটা পুকুরের পঞ্চাশ হাত দূরের রাস্তা দিয়ে একজন ব্রাহ্মণ রোগীকে চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন। এতে সেই পুকুরের জল অশুদ্ধ হয়ে গেছে বলে সেই ডাক্তারের নামে নালিশ হয়েছে। তাতে সমাজের গণ্যমান লোকেরা সাক্ষ্য দেবার সময় কত রকম মূঢ়তার যে পরিচয় দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। যেমন একজন বলেছেন কোন নীচ জাতীয় যদি ধান বপন করে ত তার খড়ে ব্রাহ্মণের ঘরের চাল ছাওয়া হতে পারে না।

আমি ম্যডু রোডে অগ্রহার নামে এক ব্রাহ্মণ পল্লীতে ছিলুম। সেখানে আমাদের এ্যান্ড্রুজ সাহেবের নিজের সমস্ত আচার আচরণ নিয়ে থাকার কোন বাধা হয় নি, কিন্তু নীচ জাতীয় হিন্দুর সেখানে প্রবেশেরও অধিকার নেই। একদিন এ্যান্ড্রুজের পরিচিত ওখানকার একটি ভদ্রলোক এ্যান্ড্রুজের সঙ্গে আস্‌তে আস্‌তে হঠাৎ ব্রাহ্মণ পল্লীর কাছাকাছি একটা রাস্তার পিছন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল তার ওপাড়ায় ঢোকবার যো নেই। অথচ কুকুর বেড়াল পোকামাকড় সর্বদা সেখানে যাতায়াত করছে—তাতে ব্রাহ্মণ পল্লীর পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে না। শুনলুম একদিন এক সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে একজন নীচ জাতীয় লোক যাচ্ছিল, এমন সময় সেখানে এক ব্রাহ্মণ দেবতার অভ্যুদয় ঘটে। আগন্তুকের চেয়ে যতটা তফাতে থাকা উচিত তা আর কোন রকমে ঘটে ওঠে না দেখে অব্রাহ্মণটি পাশের একটি ডোবার ভিতরে লাফিয়ে পড়ল —সেখানে কাঁটায় তার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল! ভারতবর্ষের প্রথম দুটি অক্ষর (ভার) সার্থক হয়েছে—সেই ভার যে কি প্রকান্ড ভার তা মান্দ্রাজে গেলে বোঝা যায়।

ভারতবর্ষের মাঝখানে বিন্ধ্য পর্বত দেওয়ালের মত দাঁড়িয়ে উত্তর ও দক্ষিণকে ভাগ করে দিয়েছে। এই দুটি ভাগের ভাষা, আচার ব্যবহার, লোক চরিত্র প্রভৃতি সকলেরই স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু এই বৈচিত্র্যই একদিন শত দলের মত ভারত সভ্যতার শোভাবর্ধন করবে।"

চার

সেদিন ভোর বেলায় মেসের ম্যানেজার আসিয়া হাসিয়া কুশল প্রশ্ন ও গল্পগুজব করিবার পর জানাইলেন যে, চার্জের জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করিয়াছেন, আর দেরি করা সম্ভব পর নয়।

অনুপম ঢোঁক গিলিয়া কহিল, এমন সর্বনাশা কথা বলবেন না, ম্যানেজার বাবু; আর দু-চারটা দিন অপেক্ষা করতেই হবে।

'এদিকে খুব কম টাকাও তো বাকি পড়ে নেই।' ম্যানেজার বলিলেন, 'টাকা না হ'লে আমাদেরই বা ব্যবসা চলে কি করে' বলুন?'

'সে কি আর আমি বুঝিনে, নির্ঘাৎ বুঝি। তবে কি জানলেন।...কিন্তু তা যাই হোক, মামা লিখেছেন, দুশো টাকা জোগাড় করে' পাঠিয়েছেন, আজকালের মধ্যেই পেয়ে যাব। টাকার জন্য কোনও ভাবনা করবেন না; আমার কাছে থাকা যা, ব্যাঙ্কে থাকাও তাই। আর চাকরিও তো একটা শিগ্‌গীরই পেয়ে যাচ্ছি। একশোর, মধ্যে একটাও লাগবে না, এটা কি একটা কথা হলো?'

'কিন্তু যে বাজার!' ম্যানেজার উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া পারিলেন না।

'ধান দিয়ে কি লেখাপড়া শিখেছি, ম্যানেজারবাবু,' অনুপম ফোঁস করিয়া উঠিল, 'যে বাজার দেখে ভড়কে যাব? চাকরি পাওয়া একটা সাধনা বৈ তো নয়। কম সাধনা করছি যে সিদ্ধি হবে না? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

ইহার পর ম্যানেজারবাবুর নিশ্চিন্ত না হইয়া আর উপায় কি। তা ছাড়া অনুপমকে তিনি সৎ লোক বলিয়াই জানেন, একটু পছন্দও করেন।

ম্যানেজারবাবুর প্রস্থানের পর অনুপম সবেমাত্র টাইপ-রাইটারের ডালা খুলিয়া লইয়াছে, এমন সময় ভজহরি এক তাড়া চিঠি লইয়া প্রবেশ করিল। প্রথানুযায়ী অনুপম চিঠি সমর্পণের অপেক্ষা করিল না, ছোঁ মারিয়া ভজহরির হাত হইতে সেগুলি কাড়িয়া লইল। এই ছোঁ মারার দরুণ বহুদিন পাশের ঘরের চিঠি পর্যন্ত সে লুঠ করিয়া লইয়াছে, ভজহরির হাত জখম করিয়াছে, তবু এক সেকেন্ড তার বিলম্ব সহে না।

ব্যগ্র আঙুল দিয়া সে খাম ছিঁড়িতে লাগিল। কিন্তু সেই একই কথা। অনুপম একটির পর একটি পড়িতে লাগিল—'দুঃখিত;' 'কাজ খালি নাই;' বর্তমানে লোক নিতেছি না।' যদি লোকই নিতেছে না এবং কাজ খালি নাই, তবে দুঃখ জানাইবার কোন্ আবশ্যকতা ছিল; খানিকটা আশার সৃষ্টি করিয়া হতাশ করা বই তো নয়—অনুপম বিড়বিড় করিতে লাগিল। অবশিষ্ট চিঠিগুলি রাগ করিয়া খুলিল না, একপাশে ছুঁড়িয়া দিল।

জানলার ধারে উঠিয়া গিয়া ওবাড়ির জানলার দিকটায় দৃষ্টি প্রেরণ করিল। কিন্তু প্রতিভার বাবা তখনও বাড়িতে থাকায় জানালাটি বন্ধই আছে। হতাশ হইয়া অনুপম জানলা ত্যাগ করিল এবং মাটি হইতে অনাদৃত চিঠিগুলির একটি তুলিয়া লইয়া খুলিল। 'দুঃখিত।' 'দুত্তোর দুঃখিত,' রাগিয়া অনুপম কহিল, 'দুঃখিতর নিকুচি করেচে।' এবং অবশিষ্ট চিঠিগুলিকে সে স্যান্ডাল দিয়া মাড়াইয়া দিল।

দরজার আড়ালে ভৃত্য ভজহরি এতক্ষণ পর্যন্ত উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এইবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া প্রস্থান করিল। কবে যে বাবু একটা চাকরি পাবেন! ভদ্রলোকের চাকরি পাওয়া কি হাঙ্গামা, নইলে এমন সোনার চাঁদ ছেলে......

এমন সময় টাইপরাইটার কোম্পানির টাকা আদায়কারী দুই তিনজন লোক সহ হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। অনুপম প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল, পরক্ষণেই রাগিয়া কহিল, এই অনধিকার প্রবেশের মানে......অনুমতি না নিয়ে ভদ্রলোকের ঘরে ঢোকা.........

টাইপরাইটার কোম্পানির জন্য টাকা আদায় করিতে করিতে সে ঘাগী হইয়া উঠিয়াছে, এত সহজেই সে দমিবে কেন। সেও চেঁচাইয়া কহিল, সে জোগাড় কি রেখেছেন মশায়; দিনের পর দিন তাগাদায় এসে হন্যে হ'য়ে যাচ্ছি, কেবলই এড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। এই ব্যবসায় চুল পাকিয়ে ফেললুম, বুঝতে পারিনে কত ধানে কত চাল। এই যে দিনের পর দিন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, মোশায়......

'পালিয়ে বেড়াচ্ছি?' সচিৎকারে অনুপম কহিল, 'আলবৎ নয়। কিন্তু আপনার টাকার জন্যে সারা দিন রাত্তির ঘরে বসে থাকতে পারি নে। টাইপরাইটারের কিস্তি গুণে দেবার জন্যই আর কলকাতা শহরে বসে নেই। যত সব চীনে জোঁকের পাল্লায় পড়েছি'......

'আচ্ছা ভদ্রলোক যা হোক,' টাইপরাইটারের লোকটা কহিল, 'টাকা না দিয়ে আবার চোখ রাঙান হচ্ছে।'

'হবে না কেন শুনি?' অনুপমও চেঁচাইতে লাগিল,

অত্যাচারের একটা সীমা আছে তো, না নেই। যদি আছেই, তবে এ কি ব্যবহার। কিস্তি পাওনা আছে বলে কি মানুষের সুখ-সুবিধে দেখতে হবে না......হট্ করে' এক দঙ্গল লোক নিয়ে বলা নেই কওয়া নেই ঘরে ঢুকে পড়লেই হলো।'

এইরূপ ধরণের বচসা প্রায় আধ ঘণ্টা চলিবার পর টাইপ-রাইটারটা এবার আর কিছুতেই রাখা যাইবে না সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার পর অনুপম কহিল, নিয়ে যান আপনার টাইপ-রাইটার, ভারি তো এক টাইপরাইটার দেখাতে এসেছেন। শহরে যেন আর কোম্পানী নেই।

তাদের ঠেঙেই নেবেন।' বলিয়া টাইপরাইটারের লোকটাও একজনের কাঁধে কলটা তুলিয়া দিয়া কহিল, তবে আসি নমস্কার। অনুপম মুখ ফিরাইয়া রহিল, কোনও জবাব দিল না এবং লোকজন প্রস্থান করিলে আসিয়া ডেক-চেয়ারটায় এলাইয়া পড়িল এবং দীর্ঘশ্বাসের ভাষায় কহিল, এইবার অ্যাপলিকেশান বন্ধ হওয়ারও জাগাড়। ধুত্তোর!

দুপুর বেলা। অনুপম চাকরির সন্ধানে তাহার প্রাত্যহিক টহলে বাহির হইয়াছে। স্নান করিবার পূর্বে ভজহরি তাহার ঘরটা ঝাটপাট দিয়া পরিষ্কার করিতে আসিয়াছে। এমন রোজই করে। ঘরের চাবি তাহার কাছেই থাকে। অবসর মত আসিয়া সে এলোমেলো জিনিসগুলির সুবিন্যাস করে। ঘরে ছেঁড়া ফেরা কাগজের ভীড়; বিছানা বালিস অগোছাল, জুতা স্যান্ডাল চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। এক কথায় অনুপমের পারিপার্শ্বিকও তাহার বিক্ষিপ্ত মনের অনুকরণে একান্তই অগোছাল। ইহাকে যথাসাধ্য গুছাইবার ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভজহরি লইয়াছে। এতখানি তার কর্তব্য নহে; অন্য কোনও ঘরে এতটা সে করে না। অনুপমের উপর কেমন জানি মায়া পড়িয়া গেছে। এমন কি কালীতলায় দু একদিন দুচারটা পয়সা দিয়া সে মা কালীর কাছে অনুপমের চাকরি করিয়া দিবার জন্য আবেদন পর্যন্ত করিয়া আসিয়াছে।

ভজহরি ঘর ঝাড়পোঁচ করিতে লাগিল। বিছানা পাট করিল, টেবিল গুছাইয়া রাখিল, মাটিতে যে চিঠিগুলি অ-খোলা অবস্থায় পড়িয়াছিল, সেগুলি টেবিলে উঠাইয়া রাখিল; অতঃপর চতুর্দিকে একবার ভীত সন্ত্রস্তভাবে চাহিয়া লইয়া সে নিজের অনুপমের তোষকটি উঠাইয়া মাথার দিকে তাহা গুঁজিয়া রাখিল।

উমেদারি হইতে ফিরিবার পথে অনুপম প্রথামত পার্কের সুবিধাজনক বেঞ্চটিতে বসিয়া হাওয়া খাইতে লাগিল। কিন্তু ওবাড়ির জানলাটা খুলিবার কোনও সম্ভাবনাই দেখা গেল না। আধ ঘণ্টারও উপর অনুপম অপেক্ষা করিল এবং বারবার ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিতে হওয়ায় ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিল। এ অবস্থায় পার্কে যথেষ্ট হাওয়ার অভাব হওয়া বিচিত্র নয়। তাহা ছাড়া ক্ষিধেও পাইয়াছিল অনুপমের অসম্ভব। সে সম্প্রতি মেসে ফেরাই সাব্যস্ত করিল।

'ভজহরি।'

'বাবু।'

'কি খাই বল তো; রাক্ষুসের মত ক্ষিধে পেয়েছে বুঝলি। ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে হেঁটে এলেম কিনা?'

'যা বলবে, তাই এনে দেব।'

'তা তো দেবে, কিন্তু পয়সাটা কে দেবে শুনি। পকেটের অবস্থা যে একেবারে মরুভূমি।'

'এজ্ঞে, ইটি কি বলচ। তোষকের তলায় দেখুন না?'

'কি দেখলি?'

'দেখুন, দুটো দশ দশ টাকার নোট, বেশ জড়িয়ে পড়ে রয়েচেন।'

'বলিস কিরে মিথ্যুক।' বলিয়া ব্যগ্র অনুপম লাফাইয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া তোষক উঠাইল। সত্য সত্যই দুইটা দশ টাকার নোট দুমড়াইয়া আছে।

'অন্য ঘরে কাজ রয়েচে। কি আনাবেন ঠিক করে' হাঁক দেবেন।' বলিয়া ভজহরি বাহির হইয়া যাইতেছিল, অনুপম চেঁচাইয়া কহিল, চালাকি করছিস আমার সঙ্গে? ভজহরি এ তোর কাজ। বলিয়া ছুটিয়া গিয়া ভজহরিকে টানিয়া আনিল। চোখে অশ্রু ঠেলিয়া আসিতেছে। 'ব্যাটা দাতাকর্ণ, দান করতে এসেছেন।' বলিয়া অসীম কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা মিশ্রিত কৃত্রিম কোপের সঙ্গে ভজহরির হাতে টাকাগুলি গুঁজিয়া দিয়া অনুপম তাহাকে ঠেলিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল। মনে মনে বলিল, যদি কোনও দিন চাকরি পাই, তবে ভজহরিকে নিয়ে যাব; চির-দিনই ওকে সঙ্গে রাখব। গরীব মানুষ, কিন্তু কত বড় ওর মন!

(ক্রমশ)

পরিবর্তন

শ্রীঅমূল্য পাল এম-এ

নীরব নিশীথ। উন্মত্ত বাতাস অজগরের শ্বাসের মত ফুলিয়া ফুলিয়া বহিতেছে।

ধড়মড় করিয়া কিশোর মাস্টার উঠিয়া বসিল। চিন্তায় চিন্তায় তাহার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে। এভাবে চলিলে আর কতদিন টেকা যায়!

ভালোয়-মন্দয় দিনগুলি কাটিতেছিল তাহার। সে জানিত শিক্ষাব্রত গ্রহণ আর দারিদ্র্য বরণ একই কথা। কিন্তু তবু সে ইহাই গ্রহণ করিয়াছিল। কলেজী-গন্ধ তখনও যায় নাই, কেতাবী বুলি তখনও মাথায় টগবগ করিতেছে। জীবনটাকে চালাইতে চাহিয়াছিল একটা আদর্শের মধ্য দিয়া। কিন্তু এই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের নির্ভর-যষ্ঠি যে এত নড়বড়ে, তাহা সে আগে বোঝে নাই। 'ভবিষ্যৎ জাতি-গঠনকারী'কে যে অন্নহীনতার কষ্টিপাথরে ঘসা খাইয়া ভেজাল সাব্যস্ত হইতে হইবে, তাহা তো সে জানিত না! পেটে না খাইলে যে পিঠে সয় না, তাহা বুঝিবার সময় যেন আসিয়াছে!

সহসা আকাশে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

স্বামীর উপর সকল দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া নির্মলা নির্ভয়ে ঘুমাইতেছে। বেচারী! সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে হয় তাহাকে। নলকূপ হইতে জল নেওয়া, কয়লার অভাবে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা, হেঁসেল ঠেলা, বাসন-কোসন মাজা, তদুপরি ছেলে ও মেয়ের যত্ন করা!

কিশোরের সঙ্গে নির্মলার বিবাহ কেন হইল! অন্য ঘরে পড়িলে তাহাকে হয়ত এত কষ্ট করিতে হইত না। কোন এক রেলওয়ের কর্মচারীর সঙ্গে নাকি তাহার বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছিল। মাস্টারের চেয়ে রেলওয়ের কর্মচারী যে অনেক ভালো, তাহাকে যে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া অপূর্ণ আহারী হইতে এবং নিজেদের খুশির পাখনা গুটাইতে হয় না, তাহা তাহার বাপের বাড়ির কুটুম্বেরা প্রমাণ করিয়াছে।

কিশোরের ছোট সংসার আর অল্প আয়ের কথা জানিয়া গ্রামের মেয়ে নির্মলা হাসিমুখে তাহার হাত ধরিয়া বলিয়াছিল, তুমিই আমার সব। আমায় তোমার মত করে নাও।

নির্মলাকে পাইয়া কিশোরের কাছে একটা কেতাবী কথা সত্য বলিয়া মনে হইল—মেয়েরা লেখাপড়া না জানিলেও, তাহাদের কলেজের তকমা না থাকিলেও পটুত্ব আছে।

কিশোরের আদর্শ দারিদ্র্য—অভিশাপ। নয়তো কি? যে-দেশে সব চলে—আমোদ-প্রমোদ, বিবাহ, অনাগতদের আগমন-উৎসব ইত্যাদি এবং যে-দেশে কদলী প্রদর্শন করা হয় শুধু শিক্ষাব্রতীদের নাসিকার নিম্নে, সে-দেশে শিক্ষার মূল্য কি? আদর্শ! তাহার হাসি পাইল। আকাশে আবার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। দেওয়ালে টাঙানো মলিন আয়নাটার মধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, দেখিয়া সে আঁতকাইয়া উঠিল।

'শ্যামাঙ্গী বর্ষা সুন্দরী' আজ কৃষ্ণাঙ্গী হইয়া বাহিরে উদ্দাম নৃত্য সুরু করিয়াছে। ক্কড় ক্কড় ক্কড় কড়াৎ। আকাশে বজ্র তাল ঠুকিয়া গেল। জানালা ভেদ করিয়া মুহুর্মুহু আসিতেছে বৃষ্টির ঝাপটা। কিশোর উহা বন্ধ করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ঝন ঝন শব্দ করিয়া বাহিরে কী পড়িতেছে যেন! জানালা ছাড়িয়া সে অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

উঠানে দাঁড়াইয়া বিদ্যুতের আলোতে দেখিতে পাইল, নির্মলার ভাঁড়ার ও তৎসংলগ্ন রান্নাঘরের টিনের চাল উড়িয়া গিয়াছে এবং বেড়া ভেদ করিয়া যেন নামিয়াছে বর্ষা। মাটির হাঁড়িকুঁড়ি! যাক্, সেগুলির অস্তিত্ব হয়ত নাই। কিন্তু আগামী কালের রসদ! সেগুলি রক্ষা না করিলে কাল যে অম্বু-উপবাস। সে চালশূন্য ভাঁড়ারে ঢুকিয়া পড়িল।

মড় মড় মড়। গাছের একটা শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িল তাহার গা ঘেঁষিয়া। সে যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন সঙ্গে মাত্র কয়েক মুঠি চাল আর গণ্ডা দুই গোল আলু।

কিন্তু রকের উপর দাঁড়াইয়া কে ও! পিছনে মিটিমিটি আলো জ্বলিতেছে। সম্মুখে আসিয়া কিশোর দেখিল, নির্মলা কাঁপিতেছে, ভয়ে। সে বলিল, এ-ঝড়ের মধ্যে তুমি ওখানে কেন গেলে?

আপাদমস্তক-সিক্ত কিশোর চাল আর আলু কয়টা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, এগুলো জলে ভাসিয়ে নিলে কাল খাব কি? সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ইহার জবাব নির্মলা কী দিবে!

কাপড় পাল্টাইয়া কাছে আসিয়া লণ্ঠনের আলোয় কিশোর দেখে, নির্মলার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে; যেন দুটি চকচকে বাঁকা সাপ। স্তব্ধ হইয়া তাকাইয়া কিশোর বলিল, কেঁদো না নির্মলা, দুঃখের কাছে নতি স্বীকার করো না। ওঠ তো। একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছি একটু চা করে দাও। ওঠ।

নির্মলা নিশ্চল। প্রতিদিন ভোরের চা'র জন্যে দুধ রাখা হয়, কিন্তু সেদিন ছিল না। তবু শিশু-কন্যাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এক ঘুমের পর মেয়েটা ক্ষুধায় জাগিয়া উঠিয়াছে। তখন আর তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে নাই।

কিশোর বলিল, কি নাই? চা? চিনি? দুধ? না থাক্ এ-সব কিছু। একটু গরম জল হলেই চলবে।

ঘরে ছিল শুধু চা। নির্মলা স্বামীর হাতে একবাটি দুধ-চিনিহীন চা আনিয়া দিল। কী সুন্দর ইহার রঙ। মানুষের দেহের দূষিত রক্ত যেন! দারিদ্র্যনিষ্পিষ্ট মানুষ যেন তাহার দেহের রক্ত দিয়া ইহাকে রাঙিন করিয়াছে। কিশোর নাড়া দিয়া বসিল। তাহার দেহের রক্তকণিকাগুলি যেন দ্রুত-গতিতে ছুটিতেছে। অর্ধ সমাপ্ত চা'র বাটিটা রাখিয়া বলিল, চল নির্মলা, আমরা এখান থেকে চলে যাই। আর এখানে নয়।

বিস্ময়-ভরা চোখ দুটি তুলিয়া নির্মলা জিজ্ঞাসা করিল, কোথায়?

গ্রামে।

(শেষাংশ ১৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(৩১)

অরুণের সঙ্গে এ বাড়ির কোন সম্পর্কই নাই।

মিসেস বোস ব্যাপার বুঝিতে পারেন না, মনের মধ্যে অনেকখানি কৌতূহল জাগিয়া উঠে।

এক বৎসর অতীত হইয়া গেছে—

ইহার মধ্যে কয়দিন তিনি স্বামীর দেখা পাইয়া জামাতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছেন, মিঃ বোস প্রশ্ন এড়াইয়া গেছেন, বলিয়াছেন, "ওসব সম্পর্কে কোন কথা আমায় জিজ্ঞাসা করো না কেটি, যা জিজ্ঞাসা করার তোমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা কর।"

শাশ্বতীর দিন তেমনই লঘু চপলতার মধ্যে কাটিয়া যাইতেছে; মায়ের সঙ্গে দেখা হয় তাহার খুবই কম।

সেদিন স্বামীর টেবলে একখানা পত্র পড়িয়াছিল। এই পত্রখানা, মিসেস বোসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, পত্রখানা লিখিয়াছে অরুণ ঘোষ—বম্বে হইতে।

সাধারণ পত্র, নিজের কুশলদান ও মিঃ বোসের কুশল প্রার্থনা।

এই অরুণ তাহার জামাতা—শাশ্বতীর স্বামী, পিতাকে বাক্যদানের পাপ হইতে শাশ্বতী রক্ষা করিয়াছে স্বেচ্ছায় ইহাকে বিবাহ করিয়া।

কার্ডখানা হাতে লইয়া তিনি বাহির হইলেন। শাশ্বতীর ঘরে সে নাই, তাহার আরদালি কানাইয়া বলিল—সে নাকি এইমাত্র বাহির হইতেছে, হয়তো এতক্ষণ লনে আছে।

সহিস মোবারক আস্তাবলের সামনে তেজী কালো ঘোড়াটাকে বাহির করিয়া জিন লাগাম পরাইতেছিল—নিকটে শাশ্বতী অকারণ চাবুক দিয়া মাথার উপরকার কুঞ্জের পাতা ফুলগুলা ছিঁড়িতেছিল। তাহার সাজপোষাক দেখিয়া মনে হয় সে এখনই অশ্বারোহণে মাঠের দিকে যাইবে।

"শাশ্বতী—"

মায়ের আহ্বান শুনিয়া শাশ্বতী মুখ ফিরাইল, "ওমা—তুমি—" বলিতে বলিতে মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিল।

গম্ভীরকণ্ঠে মা বলিলেন "আজ বেড়ানো থাক, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকারী কথা আছে—ঘরে এসো।"

শাশ্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল "এখতো যেতে পারছিনে মা, আজ এক ঘণ্টা আমাদের গলফ্ খেলা আছে। তোমায় কথা দিচ্ছি আমি ঠিক আটটায় তোমার কাছে উপস্থিত হব, এক ঘণ্টার জন্যে আমায় ছুটি দাও—লক্ষ্মী মামণি, আপত্তি করো না।"

সে দুই হাতে মায়ের হস্ত দুইখানা ধরিয়া মায়ের মুখের পানে তাকাইল—

গম্ভীরমুখে মা বলিলেন, "বেশ, তোমায় বাধা দেব না, কিন্তু মনে থাকে যেন—ঠিক আটটা—"

"লক্ষ্মী আমার মা, আমার সোনা মা—"

নিতান্ত অকস্মাৎ সে মায়ের মুখখানা নীচু করিয়া তাহার ললাটে একটা চুম্বন দিয়া একলাফে পাকা সওয়ারের মত ঘোড়ায় উঠিয়া বসিল, হাতখানা তুলিয়া কেবল বলিল—"বায় বায়—"

ধীর কদমে ঘোড়া বাহির হইয়া গেল।

চিন্তাক্লিষ্ট মনে মিসেস বোস ঘরে ফিরিলেন। একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দুই করতলের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন শাশ্বতীর ভবিষ্যতের কথা।

এ মেয়ের অদৃষ্টে কি আছে, সংসারী জীবন যাপন কি এ কোন কালে করিতে পারিবে?

মনে পড়ে স্বাতী ও শাশ্বতী—দুইটি বিভিন্ন চরিত্রা ভগিনীর কথা। দেয়ালে দুই ভগিনীর যে একত্রিত ফটোখানা ছিল মিসেস বোস তাহার পানে চাহিলেন।

পাশাপাশি দুই ভগিনী বসিয়া, একজনের হাতে এক গুচ্ছ ফুল, অপরের হাতে একগাছি বেত,—মুখের ভাবে উভয়ের মনোভাব ব্যক্ত হইতেছে।

ফটো দেখিয়া বিচার করার প্রয়োজন জননীর হয় না। একই পিতা-মাতার স্নেহচ্ছায়াতলে দুই ভগিনী মানুষ হইয়া কেমন করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া গেল—মা ভাবিয়া পান না। দেখা গিয়াছে স্বাতী যেদিকে গিয়াছে শাশ্বতী ঠিক তাহার বিপরীত দিকে গিয়াছে। এক ভগিনী অতি কোমলা একটি লতা, আর এক ভগিনী শক্ত মহীরুহ, বিনা আশ্রয়ে সে বাড়িয়া উঠে—নিজে বাঁচিবার রসদ সংগ্রহ করে।

পিছনে পায়ের শব্দ পাইয়া চমকাইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, মিঃ বোস আসিয়াছেন।

"এ কি, তুমি আজ হঠাৎ এমন অসময়ে—শরীর ভালো আছে তো?"

মিসেস বোস পাংশুমুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মাথার টুপিটা টেবলের উপর নামাইয়া চেয়ারে বসিয়া সহাস্যমুখে মিঃ বোস বলিলেন, "ভয় নেই, অত সহজে অসুখ-বিসুখ হয় না। যে দিন হবে সেদিন সব শেষ হয়ে যাবে কেটি,—সে জন্যে এখনই তোমায়—"

বাধা দিয়া উগ্রকণ্ঠে মিসেস বোস বলিলেন, "থাক, বেশী কথা আর নাই বললে। আজ এমন অসময়ে বাড়ি এলে—কোনদিন তো রাত বারোটার আগে ফেরো না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

মিঃ বোস বলিলেন, "অর্থাৎ কিনা—ভাবলুম আর এ সব ভূতের ব্যাগার দেব না, আর খাটব না। আজ মাসখানেক ধরে ব্যবসা তুলবার জন্যে ঘুরছিলুম; খরিদ্দার জুটে গেলেই কারখানা কল সব

বিক্রি করে ফেলব। এখন হতে আমি নিশ্চিন্ত কেটি, বাড়িতেই দিনরাত আমায় পাবে।"

উৎকণ্ঠিতা মিসেস বোস বলিলেন, "অত খাটুনির পরে এই পরিপূর্ণ বিশ্রাম শরীরে সইবে তো?"

মিঃ বোস হাত-পা ছড়াইয়া দিয়া একটা হাই তুলিয়া বলিলেন, —"রিটায়ার্ড জীবন, আস্তে আস্তে সবই সয়ে যাবে, কোন চিন্তা নেই। এইবার সম্পূর্ণভাবে সাংসারিক সুখ উপভোগ করব, তোমাদের অভাব-অভিযোগ সবই শুনব, তার প্রতিবিধানও করব। আঃ, মুক্তির কি আনন্দ—"

তিনি একটা সিগারেট নিতান্ত অসময়ে ধরাইয়া ফেলিলেন।

মিসেস বোস অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, তা কিছুতেই হতে পারে না. তোমায় আমি সে রকম হতে বলি নে। আমি জানি—কাজ তুমি ছাড়লে তোমায় আমি হারাব, কর্মী পুরুষ তুমি—কাজ হারিয়ে তুমি থাকতে পারো না।"

আস্তে আস্তে কখন তাঁহার চক্ষু দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল—।

মিঃ বোস হাসিয়া উঠিলেন, "নাও ঠেলা, কাজ থাকলেও কাঁদবে আর না থাকলেও কাঁদবে, তবে আমি করি কি বল দেখি? বেশ, কাজ করলেই যদি তুমি খুসি হও, আমি কাজ করব—"

মিসেস বোস বলিলেন, "হাঁ, কাজ করো—নিজেকে বাঁচিয়ে তুমি কাজ করো, যেমনভাবে আগে করতে—ঠিক তেমনই ভাবে; এ রকম রাত জেগে নয়।"

"বেশ—" বলিয়া মিঃ বোস পা দুখানা সোজা টেবলের উপর তুলিয়া দিলেন।

"উঃ, শবতি যা ঘোড়া ছুটিয়েছে দেখলুম—জানো কেটি,—নক্ষত্রের মত তার ঘোড়াটা ছুটছে—বাস্তবিক ও যদি আমার মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো।"

তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সিগারেটের ছাই ট্রেতে ঝাড়িয়া ফেলিলেন।

মিসেস বোস ভালো হইয়া বসিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, ওর সম্বন্ধেই আমি তোমায় কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। প্রথম কথা—ওর বিয়েটাই একটা মিস্ট্রী, আমি বিয়ের ব্যাপারটা মোটেই বুঝছিনে।"

মিঃ বোস বলিলেন, "সে বুঝবার মত কারণও কিছু এতে নেই। অরুণের বাপের সঙ্গে কথা ছিল স্বাতির সঙ্গে তার বিয়ে দেব আর চল্লিশ হাজার টাকা দেব যাতে সে তার ব্যবসায় লাগাতে পারে। সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে অরুণ বিলেত হতে আমার কাছে এসেছিল—তখন স্বাতি চলে গেছে। শাশ্বতি আমায় বাক্দান হতে নিষ্কৃতি দিলে, সে নিজে অরুণকে বিয়ে করলে, অরুণ চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে বম্বে চলে গেল।"

মর্মাহতা মিসেস বোস বলিলেন, "সে কি তবে কেবল টাকার জন্যেই এসেছিল, স্ত্রীর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক রইলো না?"

মিঃ বোস বলিলেন, "কতকটা সেই রকমই বটে। ওদের মধ্যে কি চুক্তি হয়েছে জানিনে, বিয়ের পরদিনই দেখি শাশ্বতী ওকে বিদায় দিচ্ছে। অরুণ আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "চললুম কাকাবাবু, টাকার দরকার ছিল বলেই এসেছিলুম, বিয়ে না করলে পাব না বলে বিয়ে করতে হল।" শাশ্বতী জানালে—অরুণ এখানে থাকবে না, সে বম্বে তার ল্যাবোরেটোরী খুলবে, তার ডাক্তারখানাও হবে সেইখানে। ওদের আগে নাকি বিয়ের আগেই এ সব কথাবার্তা হয়ে গেছে, কাজেই আমি আর একটি কথা বলতে পারলুম না।"

মিসেস বোস খানিক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "তা হলে ওরা চিরকাল এই রকম অপরিচিতের মতই দিন কাটাবে—এই ওদের চুক্তি হয়েছে?"

মিঃ বোস সংক্ষেপে বলিলেন, "শাশ্বতী তাই বলেছে।"

মিসেস বোস দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "সে বলেছে বলে তাই যে মেনে নিতে হবে তার কোনও মানে নেই। এমন একদিন আসবে যে দিন তাকে তার জন্যে অনুতপ্ত হতে হবে—"

বাধা দিয়া বোস বলিলেন, "আমার মনে হয় সে এ জন্যে অনুতাপ কোনদিন করবে না কেটি, কারণ অরুণকে সে যথার্থ ভালোবেসে স্বামীত্বে বরণ করেনি কেবল আমাকে বাঁচানোর জন্যেই বিয়ে করেছে। কেবল আমার কথা রক্ষা নয়—অনেক দিকে সে আমায় বাঁচিয়েছে কেটি—নচেৎ—"

থামিয়া গিয়া তিনি বাহিরের পানে চাহিলেন—তাহার পর চোখ ফিরাইয়া স্ত্রীরপানে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "আমার বর্তমান এই উন্নতির মূলে আছেন আমার স্বর্গগত বন্ধু—অরুণের পিতা। আমার দুঃসময়ে তিনি আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁর সর্বস্ব তিনি আমায় দিয়েছিলেন, আমি সেই ঋণ পরিশোধ করব বলে পাকা কথা শুধু নয়—লেখাপড়া করে দিয়েছিলুম। আজ যদি অরুণ সমস্ত সম্পত্তির দাবী করে, আমি হয়ত কেস করব, কিন্তু আমার হাতের লেখা তার কাছে আছে, সাক্ষীরাও কেউ কেউ বেঁচে আছেন। আমি তাই ভেবেছিলুম, স্বাতীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে আমার অর্ধেক সম্পত্তি তাকে দিয়ে মুক্তি নেব—তা হল না। শাশ্বতী সব শুনে জিদ করে তাকে বিয়ে করলে—তাকে সমস্ত সম্পত্তি দিতে চাইলুম, সে তা না নিয়ে মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে চলে গেছে। সে নিজেই বলে গেছে সে আর আসবে না।"

মিসেস বোস মাথা নত করিয়া ছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, "সে শুধু টাকা নিলেই পারতো, শাশ্বতীকে বিয়ে না করলেই হতো—"

মিঃ বোস বলিলেন, "কেবলমাত্র শাশ্বতীর জিদে; অরুণ সংসার করতে চায় না, তা ছাড়া মেয়েদের সে ঘৃণা করে।"

মিসেস বোস একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

(৩২)

কলিকাতায় বিতৃষ্ণা আসিয়া যায়—মন টানে গ্রামের দিকে, লতাপাতার ছায়ায় ঘেরা শ্যামল সুন্দর গ্রাম; পাখীর কলগীতিতে মুখরিত, ফুলের সুবাসে উদ্বেলিত;—যেখানে মাঠে মাঠে গাছের ছায়ায় রাখাল বাজায় বেণু, দূর হইতে বায়ু তরঙ্গে সে সুর ভাসিয়া আসে; সেখানে উদার মুক্ত আকাশে জাগে শুভ্র চাঁদ, শুভ্র আলোয় দৃপ্ত হইয়া উঠে পথ ঘাট, সেই গ্রামের ছবি অহরহ মনে জাগে, গ্রাম ডাকে আয় ওরে আয়।

টেনিস গলফ খেলা, সিনেমা থিয়েটার দেখা, এরোপ্লেনে আকাশপথে বিচরণ এ সবে যেন অরুচি ধরিয়া গেছে, শাশ্বতীর জীবনে ইহাতে আর এতটুকু অভিনবত্ব আসে না।

ক্লান্ত মনে শ্রান্ত দেহে শাশ্বতী সোফায় এলাইয়া পড়িয়া ভাবে—আর কেন, সবই তো ফুরাইয়া গেছে।

চকিতে অন্তর তাহার বিদ্যুতালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে না, শহর তাহার কাছে নিঃশেষে ফুরাইয়া গেলেও গ্রাম এখনও ফুরায় নাই। শাশ্বতী চোখ মুদিয়া ভাবে সেই গ্রাম, সেই ক্ষুদ্র যুগীপুকুর গ্রাম—

সেখানে আছে সুমন্ত—

শাশ্বতী চমকাইয়া উঠে—

সুমন্ত—সুমন্ত—সুমন্ত,—

একদিন যাহার প্রতি নিজের আকর্ষণ অনুভব করিয়া সে সঙ্কুচিত হইয়াছিল, লজ্জিত হইয়াছিল, চিত্তের সেই আকর্ষণকে বাধা দিবার চেষ্টা সে আজও করিয়া আসিতেছে। কিন্তু যাহাকে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া দেখিতে গিয়াছে, সেই হইয়া পড়িয়াছে অত্যন্ত বড়; তাহার চিন্তা আজ কিছুতেই বাদ দেওয়া চলে না।

পাঁচ বৎসর পূর্বের একটা দিনের কথা শাশ্বতীর মনে পড়ে।

নিতান্ত অকস্মাৎ অনাহূতের মত কুমারীর প্রথম দৃষ্টির

সামনে আসিয়া দাঁড়াইল সুমন্ত, নিজের অজ্ঞাতে কুমারী কখন তাহাকে আত্মনিবেদন করিয়া বসিল তাহা সেদিন জানে নাই। সেদিন সে নিজেকে ধিক্কার দিয়াছিল, কেহ জানিলে কি ভাবিবে ভাবিয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ আর সে কুণ্ঠা মনে আসে না সে লজ্জা জাগে না।

শাশ্বতীর প্রাণে আজ কীর্তনের সুর ঝঙ্কার দেয়—

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুতমিত রমণী সমাজে,
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলু
অবমঝু হব কোন কাজে—

শাশ্বতীর দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়ে, সে গুণ গুণ করিয়া গায়—

মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা,
তুঁহু জগততারণ দীন দয়াময়
অতএব তোহারি বিশোয়াসা।

কন্যার মুখে কীর্তনের সুর—পিতা আশ্চর্য হইয়া গেলেন। বলিলেন, "কীর্তন আমার বড় ভালো লাগে শ্বতী, ও সুর বাঙালীর প্রাণে প্রাণে জড়িয়ে আছে কিনা, তাই কারও মুখে শুনলেই মর্মে আঘাত করে। কিন্তু তুমি যে কীর্তন গাইতে পারো, তা'তো জানতুম না মা, কোথায় আর কবে শিখলে?"

শাশ্বতী উত্তর দিল, "কয়েক বছর আগে শিখেছি বাবা। মা তো জানেন—সেই যুগীপুকুরে মেসো মশাইয়ের ভাইপো সুমন্ত রায়, চমৎকার কীর্তন গাইতেন বাবা, আমি তাঁর কাছে শিখেছি।"

"সুমন্ত—যুগীপকুর—"

মিঃ বোস কতকটা অনামনস্ক হন, একটু ভাবিয়া বলিলেন, "ওই যাকে ডাকাতি কেসে ধরা হয়েছিল—সেই তো?"

শাশ্বতী বিস্ফারিতনেত্রে পিতার পানে তাকাইল—মিসেস বোস সেদিনকার সংবাদপত্রখানা দেখিতেছিলেন; বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন, "ডাকাতি কেসে ধরা পড়েছিল—তার মানে?"

মিঃ বোস বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, স্বদেশী ডাকাত অর্থাৎ ডাক গাড়ি হতে লুণ্ঠন। এই তো বছর খানেক আগেকার কথা, আমি যে সাক্ষী দিয়ে এলুম। আমার কয়েক হাজার টাকার জিনিস আসছিল যে, সেসব ওদের হস্তগত হয়েছে।"

মিসেস বোস ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "তারপর?"

মিঃ বোস বলিলেন, "তারপর আর কি। ছেলেটির বাস্তবিক অলৌকিক শক্তি সাহস আছে। সেই চলন্ত ডাকগাড়িতে সে উঠেছিল, অনেক জিনিস সরিয়ে নিজেও পালিয়েছিল। বছর খানেক আগে ধরা পড়ে দেওঘরের ত্রিকুট পাহাড়ে, কিভাবে পুলিশকে হয়রাণি ক'রে সেই সময়টুকুর মধ্যে সঙ্গীদের পালাবার সুযোগ করে দিয়ে সে ধরা দেয় তা শুনে সত্যই আমি অবাক হয়ে গেছি। মনের জোর তার এত—অনেক নির্যাতন সত্ত্বেও সঙ্গীদের কারও নাম করেনি, নিজের মাথায় সব দোষ চাপিয়ে জেলে গেছে।"

শাশ্বতী শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কতদিনের জন্যে জেল হলো?"

মিঃ বোস বলিলেন, "হয়েছে কয়েক বছরের জন্যে। সেদিন যে কাগজে পড়লুম সে নাকি ভারি অসুস্থ কি হবে তার ঠিক নেই।"

শাশ্বতী আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল।

পাশের ঘরে কান্নাভরা সুরে সে সুর করিতেছিল—

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।

মিসেস বোস একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। কয়েকদিন আগে ডক্টর ঘোষের সংবাদ সংবাদপত্রে পাওয়া গিয়াছে তিনি ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছেন। ফেরার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি গিয়াছেন,—নিজের যাহা কিছু সব সাধারণের উপকারার্থে দান করিয়াছেন।

পিতা মাতা উভয়েরই মনে শান্তি নাই, উভয়েই মনে করিতেছেন এ বিবাহ না হইলেই ভালো হইত।

শাশ্বতী নিজের ইচ্ছায় বিবাহ করিয়াছে, তাহাকে বলিবার কিছুই নাই। স্বামীর যুদ্ধযাত্রার সংবাদে সে খুসীও হয় নাই, দুঃখও পায় নাই।

পাশের ঘরে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া উজ্জ্বল নীলাকাশের পানে তাকাইয়া শাশ্বতী আজ স্থান কাল ভুলিয়া গাহিতেছিল,—

আমি নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিনু
পড়িনু অগাধ জলে,
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারাণু হেলে।

একখানা পত্র আনিয়া তাহার দাসী কখন টেবলের উপর রাখিয়া গিয়াছিল তাহা শাশ্বতী জানিতে পারে নাই।

গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া পত্রখানা দেখিতে পাইয়া গান বন্ধ করিয়া সে পত্র তুলিয়া লইল।

কভার খুলিয়া আগেই সে প্রেরকের নাম দেখিল—ডক্টর অরুণ ঘোষ, শাশ্বতীর স্বামী পত্র লিখিয়াছেন। পত্র আসিতেছে সুদূর আফ্রিকা হইতে—যে লিবিয়াতে বর্তমানে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে সেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে।

ডক্টর ঘোষ জীবনে এই প্রথম শাশ্বতীকে পত্র দিয়াছেন।

পত্রে লিখিয়াছেন—

কল্যাণীয়া শাশ্বতী—

তোমার কাছে আমার এই প্রথম এবং শেষ পত্র। অনেকবার ভেবেছি, পত্র লিখব কি না—শেষ পর্যন্ত একখানা পত্রে তোমায় সব কথা জানিয়ে দেওয়া উচিত মনে করে লিখছি।

কিভাবে এবং কেন যে হঠাৎ তোমার আমার বিয়ে হল, আমি আজও তা ঠিক করতে পারিনে। আমার সারাজীবনব্যাপী ছিল একাগ্র সাধনার স্থল, এখানে প্রবেশাধিকার ছিল না কারও—কোন নারীর। আমার ছিল একাগ্র আশা—আমার সাধনা দিয়ে ডাক্তারী শাস্ত্রে আমি এমন কিছু আবিষ্কার করব, যাতে সারা জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাবে।

আমি আমার জীবনের বেশীরভাগ সময় কাটিয়েছি ইউরোপে; তুমি শুনে রাখ, এ পর্যন্ত কোন নারী আমার মনের পরে আধিপত্য দূরে থাক, ছায়া ফেলতেও সমর্থ হয় নি। আমার আবিষ্কারের মোহ আমায় কোনদিকে চাইবার, কিছু ভাববার অবকাশ দেয়নি, আমি আমার মনে কল্পনায় এক নূতন স্বর্গ তৈরী করেছিলুম।

আমার স্বর্গগত পিতা আমায় বলে গিয়েছিলেন, বিলাত হতে ফিরে আমায় বিবাহ করতে হবে, তাঁর বন্ধু মিঃ বোসকে তিনি কথা দিয়ে রেখেছেন। মিঃ বোসের অঙ্গীকারপত্র তাঁর কাছে আছে—তিনি তাঁর অর্ধেক সম্পত্তিসহ একটি মেয়ে আমায় দান করবেন।

ইউরোপ হতে ফিরে বুঝলুম টাকার আমার কত দরকার, আমি তোমার পিতার কাছে এলুম। দেখলুম, আমার পরিচয় পেয়ে তিনি অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি না বললেও আমি শুনেছি—আমার বাকদত্তা পত্নী অন্যত্র চলে গেছে এবং অপরকে বিবাহ করেছে।

বুক হতে একটা দারুণ বোঝা নেমে গেল, কিন্তু মুস্কিল হল এইজন্য যে, টাকার কথা আমি বলতে পারলুম না। ঠিক এই সময়েই আমি শুনতে পেলুম, তোমাকে যদি আমি বিবাহ করি আমি আমার প্রয়োজনীয় টাকা পেতে পারি।

সেই মুহূর্তে আমি রাজী হয়েছিলুম।

আমি তোমায় দেখি নি শাশ্বতী, দেখেছিলুম তোমার টাকাকে।

মহাযুদ্ধের তিনবছর

ভানু গুপ্ত

বর্তমান মহাযুদ্ধের তিন বছর পূর্ণ হ'ল ১লা সেপ্টেম্বরে। তিন বছর আগে ঐ দিন নাৎসী জার্মানি পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান করে। ইওরোপীয় যুদ্ধ হিসেবেই তখন সেই সংঘর্ষ আত্মপ্রকাশ করেছিল, যার পরিণতি এখন হয়েছে বিশ্বযুদ্ধে। ইওরোপীয় যুদ্ধ যে আজ বা কাল বিশ্বযুদ্ধে পর্যবসিত হবে, এই বাস্তব অনুমান সকলেরই ছিল। আপাতদৃষ্টিতে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর; কারণ ঐ সময় থেকে পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তির মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ বেধে যায়। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে অনেক আগে।

হিটলার

স্টালিন

পৃথিবীতে কয়েকটা রাষ্ট্র পররাজ্য দখল করে' কিংবা পরদেশের বাজারে আধিপত্য স্থাপন করে' সাম্রাজ্য ও সম্পদ ভোগ করছিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা এদের মধ্যে প্রধান। আর কয়েকটা রাষ্ট্র ছিল যারা সাম্রাজ্য ও সম্পদের লোভে লালায়িত হয়ে উঠেছিল এবং সাম্রাজ্যভোগীদের কাছ থেকে রাজ্যগুলো ছিনিয়ে নেবার জন্যে অস্থির হ'য়ে পড়েছিল। এদের মধ্যে জার্মানি, ইতালী ও জাপান প্রধান। মাঝখানে ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন, যে পরশোষণ বিলুপ্ত করে' এক নতুন মানবহিতৈষণার ভিত্তিতে নিজের রাজ্যসীমার মধ্যে মানবসমাজকে গড়ে' তুলছিল। উপরের দুই শ্রেণীর রাষ্ট্রের চোখেই সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল বিভীষিকা; কারণ তাদের উভয়েরই জীবনবেদ হ'ল অপরকে শাসন ও অপরকে শোষণ। মাঝখানে আরো ছিল বহু দেশ যারা স্বাধীন শক্তির বিকাশে শক্তিমান ছিল না, যারা অন্য জাতির দ্বারা পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিগৃহীত হচ্ছিল; এবং যারা স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠ হবার জন্যে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। এদের মধ্যে চীন, ভারতবর্ষ ও মিশরের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই অবস্থার মধ্যেই মহাযুদ্ধের বীজ উপ্ত ছিল। জার্মানি, ইতালী ও জাপান ঠিক করে' নিয়েছিল যে, সাম্রাজ্য কেড়ে নেবার জন্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার সঙ্গে নিকট ভবিষ্যতে তাদের লড়তেই হবে এবং সেই লড়াইয়ের জন্যে তাদের ঘাটি তৈরী করা এবং অস্ত্রবল যতদূর সম্ভব বাড়ানো দরকার। ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেই কাজই তারা করেছে। ১৯৩২ সালে জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল ও ১৯৩৭ সালে চীন আক্রমণ; ১৯৩৫ সালে ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ ও দখল এবং ১৯৩৯-এর এপ্রিল মাসে আলবেনিয়া দখল; ১৯৩৮ সালে জার্মানির অস্ট্রিয়া দখল এবং ১৯৩৯-এর মার্চ মাসে চেকোশ্লোভাকিয়া দখল; ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে স্পেনে এক্সিস-শক্তির হস্তক্ষেপ ও ফাশিস্ট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা—এই সব হচ্ছে বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রাথমিক পর্ব, ফাশিস্ট শক্তিদের ঘাটি তৈয়ারী ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির অধ্যায়। এই সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বদেশে চলেছে সমর-সজ্জা এবং সমর-বাহিনী সংগঠন। এই অধ্যায়ে সবচেয়ে শোচনীয় হ'ল সাম্রাজ্যবাদী গণতান্ত্রিক দেশগুলোর অন্ধ আচরণ। তারা ক্রমাগত ফাশিস্ট শক্তিপুঞ্জকে তোষণের নীতি অনুসরণ করেছে, সোভিয়েট বিভীষিকায় কণ্টকিত হ'য়ে তাকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করেছে ও তার ভবিষ্যৎ আক্রমণকারী হিসেবে জার্মানি, ইতালী ও জাপানকে শক্তি বৃদ্ধি করতে দিয়েছে এবং নিজেদের অস্ত্রসজ্জার দিকে একেবারে মন দেয়নি। এই নীতির চরম প্রকাশ দেখা গিয়েছিল চীনের প্রতি ঔদাসীন্যে, স্পেন সম্পর্কে নিরপেক্ষতা অবলম্বনে এবং চেকোস্লোভাকিয়া সম্পর্কে মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরে।

এই পটভূমিকায় বর্তমান মহাযুদ্ধের সূত্রপাত। মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যেও সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ফাশিস্ট শক্তিবর্গের যেমন একটা পরস্পর-সহযোগী ব্যবস্থার আভাষ পাওয়া যায় তেমনি গত তিন বছরের যুদ্ধ থেকে দেখা যায় তাদের সমর-পরিকল্পনাটাও সর্বব্যাপী। অনেক সময় যে সব সামরিক উদ্যম বাহ্যত বিচ্ছিন্ন মনে হয়েছে সেগুলো মূলত একই সূত্রে গ্রথিত।

মহাযুদ্ধের প্রধান ঘটনাগুলো এখানে উল্লেখ করা যাক। এই বিবরণী থেকে কয়েকটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারা যাবে।

(ক) জার্মানি ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে এবং ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

মুসোলিনী

চার্চিল

ঘোষণা করে। জার্মান বাহিনী আঠার দিনের মধ্যে পোলিশ বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে' দেয়।

জার্মানি ১৯৪০-এর ৯ই এপ্রিল নরওয়ে আক্রমণ করে; ৩রা মে'র মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্যেরা নরওয়ে ত্যাগ করে এবং জার্মানি নরওয়ে পদানত করে।

জার্মানি ১৯৪০ সালের ১০ই মে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ আক্রমণ করে। ১৫ই মে সেদাঁতে ফরাসী সৈন্যদের উপর তাদের আক্রমণ সফল হয়। পাঁচ দিনের মধ্যে হল্যাণ্ড ও সতেরো দিনের মধ্যে বেলজিয়াম পদানত হয়। ৩রা জুন ডানকার্ক থেকে ব্রিটিশ সৈন্যেরা সমস্ত সমর-সম্ভার খুইয়ে অতি কষ্টে পালিয়ে চলে' আসে। ফ্রান্স ১৭ই জুন যুদ্ধবিরতি ভিক্ষা করে, ২৩শে জুন ঐ যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর কয়েকদিন আগে ১০ই জুন ইতালী ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৪০-এর সেপ্টেম্বর থেকে ইংলণ্ডের উপর ব্যাপক বোমাবর্ষণ আরম্ভ হয়।

এই সময় থেকে আমেরিকা ব্রিটেনকে ব্যাপকভাবে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করে।

জাপান ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বরে এক্সিসের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করে।

১৯৪০-এর অক্টোবরে ইতালী গ্রীসকে আক্রমণ করে। ছয় মাস ধরে' ইতালী গ্রীস জয়ের ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকে। ইতিমধ্যে জার্মানি কূটনীতি দ্বারা হাঙ্গারী, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার ফাশিস্ত-পন্থী শাসকদের হাত করে' জার্মান আধিপত্য-বিরোধী নতুন গভর্নমেন্ট নিয়ন্ত্রিত যুগোস্লাভিয়াকে এবং সেই সঙ্গে গ্রীসকে আক্রমণ করে; তারিখ ৬ই এপ্রিল, ১৯৪১। যুগোস্লাভিয়া ১৬ই এপ্রিল পদানত হয়; গ্রীক গভর্নমেন্ট ২৩শে এপ্রিল ক্রীটে চলে' যান। জার্মানি ২০শে মে প্যারাশুট সৈন্য দিয়ে অভিযান করে' ক্রীট দখল করে' নেয়।

জার্মানি ১৯৪১-এর ২২শে জুন সোভিয়েটকে অতর্কিত আক্রমণ করে। ফিনিশ, হাঙ্গারীয়ান, রুমানিয়ান, স্লোভাক ও ইতালীয়ান সৈন্য সহযোগে জার্মানরা দ্রুত এগিয়ে যায়; কিন্তু তাদের মস্কো ও লেনিনগ্রাদ দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে রুশেরা শীতের প্রাক্কালে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে জার্মানদের হটিয়ে দিতে থাকে। শীতের সময় এই অবস্থাই চলে। এই বছরের মে মাসে জার্মানরা আবার আক্রমণ আরম্ভ করে, কিন্তু সমস্ত রণাঙ্গনে এক-সঙ্গে নয়, শুধু দক্ষিণে। ককেশাস অঞ্চলে তারা এগিয়ে যায় এবং স্টালিনগ্রাডের নিকটবর্তী হয়। এখন ককেশাসের তেল ও স্টালিন-গ্রাড শহরের জন্যে ভীষণ লড়াই চল্‌ছে। এদিকে মধ্য রণাঙ্গনে লালফৌজ পাল্টা আক্রমণ করে' জার্মান ব্যূহ ভেদ করেছে এবং জার্মানদের উদ্বিগ্ন করে' তুলেছে।

(খ) সোভিয়েট বাহিনী ১৯৩৯ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডে প্রবেশ করে এবং জার্মানী ও রুশিয়া পোল্যান্ড ভাগাভাগি করে নেয়।

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে ও অক্টোবরে রুশিয়া বল্টিক রাষ্ট্র এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়েনিয়ার কাছ থেকে সামরিক ঘাঁটি আদায় করে। পরে এ তিনটি দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফিনল্যান্ড সোভিয়েটের ঘাঁটি দাবীতে অস্বীকৃত হয়। তার সঙ্গে সোভিয়েটের লড়াই হয়। ১৯৪০-এর মার্চে ফিনল্যান্ড সোভিয়েট দাবী মেনে নিয়ে চুক্তি করে।

১৯৪০-এর জুন মাসে সোভিয়েট রুমানিয়ার অন্তর্গত বেসারেবিয়া অধিকার করে।

(গ) ১৯৪০-এর আগস্ট মাসে ইতালী ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড দখল করে এবং মিশরে ঢুকে পড়ে। ১৯৪০-এর ডিসেম্বরে উত্তর আফ্রিকায় ব্রিটিশ পাল্টা অভিযান শুরু হয়। ব্রিটিশ সৈন্যেরা লিবিয়ায় বেনগাজী পর্যন্ত দখল করে। কিন্তু জার্মানরা এসে তাদের বিতাড়িত করে; তবে তব্রুক তাদের হাতে থেকে যায়। এই বছর মে মাস থেকে যুদ্ধের ফলে জার্মানরা ব্রিটিশ সৈন্যকে লিবিয়া থেকে হটিয়ে দিয়ে মিশরের মধ্যে অগ্রসর হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার পশ্চিমে আলামেনে ব্রিটিশ সৈন্য তাদের থামিয়ে রেখেছে।

১৯৪১-এর মে মাসে ইরাকীরা ব্রিটিশ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ব্রিটিশ সৈন্যেরা ইরাক দখল করার পর ব্রিটিশ সমর্থক ইরাকী গবর্নমেন্ট স্থাপিত হয়।

১৯৪১-এর ৮ই জুন ব্রিটিশ সৈন্য ফরাসী উপনিবেশ সিরিয়া আক্রমণ করে এবং ১৪ই জুলাই-এর মধ্যে দখল করে।

(ঘ) ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান পার্লহারবার ও সিঙ্গাপুরের উপর অতর্কিত আক্রমণে আমেরিকা ও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে' দেয়। মাস ছয়েকের মধ্যে সে হংকং, ফিলিপিন, মালয়, ব্রহ্ম, ডাচ ঈস্টইন্ডিজ ও প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের বহু দ্বীপ দখল করে' নেয়। সাতদিনের মধ্যে সিঙ্গাপুর অধিকার একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বছর আগস্ট মাসে মার্কিন

রুজভেল্ট

তোজো

সৈন্যেরা জাপ-অধিকৃত সলোমন দ্বীপপুঞ্জের উপর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ৬টা দ্বীপ পুনরধিকার করেছে। সেখানে এখন প্রবল যুদ্ধ চল্‌ছে।

জাপানী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানি ও ইতালী আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

চীন কিন্তু আগের মতোই অটলভাবে জাপানকে প্রতিরোধ করতে থাকে। এখন সে পাল্টা আক্রমণ সফলভাবে চালাচ্ছে।

এই ঘটনাবলী থেকেই জার্মানি, ইতালী ও জাপানের মধ্যে একটা সর্বব্যাপী সাধারণ সমর-পরিকল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সমস্ত পৃথিবীটাকে তারা যেন সব দিক থেকে চেপে ধরতে চায়। ধাপে ধাপে তারা সেইভাবেই এগিয়ে এসেছে। ফ্রান্সের পতন যখন অবধারিত, ঠিক তখন ইতালী বিনা কারণে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের সহযোগিতাবঞ্চিত ইংলণ্ডকে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ক্ষিপ্র আঘাত করা। আমেরিকা যখন ইংলণ্ডকে সাহায্য দিতে থাকল তখন তার জবাবে জাপান ভিড়ে এল জার্মানি ও ইতালীর কাছে এবং তাদের মধ্যে আমেরিকার প্রতি হুমকি দেখিয়ে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। কিন্তু আমেরিকা প্রতিনিবৃত্ত হল না; আর জার্মান বিমান-আক্রমণে ইংলণ্ডও আত্মসমর্পণ ক'রল না; উপরন্তু সোভিয়েট রণাঙ্গনে জার্মান শক্তিক্ষয়ের ফলে তুলনায় ইংগ-মার্কিন শক্তি বাড়তে থাক্‌ল। সেই অবস্থায় আক্রমণ বিধেয় মনে করে' জাপান ইংগ-মার্কিন শক্তিকে আঘাত করল।

সোভিয়েটের কাজ থেকে দেখা যায়, জার্মানী যে তাকে আক্রমণ করবে সে সম্বন্ধে তার পরিষ্কার ধারণা ছিল। এই মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে সেই সম্ভাবনার বিরুদ্ধেই সোভিয়েট কতকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

তিন বছরের ঘটনায় আরো বোঝা যায়, জার্মানি ও জাপানের সামরিক শক্তি ও সংগঠন কি সাংঘাতিক এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি কি মারাত্মকভাবে নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা উপেক্ষা করেছে। ফাশিস্ট ত্রয়ীর মধ্যে একমাত্র ইতালীই নির্বীর্য। কিন্তু তার নানা কারণ আছে, যার আলোচনা বিস্তারিতভাবে হওয়া দরকার। সমগ্র ইউরোপের শিল্প-বল ও লোকবলের বিরুদ্ধে এককভাবে রুশিয়ার লড়াই থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। আর পরিচয় পাওয়া যায় তার জনসাধারণের অদ্ভুত মনোবলের। এদিকে থেকে চীন তার সমকক্ষ।

ঘটনার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ফ্রান্সের পতনের পর কয়েক

মাস ইংলণ্ডের সব চেয়ে বড় সঙ্কটকাল গেছে। সেই সময় তার সমর-ক্ষমতা যতদূর ভাবা যায় ততদূর কমে' গিয়েছিল। সেই একক অস্ত্রবলহীন এবং শত্রু-বেষ্টিত অবস্থা সে এখন কাটিয়ে উঠেছে।

আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা উচিত। জার্মানি যদিও যুদ্ধে বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়েছে, তবু সমগ্র সংগ্রামের খতিয়ানে তার সাফল্য যেন ক্রমাগত পেছিয়ে গেছে। কোথাও সে যুদ্ধকে গুটিয়ে ফেলতে পারে নি, ক্রমাগতই তার যুদ্ধের এলাকা ছড়িয়ে পড়েছে এবং যুদ্ধের ভার বেড়ে চলেছে। আফ্রিকায় ইতালীর বিপর্যয়, বল্কানে গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়ার অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধ, যার ফলে ইরাকের অসাময়িক বিদ্রোহ দমিত হয়ে যায় এবং সিরিয়া ইংরেজের হস্তগত হয়, সোভিয়েট ইউনিয়নের অনমনীয় সংগ্রাম এবং সেখানে ১৯৪১-এর তুলনায় ১৯৪২-এ জার্মান আক্রমণ-ক্ষমতা হ্রাস—এই সব ব্যাপারে এ কথা মনে করা স্বাভাবিক যে, সমগ্রভাবে যুদ্ধ জয়ের ষ্ট্র্যাটেজি জার্মানির খুব অনুকূলে যায় নি। এক সঙ্গে দুই রণাঙ্গনে লড়াই করার যে সম্ভাবনা জার্মানি বরাবর পরিহার করতে চেয়েছে, সে সম্ভাবনাও আজ দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির অভিপ্রায় যদি ইংলণ্ড ও আমেরিকার থাকে তাহলে বাস্তবিকই জার্মানির বিপদের কথা। সুতরাং জার্মান ষ্ট্র্যাটেজির চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারিত হবে সোভিয়েট রণাঙ্গনে। সেখানে তার যত শক্তি ক্ষয় হবে ও যত বিলম্ব হবে ততই তার বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযানের সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে—ঠিক যেমন চীনের প্রতিরোধ শেষ পর্যন্ত জাপানের ভাগ্য নির্ধারিত করবে। অবশ্য সোভিয়েট ও চীনের প্রতিরোধের ভিত্তির উপর ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির অকপট নিয়োগেই শুধু ফাশিস্ট শক্তির পরাজয় হ'তে পারে, তা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

পুস্তক পরিচয়

হে রুদ্র সন্ন্যাসী:—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। জয়নগর, ২৪ পরগণা হইতে শ্রীত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা।

কবি বিজয়লাল মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত। আলোচ্য পুস্তকখানিতে চারটি প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অহিংসবাদের তিনি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। চারটি প্রবন্ধই ইতঃপূর্বে মাসিক কিংবা দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মহাত্মাজী মহামানব; বিশ্বের সংস্কৃতি এবং [illegible]র ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান কতটা, তাহা বিচার করিবার অবসর আমাদের নাই; ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার অপরিমিত অবদান আমাদিগকে বিস্মিত করে এবং তাঁহার এই অবদান মুখ্যত রাজনীতিকে আশ্রয় করিয়া এবং মহাত্মাজীর এই রাজনীতির দিকটাই আমাদের দৃষ্টিতে বড়। আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে তাঁহার বিচার আমরা বড় বলিয়া বুঝি না [illegible] করিতে বসিব না। সেজন্য বুদ্ধ, চৈতন্য—ইঁহাদেরই আদর্শ [illegible]। বিজয়লাল মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতাকে [illegible] করিয়াছেন। এই সম্পর্কে, তিনি দেখিতেছি এবার মহর্ষি [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "পতঞ্জলি প্রণীত [illegible] অহিংসাকে সার্বভৌম মহাব্রতের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে, যা [illegible] দেশ ও কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন।" আমাদের মতে মহাত্মা গান্ধী [illegible] থাকিয়া অহিংসার সার্বভৌমত্বের উপর জোর দিতেছেন, সে স্তর [illegible] মহর্ষি পতঞ্জলির নির্দেশ-স্তরে প্রভেদ রহিয়াছে। মহর্ষি পতঞ্জলির [illegible] স্তর মনোভূমির উপরের স্তর। সেখানে আর কৃত্য থাকে না; [illegible] সমদর্শন হয়। তখন আর অহিংসার কৃত্য থাকে না—অহিংসা [illegible] সত্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী অধ্যাত্ম সাধনার প্রক্রিয়ার উপর জোর না দিয়া মানস স্তরে অবস্থিত যাহারা, তাহাদের জন্যও [illegible] কৃত্য হিসাবে নির্দেশ করিতেছেন। যে সাধনাঙ্গের ভিতর [illegible] বিলোপ ঘটিয়া ব্যাপ্ত-চেতনার সঙ্গে অব্যবহিত একত্বের [illegible] উপলব্ধি হয়, প্রকৃতপক্ষে অহিংসা সার্থকতা লাভ করে সেইখানে, [illegible] অহিংসা সত্যকার শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথের সাধনার [illegible] আধ্যাত্মিকতার রস আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু [illegible] কর্মবাদের মধ্যে সে বস্তুকে সাধারণের পক্ষে ধরা সহজ হয় না। [illegible] সে সাধনাঙ্গ গান্ধীজীর পক্ষে নিজস্ব; সে বস্তুকে সাধারণের [illegible] করেন নাই। বিস্তার করিয়াছেন সে স্তরে গিয়া যে সত্য [illegible] স্বাভাবিক হইয়াছে, তাহাকেই সর্বসাধারণের কৃত্য হিসাবে। [illegible] তাঁহার অধ্যাত্ম অহিংসার বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে সার্থকতার প্রশ্ন [illegible] এবং অহিংসা কার্যত কর্মেন্দ্রিয়ের বাহ্য নিরোধের [illegible]। অন্তরে সে আলো না জ্বলিবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। [illegible] প্রকাশক বলিয়াছেন—"অবসর পুরুষ বা জীবন্মুক্ত পরমহংস [illegible] অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্পন্ন ঈশ্বরজানিত মহা-[illegible] যাঁরা, তাঁদের কথা আলাদা, তাঁরা নিত্য মুক্ত [illegible] তাঁদের নিকষে গান্ধীজীকে আমরা ঘষিয়া [illegible] তাই বলিয়া গান্ধীজীর চরিত্রে অসাধারণত্ব যে কিছুই নাই, এমন [illegible] না।" প্রকাশক, গান্ধীজীর সম্পর্কে বিচারের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর উপর অবিচার করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের মনে হইল। তিনি 'দেশ ভৈরব' কাহাদিগকে বলিয়াছেন বুঝিলাম না; কিন্তু তাঁহার উক্তি মত বাঙলা দেশের কেহ যে মহাত্মাজীকে 'দুরাত্মা' বলিয়া মনে করেন, আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে, মহাত্মাজীর আহ্বানে এই বাঙলা দেশ একদিন যে সাড়া দিয়াছিল, মহাত্মাজীর বারদোলীও তেমন সাড়া দিয়াছিল কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। ত্যাগের মর্যাদা বাঙ্গালী চিরদিনই দিয়াছে, এখনও দিয়া থাকে; সুতরাং মহাত্মাজীর ত্যাগময় জীবন বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেই, তার্কিকতা বা দার্শনিকতার বিচারে সে সত্য ক্ষুণ্ণ হইবে না।

দুই বিঘা জমি:—শ্রীবিধুভূষণ বসু। মূল্য দশ আনা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবিধুভূষণ বসু, বিষ্ণুপুর, খুলনা।

গ্রন্থকার একজন প্রবীণ লেখক এবং সাহিত্যিক। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সাংবাদিকতার ভিতর দিয়া সাধারণের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। একটা স্পষ্টবাদিতা এবং নির্ভীক স্বদেশপ্রেমিকতা বিধুবাবুর লেখার বিশেষত্ব। আলোচ্য পুস্তকখানি একটি নারী-ভূমিকাবর্জিত নাটক। রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' শীর্ষক প্রসিদ্ধ কবিতাটিকে কেন্দ্র করিয়া এই নাটক লিখিত হইয়াছে। এই নাটকের ভিতর লেখক যে তাঁর দীপ্ত দেশপ্রেমের আগুন ছড়াইয়াছেন, আধুনিকদিগকে তাহা কতটা আকর্ষণ করিবে জানি না; তবে স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত এই নাটকখানি স্কুল কলেজের ছেলেদের মধ্যে বেশ চলিতে পারে, এবং তাহা যদি চলে তবে আমরা সুখী হইব। ছেলেদের মধ্যে এই পুস্তকের প্রচারে তাহাদের চিত্ত উন্নত হইবে এবং তাহাদের মধ্যে দেশপ্রেম সুদৃঢ় হইবে।

মন্থরা (নাটিকা):—শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। বাগেরহাট সাধনা প্রেস হইতে শ্রীশিবেন্দ্রনাথ দেব কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।

রামায়ণের মন্থরা চরিত্র অবলম্বন করিয়া নাটিকাটি লিখিত। গ্রন্থকার মন্থরার চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া অত্যাচার এবং অনাদরের বিরুদ্ধে নারী-অন্তরের বিদ্রোহ রূপটি উন্মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নাটিকাটি পুরুষ-ভূমিকাবর্জিত। বর্তমানে সমাজের অনাদরের বিরুদ্ধতার ভাবটি নাটিকায় পরিস্ফুট হইয়াছে।

সনাতন নাম সাধনা:—শ্রীনরেশ ব্রহ্মচারী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশক—[illegible] শ্রীমান উদয়রাজজী সিংহ, শিবগড় রাজ্য (রায় বেরেলী)। মূল্য বারো আনা মাত্র।

নামকে অবলম্বন করিয়া ভাগবত সাধনার সংকেত এই পুস্তকে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সাধন-পদ্ধতি সার্বভৌম এবং সনাতন সাধনা। শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। লেখক শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ এবং তদীয় শিষ্য শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর প্রদর্শিত ব্যবস্থাকে পুস্তকখানির আশ্রয়স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাত্ম-রস-পিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। ছাপা কাগজ সুন্দর।

জীবনের লক্ষণ—

আগের বারে জীবনের আরম্ভ সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। প্রথম যে কোষ পৃথিবীতে উৎপন্ন হ'ল, তা' যে জীবনেরই নামান্তর তা আমরা কেমন করে জানতে পারবো? অথবা জীব ও জড়ের মধ্যে তফাৎ কি?

কি কি গুণ থাকলে বস্তুকে জীব বলা হয় তা আমরা একে একে বলব।

(১) শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের ক্ষমতা। বাতাস থেকে অম্লজান (oxygen) গ্রহণের এবং সেই অম্লজানকে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে তৎপরিবর্তে অঙ্গার-অম্ল (Carbon dioxide) নামক বায়বীয় পদার্থ নির্গত করে দেবার উপায়কে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বলে। জীবের নির্দিষ্ট তাপ আছে. সেটা শক্তির একটা রূপ এবং দেহের মধ্যে যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে থাকে, তার ফল। অম্লজান দেহের ভিতরে গিয়ে গ্লুকোজ্ (এই পদার্থের সহিত সকলেই বোধ হয় পরিচিত। ইহা এক প্রকারের শর্করা। আঙ্গুরের রসে বর্তমান।) নামক পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক উপায়ে মিলিত হয়। ফলে অঙ্গারাম্ল এবং শক্তির উৎপত্তি ঘটে। অঙ্গারাম্ল দেহ থেকে বের হয়ে যায় এবং শক্তির ফলে দেহের তাপ অক্ষুণ্ণ থাকে।

বায়ুমণ্ডলে অম্লজান বেশী মাত্রায় থাকায় মৎস্য প্রভৃতি জলচরের পক্ষে বায়ু থেকে অম্লজান গ্রহণ করা কষ্টকর, এক এক সময় অসম্ভব। সেই জন্য জলে যেটুকু বায়ু দ্রবীভূত হয়, তা থেকেই অম্লজান গ্রহণ করে জলচরেরা। সেই রকম অধিকাংশ স্থলচরের পক্ষে জলের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ অসম্ভব হয় জলে বায়ুর অল্পতা হেতু।

প্রথমেই সকলের মনে হতে পারে যে অম্লজান বুঝি জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু কোনও মানুষ বা স্থলচর যদি জলে ডুবে যায়, তবে কিছুক্ষণ অন্তত তার দেহের কাজ ঠিক্ চলে। তখন দেহে শক্তি জোগাবার জন্য অম্লজানের অভাবে দেহের একাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। নিম্ন শ্রেণীর বহু প্রাণী অম্লজান ব্যতিরেকে অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে। এরূপ জীবনকে বলা হয় বাতাস ব্যতিরেকে জীবন (anatrobiosis)। দেখা যাচ্ছে যে অম্লজান জীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু অপরিহার্য নয়।

(২) বৃদ্ধি। জড়েরও বৃদ্ধি আছে, তার একটা উদাহরণ দিই। যদি কোনো বস্তুর একটি স্ফটিককে (ধরুন তুঁতের একটা স্ফটিক—crystal) ঐ বস্তুর এক জলীয় দ্রাবণে (aqueous solution) একটা সুতার সাহায্যে ডুবিয়ে রাখা হয়, তবে বোঝা যাবে স্ফটিক ক্রমশ, অবশ্য অতি ধীরে, আকারে বড় হচ্ছে। জীবের বৃদ্ধি এত সহজ উপায়ে ঘটে না। বহু রকমের ক্রিয়ার সাহায্যে জীবের বৃদ্ধি হয়।

(৩) গতি। জীব মাত্রেই গতিশীল। গাছের প্রাণ আছে, কিন্তু আপাতঃদৃষ্টে মনে হবে উহা গতিহীন। সকল জীবেরই উপাদান কোষ। এই কোষ যেমন মানব দেহে আছে, সেই রকম গাছেও আছে। অবশ্য গাছের কোষ এবং মানুষের কোষের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। এই কোষে গতি সুস্পষ্ট। প্রথম যে কোষ পৃথিবীতে উৎপন্ন হোয়েছিল, খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্ত অথবা বিপদ হ'তে রক্ষা পাবার জন্য সেই কোষকে গতিশীল হ'তে হয়েছিল। সেই গতিই এখন সকল প্রাণীরই একটা গুণ।

(৪) একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানো জীবের একটা লক্ষণ। মানুষের কথাই ধরা যাক্। গ্রীষ্মমণ্ডলের মানুষ যে আবহাওয়ায় অভ্যস্থ, সে আবহাওয়া হিমমণ্ডলে সম্ভব নয়। কিন্তু সে মানুষের পক্ষে হিমমণ্ডলে বেঁচে থাকা অসম্ভব নয়, যদিও প্রবল শীতে তার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। জলা জায়গার একটা গাছকে যদি শুকনো জায়গায় সরিয়ে নেওয়া যায়, তবে সেই গাছ নূতন ব্যবস্থায় বাঁচবার যথেষ্ট চেষ্টা করবে, তার জন্য তার দেহের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন হ'তে পারে। কিন্তু নূতন অবস্থা যদি তার সহনের সীমা অতিক্রম করে, তবে গাছের মৃত্যু নিশ্চিত।

(৫) পুনরুৎপাদন বা নিজ হ'তে নিজের মত জীব গঠন করবার শক্তি জীব মাত্রেরই আছে। পুনরুৎপাদন দুই উপায়ে হ'তে পারে। প্রথম উপায় স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয় উপায় স্ত্রী-পুরুষ ব্যতিরেকে।

পৃথিবীতে বহু রকমের জীব আছে। এদের মোটামুটি উচ্চ শ্রেণী আর নিম্ন শ্রেণী এই দুভাগে ভাগ করা যায়। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর জীবের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ভেদ কিছু নেই। উচ্চ শ্রেণীর জীব স্ত্রী পুরুষের সাহায্যে বংশ বৃদ্ধি করে। এইরূপ উপায়কে বলা হয় Sexual. উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্ন হ'তে পারে অথবা একই জীবে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই থাকতে পারে। শেষোক্ত জীবকে বলা হয় bisexual.

নিম্ন শ্রেণীর কোনও জাতের দুইটি জীব, যেমন দুইটি শ্যাওলা গাছ একত্রিত হয়ে একটি নূতন জীবের সৃষ্টি করে। ঐ দুটি জীবের কোনোটিই স্ত্রী বা পুরুষ নয়। আবার অপর কোনো জাতের একটি জীব নিজেই নূতন জীবের জন্ম দিয়ে থাকে। এটা এককোষী (Unicellular) প্রাণীদিগের মধ্যেই বেশী দেখা যায়, যেমন yeast cell.

ভয়

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ভোর হতে না হতেই মোরগের যুদ্ধে, হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক শব্দে আর সাকিনার বক-বকানিতে ঘুম ভাঙে রজ্জাকের। সকাল বেলাতেই ছোট্ট মেয়েটার সঙ্গে কি আরম্ভ করে দিয়েছে দেখ। আর থাকতে পারে না রজ্জাক, লাফ দিয়ে উঠে বলে, 'জ্বালাতন কইরা খাইল, কি হইছে কি, ঘুমাইতে দিবি না মাইন্ষেরে?'

সাকিনা ফোঁস করে ওঠে, 'নবাব আমার, ঘুমাইয়া আর সাধ মেটে না। রাইত কি এখন পোয়াইছে নাকি? যাও যাইয়া কামলা খাট গিয়া মাইন্ষের বাড়িতে। ছাইর‍্যা দাও ঘোড়ার ডিমের চাকরী। পেটের ভাত জোটে না, চাকরী করেন বাবু।'

কথায় কথায় এই খোঁটা দেওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে সাকিনার। মাইল দুয়েক দূরে এক চৌকি আছে, সেখানে রজ্জাক দলিল লেখে। মুহুরী অনেক, মক্কেল কম। রজ্জাকের হাতের লেখা দুর্বোধ্য বলে লোকে আরো কম ঘেঁষে। কাজ করে পয়সা আসে না। কিন্তু রজ্জাক কিছুতেই অন্য কাজ ধরবে না। বংশ তাদের অভিজাত। গাঁয়ের মধ্যে কাজী-বংশের মত এমন সম্ভ্রান্ত বংশ আর নেই। কিন্তু আভিজাত্যের ছাপ রজ্জাকের চেহারাতেই যা একটু আছে, অন্য কোথাও তা চোখে পড়ে না। ঘরের সব আসবাব-পত্র অদৃশ্য হয়েছে। মাঠের জমিজমা অবশ্য মাঠ থেকে নড়েনি, কিন্তু নড়ে আসতে হয়েছে রজ্জাককে। জমির মালিক আজকাল পশ্চিম পাড়ার সাহা-রা।

লোকে বলে বাঘের পেটে বাঘডাসা জন্মেছে। অবশ্য তার বাপের আমল থেকেই অবস্থা পড়ে আসছিল। কিন্তু যেটুকু ছিল, তা রহিম কাজী বাঘের মতই আগলে রেখেছে। সব খুইয়েছে রজ্জাক। কিছুটা গেছে বুদ্ধির দোষে, কিছুটা আলসেমিতে। রজ্জাকের ঠাকুরদার ছিল কিনবার নেশা, রজ্জাককে পেয়েছে বিক্রির নেশায়। যা কিছু দেখে, তাই সে বিক্রি করে। এখন বাকি আছে ঘরের ওপরের টিন ক'খানা আর ভিতরে স্ত্রী সাকিনা, আর পাঁচ বছরের মেয়ে ময়না।

রজ্জাককে কেউ গ্রাহ্য করে না, কেউ ভয় করে না তাকে। তাই বলে ঘরের স্ত্রীও এমন অবজ্ঞা করবে? 'অবশ্য জোয়ান পুরুষের চেহারা রজ্জাকের নয়। সাহা-পাড়ার ছেলেদের মত সুন্দর গৌরবর্ণ আর মেয়েলি ধরণের চেহারা। পাড়ার লোকে এ নিয়ে ছেলেবেলায় অনেক ঠাট্টা করেছে তাকে। মুসলমানের ছেলে ত রজ্জাক নয় যে মুসলমানের মত চেহারা হবে। তবু এই চেহারা নিয়ে অহংকারের অন্ত ছিল না রজ্জাকের। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, যে বাড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যায়, মেয়েরা যে তার দিকে ঘোমটার আড়াল থেকে একবার না চেয়ে থাকতে পারে না, তা রজ্জাক জানে। প্রথম প্রথম সাকিনার সেই মুগ্ধ দৃষ্টির কথাই কি রজ্জাক কোনদিন ভুলতে পারবে? রজ্জাক অনেকবার ধরে ফেলেছে সাকিনাকে, 'দেখছ কি অমন কইরা?'

সাকিনা লজ্জিতভাবে চোখ নামিয়ে নিয়ে মৃদু হেসেছে। কিন্তু সে সব দিন আর নেই।

কথা শোন! সে যাবে কামলা খাটতে। সাকিনার কথার জবাবে রজ্জাক বলল, 'তাই বইল্যা বংশে যা কেউ করে নাই, তাই করতে যাব নাকি তোর কথা মত? কামলা খাটলে শরীরের থাকে নাকি কিছু?'

সাকিনা বলল, 'শরীর, শরীর কইর‍্যাই তো গেলা। রূপ নিয়া কি ধুইয়া খাব?' তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বয়জা দিলি?'

ডিমটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে ময়না করুণসুরে বলে, 'এ বয়জা আমার, আমি পাইলাম যে মা। ছালন রাইন্ধা দিও আমারে।'

সাকিনা ভেংচাইয়া বলে, 'ঈস আমার সোয়াগীরে! পয়সা পয়সা বয়জাডা ওয়ারে ছালন রাইন্ধ্ দেব।'

রজ্জাক বলে, 'দিলাই না একদিন একটা বয়জা; চায় যখন মাইয়াতো'।

সাকিনা জবাব দেয় 'থাউক, আর সোয়াগের দরকার নাই।' ডিম আর মুরগী বেচে সাকিনা সংসারের অর্ধেক খরচ জোগাড় করে।

কিন্তু ময়না কিছুতেই ছাড়বে না, নাকিসুরে একটানা কান্না আরম্ভ করে। বিরক্ত হয়ে রজ্জাক মেয়েকে ধমক দেয়, 'এই ময়না থামলি?'

ধমকের বহর দেখে সাকিনা মুচকি হাসে। সঙ্গে সঙ্গে ময়নাও হাসে।

প্রথম প্রথম ভয় পেলেও আজকাল আর তত ভয় করে না ময়না তার বাপকে। পাঁচ-ছ' বছর হলে কি হবে, চালাক সে তার মার মতই। সংসারে তার বাপের অবস্থা এর মধ্যেই সে বুঝে ফেলেছে। মা আর মেয়ের হাসি দেখে রজ্জাকের পিত্ত জ্বলে গেল। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে কসে এক চড় মারল ময়নার গালে। ময়না সামলাতে না পেরে ঘুরে পড়ে গেল। পাঁচ আঙুলের দাগ তার কোমল গৌরবর্ণ গালে জ্বল জ্বল করতে লাগল।

সাকিনা এল তেড়ে 'মারল্যা ক্যান্ মাইয়াডারে?'

ভালো, মেয়েকে আদর কি শাসন, কিছুই করবার অধিকার নাই রজ্জাকের? মেয়ে কি কেবল সাকিনারই, রজ্জাকের কেউ নয়?

রজ্জাক বলল, 'মারব না? মাইর‍্যা মাইর‍্যা এখন থিকাই সোজা রাখতে হবে। নইলে তোর মত নচ্ছার মাগী হবে বড় হইয়া ভয় করবে না পুরুষ মাইন্ষেরে। কুত্তার জাইতেরে নাই দি দিয়া ভুল কইর‍্যা ফেলাছি, আর কি এমন কর্ম করি?'

সাকিনা জোর করে মেয়েকে রজ্জাকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। হঠাৎ রজ্জাক বলে উঠল, 'উঃ'।

সাকিনা হেসে বলল, 'কি হইল।'

রজ্জাক ডান হাতের মণিবন্ধটা একটু উঁচু করে দেখাল, 'দেখ, দেখি কি করলি।'

অপ্রতিভ হ'ল সাকিনা। বড় বড় নখ ছিল তার আঙুলে। কাড়াকাড়ি করবার সময় কখন একটু নখের আঁচড় লেগে রজ্জাকের হাতটা সামান্য ছড়ে গিয়েছে। রক্তও বেরিয়েছে দু'-এক ফোঁটা।'

গভীর লজ্জা ফুটে উঠল সাকিনার চোখে। অপ্রতিভ-াবে একটু হাসল সাকিনা, তারপর বলল, 'ইস্ তাইতো খুন ইয়া গেছেত একেবারে—বুকে হাত দিয়া দেখি বাঁইচা আছে না।"

এবারে রজ্জাক সজোরে ঠাস করে এক চড় মারল াকিনার গালে। সাকিনা এক মুহূর্ত একটু স্তব্ধ হয়ে রইল, ন্তু পরক্ষণেই হেসে উঠল খিল্ খিল্ করে। যেন একটুও র লাগেনি, যেন রজ্জাক কেবল তামাসা করছে। হাসতে সতেই বলল, 'কচু গাছ কাট্তি কাট্তি ডাকাইত হইয়া বা ঠাওরাইছ বুঝি?'

কিন্তু দ্বিতীয়বার চড় তুলতেই সাকিনা একটু পিছিয়ে াল, 'খবরদার হাত তোল পাছে আমার গায় ভাল হইবে না য়া রাখলাম। হামিদ মুন্সীর মাইয়া আমি—মনে রাইখ াডা।' সাকিনার চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। রজ্জাক থেকেই চেঁচিয়ে বলল 'বাইর হ, বাইর হইয়া যা আমার ঢ় গুনা।' সাকিনা বলল, 'ঈস্'।

কিন্তু সেদিন রাত্রে রজ্জাক কাউকে না জানিয়ে নিজেই র দুঃখে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। যে স্ত্রী ভয় করে না, ক নিয়ে ঘর করবার মত বিড়ম্বনা আর নেই। সুন্দর ারা আর কোমল স্বভাবেও যদি রজ্জাক এমনি গৃহ আর ৃণীর মত ত্যাগ করে যেতে পারত সে আর কিছু চাইত পৃথিবীতে।

ছ'বছর পরে আবার রজ্জাক ফিরে এল নিজের বাড়িতে। াত নয় ডাকাত ধরা পুলিশ হয়ে সে ফিরে এসেছে। এই ছর ইচ্ছা করেই স্ত্রী কন্যার কোন খোঁজ করেনি সে। ্রে চাটগায় প্রেমের চেয়ে অর্থ আর ক্ষমতার নেশাই তাকে য় বসেছিল। আর কাঞ্চন একবার জুটলে পৃথিবীতে নীর অভাব হয় না। তারপর বহুদিন পরে স্ত্রী আর ার কথা তার মনে পড়ে গেছে। ক'দিনের ছুটি নিয়ে াক চলে এসেছে; সাকিনা আর ময়নাকে কর্মস্থলে নিয়ে ।

পরনে খাকির সুট, মাথায় বড় একটা সোলার টুপি, ে বন্দুক, পায়ে দামী বুট রজ্জাককে আর চিনবার জো নেই। ' ব্যাটারিওয়ালা বড় একটা টর্চ ফোকাস করতে করতে াপথে মট মট শব্দ করে এগিয়ে চলল রজ্জাক। বাড়িতে দিতেই একটা নেড়ী অস্থিসার কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে তে এগিয়ে এল। মহাবিরক্ত হয়ে ধাক্ করে এক লাথি ল রজ্জাক। মনে হল কুকুরটার পাঁজরা যেন ভেঙে পড়েছে। তীব্র আর্তনাদ করে কয়েক পা পিছিয়ে এল কুকুরটা। ময়না দাওয়া থেকে মুখটা একটু বাড়িয়ে বলল 'কেডারে, আমাগো কুত্তা মারলো কেডা।' কিন্তু রজ্জাককে দেখেই অস্ফুট চীৎকার করে মুখ ফিরিয়ে নিল, 'দেখ মা কোন্ জাগা গুনা এক সায়েব আইছে আমাগো বাড়িতে।'

রজ্জাককে দেখে মা আর মেয়ে দুজনেই দাওয়া থেকে ঘরে যেতে চেষ্টা করল।

রজ্জাক ততক্ষণ এগিয়ে এসে টর্চ ফোকাস্ করে ধরেছে দুজনের মুখের ওপর। তার তীব্র আলোয় সাকিনার ঘরের কেরোসিনের শিখা ঢেকে গেছে। রজ্জাক হেসে বলল, 'পলাও ক্যান্ বিবিজান, তোমরা চোর না ডাকাইত যে পুলিশ দেইখা পলাবা। আমি রজ্জা।'

রজ্জাক! এতদিন পরে সাকিনার সেই স্বামী ফিরে এসেছে যার জন্যে চোখের জল সাকিনার একদিনও বিরাম মানে নি। প্রত্যেক মাসে গাজীর দরগায় সাকিনা সিন্নির পয়সা পাঠিয়েছে, গোপনে হিন্দুর কালী মন্দিরে ভোগ দেওয়ার জন্য পয়সা দিয়ে এসেছে! এই মিলনের দিনেও চোখ ফেটে জল বেরুল সাকিনার। এই ক বছর কি কম কষ্টে কেটেছে তার। রজ্জাক নিরুদ্দেশ হতে না হতেই বুড়ো বাপ গেল মারা। দেখবার আর কেউ রইল না, কিন্তু লোভ দেখাবার রইল অনেকেই। মতি মিঞা কাল পর্যন্ত ফিস ফিস করে গেছে, 'তোমার কোন কষ্ট থাকবে না সাকিনা, তোমার মাইয়ারও আমি খুব ভাল সম্বন্ধ কইরা দেব।'

সাকিনা বলেছে, 'অমন কথা মুখেও আইনো না মতি মিঞা, জানোতো কার মাইয়া আমি। পোলাপানের জন্য দুইটা বয়জা যদি চাও তো নিয়া যাও, তোমার পয়সা লগবে না।' মতি মিঞা অর্থপূর্ণভাবে হেসেছে, 'আরে বয়জা নিয়া করব কি রাঙ্গাবিবি, একেবারে মুরগী সুদ্ধা নিয়া যাইতে চাই, কালে কত বয়জা পাব।'

সকালের দিকে রজ্জাক পাড়াপড়শীর সঙ্গে দেখাশুনা করতে বেরুল। মাজায় লাল তাগা বাঁধা উলঙ্গ সব ছেলে-মেয়ের দল। ম্যালেরিয়ায় অনেকেরই হাড় বেরিয়েছে। দূরে থেকে ঈষৎ ভয় ঈষৎ কৌতুহলের সঙ্গে সমস্বরে সব বলে উঠল, 'ইরে সায়েব আইছেরে, সায়েব আইছে।' রজ্জাক খুসি হয়ে সুন্দর দেখে দু'একটি ছেলের গাল টিপে দিল, পয়সা দিল প্রত্যেককে একেকটি করে। সমবয়সী কৃষকদের আর কামলাদের ঘাড় চাপড়ে দিল। তারপর দুপুরের লঞ্চে স্ত্রী কন্যা নিয়ে জেলা শহরের দিকে রওনা হল রজ্জাক। সেখান থেকে খানিকটা ট্রেনে যেতে হয়, তারপর স্টীমারে দীর্ঘ জল-যাত্রা।

নদীর ধারে থানা। অফিস ঘরের ঠিক লাগাই রজ্জাকের কোয়ার্টার। নীল পর্দা তুলে সাকিনা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। নানা রকমের লোক আসে। কেউবা জোয়ান, কারো হাড় দেখা যায়। মাঝে মাঝে দু'চারজন ভদ্রলোকের সুন্দরপানা ছেলেও আসে। চোখে মুখে অটুট তাদের সঙ্কল্প। রজ্জাক নিষ্ঠুরভাবে নিজে তাদের ঠেঙায়, অশ্লীল সব গালাগালি করে। তার মত সুপুরুষের মুখে ভারী বিভৎস শোনায় এসব। কিন্তু রজ্জাককে দেখে মনে হয় সে যেন ক্ষুদে লাল পিঁপড়ে

দলকে পা দিয়ে পিষে মারছে। নিজের নিষ্ঠুরতাকে সে উপভোগ করছে যেন। একদিন এল বর্ষীয়সী একটি মেয়েমানুষ। কাব নামে কি সব নালিশ করতে এসেছে। ইতরভাবে তাকে অপমান করল রজ্জাক। মেয়েমানুষ দেখলে সে আরো যেন ক্ষেপে যায়।

সাকিনা আর ময়না থর থর করে কাঁপতে থাকে কখন কি হয়, কখন কি করে বসে রজ্জাক। একে যেন তারা চেনে না। এ সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। রজ্জাক তা দেখে অভয় দেয় 'তোমরা চোরও না, বদমাইসও না, তোমরা ভয় পাও ক্যান। এমন ভয় তো ভাল কথা না, ধোঁকা জম্মাইয়া দেয় মনে। বলি এতকাল খাঁটি ছিলা তো বিবিজান? বুকে হাত দিয়া কও দেখি? মেয়ের সামনেই এসব কথা রজ্জাক বলে সাকিনাকে। লজ্জায় সাকিনার মরে যেতে ইচ্ছা করে। বার বছরের আজকালকার মেয়ে—না বোঝে কি!

রজ্জাক যে রাগ করে এসব বলে না তা সাকিনা বুঝতে পারে। তার আদর সোহাগ জানাবার ভঙ্গিই হয়েছে এই। তাই তার আদারকে সাকিনা যেন আরো বেশী ভয় করে। রজ্জাক ঘরের মধ্য দিয়ে ঘোরা ফেরা করলে, কি—হঠাৎ কোন কথা বললে সাকিনা চমকে ওঠে। সাকিনার ভাব দেখে রজ্জাকও বিস্মিত হয় কিন্তু কারণ বুঝতে পারে না।

সেদিন পূর্ণিমা। সন্ধ্যা লাগতে না-লাগতেই বড় হয়ে চাঁদ উঠেছে আকাশে। থানায় কোন কাজ ছিল না। সমস্তদিন বসে বসে রজ্জাক একখানা প্রেমের উপন্যাস পড়ে কাটিয়েছে। বর্ষার জল অনেক উঁচু হয়ে উঠেছে আর একটু বাড়লে একেবারে থানার উঠানে উঠে আসবে। দেখে দেখে হঠাৎ সমস্ত মন রজ্জাকের বিষণ্ণ অস্থির হয়ে উঠল। রজ্জাক ফিরে এল বাসায়। ময়না মেজ দারোগার বাসায় গেছে বেড়াতে। ঘরে আজ সাকিনা একা। হঠাৎ—নিজের প্রাইভেট কামরায় ঢুকে রজ্জাক তার পুলিশের বেশ সম্পূর্ণ খুলে ফেলল। পাড়াগাঁয়ের মানুষ ডাকাতের চেয়েও পুলিশকে বেশী ভয় করে। নীল একখানা লুঙ্গি টাঙ্গানো ছিল ঘরের এক কোনে, ঠিক যেমনটি পরত রজ্জাক গ্রামে থাকতে। লুঙ্গিখানা সে পরল। গায়ের গেঞ্জিটাও খুলে রেখে দিল। গ্রামে কোন গেঞ্জি ছিল না। আয়নায় নিজের শরীরের দিকে একবার চেয়ে দেখল রজ্জাক। ঠিক তেমনি নিটোল মসৃন গৌরবর্ণ দেহ। তবে একটু যেন রক্তাভ হয়েছে। কেন যে হয়েছে তা রজ্জাক জানে। বহুকষ্টে অনেকদিনের অভ্যাসটাকে আজ সে জয় করল। তারপর ঢুকল গিয়ে সাকিনার ঘরে। সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিল। হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকে উঠল। আজও সাকিনার ভয়। ভারি ক্ষুব্ধ হল রজ্জাক। তবু ধীরে ধীরে গিয়ে একেবারে কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল সাকিনার। সাকিনা আরও আঁতকে উঠল। রজ্জাক বলল 'যা ভাবছ তা নয়, আইজ মদ খাইয়া আসি নাই সাকিনা।'

আচরণ দেখে তা অবশ্য বোঝা যায় না। সাকিনা বলল, 'সে জন্য না। মাইয়াডা আইসা পড়তে পারে, সন্ধার সময় কি লাগাইলা। রজ্জাক বলল, 'রাইখা দাও তোমার মাইয়া। একেবারে লজ্জাবতী লতা হইছ দেখি—রাখাল চক্রবর্তীর বিধবা মাইয়'ডার মত, যে এবার প্রথম নাম লেখাইছে আইসা বাজারে।"

এ কি—এসব কী বলে বসল রজ্জাক। এসব তো অন্য সে বলতে চায়নি। কোন ভয়ের কথা নয়, কোন ইতর/কথা নয়, আজ সে প্রেম নিবেদন করবে গ্রামের সেই মেয়েটির কাছে যার চোখে ছিল মুগ্ধতা, ছিল কৌতুকা আর কৌতুহলের আলো। কিন্তু এসব কী তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। রজ্জাকের মনে হল—সে সত্যিই বীভৎস পশুর সামিল হয়ে গেছে। নিজের কথা ভাবতে নিজেই সে আঁতকে উঠল। কিন্তু তাকে এই পশুত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারে একমাত্র সাকিনা। আগের মত সোহাগে চুম্বনে সাকিনাই সেই আগের মানুষটিকে ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু মুগ্ধ দুইটি চোখ নিয়ে কোথায় সেই সাকিনা? দূরে দাঁড়িয়ে থরথর করে সে কাঁপছে, কাছে আসতে সাহস করছে না। তার চোখ ভরে অন্ধকারের মত বোবা ভয় শুধু ছেয়ে রয়েছে। ' হঠাৎ রজ্জাক গাঢ়ভাবে সাকিনাকে আলিঙ্গন করে ধরল,' তোমার পায়ে ধরছি সাকিনা, আমারে ভয় কইর না, আমারে মোটেই ভয় কইর না।' সাকিনা কোন জবাব দিল না, এও তার মাতলামি ভেবে বিবর্ণমুখে স্বামীর বাহু বেষ্টনীর মধ্যে তেমনি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

ময়না তার বেণী দুলিয়ে ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছিল, রজ্জাকের কান্ড দেখে লজ্জায়—ভয়ে ছুটতে ছুটতেই পালিয়ে গেল।
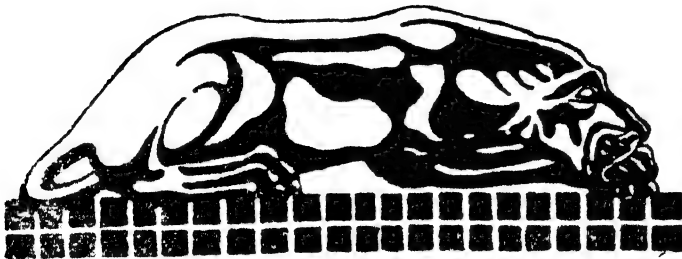
ইরাণীয় শিল্পের ঐতিহাসিকতা

ভবানী পাঠক

এসিয়া মহাদেশের শিল্পকলার ইতিহাসে ইরানী রীতির ছাপ প্রায় সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। চীন ভারত ও ইরান—এই তিন সংস্কৃতি সম্পন্ন দেশে একদিন স্বতন্ত্রভাবে শিল্পকলার প্রভূত উৎকর্ষ হয়েছিল। প্রত্যেকটি দেশ নিজ নিজ বিশিষ্ট পদ্ধতির দাবী করতে পারে। আগে একটা অভিযোগ শোনা যেত যে য়ুরোপে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বারবার সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। তার ফলে য়ুরোপের দেশে দেশে 'রেনেসাঁস' জাতীয় শিল্পকলার প্রগতিশীল এক একটি অধ্যায় দেখা দিয়েছে। ইংলন্ড প্রেরণা পেয়েছে ইতালীর কাছে, রুশিয়া পেয়েছে ফ্রান্সের কাছে এবং স্পেন পেয়েছে গ্রীসের কাছে। এসিয়ার কারু-কলা বা সংগীত নৃত্য প্রভৃতি যে কোন রম্য শিল্পের চর্চায় এসিয়া মহাদেশে এরকম সমন্বয় হয়েছিল কি না, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে অনুসন্ধান করা হয় নি। আগে ধরে নেওয়া হোত যে এসিয়ার বিভিন্ন দেশের আর্ট নিজ নিজ ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই অনুমানের পেছনে সত্যের কোন ভিত্তি নেই। এসিয়া মহাদেশের কালচার স্থানুবৎ গতিহীন—এটা নিন্দুকের কথা মাত্র।

একটু প্রাচীন কালের ভারতীয় শিল্পকলার গতি প্রগতি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বুদ্ধোত্তর ভারতের চিত্রশিল্প, নৃত্য, সংগীত, রূপকথা ও ভাস্কর্য ভারতের পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করে সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং মহাচীনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব অনুন্নত দ্বীপময় দেশে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, সে সর্ব স্থানে ভারতীয় পদ্ধতি হুবহু আচরিত হয়েছে। কারণ এই সব দেশে উন্নত সংস্কৃতি ছিল না। সভ্য ভারতের উপনিবেশ পত্তনের ফলে সেই সব দেশকে সমগ্র ভারতীয় পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। কাজেই এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বা শিল্পগত কোন সমন্বয় হয় নি।

কিন্তু মহাচীনে ভারতীয় শিল্প পদ্ধতির প্রচারের ফলে সেখানে এক সমন্বয়ের রূপ ফুটে ওঠে। সুসভ্য ও শিল্পসমৃদ্ধ মহাচীনে তাদের একটি নিজস্ব পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। চীনের বহু পুরাতন চৈত্য গৃহে ও গুহার ভেতর দেওয়ালে আঁকা রঙীন চিত্রগুলির মধ্যে এই চীন-ভারত পদ্ধতির সুষ্ঠু সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধোত্তর যুগে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পদ্ধতির কিছু প্রচলন হয়েছিল। কিন্তু নিতান্ত ধর্মগত সংঘগুলির ভেতর দিয়ে এই শিল্পের প্রসার ও প্রচার সেরকম সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। মধ্য এসিয়ার ভারতীয় শিল্প শুধু ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ভেতর আবদ্ধ থাকার ফলে সেখানে এই শিল্প লোকময় হতে পারে নি। যাভা, বলি, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপময় দেশে ভারতীয় শিল্পরীতি এতখানি প্রতিষ্ঠালাভ করে যে,

ষষ্ঠ শতাব্দীর সাইবেরিয়ার স্বর্ণনির্মিত গ্রোটেস্ক—শক স্টাইল

সে সব রীতি তার আদি অধিষ্ঠান ভারত ভূমি থেকে বহুদিন আগে লুপ্ত হয়ে যাবার পরেও উপনিবেশ ভূমিতে তারা আজও বেঁচে আছে। এখনও সুমাত্রা দ্বীপের গাঁয়ে গাঁয়ে কুম্ভকার শ্রেণীর মত ভাস্কর শ্রেণী আছে। এরা জাত ভাস্কর! চৌদ্দ বছরের সুমাত্রার ছেলে ঘরে বসেই হাতুড়ি বাটালি নিয়ে শাস্ত্রীয় রীতি সঙ্গত নানা হিন্দু দেব দেবীর মূর্তি গড়তে পারে।

তারপর ইরানের কথা। কিছুদিন আগে ইরানে ব্যাপকভাবে নানা স্থানে খনন কার্যের ফলে বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে বহু বিচিত্র পদ্ধতির শিল্প সামগ্রীও পাওয়া গেছে। এই সব প্রাচীন ইরানীয় শিল্পসামগ্রীর গঠনভঙ্গী ও আধুনিক পদ্ধতির আলোচনা করে দেখা গেছে যে কোন না কোন কালে এসিয়া মহাদেশের প্রায় সর্বত্র ইরান থেকে কলানুশীলনের রীতি নীতি ও প্রেরণা পেঁাছেচে।

১৯৩৬ সালে লেনিনগ্রাডে ইরানীয় শিল্পকলার এক বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ইংলন্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার বিভিন্ন মিউজিয়ম ও আর্ট গ্যালারী থেকে হাজার রকমের ইরানীয় শিল্পের নমুনা প্রেরণ করা হয়। তা ছাড়া সোভিয়েট দেশ থেকেই অজস্র ইরানীয় শিল্প সংগ্রহ করা হয়েছিল। সাইবেরিয়া, জর্জিয়া, তুর্কমানিস্থান, আর্মেনিয়া ও ককেসাস অঞ্চলের বিভিন্ন মিউজিয়াম থেকে আরও নানা ইরানীয় কারুশিল্পের নমুনা সংগৃহীত হয়ে লেনিনগ্রাড প্রদর্শনীতে একত্রিত করা হয়।

সমস্ত নিদর্শনগুলি একত্র করে গুনলে বোধ হয় সংখ্যায় পঁচিশ হাজারেরও বেশী হবে। ইরানের প্রাচীনতম শিল্পনিদর্শন থেকে শুরু করে আধুনিকতম নিদর্শন, সব কিছুই এর মধ্যে স্থান পেয়েছিল। সময়ের হিসাব যদি ধরা যায় তবে বলতে হয় খৃঃ পূঃ চার হাজার বছর আগের সময় থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইরানের বিচিত্র শিল্পকলার লুপ্ত বা প্রচলিত বহু নিদর্শনের সমারোহ হয়েছিল এই প্রদর্শনীতে। এত বড় যুগ ধরে বিস্তৃত শিল্প সাধনার রূপের মধ্যে আমরা এসিয়ার শিল্পসাধনার প্রাণময় স্বরূপের পরিচয় পাই।

পনের শতকের য়ুরোপের সভ্যতার দিকে লক্ষ্য করলে কি দেখতে পাওয়া যায়? সমুদ্রচারী য়ুরোপীয় অভিযাত্রিকের দল নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করছে। য়ুরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান নানা নূতন নূতন গ্রহনক্ষত্রের অস্তিত্ব ও পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হচ্ছে। অনুসন্ধিৎসু য়ুরোপের প্রতিভা নিজের সঙ্কীর্ণতায় লজ্জিত হচ্ছে এই ভেবে যে কত কিছু জ্ঞান ও সত্য তাদের কাছে এত দিন অপ্রত্যক্ষ ছিল। ভৌগোলিক আবিষ্কারের তাড়নায় য়ুরোপীয়েরা পেল অনেক পুরাতন সংস্কৃতি ও সভ্যতার সন্ধান। সেই সব প্রাচীন সভ্যতার সমৃদ্ধ রূপ ও ঐশ্বর্য দেখে তারা বিস্ময় মানলো মনে মনে। নূতন নূতন জগতের মানুষের বুদ্ধির উৎকর্ষ ও প্রতিভার কীর্তি তারা স্বচক্ষে দেখলো। এর ফলে তাদের ঔদ্ধত্য শান্ত করতে হলো। তারা বুঝলো আধুনিক পৃথিবীকে উন্নততর হতে হলে অনেক সাধনার প্রয়োজন। অন্ততপক্ষে অতীতকে ঐশ্বর্যে অতিক্রম না করতে পারলে আধুনিকতার মর্যাদা থাকে না।

তাই গত একশত বছরের ইতিহাস বলতে গেলে শুধু আবিষ্কারের ইতিহাস। সব দিক দিয়ে মানুষের শক্তি সংগ্রহের ইতিহাস। কিন্তু এই নবোপার্জিত শক্তিতন্ত্রের মধ্যে য়ুরোপীয় মানুষ সাংস্কৃতিক সাম্য ও শান্তির একটি সুশোভন স্থৈর্যের আদর্শ খুঁজে পায়নি। শক্তি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির প্রেরণার চেয়ে প্রতিষ্ঠার প্রেরণা য়ুরোপীয় প্রতিভাকে বেশী করে গ্রাস করলো। তাতে সব সময় য়ুরোপীয় প্রতিভা সফল হতে পেরেছে, একথা সত্য নয়। বুদ্ধি ও কর্তব্যের মধ্যে তারা এই সময় যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছিল। এই ভ্রান্তির ফলেই তারা মন দিল ঔপনিবেশিক বিস্তারের দিকে, যা অদূরভবিষ্যতে দেখা দিল কদর্য সাম্রাজ্যবাদের রূপে। সেই ঐতিহাসিক ভ্রান্তি আজ য়ুরোপীয় সভ্যতাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে, পরার্থের অনিষ্ট সাধনা আজ তাদের নিজের ইষ্ট নাশ করতে চলেছে।

যেসব দেশে য়ুরোপীয় অনুসন্ধিৎসুর দল প্রথম এসেছিল,

বিশ্রামরত ঘোড়া ও সওয়ার। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে সাইবেরিয়ার কাঠের কাজ

তাদের উচিত ছিল শিক্ষার্থীর মত প্রাচীন সংস্কৃতির অভিজ্ঞতাকে সশ্রদ্ধভাবে উপলব্ধি করা। কিন্তু তারা ছিল আত্মাদরের বিলাসে ডুবে। য়ুরোপীয়দের আচরণে এইটুকু বোঝা যায় যে তারা এসিয়ার সংস্কৃতিকে অপমান করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল।

এ গেল য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিক পর্বের প্রথম অধ্যায়। কিন্তু আমরা জানি, গ্রীক ক্রীতদাসের কাছে উদ্ধত রোম শিষ্যের মত শিক্ষাগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। বোগদাদের খলিফার আসরে ইরাণী ক্রীতদাসের জ্ঞানের মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছিল সুতরাং য়ুরোপকেও ধীরে ধীরে এসিয়ার বনেদী সংস্কৃতির মর্যাদাকে মেনে নিতে হয়েছিল; যদিও রাজনীতি ও অর্থনীতির দিক দিয়ে তারা দস্যুতাবৃত্তির চর্চাই করে এসেছে।

এসিয়ার সভ্যতার শান্তমহিম প্রকৃতির পরিচয় যদি য়ুরোপ মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পারতো, তবে তারা হয়তো বহু ভ্রান্তি থেকে মুক্তি পেত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপ এসিয়াকে ঘৃণা করে আনন্দ পেতে আরম্ভ

করলো। তারা চাইলো এসিয়ার সম্পদকে শোষণ করতে, তারা যুদ্ধের মত পাঠালো যত নির্বোধ পাদরীদের ধর্মোন্মত্ত এসিয়াবাসীদের কাছে ধর্মপ্রচার করতে। তারা এতই অন্ধ ছিল যে, এই সরল তত্ত্ব কেনমতেই বুঝতে পারলো না—এসিয়া সকল সভ্যতার মাতৃভূমি। শ্রেষ্ঠ যুক্তিবিদ্যা ও জীবনদর্শনের উদ্ভব হয়েছে এসিয়ার গুণী জ্ঞানীদের চিন্তা থেকে। সভ্য য়ুরোপ তার ভাষা, লিপি ও গণিত পেয়েছে এসিয়ার কাছ থেকে। বয়নশিল্প, ধাতুর ব্যবহার থেকে শুরু করে ধর্মতত্ত্ব পর্যন্ত এসিয়া থেকে য়ুরোপে রপ্তানি হয়। সেই ঋণী য়ুরোপ কেন যে উত্তমর্ণ এসিয়ার মানুষকে অপমান করতে উদ্যত হলো তা জাতিমনস্তত্ত্বের এক রহস্য।

আলতাই প্রদেশের কাঠের কাজ

কারুশিল্পের জন্মস্থান এসিয়া। চতুর্দশ শতাব্দীতে শিয়া থেকে সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রে খচিত রেশমী বস্ত্র য়ুরোপে লান যেত এবং সেখানে এই শিল্প অনুকরণের এক প্রচেষ্টা য়। সপ্তদশ শতাব্দীতে য়ুরোপের কুম্ভকারেরা বৃথা চেষ্টা রতো এসিয়ার অনুকরণে পোর্সিলেনের সুচিক্কণ ও সুদৃশ্য জসপত্রাদি তৈরীর জন্য। ভারতের মসলিন য়ুরোপীয় ন্তুবায়দের হতভম্ব করে দিয়ে রোম ভেনিস এথেন্সের বাজার কিয়ে বসেছিল। তা ছাড়া সেদিন মাত্র অর্থাৎ ১৮ শতকে রতের রঙীন ছাপওয়ালা তুলোর সুতোর তৈরী কাপড় রোপের বাজার প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল। ভারতীয় বস্ত্রের ই আক্রমণ থেকে দেশী তন্তুবায় সমাজকে রক্ষা করার জন্য রোপের রাষ্ট্রগুলি ভারতীয় বস্ত্রের আমদানী সম্পর্কে আইন রী করে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে।

য়ুরোপের ঘরে ঘরে এসিয়ার এই শিল্পপণ্যের প্রতিপত্তি রোক্ষভাবে য়ুরোপবাসীকে উপকৃত করে। তারা উন্নত ও ৎকৃষ্ট শিল্প সম্বন্ধে সুরুচি জ্ঞান লাভ করে। এসিয়া থেকে রোপীয় তরী বোঝাই হয়ে নানা সুগন্ধি মসলা তাদের ন্দরে বন্দরে পৌছতো। সেই সুগন্ধের আঘ্রাণ তাদের স্মরণ রিয়ে দিত সাগর পারের এক বিচিত্র রোমান্টিক দেশ এসিয়ার বি। এর মধ্যে যেন তারা এসিয়ার গায়ের গন্ধ পেত। এসিয়ার শিল্প সামগ্রীও ঠিক তেমনি করে য়ুরোপবাসীর মনে এক শিল্প সৃষ্টির মনোরম প্রেরণা জাগিয়ে তুলতো। আঠার শতকে য়ুরোপীয়দের এই প্রাচ্যপ্রীতি একটা ফ্যাসানে দাঁড়িয়ে গেল। একে বলা হতো 'Chinoiserie'—অর্থাৎ প্রাচ্য দেশ হতে আমদানি করা শিল্পসামগ্রীর নকল করে যে সব বাজে জিনিস তৈরী হতো, তারই ব্যবহার। পোর্সিলেনের বাসন, গালার শিল্প, দেয়াল মোড়ার সুচিত্রিত কাগজ প্রভৃতি শিল্পপণ্য জাহাজ বোঝাই করে য়ুরোপে আসতে লাগলো। ফ্লেমিং শিল্পীরা ভারতের 'করোমণ্ডল' উপকূলবাসীর কাছ থেকে তাঁতের গঠন ও টেকনিক শিখে নিয়ে সুদৃশ কাপড় তৈরীর চেষ্টা করলো। ফরাসীর অভিজাত ও শিল্পীরা তাদের সান্ধ্য আসরে চীনা ভদ্রলোক বা ভারতীয় রাজা নবাবের অনুকরণে বিচিত্র রেশমী বেশভূষা পরে উপস্থিত হতো।

কিন্তু আঠার শতক পর্যন্ত য়ুরোপীয়দের মনে প্রাচ্য শিল্প সম্বন্ধে একটা মোহ ফ্যাসান ও আলোড়ন ছিল। কার্যত প্রাচ্যশিল্পকে বুঝবার জন্য তখনো তারা তৎপর হয়নি। আঠার শতকের শেষে যখন প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কৌতূহলী ও উৎসাহিত য়ুরোপ চর্চা সুরু করে তখন থেকেই তারা প্রাচ্য রুচি ও সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের অন্তর্নিহিত ভাবধারার প্রসাদ লাভ করতে থাকে। আঠার শতকের য়ুরোপীয় বণিকেরা শুধু এসিয়ার ভাণ্ডার থেকে 'Curio' হিসাবে শিল্পসামগ্রী নিয়ে যেত; নানা ধাতু, হস্তিদন্ত ও কাঠের তৈরী মূর্তি নিয়ে গিয়ে তারা ঘরের অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করতো। তারা এসিয়ার সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপে জাপানী শিল্পরীতি নিয়ে একটু হৈ চৈ হয়। এর মধ্যেও ছিল সেই নূতন বা অদ্ভুতের জন্য একটা ফ্যাসান।

এর পর প্রাচ্য সাহিত্য ও ভাষার চর্চার সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীতে এসে য়ুরোপীয়েরা প্রাচ্য শিল্পের কদর ঠিক ঠিক বুঝতে শিখলো। চীন, ভারত ও ইসলামীয় দেশগুলির শিল্প সম্বন্ধে পর্যালোচনা করে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা তার পরিচয় প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন।

এর আগে প্রায় তিন শত বছর ধরে য়ুরোপের আসরে আসরে কত ইরানী গালিচা পাতা হয়েছে। কিন্তু এই গালিচার ডিজাইন প্রভৃতি টেকনিকগত কোন উৎকর্ষের জন্য কেউ মাথা ঘামায়নি। ইরান থেকে আরও নানা শিল্প সামগ্রী য়ুরোপে প্রসার লাভ করে। রঙীন তৈজসপত্র তার মধ্যে একটি। ইরানীয় শিল্পকলা য়ুরোপীয় সামাজিক রুচিতে এক বিস্ময়কর আবহাওয়া সৃষ্টি করে। ইরানী পদ্ধতির মত গঠনে, রঞ্জনে, উদ্ভাবনে ও ব্যবহারে এত বিচিত্র শিল্প নিদর্শনের তুলনা পাওয়া যায় না। ইসলামীয় শিল্পকলাকে একমাত্র ইরানী শিল্পীরাই গৌরবান্বিত করেছে। তাই সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামীয় শিল্পের দান সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আধুনিক কালে সভ্য য়ুরোপ এবং সভ্য এসিয়ার সর্বত্র দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে ইসলামীয় শিল্পরুচি সজীব হয়ে রয়েছে এবং বেশীর ভাগ স্থান অধিকার করে আছে।

গিরি পর্বতে সমাকীর্ণ ইরান একটি অধিত্যকা ভূমি। এখানে যুগে যুগে নানা বিদেশী জাতির অভিযান এসেছে।

নানা শাসন ও সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হয়েছে। নানা ভাষা ও সংস্কৃতির আগমন হয়েছে। আকিমেন্দিস, পার্থিয়ান, সাসানীয়ান প্রভৃতি নানা শাসকবংশ এখানে আধিপত্য করেছে। কিন্তু খৃঃ পূঃ চার হাজার বছর আগে থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত ইরানীয় শিল্প পদ্ধতি একটি প্রাণবান ঐতিহ্যের সূত্রে গাঁথা রয়েছে। শিল্পী ইরানের প্রাণধর্ম কখনো ক্ষুন্ন হয়নি। খৃষ্ট জন্মের আগে ইরানে যে রঙীন তৈজসপত্র তৈয়ারীর পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, আজও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। ঐ প্রদর্শনীতে আগত দেশ দেশান্তরের শিল্প সামগ্রী থেকে এই আশ্চর্যকর সত্য প্রমাণিত হয়েছে। দক্ষিণে পার্সিপোলিস, মধ্যে সিয়ালিক, উত্তরে দাঘবান এবং পশ্চিমে নিয়াহাভান্দ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান থেকে একই পদ্ধতির শিল্প পাওয়া গেছে।

সাইবেরিয়ার ব্রঞ্জ, আর্মেনিয়ার ব্রঞ্জ এবং আলতাই পার্বত্য অঞ্চলের ব্রঞ্জ ও কাস্পিয়ান সাগরের উপকূল প্রদেশের ব্রঞ্জ—বহু ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন এই সমস্ত বিভিন্ন দেশের ব্রঞ্জ-শিল্পের মধ্যে একটি বিস্ময়কর ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্য মূলত ইরানীয় শিল্পের দান।

ইরানের পার্থিয়ান শাসকবর্গ গ্রীকদের সংস্পর্শে এসেছিল। সেই সময় হেলেনীয় শিল্পে নানাভাবে ইরানীয় পদ্ধতি প্রভাব ও প্রবেশ লাভ করে; হেলেনীয় শিল্পের সরল নিরাভরণতার মধ্যে ইরানীয় পদ্ধতি তার অলঙ্কারের ঐশ্বর্য নিয়ে দেখা দিল।

আলতাই পর্বতে ব্যাজিরিক নামক স্থানে কতগুলি সমাধিস্থান থেকে যে সমস্ত দারুশিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা থেকে মনে হয় এককালে এখানে এই সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল। এই দারুশিল্পের মধ্যে বিশুদ্ধ ইরানীয় পদ্ধতি বর্তমান।

ব্যাকট্রীয় সভ্যতার কথা ধরা যাক্। ব্যাকট্রীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি হিসাবে কতগুলি রূপার পাত্র প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে হেলেনীয় প্রভাব ক্ষীণ হয়ে এসেছে, সমস্ত গঠন পদ্ধতি ও অনুকরণের মধ্যে ইরানীয় পদ্ধতিই সর্বপ্রধান হয়ে উঠেছে।

ইরানের কাছাকাছি দেশগুলির কথা বাদ দেওয়া যাক্। সুদূর প্রাচ্যের শিল্পকলার মধ্যেও কিভাবে ইরানীয় প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। তুর্ফান মরূদ্যান থেকে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে কতগুলি শিল্প-সামগ্রী পাওয়া গেছে যা থেকে বোঝা যায় দূরে অতীতে ইরানীয়

ব্রঞ্জের রাজহংস—সাসানীয় স্টাইল

শিল্পকলা সহস্র যোজন মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে মানুষের সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছিল।

সাসানীয় ইরান বা পার্থীয় ইরানের শিল্পকলার প্রভাব ভারতে কখনো প্রবেশ লাভ করেছিল কিনা এবং করে থাকলে তার কোন প্রমাণ আছে কিনা, এ বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান কখনো হয়নি। এটা প্রত্নতত্ত্বের বিষয় মনে করে হয়তো শিল্প সমালোচকেরা কখনো অনুসন্ধান করেনি। সে যাই হোক, ইসলামীয় ইরানের কাছে আধুনিক ভারতের শিল্প যে বহুভাবে ঋণী সে সম্বন্ধে গবেষণার অপেক্ষা করত হয় না; এটা চাক্ষুষ সত্য। আধুনিক ভারতের হিন্দু বা মুসলমানের আচার আচরণে ইরানীয় শিল্পরুচি এক হয়ে মিশে গেছে। পোষাক পরিচ্ছদ, ঘরের আসবাব, স্থাপত্য চিত্রাঙ্কণ প্রসাধন কলা, রন্ধন কলা প্রভৃতি আধুনিক ভারতের বহুবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মূলত ইরানীয় পদ্ধতির সংস্পর্শে এসে তৈরী হয়ে উঠেছে।

স্বল্পায়ু

শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল

স্বল্পায়ু উল্কার চ্যুতি, ক্ষণে জ্বলি নিভে চিরতরে
নির্বেদ আনার কথা, কিন্তু মনে বুভুক্ষা জাগায়।
বুদ্ধ-টলস্টয়-গান্ধী কৃচ্ছ্রসাধনের আড়ম্বরে
জীবনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে দুর্বোধ ভাষায়।

সংহিতা বিছায় মনে বৈরাগ্যের ব্যর্থ প্রাবরণ
আদিম দম্পতি যার জীবকোষে বাঁধিয়াছে বাসা,
অতনু-রতির তনু প্রতি রক্ত কণিকা যখন
কানে পশি ফিরে যায় শঙ্করের মুদ্গরীয় ভাষা।

তোমার যৌবন যদি সুচির না হয় হোক প্রিয়া,
প্রতপ্ত কামনা মোর ঊর্ধ্বশিখ যদি ক্ষণকাল,
কি ক্ষতি তাহাতে কার, ক্ষণেকের জোড়া-লাগা হিয়া
ক্ষণিক লাগিলে ভাল, ব্যর্থ হয়ে যাক চিরকাল।

নিত্যানিত্যবাদী যারা নিত্য তারা থাক অনশনে।
তুমি মোরে ভরে দাও ঘনাশ্লেষ প্রবুদ্ধ যৌবনে॥

প্রশ্রয়

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

মার্জনা করেছি ভিক্ষা অপরাধ করেছি স্বীকার
তুমি করিয়াছ ক্ষমা প্রিয়তমা, তাই ত আবার
হই আমি অপরাধী, পুনে সাধি, তুমি ভুলে যাও
স্খলন পতন মোর, স্নিগ্ধ চোখে মুখপানে চাও।
মার্জনা-মধুর আঁখি মনে রাখি' ভয় ভেঙে যায়
পুরাতন দুষ্কৃতির প্রলোভন জাগে পুনরায়।
শাসন মানে না মন, প্রশ্রয়ের নাই সীমা তব,
স্পর্ধা তার দুর্নিবার, প্রবর্তনা পায় অভিনব
তোমার প্রসন্ন চক্ষে। সে দাক্ষিণ্যে দুর্বলতা মোর
তোমারে দুর্বলা করি নিত্য হয় বলিষ্ঠ কঠোর।
সহিতে সহিতে তুমি নমনীয় হও অনুদিন,
আজি তুমি পরাজিতা, জয়ী আমি বাধাবন্ধহীন।
শোচনা নাহিক আর, নাই আর পাপে পরিতাপ,
তোমার নিষেধ নাই, আছে মোর দোর্দণ্ড প্রতাপ।

ছলনা

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুলঝুরি-জ্বালা ছন্দ-মুখর রাত ;
হাস্নুহানার সুবাসে পাগল-বন,
চন্দ্রের সাথে তারাদের মৌতাত ;
রাত চোরা পাখী ডেকে যায় অনুখন্।

ভুলনা বন্ধু আলেয়ার ছলনায়—
অশ্রু-জমানো শুষ্ক-মরুর বুকে,
ক্ষণেকের এই মরীচিকা কামনায়—
বাস্তব যেন ভুলনা অলীক্-সুখে।

দীপিকা-উজল আবেশে মদির রাত ;
উদাস হ'য়োনা মৃদু দক্ষিণ বায়ে।
কেন ছোট মিছে মায়া-মৃগ পশ্চাৎ?
সোনালী-স্বপন ভেঙ্গে যাবে এক ঘায়ে।

যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সিনেমার জন্য Raw Film-এর আমদানী কমে আসতে লাগল। ফিল্ম আমাদের দেশে তৈরী হয় না—সেদিক দিয়ে আমরা পরমুখাপেক্ষী। অসুবিধায় পড়ে গেলেন ভারতীয় চিত্র-প্রযোজকরা। ফিল্ম-এর দুষ্প্রাপ্যতা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ভারত গভর্নমেণ্ট ভারতীয় ছবির দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট করে দিলেন ১১ হাজার ফিট। প্রযোজকরা পড়ে গেলেন আরেক দফা অসুবিধায়। আমাদের দেশে ১৪ হাজার ফিটের কমে সাধারণত ছবি তৈরী হয় না—তাতেও মনে হয় গল্প বুঝি অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। তিন হাজার ফিট কমে যাওয়ায় পরিচালক ও প্রযোজকরা সমস্যায় পড়ে গেলেন, ১১ হাজারে গল্প সাজাবেন কি করে।

আমরা দর্শকদের পক্ষ থেকে একথা বলতে চাই যে এতে শাপে বর হোলো। এই সরকারী নবনির্দেশের ফলে প্রযোজকরা নিখুঁত চিত্রনাট্য সংগ্রহে বাধ্য হয়েই উৎসাহিত হবেন। পরিচালকরাও তাদের কল্পনাপ্রসূত খেয়াল নিয়ে আর যা-খুসি তা করতে পারবেন না, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ছবি পরিচালনা করতে হবে। অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় কল্পনা-বিলাস ছবিতে আর চলবে না। সংক্ষিপ্ত আকারের ছবি তোলার জন্য ভাল গল্পের সর্বাধিক প্রয়োজন এবং সেই গল্পকে ভাল চিত্রনাট্যে পরিণত করার দায়িত্ব রয়েছে পরিচালকের। ছবিকে সফল করে তুলতে হলে ভাল গল্প চাই। প্রযোজকদের কাছে আমাদের অনুরোধ যে তাঁরা যেন স্তব ও স্তুতির মোহে স্তাবক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ফরমাসী গল্প গলায় বেঁধে আত্মহত্যা না করেন, সত্যিকারের যারা গল্প লিখিয়ে তাদের দিকে যেন দৃষ্টি ফেরান।

একথা সত্যি যে গল্প-নির্বাচন সম্বন্ধে উদাসীন থাকলে ভবিষ্যতে প্রযোজকদের ক্ষতিগ্রস্ত হতেই হবে, অতীতে ভাল ছবি তোলার সুনামও তাঁদের বাঁচাতে পারবে না। প্রযোজকদের কাছে আমাদের আরেকটি অনুরোধ যে ছবি তোলা সম্বন্ধে তাঁদের বাঁধাধরা সংস্কার ও ফরমুলাকে যেন তাঁরা মন থেকে দূর করে দেন। কেননা ফরমুলা ছবি আমাদের দেশে অত্যধিক হয়ে পড়ায় দর্শকদের কাছে তার আর কোন মোহ নেই।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের "জীবনসঙ্গিনী" চিত্রের একটি দৃশ্যে ছবি বিশ্বাস, রতীন ও প্রতিমা দাশগুপ্তা। ছবিখানি উত্তরায় প্রদর্শিত হচ্ছে।

স্টুডিও সংবাদ

এম্ পি প্রোডাকসন্স—

গত সপ্তাহে টালীগঞ্জে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে পরিচালক সুশীল মজুমদারের কক্ষে একটি আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। এম্ পি প্রোডাকসন্সের পরবর্তী দোভাষী ছবিতে যাঁরা অভিনয় করবেন তাঁদের সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যথা—অহীন্দ্র, কানন, জ্যোতি, ভানু, কেষ্ট মুখার্জি, ইন্দু মুখার্জি, রাজলক্ষ্মী, ইন্দিরা রায়, সন্ধ্যারাণী, পূর্ণিমা, প্রমোদ গাঙ্গুলী, রবীন মজুমদার, রবি রায়, নৃপতি চ্যাটার্জি, কানু বন্দ্যো, সত্য মুখার্জি প্রভৃতি। ক্যামেরাম্যান অজিত সেনগুপ্ত ও সংগীত পরিচালক কমল দাশগুপ্তও উপস্থিত ছিলেন। প্রারম্ভে পরিচালক সুশীল মজুমদার সকলকে গল্পটি পড়ে শোনান এবং গল্প সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

(শেষাংশ ২০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

[illegible] "চৌরঙ্গী" (বাঙলা) চিত্রের একটি ভূমিকায় প্রমীলা ত্রিবেদী।

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীনতম আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। যুগান্তর সৃষ্টিকারী ভারতীয় দল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব পুনরায় শীল্ড বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। ভারতীয় দল হিসাবে মহমেডান স্পোর্টিং দলের এই কৃতিত্ব খুবই প্রশংসনীয়। এইবার লইয়া মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব তিনবার শীল্ড বিজয়ী হইল। কোন ভারতীয় দল ইতিপূর্বে তিনবার শীল্ড বিজয়ী হয় নাই।

ফাইনাল খেলা

লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অনেকেই আশা করিয়াছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মহমেডানের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা করিবে। এমন কি শীল্ড বিজয়ী হইবে। কিন্তু ফলত সকলকেই হতাশ হইতে হইয়াছে। যাঁহারা খেলা দেখিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, "ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সৌভাগ্য বলেই শোচনীয় পরাজয়ের হাত হইতে রেহাই পাইয়াছে।" প্রকৃতই এই দিন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড়গণের খেলা খুবই নৈরাশ্যজনক হইয়াছিল। একমাত্র গোলরক্ষক ব্যতীত কেহই নিজ খ্যাতি অনুযায়ী খেলিতে পারেন নাই। আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়গণ লীগের বিভিন্ন খেলায় যেরূপ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, এই দিন তাহার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। রক্ষণভাগও সেইরূপভাবে তাঁহাদের সাহায্য করিতে পারেন নাই। অপর দিকে মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলোয়াড়গণ খেলার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিপুল উৎসাহে খেলিয়াছিলেন। পূর্ব খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহারা যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাহা খেলার সময় বিশেষভাবেই পরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছিল। পেনাল্টি গোলে তাঁহারা বিজয়ী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা অতি অল্পের জন্যই কয়েকবার অব্যর্থ গোল হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। একমাত্র ভাগ্যবলেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে ঐ সকল গোল হয় নাই। তাহা ছাড়া মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব যে অবস্থায় পেনাল্টি পাইয়াছেন তাহাতে একটি গোল হইত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইস্টবেঙ্গল দলের ব্যাক একরূপ বাধ্য হইয়াই অব্যর্থ গোলকে ব্যর্থ করিবার জন্য বলটি হাতে ধরিয়া ফেলেন। তিনি বলটি হাতে না ধরিলে উহা গোলে প্রবেশ করিতই, গোলরক্ষক কোনরূপেই উহা রক্ষা করিতে পারিতেন না। তবে ব্যাকের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল যখন পেনাল্টি সটও গোলে পর্যবসিত হইল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পরাজয় হইতে অব্যাহতি পাইল না। তবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পরাজিত হইয়া রানার্স আপ হইলেও অখ্যাতির কিছুই হয় নাই। একই বৎসরে লীগ চ্যাম্পিয়ান ও শীল্ড প্রতিযোগিতার রানার্স আপ হইয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। তাঁহাদের ক্লাবের ইতিহাসে এই কৃতিত্ব নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিল।

আই এফ এ শীল্ডের ইতিহাস

১৮৯৩ সালে সর্বপ্রথম এই প্রতিযোগিতা প্রচলিত হয়। এই সময় আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা দুইটি জোন বা বিভাগীয় প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া অনুষ্ঠিত হইত। একটি খেলা হইত কলিকাতায় ও অপরটি হইত উত্তর ভারতে। প্রথম বৎসরে মো[illegible] ১৩টি দল যোগদান করে। ভারতীয় দলের মধ্যে একমাত্র শোভাবাজার ক্লাব যোগদান করে। রয়াল আইরিশ সৈনিক দল সর্বপ্রথম এই শীল্ড বিজয়ী হয়। ইহার পর হইতে এই পর্যন্ত ৩২ বার সৈনিক দল শীল্ড বিজয়ী হইয়াছে। বেসামরিক দল ১৭ বার শীল্ড পাইয়াছে। গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স, ক্যালকাটা ও শেরউড ফরেস্টার এই তিনটি দল পর পর তিনবার এই শীল্ড লাভ করিয়াছে। ভারতীয় দলের মধ্যে মোহনবাগান ক্লাব সর্বপ্রথম ১৯১১ সালে এই শীল্ড বিজয়ী হয়। ১৯৩৬ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ১৯৪০ সালে এরিয়ান্স ক্লাব ও ১৯৪১ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব শীল্ড বিজয়ী হয়। ১৯৪২ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব পুনরায় শীল্ড বিজয়ী হওয়ায় পঞ্চমবার ভারতীয় দল এই শীল্ড লাভ করিল।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কৃতিত্ব

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বহু বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ১৯৩৪ সালের পূর্বে এই ক্লাব সম্বন্ধে সাধারণ ক্রীড়ামোদীগণ [illegible] বিশেষ কিছুই জানিত না। এই বৎসর প্রথম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনে খেলিবার যোগ্যতা লাভ করে। ঐ বৎসরই, আশ্চর্যের বিষয় যে, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার সৌভাগ্য অর্জন করে। ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় দলের পক্ষে প্রথম ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্ভব হয় নাই। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এই কৃতিত্ব অর্জন মহমেডান দলকে জনপ্রিয় করে। ১৯৩৫ সালে পুনরায় এই দল লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৩৬ সালেও এই দল লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং এমন কি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হইবার গৌরবেরও অধিকারী হয়। ইহার পূর্বে কোন ভারতীয় দলের পক্ষেই একই বৎসরে লীগ চ্যাম্পিয়ান ও শীল্ড বিজয়ী হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ফলে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করে। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালেও তাঁহারাই লীগ চ্যাম্পিয়ান হয় এবং আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার রানার্স আপ হয়। পর পর পাঁচ বৎসর লীগ চ্যাম্পিয়ান কোন ভারতীয় বা সামরিক কিংবা বেসামরিক দল ইতিপূর্বে হইতে পারে নাই। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব সেই বিষয়ে একটি নূতন রেকর্ড করে। ১৯৩৯ সালে আই এফ এর সহিত মতানৈক্য হওয়ায় মহমেডান স্পোর্টিং কোন প্রতিযোগিতায় যোগদান করে না। ১৯৪০ সালে তাহারা পুনরায় খেলায় যোগদান করিয়া লীগ চ্যাম্পিয়ান, সিমলার ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী ও বোম্বাইর রোভার্স কাপ বিজয়ী হয়। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবই একমাত্র ভারতীয় দল—যাহারা ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী হইয়াছে। বাঙলার দল হিসাবে তাহারাই একমাত্র দল যাহারা বোম্বাইর রোভার্স কাপ বিজয়ী হইয়াছে। ১৯৪১ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৩৬ সালের পুনরাবৃত্তি করে। অর্থাৎ লীগ চ্যাম্পিয়ান ও শীল্ড বিজয়ী হয়। ১৯৪২ সালে তাহারা পূর্ব বৎসরের গৌরব সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলেও আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 12th September, 1942 [৪৪শ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার—

প্রায় দুই সপ্তাহ হইতে চলিল, গত ২৭শে আগস্ট আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে সহসা ভারতরক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। ভারতরক্ষা বিধানের গতি রহস্যময়! ইহা কোন্ উদ্দেশ্যে, কখন যে কাহার উপর এবং কোথা হইতে কোন্ প্রভাবে আপতিত হইবে, কিছুই বুঝিয়া উঠিবার উপায় নাই। সুরেশবাবুর গ্রেপ্তার ব্যাপারে এ রহস্য আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের জ্ঞান বিশ্বাস মত, ভারতরক্ষা আইন অনুসারে আটক হইবার মত কোন অপরাধই সুরেশবাবু করেন নাই। অবশ্য, প্রথম জীবন হইতেই তিনি একজন স্বদেশপ্রেমিক এবং ত্যাগী কর্মী। দেশের সেবাকে তিনি জীবনের মুখ্য ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বোধ হয়, ইহাই সুরেশবাবুর একমাত্র অপরাধ এবং পরাধীন দেশে, বিশেষভাবে এই বাঙলায় স্বদেশপ্রেম যে অপরাধস্বরূপেই গণ্য হইয়া থাকে, ইহাও আমরা জানি; কিন্তু দেশের বর্তমান এই সঙ্কটকালে সুরেশবাবু সংবাদপত্র-সেবার ভিতর দিয়া যে কাজ করিতেছিলেন, তাহা অসামান্য। জাতীয় সংবাদপত্র সেবার ক্ষেত্রে সুরেশবাবুর সাধনা সমগ্র ভারতে বাঙলা দেশের গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, সংবাদপত্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁহার এইরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমের মূল্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপর ভারতরক্ষা বিধান প্রয়োগ করা যে কত বড় ভুল হইয়াছে, কর্তৃপক্ষের তাহা বুঝিতে বিলম্ব ঘটিবে না এবং অবিলম্বেই তাঁহাকে মুক্তিদান করা হইবে; প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রতিদিনই তাঁহার মুক্তির আশা করিতেছিলাম। এখনও তাঁহাকে কেন মুক্তি দেওয়া হইল না, এ সম্বন্ধে আমরা যতই চিন্তা করিতেছি, ততই বিস্মিত হইতেছি। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার ফলে আমাদের যে অশেষ ক্ষতি ঘটিয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু শুধু আমাদের ক্ষতির প্রশ্নই এক্ষেত্রে বড় নয়, দেশের অবস্থা বর্তমানে যেরূপ এবং সংবাদপত্র-সেবার ক্ষেত্রে দায়িত্ব এখন যেমন জটিল, তাহাতে সুরেশবাবুর মত একজন স্বাধীনচেতা সংবাদপত্রসেবীকে গ্রেপ্তার করার ফলে দেশেরও বিশেষ ক্ষতির কারণ ঘটিয়াছে। সুরেশবাবুর স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নয়। কারাগারে আটক থাকিলে তাঁহার স্বাস্থ্য কিরূপ থাকিবে, ইহা ভাবিয়াও আমরা উদ্বেগ বোধ করিতেছি।

ভারতের সমরাশঙ্কা

সম্প্রতি ওয়াশিংটন শহরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমর-পরিষদের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে প্রশান্ত মহাসাগরের সমর-সম্পর্কিত বিষয়সমূহের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এ পরিষদের সভাপতিত্ব করেন। অধিবেশনে ভারতের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা নিশ্চয়ই হইয়াছিল ইহা বুঝা যায়; কারণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমস্যার সঙ্গে ভারতের সামরিক পরিস্থিতির বিশেষভাবে যোগ রহিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে যে সমরতরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহা বর্তমানে মালয় এবং ব্রহ্মকে ভাসাইয়া ভারতের পূর্ব প্রদেশ আসামের সীমান্তভাগে পর্যন্ত পেঁছিয়াছে। জাপানীরা ভারতবর্ষের তোরণদ্বারে আজ উপস্থিত। বর্ষার পরে তাহাদের গতি কোন্ দিকে হইবে, পরিষদে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। কেহ কেহ বলেন, জাপানীরা অতঃপর সাইবেরিয়া আক্রমণ করিবে, কেহ বলেন, ইহার পর তাহাদের আক্রমণ আরম্ভ হইবে ভারতবর্ষের উপর; তবে অনেকেই এই মত প্রকাশ করেন যে, জার্মানদের সহিত মিলিত হইবার জন্যই জাপানীরা ইহার পর চেষ্টা করিবে এবং সেজন্য ভারতবর্ষ উভয়ের লক্ষ্যস্থল হওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষজ্ঞগণের অনেকেরই অভিমত এই যে, সলোমন দ্বীপের যুদ্ধে জাপানীরা যদি বিশেষভাবে নির্জিত হইয়া থাকে, তবে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমদিকে তাহাদের সমরবাহুকে সম্প্রসারিত করিবার নীতি প্রয়োগ করা তাহাদের পক্ষে হয়ত সম্ভব হইবে না; কিন্তু সলোমন দ্বীপের এই যুদ্ধে তাহাদের সমর-শক্তি কতটা ক্ষুন্ন হইয়াছে, ইহা নিরিখ করিয়া উঠাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা সমর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, শত্রুর বলাবলের বিচারসাপেক্ষ এমন সিদ্ধান্ত করা তাঁহাদের পক্ষেই কতকটা সম্ভব হইতে পারে। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে, আমাদিগকে এই কথাই বলিতে হয় যে, মিশর এবং ককেশাস অঞ্চলে জার্মানদের সমরোদ্যম এখনও যখন চলিতেছে এবং পূর্বদিকে জাপান ঘাঁটি বাঁধিয়া বসিয়াছে, তখন ভারতের পক্ষে বিপদাশঙ্কা ষোল আনাই রহিয়াছে। এই বিপদকে প্রতিহত

করিতে হইলে সমরোদ্যমে সমগ্র ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতাই একান্ত আবশ্যক—সলোমন দ্বীপের যুদ্ধের ফলাফল খতাইয়া ভারতবাসীদের পক্ষে নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু সমগ্র ভারতের আন্তরিক সহযোগিতা যদি মিত্রশক্তির সমরোদ্যমকে সুদৃঢ় করে, তবে বাহির হইতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া কোন শক্তির পক্ষেই সাফল্যলাভের সম্ভাবনা নাই; পক্ষান্তরে তেমন ক্ষেত্রে তাহাদিগকে স্পষ্টভাবেই ভারতের বিপুল জনবল এবং সঙ্ঘতিবলের সহিত সংঘর্ষের সম্মুখীন হইয়া বিড়ম্বিতই হইতে হইবে। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সমরোদ্যমে ভারতবাসীদের সেই স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা লাভের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কি করিতেছেন। কংগ্রেসের আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য দৃঢ়তাই বর্তমানে তাঁহাদের ভারতে অবলম্বিত নীতির মধ্যে স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইহা কি সত্যই সমরোদ্যমে সাফল্য লাভের পথ?

———

সতর্ক বাণী

'স্টেটসম্যান' পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক মিঃ আর্থার মুর সমরোদ্যম সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সেদিন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে সতর্কতার হিসাবে কয়েকটি স্পষ্ট কথা জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ এই চার বৎসরে পড়িল। যুদ্ধের এই চতুর্থ বৎসরে আমাদের অবস্থা ভারতে কিরূপ?. জাপানীরা ব্রহ্মদেশ দখল করিয়াছে এবং তাহারা বাঙলা ও আসামের সীমান্ত পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। জার্মানরা ককেশাস অঞ্চলে লড়াই চালাইতেছে এবং সেইভাবে তাহারা তুরস্ক, ইরাক ইরাণ এবং আফগানিস্তানের সম্পর্কে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে। মিশরেও জেনারেল রোমেলের অধীনে জার্মান বাহিনী সুয়েজ ও প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে বিপদ ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। এমন অবস্থায় 'ভারতের অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে' ভারত সচিব আমেরী প্রভৃতি ব্রিটিশ রাজনীতিকদের আত্মগর্বপূর্ণ এই ধরণের যেসব উক্তি দেখা যাইতেছে, সেগুলির প্রকৃতপক্ষে কোন মূল্য নাই। মিঃ আর্থার মুর দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, ভারতের পক্ষে আজ বড়ই সংকটকাল; অথচ এই সময়েই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নীতির সঙ্গে ভারতের রাজনীতিকদের মতের একটা সুস্পষ্ট সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে। আজ ভারতবর্ষকে নিরাপদ রাখিবার জন্য কোন রকম ত্যাগ স্বীকারেই কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়; ইহা সকলেই বলিতেছেন। ভারতবাসীরা এই অভিযোগ করিতেছে যে, এ সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সেই ত্যাগ স্বীকারে সম্মত হইতেছেন না। তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে তাহাদের নিজেদের দেশ শাসনের পূর্ণ অধিকার প্রদান করিতেছে না। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ পক্ষ এই কথা বলিতেছেন যে, এই দুঃসময়ে ভারতবাসীরা অনুচিত মতিগতি অবলম্বন করিয়াছে এবং তাহারা সমরোদ্যমে সাহায্য করিতেছে না। বলা বাহুল্য মিঃ আর্থার মুর ভারতবাসীদের অভাব অভিযোগ এবং দাবী বলিতে কংগ্রেসের দাবীরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাই স্বাভাবিক। তিনি ভারতের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল পুরুষ; এ দেশের জাতীয় জীবনের উপর কংগ্রেসের প্রভাবের গুরুত্ব কতখানি, তিনি তাহা সম্যকরূপে অবগত আছেন; সুতরাং তিনি জানেন যে, কংগ্রেসের দাবী প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষেরই দাবী এবং কংগ্রেসের অভিমতকে বস্তুত সমগ্র ভারতের জনগণের অভিমত বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল এবং ভারত সচিব মিঃ আমেরী কংগ্রেসের তথা ভারতের এই দাবীর গুরুত্ব এখনও উপলব্ধি করিতেছেন না; এ দেশের দুই একজন ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির বাক্যেই তাঁহারা বিভ্রান্ত হইতেছেন এবং দমননীতির জোরে ভারতের বর্তমান রাজনীতিক সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া গর্ব করিতেছেন। ইহার অপেক্ষা চূড়ান্ত অদূরদর্শিতার পরিচয় অন্য কিছু হইতে পারে না। তাঁহারা যদি অবিলম্বে তাঁহাদের এই ভ্রান্ত নীতি পরিত্যাগ না করেন এবং ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া সমরোদ্যমে ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা লাভের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বকে উপলব্ধি না করেন, তবে শুধু ভারতের পক্ষেই নয়, তাহাদের নিজেদের স্বার্থের পক্ষেও বিষম আশঙ্কার কারণ ঘটিবে। দেখিতেছি, আমেরিকার অন্যতম সাংবাদিক মিঃ রেমণ্ডের দৃষ্টি ভারতের এই সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারে ভারতে যে অশান্তি দেখা দিয়াছে, সরকারী দমননীতির ফলে তাহার বাহ্য বিক্ষোভের দিকটা দমিত হইলেও যে সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হইবে, একথা বলা যায় না; কারণ প্রয়োজন এক্ষেত্রে মনের মিলের; ভারতের জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতাই মিত্রশক্তির সমরোদ্যমের সাফল্যের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক। মিঃ রেমণ্ড বলেন, আমেরিকার জনসাধারণ বিশেষভাবে এই আশা করে যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য পুনরালোচনা আরম্ভ করিবে। বিলাতের 'নিউ স্টেটসম্যান এণ্ড নেশন' পত্রও মার্কিন সাংবাদিক মিঃ রেমণ্ডেরই ন্যায় ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ নিষ্পত্তি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। উক্ত পত্র বলেন, ভারতীয় সমস্যার সমাধানই এখন প্রধান সমস্যা। পার্লামেণ্টের পুনরধিবেশন আরম্ভ হইবামাত্র সদস্যদের দৃষ্টি সর্বাগ্রে এই দিকেই আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ভারতবর্ষ হইতে যে সব খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ভারতের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ দ্রুতগতিতে ব্রিটেনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। জাপানীরা ইহাই চায়। তথাপি ভারতের এই সব লোক যে জাপানের পক্ষপাতী হইয়াছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের সাম্রাজ্যগত মর্যাদার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ভারতের এই সমস্যার সমাধান করা উচিত।" 'নিউ স্টেটসম্যান এণ্ড নেশন' বলেন যে, মহাত্মা গান্ধী আপোষ নিষ্পত্তি করিবার জন্য সমস্তই আছেন। তাঁহার মতে জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে যদি এখন কোন আপোষ নিষ্পত্তি হয়, মিঃ জিন্না তাহা অগ্রাহ্য করিতে সাহস পাইবেন না এবং মিঃ জিন্না যদি তেমন চেষ্টা করেন, ভারতের জনগণ তাঁহার প্রতি বিরাগ ভাজন হইয়া উঠিবে। অতঃপর উক্ত পত্র মিঃ রুজভেল্টকে এ মীমাংসার ব্যাপারে

মধ্যস্থ স্বরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের মতে অবিলম্বে জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী স্বীকার করিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি আপোষ করিতে সত্যই ইচ্ছুক হন, তবে সে ক্ষেত্রে মিঃ রুজভেল্টের মধ্যস্থতা করিবার কোন প্রশ্নই দেখা দিবে না এবং জিন্না সাহেব ও তাঁহার অনুগামী লীগওয়ালাদের আস্ফালনও যে সেই এক চালেই বন্ধ হইয়া যাইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, চার্চিল-আমেরী কোম্পানী ইহাতে রাজী হইবেন কি?

প্রথম প্রয়োজন—

'ভারতের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তিই প্রথম প্রয়োজন'—শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেদিন লাহোরের বক্তৃতায় এই কথার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রশ্ন এই যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কি ভারতবাসীদের হাতে দেশ শাসনের অধিকার ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন? যদি থাকেন, তবে এখনই তাহা দেওয়া দরকার। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের প্রস্তাবে ভারতবাসীরা সন্তুষ্ট নহে। যুদ্ধের পরে ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে, এমন প্রতিশ্রুতিতে বর্তমান সমস্যার সমাধান হইবে না। ভারতবাসীদিগকে দেশ শাসনের সম্পূর্ণ অধিকার এখনই দিতে হইবে এবং অবিলম্বে জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে ইংলণ্ডেরই উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতের দাবীর তাৎপর্য প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন এবং বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, মিত্রশক্তির সমরোদ্যমকে বাস্তবের দিক হইতে সার্থক করিতে হইলে ভারতের স্বাধীনতার দাবী সর্ব প্রথমে পূরণ করা কর্তব্য এবং স্বাধীনতার একটা আদর্শমূলক আবেগই সে দাবীর মূলে নাই—রহিয়াছে, ভারত এবং গ্রেট ব্রিটেন উভয় দেশের প্রকৃত স্বার্থ। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিরও ইহাই ছিল প্রধান বক্তব্য। তাঁহারাও এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রশ্ন ভারতের পক্ষে আজ যদি একটা একান্ত হইয়া না পড়িত, তবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রদত্ত স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিকে সম্বল করিয়া ভারতবাসীদের পক্ষে দিন গণনা করা সম্ভব হইলেও হইতে পারিত; কিন্তু বর্তমানে সমগ্র ভারতের আন্তরিক সহযোগিতাকে সংহত করিয়া দেশরক্ষার সমস্যাই ভারতের পক্ষে প্রবল হইয়া পড়িয়াছে এবং সে কাজ করিতে হইলে দেশের স্বাধীনতার উদার আদর্শকে দেশের জনসাধারণের অন্তরে পরিস্ফুট করিয়া তোলা আবশ্যক; প্রতিশ্রুতির ফাঁকা ভরসা এই আগ্রহকে যথেষ্ট কার্যকররূপে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ সুদীর্ঘকাল ভারত শাসনে অভিভাবকত্বের ঔদ্ধত্যে এবং সাম্রাজ্যবাদসুলভ সংস্কার বশতঃ এই সোজা সত্যটি স্বীকার করিয়া লইতে সক্ষম হইতেছেন না। অধিক কি, ভারতের জঙ্গীলাট জেনারেল ওয়াভেল গত ৩রা সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে বেতারযোগে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যাইতেছে যে, মালয়, ব্রহ্মদেশ এবং ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সমর বিপর্যয়ের সম্বন্ধে সাক্ষাৎরূপে তাঁহার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তিনি পর্যন্ত এই সত্যের গুরুত্ব বিষয়ে এখনও অবহিত হইতে পারেন নাই। সেদিনের বেতার বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, 'রাজনীতিকেরা ঘরোয়া কলহ লইয়াই ব্যাপৃত আছেন—তাঁহারা ভারত রক্ষা করিতেছেন না, স্কুলের উচ্ছৃঙ্খল ছেলেরা সে কাজ করিতেছে না এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন উপদ্রবকারীরা কিংবা অজ্ঞ গুণ্ডার দলও ভারত রক্ষা করিতেছে না, ভারত রক্ষা করিতেছে ভারতের সৈন্যদল এবং ভবিষ্যতেও ভারতকে তাহারাই রক্ষা করিবে।' ভারতের রাজনীতিকদিগকে নিন্দা করিবার একটা অভ্যাস ব্রিটিশ রাজপুরুষগণের এক রকম মজ্জাগত সংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা আমরা জানি, কিন্তু জেনারেল ওয়াভেল যোদ্ধা পুরুষ, অন্তত তাঁহার এ সত্যটি উপলব্ধি করা উচিত ছিল, যে দেশপ্রেমে জাগ্রত জনসাধারণের সহানুভূতির শক্তিই সেনাদলের সর্বপ্রধান শক্তি। আধুনিক লড়াইয়ের সাফল্য সমর নীতির দিক হইতেও সর্বাংশে সমগ্র দেশের জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতার উপরই নির্ভর করে এবং দেশের জনসাধারণের এই সহযোগিতার অভাবই ব্রহ্ম ও মালয় এবং যবদ্বীপের সমর বিপর্যয়ের মূলে ছিল। ভারতের রাজনীতিকগণ, বিশেষভাবে কংগ্রেসের নেতৃগণ মিত্রশক্তির সমরোদ্যমকে জনগণের এই আন্তরিক সহযোগিতায় সুদৃঢ় করিতেই চাহিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে নিন্দা করিলে তাঁহারা সমরোদ্যমে যে শক্তি সঞ্চার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তাহার অভাব পূর্ণ হইবে কি? অর্থাৎ ভারতের রাজনীতিকদের সেই নিন্দার পথে সমগ্র ভারতের জনগণের স্বদেশপ্রেমোদ্দীপ্ত প্রেরণা মিত্রশক্তির সমরোদ্যমকে পিছনে একান্তভাবে পাওয়া যাইবে কি, ইহাই হইতেছে প্রশ্ন।

শাসন পরিষদ সদস্যদের ক্ষমতা—

দিল্লীর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানকার ছাত্রী ও বয়স্কা মহিলারা বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এবং শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আণের গৃহে পিকেটিং সুরু করিয়াছেন। বড়লাটের শাসন-পরিষদের ভারতীয় জনমতের এই যোগ্য প্রতিনিধি দুইজনের এই অবস্থা আমাদের মনে তাঁহাদের প্রতি সমবেদনারই উদ্রেক করিতেছে; বড়লাটের শাসন পরিষদে ইঁহাদের পদমর্যাদা এবং ক্ষমতার সম্বন্ধে মাদ্রাজের "হিন্দু" পত্রের সংবাদদাতা যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহাতে সেই সমবেদনার ভাব চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তোলে। 'হিন্দু'র সংবাদদাতা বলেন, বড়লাটের শাসন-পরিষদের বড় বড় নীতিকে ইঁহারা প্রভাবিত করিবেন, সে তো দূরের কথা, আটক বন্দীদের সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানিতে চাহিলেও স্বরাষ্ট্র বিভাগ ক্ষিপ্ত হইয়া ইঁহাদিগকে তাড়াইয়া আসে। বড়লাট এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগই সব চালাইতেছেন। ভারতীয় সদস্যগণ যদি ইচ্ছা করেন, স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের মত কংগ্রেস-নিপাতের জন্য বিবৃতি দিতে পারেন; কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে মীমাংসার কথা কহিবার সাহস কোন সদস্যের নাই।' মন্তব্য অনাবশ্যক।

ব্রিটিশ শাসনের কৃতিত্ব

প্রত্যক্ষভাবে শাসন-ব্যাপারের কোন রকম কর্তৃত্বের সম্পর্কে গেলেই ভারতের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন বলিয়া পরিচিত ইংরেজের মনোবৃত্তিও যে কিরূপভাবে সাম্রাজ্যবাদের সনাতন মনোবৃত্তির দিকে মোড় ঘুরিয়া বসে অতীতে সেই ম্যাকডোন্যাল্ডী প্রধান মন্ত্রিত্বের আমল হইতে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের প্রস্তাব উত্থাপন কাল পর্যন্ত আমরা তাহার অনেক পরিচয়ই পাইয়াছি। সেদিন ইংলন্ডের সহকারী প্রধান মন্ত্রী এটলী সাহেবের বক্তৃতাতেও সে মনোভাবের আর এক প্রস্থ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সমরোদ্যমে ব্রিটিশের আদর্শের কথা উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন,—"আমরা এক শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করিয়াছি এবং সুশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছি; শুধু ইহাই নহে, ভারতের স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য আমরা গত ২৫ বৎসরে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি। ভারতবাসীদের মধ্যে অনৈক্যের জন্যই অধিকতর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। ত্রিশ কোটি লোকের বাসভূমি এই ভারতে আদিম কালের সভ্যতার পাশাপাশি আধুনিকতম সভ্যতার ধারা বহিয়া চলিয়াছে, এমন অবস্থায় সেখানে গণতন্ত্র প্রবর্তনের পথে অসুবিধা ঘটিবেই। যদি এ অসুবিধা না থাকিত, তবে আমরা আরও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিতাম।" এটলী সাহেব এক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের এক ঘেঁয়ে কথাই আওড়াইয়াছেন মাত্র। তাঁহার ন্যায় ব্রিটিশ 'রাজনীতিকদের এখন কথাটা' পরিষ্কারভাবেই বুঝা উচিত যে, তাঁহাদের এই শ্রেণীর ধাপ্পাবাজীতে ভারতবাসীরা আর প্রবঞ্চিত হইবে না ভারতবাসীরা বুঝিয়া লইয়াছে যে, তাঁহাদের ঐসব কথার কোন মূল্যই নাই। গত ২৫ বৎসরে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসনের পথে অনেকটা আগাইয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া মিঃ এটলী গর্ব করিয়াছেন; কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের পথে ভারতকে অগ্রসর করাইবার জন্য তাঁহারা যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের মতেই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভে ভারতবাসীদের অযোগ্যতার একমাত্র কারণ যে অনৈক্য, তাহা দূর হইয়াছে কি, না সাম্প্রদায়িকতার শত রন্ধ্রপথে তাহা অধিকতর সম্প্রসারিত হইয়াছে? ভারতে গণতন্ত্রমূলক শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পক্ষে বাধার কথা এটলী সাহেব বড় মুখে আওড়াইয়াছেন, কিন্তু এদেশবাসীর গভীর নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য সুদীর্ঘকালের শাসনে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই গর্বের বিষয় নয়। প্রত্যক্ষভাবে গণতন্ত্রবিরোধী আদর্শের ধ্বজাধারী সামন্ত রাজাদের সনাতনী নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াই তাঁহারা ভারতের বেলায় গণতান্ত্রিকতার মহিমাকে পুষ্ট করিয়াছেন। ভারতবাসীদের সকল রকমের প্রগতিমূলক উদ্যম প্রতি পদে তাঁহাদের অবলম্বিত নীতিতে বাধাপ্রাপ্তই হইয়াছে এবং তাঁহাদের সেই প্রগতিবিরোধী নীতি আজও কার্যত সমানভাবেই চলিতেছে। তাঁহাদের মুখের ফাঁকা কথায় বাস্তব সত্যের ব্যতিক্রম বুঝিয়া ভারতবাসীরা নিশ্চয়ই তাঁহাদের স্তবগানে তৃপ্ত থাকিতে পারে না; কারণ ভারতবাসীরাও মানুষ এবং যুগোচিত আদর্শ তাহাদের অন্তরও স্পর্শ করে।

কৃষ্ণবর্ণের দোষ—

জ্বলজীয়ন্ত একজন 'রাজা' এবং ভারত সরকারের দেশরক্ষা কমিটির একজন সদস্যকে সেদিন কটক রেল স্টেশনে তিনজন "শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক" সেই কক্ষে বিরাজ করিতেছেন' সম্প্রতি সে সম্বন্ধে একটি খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, উড়িষ্যার খলিলকোটের রাজা দেশরক্ষা পরিষদে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লীতে যাইবার জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়া রাখেন। পারিষদগণ পরিবৃত অবস্থায় রাজা গাড়িতে উঠিতে গিয়া দেখিতে পান যে, তিনজন "শেতাঙ্গ ভদ্রলোক" সেই কক্ষে বিরাজ করিতেছেন' স্টেশন মাস্টার আসিয়া এই ভদ্রমহোদয়গণকে কৃপা করিয়া অন্য কামরায় যাইবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তাহারা সে কথায় ভ্রূক্ষেপও করে নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া খলিলকোট-রাজ কর্তৃপক্ষের নিকট এই ভদ্র ব্যক্তিত্রয়ের ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদমূলক এক তার প্রেরণ করেন এবং অন্য কামরায় উঠিয়া দিল্লীর দরবারে হাজিরা দিতে অগ্রসর হন। ব্যাপারে নূতনত্ব কিছুই নাই এবং থাকিবারও কথা নয়; ইংরেজ ও ভারতবাসীদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য রহিত করিবার সম্বন্ধে ব্রিটিশ রাজপুরুষদের মৌখিক সদিচ্ছাপূর্ণ শত উক্তি সত্ত্বেও ভারতবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে সে বৈষম্য সত্য হইয়াই রহিয়াছে এবং ভারতবাসীরা যতদিন পর্যন্ত স্বাধীন না হইবে, ততদিন সে সত্যের ব্যতিক্রমও ঘটিবে না। পরাধীন যে, বিশেষ ক্ষেত্রে সে ব্যক্তিবিশেষের কৃপা কিংবা অনুগ্রহভাজনই শুধু হইতে পারে, নতুবা সাধারণভাবে মানুষ হিসাবে মর্যাদা লাভ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। একজন ভারতবাসীর রিজার্ভ করা গাড়িতে অনধিকার প্রবেশপূর্বক তিনজন শ্বেতাঙ্গ পদস্থ ভারতবাসীকে একান্ত অসভ্যের মত অপদস্থ করিল এবং তেমন অপদস্থ করিয়াও ভারতীয় সংবাদদাতাদের মতে তাহারা 'ভদ্রলোক'ই থাকিল, রেলওয়ে বিধিব্যবস্থাকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিল। কিন্তু তিনজন ভারতবাসী যদি ভ্রান্তিবশেও এমন ব্যবহার করিত, তবে ব্রিটিশ ন্যায়ের বজ্র কিভাবে গর্জন করিয়া উঠিত, সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

৩৩

দীর্ঘ দিনের পর সুমন্ত বাড়ী ফিরিয়াছে। ঘরে চাবি বন্ধ ছিল, তালাটা খুলিতে খুলিতে সুমন্ত একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। দরজা খুলিতেই রুদ্ধ গৃহের ভ্যাপসা গন্ধ নাকে আসিল, পিছনে সরিয়া গিয়া সে দাঁড়াইল। গন্ধটা কতক বাহির হইয়া গেলে ঘরে ঢুকিয়া সে দরজা-জানালাগুলা খুলিয়া দিল।

দীর্ঘকাল পরে সুমন্ত ফিরিয়াছে—।

সংবাদ পাইয়া আগেই আসিলেন মহেশ রায়—এই আড়াই বৎসর সুমন্তের অবর্তমানে তাহার বিষয় সম্পত্তি সবই ভোগ করিতেছেন তিনিই,—বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ তাঁহার খানিকটা মেদ বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অনুপাতে থাকমণি ও কেদার খানিকটা স্ফীত হইয়াছেন তাহা বেশ বুঝা যায়। ব্রজসুন্দরকে পথে দেখা গিয়াছিল, তাহার রুক্ষ কর্কশ চেহারাটাও কেন কতকটা কোমল হইয়াছে মনে হইতেছে।

মহেশ আসিয়াই চৌকির উপর বসিয়া পড়িলেন। সুমন্ত তাঁহাকে প্রণাম করিল, জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর—ভালো আছেন তো কাকাবাবু?"

মহেশ রায় বলিলেন, "আর বাবা, ভালো থাকাথাকি আর আমাদের কিছু আছে কি? ওই চলছে এক রকম করে টেনেটুনে; দেহের দিক দিয়েও বটে, অন্য সব দিক দিয়েও বটে। আমাদের আবার ভালো মন্দ, আমাদের আবার আর কিছু,—কোন রকমে বেঁচে আছি এই মাত্র।"

সুমন্ত বলিল, "কেন, অসুখ বিসুখ—"

শুষ্ক মুখে মহেশ বলিলেন, "অসুখ বিসুখের বাবা,—সংসার নিয়ে বিব্রত। দেখছো তো—কি খেয়ে যে গায়ে মেদ লাগছে তাও বুঝিনে। তোমার কাকিমার যে অবস্থা, মোটে চিকিৎসা করবার যো পর্যন্ত নেই—"

বিস্তারিত চোখে সুমন্ত বলিল, "এত রোগা হয়ে গেছেন—কি হয়েছিল?"

"রোগা—" বড় কষ্টে মহেশ হাসিলেন—"মোটা বল। কাপড় এদিকে বারো হাত না হলে কুলোয় না—অথচ গায়ে রাখবার যো নেই। ধরে পাশ ফিরিয়ে দিলে বরং ভালো হয় এমন অবস্থা—"

"উঃ—সাংঘাতিক তো?"

সুমন্ত মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "ওঁকে রোগা হওয়ার ওষুধ খাওয়ান না কেন—আপনিও খান কাকামশাই নইলে যে ভাবে মেদ বাড়তে শুরু করেছে তাতে আপনারা কোনদিন ফুটবলের মত ফেটে পড়বেন, এর পর বাঁচানোই মুস্কিল হবে—।"

উৎসাহিত হইয়া মহেশ বলিলেন, "যা বলেছো—ওই ভয়ই তো হয়—। আমি তো বরং পদে আছি, তোমার কাকিমা পাছে ফেটে যান সেই আমার ভয়। ব্রেজোর বউ সবে সেদিন এসেছে, সংসারের বোঝেই বা কি, জানেই বা কি,—আজ যদি কিছু হয়—"

সুমন্ত বাধা দিল, বিস্ময়ের সুরে বলিল, "ব্রেজোর বিয়ে হয়ে গেছে? তবে যে শুনেছিলুম ওর বিয়ে দেবেন না?"

হাসিমুখে মহেশ বলিলেন, "তাই কি হয় বাবা—বংশটা লোপ হয়ে যাবে যে। আমাদের হরিচরণ দত্তের মেয়ে—অবশেষে তারই সঙ্গে বিয়েটা দিতে হল—। একটী মাত্র ছেলে—হলই বা রুগ্ন, তবু বংশ রক্ষে তো চাই। এই যে তুমি একেবারে ধনুকভাঙ্গা পণ করেছো—বিয়ে কিছুতেই করবে না—কি যে গোঁ বাপু,—দাদার বংশটা একেবারেই গেল।"

বংশ রক্ষা—সুমন্তের মুখে হাসি ধরে না। কোনকালে শ্রুত পুরাণের গল্পটা মনে পড়িয়া গেল,—একটিমাত্র পুত্রের অভাবে উর্দ্ধতন চৌদ্দ পুরুষ গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া আছেন; না পারিতেছেন উর্দ্ধে উঠিতে, না পারিতেছেন নিম্নে নামিতে। আজ পিপাসায় বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, এক ফোটা জল দিতে বংশধর কেহ নাই।

সুমন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিল, "ওরকম বংশ রক্ষার অর্থ আমার কাছে কিছুই নয় কাকামশাই, পিতৃপুরুষের যদি নিজের পুণ্যের জোর থাকে তাঁরা সোজা স্বর্গে চলে যাবেন, না থাকে আবার জগতে নেমে আসবেন, শূন্যে ঝুলবেন না একথা ঠিক। আপনি বিজ্ঞানের আলোচনা করেন নি, করলে জানতেন—কোন কিছুই যে শূন্যে ঝুলতে পারে না। নিউটন প্রমাণ করেছেন, পৃথিবীর যে মাধ্যাশক্তি আছে সেই শক্তিতে সব কিছুই মাটিতে নেমে আসে।"

মহেশ বিকৃতমুখে বলিলেন, "চুলোয় যাক তো—

নিউটন আর ওই পৃথিবীর শক্তি। ওরা সাহেব লোক, আমাদের সম্বন্ধে জানে কি—খোঁজ রাখে কি? না করে এমন কাজ নেই, না খায় এমন জিনিষ নেই,—ওদের কথা নিয়ে চলে তর্ক আলোচনা, আর আমাদের শাস্ত্র যা বলে, আমাদের বংশানুক্রমে যা নিয়ম আচার-বিচার চলে আসছে তা হলো মিথ্যে? চুলোয় যাক ওসব, আমাদের যা তা আমাদেরই ভালো—

বিনীতভাবে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অগ্রসর হইলেন।

দুই পা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ওই ওষুধটার নাম লিখে দাও তো, দাম কত পড়বে আর কোথায় পাওয়া যায়—

সুমন্ত বলিল, "কুছ পরোয়া নেই, নাম আমি এর পর লিখে দেব এখন, ডাক্তারদের দোকানেই পাবেন, দামও তারা ঠিক করে বলে দেবে।"

মহেশ বাহির হইয়া গেলেন।

নিতান্তপক্ষে চক্ষুলজ্জার খাতিরেই তিনি আসিয়াছিলেন। আজ কয়টী বৎসর যাহার সব কিছু ভোগ-দখল করিতেছেন, এতকাল পরে সে বাড়ি ফিরিয়াছে, একটু তোষামোদ করা ভালো।

নিতান্ত ফাঁকা ঘর—।

আড়াই বৎসর আগে সে দিবাকরকে বাড়িতে রাখিয়া গিয়াছিল, আড়াই বৎসর বাড়ির খবর সে কিছু পায় নাই; এখানে আসিয়াই সে খোঁজ পাইয়াছে প্রভুভক্ত দিবাকর অসুস্থ হইয়াও মনিবের ভিটা ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই, এইখানেই সে দেহত্যাগ করিয়াছে।

আজ শূন্য ঘরে দিবাকরের কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া সুমন্তের মনে পড়িতেছিল।

পুরাতন প্রভুভক্ত ভৃত্য—

নিজের কেহ না থাকিলেও আত্মীয়স্বজন তাহার ছিল, তাহারা দিবাকরকে নিজেদের কাছে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ, পীড়াপীড়ি অনেক করিয়াছে, সুমন্তকে রাখিয়া দিবাকর যাইতে পারে নাই। সুমন্ত হঠাৎ যেদিন গৃহ ত্যাগ করে সেদিন কেবলমাত্র বলিয়া গিয়াছিল "সব রইল দিবাদা, বাগান পুকুর আমারই- ওরা ভোগ করে করুক—তুমি আমার এই ভিটেয় থেকো—যতদিন আমি না ফিরি।"

সুমন্তের কথা সে রক্ষা করিয়াছে, এইখানেই সে দেহ ত্যাগ করিয়াছে—কোথাও যায় নাই।

সুমন্তের চোখ দুইটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে—আর্তভাবে বার বার অস্ফুট কণ্ঠে ডাকিল—"দিবা দা—দিবা দা, আমি এসেছি।"

সুমন্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়াই পতিরামের দেখা পাইয়াছিল, তাহার নিকটে শুনিয়াছে বিধবা রাজলক্ষ্মী আজ বৎসরখানেক এখানে আসিয়া আছে—রাম বসু মাস চার পাঁচ হইল মারা গিয়াছেন, রাজলক্ষ্মী এখানেই আছে। দিবাকরের পরিচর্যা সেই করিয়াছে, সুমন্তের ঘরের চাবি দিবাকর তাহাকেই দিয়া গিয়াছে।

লোক পাঠাইয়া চাবি আনিয়া সুমন্ত দরজা খুলিতে পারিয়াছে।

সুমন্ত ফিরিয়াছে শুনিয়া তাহার অনুগত মোহন বাগদি, রতন ও ভোলা জেলে, দীনু কাওরা প্রভৃতি দেখা করিতে আসিল।

তাহাদের পানে তাকাইয়া অকারণেই সুমন্তের চোখে জল আসিল; তাহার বড় প্রিয় বন্ধুবর্গ, ইহাদের ছাড়িয়া আজ আড়াই বৎসর সে গিয়াছিল বহু দূরে—সেখানে কেহ তাহার সন্ধান পায় নাই—ফিরিয়া না আসিলেও কাহারও সহিত দেখাও হইত না।

মোহন বলিল, "বড় রোগা হয়ে গেছো দাদাবাবু,—কোথায় ছিলে, কি হয়েছিল?"

রতন বলিল, "অসুখ-বিসুখ করেছিল বুঝি?"

সুমন্ত একটু হাসিল, বলিল, "সেই রকমই বটে।"

ভোলা বলিল, "এখন থাকবে তো দেশে?"

পতিরাম সক্রোধে বলিল, "সেই একটা বাউণ্ডুলে লোক এসেছিল না, সেই লোকটাই তো আমাদের দাদাবাবুকে জুড়ে নিয়ে বার করলে। ঘরের ছেলে দিব্যি ঘরে ছিল, তাকে কি যে যাদুমন্তর দিলে যাতে ঘর তুশ্চু করে দাদাবাবু বার হল পথে আজ একবার সে লোকটাকে দেখতে পাই—ধরে আছাড় দেব।"

পরাণ জেলে তাহার পেশীবহুল হাত দুখানা শূন্যে আন্দোলন করিয়া কেবল চোখ দুইটা পাকাইয়া চারিদিকে ঘুরাইল।

মোহন জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ি থাকবে ত দাদাবাবু?"

ভোলা বলিল, "তোমার বিয়ে দিয়ে এবার আমরা সংসারী করব। আমি সেদিন পাঁচগোড়ায় গেছলুম, সেখানে দেখলুম একটি মেয়ে বটে—আঃ, সে কি সুন্দর তা আর কি বলব দাদাবাবু, যদি একবার দেখতে—বুঝতে বটে, একেবারে লক্ষ্মী পিরতিমে। খোঁজ নিয়ে জানলুম ওখানকার চৌধুরীদের মেয়ে—লেখাপড়ায়, গানে বাজনায় ঘরের কাজকর্মে সব দিক দিয়ে মেয়ে গুণে মা সরস্বতী। চুপচাপ সব খবর নিলুম, তারপর তাঁদেরকে যেই না তোমার কথা বলা, তাঁরা ত একেবারে লাফিয়ে উঠলেন—তখনই সব রাজি—এখন বিয়ে হলেই হয়।"

ভ্রূভঙ্গি করিয়া সুমন্ত বলিল, "একেবারে সব ঠিকঠাক—?"

সগর্বে ভোলা বলিল, "হবে নাই বা কেন—যুগীপুকুরের রায়বাড়ীর নাম শোনেনি এমন লোক এ তল্লাটে আছে? তারপরে তোমার বাবা—আমাদের বড়বাবুকে না চেনে এমন লোকই নেই—ছোট কর্তাকে চেনে কে বলতো?"

সুমন্ত অন্যমনস্কভাবে বলিল,—"দেখা যাক—কপালে যদি থাকে বিয়ে হবে। আসল কথা ওই—আমার কপাল আর তোমার হাতযশ ভোলা—

বলিতে বলিতে সে জোর করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

আড়াই বৎসর পরে সুমন্ত বাক্সগুলো খুলিয়া দেখিতেছিল

ঠিক এমনই সময় দরজায় দাঁড়াইল একটি মেয়ে, তাহার উপস্থিতি অনুভব করিয়া সুমন্ত মুখ তুলিল—

"হুঁ, আমিও তাই ভেবেছি রাজলক্ষ্মী, তুমি আসবেই, না এসে থাকতে পারবে না। এসো, তোমায় অভ্যর্থনা করছি।"

রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে তাহার পানে খানিক তাকাইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "থাক অভ্যর্থনার দরকার আর নেই। তারপর, খাবার কি এখানে আনব, না আমাদের বাড়িতে গিয়ে খাবে?"

"খাবার—"

সুমন্ত বিস্ফারিত চোখে তাহার পানে তাকাইল—

রাজলক্ষ্মী বলিল, "খাওয়া যে হয়নি তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কেবল আজই নয়, কয়দিন পেটে ভাত পড়েনি তাও বুঝেছি। ওঠো, খেতে চলো আগে।"

সুমন্ত বলিল, "কিন্তু এগুলো—"

সংক্ষেপে রাজলক্ষ্মী বলিল, "এখন থাক, পরে হবে।"

সুবোধ বালকের মতই সুমন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল, দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া সে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সমস্ত পথ রাজলক্ষ্মী নির্বাক গেল। নিজের বাড়িতে পৌঁছাইয়া সে যখন দরজা খুলিল, সুমন্ত দেখিল ঘরের মেঝেয় পরিপাটিভাবে আসন, জল, লেবু, লবণ সব দিয়া সে গুছাইয়া রাখিয়া গেছে।

সুমন্তের পানে তাকাইয়া রাজলক্ষ্মী বলিল, "ওখানে জল আছে, হাত পা মুখ ধুয়ে এসে আসনে বসো, আমি ভাত নিয়ে আসি।"

সে আদেশ সুমন্ত অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, হাত মুখ ধুইয়া আসনে বসিতে বসিতে রাজলক্ষ্মী ভাতের থালা আনিয়া রাখিল।

ভাত ও তরকারীর পানে তাকাইয়া সুমন্ত সবিস্ময়ে বলিল, "এত?"

রাজলক্ষ্মী বলিল, "বেশী নয়।"

সুমন্ত ভাতে হাত দিল, ডাল দিয়া কতকটা ভাত মাখিতে মাখিতে বলিল, "দুটি বছর জেলে বাস করে সম্প্রতি অত বড় ব্যারামটায় ভুগে আমার খাওয়া একেবারেই কমে গেছে রাজলক্ষ্মী। আড়াই বছর আগের খাওয়া অনুযায়ী তুমি ভাত, তরকারী দিয়েছো, কিন্তু বর্তমান পাকস্থলী এত বোঝা বইতে বিমুখ।"

বিবর্ণ হইয়া গিয়া রাজলক্ষ্মী বলিল, "তুমি জেলে গিয়েছিলে, দুই বছর জেলে ছিলে—?"

সুমন্ত এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে উত্তর দিল, "তা ছিলুম বই কি? খোঁজ নিলে হয়তো জানতে পারতে, খোঁজ করার আর তো কেউ নেই, কাজেই জানা যায়নি।"

রাজলক্ষ্মী কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল।

মাছের ঝোলের বাটিটা আনিয়া দিয়া বলিল, "থাক, নেহাৎ দিয়েছি বলেই ডাল তরকারী সবই যে খেতে হবে তার কোন মানে নেই; তুমি মাছের ঝোল দিয়ে যা পারো তাই খাও।"

"মাছের ঝোল—তুমি মাছের ঝোল করেছো—?"

সুমন্ত রাজলক্ষ্মীর পানে তাকাইল; বিধবা হইয়া পর্যন্ত রাজলক্ষ্মী আমিষ কিছুই স্পর্শ করে নাই তাহা সে জানিত।

রাজলক্ষ্মী একটু হাসিল, বলিল, "হ্যাঁ আমিই রেঁধেছি। আমি মনে করছি ওতে আমার বিশেষ পাপ হয়নি; এর পর গিয়ে একটা ডুব দিয়ে এলেই হবে, তুমি খাও।"

নিস্তব্ধে সুমন্ত আহার করিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখ হয়েছিল কোথায়?"

সুমন্ত উত্তর দিল, "জেলে, বাঁচবার আশা ছিল না, অদৃষ্টে আরও কষ্ট আছে বলেই বেঁচে ফিরেছি।"

রাজলক্ষ্মী একবার তাহার সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, তাহার পর বলিল, "জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—কি অপরাধে জেল হয়েছিল?"

সুমন্ত বলিল, "পারো; আজ আমি স্বীকার করছি রাজলক্ষ্মী, সেটুকু জিজ্ঞাসা করার অধিকার তোমার আছে। আমি রাজনৈতিক বন্দীরূপে জেলে গেছলুম—অপরাধ ডাকগাড়ি লুঠ করা—রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা।"

পাংশু হইয়া গিয়া রাজলক্ষ্মী বলিল, "কত দিনের জন্যে জেলের আদেশ হয়েছিল?"

সুমন্ত মাছের কাঁটা বাছিতে বাছিতে বলিল, "যদি বলি পাঁচ বছরের জন্যে—"

রাজলক্ষ্মী হাঁকাইয়া উঠিয়াছিল, "পাঁচ বছর, তবে এই দু'বছর হতে তুমি এলে কি করে?"

সুমন্ত মুখ তুলিল, হাস্যোজ্জ্বল দুইটি চোখের দৃষ্টি রাজলক্ষ্মীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল "যদি বলি আমি জেল হতে পালিয়েছি—"

রাজলক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া গেল।

সুমন্ত শান্ত কণ্ঠে বলিল, "তোমার কাছে সত্য কথাই বলব রাজলক্ষ্মী—আমার পাঁচ বছরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। অপরাধটা বড় কম নয়, আমি রাজদ্রোহীর দলে লাফ দিয়েছিলুম, অনেক কিছু আমি করেছি, ধরা পড়ে দণ্ডাদেশও নিয়েছি। বেনারস জেল হতে আমায় লক্ষ্মৌ জেলে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই সময় আমি পালিয়েছি। অসুস্থ দুর্বল বলে রক্ষী তেমন দৃষ্টি রাখেনি, কাজেই আমার পালানোর সুযোগ হয়েছিল।"

রুদ্ধশ্বাসে রাজলক্ষ্মী বলিল, "তারপর?"

হাসিয়া উঠিয়া সুমন্ত বলিল, "তারপর সোজা একেবারে ট্রেনে উঠে যুগিপুকুর গাঁয়ে পৌঁচেছি।"

রাজলক্ষ্মী বলিল, "এতক্ষণ নিশ্চয়ই তা হলে হুলুস্থূল পড়ে গেছে—"

তাহার কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল।

সুমন্ত মুখ তুলিল, অপলক দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ রাজলক্ষ্মীর মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, "তাতে হয়েছে কি?"

"তাতে হয়েছে কি—"

রাজলক্ষ্মী একটি কথাও বলিতে পারে না, সুমন্তের দৃষ্টি হইতে মুখখানা আড়াল করিবার জন্য সে দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

সুমন্ত এবার জানিতে পারিল না, হাসিবার কথাও তাহার মনে হইল না। ধীর কণ্ঠে বলিল, "আমি হয়ত পালাতুম না রাজলক্ষ্মী, সেদিন রাত্রে জেলের বিছানায় শুয়ে আমি স্বপ্ন দেখলুম এই গাঁয়ের, এই গাঁ আমায় ডাকছে। আমার

ভিটেয় আমার পিতৃপুরুষদের আত্মা হাহাকার করে ফিরছে—তারা আমার হাতের পিণ্ড চায়—তাদের মধ্যে আছেন আমার শত অপরিচিত পিতৃপুরুষের মধ্যে আমার মা, আমার বাবা। আমি থাকতে পারলুম না রাজলক্ষ্মী, পিতৃপুরুষকে মুক্ত করতে, তাদের প্রার্থিত পিণ্ড দিতে আমি পালিয়ে এসেছি।"

খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল, "আইনের চোখে আমি অপরাধী, অন্তরের দেবতার কাছে অপরাধী নই রাজলক্ষ্মী। আমি ভগবান কোনদিনই মানি নি, বিশ্বাস করিনি, কিন্তু অন্তর দেবতাকে আমি অগ্রাহ্য করতে পারি নি—ওর আহবান আমি শুনেছি, ওকে আমি পূজা করেছি, মেনেছি ওর সম্পূর্ণ সত্তাকে।"

রাজলক্ষ্মী প্রবলভাবে মাথা নাড়িল, "না, ওইখানেই তুমি ভুল করেছো, তুমি অন্তর দেবতার সত্তাকে সম্পূর্ণ মানতে পারোনি, তার নির্দেশ তুমি মেনে চলতে পারোনি, অনেক কিছুই তুমি বাদ দিয়ে গেছো, অনেক কিছুই—"

বলিতে বলিতে সে একেবারে যেন কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সুমন্ত হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল,—এই মুহূর্তে মনে জাগিয়া উঠিল ছোটবেলার কথা—

রাজলক্ষ্মী এবং সুমন্ত খেলাঘরের বরকনে—ভবিষ্যৎ জীবনে কে কোন্ পথে যাইবে তাহা কেহই জানিত না। সেদিনকার রাজলক্ষ্মী আজও সে আছে, সুমন্তের সামনে সে দুর্ভাগিনী মেয়েটি সর্বহারার মতই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে—সে সেই রাজলক্ষ্মী।

সান্ত্বনা দিবার ভাষা সুমন্তের মুখে ফুটিল না, তাহার কণ্ঠ যেন শুকাইয়া উঠিয়াছে।

"রাজু—লক্ষ্মী—"

সুমন্ত বাম হাতখানা রাজলক্ষ্মীর জানুর উপর রাখিতে গিয়া সরাইয়া লইল, মনে পড়িয়া গেল সেদিনকার লক্ষ্মী আজ অনেক বড় হইয়া গেছে সে পরস্ত্রী, বিধবা।

রাজলক্ষ্মী যেমন হঠাৎ কাঁদিয়াছিল, তেমনই হঠাৎ শান্ত হইয়া গেল। অঞ্চলে চোখমুখ মুছিয়া ফেলিয়া একটু হাসির রেখা মুখের উপর ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আ আমার পোড়াকপাল, হাত গুটিয়ে বসলে যে—খাওয়া হল না? আর হবেই বা কি, খাওয়ার সময়ই আমার যত মাথামুণ্ড কথাবার্তা শুরু হল। কিন্তু তা হোক সুদা,—ভগবান পোড়া মেয়েমানুষের চোখে অজস্র জল রেখেছেন, একটুকু নাড়া পেলেই সে জল ঝড় ঝড়িয়ে পড়ে; তাই দেখে পুরুষ মানুষ তোমরা—তোমাদের কি বিচলিত হওয়া চলে—না মানায়, তোমাদের জাতের ধরণ তো তা নয়—"

বাধা দিয়া সুমন্ত বলিল, "হাঁ, আমাদের জাতের বুক পাষাণ দিয়ে গড়া তা জানি, রাজলক্ষ্মী, অন্ততঃপক্ষে তোমরা যে আমাদের সম্বন্ধে কতখানি উগ্র ধারণা করে রাখো তাও জানতে আমার বাকি নেই। সে ধারণা করাটাও কিন্তু মিথ্যে নয় রাজলক্ষ্মী, একনিষ্ঠতা আমাদের কোনকালেই নেই—থাকবেও না একনিষ্ঠতার অহঙ্কার তোমরা করতে পারো—আমাদের জাত সে অহঙ্কার করতেও ব্যগ্র নয়—কি বল?"

বলিয়া অকস্মাৎ সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাজলক্ষ্মীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে কোন জবাব দিল না, স্তব্ধভাবে কেবল সুমন্তের পানে তাকাইয়া রহিল।

সুমন্ত উঠিয়া আচমন করিয়া আসিল, একখানা রেকাবিতে কয়টা পানের খিলি ছিল, সব কয়টাই এক সঙ্গে মুখের মধ্যে পুরিয়া দিয়া প্রাণপনে চিবাইয়া সেগুলিকে কতকটা আয়ত্বের মধ্যে আনিয়া বলিল, "তা বলে মনের বালাই নেই—তা ভেব না। মনের বালাই যথেষ্ট আছে বলে যেখানেই যাই, ঘুরে ফিরে আসি এখানে। যদি খোঁজ নাও জানতে পাবে—আমি পালিয়ে সেদিন কাশীতে বাঙালীটোলায় একটা বাড়িতে গিয়েছিলুম রাজলক্ষ্মী। নিজের পরিচিত কেউ নেই কাজেই খাতির যত্ন পেলুম না, খিড়কীর দরজা দিয়ে ঢুকেছিলুম, পাঁচিল টপকে চলে এলুম।"

"পাঁচিল টপকে এই শরীরে—?"

রাজলক্ষ্মী এতক্ষণে একটিমাত্র প্রশ্ন করিল।

যেন আশ্চর্য হইয়া গিয়া সুমন্ত বলিল, "কেন, শরীরের হয়েছে কি?" পরমুহূর্তে হাসিয়া বলিল, "যাই বল নাম করা বংশের ছেলে হলেও কোনদিন তুলোয় শুয়ে সোনার ঝিনুকে বাটিতে দুধ খাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তা ত বেশই জানো রাজলক্ষ্মী। দুঃখের সঙ্গে চিরকাল যাকে লড়াই করতে হয় সে কতকটা শক্তিশালী হয়ে ওঠে বইকি। বলবে, আগে গাঁয়েই তো ছিলুম,—তখন পথ পাইনি—গাঁয়ের লোককেই নিজের শক্তি সাহসের পরিচয় দিয়ে এসেছি। ক্ষুদ্র হতে বৃহৎ কাজে জড়িয়ে পড়েছি কিনা, ক্ষুদ্র ঘরে জায়গা আর ধরে না, সেজন্যে অপরাধ নিয়ো না—দোষী করো না রাজলক্ষ্মী।"

মুহূর্তে চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "আজ তবে চলি, তুমি এতক্ষণ অতিথি সৎকার করলে—এবার নিজের কাজ একটু করে—খেয়ে দেয়ে নাও। তারপর কাশীতে যাচ্ছো কবে?"

রাজলক্ষ্মী সংক্ষেপে বলিল, "দেখি?"

সুমন্ত বলিল, "তোমায় তারা বলবে আমার কথা, উড়িয়ে দিয়ো, অথবা যদি সাহস থাকে, সত্য কথাই বলো—।"

সে ধীরপদে চলিয়া গেল।

পথ পর্যন্ত গিয়া মনে পড়িল রাজলক্ষ্মীকে একটা কথা বলা হয় নাই।

ফিরিয়া ঘরের বারাণ্ডায় উঠিতে গিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। রাজলক্ষ্মী আহারে বসে নাই, সে যে আসনে বসিয়াছিল, সেই আসনের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

সুমন্ত স্তব্ধভাবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখিয়াছিল, তাহার পর চোরের মতই পা টিপিয়া টিপিয়া আবার বাহির হইয়া গেল।

রাজলক্ষ্মীকে ডাকিবার সাহস তাহার হইল না।

(ক্রমশঃ)

মরীচিকা

অমর সান্যাল

শহরের উত্তরে সম্প্রতি কলোনী গড়ে উঠচে। খানা ডোবা বুজিয়ে, আসশ্যাওড়া আর কচুবন ছেঁটে ফেলে বড় বড় ইমারত মাথা তুলে দাঁড়াল। কোন্ এক ব্যাঙ্কের কর্তারা জমি কিনলেন প্রচুর, চারতলা বাড়িও একখানা পরীক্ষামূলকভাবে তৈরী করালেন। ওপরে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা হল মায়াপুরী। বছরখানেকের মধ্যেই জায়গাটা জেঁকে উঠল। চারতলা বাড়ির ঘরে ঘরে ভাড়াটে এল। দেউড়ীতে পাহারাদার বসল গালপাট্টা দাড়ীওয়ালা হিন্দুস্থানী দরোয়ান। দেশোয়ালী ভেইয়াবেষ্টিত হয়ে সে টুলে বসে খৈনী টেপে আর ঝিমোয়। সবুজ রঙের আগাগোড়া জাফরিকাটা কাঠের সিঁড়িটা এঁকেবেঁকে উঠে গেছে চারতলার ছাদ পর্যন্ত। ছাদে দাঁড়ালে চোখের দৃষ্টি গাছপালা ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যায়। কলকারখানার চিমনির ধোঁয়ায় মনে হয় আকাশে ঘন মেঘ জমেছে, দূরে কোন্ অজানা নদীর পাড়ে বালি চিক্‌চিক্ করচে; চারিদিকের খোলা মাঠ দেখে মনে হয় ঐশ্বর্যকে সদর্পে ব্যঙ্গ করচে একটা বিরাট শূন্যতা।

বাড়ির নীচের তলা দোকানঘরে ঠাসা। দোতলার প্রথম দুটো ঘরে বাড়ির সরকার থাকে সপরিবারে। চর্বিবহুল সুগোল দেহ, চোখেমুখে ধূর্তামির ছাপ,—সরকারকে দেখলেই পাঁজীর রাহুর ছবি মনে পড়ে। মনোতোষবাবু নতুন এসেছেন কলোনীতে। ষাট টাকায় চারতলায় দক্ষিণখোলা ঘর ঠিক করে গেলেন চারখানা। নির্দিষ্ট দিনে এসে দেখেন তাঁর ঘর দখল করে আছে এক ভাটিয়া পরিবার। দরোয়ান তাঁকে উত্তরে ঘর দেখিয়ে দিল। গৃহপ্রবেশের দিনই অভ্যর্থনার এই নমুনো দেখে সরকারের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করতে এসে থেমে গেলেন তিনি। সুরেন শীল ব্যাপারটা আগাগোড়া এমনভাবে দাঁড় করাল যে, ষাট টাকায় ওর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হয় না। মনোতোষবাবু ছাত্রজীবনে পটলডাঙ্গায় দুটাকা সীটরেন্টে মেসের দোতলার ঘর আর ষাট টাকায় মায়াপুরীর চারতলার ঘরে কোন তফাৎ বুঝতে পারলেন না।

যাই হোক, মায়াপুরীর অবস্থাটি ভাল, শহরের উন্মত্ত জীবন-প্রবাহের বহু দূরে। নীচ দিয়ে চলে গেছে পিচঢালা রাস্তা, স্বল্প যানবাহনে মুখরিত। রাস্তার ওপারেই একটা অনাথ আশ্রম, ছেলেমেয়েরা সেখানে অবিরাম খাটবে আত্ম-গরিমায় বিলিয়ে দেওয়া অন্নবস্ত্রের জন্য। আশ্রমের পাশেই একটা সিনেমা, রাতের আলোয় অপরূপ হয়ে ওঠে। বিকেল হলেই রাস্তায় ভিড় জমে যায়। ফিরিওয়ালাদের মিহিমোটা সুর, ভিখারীদের বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না, পথচারীদের দন্তুর হাসি, বাসট্রামের ভেঁপু ও ঘণ্টাধ্বনি জায়গাটাকে সজীব আগ্নেয়গিরির মত সতেজ করে তোলে।

মহামানবের মিলনক্ষেত্র এই মায়াপুরী বিল্ডিং। ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপনের জোর আছে। সুদূর চীন, জাপান ও ইরান থেকেও যাত্রী এসে ঠাঁই নেয় এখানে। তাদের কথাবার্তা, সাজপোষাকের বাহার সারা কলোনীর আকর্ষণী শক্তি বাড়িয়ে তুলেছে। বেশীর ভাগ লোকই ব্যবসা উপলক্ষ্যে আসে। এদেশের ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজ বপন করে, অবসর সময় খানাপিনা আমোদ আহ্লাদে কাটিয়ে, একচেটে মোটা টাকা হস্তগত করে তারা বিজয়ীর মত স্বদেশে ফেরে। বাঙালী যে কজন আছে, তাদের মধ্যে সকলেই চাকুরে না হয় বেকার। বিলেতফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার বোস সায়েবের ঘরে রোজ সান্ধ্য আড্ডা বসে। হুইস্কি থেকে আরম্ভ করে ধেনো পর্যন্ত সেখানে চলে। বিদেশী আগন্তুকদের সম্বন্ধে একে একে মন্তব্য প্রকাশ করে সকলেই। কিন্তু কথায় সবচেয়ে জোর হয় সত্যর।

মায়াপুরীর বেকার সঙ্ঘের একচ্ছত্র নেতা সত্য। লম্বা সুপুরুষ, মজলিসী লোক। কাজ করেচে অনেক, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেনি কোনটাতেই। এ বাড়িতে সে কবে এসে জুটেচে তার হিসেবও কেউ রাখে না। হ্যাটকোট পরে শেয়ার মার্কেটে রোজ বেরোয় বটে, কিন্তু এখানে তার খরচ জোগায় সবিতা রায় একথাও সকলে জানে।

বোসের ঘরে সান্ধ্য আড্ডায় সবিতাকে আমি প্রথম দেখি। সত্যর সঙ্গে ঘরে এলেন হঠাৎ একদিন। আমরা উঠে দাঁড়ালাম; তিনি নমস্কার করে সত্যর পাশেই চেয়ারে বসলেন। আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল সত্য,—তার বান্ধবী। কৌতূহলভরা দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে থাকলেন সকলের দিকে। রং ময়লা, চেহারায়ও এমন কিছু শ্রী নেই। নিতান্ত সাধারণ মেয়ে।

সত্যর কাছে এসে তাঁর পরিচয় পেলাম। কয়েক বছর আগে তাকে কি একটা কঠিন ব্যারামে ধরে; সরকারী হাসপাতালে কাটাতে হল তিন মাস। এই সময়ের মধ্যে সে হাসপাতালে সকলের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছিল। পাশের শূন্য বেডটি হঠাৎ একদিন ভর্তি হয়ে গেল। রোগী এল উত্তর কলোনীর অনাথ আশ্রম থেকে ছোট একটা ছেলে। বৈকালে তাকে দেখতে এল আশ্রমের ব্যাজ-আঁটা একটি মেয়ে। তার পর থেকে রোজই আসে সে। ছেলেটির কাছে বসে, গল্প করে চলে যায়। হাসপাতালের আর কোন প্রাণীর সম্বন্ধে তার যেন কৌতূহল নেই। ছেলেটির সঙ্গে সত্য ভাব করে ফেলল; সে বললো,—উনি আশ্রমের ছোট দিদিমণি, তাদের ভালবাসেন খুব। এরি মধ্যে একদিন তার অসুখ গেল বেড়ে। সারারাত তার যন্ত্রণা-কাতর চীৎকার নার্সরা থামাতে পারে না! ঠিক হল ছোট দিদিমণি রাতে থাকবেন তার কাছে। কিছুদিন পরে নামল বর্ষা। এক একদিন নিস্তব্ধ রাত্রি বৃষ্টিধারায় মুখর হয়ে উঠত; ঘুমের ঘোরে সত্য অনুভব করত কে যেন তার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, সার্টের বোতাম খুলে গায়ের

তাপ পরীক্ষা করবে। একদিন সে ধরে ফেলল তার শুশ্রূষাকারিণীকে।

অসুখ সেরে সত্য আশ্রয় নিল উত্তর কলোনীর মায়াপুরী বিল্ডিং-এ। সবিতা তাঁর আশী টাকা মাইনে থেকে ত্রিশটি টাকা মাত্র নিজের রেখে বাকী টাকায় সত্যর হোটেলের খরচ যোগাতে লাগলেন। টাকা পেয়ে সত্য খুসী হল। সবিতার ওপর তার টান থাকলেও টাকার মর্যাদা সে অমান্য করল না। পাঁচ বছর ধরে তিনি মায়াপুরীতে যাতায়াত করছেন, গোপনে কত রাত কাটিয়ে গেছেন, আশা তাঁর এখনও আছে সত্য একদিন তাঁকে বিয়ে করবে।

সবিতা যেদিন আসেন, সত্যর ঘরে সেদিন আমাদের আড্ডা বসে। আমি একদিন তাঁকে বললাম,—আপনাকে আমরা দিদি বলে ডাকব, কেমন? তিনি হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে বললো,—বেশ ত। তখন থেকে আমাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার খুব সহজ হয়ে গেল। সত্যর অনুপস্থিতিতেই আমরা তাঁর ঘরে তাঁর সঙ্গে আলাপ, হাসিঠাট্টা করতাম। তাঁর হাসি আমার খুব ভাল লাগত; একটা হাসির কথা উঠলেই তিনি সত্যর বিছানায় হেসে লুটোপুটি খেতেন। দেখতাম বিছানাটি তিনি ঝেড়ে নতুন করে পেতে রেখেছেন, আলনায় সত্যর কাপড় রেখেছেন কুঁচিয়ে, তার জুতো রেখেছেন ব্রাস করে। সভায় সত্য উপস্থিত থাকলে তাকে তিনি ঠাট্টা করে, হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে, তার ওপর অভিমান করে নাজেহাল করে তুলতেন।

সব রাতে সত্য বাড়ি ফিরত না; সবিতার হাসিমুখ ম্লান হয়ে যেত। আমরা সেদিন হয়ত একটু বেশীক্ষণ থাকতাম সত্যর ঘরে, কিন্তু আলাপ আর জমত না। সাড়ে সাতটার পরই তিনি চঞ্চল হয়ে উঠতেন। একবার বিছানায় এসে বসতেন, একবার উঠে গিয়ে দাঁড়াতেন ব্যালকনিতে। পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দৃষ্টি ভারী হয়ে যেত, কেমন একটা ব্যথাকরুণ ভাব তাঁর চোখ বেয়ে যেন ঝরে পড়ত। তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ফ্যানের হাওয়া আমার কাছে গরম হয়ে উঠত।

আমার ঘর সত্যর পাশেই। সেদিন চাপাকান্নায় অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেত। মনে মনে সত্যর মুণ্ডপাত করতাম। সে হয়ত তখন নেশায় বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে কোন অভিনেত্রীর বাড়ীতে।

এর পর সবিতা চারপাঁচ দিন অনুপস্থিত থাকতেন। টাকার অভাব হলেই সত্য যেত কপট অভিনয়ে তাঁর মান ভাঙ্গাতে। বোসের ঘরে আমরা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতাম। বোস নিজে লোকটা দিলদরিয়া। বিলাতী আবহাওয়ার ঘূর্ণিপাকে তার সামাজিক মন তখনও তলিয়ে যায় নি। সবিতার সম্বন্ধে তার ধারণা খুব উঁচু। কেবল রাস্কেল সত্য মেয়েটার সর্বনাশ করে তাকে পথে বসাবে এই রূঢ় সত্যটাই বোস জোর গলায় প্রচার করত আমাদের সভায়। বোসের সঙ্গে এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত ছিলাম। কেবল মনস্তত্ত্ব-বিশারদ কেশব মিত্তির বলত,—মেয়েটা আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়েছে। আমার ত জানা ছিল পুরুষেরাই এবিষয়ে অগ্রণী হয়ে টাকা খরচ করে; কিন্তু সত্য ত ইচ্ছামত মেয়েটাকে পাচ্ছেই, তার উপর টাকাও পাচ্ছে অনেক। মুখুয্যে মিত্তিরকে খোঁচা দিয়ে বলত,—চেহারা, মিত্তিরমশায় চেহারা। কালো বেঁটে চেহারা, একমুখ দাড়ী দেখে যে কোনও মেয়ে ভয়ে পিছিয়ে যাবে। জানেন ত, এর আগে সত্য কমসে কম এক কুড়ি মেয়ের লাভার ছিল।

এসব আলোচনায় আমি যোগ দিতাম না। সত্যর সম্বন্ধে আমি যেটুকু জানি তাই যথেষ্ট। সবিতার জন্য কষ্ট হত। চোখের সামনে করুণ দৃশ্য ভেসে উঠত,—সত্যর বালিশে মুখ গুঁজে তিনি কাঁদছেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

মায়াপুরীতে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিল অশোক সেন। জলপাইগুড়ির কোন এক জমিদারের ছেলে সে, মাসে মাসে মনিঅর্ডার আসে দেড়শ টাকা। উত্তর কলোনীর আবহাওয়া তার ভাল লাগাতে একেবারে তিনখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সভৃত্য সংসার পাতিয়ে বসল। আশোক ছেলে ভালই; এম-এ পড়ে, বাড়ির সরকারকে ত্রিশ টাকা আর বাঙ্কাকে আর ত্রিশ ফেলে দিয়ে বাকী টাকা হাতখরচ করে। জলপাইগুড়ির নিরন্ন কৃষক পাঁচু সেখ, বিষ্টু ভূঁয়ের টাকার সদ্ব্যয় হয় সায়েবপাড়ার হোটেল আর সিনেমায়, পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ট্যাক্সীতে আর কলেজের মেয়েদের পায়ে। বয়সে ছোট হলেও আশোক আমাদের আড্ডার একজন বিশিষ্ট সভ্য হয়ে উঠেছিল।

সে ছিল সবিতার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র। আমাদের সঙ্গে চালচলনে একটু ব্যবধান রাখলেও, অশোকের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতেন ঠিক দিদির মত। এবাড়িতে একমাত্র তার ঘরেই তিনি যেতেন, তার সহস্র আবদার সহ্য করতেন হাসিমুখে। কোন কোন মাসে অশোক দেড়শ টাকায় খরচ কুলিয়ে উঠতে পারত না, তিনি কোথা থেকে টাকা এনে দিতেন। অশোক শোধ দিতে ভুলে যেত। সে কিন্তু সবিতাকে দিদির মতই ভালবাসত, ভক্তি করত। পকেটভরে তাঁর জন্য চকোলেট নিয়ে আসত। কোনদিন বা আনত রজনীগন্ধার গুচ্ছ। কতদিন আমরা দেখতাম, সবিতা অশোকের চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন, তার বইগুলো গুছিয়ে রাখতেন। রাতের বেলা সত্য না ফিরলে সে ছাড়া আর কেউ তাঁকে শান্ত করতে পারত না। বোসের ঘরে আড্ডায় সে প্রায়ই বলত,—দিদির মত মেয়ে যে কোনও দেশের গর্ব। আমাদের সামনেই ত সে তাঁকে কতবার তাদের দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইত।

সেবারে অঘ্রাণের গোড়াতেই শীতটা পড়ল জাঁকিয়ে। ঠাণ্ডা উত্তরে হাওয়ায় শহরের চেহারা বদলে গেল। সন্ধ্যাবেলাটা ধোঁয়ায় ধূসর হয়ে ওঠে; একটু রাত হলেই পথে লোক চলাচল কমে যায়। কেবল অনাথ-আশ্রমের ছেলেমেয়েদের পরিশ্রমের কোন লাঘব হয় না। ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তাদের কাজ একটানা চলে। লাল কম্বল গায়ে খালি পায়ে তারা ভোরবেলা বাগানে মাটি খোঁড়ে, গাছে জল দেয়। রাত দশটায় আবার এসে খোলা মাঠে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে কি একটা স্তব পাঠ করে। মায়াপুরীর সুখাদ্যপুষ্ট ভাগ্যবানেরা ওভারকোট গায়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের কৃচ্ছ্রসাধন দেখে, আর আশ্রমের

কর্তাদের বদান্যতার তারিফ করে। বিদেশী আগন্তুকেরা জায়গাটাকে একটা রিফরমেটারী স্কুল বলে ধরে নিয়েচে।

আমি কিন্তু আর একটা ব্যাপারে বিচলিত হয়ে উঠছিলাম। সবিতার অনুপস্থিতি। দিন পাঁচেক আগে সত্যকে টাকা দিয়ে সেই যে সকালবেলা তিনি চলে গেলেন, তারপর আর তাঁর দেখা মিলল না। সত্যও রাতে ফেরে না, এবং জানতাম যে টাকা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর খোঁজ সে নেবে না। শেষ পর্যন্ত আমরাই একদিন তাঁর খবর নিতে গেলাম।

অনাথ-আশ্রমের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই লালরঙের একতলা বাড়ি শিক্ষয়িত্রীদের কোয়াটার্স। শুভ্র পরিচ্ছদে চারপাঁচটি মেয়ে ডিউটিতে যাচ্ছে। যারা ডিউটি সেরে আসচে তারা এবার সেজেগুজে বেরুবে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রক্ষা করতে। ছোট দিদিমণি সবিতা রায় থাকে কোণের ঘরটিতে। সেদিকে পা বাড়িয়েই দেখি তিনি এগিয়ে আসচেন আমাদের অভ্যর্থনা করতে। বড় ম্লান দেখাচ্ছে তাঁকে। অবিন্যস্ত চুল কপাল বেয়ে পড়েচে চোখের ওপর, গায়ে একটা র‍্যাপার জড়ান, শুকনো ঝরা পাতার মত অসহায় চেহারা। ঘরে এসে আমি বল্লাম,—দিদিমণি কি আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়ে দিচ্ছেন? তিনি বললেন,—সেদিন তোমাদের ওখান থেকে ফিরেই জ্বরে পড়েচি ভাই। নতুন হিমলাগা জ্বর, সেরে যাবে দু'একদিনের মধ্যেই। কথাপ্রসঙ্গে জানলাম, সত্য একদিনও আসেনি খোঁজ নিতে।

সবিতার ছোট ঘরখানি দেখে তাঁর রুচির প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। সাজান গুছান ঘরখানি দেখাচ্ছে ছবির মত। বোস বললে,—বিলেতে খুব ভাল হাজিফরাও এরকম ঘর সাজাতে পারে না। আমাদের দেখে সবিতা রোগযন্ত্রনা ভুলে গেলেন। তাঁর আদরআপ্যায়নে মিত্তির পর্যন্ত তার পূর্বধারণার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে উঠল। অশোককে ত তিনি স্নেহের অত্যাচারে ব্যস্ত করে তুললেন। হঠাৎ মুখুয্যে বললে—দিদিমণি, অশোককে আর বেশী আদর করবেন না। এই মাসেই ওর বিয়ে। তখন কিন্তু ওর নাগাল পাওয়া কঠিন হবে। খবর শুনে সবিতা উল্লাসে আমাদের উপস্থিতি এক রকম ভুলে গিয়ে অশোককে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর দুচোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল তার মাথার ওপর দিদির আশীর্বাদের মতই। মুখে শুধু বললেন—আমাকে নিয়ে যাবে ত ভাই?—

অশোকের বিয়ে হল উত্তর কলোনীতেই পশুপতিনাথ রোডে একটা বাড়ী থেকে। রবিবারের দুপুরবেলা বৌভাত। মায়াপুরীর আমরা কজন গেলাম সদলে। খাওয়াদাওয়ার পর সন্ধ্যাবেলা বসল গানের আসর। পুরুষদের পাশে মেয়েদের বসবার জায়গা হয়েচে। আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সবিতার দেখা পেলাম না। চুপি চুপি এক সময় অশোককে জিজ্ঞাসা করলাম,—দিদিমণির নেমন্তন্ন হয় নি? অশোক সংক্ষেপে বললে—না। এসব সামাজিক ব্যাপারে ওঁকে নেমন্তন্ন করা যায় না। আমি বুঝতে পারলাম না মায়াপুরী বিল্ডিংএর অসামাজিক অশোক সেন বিয়ে করে রাতারাতি কি করে সমাজপতি হয়ে উঠল। নাচগান তখন বেশ জমে উঠেচে। অশোকের বাবা বোসের পাশে বসে হেঁ হেঁ করচেন; সত্য নিশ্চিন্ত মনে হেসে হেসে আলাপ করচে একটি মেয়ের সঙ্গে। রাত হয়ে আসচে; সবিতা নিশ্চয়ই সত্যর বিছানায় শুয়ে চোখের জল ফেলচেন।

বাড়ি ফিরে শুনলাম সবিতা আসেননি। আমি আর মুখুয্যে ছুটলাম তাঁর কোয়াটার্সের দিকে। ঘরের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম একটা র‍্যাগ জড়িয়ে বসে কি একখানা বই তিনি পড়চেন। আমাদের দেখে বই রেখে বললেন,—এস ভাই। আমরা হাত জোড় করে বললাম,—দিদিমণি আমাদের মাপ করতে হবে। সবিতা বিস্মিত হয়ে বললেন,—সে কি ভাই, তোমরা ত কোন অন্যায় করনি। অশোক আমাকে নেমন্তন্ন না করে ভালই করেচে। তাদের বাড়িতে কত গণ্যমান্য লোক আসবে, কত ভাগ্যবতী আসবে সিঁথেয় সিঁদুর দিয়ে, তাদের মধ্যে আমার স্থান কোথায় ভাই? অশোক বুদ্ধিমান ছেলে, সে ভেবেচিন্তেই আমাকে বাদ দিয়েচে। তারপর একটু নিম্নস্বরে বললেন তাকে দেখলে ত? মুখুয্যে এতক্ষণ রাগে অভিমানে ফুলছিল। সে বললে, দিদিমণি, যে সামাজিক উৎসবে আপনার স্থান হয় না, সত্যর মত পাষণ্ডের স্থান হয় সেখানে কোন নিয়মের জোরে? সবিতা কোন উত্তর দিলেন না। তাঁর গাল বেয়ে পড়তে লাগল ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল। এতদিনে যেন তাঁর দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েচে।

বাঙ্‌লার মেয়ে

শ্রীহাসিরাশি দেবী

বৌদি এসেছে, নূতন বৌদি, তাই বৌ দেখার এই আমন্ত্রণ!......

নির্মাল্য জানে, দাদা যতভাবে এবং যত দিক দিয়েই সনাতন প্রথাটাকে উচ্ছেদ করতে থাকুন, অন্তঃপুরের দিকে হাত বাড়াবার উপায় তার নেই; সেখানে মামিমা তাঁর দৃঢ় মুষ্টিতে যে শাসনদণ্ড ধরে আছেন সে দণ্ডকে এড়িয়ে—সদর তো নয়, খিড়কির পথেও আনাগোনা অসম্ভব, মামিমার সজাগ দৃষ্টি সর্বত্র।......

শ্বশুর বাড়ি থেকে নূতন এসে মামাতো বোন বীণা বলে—

"মা'র সবই বাড়াবাড়ি। নইলে এখনকার দিনে কে আবার অত বিধিনিষেধ প্রতিপালন করে চলতে পারে বল দিকি! মেয়ে মানুষ চলবে আস্তে, বলবে আস্তে, মুখ যেন কেউ দেখতে না পায়! এসব কি আর এখনও চলে? সাধে বলি—সব তাতেই বাড়াবাড়ি! মামিমাকে দেখা গেল খোলা দরোজাপথে; তরকারী-কোটা থালা নিয়ে তিনি হলঘর পার হ'য়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছেন:—

কালো সিমেণ্টের মেঝের ওপোর তাঁর সুগৌর পদ দুখানিকে স্থলপদ্মের সংগে তুলনা না দিতে পারলেও অসুন্দর বলা চলে না। পরণে একখানা তসর। বৈধব্যের কঠিন নিয়ম পালনে দেহ কৃশ হ'লেও তার সংগে তপস্বিনী-দেহের উপমা দেওয়া চলে।......

মুখ ফিরিয়ে মামিমা এইদিকে দৃষ্টিপাত করতেই বীণা থেমে গেল; মামিমা কিন্তু নিরুত্তর; যেমনভাবে যাচ্ছিলেন, তেমনিভাবেই নির্বাকে দালান পার হয়ে অপর পার্শ্বের রান্নাঘরে অদৃশ্য হলেন; সেখান থেকে ভেসে আসতে লাগলো ঠাকুরকে চালকুমড়োর ঘণ্ট রান্নার উপদেশাবলী।

বীণা হঠাৎ ভাবোচ্ছ্বাসের মুখে বাধা পেয়ে কোলের ছেলেটাকে কোলের ওপোর থেকে—"ওঠ ওঠ বলছি কোল ছেড়ে· এত বড় ছেলে হতে গেল, একবিন্দু ঘাড় ছাড়বে না! কত সই বলতো সেজদা, অন্য মেয়ে হলে এতক্ষণ পিটিয়ে আটাপেটা করতো, নেহাৎ আমি বলে তাই......"

ক্রন্দনমুখর কণ্ঠস্বরে সে ঘরখানাকে কাঁপিয়ে তুললে।

নির্মাল্য এখানে নবাগত; মামার বাড়ির সংগে সম্বন্ধ তার একেই কম বরাবরের জন্যে, তার ওপোর মা গিয়ে অবধি তিন বৎসর কোনও খবরই নেয়নি সে সেখানকার; এমনি অবস্থায় হঠাৎ একদিন দাদার সংগে দেখা হয়ে গেল পথে।......

দাদার নাম গোলক; বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। চাকরী করেন শিক্ষকতার।

দুই একটা কুশল প্রশ্ন ও উত্তরের পরে গোলক জানালেন, এতদিন পরে তাঁর কৌমার্যব্রত ভঙ্গ হয়েছে অর্থাৎ বিবাহ ক'রেছেন; সুতরাং মা'র ইচ্ছা যে, এই উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনকে একত্র করেন; তাই তাঁর নির্মাল্যকে জানানো।

অগত্যা নির্মাল্যকে আসতে হলো।......

পূর্ব পরিচিত পথঘাট!...তবু আজ কত পরিবর্তন ঘটেছে তার! মা'র সংগে যখন সে এসেছিল, সে আজ অনেক দিনের কথা; অনেক দিনের দুঃখ সুখ সেই সংগে জড়িয়ে মিশিয়ে মনের মধ্যে চাড়া দিয়ে উঠল আজ!

হাসি এলো তাই নির্মাল্যের!......

স্টেশনে নেমে সে ক্ষণকাল দাঁড়াল; তারপর বর্ষাতিটা গায়ে চড়িয়ে বার হয়ে পড়লো রাস্তায়।......

শ্রাবণের সন্ধ্যা।

ঝিমঝিমে বৃষ্টির সংগে জল হাওয়া ব'য়ে চলেছে অসংস্কৃত পল্লী-পথের পাশের ঝোপঝাড় কাঁপিয়ে,—ভেজা নারকোল পাতা আছড়ে ফেলে। জল-কাদায় পিছল পথ;—এরই দুধারে গরুরগাড়ি চলার চাকার গর্তে গর্তে বৃষ্টির জল ঢুকে উছলে চলেছে; ব্যাঙ্ আর ঝিঁঝির দল বাজাচ্ছে জয়ভেরী।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে! সেও এমনি বর্ষণমুখর একটি সন্ধ্যা, তবে শ্রাবণ মাস কি না, তা মনে নেই।......

ছোট একটা স্টেশন; তার চেয়েও ছোট স্টেশন-মাস্টারের আকৃতি। এতটুকু মানুষ জরার ভারে ন্যুব্জ দেহ, বয়সের বেশী আগিয়ে চলেছেন যেন জেদ করে। গলাবন্ধ কোটটার বুকের ওপোর আড়াআড়িভাবে হাত দুখানা রেখে, ফিরে যাচ্ছিলেন তিনি ডিউটি সেরে নিজের ঘরে।......

নির্মাল্যকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করলেন, "কোথায় যাবেন?"

"বিজন চাটুয্যের বাড়ি, পোস্টমাস্টার বিজন চাটুয্যে—"

"তিনি তো নেই এখানে, বদলি হয়ে গেছেন। কে হন আপনি তাঁর?"......

"বন্ধু......" ...

ভদ্রলোক একবার আকাশের দিকে, একবার নির্মাল্যের মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভাবলেন, তারপরে বললেন,—"কলকাতা থেকে আসছেন আপনি?"

"হ্যাঁ"।

"তবে আপনার ফিরবার গাড়িও তো সেই শেষ-রাত্রে; ততক্ষণ কি করবেন?"

নির্মাল্যও ভাবছিল, কি করা যায় উপস্থিত!

সংকট থেকে ভদ্রলোক উদ্ধার করলেন নিজেই। "যদি কিছু না মনে করেন, তবে রাতটুকুর মত আমার বাসায় পায়ের ধূলো দিলে,—"

নির্মাল্য সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল—"কি বিপদ! আমি আপনার চেয়ে বয়সে ছোট, তাতে জাতিগত পার্থক্যও তো থাকতে পারে!"

হোঃ হোঃ শব্দে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক; প্রাণখোলা হাসি। বললেন,—"অত বিধিনিষেধের গণ্ডি মেনে আসতে পারিনি কোনওদিন, পারব ব'লেও ভরসা হয় না মশাই; তবে

চন্টা দেখা,—তা, সেও মানসিক অবস্থা সাপেক্ষ! হাসির উচ্ছ্বাসটা কমিয়ে তিনি ফিরে তাকালেন,—"কিন্তু মশায়ের নাম?"

"নির্মাল্য গাঙ্গুলী—"

"ব্যস্, আর কিছু জানবার দরকার নেই আমার পরিচয়টা জেনে রাখুন; আমার নাম হরিপদ মৈত্র। পেশা দেখতেই পাচ্ছেন।"

তাড়াতাড়ি পা ফেলে তিনি নিজের বাসায় গিয়ে উঠলেন, পিছনে পেছনে চলল নির্মাল্য। দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে পদার্পণ করতে করতেই হরিপদ ডাক দিতে শুরু করলেন, টুনি ফট্‌কে—ঊষা—অন্নপূর্ণা......"

এর পরেই ডাকলেন,—"বলি ওগো, শুনছো—"

একসঙ্গে ঘর থেকে বার হয়ে এলো গুটি চার-পাঁচ ছোট বড় মেয়েতে ছেলেতে, অন্য ঘর থেকে খুন্তি হাতে এক-খানি ছোট শাড়ি পরনে বার হয়ে এলেন একজন রমণী।

"হরিপদবাবুর পেছনদিকে নজর পড়তেই তিনি মাথার আঁচল টেনে নামিয়ে আনলেন চোখের ওপর পর্যন্ত, ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও ফিস্‌ফিসানি শুরু হয়ে গেল ইতিমধ্যে।

হরিপদবাবু ওঁর বাজখাঁই গলায় ঝঙ্কার তুলে বললেন,—তোমাদের সব আক্কেল কি বলদিকি! বাড়ি এসে চেঁচামেচি না বাধালে তোমাদের গ্রাহ্যই হয় না কিছু।"

ছোট মেয়েটা এসে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নির্মাল্যকে দেখতে দেখতে হরিপদর পরিধেয়র একাংশ মুঠো করে ধরলো; বাবা তুমি যে বলেছিলে, বড়দি'র বর আসবে আমার জন্যে খাবার নিয়ে..."

এক ঝট্‌কায় তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে হরিপদ ঢুকলেন ঘরে—"এস হে এস, কি বলে তোমার নামটা... নির্মাল্য না কি, এস, বসে একটু চা খাওয়া যাক্ আরাম করে।

আলাপী মানুষ হরিপদবাবু, তাই আলাপটা অন্তরঙ্গ হতেও বেশী সময় লাগল না একটা পাতানো সম্বন্ধের সূত্র ধরে। অর্থাৎ ঊষা, ফটিক, টুনি, অন্নপূর্ণার মা—হরিপদবাবুর স্ত্রী মহামায়া দেবীর কোন্ বোনের ছেলে নাকি দেখতে ছিল ঠিক তারই মত, সে আজ নাই; সুতরাং সেই মায়াটা দেখতে দেখতে নাকি গিয়ে পড়ল নির্মাল্যের ওপর। অনুরোধ জানালেন কিছুদিন কতক আর থেকে যাও বাবা, আর একটা কথা....

"বলুন—"

উনি যে কি প্রকৃতির মানুষ, তা দেখতেই পাচ্ছ! মেয়ে ও বড় হয়ে উঠেছে যে, ওর দিকে তাকালে পেটের ভাত আমার হজম হয় না; দেখে শুনে যদি ওর জন্যে একটা পাত্তর ঠিক করতে পারো—

একটু থেমে কতকটা সঙ্কোচ, কতকটা অনুরোধ এবং একটা প্রার্থনার সঙ্গেই জানালেন,—"আর একটা কথা আমার মনে হয়, কিন্তু বলতে সাহস হয় না—।"

ক্ষণকাল নির্বাকে ওর মুখের দিকে নিজের কোটরাগত চোখের দৃষ্টি মেলে রাখলেন মহামায়া, তারপর নিজের রোগা শির-ওঠা হাতের খুলিমলিন শাঁখাটি খুঁটতে খুঁটতে প্রশ্ন করলেন,—"একটা কথা আমার মনে [illegible] ল্য......পছন্দ না হোক্, কিন্তু রূপেও কি আমার ঊষা তোমার অনুপযুক্ত? আমি রাঢ়ী বারেন্দ্র মানি না, নীচু উঁচু ঘরও আমার চাইনে. শুধু তোমার মার মত হলেই......

আনন্দময় প্রত্যাশায় তিনি তাকিয়ে রইলেন নির্মাল্যের মুখের দিকে; কিন্তু নির্মাল্য নির্বাক।

মায়ের মুখের পাশেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তখন ঐ বহু সন্তানের জননী মহামায়ার ক্লিষ্ট মুখখানা। সমস্ত মুখখানায় ওঁর দারিদ্র্যের কষ্টমাখা, পরিচ্ছদেও তার ছায়া ভাসছে, আরও ভাসছে ঐ অর্ধ উলঙ্গ ছোট ছেলেমেয়েগুলির মধ্যে, ওদের আচারে, ব্যবহারেও।......একমাত্র ঊষা ছাড়া।......

উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী ক্ষীণ দেহ তার, লাল পাড় আধময়লা কাপড় সেমিজে ঢাকা, নীচের হাতে দুগাছি রবারের লাল রুলী, মুখে একটা প্রসন্ন গাম্ভীর্য। ঠিক বাপের উল্টো প্রকৃতি দেখা দিয়েছে মেয়ের মধ্যে। নির্বাকে সে কাজ করে যায় সংসারের, নির্বাকেই সারাদিন বয়ে বেড়ায় ছোট ছোট ভাইবোনগুলিকে, মায়ের হাতের কাজ করে গুছায় সংসারখানা। এই-ই যেন তার জীবনের পরম এবং চরম কর্তব্য, আর কিছু সে জানে না, জানবার আগ্রহও নেই।

মহামায়া ডাকলেন,—"নির্মাল্য—"

একটু ভেবে মহামায়া বললেন—কথাটা আমার তুমিও একবার ভেবে দেখো বাবা, তারপর তোমার মাকে জানাব!

তিনি উঠে গেলেন ঘরের কাজে, নির্মাল্যও উঠলো পাখী শিকারের চেষ্টায় বন্দুক কাঁধে ফেলে।

দিন কেটে গেল এমনি করে; রাত্রের অন্ধকারে মানুষ যেমন ভূত দেখলে চমকে ওঠে, তেমনি চমকে উঠলো নির্মাল্য সামনে ঊষাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। শোবার পর একটু তন্দ্রাই এসেছিল বোধ হয়; ভেঙ্গে গেল কিসের শব্দে, কে জানে! কমানো লণ্ঠনের আলোয় তাই ঊষাকে দেখে নির্মাল্য চমকে উঠলো,—"তুমি এ-ঘরে কেন?"

"মা পাঠিয়ে দিলেন—।"

মা যে কেন তাকে পাঠিয়েছেন, তা বুঝতে নির্মাল্যের বিলম্ব হলো না। হাত বাড়িয়ে সে লণ্ঠনের আলো বাড়িয়ে দিলে; সেই আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠলো ঊষার বেদনাক্লিষ্ট মুখখানা, কাতর, অসহায় দৃষ্টি।

একটা দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে এলো নির্মাল্যের বুক থেকে। বললে,—"জানাওগে তোমার মাকে যে, বিয়ে যদি করতে হয়, তবে তোমাকেই করব, কিন্তু আজ নয়। কিছুদিন পরে, মার মত নিয়ে—।"

ঊষা চলে গেল ধীরে ধীরে। পেছনে রেখে গেল ওর না-বলা কথা—সে কথা নির্মাল্যকে সারারাত জাগিয়ে রাখলে তন্দ্রাহীন করে।

ভোরের আকাশে ভেসে উঠলো শুকতারা।

তার পরে আজ তিন বছর কেটে গেছে, মাও মারা গেছেন নির্মাল্যের, কিন্তু ঊষাকে বিবাহ করা হয়নি নির্মাল্যের, খোঁজ করেও কোথাও সন্ধান পায়নি তাদের। হরিপদবাবু নাকি

(শেষাংশ ২২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জয়যাত্রা

শ্রীসুবোধ বসু

পাঁচ

সে সন্ধ্যায় অনুপম বেড়াইতে বাহির হইল না; মনটি বড়ই খারাপ। চাকরি-বাকরি পাওয়া না গেলে পার্কে যাইয়া ও-বাড়ির ঐ জানালাটার দিকে তাকাইয়া থাকিলেই বা কি লাভ। অথচ কোনও দিকেই কোনও রকম সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। অনুপম আশাবাদী; কিছু একটা আশ্চর্যজনক উপায় হইয়া যাইবে, এইরূপ একটা বিশ্বাস তার মগ্নচৈতন্যে বেশ জটিল হইয়া জড়াইয়া আছে। কিন্তু মাসের পর মাস পার হইয়া যাইতেছে; বাজারের তামাম কাগজ আবেদন করিয়া ফুরাইয়া দিবার জোগাড় অথচ বিরূপ ভাগ্যের সদয় হইবার কোনও সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না।

ভোর বেলা কয়টি অ-খোলা চিঠি টেবিলের একধারে জড়ো ছিল; অনুপম একটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উঠাইয়া লইল। খুলিয়াই কিন্তু সে চমকাইয়া উঠিল। বুকটা এক মুহূর্তে ধড়াস ধড়াস করিতে আরম্ভ করিল; চোখটা মাতাল হইয়া উঠিয়া লাইনগুলি খুলাইয়া ফেলিতে লাগিল; রুদ্ধনিঃশ্বাসে অনুপম পুনর্বার তাহার পাঠোদ্ধার করিতে লাগিল :

কিকুভাই বিমলদাস অ্যাণ্ড ভাজিবদার কোং, লিঃ,

১১৭ই হর্নবি রোড, ফোর্ট বোম্বে। পোস্ট বক্স ১০৭৩।

প্রিয় মহাশয়!

আপনার আবেদনের উত্তরে জানাইতেছি যে, যে চাকরিটির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, তাহার জন্য আপনি মাসিক ১৫০৲ টাকা মাহিনায় নির্বাচিত হইয়াছেন। এই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অবশ্যই কাজে যোগদান করিতে হইবে। রাজী হইলে অবিলম্বে তার করিয়া জানাইবেন ইতি—

বৈরামজী মঙ্গলদাস মার্চেন্ট,

ম্যানেজার

এইবার অনুপম তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া খবরটা সারা জগতকে জানাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল, কিন্তু জগতের পরিবর্তে ভজহরির নাম ধরিয়া দারুণ চীৎকার করিতে লাগিল। বারম্বার কোম্পানীর নামটি আবৃত্তি করিতে লাগিল এবং ভজহরি আসিলে আনন্দের আতিশয্যে তাহার পিঠের উপর দমাদম কিল ফেলিয়া কহিল, চাকরি, আলবৎ চাকরি। ভাবা হ'তো বাজে চাল দেওয়া হচ্ছে। এটা কি শুনি?

ভজহরি পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে উৎফুল্ল হইয়া চেঁচাইয়া কহিল, আজ্ঞে, চাকরিই তো। আলবৎ চাকরি। আমি তো জানতুমই...এতো হতেই হবে...

"নিশ্চয়ই হ'তে হবে।" অনুপম পকেটে ফাউন্টেন পেন গুঁজিতে গুঁজিতে কহিল, "হবে না মানে। একি ধান দিয়ে লেখাপড়া শিখেছিলাম? এইবার যাও দিকি, দুসের রসগোল্লা নিয়ে এস, আমি যাচ্ছি, টেলিগ্রাফ অফিসে চট্ করে' ওদের একটা তার করে' দিয়ে আসি...কোথায় জানি পাঁচ টাকার নোটটা লুকিয়ে রেখেছিলাম..."

"কিন্তু দুসের রসগোল্লা দিয়ে তুমি কাকে খাওয়াবে? সারা মেসের বাসিন্দা?"

"ধুত্তোর সারা মেস।" অনুপম স্যান্ডেলে পা ঢুকাইয়া কহিল। "বয়ে গেল মেসকে খাওয়াতে। ১১৮ নম্বরের ঐ উল্লুকটাকে খাওয়াব ঈস্। এক সের আমি, আর এক সের তুই—বাস। আর আমি বক্‌তে পারিনে—এদিকে বড় টেলিগ্রাফ অফিস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাক।"

অনেক রাত হইয়াছে। সারা মেস নিদ্রিত। শুধু অনুপমই আলো জ্বালিয়া চিঠি মক্স করিতেছে। এবার আর আবেদন নয়, রীতিমত ব্যক্তিগত পত্র। এই পত্র ভোরে লেখা চলিত না, তাহা নয়; তবে সকল উপন্যাসেই এই শ্রেণীর পত্র বিনিদ্র রাতে লেখা হয়। বাহিরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না; পার্কের পুকুরের জল পর্যন্ত টলমল করিতেছে; দেবদারু আর ঝাউগাছগুলিকে রূপকথার রাজ্যের শান্ত্রীর মতো মনে হয় এবং উহাদের এড়াইয়া দৃষ্টি রাজকন্যার মহলের দিকে যাত্রা করে, কিন্তু অন্ধকার বাতায়নে কিছু না দেখিয়া মেসের ঘরেই প্রত্যাবর্তন করে এবং টেবিলে ঝুঁকিয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

ভদ্রে, আমি বোম্বাইতে একটি চাকুরি পাইয়াছি। মাইনেটা খুব বেশী না হইলেও দেড়শো টাকাতেই চলিয়া যায়। এখন আপনাকে—বলিয়াছিলাম চাকরি পাইয়া একটা প্রস্তাব করিব—মানে, আপনাকে বিবাহ করিতে চাই। আপত্তি না থাকিলে লিখিবেন; আপনার বাবার কাছে

(গ) "আমাদের ক্লাবের হিসেবে ও আর এমন কি বাহাদুরী?"

(৯) খেলায় অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে আপনি কি দোষ দেন

(ক) নিজেকে?

(খ) আবহাওয়াকে, নিজের স্বাস্থ্যের অবস্থাকে কিংবা ক্রীড়ানককে? না—

(গ) সহ খেলোয়াড়দের?

(১০) কোন বন্ধু যদি জানায় যে তার প্রথম লেখা কাগজে মনোনীত হ'য়েছে তাহ'লে আপনি সে সংবাদ গ্রহণ করেন

(ক) সানন্দ সহকারে?

(খ) বিস্ময়ের সঙ্গে? না—

(গ) বিরক্ত সহকারে?

(১১) কোন বন্ধু তার একটু অপরিচ্ছন্ন বাড়িতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল আপনি ব'লবেন কি

(ক) "বেশ বাড়ি কিন্তু তোমাদের"

(খ) "গিয়ে তোমাদের বিরক্ত ক'রবো না তো?" না—

(গ) "এ কি হে তোমার বাড়ি—রাম, রাম?"

(১২) সিনেমায় আপনি রয়েছেন বক্সে বসে সেই সময়ে চতুর্থ শ্রেণী থেকে কোন বন্ধু যদি আপনাকে চেঁচিয়ে ডাকে তাহ'লে আপনি কি

(ক) চেঁচিয়ে উত্তর দেবেন?

(খ) বক্সে গুঁড়ি মেরে বসে প্রোগ্রামে মনোনিবেশ ক'রবেন? না—

(গ) একজন পরিচারককে ডেকে সেই বর্বর বন্ধুকে বের ক'রে দিতে বলবেন?

(১৩) কার পাশে বসে আপনি খেতে চান—

(ক) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি?

(খ) অপরের শ্রমলব্ধ মাসে হাজার টাকা? না—

(গ) পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি?

(১৪) আপনি কত রোজগার ক'রতে চান—

(ক) নিজে খেটে পঞ্চাশ টাকা?

(খ) আয়ের শ্রমলব্ধ মাসে হাজার টাকা? না—

(গ) কোন জুয়াচুরী ব্যবসায় বছরে লাখ টাকা?

(১৫) আপনি কি চান—

(ক) আপনার পরিবারের স্নেহ?

(খ) আপনার শহরের প্রশংসা? না—

(গ) সমস্ত দেশ আপনাকে ঘৃণা ও ভয় ক'রবে?

এরপর যতগুলি 'ক'-এর পাশে আপনার দাগ পড়েছে তার প্রত্যেকটির জন্য ৫ নম্বর, প্রত্যেকটি 'খ'-এর জন্য ২ এবং প্রত্যেক 'গ'এর জন্য ০ নম্বর বসান।

এইভাবে ৬৫ নম্বরের বেশি যদি পান তাহ'লে আপনাকে সুরুচীসম্পন্ন ব্যক্তি বলা যায়।

২০র নীচে হ'লে রুচীর প্রশংসা করা যায় না। বেশী 'ক' পাওয়াটাই হ'চ্ছে প্রার্থনীয়, তবে অনেকগুলি 'খ' পাওয়াও খুব অগোরবের নয়। আর সবচেয়ে বেশী 'গ' যাঁরা পান তাঁরা নিজেরাই হ'চ্ছেন তার জন্যে দায়ী।
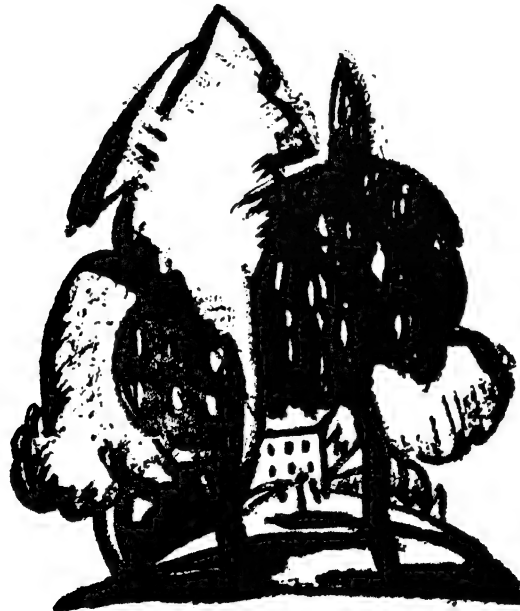
জীবকোষ

(১)

আগের বারে জীবনের লক্ষণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হয়েছে। আমরা একাধিকবার 'জীবকোষ' এই কথাটি ব্যবহার করেছি। এখন এই জীবকোষ সম্বন্ধে কিছু বলব।

প্রথম জীব পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিলো একটি মাত্র কোষের মধ্যে, সাগরের কাছে। এককোষী (Unicellular) বহু জীব এখন বর্তমান। বেশীরভাগ রোগ সৃষ্টিকারী জীব সকল (যাদের জীবাণু বলা হয়) এককোষী অথবা সামান্য কয়েকটি কোষের সমষ্টিমাত্র। এদের কাহাকেও চর্মচক্ষে দেখা যায় না। এদের গঠন বা আকৃতি বুঝতে হ'লে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যের প্রয়োজন।

এককোষী জীবাণু ব্যতিরেকে ক্ষুদ্রতম জীবাণু (যাদের অনুবীক্ষণ ছাড়া দেখা অসম্ভব) হ'তে বৃহত্তম তিমি পর্যন্ত সকল জীবই কোষের সমষ্টি। এই জীব সকলকে মনে হয় যেন তারা জীবনের প্রথম অধ্যায় (অর্থাৎ এককোষীরূপে বর্তমান থাকা) শেষ কোরেছে। এদের বলা হয় 'বহুকোষী' (Multicellular) জীব। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই বহুকোষী হতে পারে অথবা এককোষী হতে পারে। এককোষী উদ্ভিদের উদাহরণ হচ্ছে ইস্ট (yeast) নামক একপ্রকার উদ্ভিদ কোষ। আর এক কোষী প্রাণীর উদাহরণ হচ্ছে অ্যামিবা (amoiba) নামক এক প্রকার প্রাণ কোষ। এ সকল ছাড়া এক কোষী আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বহু কোষীর উদাহরণ বোধ হয় দিতে হবে না—কারণ আমাদের চারিপাশে আমরা যে সকল উদ্ভিদ বা প্রাণী দেখি তারা সকলেই বহু কোষী। এই 'বহু' কথাটা বিশদভাবে বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে, এক রক্তবিন্দুর মধ্যে শত শত কোষ বর্তমান।

কোষ বা cell কথাটা বললেই মনে হয় তার চারপাশে একটি সীমানা আছে। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে কোষের বিষয় জানতে পারা সম্ভব হোয়েছে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। তখন উদ্ভিদ জগতের কোষ সম্বন্ধেই গবেষণা আরম্ভ হয়। উদ্ভিদ কোষের একটি নির্দিষ্ট সীমানা আছে, তাকে বলা হয় wall of the cell বা সংক্ষেপে cellwall. প্রাণীর-কোষের বিষয়ও পরে জানা গিয়াছে। তবে উদ্ভিদ কোষের যে ধরণের আবরণ থাকে, প্রাণী-কোষের সে আবরণ নেই। এখানে বলে রাখা ভাল যে উচ্চস্তরের প্রাণিসকল বহুকোষী বটে, কিন্তু তারা প্রথমে একটি মাত্র কোষরূপে জন্মগ্রহণ করে। পরে বৃদ্ধি পেয়ে বহু লক্ষে পরিণত হয়।

কোষ সম্বন্ধে আমাদের ভাল করে জানতে হলে, পুরাতন ও ভুল মতগুলি ছাড়তে হবে। পূর্বে মনে করা হো'ত কোষের সীমানাকেই বুঝি কোষ বলা হয়। কিন্তু আসলে কোষ বললে বুঝতে হবে সীমানাসহ বা সীমানা ব্যতিরেকে কোষ মধ্যস্থ আসল বস্তুটি। এই বস্তুটি হচ্ছে জীবন্ত এবং প্রাণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। একে 'জীবনের ভিত্তি' বা 'প্রোটোপ্লাজম্' বলা হয়। প্রোটোপ্লাজমের বিষয় জানলেই আমরা কোষের বিষয় এবং জীবনের বিষয় জ্ঞান লাভ করতে পারি। আগে আমরা কোষ-সীমানা সম্বন্ধে দুচারি কথা বলব।

পূর্বেই বলা হোয়েছে যে উদ্ভিদ-কোষেব সীমানা আছে আর প্রাণী-কোষের উদ্ভিদ কোষের মত সীমানা নেই। তবে প্রাণী-কোষের বাইরে যে একটি সূক্ষ্ম আবরণ আছে, একথা সত্য। এই আবরণটি হয়ত অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা যায় না, তবে ইহা যে বর্তমান তার প্রমাণ হচ্ছে প্রাণী-কোষের স্থিতি স্থাপকতা, কিছুক্ষণ চাপ দেবার পর একে ছেড়ে দিলে ইহা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।

পরের বারে প্রোটোপ্লাজম্ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলা যাবে।

ইচ্ছাশক্তি

(১৩৪ পৃষ্ঠার পর)

"তুমি জন্মসিদ্ধ যাদুকর" (you are a born showman), কিন্তু আমি জানি যে, ইহাতে 'জন্মসিদ্ধ' কোন ব্যাপার নাই ইহা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির একটি কঠিন পরীক্ষামাত্র ছিল।

মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে ইচ্ছার ক্ষমতা অপরিসীম। এখনও পাশ্চাত্যদেশসমূহে এই ব্যাপার লইয়া যথেষ্ট গবেষণা চলিতেছে। 'ইচ্ছা থাকিলেই উপায় আছে' (where there is will there is way) এই ইংরেজি প্রবাদ বাক্যটি খুবই মূল্যবান। ইচ্ছার শক্তি অসীম এবং ইহার অসাধ্য জগতে কিছুই নাই।

খৃষ্টধর্মের প্রবর্তক মহাত্মা যীশু এই ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। রোগীদিগের দেহস্পর্শ করিয়া যেইমাত্র তিনি বলিতেন 'আমি ইচ্ছা করিতেছি তুমি রোগমুক্ত হও' অমনি রোগী রোগমুক্ত হইয়া পড়িত।

[The Leper said "Lord, if thou **Wilt,** thou canst make me clean." Jesus then put forth his hands and touched and **Wilt** be thou clean and his leprosy was cleaned.]

নভেন্দ্র মজুমদারের প্রচেষ্টায় ক্লাবটি গঠিত হয়। ১৯৩৯ সালে সর্বপ্রথম এই ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড়গণ ব্যারাকপুরের চন্দ্রশেখর মেমোরিয়াল ফুটবল শীল্ড লাভ করেন। এই সাফল্য খেলোয়াড়গণকে বিশেষ উৎসাহ দান করে। উক্ত মিলের ম্যানেজিং এজেন্টেসদের মধ্যে একজন শ্রীযুত সুধীন দত্ত খেলোয়াড়গণের উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া ক্লাবের উন্নতির জন্য যত্নবান হন। তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়া ক্লাবের সভ্যগণও দ্বিগুণ উৎসাহিত হন। ১৯৪০ সালে উক্ত ক্লাবের ফুটবল দল বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। খড়দহের প্যারাগণ শীল্ডের রাণার্স আপ হয়। ১৯৪১ সালে আই এফ এর পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করে, কিন্তু সুবিধা করিতে পারে না। তবে বহরমপুরের হুইলার মেমোরিয়াল শীল্ড বিজয়ী হইতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই বৎসর এই ক্লাবের খেলোয়াড়গণ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই পর্যন্ত এই ক্লাব রাজবাড়ীর নরেন্দ্র কর্মকার শীল্ড, ট্রেডস্ কাপ ও ইয়ঙ্গার কাপ বিজয়ী হইয়াছে। আরও কয়েকটি প্রতিযোগিতায় এই দল যোগদান করিয়াছে। সকল প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ না করিলেও কয়েকটিতে বিজয়ী হইবে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ভারতীয় পরিচালিত মিলের কর্মচারীবৃন্দের কোন ফুটবল ক্লাব এইরূপ গৌরব অর্জন ইতিপূর্বে এখনও করে নাই। সেই হিসাবে ইঁহাদের সাফল্য বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এই ক্লাবের আরও উন্নতি কামনা করি।

ট্রেডস কাপের ইতিহাস

ট্রেডস কাপ কলিকাতার তথা ভারতের প্রাচীনতম ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার সর্বপ্রথম প্রবর্তন হয় ১৮৮৯ সালে। ইহার পূর্ব বৎসরে কলিকাতার ট্রেডস এসোসিয়েশন এই কাপটি প্রদান করেন। উক্ত এসোসিয়েশনের নামানুসারে ট্রেডস কাপ নাম দেওয়া হয়। প্রথম বৎসরে ডালহৌসী এই কাপের বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ দল এই প্রতিযোগিতায় সর্বাপেক্ষা অধিকবার বিজয়ী হইয়াছে। ইহার পরেই মোহনবাগান ক্লাবের নাম উল্লেখযোগ্য। এবং মোহনবাগান ক্লাবই একমাত্র ক্লাব যে পর পর তিন বৎসর এই কাপ লাভ করিয়া চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। ১৯৪০ সালে পুনরায় মোহনবাগান ক্লাব এই সম্মানের পুনরাবৃত্তি করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু রবার্ট হাডসন দল তাঁহাদের সেই সম্মান হইতে বঞ্চিত করে। জুনিয়ার দলের মধ্যে কুমারটুলি, জোড়াবাগান, নেপিয়ার, গ্রীয়ার, রবার্ট হাডসন প্রভৃতি এই কাপ বিজয়ী হইয়াছে। নিম্নে পূর্ববর্তী বিজয়ীগণের নাম প্রদত্ত হইল :—

১৮৮৯—ডালহৌসী, ১৮৯০—বাফস্ রেজিমেণ্ট, ১৮৯১—কিংস লিভারপুর রেজিঃ, ১৮৯২—ইস্ট ল্যাঙ্কাসায়ার, ১৮৯৩—সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ, ১৮৯৪-৯৫—মেডিক্যাল কলেজ, ১৮৯৬—শিবপুর কলেজ, ১৮৯৭-৯৮—জামালপুর রিক্রিয়েশন, ১৮৯৯—রেঞ্জিটিংস, ১৯০০—ন্যাশনাল এসোঃ, ১৯০১—শিবপুর কলেজ, ১৯০২—ন্যাশনাল এসোঃ, ১৯০৩-৪ মেডিক্যাল কলেজ, ১৯০৫—শিবপুর কলেজ, ১৯০৬-৮—মোহনবাগান ক্লাব, ১৯০৯—ওয়াণ্ডারার্স, ১৯১০—ই আই আর (আসানসোল), ১৯১১—চন্দননগর, ১৯১২—ন্যাশনাল এসোঃ, ১৯১৩—এরিয়ান্স, ১৯১৪—কুমারটুলি, ১৯১৫—হাওড়া রোভার্স, ১৯১৬—পুলিশ, ১৯১৭—মেডিক্যাল কলেজ, ১৯১৮—জোড়াবাগান, ১৯১৯—গ্রীয়ার, ১৯২০—মেডিক্যাল কলেজ, ১৯২১—টেলিগ্রাফ, ১৯২২—ডালহৌসী, ১৯২৩—গ্রীয়ার, ১৯২৪—ই বি আর, ১৯২৫—পুলিশ, ১৯২৬—ই বি আর, ১৯২৭—পুলিশ, ১৯২৮—মেডিক্যাল কলেজ, ১৯২৯—টেলিগ্রাফ, ১৯৩০—সেণ্ট জোসেফ, ১৯৩১—কাস্টমস, ১৯৩২—হাওড়া ইউনিয়ন, ১৯৩৩—ডালহৌসী, ১৯৩৪-৩৫ পুলিশ, ১৯৩৬—রেঞ্জার্স, ১৯৩৭—নেপিয়ার, ১৯৩৮-৩৯—মোহনবাগান, ১৯৪০-৪১—রবার্ট হাডসন, ১৯৪২—মহালক্ষ্মী স্পোর্টিং ক্লাব।

আন্তঃ অফিস ফুটবল লীগ

নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যেও আই এফ এ পরিচালিত আন্তঃ অফিস ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ডিভিসনের সকল খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাটা কোম্পানীর ফুটবল দল প্রথম ডিভিসনে চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। এই দলকে মোট ১৩টি খেলায় যোগদান করিতে হয়। একটি মাত্র খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। অপর ১২টি খেলায় এই দল বিজয়ী হইয়াছে। ক্যালকাটা ট্রামওয়ে কোম্পানীর দল বাটা অপেক্ষা মাত্র দুই পয়েণ্ট কম পাওয়ায় রানার্স আপ হইয়াছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল দল ট্রামওয়ে দলের সমান সংখ্যক পয়েণ্ট পাইয়াও গোলের গড়পড়তার জন্য তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় ডিভিসনে এণ্ড্রু ইউল কোম্পনীর দল চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। এই দলের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। মোট ১০টি খেলার মধ্যে এই দল কোন খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে নাই অথবা পরাজিত হয় নাই। বার্ন কোম্পানীর দল এই বিভাগে এণ্ড্রু ইউল অপেক্ষা ৫ পয়েণ্ট কম পাইয়া রানার্স আপ হইয়াছে।

তৃতীয় ডিভিসনে এস সি রায় কোম্পানীর দল চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। বেরী কোম্পানীর দল রায় কোম্পানী দলের সমান সংখ্যক পয়েণ্ট পাইয়াও গোলের গড়পড়তার জন্য রানার্স আপ হইয়াছে। তবে আই এফ এর পরিচালকগণ চ্যাম্পিয়ানশিপ ঘোষণার পূর্বে বেরী কোম্পানী দলকে এস সি রায় কোম্পানী দলের সহিত অতিরিক্ত একটি ম্যাচ খেলবার সুযোগ দান করেন। এই খেলায় এস সি রায় কোম্পানী দল ৪-০ গোলে বেরী কোম্পানী দলকে পরাজিত করে।

আন্তঃ অফিস ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ডিভিসনের ফলাফল অবলোকন করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, যোগদানকারী দলসমূহের পরিচালকগণ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অফিসের খেলা বলিয়া পরিচালনায় শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই। ইহা খুবই সুখের বিষয়।

এক মাইল দৌড়ে নূতন রেকর্ড

ইংলাণ্ডের এ্যাথলীট সিডনী উডার্সন এক মাইল পথ ৪ মিনিট ৬ ৪/১০ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর নূতন রেকর্ড করিলে অনেকেই চমৎকৃত হন। ইংলাণ্ডের সংবাদপত্রসমূহ প্রচার করেন যে, এই রেকর্ড কেহই ভঙ্গ করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের উক্তি যে সত্য নহে তাহা সুইডেনের এ্যাথলীট গুন্দার হেগ প্রমাণিত করিয়াছেন। ইনি গত জুলাই মাসে এক মাইল ৪ মিনিট ৬ ২/১০ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেন। ফলে উডার্সনের রেকর্ড ভঙ্গ হয়। উডার্সনের সমর্থকগণ ইহা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সময় পরীক্ষকগণ ঠিক ধরিতে না পারায় গুন্দারের পক্ষে রেকর্ড ভঙ্গ করা সম্ভব হইয়াছে। গুন্দার বোধ হয় সেই উক্তি শুনিয়াছিলেন। কারণ তিনি উহার পরেই ঘোষণা করেন যে, পুনরায় তিনি নিজ রেকর্ড ভঙ্গ করবার চেষ্টা করিবেন। সেই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর তিনি স্টকহলমে সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে এক মাইল পথ ৪ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়াছেন। দুই সেকেণ্ডের অধিক কম সময় উডার্সনের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন। সিডনী উডার্সনের সমর্থকগণ ইহার পর কোন উক্তি করিবেন বলিয়া মনে হয় না। হেগের সহিত বর্গ নামক একজন সুইডিস এ্যাথলীট দৌড়াইয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও উডার্সনের রেকর্ডের সমান করিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে ইনিও উডার্সনের রেকর্ড ভঙ্গ করিবেন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হেগ ইতিপূর্বে ২ মাইল, ১৫০০ মিটার, ২০০০ মিটার ও ৩০০০ মিটার দৌড়ের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন।

১লা সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—'রয়টারে'র বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন, স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে কয়েকটি অঞ্চলে জার্মানরা কঠিন অবস্থায় পড়িয়া কিছুদূর পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

পূর্ব ককেশাসের প্রোখলাদনায়া অঞ্চলে রুশ সৈন্যেরা পাল্টা আক্রমণ শুরু করিয়াছে।

জেনারেল রোমেল মিশরে নূতন আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। গতকল্য এক্সিসবাহিনী এল হিমেমাত-এ অষ্টমবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বে অভিমুখে অগ্রসর হয়। এক্সিসবাহিনী মিত্রশক্তির মাইন ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রায় আট মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

জাপানের পররাষ্ট্র সচিব শিগেনোরি তোগো "ব্যক্তিগত কারণে" পদত্যাগ করিয়াছেন। জেনারেল তোজোর উপর পররাষ্ট্র বিভাগের ভার অর্পিত হইয়াছে। জেনারেল তোজো জাপানের প্রধান মন্ত্রী, সমরসচিব ও পররাষ্ট্র সচিব হইলেন।

নিউগিনির মিল্‌নে উপসাগর হইতে জাপানীদিগকে বিতাড়িত করা হইয়াছে। বুনার দক্ষিণে ককোদায় সমস্ত দিন তুমুল যুদ্ধ চলে। ঐ স্থান দিয়া জাপানীরা পোর্ট মোরসবির দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে।

২রা সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে আর একটি অঞ্চলে রুশ সৈন্যগণ পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে জার্মানরা অনবরত নূতন নূতন সৈন্য আমদানী করিতেছে। পশ্চিম ককেশাসে ক্রাসনোডারের দক্ষিণ-পশ্চিমে সারাদিন যুদ্ধের পর রুশ সৈন্যেরা একটি শহর পরিত্যাগ করিয়াছে।

মিশর রণাঙ্গনে সমস্ত দিন যুদ্ধ চলে। দক্ষিণাংশে হিমেমাত ও রুবেশাত-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে মিত্রপক্ষ এবং এক্সিসবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। কায়রো অঞ্চলে বোমা বর্ষণের ফলে ৫ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়।

৩রা সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ যে, জার্মানরা নভোরোসিস্কের দিকে অগ্রসর হইতেছে; সেবাস্তোপোলের পতনের পর কৃষ্ণসাগর তীরস্থ রুশিয়ার বড় বড় বন্দরগুলির মধ্যে একমাত্র উহাই রুশদের দখলে আছে। জার্মান বাহিনী উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে উপকূলের সমান্তরাল পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া নভোরোসিস্ক আক্রমণ করিয়াছে। ঐ অঞ্চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে এবং একটি অঞ্চলে রুশ সৈন্যেরা নূতন ঘাঁটিতে সরিয়া গিয়াছে। কুটেল নিকোভো-স্ট্যালিনগ্রাদ রেল পথ বরাবর রুশদের একটি সুরক্ষিত স্থান। ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে আর একটি সুরক্ষিত স্থান পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। সেখানে রেলপথের দক্ষিণে রুশ ব্যূহের ভিতর জার্মান সৈন্যগণ কীলকাকারে প্রবেশ করিয়াছে।

চীন—চুংকিংয়ের সংবাদে প্রকাশ, চীনা সৈন্যেরা ক্যাণ্টনের উত্তর-পশ্চিমে লুপাও পুনর্দখল করিয়াছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—স্ট্যালিনগ্রাদের চতুর্দিকে জার্মানরা ২৫ ডিভিসন সৈন্য ও এক হাজার বিমান সমাবেশ করিয়াছে। জার্মানরা গতকল্য স্ট্যালিনগ্রাদ শহরের উত্তর-পশ্চিমে কয়েক স্থানে অগ্রসর হয়। জার্মানদের সৈন্য সংখ্যা রুশ সৈন্য সংখ্যার দ্বিগুণ এবং কখনও কখনও তিনগুণ অধিক ছিল। স্টালিনগ্রাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়েকটি অঞ্চলেও জার্মানদের সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিল এবং তাহারা প্রথম রুশ ব্যূহ ভেদ করে। জার্মানরা প্রোকলাদনায়া অঞ্চলে গ্রজনী তৈল খনি অভিমুখে নূতন অভিযান শুরু করিয়াছে। স্টকহলমস্থ 'রয়টারের' বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন, জার্মানরা বলিতেছে যে তাহাদের বহু সৈন্য স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তরে ভলগা নদীর তীরে পেঁৗছিয়াছে। উক্ত সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, নভোরোসিস্ক বিপন্ন হইয়াছে। জার্মানরা আনাপা ও নভোরোসিস্কের মধ্যবর্তী ক্রাস্নে মেডিভডস্কায়া দখল করিয়াছে।

চীন—চেকিয়াং প্রদেশে জাপ বাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া উহার রাজধানী কিনহোয়ার ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে রেলওয়ে জংশন লাকিং পুনরধিকার করিয়াছে। চীনাবাহিনী নূতন উদ্যমে আক্রমণ চালাইয়া কিনহোয়ার প্রান্তভাগে পেঁৗছিয়াছে।

৫ই সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—জার্মানী দাবী করে যে, স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে রুশরা আবার পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। মার্শাল ফন বকের সৈন্যেরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে এবং প্রত্যেক পদ অগ্রসর হওয়ার জন্য হাজার হাজার জার্মান সৈন্য হতাহত হইতেছে। অগ্রবর্তী জার্মান সৈন্যদল স্ট্যালিনগ্রাদের ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত মেইস্ক-এর সামান্য পশ্চিমে পেঁৗছিয়াছে। স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তরে ও পশ্চিমে জার্মান চাপের জন্য মার্শাল টিমোগেঙ্কো কাচালিনস্ক ও কালাচে রিজার্ভ সৈন্য নিয়োজিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

৬ই সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—'রয়টারের' বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, স্ট্যালিনগ্রাদের সম্মুখভাগের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। প্রচুর সৈন্যক্ষয় সত্ত্বেও বিভিন্ন এলাকায় জার্মান আক্রমণের চাপ হ্রাস পায় নাই। বিশেষভাবে স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবল চাপ দেওয়া হইতেছে। গতকল্য এই এলাকায় নগরীর প্রবেশ পথ সমূহে ঘোরতর সংগ্রাম হয়।

৭ই সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—স্ট্যানিলগ্রাদের যুদ্ধে রুশ সৈন্যরা শহরের উত্তর-পশ্চিমে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া কয়েকটি স্থান হইতে শত্রু সৈন্যকে হটাইয়া দিয়াছে। মস্কোর ইস্তাহারে প্রকাশ, গত রাত্রে স্টালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের কোথাও জার্মানরা নূতন করিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই। গ্রজনী তৈল খনি হইতে ৫০ মাইল দূরে এক স্থানে যুদ্ধ চলিতেছে। লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, স্ট্যালিনগ্রাদের বড় বড় কারখানা সমূহ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

মিশর রণাঙ্গন—কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিম রণক্ষেত্রে সমস্ত এক্সিস সৈন্যই পশ্চিমদিকে সরিয়া গিয়াছে। এক সপ্তাহ পূর্বে তাহারা যে স্থান হইতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই স্থানেই আবার ফিরিয়া গিয়াছে। এখন বলা যায় যে, মিশরের যুদ্ধের প্রথম পর্বে মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা জয়লাভ করিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর সমগ্র ভারতব্যাপী যে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন ও আন্দোলন চলিতেছে এবং গভর্নমেণ্ট উহার দমনকল্পে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, স্থানাভাববশত তাহার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। শুধু বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলিই তারিখ অনুসারে নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

২৫শে আগস্ট

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং তৎসম্পর্কে বহুলোককে ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। কলিকাতায় শ্রীযুক্ত ভগীরথ কানোরিয়া, জীবনলাল পণ্ডিত এবং হরিপদ বসু ধৃত হন।

২৬শে আগস্ট

ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগ—কলিকাতায় শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র [illegible] ও রামকমল দাস, খুলনায় শ্রীযুত কেদারনাথ মিত্র এবং কিশোরীমোহন চ্যাটার্জিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ময়মনসিংহে শ্রীযুত [illegible]চন্দ্র চক্রবর্তী, কুমিল্লায় শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ চৌধুরী, রাজসাহীতে শ্রীযুক্ত রাধারমণ ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২৭শে আগস্ট

ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগ—"আনন্দবাজার পত্রিকা" ও "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের" ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার হন। কলিকাতায় কালীপদ মুখার্জি, রাজকুমার চক্রবর্তী, সুধীরকুমার রায় চৌধুরী, মিস কমলা দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসু, নাগরমল শর্মা ও [illegible] সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্ত [illegible] দত্ত এম এল এ এবং পাবনার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২৯শে আগস্ট

বিহার সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ২৪শে আগস্ট [illegible] থানার অন্তর্গত মধুবন বাজারে জনতা সীতামারীর মহকুমা হাকিম বাবু হরদ্বীপ সিং ও অপর তিনজনকে নিহত করিয়াছে।

২রা সেপ্টেম্বর

গত ২৭শে আগস্ট রাত্রিতে একদল জনতা গৌহাটির পল্লী অঞ্চলে একটি ডাকঘর ও থানা আক্রমণ করে এবং অগ্নি সংযোগে উহা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করে। জনতা দুইটি সেতুও ধ্বংস করিয়াছে।

৩রা সেপ্টেম্বর

বিহার গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পাটনা জেলার মোকামা থানা এলাকায় ছয়টি গ্রামের অধিবাসীদের উপর এক লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে।

বাঙলা সরকারের এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, গত ৩১শে আগস্ট ঢাকা জেলের হাঙ্গামায় মোট ৩২ জন নিহত ও ১৩৬ জনের অধিক আহত হইয়াছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর

আসাম গভর্নমেণ্টের এক প্রেস নোটে প্রকাশ, সশস্ত্র সৈন্যদলের উপস্থিতিতে ধ্বংসমূলক কার্য চালাইবার এবং সৈন্যদলকে আক্রমণ করায় দুই স্থানে সৈন্যদিগকে গুলী চালাইতে হয়। প্রত্যেক স্থানে দুইজন করিয়া লোক নিহত হয়।

৫ই সেপ্টেম্বর

বিহার গভর্নমেণ্টের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে মজঃফরপুর জেলার বীদপুরে গত ৩রা সেপ্টেম্বর এক জনতা সৈন্যদলকে আক্রমণ করে। সৈন্যদল গুলী চালাইয়া আটজনকে নিহত করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। গত ২৯শে আগস্ট উত্তর ভাগলপুরের সাহারসায় এক জনতা মহকুমা হাকিমের অফিস আক্রমণ করে। জনতা ৪টি গুলী ছোড়ে। ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় এবং তাহাতে তিনজন নিহত ও সাতজন আহত হয়। জনতার নিকট ছোরা, বর্শা, কুলহারি এবং বন্দুক ইত্যাদি বহু অস্ত্রশস্ত্র ছিল। মজঃফরপুরের অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট উপদ্রুত অঞ্চলে টহল দিবার সময় বাজপাটিতে বাধাপ্রাপ্ত হন—সেখানে তাঁহাকে বলপ্রয়োগ করিতে হয়।

উড়িষ্যা সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, কোরাপুটে দুইবার গুলীবর্ষণের ফলে ১৫ জন বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী নিহত হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে ১০।১২ জন ছাত্রী বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য মিঃ এম এস আণে এবং মিঃ এন আর সরকারের বাসভবনের সম্মুখে পিকেটিং করে।

৬ই সেপ্টেম্বর

কলিকাতায় হরতাল প্রতিপালিত হয়। শহরে কয়েকটি ক্ষেত্রে ট্রাম গাড়িসমূহে আগুন ধরাইবার চেষ্টা করা হয়। অপরাহ্ণ হইতে কয়েকটি সেকসনে ট্রাম চলাচল বন্ধ রাখা হয়। হাঙ্গামা সম্পর্কে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে।

আকোলা রেলওয়ে স্টেশনের দুই মাইল দূরে রেল লাইনের উপর স্টীলের ব্র্যাকেট লাগাইয়া কলিকাতা মেল ট্রেন লাইনচ্যুত করার চেষ্টা হয়।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি স্যার নলিনীরঞ্জন চ্যাটার্জি বীরভূম জেলার অধীন পাঁচড়া গ্রামে তাঁহার পল্লী ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল।

৭ই সেপ্টেম্বর

কলিকাতার কয়েকস্থানে ট্রাম গাড়িতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করা হয়। বিক্ষোভকারিগণ জোড়াবাগান অঞ্চলে আহিরীটোলা পোস্ট অফিসে আগুন ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

কলিকাতার স্কুল ও কলেজসমূহ পুনরায় খোলে ; ঐ সমূহ গত ১৪ই আগস্ট হইতে বন্ধ ছিল। অধিকাংশ ছাত্র প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রগণ ক্লাশে যোগদান করেন নাই।

হাওড়ায় এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আমতা থানার অধীন ঝিকিরা পোস্ট অফিস গৃহে কতকগুলি লোক আগুন ধরাইয়া দেয়।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভারতরক্ষা আইনে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। বোম্বাইয়ে ডাঃ জীবরাজ মেটা এবং দিল্লীতে লালা দেশবন্ধু গুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ফরিদপুরে একটি জনতার উপর পুলিশ লাঠি চালনা করে। জনতার ইস্টক বর্ষণে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খান বাহাদুর আমীর আমেদ আহত হইয়াছেন। এই সম্পর্কে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞা
আমি ভারতের সন্তান ও ভারতের অধিবাসী বলিয়া গৌরব অনুভব করি, সেই কারণে একান্তভাবে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছি যে আমি সর্ব্ববিধ নৈরাশ্যজনক মনোভাব দেশ হইতে উচ্ছেদ করিব, ভীতি উৎপাদক জনরব দমন করিব, ভারতের জাতীয় মর্য্যাদা ও নিরাপত্তার পক্ষে হানিকর যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হইয়া তাহার প্রতিরোধ করিব এবং যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত বিশ্বাস লইয়া দিনের পর দিন একাগ্রচিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে আত্ম-নিয়োগ করিব।
জাতীয় যুদ্ধের আহ্বান
এই সঙ্কল্প বাক্য এ যুদ্ধে ভারতের ও মিত্রশক্তির জয়লাভ সুনিশ্চিত করিবার জন্য আপনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাক্ষীস্বরূপ গৃহের সৌষ্ঠব ও মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিবে। রঙ্গীন ও সুন্দর ভাবে মুদ্রিত ইংরাজী বা প্রধান প্রধান দেশীয় ভাষায় স্থানীয় অর্গানাইজারের নিকট প্রাপ্য।

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ২রা আশ্বিন, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 19th September, 1942 [৪৫শ সংখ্যা

বুদ্ধিভ্রংশের লক্ষণ

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেব সেদিন ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা সমালোচনার অযোগ্য; কারণ যেখানে যুক্তিবুদ্ধি থাকে, সমালোচনা বা যুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা বিচার সেইখানেই সম্ভব হয়; কিন্তু চার্চিল সাহেবের বক্তৃতায় যুক্তি নাই, আছে যুক্তির অপলাপ; বুদ্ধি নাই, আছে বুদ্ধিভ্রংশেরই পরিচয় অথবা দুর্বুদ্ধিমূলক অন্ধ অহমিকতারই আস্ফালন। ইহার পূর্বে চার্চিল সাহেব প্রধান মন্ত্রী হিসাবে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন বক্তৃতা প্রদান করেন নাই; তাঁহার পাত্রমিত্রের দ্বারাই কাজটা সারিয়া লইয়াছেন; ভারত শাসন-ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর এতদিনের নিরুদ্ধ হৃদয়ের ঔদ্ধত্য এবং অহমিকার অন্ধ আবেগ এ বক্তৃতায় গর্জন করিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বক্তৃতার প্রধান কথাই হইল এই যে, কংগ্রেস কিছুই নয়; কংগ্রেসকে কে জানে, কে চিনে, বিরাট এবং বিশাল ভারতবর্ষের গুটিকত লোক ছাড়া কংগ্রেসকে কেহই সমর্থন করে না। ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে প্রতিরুদ্ধ করিবার পক্ষে প্রচারকার্যের দিক হইতে এমন কথার মূল্য আছে আমরা জানি এবং এই ধরণের প্রচারকার্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অসাধারণ ওস্তাদীও আমাদের জানা আছে; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, নেহাৎ গায়ের জোরে কংগ্রেসকে উড়াইয়া দিলেই তো সমস্যার সমাধান হইবে না। কংগ্রেসের নীতি ভারতবর্ষের কেহ মানে না, কংগ্রেসকে কেহ মানে না, প্রকৃত সত্যের এমন নির্লজ্জভাবে অপলাপের দ্বারা বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবার যদি কোন কারণ থাকিত, তবে না হয় স্বীকার করা যাইত যে, ইহার মূল্য কিছু আছে। রাজনীতির দিক হইতে বিশেষভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনৈতিক সূত্রমতে সত্য বা অসত্যের বিচার বড় নয়, বড় হইল বাস্তব স্বার্থ। ইহা আমরা বুঝি এবং কংগ্রেসকে গালাগালি দিলে বা কংগ্রেসকে ভারতবর্ষে কেহ সমর্থন করে না, এমন কথা বলিলে যদি ভারতবর্ষের সম্পর্কে ব্রিটিশের অবলম্বিত নীতি ভারতবর্ষের লোকেরা সমর্থন করিত এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের প্রস্তাবের পক্ষে জয়ধ্বনি তুলিত, তবে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের স্বার্থের বিচারে চার্চিল সাহেবের বক্তৃতার বাস্তব ফলোপধায়কতা থাকিত, ইহাও আমরা মানি। কিন্তু মিঃ চার্চিল নিজে বেশ ভালভাবেই জানেন যে, কংগ্রেস কেন, ভারতের কোন সম্প্রদায় বা দলই স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের প্রস্তাব মানিয়া লইতে রাজি হয় নাই এবং সমভাবে উহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কংগ্রেস জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার যে দাবী করিয়াছে, এক মোস্লেম লীগ ব্যতীত ভারতের আর সকল রাজনীতিক দলই, এমনকি, এদেশের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের অনেকে পর্যন্ত সেই দাবী সমর্থন করিয়াছেন। অথচ চার্চিল সাহেব অনমনীয় ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ভারতের সর্বদল এবং রাজনীতিক সকল সম্প্রদায়ের দ্বারা সমভাবে নিন্দিত স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সেই প্রস্তাব লইয়াই শূন্যগর্ভ আস্ফালন করিয়াছেন। রাজনীতিক অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত সমগ্র ভারতের অভিমতের প্রতি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর অপরিসীম অবজ্ঞা এবং তাচ্ছিল্যের ভাবই তাঁহার বক্তৃতায় আগাগোড়া পরিস্ফুট, ভারতবাসীদের আত্মমর্যাদার প্রতি আঘাত তাঁহার বক্তৃতায় আত্যন্তিক; জাতীয় মর্যাদাবুদ্ধিতে জাগ্রত ভারতে এমন বক্তৃতা অনর্থের কারণ সৃষ্টি করিবে, আমাদের ইহাই আশঙ্কা।

ভারতসচিবের মামুলী যুক্তি

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে রাজীই থাকেন, তবে কংগ্রেসের দাবীকে ভিত্তি করিয়া আপোষ-আলোচনা চালাইতে ক্ষতি কি ছিল, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর ভারত সম্পর্কিত বক্তৃতা অবলম্বন করিয়া পার্লামেণ্টে যে আলোচনা হয়, সেই অবসরে ভারতসচিব ইহার একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন।

তিনি বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশসমূহ যে অধিকার ভোগ করে, প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেরা যে স্বাধীনতা ভোগ করি, যুদ্ধের পর আমরা ভারতবাসীদিগকে তেমন অধিকারই দিতে চাই। কিন্তু কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে তাহা চায় না; তাহারা, আমরা যেভাবে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছি, সমগ্র ভারতের উপর সেইরূপে শাসন চালাইতে ইচ্ছুক। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলসমূহের সহযোগিতার উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত শাসনতন্ত্র অনুসারে আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে চাই, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ইহা নয়। বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং দলের স্বার্থকে পিষ্ট করিয়া কংগ্রেস ভারতে নিজেদের দলগত প্রভুত্বই চালাইতে অভিলাষী। ভারতসচিব আমেরী সাহেব ভারতের সম্পর্কে তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতায় ভেদনীতির যে কূটকৌশল সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার এই যুক্তির মধ্যেও সেই একই কৌশল রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস কোন দল বা সম্প্রদায় নহে। কংগ্রেস ভারতের বিভিন্ন দল এবং সম্প্রদায় লইয়া গঠিত প্রতিষ্ঠান; ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ এ সত্যকে উড়াইয়া দিতে চাহিলেই দিতে পারিবেন না। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বন্দী হইবার কিছুদিন পূর্বেও স্পষ্ট ভাষাতেই একথা বলিয়াছিলেন,—ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন, তবে জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠনের ভার মোশ্লেম লীগের উপর দিলেও কংগ্রেস তাহাতে আপত্তি করিবে না। যুদ্ধের পর ভারতের সকল দল এবং সম্প্রদায়ের সম্মতি লইয়া গভর্নমেণ্ট গঠনের যে যুক্তি আমরা আমেরী সাহেব প্রমুখ ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মুখে শুনিতেছি, উহা প্রকৃতপক্ষে একটা ধাপ্পাবাজী মাত্র। যতদিন পর্যন্ত ভারতের উপর তাঁহাদের কর্তৃত্ব থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত ভারতে দলের বিভিন্নতার বা সম্প্রদায়ের অনৈক্যগত সমস্যার সমাধান হইবে না; সুতরাং সেই হিসাবে সর্বদলের সম্মতিক্রমে শাসনতন্ত্র গঠনের সম্ভাবনাও যে দেখা দিবে না, ইঁহারা তাহা বিশেষভাবেই অবগত আছেন। শাসনতন্ত্র সব দেশেই বহুমতের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত হইয়া থাকে। জগতে এমন কোন দেশ নাই, আমেরী সাহেবের নিজের দেশও নহে, যেখানে সকল লোক এবং সম্প্রদায় একমত হইয়া দেশের প্রচলিত শাসনতন্ত্রকে সমর্থন করিয়া থাকে। আমেরী সাহেবের দল ভারতের কোন সংহত রাষ্ট্রীয় চেতনাকে স্বীকার করেন না; তাঁহাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি লোকই প্রকৃতপক্ষে এক-একটি সম্প্রদায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কয়জন লোকের সমর্থন কোন্ দলের পিছনে রহিয়াছে, তাঁহাদের কাছে ইহা অবান্তর। এমন অবস্থায় তাঁহাদের যুক্তিমত পথে ভারতের ৩৮ কোটি লোক কোনদিন একমত হইবেও না, সুতরাং ব্রিটিশ অভিভাবকত্বের অপ্রয়োজনীয়তাও ভারতবর্ষে কোনদিন দেখা দিবে না। ভারতের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্যস্থাপন প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সহানুভূতি আছে বলিয়া আমেরী সাহেব সেদিন যে কথা বলিয়াছেন, তৎসম্পর্কে তাঁহাদের আন্তরিকতার বিচার এই দৃষ্টিতেই করিতে হইবে।

সত্যের অপলাপ

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের আদুরে গোপাল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারত সম্পর্কিত বিবৃতিতে তাঁহাকে সমর্থন করিবার জন্য একান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু চার্চিল সাহেব নিজেই সকলের কাজ চুকাইয়া দিয়াছেন, এজন্য তিনি বিশেষ সুবিধা পান নাই। তবু ভারতসচিব আমেরীর বক্তৃতার মধ্যে ফোঁড়ন কাটিয়া স্যার স্ট্যাফোর্ড কিছু বাহাদুরী ফলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কংগ্রেসের মতলবটা আগাগোড়াই খারাপ ছিল, আমেরী সাহেব এই কথা যখন তাঁহার উদ্ভট যুক্তিজাল বিন্যাস করিয়া প্রতিপন্ন করিতেছিলেন, তখন স্যার স্ট্যাফোর্ড উঠিয়া বুঝাইয়া দেন যে, মহাত্মা গান্ধীই যত অনিষ্টের কারণ। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি স্যার স্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাবই সমর্থন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তাহাতে প্রতিবাদী হন; তাহার ফলে কংগ্রেসের প্রস্তাব পাল্টাইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে স্যার স্ট্যাফোর্ডের এই উক্তি নির্লজ্জভাবে সত্যের অপলাপ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। স্যার স্ট্যাফোর্ডের ভারতে অবস্থানকালেই স্বয়ং মহাত্মাজী এমন অভিযোগের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং পণ্ডিত জওহরলাল ও কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টও বলিয়াছেন যে, ঐরূপ উক্তি সত্য নয়। সম্প্রতি শ্রীযুত রাজগোপালাচারীও স্যার স্ট্যাফোর্ডের এ উক্তির অসত্যতাকে উন্মুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব পরিবর্তিত হইয়াছে যদি তর্কের খাতিরে ইহা স্বীকার করিয়াও লওয়া যায়, তাহাতেও সে প্রস্তাবের অসঙ্গতি প্রতিপন্ন হয় না। ভারতের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইলে সমগ্র ভারতের জনমতের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন মিত্রশক্তির সমরোদ্যমকে সমধিক শক্তিশালী করিবে এবং বৈদেশিক আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য ভারতের জনসাধারণ উদ্বুদ্ধ হইবে, কংগ্রেসের প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল ইহাই। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া মিঃ আমেরী এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড প্রভৃতি সকলেই সুকৌশলে এই সোজা সত্যটিকে এড়াইয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে সত্যের ব্যতিক্রম ঘটে না।

উদ্দেশ্য কি?

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের একটি সভায় কর্পোরেশনের দুইজন কাউন্সিলার শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী ও শ্রীযুত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী এবং কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করা হয়। সরকারী সেন্সার সভার বিবরণটি যেভাবে প্রকাশ করিতে দেন, তাহাতে সুরেশবাবুর প্রসঙ্গমাত্র ছিল না এবং বন্দী কাউন্সিলারদ্বয়ের নামের উল্লেখ বাদ দেওয়া হয়। কর্পোরেশন পরবর্তী একটি সভায় সরকারী সেন্সার কর্তৃক সংবাদ প্রকাশে এই অসঙ্গত ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে বাঙলা দেশে সরকারী সেন্সার কার্য যে কিরূপ যুক্তি বা বুদ্ধির ধারা ধরিয়া চলিতেছে, আমরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। প্রতিবাদের খবরটা প্রকাশ করিতে দিতে যদি আপত্তি না থাকে, তবে নাম কয়েকটি প্রকাশ করিতে

। দিবার পক্ষেই বা কি যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে, ঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী সংবাদিকদের নিকট প্রতিশ্রুত হন যে, ভারতরক্ষা আইন নুসারে যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইবে, তাঁহারা সরকারীভাবে াঁহাদের নাম প্রকাশ করিবেন। ইহার ফলে গ্রেপ্তারের সংবাদের ঙ্গে সঙ্গে নাম প্রকাশ হয় না, কয়েকদিন পরে সরকারী ঘোষণা-রূপে নামগুলি দফায় দফায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। রকারী সেন্সারের কৃপায় কর্পোরেশনের প্রতিবাদ সভার রেণী হইতে যাঁহাদের নাম প্রকাশ বন্ধ করা হইয়াছিল, প্রকৃত-ক্ষে তাঁহাদের নাম সরকারী ঘোষণাসূত্রে উক্ত সভার অধি-শনের পূর্বেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং দেশের লোকে ানিতে পারে এমন ক্ষেত্রে সেই কয়েকটি নাম পুনরায় প্রকাশিত িতে দিলে বাঙলা দেশের পক্ষে কি যে বিপজ্জনক পরি-র্থিতির সৃষ্টি হইত, সেন্সার বিভাগের কর্তারাই তাহা বলিতে রেন।

সিকিউরিটি বন্দীদের ভাতা

সম্প্রতি বাঙলা গভর্নমেণ্ট সিকিউরিটি বন্দীদের আটক থা সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থার কিছু সংশোধন করিয়াছেন। তদিন প্রত্যেক বন্দীকে আহার্য বাবদ দৈনিক সাড়ে নয় আনা রিয়া দেওয়া হইত; এখন তাহা বৃদ্ধি করিয়া বার আনায় ানো হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আহার্য জিনিসপত্রের মূল্য যে নুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই অনুপাতে ভাতার হার যে ড়ান হইয়াছে, ইহা বলা যায় না এবং জলখাবারের খরচ শুদ্ধ ভাতা নিশ্চয়ই পর্যাপ্ত নহে। বন্দীদের পারিবারিক ভাতা বন্ধে গভর্নমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, একান্ত য়োজনের ক্ষেত্রে এবং আটক রাখার ফলে পরিবারের আয়ের থ বন্ধ হইয়াছে, এরূপ যেখানে জানা যাইবে, সেখানে ভাতা ওয়া হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন এই যে, কোন্ ক্ষেত্রে কান্ত প্রয়োজন, তাহা স্থির করিবে কে বা কাহারা এবং আটক িবার ফলে পরিবারের আয়ের পথ যে বন্ধ হইয়াছে, এ সম্বন্ধে িদ্ধান্তই বা হইবে কি উপায়ে? অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে মরা এই কথা বলিতে পারি যে, অনেক ক্ষেত্রেই এ সম্বন্ধে দন্তকারী বিভাগের কর্তাদের শৈথিল্য বা উদাসীনতার ফলে গত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে না এবং সরকারী বিধি বস্থা কেবল কাগজপত্রেই থাকে; তারপর আর একটা কথা ই যে, সিকিউরিটি বন্দিগণ দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী নহেন, কাশ্য আদালতের বিচারে তাঁহাদের অপরাধ সপ্রমাণ হয় নাই; রূপ ক্ষেত্রে আমাদের মতে, তাঁহাদের পরিবারের অবস্থা যেমনই উক না কেন, তাঁহাদিগকে আটক করিবার ফলে তাঁহাদের রিবারবর্গ যে আয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহা-গকে বঞ্চিত করিবার ন্যায্য অধিকার কর্তৃপক্ষের নাই। সুতরাং ক্ষেত্রে 'একান্ত প্রয়োজনের' প্রশ্ন না তুলিয়া বন্দীদের পরিবার-বর্গকেই ভাতা দেওয়া সরকারের কর্তব্য। আমরা আশা করি, ঙলা সরকার এ সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবেন।

দিল্লী আলোচনার পরিণতি

হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে সম্প্রতি দিল্লীতে বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি আলোচনা-সভা হইয়া গিয়াছে। আলোচনার পর নেতারা প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা ভারতীয়গণের নিকট হস্তান্তরিত করিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিয়াছেন। নেতারা বলেন, "ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিকট আমাদের অনুরোধ, সময় থাকিতে এখনও তিনি ভারতীয় সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হউন। তিনি যদি আগ্রহসম্পন্ন হন, তবে এই কার্যের উপযোগী সাহস দূরদৃষ্টি এবং রাজনীতিজ্ঞতা তাঁহার আছে এবং ইহা দ্বারা ব্রিটেন ও ভারত উভয়েরই কল্যাণ হইবে।" এ অনুরোধের উত্তর প্রত্যক্ষভাবে না আসিলেও পরোক্ষভাবে ইতিমধ্যেই আসিয়া গিয়াছে। নেতাদের অনুরোধ-পত্র ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর কাছে পৌঁছিবার পূর্বেই পার্লামেণ্টে বক্তৃতার মারফতে অনুরোধের উত্তর মিলিয়াছে। চার্চিল সাহেব জাঁদরেলী সুরে ও জবরদস্ত ভাষায় ভারতীয় সমস্যা সমাধানে তাঁহার আগ্রহ এবং সাহস, রাজনীতিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা কোন্ পথ ধরিয়া চলিতেছে, স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর পক্ষ হইতে ভারতসচিব আমেরী সাহেব ৩৮ কোটি ভারতবাসীকে একেবারে সার কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'তোমরা ভারতবাসীরা যতই অনুরোধ-উপরোধ কর না কেন, আমাদের কথা শুনিয়া রাখ,' যতদিন যুদ্ধ চলিতেছে, ততদিন ভারত-শাসন সম্পর্কে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব আমরা কিছুতেই ছাড়িতেছি না এবং তাহা না ছাড়িবার পক্ষে গুরুতর রকমের কারণও রহিয়াছে। ভারতবর্ষ, সিংহল, ইরাক, ইরাণ, মিশর এবং ব্রহ্মদেশের রক্ষার ব্যবস্থা এক হাতে থাকা দরকার, ভারতবর্ষের শাসন-বিভাগের প্রত্যেকটির সঙ্গে এই কর্তৃত্বের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে।' দিল্লীর এই আলোচনার পরিণতি সম্বন্ধে আমরা কোনদিনই আশাশীল ছিলাম না; স্যার তেজ বাহাদুরের ন্যায় মডরেট নেতা এবং বীর সভারকরও ইহার সাফল্যের সম্বন্ধে ষোল আনাই সন্দিহান ছিলেন বলিয়া মনে হয়; কারণ এক্ষেত্রে আপোষ-নিষ্পত্তি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মতিগতির উপর। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মতিগতির কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই এবং তাঁহাদের ভেদ নীতি খাটাইবার ঘাঁটি যে মোস্লেম লীগ তাহাও তাঁহাদের হাতে পাকাই রহিয়াছে। পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার দিল্লীর আলোচনায় প্রথমটা আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর মুসলমানদের সঙ্গে যদি আপোষের কথা চালাইতে হয়, তবে মিঃ জিন্নার নিকট যাইতে হইবে, সেই যুক্তি দেখাইয়া তিনি সরিয়া পড়েন। ইহার পর ব্রিটিশ কর্তাদের তরফ হইতে মোস্লেম লীগের চাঁইয়ের দল আবার নূতন রকমে প্রশ্রয় পাইয়াছে। আমেরী সাহেব সেদিনও নিতান্ত নির্লজ্জভাবে সত্যকে বিকৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের দিকে মুসলমান-দের কতক কতক লোকের টান আগে কিছু ছিল বটে; কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের নীতির ফলে কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের মতিগতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ

মুসলমানেরা আর কংগ্রেসকে সমর্থন করে না। আজাদ মুস্লিম দল, জমিয়েৎ-উল-উলেমা, মোমিন সম্প্রদায়—কংগ্রেসী মুসলমানদের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইঁহাদিগকে ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল ধর্তব্যের মধ্যেই মনে করেন নাই এবং কৌশলপূর্ণভাবে হিসাবপত্রে সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করিয়া নিজেদের সনাতন রীতি অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার দাবীর প্রতিবন্ধকতা করিবার জন্য মোস্লেম লীগের পৃষ্ঠপোষকতাই তাঁহারা করিতেছেন। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ সম্প্রতি মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং তিনি ও হিন্দু মহাসভার অপর কয়েকজন নেতা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু ইহার ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মতিগতির আশু পরিবর্তন ঘটিবে বলিয়া আমরা আশা করি না। আমাদের মতে ভারতবাসীর ভাগ্য তাঁহাদের নিজেদের উপরই নির্ভর করে, ব্রিটিশ মন্ত্রীদের উপর নয়।

বাঙলার গভর্নরের বক্তৃতা

গত সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের যুক্ত-অধিবেশনে বাঙলার গভর্নর বাঙলাদেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়াছেন। এ বক্তৃতায় অনেক কথাই আছে, জাপানীদের আক্রমণের আতঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া যাহাদের জমি এবং সম্পত্তি, যুদ্ধ-প্রয়োজনে সরকার হস্তগত করিয়াছেন, তাহাদের ক্ষতিপূরণ, খাদ্যদ্রব্যের মহার্ঘতা, দেশব্যাপী অশান্তি—এসব বিষয়ের সম্বন্ধে গভর্নর বাহাদুর আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার এই আলোচনা আমাদের মনে কোন আশা উদ্দীপ্ত করিতে পারে নাই এবং তাঁহার এই বক্তৃতা আমাদের মতে অসন্তোষজনকই হইয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে যাহাদের জমিজমা দখল করা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাদের কথা উত্থাপন করিয়া গভর্নর বাহাদুর বলিয়াছেন যে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ইহাদিগকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ব্যবস্থা হইলেও সব সময় কাজ তদুপযোগী হয় না। আমরা ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে নানারকমের অভিযোগ এখনও শুনিতে পাইতেছি। জীবিকা অর্জনের উপায় হইতে যাহারা বঞ্চিত হইয়াছে, গভর্নর বাহাদুর তাহাদের কথা, বিশেষভাবে জেলেদের কথা এ সম্বন্ধে তুলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সামরিক প্রয়োজনে নকল জাল বুনিবার কাজে ইহাদিগের অনেককে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং সেই উপায়ে তাহারা জীবিকা নির্বাহের সংস্থান পাইয়াছে। কিন্তু বাঙলাদেশের কতজন জেলে জীবিকা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কতজনই বা সরকারের জাল বুনানো প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত হইয়া জীবিকার অভাব মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে, গভর্নরের বিবৃতিতে সে সম্বন্ধে কোন হিসাব নাই। আমাদের বিশ্বাস এই যে, এইভাবে জেলেদের মধ্যে খুব কম লোকেরই জীবিকা অর্জন করিবার সুবিধা হইয়াছে এবং ইহাদিগকে সমধিক ব্যাপকভাবে কার্যকর সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে প্রয়োজন। তারপর দেশরক্ষার ব্যবস্থা। গভর্নর বাহাদুর বলেন, জাপানী আক্রমণের আতঙ্ক এখনও কাটিয়া যায় নাই; বর্ষা কাটিয়া গেলে এবং শীতের আরম্ভে এই সমস্যা অধিকতর জটিল আকার ধারণ করিতে পারে। গভর্নর বাহাদুর যে আশঙ্কার কথা বলিয়াছেন, সম্প্রতি আমেরিকার ইণ্ডিয়া লীগের প্রেসিডেণ্ট সর্দার জে জে সিংহ একটি বিবৃতিতেও এই আশঙ্কাকে দৃঢ় করিয়াছেন। তিনি বলেন, জাপানী ভারত আক্রমণের জন্য একরকম প্রস্তুত হইয়াই উঠিয়াছে এবং তিন চার সপ্তাহের মধ্যেই তাহারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারে। এই আশঙ্কার কারণকে আমরাও কোনদিন লঘুভাবে দেখি নাই। গভর্নর আমাদিগকে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে বলিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, জাপান এবং তাহার পক্ষীয় শক্তিবর্গ যদি জয়লাভ করে, তবে বিজিত জাতিকে নিষ্ঠুর অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইতে হইবে। আমরা ভারতবাসীরা পরাধীনতা আমরা চাহি না এবং জাপানের আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য সমস্ত দেশের শক্তি সংহত করিতেই চাই। কংগ্রেসের প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, বৈদেশিক আক্রমণকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা। দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সে প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত আন্তরিকতাকে উপলব্ধি করিলেন না এবং আপোষ-নিষ্পত্তির পথে অগ্রসর হইলেন না। বাঙলার প্রধানমন্ত্রী এখনও সেই আপোষ-নিষ্পত্তিরই আশা করিতেছেন এবং বাঙলার অর্থসচিব ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ সেজন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের তেমন চেষ্টা সাফল্য লাভ করিবে কি না, বাঙলার গভর্নর বাহাদুরের বক্তৃতায় সে সম্বন্ধে কোন আশা-ভরসা পাওয়া যায় না।

গুণিগণের গণনা

গুণী ব্যক্তিই গুণীর আদর করিতে জানে—জহুরীই জহরৎ চিনে। ভারত সচিব আমেরী একজন গুণী পুরুষ; তাই দেখিতেছি বড়লাটের শাসন-পরিষদের ভারতীয় সদস্যদের গুণগানে তিনি সেদিন পার্লামেণ্টে ভারত সম্পর্কিত বিতর্কে বক্তৃতার উচ্ছ্বাস ছুটাইয়াছেন। তিনি বলেন, 'বড়লাটের শাসন পরিষদ বর্তমানে যেসব সদস্যকে লইয়া গঠিত, তাঁহারা কেবল উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিই নহেন, তাঁহারা দস্তুরমত জাতীয়তাবাদী। এমন জ্ঞানী ও গুণীর সমন্বয় ভারতে আর কোথায়ও দেখা যাইবে না। বর্তমান সঙ্কটে ইঁহারা যে সাহস দেখাইয়াছেন, ভারতীয় সমস্যা সমাধানের পক্ষে ইঁহারাই আমাদের এবং ভারতবাসীদের এখন আশা-ভরসা।' বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যদের এমন মহিমার মূল কোথায় বেশই বুঝা যায়। এক স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের গুণ গাহিতেই ভারত সচিব সময় পান নাই, আর আর সদস্যদের গুণের কথা—সে তো তাঁহার হৃদয়ে গাঁথাই রহিয়াছে। কিন্তু শাসন-পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণ যদি এমনই গুণী ও জ্ঞানী এবং ভারতের শাসন-তরণী পরিচালনার পক্ষে এহেন পাকা কাণ্ডারী, তবে আর স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস্‌কে সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়া এদেশে পাঠানো হইয়াছিল কেন? সে প্রহসন না করিলেই তো চলিত!

(৩৫)

সমস্ত রাত্রির দুশ্চিন্তার পর ভোরবেলা সুমন্তর ঘুম ভাঙিয়াছে; এমন সময় ঝড়ের মতো শাশ্বতী ঘরে প্রবেশ করিল।

শাশ্বতী বলিল, "একটা বিশেষ দরকারে রাত থাকতে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে মোটর নিয়ে বার হয়ে পড়েছি। আপনাকে আমার বিশেষ দরকার, গেল রাত্রেই বার হব ভেবেছিলুম, কিন্তু অন্ধকার পথ বলে নেহাৎ আসতে পারি নি।"

সুমন্ত শাশ্বতীর মুখের পানে তাকাইয়া বুঝিতে পারিল, সে সমস্ত রাত ঘুমায় নাই, মুখখানা তাহার অত্যন্ত বিমর্ষ, অত্যন্ত শীর্ণ দেখাইতেছিল।

বলিল, "আপনি কাল সারারাত ঘুমাননি নাকি?"

শাশ্বতী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "নিন, আর দেরী করবেন না; উঠে পড়ুন।"

আশ্চর্য হইয়া সুমন্ত বলিল, "উঠে পড়ব—তার মানে?"

শাশ্বতী বলিল, "কেন যে উঠবেন আর কেন যে আপনাকে এখনই এ গ্রাম ছাড়তে হবে তা আপনি বেশই জানেন। আপনি প্রথম হতেই জানেন, যে কোন মুহূর্তে আপনাকে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে—অবশ্য কোথায় যে যাবেন তা যদিও জানা নেই।"

সুমন্ত অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া গেল।

শাশ্বতী তাহার গাম্ভীর্য দেখিয়া উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "এখনও কি ভাবছেন বলুন তো?"

সুমন্ত হাসিল, বলিল, "আপনার অযাচিত এই করুণার জন্যে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিসেস ঘোষ। আমি দেখছি আপনি সারারাত ঘুমান নি, কখন পূবে ফরসা হবে সেই প্রতীক্ষায় সারারাত আকাশ আর ঘড়ির পানে চেয়ে কাটিয়েছেন। তারপর কাউকে না জনিয়ে কেবল এই অভাগা অজানাকে গাঁ ছাড়া করবার জন্যে নিজে ফুলস্পীডে গাড়ি চালিয়ে পাঁচ ঘণ্টার পথ পাঁচ মিনিটে অতিক্রম করেছেন। আপনাকে আমি হাজার হাজার বার আমার কৃতজ্ঞতা জনাচ্ছি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিচ্ছি—আপনি মিথ্যে রাত জেগেছেন—পণ্ডশ্রমই করেছেন মাত্র।"

বিবর্ণ মুখে শাশ্বতী বলিল, "আপনি যাবেন না ত।"

একান্ত উদাসভাবে সুমন্ত বলিল, "কোথায় যাব বলুন। আমি তো দেখছি, যে মুক্তি আপনি আমার জন্যে এনেছেন সে মুক্তি কোথাও নেই, ও কেবল আপনার মনকে চোখঠারা—অর্থাৎ সান্ত্বনা দেওয়া মাত্র। কারাগার বলতে চান পাঁচিল ঘেরা ছোট একটা ঘরকে, আমি বলব—চারিদিক বেষ্টিত, চারিদিক সুরক্ষিত এই ভারতবর্ষকে। এর আষ্টেপৃষ্ঠে নাগপাশের বন্ধন, আমরা নিরন্তর সে বন্ধনবেদনা অনুভব করছি, আমাদের মুক্তি কোথায়? যে দেশের প্রতিটি লোককে অশন বসনের জন্যে পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়, সামান্য যে কোন কাজের জন্যে অনুমতি চাইতে হয়, নিজের ইচ্ছায় যেখানে কথা বলা দূরে থাক, নড়াচড়া এমন কি তাকিয়ে দেখাও বন্ধ, সে দেশের বন্দীশালা কোথাও নির্দিষ্ট নেই, তার জায়গায় কারাগার— সব জয়গায় 'অধীনতা, সব জায়গায় দুঃখ দারিদ্র্য। কোথা হতে আমি মুক্তি নেব, আমার মুক্তি নেই, জাতির মুক্তি নেই, দেশের মুক্তি নেই। না, আমি কোথাও যাব না মিসেস ঘোষ, স্বেচ্ছায় আমি এ ভিটে ছাড়ব না।"

শাশ্বতী চুপ করিয়া তাহার কথাগুলো শুনিয়া গেল, একটু হাসিয়া বলিল, "আপনার ভিটেয় নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করেন আপনি?"

সুমন্ত মাথা নাড়িল, বলিল, "তাও নয়—কিন্তু আমি এখান হতেই বন্দী হতে চাই, আমার ভিটে হতে আমায় নিয়ে যাক, আমার পিতৃপুরুষের চোখের সুমুখ হতে আমায় নিয়ে যাক।"

শাশ্বতী একটা হালকা নিঃশ্বাস ফেলিল, বলিল, "আপনার সন্ধান পুলিশ পেয়েছে, তারা আজই যে কোন সময়ে আপনার এখানে হানা দিতে আসবে, আপনাকে এখান হতে হাতে কড়া দিয়ে নিয়ে চলে যাবে, আর তারপরে যে শাস্তি আপনাকে মাথায় নিতে হবে—"

বাধা দিয়া সুমন্ত বলিল, "তা আমি জানি শাশ্বতী দেবী, আমি আমার প্রহরীকে আহত করে পালিয়েছি, যদি সে মরে থাকে—"

বাধা দিয়া শাশ্বতী বলিল, "সে মরে গেছে।"

পরম নিশ্চিন্ত ভাবে সুমন্ত বলিল, "হ্যাঁ, তার মরাই উচিত, যে কোন দিক দিয়ে সেদিন সে মরতোই—তার ললাট লিখন। যাক, আমার ভবিষ্যৎ তা হলে হয় ফাঁসির দড়িতে না

হয় আন্দামানে লটকানো রইলো, ধরা পড়লেই এই দুটির মধ্যে একটি নিশ্চিত।"

শাশ্বতী অন্যমনস্ক ভাবে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না।

সুমন্ত বলিল, "আজ আমায় ধরলেও দুঃখ নেই শাশ্বতী দেবী, গতকাল আমার পিতৃপুরুষের কাজ শেষ করেছি, এখন আমি ওদিক দিয়ে মুক্ত। আমি যাদের ভালোবাসি তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, আমার ব্রতে আমি অনেককে দীক্ষা দিয়েছি---"

শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ব্রত কি,—খুন চুরি ডাকাতি তো?"

সুমন্ত হাসিল, বলিল, "দরকার পড়েছিল তাই আমাকে জেনে শুনেও কয়েকটা গর্হিত কাজ করতে হয়েছে শাশ্বতী দেবী। আমার চিরকালের ব্রত আপনি জানেন, আমার ব্রত দেশের তথাকথিত দেশবাসীর সেবা—চিরকাল যা করে এসেছি। আমি কাউকে কোনদিন ছোটলোক বলে ভাবিনি, কাউকে ঘৃণা করিনি, চিরদিন ন্যায়ের পথ ধরে চলেছি, অন্যায়কে পীড়ন করেছি, লাঞ্ছিত করেছি। আপনি তো জানেন, আপনার মাসিমা মেসোমশাই হতে আরম্ভ করে গ্রামের তথাকথিত ভদ্রলোকেরা কেউ আমায় সইতে পারেন না?"

শুষ্ক কণ্ঠে শাশ্বতী বলিল, "জানি।"

সুমন্ত বলিল, "যারা আমায় ভালোবাসে সেই সব ছোটলোক—তাদের আমি সত্যকথা সব বলেছি, বলতে পারি নি শুধু রাজলক্ষ্মীর কাছে, তাকে শুধু জানিয়েছি—আমি জেলপলাতক আসামী।"

শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "কে রাজলক্ষ্মী?"

সুমন্ত গম্ভীর মুখে গভীর কণ্ঠে উত্তর দিল, "সে এক দুর্ভাগিনী বিধবা, জগতের সব হতে বঞ্চিতা।"

মুহূর্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, "জগতে অনেকে আমায় যেমন ঘৃণা করে, আমায় এড়িয়ে চলে তেমনই আরও অনেকে আছে যারা আমায় সত্যই ভালোবাসে—আমার মঙ্গল সর্বদা কামনা করে। এদের মধ্যে আছে আমার ভক্ত তথাকথিত ছোটলোকেরা, আছে তপস্বিনী হিন্দু ব্রহ্মচারিণী বিধবা রাজলক্ষ্মী, আর—আর আছ তুমি শাশ্বতী—"

"আমি—"

শাশ্বতী চমকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল।

সুমন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ তুমি। আজ চিরবিদায়ের মুহূর্তে তোমায় তুমি বলেই সম্বোধন করলুম, নাম করে ডাকলুম, এ অপরাধ আমার ক্ষমা কোর। তুমি আমায় আজই ভালোবাসনি শাশ্বতী, ভালোবেসেছো আজ পাঁচ বছর আগে---প্রথম সে দিনটার কথা আজও মনে আছে। আমি জানি, সেদিন তুমি বুঝতে পারলেও বুঝতে চাও নি--তোমার পুরুষ প্রকৃতি তোমায় বুঝতে বাধা দিয়েছিল, কিন্তু আমি সেদিন বুঝেছিলুম। দিনের পর দিন চলে গেল, তুমি দীর্ঘকাল সামনে না এসেও আমায় ভুলতে পার নি তাও আমি জানি। এ ভালোবাসা নিতান্ত গর্হিত—অনুচিত জেনেই তুমি ডক্টর ঘোষকে স্বেচ্ছায় পিতামাতার অমতে জোর করে বিয়ে করেছো তাও আমি জানি।"

শাশ্বতী মুখ নত করিয়াছিল, উত্তর দিল না।

সুমন্ত বলিল, "আজও তাই সকলকে লুকিয়ে তুমি রাতের অন্ধকারে এসেছো বা'র হয়ে—আমায় নিয়ে যেতে। আমি যদি যাই, তুমি নিজের বিপদের দায়ীত্ব বিস্মৃত হয়ে আমায় লুকিয়ে রাখবে—তুমি নিজের কথা ভাব নি। আমায় তুমি ভুল বুঝিয়ো না শাশ্বতী, আমি তোমায় দেখেই বুঝেছি।"

শাশ্বতী হঠাৎ বসিয়া পড়িল, দাঁড়াইতে সে অসমর্থা হইয়া পড়িয়াছিল, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

সুমন্ত ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ পাদচারণা করিতে লাগিল, দু পাঁচবার ঘুরিয়া সে আসিয়া শাশ্বতীর সামনে দাঁড়াইল—

শান্ত কণ্ঠে বলিল, "তোমায় আমি এ ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই আমি বুঝেছি—তুমি আমায় রক্ষা করার জন্যেই এসেছো, আমায় তুমি বাঁচাতে চাও। জানি, তুমি যেখানেই থাকো—আমার সংবাদ তুমি রাখো—তুমি—"

শাশ্বতী মুখ হইতে হাত সরাইল, অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা গোপনে মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ওসব কথা থাক, আমি বাজে কথা শুনতে চাইনে, বেলা এদিকে আটটা বাজে। আপনি উঠুন, আমার অদৃষ্টে যা-ই থাক, আমি আপনাকে নিয়ে যাব। আমার স্বামীকে আমি অনুরোধ করব, তিনি আপনাকে রক্ষা করবেন, সে মহানুভবতা তাঁর আছে। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন--তিনি আমার কাছ হতে বিয়ের দিন হতে তফাৎ থাকেন, আমার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক না থাকলেও মানুষ হিসাবে আমার কথা রাখবেন, আপনাকে তিনিই দেখবেন। আমি আগেই একদিন তাঁকে সব বলেছি, তিনিই কাল রাত্রে এ সংবাদ আমায় দিয়ে গেছেন। আপনি চলুন সুমন্তবাবু, উঠুন—"

সুমন্ত ধীরভাবে একটা বিড়ি ধরাইল, বলিল, "আমি আন্তরিক দুঃখিত শাশ্বতী, আমি তোমার সঙ্গে যাব না তবে এখানেও থাকব না। তুমি চলে যাও, আমিও এখনি এখান হতে চলে যাব, তোমায় কথা দিচ্ছি।"

জীবনে শাশ্বতী যাহা করে নাই, আজ তাহাই করিল, সুমন্ত বাধা দিবার পূর্বে সে নত হইয়া তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিল, তাহার পায়ের ধুলো মাথায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, "আপনাকে আমি মোটরে তুলে খানিক দূর নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিতে চাই—আসুন।"

সুমন্ত হাসিল, "না, নেহাৎ নাছোড়বান্দা তুমি—চল যাচ্ছি।"

ঘরের বাহির হইয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া অগ্রসর হইল,—

গাড়ির কাছে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "একবার রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করে গেলে হতো না?"

শাশ্বতী সংক্ষেপে বলিল, "সময় নেই--তা হলে আমিও মাসিমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারতুম।"

নিঃশব্দে সুমন্ত গাড়িতে উঠিল—

শাশ্বতী উঠিয়া বসিল এবং গাড়িতে স্টার্ট দিল। পথের

একটা বাঁক ঘুরিতেই সুমন্ত চেঁচাইয়া উঠিল, "থামো থামো শাশ্বতী, আমি রাজলক্ষ্মীকে দুটো কথা বলে যাই, আর তো ওর সঙ্গে দেখা হবে না।

শাশ্বতী মোটর থামাইল।

পথের ধারে যে মেয়েটি দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পানে তাকাইয়া শাশ্বতী বিস্মিত হইয়া গেল। এমন সৌন্দর্য সে যেন কখনও দেখে নাই। তাহার সমাজে সে প্রসাধনচর্চিত অনেক সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়াছে,—এই মেয়েটির সৌন্দর্য তাহা হইতে একেবারে পৃথক।

শুভ্র থান পরিহিতা, রিক্ত দেহা মেয়েটি, এই রাজলক্ষ্মী!

সুমন্ত গাড়ির দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল।

রাজলক্ষ্মী আগাইয়া আসিল, শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "চলে যাচ্ছো সুদা? খবর পেয়েই আমি এখানে এসে দাঁড়িয়েছি—"

সে ভূমিষ্ঠ হইয়া সুমন্তের পায়ের ধূলা লইল—তাহার অবাধ্য চোখের জল কতকটা ঝরিয়া পড়িল সুমন্তের পায়ের উপরে।

সুমন্ত হাতখানা তাহার মাথায় রাখিল, চক্ষু দুইটা বুঝি সজল হইয়া উঠিল। আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, আমি চলে যাচ্ছি রাজলক্ষ্মী, জীবনে আর কোনদিনই আসব না। আমার যা কিছু সব দিয়ে গেলুম ব্রজসুন্দরকে, সেই সব ভোগ করবে। তোমার সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্যে মনটা চাচ্ছিল—তাই তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল। আশীর্বাদ করে যাই রাজলক্ষ্মী, কিন্তু কি আশীর্বাদ করব ভেবে পাচ্ছিনে।"

চোখ মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে রাজলক্ষ্মী বলিল, "আশীর্বাদ কর যেন শিগগিরই মরণ হয়।"

"তাই—তাই আশীর্বাদ করলুম—"

ধীরে ধীরে সে মোটরে উঠিল, শাশ্বতী মোটর চালাইল।

একবার ফিরিয়া দেখিল—সুমন্ত সজলনেত্রে পিছনে ফেলিয়া-আসা পথের পানে তাকাইয়া আছে।

বিভিন্ন পথে দীর্ঘ এক ঘণ্টা মোটর চালাইয়া আসিয়া শাশ্বতী থামিল।

সুমন্ত নামিয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বতীও নামিল।

একবার চারিদিকটা দেখিয়া লইয়া প্রসন্নমুখে সুমন্ত বলিল, "একটা স্টেশনের কাছেই এনেছো দেখছি। এখান হতে আমি যে-কোনদিকে পাড়ি দিতে পারব, কিন্তু আমার পকেট যে শূন্য শাশ্বতী, রেল কোম্পানী আমার আত্মীয় নয়, কাজেই—"

শাশ্বতী নিজের ব্যাগটা খুলিয়া একতাড়া নোট বাহির করিয়া বলিল, "এই পাঁচশো টাকা আছে, চারখানা একশো টাকার, একখানা ভাঙিয়ে খুচরো করে এনেছি। এই টাকাটা নিন।"

সুমন্ত পিছাইয়া গেল, "এত!"

শান্তকণ্ঠে শাশ্বতী বলিল, "পথে বা'র হতে গেলেই অনেক দরকারে লাগবে।"

"তবে দাও—"

সুমন্ত টাকা ব্যাগে ভরিয়া লইল।

শাশ্বতী আবার প্রণাম করিল।

সুমন্ত আশীর্বাদ করিয়া বলিল, "তোমায় আশীর্বাদ করলুম—সুখী হও। দেখো, তুমি যেন আবার চোখের জল ফেলো না।"

হাসিয়া শাশ্বতী বলিল, "আমি রাজলক্ষ্মী নই সুমন্ত-বাবু, আমি শাশ্বতী, শাশ্বত সত্য কাজেই চোখের জল আমার কাছে অত সস্তা নয়।"

সুমন্তের সঙ্গে সঙ্গে সে স্টেশনে প্রবেশ করিল—

সুমন্ত হাওড়ার টিকিট কাটিয়া বলিল, "হাওড়া হতে টিকিট কেটে সোজা পেশোয়ারে চলব, ওখান হতে ব্যবস্থা ঠিক করা যাবে, আমাদের দলটা ওখানেই রয়েছে কিনা। আচ্ছা, তুমি যাও শাশ্বতী, ট্রেন আসছে।"

শাশ্বতী বলিল, "যাচ্ছি, আপনি আগে উঠুন—"

ট্রেন আসিয়া পড়িতেই গাড়িতেই সুমন্ত উঠিয়া পড়িল।

যতক্ষণ ট্রেন স্টেশনে থামিল, শাশ্বতী দাঁড়াইয়া রহিল—

গার্ড হুইসল দিল, ট্রেন চলিতে সুরু করিল—

সুমন্ত হাতখানা বাড়াইল, "বিদায় শাশ্বতী।"

"বিদায়—"

চলন্ত ট্রেন হইতে সুমন্ত জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, শাশ্বতী মোটরের দিকে চলিয়াছে। ক্লান্ত চরণদ্বয় তাহার দেহভার যেন বহিতে পারিতেছে না, সে সামনে নুইয়া পড়িয়াছে।

সমাপ্ত

শান্তিসমাগমে সংগঠন সংকল্প

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধারম্ভ হইতে দীর্ঘ তিনটি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। ধ্বংস ও সংহারলীলা এখনও পূর্ণ উদ্যমে, অকুণ্ঠিত ও অপ্রতিহতভাবে চলিয়াছে। কবে এবং কোথায় ইহার সমাপ্তি ঘটিবে, তাহা ভবিষ্যতের তিমির গর্ভে নিহিত। অবস্থা এবং ব্যবস্থা ক্রমেই জটিল ও কুটিল গতি লাভ করিতেছে। কত দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে; কত রাজ্য স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের গৌরব ও গরিমা হইতে বিচ্যুত হইয়া অধীনতা ও বশ্যতার নাগপাশে বিজড়িত হইয়া অতি দীনভাবে দিন যাপন করিতেছে; কত সহস্র সহস্র সুস্থ, সবল, বলিষ্ঠ ও কর্মঠ স্ত্রীলোক, যুবক ও যুবতী, বালক ও বালিকা অকালে কাল-কবলিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং কত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম, রসদ-পোষাক প্রভৃতিতে প্রতিদিন ব্যয়িত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলেই বলিতেছেন, শান্তির নিমিত্ত, জগতে নববিধান প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এই সমরাভিযান ও সমর পরিচালন, যুদ্ধ-লিপ্ত ও যুদ্ধসংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র মহৎ সকল নায়ক এবং অধিনায়কের মুখে শান্তির অভয় বাণী ও আশ্বাস; অথচ অশান্তি ও অস্বস্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে! চতুর্দিকে ক্ষয় ও ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা! কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধান্তে পৃথিবী যেরূপ ধনজন-বিহীনা হইয়াছিল; কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা বহুগুণে প্রচণ্ডতর এই যুদ্ধের অবসানে, তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ ছিল, মাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নিবদ্ধ। স্বল্প পরিসরে সেই সংহারলীলা চলিয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধকে অনেকেই জগদ্ব্যাপী যুদ্ধ (World War) আখ্যা দিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমান মহাযুদ্ধ তদপেক্ষা বহুলাংশে বিস্তৃত এবং বিনাশশীল। এই যুদ্ধই জগদ্ব্যাপী যুদ্ধ নামে অভিহিত হইবার অধিকারী। অধর্মের বিনাশ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা দ্বারা জগতে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের মহত্তম উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু পরিণামে কি ঘটিয়াছিল? বীরশূন্যা, অর্থশূন্যা ধরিত্রীর দারুণ দুর্দশা দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলিপ্সা বিলুপ্ত এবং জীবনে নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল। কূটচক্রী হিটলারের নববিধানের (New Order) দুঃস্বপ্নও মরু-মরীচিকার ন্যায় অন্তর্হিত হইবে এবং কুরুক্ষেত্র-নাটকের প্রধান নায়ক হৃতসর্বস্ব ভগ্নোরু দুর্যোধনের ন্যায় "পরিণামে পরিতাপ" অবশ্যই ঘটিবে। কিন্তু ধ্বংসলীলার যে প্রচণ্ড ভগ্নস্তূপ তিনি ধরাবক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া পুনঃ-সৃষ্টির প্রসাধনে তাহাকে বৈভব ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিতে যে কত যুগ লাগিবে, তাহা যাঁহারা বিগত মহাযুদ্ধের ধ্বংস-পরিসর ও যুদ্ধাবসানে তাহার পরিপূরণ-প্রচেষ্টার সহিত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে পরিচিত, তাঁহারাই কথঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারিবেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, বর্তমান ধ্বংসলীলার পরিসর ও পরিণাম যে কত ভীষণ হইবে, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা একটুও কঠিন নয়। সুখের বিষয়, বিগত এবং বর্তমান যুদ্ধে প্রত্যক্ষীকৃত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সরকার তৎপ্রতিকার-প্রতি অবহিত হইয়াছেন। শিল্প-বাণিজ্য-নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের যুদ্ধারম্ভ হইতে সানুনয় নির্বন্ধাতিশয্যে, সরকারের ঔদাসীন্য বিদূরিত হইয়াছে এবং মতিগতি সংগঠনের পথে পরিচালিত হইতেছে। সম্প্রতি সরকার বাণিজ্য-সচিবের নেতৃত্বে একটি পুনর্গঠন সমিতি (Reconstruction Committee) সংগঠিত করিয়াছেন এবং যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধোত্তর সংগঠন সংকল্পে যে বিভিন্নমুখী প্রগাঢ় প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইবার নিমিত্ত ভারতের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা স্যার টমাস গ্রেগরীকে বিলাতে প্রেরণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে পুনর্গঠন সমিতি নিষ্ঠা সহকারে কর্তব্য অবধারণ ও অনুষ্ঠানে মনোযোগী হইয়াছেন।

বিংশতি বর্ষ পূর্বে, বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে ক্ষণস্থায়ী তেজস্বিতার পরে, অর্থনৈতিক ও শিল্প পরিস্থিতির ঘোর বিপর্যয় হেতু, যে দীর্ঘ স্থায়ী বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি ক্রমবর্ধমান অবনতির সৃষ্টি করিয়াছিল, বর্তমান মহাবিপ্লবের অবসানে, শিল্পবাণিজ্য, তথা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের গুরুত্ব, বর্তমান আহবের বিস্তার ও বিনাশের অনুপাতে বহুলাংশে প্রচণ্ডতর হইবে। যে সকল শিল্প এখন যুদ্ধের তীব্র তাড়নায় দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে, শান্তির শুভাগমনে সে-সকলের প্রয়োজন শেষ হইবে। যে সহস্র সহস্র শ্রমিক এখন এই সকল অত্যাবশ্যক শিল্পে নিযুক্ত আছে, তাহাদের কর্মের অবসান ও আয়ের অভাব ঘটিবে এবং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ও মজুত অনাবশ্যক অতিরিক্ত মালের কাটতি ঘটাইবার নিমিত্ত ত্বরিত উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। এখন হইতেই এই সকল অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের ভাবী প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তদুদ্দেশ্যেই পুনর্গঠন সমিতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

সরকারের প্রথম ঘোষণায় একটিমাত্র সমিতির প্রতিষ্ঠা বিঘোষিত হইয়াছিল। এই সমিতির সভাপতি বাণিজ্য-সচিব এবং কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও অর্থ, বাণিজ্য, সংরক্ষণ (Defence), শিক্ষা-স্বাস্থ্য-ভূমি শ্রমিক, যোগান (Supply) বিভাগের প্রত্যেকের এবং রেলওয়ে বোর্ডের প্রতিনিধিগণ ইহার সভ্য। এই সংগঠনে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া বণিক সম্প্রদায় তাঁহাদের অসন্তোষের কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরীভূত করেন। এই সংগঠনে, একমাত্র বাণিজ্য-সচিব ব্যতীত কোন ভারতীয় সদস্য যে স্থান পাইবেন না, ইহা তাঁহারা অঙ্কুরেই অনুমান করিয়াছিলেন। পুনর্গঠন, অর্থাৎ শান্তি সংগঠন সমিতির কর্তব্য যে, যুদ্ধ প্রয়োজনসম্ভূত শিল্প, তন্নিয়োজিত শ্রমিক ও তদুৎপন্ন উদ্বৃত্ত দ্রব্যসম্ভারের নিষ্কৃতি

ব্যবস্থায় নিবদ্ধ নহে, পরন্তু যুদ্ধ-প্রয়োজনপ্রসূত সকল শিল্পের উৎপাদন ও বিস্তারশক্তিকে স্থায়ীভাবে, শান্তিকালে, দেশের কল্যাণকর অর্থনৈতিক অভ্যুদয়ের অনুকূল ও অনুগামী করিবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সংক্রান্ত; তাহাই নিবেদন করিয়া ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে, দেশের কয়েকজন প্রধানতম শিল্পনিষ্ঠ ও গণনিষ্ঠ ব্যক্তি লইয়া এমন একটি সমিতি গঠিত হউক, যাহা যুদ্ধোৎপন্ন প্রচণ্ড সঙ্ঘ ও কর্মশক্তিকে চিরকল্যাণপ্রদ জাতীয় সমুত্থানকল্পে নিয়োজিত করিতে পারিবে।

সরকারের উদ্দেশ্য ছিল, মূল সমিতি কয়েকটি উপসমিতিতে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিবেন এবং তাহাদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত মূল সমিতির অধিবেশনে যাচাই করিয়া গ্রহণ করা হইবে। প্রয়োজনানুযায়ী সমিতি প্রাদেশিক সরকার এবং করদ ও মিত্ররাজ্যগুলির সহিত আলাপ-আলোচনা এবং বিশিষ্ট ও বিশেষজ্ঞ শিল্পবাণিজ্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিবেন। সমিতির আকার-আয়তন অযথা বৃদ্ধি দ্বারা তাহাকে একটি অতিকায় মন্থরগতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত না করিয়া, সরকার প্রয়োজনানুযায়ী সাময়িক সহযোগিতার ব্যবস্থা দ্বারা, কোন বিশেষ সমস্যার জন্য তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, বাণিজ্য-সচিব প্রাদেশিক বণিক সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া যে যুক্তিতর্কের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে মূল-সমিতি ব্যতীত আরও চারিটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। মূল-সমিতির গঠনপ্রণালীর পরিবর্তন করা হয় নাই; তবে এই সমিতির আখ্যা হইয়াছে Co-ordination, অর্থাৎ অন্য সমিতিগুলির কার্যকারণ শৃঙ্খলা বিধান সমিতি। শেষোক্ত চারিটি সমিতিতে বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকিবে। মূল সমিতি এই সমিতিগুলির সিদ্ধান্ত সম্বলিত বিবৃতি গ্রহণ করিবেন এবং তাহাদের কার্যকালে প্রয়োজনানুযায়ী উপদেশাদি প্রদান করিবেন। বণিক সম্প্রদায়ের অভিযোগ, এই মূল-সমিতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-বর্জিত সম্পূর্ণ সরকারী সংগঠন। সরকার অবশ্য আশ্বাস দিয়াছেন যে, শাখা সমিতিগুলির বিবৃতি সপারিষদ বড়লাট বাহাদুর বিচার বিবেচনা করিবেন। এই আশ্বাসে বণিক সম্প্রদায়ের আশা পূর্ণ হয় নাই।

ইতিমধ্যে, মূল সমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে অন্য চারিটি সমিতির কর্ম পরিধি নির্ধারিত হইয়াছে। একটি সমিতির বিবেচ্য Labour and Demobilisation অর্থাৎ শ্রমিক ও সৈনিক নিষ্কৃতি। দ্বিতীয়ের অধিকার Disposal and Contracts অর্থাৎ প্রস্তুত ও মজুত মালের সম্পত্তি এবং অসমাপ্ত চুক্তির ব্যবস্থা। তৃতীয়ের আয়ত্তে Public works and Purchase অর্থাৎ সর্বসাধারণের হিতকর কর্ম এবং ক্রয়। চতুর্থের নির্দিষ্ট কর্ম Trade, International Trade Policy and Agricultural Development অর্থাৎ ব্যবসায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি এবং কৃষি সমুন্নয়ন।

এই কর্ম বিভাগ কোথাও আশার, কোথাও বা নৈরাশ্যের সঞ্চার করিয়াছে। প্রথম তিনটি বিভাগ স্থূল কর্মমূলক, কিন্তু শেষোক্তটি সূক্ষ্ম নীতিমূলক। প্রথম তিন বিভাগের কর্তব্য সরকারী কর্মচারিগণের সহজসাধ্য। শেষোক্ত বিভাগে বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন, কারণ এইটিই গঠনমূলক। এই বিভাগের কর্মতৎপরতা ও সিদ্ধান্তের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও প্রগতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবে। পুনর্গঠনের মূল উদ্দেশ্য উদ্বৃত্তের বিলিব্যবস্থা মাত্র নহে। অকস্মাৎ বহু শিল্পোদ্যমের বিরতি, বহু শ্রমিকের কর্মচ্যুতি, বহু পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিসমাপ্তি, বহু বণিকের ব্যবসা-সঙ্কোচ এবং বহু ধনিকের অর্থসঙ্কটপ্রসূত শিল্পবাণিজ্যের বিষম বিপর্যয়কে জাতীয় অর্থনৈতিক অভ্যুত্থানের অনুকূল ও উপযোগী করিবার ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা। জাতীয় অর্থনৈতিক অভ্যুত্থানের সহিত জাতীয় শিল্পবাণিজ্য ও কৃষির সুপরিকল্পনা-পরিপুষ্ট বিস্তার ও উন্নতি প্রয়োজন।

শান্তির শুভাগমনে যুদ্ধ প্রয়োজন পরিমুক্ত শিল্পগুলির স্থায়ী দেশহিতকর নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনে বিনিয়োজন, যুদ্ধ কর্মচ্যুত শ্রমিক ও সৈনিকের অর্থোপার্জন হেতু নিত্যকর্মের ব্যবস্থা এবং মজুত ও প্রস্তুত উদ্ধৃত্ত যুদ্ধশিল্পজাত দ্রব্যাদির ত্বরিত বণ্টন-বিক্রয়-বিধান এরূপভাবে করিতে হইবে, যাহাতে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রচণ্ড বিপর্যয় না ঘটে। যুদ্ধান্তে অবশ্যম্ভাবী এইরূপ বিপর্যয়ের প্রতিকারকল্পে সরকারের কোন পরিপুষ্ট পরিকল্পনার ইঙ্গিত আমরা এখন পাই নাই। যুদ্ধানুষঙ্গিক বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন জাতীয় অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতির বিষম বিপর্যয় ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। যুদ্ধমান জাতিগুলির যেরূপ ধনসম্পত্তির ও জন-সম্পদের প্রভূত ক্ষতি ঘটিতেছে, তাহার তুলনায় তাহাদের পুনর্গঠনের প্রচেষ্টাও অতি বিপুল হইবে। আমাদের ক্ষতি যদিও তত প্রচণ্ড ও প্রভূত নহে, তথাপি আমাদের অতি দরিদ্র দেশের যে বিপুল অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা আমাদের ন্যায় নিরীহ নিরন্নের পক্ষে অপরিসীম। এই হিসাবে ব্যবসা, বাণিজ্যনীতি ও কৃষি-সমুন্নয়ন উপ-সমিতির কর্ম-পরিধি অতি বিস্তৃত ও বিঘ্নসঙ্কুল।

দ্রব্যমূল্য, রৌপ্য মুদ্রা বিনিময় মূল্যমান, প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের প্রাচুর্য ও সুলভতা, দেশের আর্থিক পশার ও ঋণ পরিচালন নীতি, আমাদের আয়ত্তচ্যুত রপ্তানী পণ্য বিক্রয় বাজারের পুনরুদ্ধার, রক্ষণ শুল্ক অথবা অনুরূপ সরকারী সাহায্য দ্বারা শিল্প সম্বর্ধন এবং কৃষিসমুন্নয়ন প্রভৃতি সমস্যা, এই উপসমিতির বিচারবিবেচনা সাপেক্ষ। মুদ্রা বিনিময়, মুদ্রা স্বচ্ছলতা, শিল্প সমুন্নয়ন প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে যুদ্ধান্তে ব্যাপক ও বিস্তৃত তদন্তের প্রয়োজন হইবে এবং তজ্জন্য রাজকীয় তদন্ত সমিতির নিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। ইতিমধ্যে যুদ্ধাবসান মাত্রই তৎকালোদ্ভূত পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তের বশীভূত করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে এখন হইতেই প্রস্তুত হইতে হইবে। যদিও যুদ্ধ কবে শেষ

হইবে তাহার এখন কোন স্থিরতা নাই, তথাপি ইংলণ্ডে—যেখানে সদা সশঙ্কিত অবস্থায় কর্তৃপক্ষকে আত্মরক্ষা ও আক্রমণ উভয়বিধ ব্যবস্থায় সর্বদা সর্বতোভাবে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে,—যুদ্ধান্তে পুনর্গঠনের নিমিত্ত সেখানেও সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত, যুদ্ধের প্রাক্কাল হইতে একজন দায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রী কর্মতৎপর রহিয়াছেন। ভারত সরকারের পুনর্গঠন সমিতি তাহারই ক্ষীণ অনুকরণ মাত্র। বিলাতে পুনর্গঠন মন্ত্রীর তদন্ত-পরিধি যেরূপ বিস্তৃত, ভারতীয় সমিতির অধিকার তত প্রশস্ত নহে। এই সমিতি নিজেদের সামঞ্জস্য-সমীকরণ-সংশোধন সমিতি (Co-ordination Committee) আখ্যা দিয়াছেন।

এই পুনর্গঠন সমিতির সংস্রবে পনর জন প্রথিত নামা অর্থনীতিবিদ্ লইয়া একটি অর্থনৈতিক সমিতি (Economic Committee) নিযুক্ত হইয়াছে। এই সমিতির কার্য যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে পরস্পর সাপেক্ষ করিয়া অধিকতর কার্যকরী করা। অর্থনৈতিক সমিতি চেষ্টা করিবে—পরিমিত ব্যয়ে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত ও সরবরাহ করিতে। ফলে পুনর্গঠন সমিতির কার্য, পরিশেষে যুদ্ধশিল্পের বিরতি সাধনে (Liquidation of War Industries) পর্যবসিত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা নহে। যুদ্ধশিল্পের যতগুলিকে দেশের কল্যাণার্থ স্থায়ীভাবে বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়, তৎপ্রতি আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রয়োজন। তাঁহাতে সেই সেই শিল্পে, দেশের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে তাহা নহে ; ঐ সকল শিল্পে নিযুক্ত অর্থ ও শ্রমিকের সদ্ব্যবহার হইবে। নিতান্ত দুষ্কর অথবা অপ্রয়োজনীয় না হইলে এই সকল শিল্পের অধিকাংশকেই বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। সুখের বিষয়, বাণিজ্য-সচিব এ বিষয়ে যথাসম্ভব সরকারী সাহায্য প্রদান করিবার আশ্বাস দিয়াছেন। এই সাহায্য যথাসম্ভব নহে, যথোপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যে সকল শিল্পের প্রয়োজন-নাশ-হেতু বিরতি ঘটিবে, তাহাতে নিযুক্ত শ্রমিক এবং যুদ্ধ-বিরতি-হেতু-মুক্ত সৈনিকদিগের নানাবিধ অভ্যুদয়শীল কর্মে নিযুক্ত করিতে হইবে, নতুবা বেকার সমস্যা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিষম বিপর্যয় ঘটাইবে। সর্বসাধারণের উপকারী কর্মের (Public Works) পরিসরই ইহার মুখ্য প্রতিকার। শিল্পের, কৃষির এবং তদানুষঙ্গিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারও এ বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করিবে।

বিগত মহাযুদ্ধে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তদনুপাতে বর্তমান মহাবিপ্লব প্রসূত ক্ষতি অত্যধিক বিস্তৃত ও ব্যাপক হইবে। যেরূপ অসহায় অবস্থায় আমরা গত বারে পতিত হইয়াছিলাম এবং যেরূপ আনাড়ীভাবে আমরা যুদ্ধান্তে সমুৎপন্ন সমস্যাগুলির প্রতিকার প্রয়াস অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহার মুখ্য কারণ ছিল, ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আমাদের অপরিসীম উদাস্য ও অবিমৃষ্যকারিতা। কোন যুক্তিসিদ্ধ পরিকল্পনা-পরিপুষ্ট কর্মসূচীর অভাবে আমরা ১৯১৮ হইতে ১৯২২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অন্যান্য দেশের সমবায় গতি প্রকৃতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির প্রকোপে পর্যুদস্ত হইয়াছিলাম। গত মহাযুদ্ধের বিপর্যয় অপেক্ষা বর্তমান মহাসমরের বিপর্যয় যে কত শত গুণে অধিকতর হইবে, তাহা এখনও কল্পনাতীত। তথাপি পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান অবস্থানুযায়ী অনুমানের সাহায্যে আমাদিগকে যথাসম্ভব কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিপুষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে। যাহাতে যুদ্ধান্তে সমুদ্ভূত পরিস্থিতিকে আমরা অনায়াসে না হউক, স্বল্পায়াসে অথবা বিপুল আয়াসেও করায়ত্ত করিতে পারি।

যুদ্ধের নিমিত্ত আমরা বর্তমানে কুড়ি হাজার প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ করিতেছি। যুদ্ধার্থ প্রয়োজন চল্লিশ হাজার প্রকারের দ্রব্য। কোন বিশেষ একটি দেশের পক্ষে সর্বপ্রকার যুদ্ধ-সম্ভার প্রস্তুত ও সরবরাহ করা সম্ভব নহে। কিন্তু এই কুড়ি হাজার প্রকার দ্রব্য উৎপাদনার্থ যে অন্ততঃ কুড়ি লক্ষ লোক কর্মে নিযুক্ত আছে, এই শিল্পের বিরতি ঘটিলে তাহাদের অবস্থা ও সেই সঙ্গে তাহাদের পরিবার সমষ্টি সম্ভূত আমাদের দেশের অবস্থা কি দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তৎপ্রতিকারকল্পে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা অবশ্য নির্ভর করিবে, সরকারী সাহায্যের পরিধি, পরিমাণ ও তৎপরতার উপর। যুদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ঘাত-প্রতিঘাতও আমাদিগকে সহিতে হইবে প্রচুর। শান্তি-চুক্তির সন্ধি সর্তে ভারতের দাবী বা অধিকার কতটুকু থাকিবে তাহাও বিবেচ্য। আমাদের বর্তমান শাসন প্রণালীর কোন অথবা কিরূপ পরিবর্তন হইবে এবং তাহা আমাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কিংবা প্রতিকূল হইবে, তাহাও ভাবিবার বিষয়। আমাদের সর্বপ্রচেষ্টার সফলতা অথবা বিফলতা, স্বার্থকতা অথবা নিরর্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করিবে, যুদ্ধান্তে অর্জিত ভারতের জাতীয় মর্যাদার উপর এবং নববিধানের ফলে ভারতের শাসন-তন্ত্রের গণতান্ত্রিক অথবা আমলাতান্ত্রিক পরিবর্তন-প্রসূত স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা ও অধিকারের পরিসরের উপর। ভারতের শাসন কর্তৃত্ব ভারতে ভারতবাসীর হস্তে কেন্দ্রীভূত হইলে মঙ্গল ; নতুবা সুদূরনিবাসী শাসক অথবা শোষকমণ্ডলীর নিরসন-নিয়ন্ত্রণের বশীভূত হইলে আমরা অশান্তি ও অনিষ্টই আশঙ্কা করিব প্রচুর।

বন্ধনী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অপমানের ভাতগুলি যেন গলা দিয়া নামিতে চাহে না সুলতার; কয়েকবার অকারণেই আঙুল দিয়া থালার উপরে কতকগুলি আঁকজোক কাটিয়া অবশেষে একসময় থালায় জল ঢালিয়া সে উঠিয়া পড়িল। নন্দরাণী নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন, তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—অর্থাৎ রাগ দেখানো হলো নবাবনন্দিনীর? সোয়ামী যার ঘরে বসে থাকে, তার আবার অত অহংকার কিসের লো!......

নন্দরাণী আরও আঘাত করিতে পারিতেন এবং করিতেনও, কিন্তু সুলতা কহিল,—অহংকার তো নয় দিদি,—আপনি ঠিকই বলেছেন; দু' পয়সা ঘরে আনবার ক্ষমতা যার নেই, অসুখ হয়ে ঘরে বসে থাকাটা তারপক্ষে সত্যিই মস্ত বড় অপরাধ!

কথাটা হইতেছিল সুলতার স্বামী দেবনাথকে লইয়া,—নির্বিকার লোক, আগে কাজ করিত কোন এক জমিদারী সেরেস্তায়—মাস কয়েক হইল অসুখ হইয়া বাড়িতে পড়িয়া আছে—ডাক্তাররা বলেন রক্তদুষ্টি, যতদিন না সারে, ঠায় বাড়িতে বসিয়া থাকিতে হইবে, সেই সঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসা। নানা কারণে শেষের দিকটা আর রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই, তবে বাড়িতে বসিয়া থাকিতে ডাক্তারের ভিজিট গুণিতে হয় না বলিয়াই বোধ হয় দেবনাথ উপদেশের প্রথম দিকটা নির্বিকার ঔদাসীন্যের সহিত রক্ষা করিয়া চলিল। হিসাবে সেইখানেই দেবনাথের চরম ভুল হইয়া গিয়াছিল,—যতদিন চাকরী করিয়াছে ততদিন নন্দরাণীর যে মূর্তি দেখিয়াছে, তাহার আড়ালে যে এক কালনাগিনী ফণা উঁচাইয়া বসিয়া থাকিতে পারে, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই—যখন বুঝিল, তখন যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।

সুলতার প্রধান অপরাধ, তাহার স্বামী অকর্মণ্য এবং দেবনাথের সেই অকর্মণ্যতাকে অবলম্বন করিয়া নন্দরাণী হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, দেবনাথের ক্ষুৎপিপাসা আর পাঁচজনের মত থাকা উচিত নহে, তাহার উচিত ছেলেমেয়েদের সহিত সুলতাকে বাপের বাড়িতে পাঠাইয়া দেওয়া এবং সেই সঙ্গে সম্ভব হইলে নিজেও......, আর সম্ভব না হওয়াটাও তো উচিত নহে। হিসাবের ফলাফলগুলি যখন বিভিন্নরূপে নন্দরাণীর মুখ দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল, তখন দেবনাথ এই উচিত অনুচিতের কাঞ্চনজঙ্ঘার সম্মুখে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

দেবনাথ অকর্মণ্য, সুতরাং কলহের ভিত্তিটা বেশ পাকাই ছিল নন্দরাণীর পক্ষে,—তাঁহার আর নিত্য-নূতন অজুহাত খুঁজিতে হয় না,—আজও হইল না; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, সুলতা তাঁহার আঘাতগুলি নীরবে সহ্য করিয়া গেল, তখন সহসা তাঁহার চৈতন্য হইল যে, এই নীরবে সহিয়া যাওয়ার অর্থ আঘাতগুলি তাঁহাকেই ফিরাইয়া দেওয়া নয়তো!

সুলতা কহিতেছিল,—অহংকার তো নয় দিদি,—আপনি ঠিকই বলেছেন—দু' পয়সা ঘরে আনবার ক্ষমতা যার নেই অসুখ হয়ে পড়ে থাকাটা সত্যিই তার পক্ষে মস্ত বড় অপরাধ!

সুলতার এই ভাসা-ভাসা জবাবগুলি কি জানি কেন নন্দরাণী সহিতে পারেন না, মনে হয়, এই নিরীহ কথাগুলির মধ্যে অবিমিশ্রিত বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—অহিংস কথার আবরণে আচ্ছন্ন সে বিদ্রূপ তিনি ঠিক বুঝিতে পারেন না, তবু তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকে না নন্দরাণীর। বিপদ্ এইখানেই; ইচ্ছা হয়, কথাগুলির উত্তরে সুলতাকে তিনি কাঁদাইয়া ছাড়েন, কিন্তু আসলে যে কি কথার উত্তরে তাহা করিবেন, তাহাই তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। বাধ্য হইয়াই নন্দরাণী ক্রমান্বয়ে এক প্রসঙ্গ হইতে অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া আসেন এবং যখন এক শুভমুহূর্তে কলহের সাময়িক অবসান হয়, তখন দেখা যায় যে, মূল প্রসঙ্গের সহিত তাহার কোনই যোগাযোগ নাই—নন্দরাণী সুলতাদের বংশের নানা কলঙ্ক কাহিনী টানিয়া বাহির করিয়াছেন—তা হোক্ না সে মনগড়া।

সুলতা মাটি হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া উচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জনের অংশগুলি থালার উপরে তুলিয়া ফেলিতে লাগিল।

কথার জের টানিয়া নন্দরাণী কহিলেন—এদিকে তো অপরাধ-নিরপরাধের জ্ঞান দিব্যি আছে,—তাই যদি বুঝিস্, তবে সেইভাবে চললেই তো হয়,—আর তাও বলি, যে সংসারের মেয়েরা বেরিয়ে যায় পরপুরুষের সঙ্গে, তাদের কাছ থেকে ভদ্রঘরের আচার-ব্যবহার আশা করাই ভুল! বাপ-মা চিরদিন যে শিক্ষে........নন্দরাণী অশ্রান্তভাবে বকিয়া চলিলেন।

এক নিমেষে যেন সারা ঘরটার আবহাওয়া একটা জঘন্য কদর্যতায় ভরিয়া উঠিয়াছে, সমস্ত বাতাসটা যেন অস্বাভাবিকরূপে ভারি হইয়া উঠিয়াছে পঙ্কিল কলুষের স্পর্শে—প্রাণ ভরিয়া নিশ্বাস লইতেও কষ্ট হয়! বাসনগুলি হাতে লইয়া সুলতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—কে যেন তাহার সমস্ত শক্তিটুকু নিঃশেষে নিঙড়াইয়া লইয়া গিয়াছে—তারপর একটিও কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে পুকুরের দিকে চলিয়া গেল।

আশেপাশের বাড়িগুলির জানলাতে কয়েক জোড়া কৌতূহলী চক্ষু।

রাত্রে সুলতা দেবনাথকে কহিল,—দ্যাখো, এমনি করে আর চলে না। তুমি ভাসুরঠাকুরকে বুঝিয়ে বল সব কথা, তারপরে চল আমরা কলকাতায় চলে যাই। কাজ যা হোক্ একটা কিছু জুটবেই, যতদিন না জোটে, ততদিন না হয় সেজমামার বাসায় থাকা যাবে।

দেবনাথ 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' কিছুই বলিল না।

উৎসাহের আধিক্যে সুলতা বলিয়া চলিল,—তবে সেই কথাই রইলো, কেমন? কালই কলকাতা রওনা হবো আমরা—

তুমি বরং সকালে যেয়ে রহমৎকে একটা খবর দিও. সে যেন তার নৌকো নিয়ে ন'টার ভিতরেই এখানে চলে আসে, তা নৈলে রসুলপুর যেয়ে স্টীমার ধরা যাবে না।'

দেবনাথ একটু হাসিয়া কহিল,—বড্ড মাথা গরম হয়ে গেছে তোমার,—মাথায় একটু জল থাবড়ে শুয়ে পড় দেখি।

নিমেষে সুলতার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। এক-মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল,—তোমরা পুরুষরা ভারী নিষ্ঠুর গো,—প্রাণের সমস্ত আশার রঙীন আমেজ দিয়ে তিল তিল করে যে স্বপ্ন আমরা সৃষ্টি করি, তা এক নিমেষেই চূর্ণ হয়ে যায় তোমাদের সামান্য একটা কথায়!

দেবনাথ ব্যস্ত হইয়া কহিল,—না, না তা আমি কিছু বলিনি, তবে মন কাঁদবে না তোমার বাসুর জন্যে? তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে কলকাতায়?—

এতক্ষণ তো সুলতা একথা ভাবিয়া দেখে নাই! বাসুর জন্য তাহার মন সত্যিই একটা মোচড় দিয়া উঠিল, কিন্তু পাছে তাহার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া কথাটা চাপা পড়ে, সেইজন্য তাহার উপর একটা অস্বাভাবিক রুক্ষতার আবরণ চাপাইয়া দিয়া সুলতা কহিল,—থামো তুমি! শত্তুরের ছেলে. তার জন্যে আবার মন-কাঁদা! এ পাষাণে আর ও-সব মায়া-দয়া শিকড় গাড়ে না গো!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া গেল সুলতা,—কালই চল আমরা পালাই এখান থেকে।

সুলতার মন যেন একমুহূর্তে মূর্ত হইয়া উঠিল দেবনাথের চক্ষে, দেবনাথ কহিল,—কি জানো সুলতা, মন যেখানে যত বেশী দুর্বল, সে সেখানে তত বেশী তাড়াতাড়ি বিদায়পর্বটা সেরে ফেলতে চায়,—মন তোমার শক্ত নয় সুলতা!

সুলতার দুই চোখের কোণ্ চকচক করিয়া উঠিল—কহিল,—ও-সব তত্ত্বকথা রাখো তুমি,—মন আমার শক্ত কি দুর্বল কালকেই তা দেখে নিও।

আলোটা নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল সুলতা। এক ফালি আকাশ ধরা পড়িয়াছে সামনের জানালাটাতে, স্তব্ধ আঁখি মেলিয়া সুলতা সেদিকে তাকাইয়া রহিল। রাত্রির চাকা অনেকখানি ঘুরিয়া আসিয়াছে, মৃত হলুদবর্ণ চাঁদের আবছা আলোকে অস্পষ্টভাবে অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে—অনেকদূর,—সেই যেখানে কুমারনদের ঢালু পাড়ের উপরে নুইয়া-পড়া কাশফুলের গুচ্ছ আলো-আঁধারির নেশায় দৃষ্টিবিভ্রম জাগাইয়া দেয় রাত্রিচারী পথিকের চোখে,—দূরে দূরে আরও অনেকদূরে—আকাশের গায়ে নক্ষত্রগুলি মুক্তির আশা লাগিয়া যেন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে—আরও কত দূরে গো!

সঙ্কীর্ণপরিসর খালের বুকে ছুটিয়া চলে কলের স্টীমার. জেলে ডিঙ্গীগুলি সহসা একটা অভূতপূর্ব সাড়া পাইয়া ঢেউয়ের দোলায় নাচিতে থাকে; সীমাহীন আকাশের গায়ে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, তাহারি কোল বাহিয়া দুই-একটা গাংচিল ঘুরিয়া ঘুরিয়া জলের উপরে নামিয়া আসে, ঢেউগুলি দুই ধারে ছড়াইয়া পড়িয়া পাড়-ভাঙা নদীর বুকে কঙ্কালের মত বাহির হইয়া-পড়া গাছের শিকড়গুলির পাকে পাকে জড়াইয়া মরে...।

নিদ্রাহীন অখণ্ড অবসরের প্রতিটি মুহূর্ত স্বপ্ন দিয়া বুনিয়া চলিল সুলতা।

সকাল বেলা নন্দরাণী স্নান সারিয়া আসিয়া দেখিলেন সুলতার ঘরের দরজা তখনও বন্ধ,—আশ্চর্য, এত বেলা পর্যন্ত মানুষে ঘুমায় কেমন করিয়া! দরজায় করাঘাত করিয়া ডাকিলেন, —ছোট বৌ, ও ছোট বৌ, ধন্যি ঘুম বাবা তোর! ওদিকে বাসু যে ক্ষিদের চোটে বাড়িটাকে মাথায় করে তুললো,—আর ছেলেটাকে নিয়েও হয়েছে মহা যন্ত্রণা—কবে এসে কাকীমা খেতে দেবে তবে ছেলে খাবেন! নে এখন বসে বসে তপিস্যে কর, যদি তাঁর দর্শন মেলে......।

সুলতা ততক্ষণে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়াছে—উঃ, বেলা হইয়াছে তো কম নয়! প্রখর সূর্যের আলো জানালা বাহিয়া আসিয়া সারা ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সর্বাঙ্গে আলোর আশীর্বাদ মাখিয়া ঝলমল করিতেছে নূতন চূণকাম করা দেয়ালগুলি, সেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই সুলতার চক্ষু ঝলসাইয়া গেল যেন। নিস্তব্ধ রাত্রির যে প্রশান্ত ঈষৎ ছায়াতুর জ্যোৎস্না-করুণ রূপ সুলতার সারা অন্তর প্রাচুর্যে ভরিয়া দিয়া তাহার মুগ্ধ চক্ষুতে স্বপ্নের তুলি বুলাইয়া দিয়াছিল, সহসা সে যেন দিনের আলোর স্পর্শ হইতে সন্তর্পণে নিজেকে বাঁচাইয়া ত্রস্তপদে পলাইয়া গেল। একটা অকারণ লজ্জা আসিয়া চকিতে নাড়া দিয়া গেল সুলতার অন্তরকে; রাত্রির নির্জনতার অবসরে যে আত্মাটি স্বপ্নের জাল পাতিয়া পলায়নপর সাহসী মুহূর্তগুলিকে একে একে আটকাইয়া ফেলিয়াছিল, দিবালোকে সে যেন সহসা অত্যন্ত ভীরু হইয়া উঠিয়াছে।

তাড়াতাড়ি চোখে-মুখে জল দিয়া বাসি কাপড়টা ছাড়িয়া ফেলিল সুলতা, তারপরে ত্রস্তপদে রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া বাসু কাঁদিতেছে,—সুলতা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

—লক্ষ্মীতো বাসু, আর কাঁদে না! এই তো এসেছি আমি, ইস্, ক্ষিদেয় পেট যে একেবারে পড়ে গিয়েছে সোনামণির! —তারপরে শোন্—রাজপুত্তুর তো ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন তেপান্তরের মাঠে—ঘোড়ার খুরের ধুলোয় আকাশে মেঘ জমতে লাগলো......।

তেপান্তর! সে কত দূর? কলিকাতা হইতেও দূরে? হাতা দিয়া দুধ নাড়িতে নাড়িতে বারেবারেই যেন সুলতা অন্যমনস্ক হইয়া যাইতে লাগিল!

—আয় আয় টিয়ে নায়ে ভরা দিয়ে......।

জেলেদের নায়ের বুকে দোলা লাগিয়াছে। স্টীমার এতক্ষণে ছোট খাল বাহিয়া বড় গাঙে পড়িল নাকি! জালে ধরা পড়িয়া সূর্যের আলোকে মাছগুলি চকচক করে, প্রবল স্রোতের বেগে স্টীমার থরথর করিয়া কাঁপে, নদীর পাড় বাহিয়া কৌতূহলী একজোড়া চক্ষু দৃষ্টির সীমানা খুঁজিয়া লইতে উধাও হইয়া যায়—মটরশুটির দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেতগুলির পরে ধু ধু করে একখানি গ্রাম—তারপরে আর দৃষ্টি চলে না. পৃথিবী আর আকাশ যেন একাকার হইয়া গিয়াছে।

ছয়

একদিন গেল, দুই দিন গেল। অনুপম চিঠির জবাব পাইল না। চাকরির চিঠিটার জন্য সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। ও-বাড়ির মেয়েটার দেখা পাইবার প্রত্যাশায় সে পার্কে এবং জানলার নীচে বিস্তর ঘোরাফেরা করিল, কিন্তু কথা বলার সুযোগ তো দূরের কথা চাক্ষুষ দেখাটা পর্যন্ত মিলিল না।

আজ ১২ই জুন। আজ রওনা না হইলে ১৫ই বোম্বাইয়ে পৌঁছান যাইবে না। ইহার উপর মুস্কিলের উপর মুস্কিল। কোম্পানীর নামটা অনুপম ইতিমধ্যে ভুলিয়া বসিয়াছে। কি না জানি নামটা ছাই, সে মাথার চুল টানিয়া আক্ষেপ শুরু করিল, 'সর্বনাশ করে' বসুলাম যে। কি মূর্খতাই করা হয়েছিল; চাকরির চিঠিটা আবার পাঠাতে গিয়েছিলাম কেন!'

ঘরের মধ্যে চরম হতাশায় সে প্রায় লাফাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। নামের প্রথমে ইংরেজি 'K' অক্ষরটা আছে। তারপর? নাঃ কিছু মনে আসছে না! দেড় গজী নাম, ছাই মনে থাকে কি করে? 'K' আছে, নির্ঘাৎ আছে প্রথমে, কিন্তু তারপর? নাঃ, দিলুম শেষ করে'। চিঠির খামটা থাকলেও হ'তো; দুমড়ে' কখন ফেলে দিয়েছি।'

ভজহরি কি এক কাজে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, বাবুর অবস্থা দেখিয়া ভড়কাইয়া গেল। বিস্মিত হইয়া কহিল, 'ওকি হচ্ছে, বাবু; ওরকম কচ্ছেন কেন? মাথা গরম হ'য়ে উঠল নাকি? বরফ আনব?'

'চাকরির চিঠিটা,' ঢোক গিলিয়া অনুপম কহিল, ও-বাড়িতে, মানে—'খুঁজে আর পাচ্ছিই না।'

'পাচ্ছেন না,' ভজহরি ভীত হইয়া কহিল, 'কোথায় রেখে-ছিলেন সেটা?'

ব্যাটা তো জেরা করিয়া কোণঠাসা করিবার উপক্রম করিয়াছে! যা ছেলেমানুষি করিয়াছে, করিয়াছে; চাকরের কাছে বোকা সাজিতে অনুপম পারিবে না। কহিল, 'তা কি মনে আছে ছাই। তবে আর খুঁজে মরছি কেন। রেখেছিলেম কোথায়ও তো পাচ্ছিনে।'

'একি সর্ব্বনেশে কথা।'

'নিঃসন্দেহে।' অনুপম স্বীকার করিল। 'যা তো ভজহরি, নীচে রাস্তায় গিয়ে দেখ, চিঠির খামটা কোথাও খুঁজে পাস কি না। খামটা রাস্তায়ই ছুঁড়ে ফেলেছিলাম, স্পষ্ট মনে আছে।'

ভজহরি কহিল, 'রাস্তায় কবে টুক্‌রা কাগজ ফেলেছিলেন, তাকি আর এতক্ষণ পড়ে আছে? তবু যাই, একবার খুঁজে দেখি। আপনিও ওপরে আঁতিপাতি করে' খুঁজুন। হাতে চাঁদ পেয়ে শেষে কি হারিয়ে বসবেন; বিছানার তলাটা একবার খুঁজুন—রাজ্যের জিনিস ওখানে জড়ো হয়ে আছে'......

ভজহরি প্রস্থান করিলে অনুপম জানলার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। বিছানার তলাটা সে ইতিমধ্যে অন্তত সাতবার তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে চিঠির পুরানো খামটার জন্য।—চিঠিটা কোথায় আছে, তাহার জানাই আছে। তাহার জন্য এখানে আঁতিপাতি করিয়া খুঁজিবার কোনই অর্থ হয় না। চোখে মুখে প্রচণ্ড হতাশা, চুল উস্কখুস্ক, মাথাটায় আগুন জ্বলিতেছে।

এমন সময় দেখা গেল পার্কের মধ্য দিয়া বই-বগলে ও-বাড়ির মেয়েটা কলেজে চলিয়াছে। অনুপম এক মুহূর্ত মাত্র হতভম্ব হইয়া ব্যাপারটা সত্য না কল্পনা তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করিল এবং পরক্ষণে চেয়ারটা উল্টাইয়া, চৌকাঠে হুঁচোট খাইয়া, শুধু পায়ে পড়িমরি করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল।

কবি শিহরণ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিলেন; এমন সময় উপর হইতে একটা ঝড় নামিয়া আসিল। কবিবর তিন সিঁড়ি নীচে ছিট্‌কাইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঝড়টা যথেষ্ট নীচে নামিয়া যাইবার পর এবং কবি সুলভ মৃদুকণ্ঠ সেখানে পৌঁছিবেনা এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া দাঁতের ফাঁক দিয়া কহিলেন, 'ব্রুট' এবং শঙ্কিত হইয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেলেন।

'দেখুন, শুনছেন, আপনার গিয়ে বুঝতে পারলেন,' ছুটিতে ছুটিতে অনুপম চেঁচাইতে লাগিল। তাহা প্রতিভার কর্ণ কুহরে প্রবেশ না করায় সে সটান বরাবর হাঁটিয়া যাইতে লাগিল। ফলে অনুপম আরও ছুটিতে লাগিল এবং আরও চেঁচাইতে লাগিল।

'দেখুন, শুনলেন, বুঝেছেন, এই যে, এক মিনিট দাঁড়াবেন।'

এইবার প্রতিভা পিছন হইতে একটা আহ্বান শুনিতে পাইল। চমকিয়া সে দ্রুত পা চালাইল, পিছন দিকে মাত্র তাকাইল না। রাজ্যের ছোকরাদের উপর তাহার রাগ ধরিয়া গিয়াছে; এমন ইতর ওগুলো......

'একটা সেকেণ্ড; শুনছেন, একটু দ্রুত ছুটিয়া অনুপম এইবার কাছে উপস্থিত হইল। প্রতিভা ভয়ে বিবর্ণ

হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার উদাস-হওয়া চোখ দুইটি হইতে কান্না বাহির হইবার উপক্রম। চমকাইয়া উঠিয়া দেখিল অনুপমকে: দেখিয়া মুহূর্তে সে আশ্বস্ত হইল।

'দেখুন' হাঁপাইতে হাঁপাইতে অনুপম কহিল, 'পরশুর আগের দিন আপনার কাছে একটা চিঠি লিখেছিলাম। সেটা পেয়েছিলেন তো?'

'চিঠি?' সবিস্ময়ে প্রতিভা কহিল, 'চিঠি কে দিয়েছিল? আপনি?'

বিব্রত অনুপম মাথা চুলকাইয়া কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই......

'কই, কোনও চিঠি পাই নি তো।' প্রতিভা আশ্চর্য হইয়া কহিল। 'আপনিই বা আমাকে চিঠি লিখতে গেলেন কেন?'

'একটা চাকরি পেয়েছি; সে সংবাদটা জানাবার জন্যই, মানে'.....

'চাকরি পেয়েছেন বুঝি।' প্রতিভা কহিল, 'শুনে আনন্দিত হলাম। কিন্তু সে খবর আমাকে জানিয়ে কি হবে?'

অনুপম নখ খুঁটিল। মুখ লাল করিল, তারপর দ্বিধার সঙ্গে কহিল, 'সে কথা শুনলে আপনি হয় তো আবার রাগ করে' বসবেন।'

'কি সে কথা?'

'একটা বিয়ের প্রস্তাব করা হয়েছিল।'

প্রতিভা স্তম্ভিত হইয়া ঈষৎ বিরক্ত ঈষৎ লজ্জিতভাবে মুখটা নিচু করিল। বলিল, 'বড় অসভ্য তো আপনি। লজ্জা করে না একথা এমন করে' বলতে? নমস্কার। চিঠি আমি পাই নি। আর চিঠিটিঠি যেন দেবার চেষ্টাও করবেন না। আমার বাবা জানতে পারলে বড়ই অসন্তুষ্ট হবেন। খামে-পোরা আমার কোনও চিঠি এলেই তিনি পুড়িয়ে ফেলেন।'

'পুড়িয়ে ফেলেন।' সশঙ্ক চিৎকার করিয়া অনুপম কহিল, 'বলেন কি! সর্বনাশ করলেন যে।'

প্রতিভা অবাক হইয়া কহিল, 'কি হলো আপনার? অমন চেঁচাচ্ছেন কেন?'

'চেঁচাবো না, বলেন কি?' অনুপম অধীর হইয়া কহিল। 'জানেন, কি ছিল সেই চিঠির সঙ্গে? তার সঙ্গে আমার চাকরির চিঠিটাও আঁটা ছিল। তবে সেটাও যে ছাই হয়ে গেছে।'

'অদ্ভুত লোক তো আপনি।' স্তম্ভিত হইয়া প্রতিভা কহিল, 'চিঠির সঙ্গে আবার চাকরির চিঠিটা এঁটে দেওয়া কেন? এর মানেটা আমার কি হলো?'

'আপনার যাতে বিশ্বাস হয়। একটা বিয়ের প্রস্তাবও সঙ্গে ছিল কিনা। তাই ভাবলুম, বেকার নই, এই প্রমাণটা স্পষ্ট করে' দিয়ে দেওয়াই দূরদর্শিতা।'

'বেশ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন,' প্রতিভার গলার সুর রীতিমত করুণ হইয়া উঠিয়াছে, 'এতক্ষণে সে চিঠি ছাই হয়ে গড়াগাড়ি করছে। পরশু দিনও বাবাকে চিঠি পোড়াতে দেখেছি'......

অনুপম হতাশায় হাত দুটি দিয়া মাথা চাপড়াইয়া দিল।

'কি হবে এখন বলুন তো,' উদ্বেগের সঙ্গে প্রতিভা কহিল, 'কেন এমন ছেলেমানুষি করতে গেলেন? একটা চাকরি পাওয়া কি সোজা কথা। আজ বাড়ি গিয়েই আমি তন্ন তন্ন করে সব খুঁজে দেখব। পাই যদি আপনার মেসে পাঠিয়ে দেব সামনের মেসেই আপনি থাকেন, আমি জানি। কিন্তু পাব বলে ভরসা হয় না।'

অনুপম কহিল, 'সংস্কৃত সাহিত্যে একসময়ে পড়েছিলাম। এখন সব ভুলে মেরে দিয়েছি। শুধু একটা লাইন মনে পড়ছে। 'ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র।'

প্রতিভার চোখ দুইটি ইতিমধ্যে আবার উদাস হইয়া উঠিয়াছিল। সংস্কৃত আওড়ান শুনিয়া সে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। সহানুভূতি-আর্দ্র কণ্ঠে কহিল, 'কোম্পানীর অফিসে গিয়ে সব বুঝিয়ে বললে হয় না?'

'কোম্পানী এখানে নয়। বোম্বেতে। সেখানেই চাকরি।'

'তবে তাদের কেন চিঠি লিখুন না?'

'তারই-বা উপায় কোথায়? নাম মনে নেই।'

'নামও মনে নেই!' বিস্মিত হইয়া প্রতিভা কহিল, 'কি অদ্ভুত মানুষ আপনি!'

'বাঃ রে, প্রতিবাদ করিয়া অনুপম কহিল, 'মস্ত দেড়গজী নাম যে। মনে থাকে নাকি? তবে প্রথমের অক্ষরটা ইংরেজি 'K'—এটা ঠিক মনে আছে। বেশ কি একটা গাল-ভরা নাম। আর প্রথম সিলেবেলের সঙ্গে কোন্ একটা অসভ্য জাতির নামের সামান্য সাদৃশ্য আছে।'

'অদ্ভুত লোক!'

'যাব বোম্বেতেই,' সহসা অনুপম দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে কহিল, 'খুঁজে বের করতেই হবে। যেমন করেই হোক্। এই বাজারে একটা চাকরি কিছুতেই ফস্কানো যেতে পারে না, দেড়শো টাকা—একটা চালাকি নয়!'

প্রতিভা কৌতূহলী হইয়া কহিল, 'আন্দাজে খুঁজে বের করবেন কি করে?'

'করতেই হবে।' অনুপম জোর দিয়া কহিল, 'উপায় কি! আচ্ছা নমস্কার। চাকরির সম্ভাবনাটা ক্ষীণ হয়ে উঠেছে, এ অবস্থায় আর কোন প্রস্তাব করতে চাই না। নমস্কার।' পর-মুহূর্তে অনুপম প্রস্থান করিল।

ও-বাড়ির মেয়ে প্রতিভা স্তব্ধ হইয়া কতক্ষণ সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। সহানুভূতিতে মুখটা করুণ; চোখটা সচরাচর যেমন উদাস হইয়া উঠে, এখন আর ঠিক তেমনটা নহে। বরং তাহাতে অশ্রু চক্‌চক্ করিতেছে।

ক্রমশ

পাঁচমিশেলী

—শ্রীপথিক

একটা কিছু ভুল হ'য়েছেই। জাপান তার বহু যুগের রক্ত হাতে মেখে—চীনে বলপ্রয়োগের উপক্রমণিকা যখন কোরিয়ায় তার নিষ্ঠুর অভিযান—তবুও যেখানে সে যেতে চায়, স্বাগত হয়, এমন এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায়ও সন্দিগ্ধ মনে গৃহীত হয়।

এই ভ্রান্ত ধারণাকে চলতে দিয়ে আমরা অথবা সংযুক্ত জাতিসমূহ ন্যায় বিচার করছি না। এতে যুদ্ধ জয় বাধাপ্রাপ্ত হ'চ্ছে এবং শান্তি বিষাক্ত হবার আশংকা রয়েছে।

আমরা এবং প্রত্যেকেই জানুক এশিয়ায় আমাদের যুদ্ধ-উদ্দেশ্য কি। তা এখনই জানতে হবে।

আমরা সত্যি কিসের জন্যে লড়ছি? ইউরোপের কাছে সংযুক্ত রাজ্যসমূহের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। হিটলার কর্তৃক স্বাধীন দেশসমূহ বিজিত হ'য়েছে। আমাদের জয় তাদের মাটি উদ্ধার করে দেবে, তাদের নিজেদের শাসন অধিকার ফিরিয়ে দেবে, স্বাধীন এবং শান্তি-পূর্ণ রাষ্ট্র সম্প্রদায়ে তাদের অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ দেবে।

কিন্তু এশিয়াতে জাপানকে পরাজিত করাই একমাত্র শপথ নয়। পূর্ব এশিয়ার লোকে জানতে চায় এই যুদ্ধ জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের ধ্বংস ক'রে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য কি-না। তাদের সন্দেহ তাই।

যতক্ষণ না এশিয়ার লোকে জানতে পারে যে জাপানের পরাজয় মানে তাদের স্বাধীনতা এবং পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়, ততক্ষণ জাপানী অভিযানের বিপক্ষে লড়াই সম্পর্কে তাদের অন্তরের সাড়া থাকবে না। এ দোষ যুক্তরাজ্যসমূহের। আমাদের তা সংশোধন করতেই হবে।

কিন্তু শুধু সামরিক বিজয়েই তা সম্ভব হয় না। ভারতের কথা ধরা যাক। প্রায় ১০০ বৎসর ধ'রে ইংলণ্ড সেখানে সামরিক দিক থেকে বড়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বরাবরই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন জেগে ওঠে। যুদ্ধ যেভাবেই শেষ হোক তা বেড়ে যাবেই। এশিয়াময় এই একই অবস্থা। এশিয়াবাসীর সাহায্য পেতে গেলে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমাদের জয় অর্থ তাদের মুক্তি।

আমাদের আন্তরিকতায় যেন সন্দেহ না জাগে। এশিয়ার স্বাধীনতা বিঘোষিত করায় বাধা কোথায়? স্বার্থপরতা? অহমিকা?—না, চক্ষুলজ্জা?

—"লুক্" পত্রিকায় রেমন্ত ক্ল্যাপার

* * *

গড়ে প্রতি মানুষে থাকে সাতখানা সাবান তৈরীর মত চর্বি, দুহাজার দেশলাই কাটি তৈরীর মত ফস্‌ফরাস্, একটা ফিট আটেক দেয়াল চুণকাম করার মত চুণ, দুটো ছোট পেরেকের মত লোহা, এক সের চিনি, একটা বড় ফোঁটা ম্যাগনেসিয়া, ছ' চামচ নুন, সামান্য গন্ধক এবং দশ গ্যালন জল—একুনে যার দাম মাত্র টাকা দুই।

* * *

আমাকে একবার বোকা বানাও—তোমার লজ্জার বিষয়; আমাকে দ্বিতীয়বার বোকা বানাও—আমার লজ্জার বিষয়।

—চৈনিক প্রবাদ

* * * * *

—"এ বয়! ডাক ম্যানেজারকে। আমি এ কাটলেট খেতে পারছি না!"

"আজ্ঞে, ম্যানেজারকে ডেকে কি হবে বলুন! তিনিও ত খাবেন না।

* * * *

পরিহার করতে হবে—

খুঁৎখুঁতেমি। সব সময়েই যার নালিশ থাকে সে সাধারণত তার সুযোগগুলোকে অস্তিত্বহীন ক'রে ফেলে।

অতি উচ্চ আশা। আশা খানিকটা উঁচু হলেই হ'ল।

পরিহাস লাভ করবার আশংকা।

"নিজের সংকল্প দৃঢ় নয়" এরূপ মনে করা। একথা বললেই তবে দুর্বল হয়। দুর্দান্ত লোকেই দৃঢ়মনা, এরূপ মনে করা।

অসাফল্যের আশংকা। ভয় কাজে বাধা দেয়।

অপরের বিচারের ওপর অতি নিশ্বাস স্থাপন করা। ঠিক জিনিস সংকল্প আনবে এবং তা করবে।

নিজের অসুবিধাগুলি দুরারোহ মনে করা। আশা পোষক করবে।

স্মরণশক্তি সম্পর্কে খুঁতখুঁত করা। তাতেই আরও খারাপ হয়।

নিজেকে অতি বয়স্ক মনে করা। মনের বয়স শিক্ষা এবং শৃঙ্খলার বিষয়।

ভাসাভাসা ধারণা পোষণ করা। যে কোন বিষয়ই হোক গভীর অন্তস্তলে প্রবেশ ক'রবে।

সংকল্পকে চূর্ণ হতে দেওয়ার প্রবৃত্তি।

যেমন কর্ম তেমন ফল, এই প্রবাদটি।

দুঃখ কষ্ট থেকে পালাবার চেষ্টা; বস্তুত তা থেকে পালানো সম্ভব নয়। তারা ঠিক পায়ে পায়ে অনুসরণ করে।

নিজের অবস্থা আর সবায়ের চেয়ে খারাপ ধারণা করা। তোমার চেয়েও দুঃখী থাকবেই।

কুসংস্কার; অন্ধ বিশ্বাসেও কোন কাজ ক'রবে না।

অতীতের দুশ্চিন্তা। যা হয়ে গেছে তাকে না করা যায় না। তবে তার দুষ্টপ্রভাব থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

—"পেলম্যানিজম"

* * * *

এক চীনা মারাত্মক অসুস্থ হয় এবং আসন্ন মৃত্যু থেকে অপ্রত্যাশিতরূপে আরোগ্য লাভ ক'রায় এইভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে:

"—আমার অসুখ করে। আমি তখন ডাঃ ইয়ান-সেনকে ডাকি। তার ওষুধ খাই কিন্তু অসুখ তাতে আরো বেড়ে যায়। তারপর ডাকি ডাঃ হ্যাং-কোর-কে। তাঁর ওষুধেও কোন উন্নতি হ'ল না। শেষ সময় অতি দ্রুত ঘনিয়ে আসছে দেখে সবচেয়ে বড় ডাক্তার হং-শি-উকে ডাকি। সেদিন তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় আমায় দেখে যেতে পারলেন না। তার পরদিনও নয়। তারও পরদিন নয়। ইতিমধ্যে আমি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করি। সত্যিই ডাঃ হং-শি-উ খুব বড় ডাক্তার।

—"দি লিভিং এজ"

* * * *

প্রাচীন ভারতের গ্রাম্য ও নাগরিক মাননীয় ব্যক্তিদের অফিসের

শীলমোহর এবং জাভা, সুমাত্রা ও অন্যান্য দেশের সংগে সংযোগের বহু নিদর্শন সম্প্রতি নালন্দা থেকে পাওয়া গিয়েছে। ১১০০ বৎসর পূর্বে ভারতে জনশাসন কতটা উন্নতি লাভ করেছিল তার বহু মৃণ্ময় নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। একটি খোদিত প্রস্তরে উত্তরভূমির এক প্রধান শাস্ত্রীর বিবরণ পাওয়া যায় (যার 'টিকিন' উপাধি থেকে মনে হয় সে তাতার বংশোদ্ভূত) যে নালন্দায় তীর্থ করতে এসেছিল। এগারো শতাব্দী পূর্বের এক বিবরণে জানা যায় যে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের এক শাসকের রাজ্যের মধ্যে সুমাত্রা ও জাভা অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তিনি পাল রাজা দেবপালকে তদ্‌কর্তৃক নালন্দার নির্মিত মঠটি চালাবার জন্য অনুরোধ করেছেন।"

* * * *

কেরাণী—"আসছে সোমবার স্যার, আমার ছুটি চাই।"

সাহেব—"কেন?"

কেরাণী—"আজ্ঞে সেদিন আমার বিয়ের রজত-জয়ন্তী।"

সাহেব—"তার মানে! প্রত্যেক পঁচিশ বছরে তোমাকে এই বাড়তি ছুটিটা দিতে হবে নাকি?"

* * * *

পৃথিবীতে একেবারে দোষমুক্ত কেউ নেই এই যা ভাল, নয়তো তার আর কোন বন্ধু জুট্‌তো না।

* * * * *

দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও স্বাদ—এতদিন এই পাঁচ অনুভূতির কথাই জানা ছিল; বিজ্ঞান এখন এদের সংগে আরো ছটি অনুভূতি যোগ ক'রে দিয়েছে। সেগুলি হ'চ্ছে :

তাপজ্ঞান : দেহে তাপপ্রবণ ৩০,০০০ ছিদ্র আছে এবং শৈত্য-প্রবণ ছিদ্র আছে ২,৫০,০০০। গালে হাত দিন, দেখবেন ঠাণ্ডা; কানে হাত দিন দেখবেন গরম। তার কারণ আপনার হাতের স্বাভাবিক তাপ কান ও গালের মাঝামাঝি।

সমতাজ্ঞান : কানের অর্ধবৃত্তাকার নালী এই অনুভূতির ইন্দ্রিয়; চলতে গিয়ে যে লোকে বেটাল হয় না তা এরই কার্যকারিতায়।

ক্ষুধা : পাকস্থলীর চতুঃপার্শ্বস্থ পেশীর সংকুচনে এই অনুভূতি জাগে।

পেশী জ্ঞান : মেঝে থেকে একটা কিছু তুলুন, দেখবেন তার ওজন আপনি আন্দাজ করতে পারছেন; পেশী দ্বারা মস্তিষ্কে এই অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। কোন কিছুর দিকে চেয়ে তার দূরত্ব নির্ণয় করার যে ক্ষমতা তা আসে অক্ষিগোলক সংযুক্ত দৃষ্টিনিয়ন্ত্রণ পেশী-সমূহের মৃদু সংকুচন পরিবর্তনে। জোরে যখন কথা বলা হয় তখন কণ্ঠনালীর পেশী কি পরিমাণ সংকুচিত হ'লে ঠিক স্বরটা বের হবে তা নির্ণয় করে দেয়।

বেদনা : এটি হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাপক অনুভূতি। কোন রকমের অতি চাপ পড়লেই বেদনা জাগে। ঠিক কোথায় বেদনা হ'চ্ছে অনেক সময় বলা শক্ত হয়। বেদনা অনুভূতি যতই কষ্টদায়ক হোক তাকে অভিশাপ বলে যেন কেউ গ্রহণ না করে। এটাকে বরং আশীর্বাদই বলা যেতে পারে, কারণ এই বিপদ-সংকেত জানিয়ে দিচ্ছে যে দেহের কোথাও একটা কিছু গোলমাল হয়েছে।

তৃষা : পূর্ণ না হ'লে এ অনুভূতি সবচেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে।

—ইওর লাইফ

* * * *

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন: নানকের যে দুজন সাথী ছিলেন তাঁদের একজন হিন্দু, একজন মুসলমান।। শিখ ধর্মকে তিনি সর্বজনীন রূপ দিয়েছিলেন অমৃতসরের বিখ্যাত স্বর্ণ-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেন একজন মুসলমান পীর। ঠিক হয় তার দরজা মক্কার দিকে থাকবে। কিন্তু হিন্দুরা তাতে আপত্তি করে। গুরুজী তখন ঠিক করেন মন্দিরের চারদিকেই দরজা থাকবে; তিনি তাদের বুঝিয়ে বলেন যে, ভগবান সর্বত্র বিরাজ করেন এবং সব পথেই তাঁর কাছে যাওয়া যায়।

কিছু বছর আগে পাঞ্জাব হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে গুরু নানকের জীবনী আলোচনার জন্য এক বৈঠক বসে। তখনকার খৃশ্চান পাঞ্জাব গভর্নর তাতে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন হিন্দু স্যার যোগেন্দর সিং, বর্তমানে ভাইসরয়ের মন্ত্রণা সভার সভ্য। পরবর্তী বক্তা ছিলেন লালা রামশরণ দাস, শাসন পরিষদে বিপক্ষ দলের দলপতি। তিনি বলেন : "স্যার যোগীন্দের আলোচনা শুনলুম, কিন্তু গুরু নানক একজন হিন্দু সংস্কারক ছাড়া কিছু ছিলেন না; আমাদেরই একজন ছিলেন তিনি।"

তাঁর পরে একজন মুসলমান স্যার খালিফ কার্লআসান বক্তৃতা দিয়ে বলেন যে নানক ছিলেন মুসলমান এবং তিনি হজ তীর্থ দর্শনে গিয়েছিলেন।

গভর্নর তারপর বক্তৃতাবলীর মর্ম ব্যাখ্যা ক'রে এই ব'লে আলোচনা সম্পূর্ণ করেন : "স্যার যোগীন্দর যা ব'লেছেন আমি মন দিয়ে তা শুনলুম এবং গুরু নানকের ধর্মতত্ত্ব থেকে আমার মনে হয় তিনি খৃশ্চান ছিলেন।

* * * *

ব্যাপক পরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে প্রাচীন যুগে দন্তশূল রোগে লোকে খুবই ভুগ্‌তো। আজ তাদেরই বংশধররা সেই একই রোগে ভোগে। এ থেকে বুঝা যায় যে, আধুনিক খাওয়ার ওপরে দাঁত খারাপ হওয়ার যে দোষ চাপানো হয় তা ঠিক নয়।

দাঁতের রোগ আগে ছিল আজও আছে। তবে একথা বলা যায় যে সভ্যতা প্রসারিত হওয়ার সংগে এ রোগটিও আগের চেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে প্রাচীন প্রস্তরযুগে, অর্থাৎ প্রায় লক্ষ বৎসর পূর্বে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শতকরা ৫ থেকে ২০ জনের এই রোগ ছিল। নব প্রস্তরযুগে অর্থাৎ ২০,০০০ বৎসর পূর্বে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে দন্তক্ষয়ের মাত্রা ছিল শতকরা ১৫ থেকে ৪৫। পরবর্তীকালে দন্তক্ষয় রোগ বৃদ্ধি লাভ করে। তারপর আসে ৬০০০ থেকে ৭০০০ বৎসর আগের কথা। খৃঃ পূর্ব ৩৫০০ সালে ইরানিয়ানদের শতকরা ৭৫ থেকে ৯০ জনের দন্তক্ষয় ছিল। অর্থাৎ প্রায় সমগ্র জনসংখ্যারই এই রোগ ছিল। এটা প্রায় আধুনিক কোন সভ্য সম্প্রদায়ের সমান।

—নিউ ইয়র্ক এমেরিকান

* * * *

পাছে শত্রু হয় এই ভয় যার সে কোনদিন আসল বন্ধু জোটাতে পারবে না।

চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন

শ্রীমতী বীণাপানি চক্রবর্তী

হাসপাতাল থেকে স্টেশন দূরে নয়, কাছেই।

রেলগাড়ী আসবার কিছু আগে যখন ঘণ্টা পড়ে, তখন আমি খাট থেকে নেমে জানালার পাশে এসে দাঁড়াই।

প্ল্যাটফর্মের উত্তরে রেললাইন বেঁকে বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সেদিক থেকে রেলগাড়ি যখন আসে, এক সঙ্গে সবটা দেখা যায় না।

রেল লাইনকে তলায় রেখে বনের মাথায় দেখা দেয় একরাশ কালো ধোঁয়া, তার পরে ইঞ্জিন, তার এক পাশের বড় বড় চাকা, পেছনে দুটো কি একটা মালগাড়ী, তার পরে বাকী সব একে একে দেখা দেয়।

প্লাটফরমে যখন সে ঢুকে পড়ে, তখন আর দেখতে কিছু বাকী থাকে না। থাকবেই বা কি করে?

প্ল্যাটফরমের পেছনে একটা ছোট বিল, তার ধারে কয়েকটা তাল আর নারকেল গাছ, তারপরেই আমাদের হাসপাতালের কম্পাউণ্ড ওয়াল আরম্ভ।

আমার ঘরটা তিনতলায় হওয়ায় আমার সুবিধে হয়েছে বেশী।

রেলগাড়ীর দরজা যায় খুলে, লোকজন নামতে শুরু করে, কেউ বা রেলগাড়ি থামতে না থামতেই হাতল ধরে উঠে পড়তে চেষ্টা করে, পাছে রেলগাড়ি ছেড়ে দেয়, আর সে প্ল্যাটফরমে পড়ে থাকে।

এই ভয়টা আমারও একদিন ছিল খুব বেশী। তাই ঐ ধরণের যাত্রীদের মনের অবস্থা আমি বেশ বুঝতে পারি।

পেছনের গাড়িতে গার্ড সাহেব সবুজ নিশান দেখায়।

ইঞ্জিন বাঁশী বাজিয়ে তার উত্তর দেয়।

তারপরে ইঞ্জিনের পাশের বড় চাকাগুলো ঘুরতে থাকে।

প্ল্যাটফর্ম খালি হয়ে যায় অল্পক্ষণের মধ্যেই।

কিন্তু সব গাড়িগুলো আমি এমন করে লক্ষ্য করি না, যেমন করি ৩-৫৩ আপ্ আর ৬-৫৫ ডাউন ট্রেন দুটিকে।

আমি জানি, আমার ভাই ইঞ্জিনের ঠিক পরের গাড়িতেই আসবে। আজ পর্যন্ত খুব কম দিনই তার এ বিষয়ে ভুল হয়েছে।

তাই তাকে খুজে নিতে আমার বেশী দেরী হয় না।

কিন্তু প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে বিলের ধার দিয়ে নারকেল আর তাল গাছের তলা দিয়ে আসার সময় হঠাৎ সে অল্পক্ষণের জন্য হারিয়ে যায়।

প্রথম দিন আমি ভেবেছিলুম, কোথাও চলে গেল বুঝি। তারপরেই দেখি, কই, নাতো? ওই তো আসছে।

আমি যেন কিছুই জানি না, চাদরঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ি।

পাশের ঘর থেকে কাশির শব্দ আসে।

ও ঘরে যে থাকে, তার নাম জানলেও সব সময়ে সেটি ব্যবহার করতে পারি না।

সামনের বারান্দা দিয়ে নার্স যায়। বলি, শোনো একবার......

সে ঘরের মধ্যে ঢোকে।

বলি, ৪৩ কেমন আছে? কাশিটা বড় বেড়েছে, না?

"হাঁ"ও বলা চলে, "না"ও বলা চলে, এই ধরণের একটা সায় দিয়ে সে চলে যায়।

নার্সরাও চালাক কম নয়। একজনের অসুখ বাড়লে অন্য পেসেন্টদের কাছ থেকে তা গোপন রাখতে চায়। মনে করে, আমরা বুঝি ভয় পাবো। ভয়? আফ্রিকার জঙ্গলে হলদে কেশর-ওলা সিংহ আছে, মহাসাগরে বিরাট তিমি হাঙ্গর আছে, আরব মরুভূমিতে হিংস্র বেদুইন আছে,—এই সব বিষয়ে আমার যেমন সাধারণ জ্ঞান, তেমনি সাধারণভাবেই জানতাম, পৃথিবীতে এই সাংঘাতিক রোগের অস্তিত্বের কথা। কিন্তু সেদিন মনে ভাবিনি, এই কাল রোগের সঙ্গে কোনদিন বিশেষ করে আমাকেই মুখোমুখি হতে হবে। ভয় তো হয়েছিল, যেদিন শুনতে পেলাম, আমারই বুকে এই রোগের বীজাণু বাসা বেঁধেছে। সেদিন সমস্ত বাড়িতে একটি বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল এবং আমার মনে একটা গভীর আতঙ্ক জেগে উঠেছিল। কিন্তু এখন, ?......না,......

বারান্দায় পায়ের শব্দ হয়। চেনা শব্দ।

অনিল এসে ঘরে ঢোকে। বলে, কিরে, ঘুমোচ্ছিস নাকি?

আমি চমকে উঠে পড়ি।—ওমা, তুই? কখন এলি?......আয় বোস্। দাঁড়া একটা চেয়ার আনিয়ে দিই।

জোরে ঘণ্টা বাজাই।

ঝি আসে।

বলি, একটা চেয়ার নিয়ে এসো তো, আমার চেয়ারটা আবার কে নিয়ে গেছে। হাঁরে অনিল, তুই কদ্দিন পরে এলি বলতো?

আমার ভাইয়ের বিস্ময় চোখে মুখে ফেটে পড়ে। বলে, কদ্দিন পরে এলাম?বেশ বলেছিস তো? কালই তো এসেছিলাম।

ভুল ধরা পড়ে। বলি, ঠিক বলেছিস, আমারই মনে ছিল না।

ভাই কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করে, শুয়ে ছিলি কেন? শরীর কি ভাল নেই?

আমি মুখ বিষন্ন করে বলি, হাঁরে, কাল রাত্তির থেকে জ্বর হচ্ছে।

অনিলের মুখ শুকিয়ে যায়।

আমি জোরে হেসে উঠি। বলি, নারে, সব বাজে কথা। কিছু হয়নি আমার।

অনিল অনেকটা সান্ত্বনা পায়। বলে, এই, অত জোরে হাসিস্ নি।

আমি মনে মনে হাসি। টি বি আমাদের বারোমাস তিরিশ দিনের রোগ। তার মধ্যেও ভাল থাকা আছে, মন্দ থাকা আছে,...... আছে আরও কত কি... আজ একটু জ্বর হওয়া, কাল মাথা ধরা, পরশু দিন হয়ত অন্য একটা কিছু...পৃথিবীর সাধারণ সুস্থ লোকের মত আমরাও এগুলোকে বড় করে ধরি, টি বি কথাটা সব সময়ে মনেও থাকে না।

ঝি চেয়ার নিয়ে আসে।

বলি, বোস, তোর সঙ্গে আজ অনেক কথা আছে।

অনিল চেয়ারটা টেনে নিয়ে আমার মুখের কাছে এসে বসতে যায়, কিন্তু আমার কৃত্রিম ধমকে সে সেই মুহূর্তেই পিছিয়ে যায়,... সরে বোস্, বোকা কোথাকার, এত কাছে আসছিস কেন? জানিস না, আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসে কি আছে?

আমি যখন ওর বোন, তখন আমার মধ্যে কি এমন থাকতে পারে যে, ওর সঙ্গে জীবন নিয়ে শত্রুতা করবে,...এই কথাটা ও আজ পর্যন্ত বোধ হয় বুঝেই উঠতে পারল না।

...তুই বাপু আর কাল থেকে আসিস্ নি, এবার—অনেকদিন দেরী করে আসবি...একে হাসপাতাল, তাও সাধারণ রোগের নয়, রোগ ত রোগ, একেবারে......হাতে ওটা কিরে?

ভাই হাত বাড়িয়ে বলে, এটা? কি বল্ ত? তুই-ই বল্।

কাগজে মোড়া একটা জিনিস। কি হতে পারে, মনে মনে ভাবি। তারপর বলি, যা আছে তাই।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে বমির শব্দ এলো। দত্ত বমি করছে। বমির সঙ্গে কে কি জানি।

খাট থেকে নেমে তাকে দেখতে যাই। বলি, তুই একটু বোস্, আমি এক্ষুণি আসছি।

...বেরিয়ে...দত্তর খাটের পাশে গামলাটা জল, ফিনাইল আর রক্তে প্রায় ভরে এসেছে। তার মধ্যে রক্তের ভাগ কতখানি তা নির্ণয় করতে না পারলেও বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে। তাড়াতাড়ি ঘরে চলে আসি। ঘরে আমার ভাই আছে, একটু ভরসা পাই বই কি!

অনিল ততক্ষণে কাগজের মোড়াটা খুলে ফেলেছে। কাগজের বাক্সে এক শিশি ওষুধ। বাক্সটার অর্ধেক রঙ সাদা, আর বাকী অর্ধেকটার রঙ লাল......লাল টক্ টক্ করছে।

অনিল এক হাত উঁচু করে মোড়কটা আমার চোখের সামনে তুলে ধরে। অল্প হেসে বলে, ব্লাড-ভিটা, তোর জন্যে কিনে আনলুম। ডাক্তার সরকার প্রেস্‌ক্রিপসন দিয়েছিলেন, মনে নেই?

—ও ওষুধ কি জন্যে রে?

শরীরে রক্ত হবে, বুঝলি না? ওষুধটার নামই যে ব্লাড-ভিটা, ব্লাড মানে রক্ত......

ক্রমে ওয়ার্নিং বেল পড়ে।

অনিলের উঠি উঠি করে ওঠা হয় না।

বলি, ওরে উঠে পড়, এক্ষুণি নার্স এসে তাড়া দেবে।...

ভিজিটার্স রেজেস্ট্রীতে নাম সই করতে ভুলিস্‌নি যেন।

অনিল প্রায় সিঁড়ির কাছে গেছে, এমন সময়ে আবার ডাকি, বলি, কাল আসতে পারবি? কাল কলেজ খুলবে, না? আচ্ছা, ছুটি হলে আসিস্।...তাড়াতাড়ি যা, দেখছিস্, মেঘ করেছে কি রকম?...ইয়ে, শোন, এবার যেদিন আসবি, সেদিন এক পয়সার চানাচুর নিয়ে আসিস্ তো, বুঝলি?

ঘরে ফিরে আসি।

ঢং করে হাসপাতালের ঘণ্টা পড়ে।

সমস্ত হাসপাতাল চুপচাপ।

স্টেশনে এই সময়ে সমস্ত চুপচাপ ভেঙে যায়।

৬-৫৫এর ডাউন ট্রেন এসেছে।

হাসপাতালের নিয়ম অগ্রাহ্য করে অসময়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়াই।

ডাউন ট্রেনে আমার ভাই একেবারে শেষের গাড়িতে ওঠে। আজ পর্যন্ত এ নিয়ে ভুল তার খুব কমই হয়েছে।

গার্ডসাহেব সবুজ নিশান উড়িয়ে দেন।

ইঞ্জিন তার উত্তরে বাঁশী দেয়।

তার হাঁকডাক শুরু হয়।

তারপর তার পাশের বড় বড় চাকাগুলো ঘুরতে থাকে।

ক্রমে প্রায় সব গাড়িগুলিই বাঁকা রেলপথে বনের আড়ালে চলে যেতে থাকে।

কিন্তু তখনও শেষ গাড়িটা দেখা যায়।

আমার ভাই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

কি বিশ্রী সাহস!

রোজ বলি, ওরকম করে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকিস্ নি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে।

ওকে বলার কোন মানে হয় না, বললে আরও বাড়ায়। ......

ডাক্তার সরকার আসেন। বলেন, এই যে, আপনি ত বেশ তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাচ্ছেন।

জানি, ওটা মুখের বাঁধা বুলি। তবু ঐ কথায় কেমন যেন একটা ভরসা পাই। পাশের ঘরে দত্তকে যে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে, সে কথা মুহূর্তের জন্যে ভুলে যাই।

বৃষ্টি নামে।

জলের ছাট ঘরের দরজা অব্দি আসে।

গাড়ি থেকে নেমে প্রায় মাইল খানেক হাঁটার পথ। কে জানে, অনিল এতক্ষণে বাড়ি পেঁছেচে কি না, হয়ত রাস্তায় ভিজতে ভিজতে চলেছে।

ওকে রোজ রোজ আসতে বলব না। এই হাসপাতালে রোজ আসা, ওই অল্পবয়সে, ভালও ত নয়। আমার জন্যে যদি ওকে আবার এই রোগে ধরে......

কিন্তু......

বড় একা একা মনে হয়...

আকাশ অন্ধকার করে এসেছে...

এত অন্ধকার যে পুকুরের ওপারে হাসপাতালের অফিস পর্যন্ত দেখা যায় না।

আমার ঘরের কোণে ছোট টেবিলটার ওপরে ছোট ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে চলেছে।

ওর রকম সকম আমার ভাল বোধ হয় না।

রাত্তির বেলা ওর প্রাণশক্তি যেন বেড়ে যায়। ওর সমস্ত কল-কব্জা যেন একসঙ্গে এক মুহূর্তে চাঙ্গা হয়ে ওঠে ঠিক এই সময়ে। দুটো কাঁটায় আর সংখ্যাগুলোয় কি যেন এক রকম রঙ মাখানো। অন্ধকারে এত বিশ্রী জ্বলতে থাকে।...

সুইচ্ টিপতে ইচ্ছে হলেও টিপতে পারি না। আমার সামান্য কর্মশক্তি রাতের অন্ধকারে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়।

অন্ধকার ঘরে গা ছম্ ছম্ করতে থাকে।

মুখের ওপর দিয়ে কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা বাতাস আস্তে আস্তে চলে যায়।

অন্ধকারে ছোট টেবিলের ঠিক ওপরে সাদা দেওয়ালে কার একখানি মুখ যেন ভেসে ওঠে।

বলি, তুমি কে?

বলে, আমাকে চেনো না?

মুখটা যেন কি রকম...দেখলে ভয় হয়।

বলি, কই, না তো, কখনো তো তোমায় দেখিনি।

বলে, তা দেখবে কি করে, তুমি তো তখন আসো নি। আমি এ ঘর ছেড়ে দেবার পরই তো তুমি এলে।

আশ্চর্য হই। বলি, তুমি বুঝি আমার আগে এই ঘরে ছিলে? তা...... এখন কোথায় আছ?

—এখন? সে হাসে, হাসিটা যেন কি রকম।

বলি, তুমি ওরকম করে হাসছ কেন?

সে উত্তর দেয় না, আস্তে আস্তে চলে যায়।

আসে আর একজন।

বলে, আজ থেকে প্রায় নয় মাস আগে আমি এই খাটে শুয়েছিলাম, তুমি এখন যে খাটে শুয়ে আছো।

বলি, তাই নাকি?

বলে, হ্যাঁ।...সেদিনও আজকের মত বৃষ্টি পড়ছিল, আমার স্বামী আমাকে দেখতে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন।

বলি, কেন?

সে অল্প হেসে বলে, কেন? সে কথা থাক।......তারপর কি হোল, শোনো বলি,...আমার স্বামী ফিরে গেলেন, কারণ তিনি খুব দুর্বল ছিলেন, তারপর এতবড় একটা আঘাত তিনি সহ্য করতে পারলেন না।...

তাকে বাধা দিয়ে আমি বলি, কিসের আঘাত?

কিন্তু এবারেও সে অল্প হেসে আমাকেই বাধা দিয়ে বললে, থা থাক্‌। তারপর কি হোল, শোনো বলি...আমার স্বামী ফিরে ন, কিন্তু আমার ভাই—ঠিক তোমার ভাইয়ের মত আমারও একটি ছিল—সে শেষ পর্যন্ত ছিল......

আমি কঠোর হতে চেষ্টা করলাম। বললাম, আমার একটা নর উত্তর না দিলে আমি কিছুতেই আর তোমার কথা শুনব না। ার প্রশ্ন হচ্ছে এই, আমার যে ভাই আছে, তাকে তুমি জানলে কি ? তাকে তুমি কখনও দেখেচ বলে ত বোধ হয় না?

সে বললে, কেন, আজই ত দেখলাম, ওই চেয়ারে তোমার ভাই ছিল, হাতে কি একটা কাগজের মোড়ক ছিল...

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, সেকি? তুমি ত তখন এই ঘরে ঘরের আশেপাশে কোথাও ছিলে না, আমরা কেউ তো তোমায় ন দেখতে পাইনি তবে তুমি কেমন করে তাকে দেখলে?

এবার সে আর কোন উত্তর দিল না। অল্প হেসে অভদ্রের মত গেল। হাসিটা আমার মোটেই ভাল লাগল না।

এলো অন্যজন।

বললে, তুমি যে টেবিলে খাবার রেখে খাও, সেই টেবিলে মিও একদিন খেয়েছিলাম।

চিনি না, জানি না, এরূপ একজনকে আর কিছুতেই প্রশ্রয় ওয়া হবে না। মনে মনে এই ঠিক করে বললাম, সে কথা আমাকে লার দরকার?

সে অপ্রস্তুত হয়ে হাসে। বলে, দরকার? কিছু না।

কিছুক্ষণ চুপ করে বলে, খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল,— মারই ভাইয়ের দেওয়া এক পয়সার চানাচুর—এমন সময় হঠাৎ ষণ কাশি এলো। কাশতে কাশতে উঠল রক্ত, সে রক্ত দেখে আমি মকে উঠলাম, অনেকদিন এ রকম রক্ত ওঠে নি...একটু রকার এলেন, বললেন ভয় করবেন না, ও কিছু নে হলে হাসি পায়। তারপর আজ বিকে তোমাকেও যখন ওই ধরণের কি একটা কথা ব আর একটু হলে তোমাদেরই মাঝখানে হেসে

সে আবার হেসে উঠল।

বললাম, তুমি ওরকম করে হেসে

কিন্তু সে আর কোন কথা বলে যেন চলে গেল।

...আমার মুখের ওপর দিয়ে বাতাস আস্তে আস্তে বয়ে গেল।

আমার প্রাণশক্তি যেন ধীরে ধ মুক্তি পেয়ে আমার মধ্যে ফিরে এলো

সমস্ত দুঃস্বপ্নকে ঝাড়া দিয়ে পেলাম।

কিন্তু তখনও বুকের মধ্যে ধ ঘাম ঝরছে, হাত-পা ঠক্ ঠক্ করে ক

...পাশের ঘরে কি যেন একটা না, অথবা যা সন্দেহ করছি, তা ঠিক

কেমন যেন একটা চাপা ব্যস্তত

৪৩ পেসেন্ট?

ডাক্তার সরকার?

নার্স?

লালু জমাদার?

চুপি চুপি অন্ধকারে, ছোট টে

লুকিয়ে সমস্ত হাসপাতালের পেসেন্টদের অজ্ঞাতে ওরা কি করতে চায়, ৪৩ পেসেন্টকে নিয়ে?

এমন বীভৎস ঘটেছে কি কিছু, দিনের আলোয় যা আমরা সহ্য করতে পারবো না?

উঠে গিয়ে একবার দেখব কি?

না, থাক্‌।

ডাক্তার সরকার তাতে ব্যথা পাবেন।

তিনি আমাদের অজ্ঞাতে যা করতে চেষ্টা করছেন, একমাত্র আমার দ্বারা তাঁর সে চেষ্টা যদি নিষ্ফল হয়ে যায়......

তিনি আমাদের প্রাণের আশা দেন।

তাঁর সে আশ্বাসবাণীর মিথ্যাটুকু দিনের আলোর মত আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলেও আমরা যে তা জেনেছি, উনি যেন তা না জানতে পারেন। আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে যদি তিনি কিছু তৃপ্তিলাভ করেন, তবে তা থেকে তাঁকে অকারণে বঞ্চিত করে লাভ কি?

ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙ্‌লো, ৪৫ এসে 'সুপ্রভাত' বলে আমাকে নমস্কার জানালো। আশ্চর্য, রাতের স্বপ্নের কথা তখন ভুলে গিয়েছিলাম।

গত রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের আগেই চান করে ভাত খেয়ে নিলাম। ঘুম যখন ভাঙ্‌লো, বেলা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

এর মধ্যে কখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে, টের পাইনি।

সুটকেশ খুলে চিঠির কাগজ আর কলম নিয়ে টেবিলে বসি অনিলকে চিঠি লিখতে হবে।

কি লিখব, ভাবি।

দু'বছরের বড়...ছুটি হলেই এসো...তোমাকে এক পয়সার চানাচুর আনতে বলেছিলাম, সেটা আর এনো না। ওটা খেলে মাঝে মাঝে বড় বুক জ্বালা করে কি না, তাই আনতে নিষেধ করলাম...তুমি বরং এক পয়সার ছোলার পাটালী এনো, ওটা অনেকদিন খাইনি...

সারাদিন বৃষ্টি আর থামতে চায় না।

সন্ধ্যার আগেই অন্ধকার নেমে আসে।

অন্ধকারে আর কাজ করা চলে না। তাই যে মিস্ত্রীরা ৪৩ ঘরের কলি ফিরাতে এসেছিল, একটু আগে তারা চলে গেল।

মাত্র দিনকয়েক আগে ৪৩র সঙ্গে কি সব কথা বলেছিলাম, একটু একটু মনে আসে......

এই তো সেদিন আমার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলল...

কি কথা যেন?

না, এখন ঠিক মনে আসছে না...

যে কাগজগুলোয় চিঠি লিখবো ভেবেছিলাম, সেগুলো বাতাসে কখন উড়ে গিয়ে ঘর আর বারান্দায় ছড়িয়ে পড়েছে...

অন্ধকারে বৃষ্টি আরও জোরে পড়তে থাকে

ঢং করে হাসপাতালের ঘণ্টা পড়ে।

সমস্ত হাসপাতাল চুপ-চাপ।

কিন্তু সেই সময় স্টেশনের সমস্ত চুপ-চাপ কিছুক্ষণের জন্য ভেঙে যায়।

অন্ধকারে ভিজতে ভিজতে ৬-৫৫এর ডাউন ট্রেনখানা এসে প্ল্যাটফরমের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

অন্যদিন এ সময়ে কিছু আলো থাকে; কিন্তু আজ অন্ধকারে বিশেষ করে কিছু দেখতে পাই না।

বাঁশী বাজিয়ে কালো ধোঁয়ায় আকাশ আরও কালো করে দিয়ে বাঁকা রেলপথ ধরে রেলগাড়ি বনের মধ্যে মিশে যায়।

অন্ধকারে মাঠের মাঝখানে রেল-লাইন আর তার কালো পাথরের খোয়াগুলি ভিজতে থাকে।

সলোমন দ্বীপপুঞ্জ

বসুবন্ধু শর্মা

আমেরিকা এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধঘোষণা করার পর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষ এ পর্যন্ত আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামই চালিয়ে আসছেন। জাপানের আক্রমণাত্মক রণনীতির কাছে মিত্রপক্ষকে ক্রমাগত পিছু হটতেই হয়েছে। ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউগিনির অধিকাংশ ছাড়া, মিত্রপক্ষের হাতে আজ আর কোনও সুবিধাজনক ঘাঁটি নেই বললেও চলে। মিত্রপক্ষ ক্রমাগত পিছু হটতে থাকলেও তাঁরা ক্রমাগত ঘোষণা করে আসছেন যে, সুযোগ উপস্থিত হলেই তাঁরা আক্রমণাত্মক রণনীতি অবলম্বন করবেন এবং অধিকৃত দ্বীপাবলী থেকে জাপানকে বিতাড়িত করবেন। এতদিন পর্যন্ত এ ঘোষণা কার্যে পরিণত করা মিত্রপক্ষের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের আক্রমণাত্মক রণনীতি অবলম্বনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জাপান অধিকৃত সলোমন দ্বীপপুঞ্জের উপর তাঁদের প্রথম আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়েছেন এবং অনেকটা সাফল্যলাভও করেছেন। যদিও একে কোন মতেই চূড়ান্ত জয় বলে অভিহিত করা যায় না, তবু এ বিজয়ের গুরুত্ব কম নয়। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপ জাপানের হস্তচ্যুত হওয়ায়, জাপানের যেমন অসুবিধা হয়েছে, তেমনই প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানকে আঘাত করার পক্ষে মিত্রপক্ষের অনেক সুবিধা হয়েছে। হস্তচ্যুত সলোমন দ্বীপপুঞ্জ পুনরধিকারের জন্য জাপান প্রাণপণ চেষ্টা করছে। জাপানের যুদ্ধঘোষণার পরে প্রায় দশ মাস অতীত হ'ল; এই সামান্য সময়ের মধ্যে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ দুইবার হাত বদলাল। এই সলোমন দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধ থেকেই হয়ত প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের গতিও ঘুরে যেতে পারে। বর্তমানে এই সলোমন দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধেই কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করব।

প্রশান্ত মহাসাগরে নিউগিনি দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বদিকে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। স্যামোয়া, হনলুলু প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য দ্বীপের মত সলোমন দ্বীপপুঞ্জ কোনদিনই তত প্রসিদ্ধ ছিল না। বর্তমান যুদ্ধের ফলেই সলোমন হঠাৎ প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েছে। সলোমন দ্বীপপুঞ্জ প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে। এর আবিষ্কর্তা ছিলেন একজন স্পেনীয় নৌ-সেনাপতি; তাঁর নাম মেণ্ডোজা (Mendoza)। তিনি এই দ্বীপপুঞ্জে প্রায় বছরখানেক ছিলেন এবং স্পেনীয় ভাষায় কয়েকটি দ্বীপের নামকরণ করেছিলেন। গুয়াডাল ক্যানাল, স্যাণ্টা ইসাবেল, স্যান ক্রিস্টোভা প্রভৃতি নাম আজও মেণ্ডোজার স্মৃতি বহন করে বেঁচে আছে। এই দ্বীপপুঞ্জের সলোমন নামকরণও করেছিলেন তিনি। এই নামকরণের একটু ইতিহাস আছে। বাইবেলে আছে যে, ওফির নামে একটি দেশ ছিল—প্রখ্যাত রাজা সলোমন সেখান থেকে অজস্র স্বর্ণ আমদানী করতেন তাঁর রাজ্যে। মেণ্ডোজা সলোমন দ্বীপপুঞ্জে এসে দেখেছিলেন যে, সেখানকার লোকেরা—বিশেষ করে গুয়াডাল ক্যানালের অধিবাসীরা প্রচুর সোনার অলঙ্কার পরে। তার থেকে তাঁর ধারণা জন্মেছিল যে, এইটাই নিশ্চয় বাইবেল-প্রসিদ্ধ ওফির দেশ। তাই তিনি রাজা সলোমনের নামে এই দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ করেছিলেন সলোমন দ্বীপপুঞ্জ।

সলোমনবাসী

মেণ্ডোজার অভিযানের পর দু'শ বছরের মধ্যে আর কোন ইউরোপীয় নাবিক সোলমন দ্বীপপুঞ্জে যান নি। সোলমন দ্বীপপুঞ্জ আবার পূর্বের মতই অজ্ঞাত দেশে পরিণত হ'য়েছিল; তবে সভ্যজাতির ইতিহাস থেকে সোলমন দ্বীপপুঞ্জের নাম একেবারে নিঃশেষে মুছে যায় নি। ইউরোপীয় নাবিকদের মনে তার স্মৃতি জাগরূক ছিল। বিস্তৃত প্রশান্ত

মহাসাগরের বুকে কোথাও না কোথাও তার অস্তিত্ব যে আছে এ নিশ্চয়তা লোকের মনে বরাবরই ছিল এবং এই সূত্র ধরেই ১৭৮৫ খৃস্টাব্দে ফরাসী নৌ-সেনাপতি বুগাঁভিল্ (Bougainville) আবার নতুন ক'রে সোলমন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি প্রথম যে দ্বীপটি দেখতে পেয়েছিলেন, সোলমনের অধিবাসীদের কাছে তার নাম ছিল লোরু। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের উত্তর দিকস্থিত এই দ্বীপটি পর্যন্তই ছিল মেন্ডোজার আবিষ্কারের সীমানা। ফরাসী সম্রাট লুইয়ের রাজসভায় বুগাঁভিলের যিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁর নাম ছিল কোয়াসিউল্; তাই বুগাঁভিল তাঁর নামানুসারে লোরুর নামকরণ করলেন কোয়াসিউল্; কোয়াসিউলের উত্তর-পশ্চিমস্থিত বড় দ্বীপটিকে সোলমন-বাসীরা বলত বুইন দ্বীপ—তিনি নিজের নামানুসারে এই দ্বীপটির নামকরণ করলেন বুগাঁভিল।

এর পরের একশ বছরে দেখা যায় যে ইউরোপবাসী-দের সঙ্গে এই দ্বীপপুঞ্জের সম্পর্ক খুব বেশী ছিল না; যেটুকু সংস্পর্শ ঘটেছিল তাতে ইউরোপীয়রা এ দ্বীপপুঞ্জের উপকারের চেয়ে অপকারই করেছিল বেশী। সভ্যতার দিক থেকে ইউরোপীয়রা উন্নততর জাতি হওয়া সত্ত্বেও, এ দ্বীপের অধিবাসীদিগকে উন্নত করার চেষ্টা করে নি—বরং শ্বেতকায় দাস-ব্যবসায়ীরা এ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদিগকে ধার নিয়ে অন্যত্র বিক্রী করার চেষ্টায় ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগেই ইংলণ্ড এবং তার উপনিবেশসমূহ থেকে আইন দ্বারা দাস-ব্যবসায় প্রথা রদ ক'রে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই দাস-ব্যবসায়েরই সমগোত্রীয় ব্ল্যাক্-বার্ডিং (Black-birding) নামক ব্যবসায় বহুদিন যাবত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল। স্থানীয় ব্ল্যাক বার্ডিং ব্যবসায়ীরা স্থানীয় লোকদিগকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে কুইন্সল্যাণ্ডে এবং ফিজিতে চিনির চাষে লাগিয়ে দিত। অনেককে আবার এতদূর যায়গায় নিয়ে যাওয়া হ'ত যে সেখান থেকে তাদের ফেরার আশা থাকত খুবই কম। পেরুর রৌপ্য খনিতে কাজ করার জন্য লোক নিয়ে যাবার পথে এমনই একটি ব্ল্যাক বার্ডিং জাহাজ ধরা পড়েছিল।

নানা উপায়ে এই সব লোক জোগাড় করা হ'ত। দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীরা প্রায়ই খুব সরল। দাস-ব্যবসায়ীরা জাহাজ এনে তীরের নিকটস্থিত অধিবাসীদের ডাকত এবং জাহাজে ওঠার জন্য আহ্বান করত। স্বাভাবিক ঔৎসুক্যের ফলে দ্বীপবাসীরা সাড়া দিত এবং জাহাজটাও তখন তাড়াতাড়ি হতভাগাদের নিয়ে পালিয়ে যেত। কিন্তু এমনভাবে বেশীদিন ব্যবসায় চালানো সম্ভব হয় নি; কারণ লোকেরা ধীরে ধীরে ব্যবসায়ীদের ফাঁকি ধ'রে ফেলেছিল—পরে আর তারা অত সহজে জাহাজে উঠ্ত না। তখন সর্দারদের সাহায্য নিয়ে কুলী সংগ্রহ করা হ'ত। কোন সর্দারকে অর্থ দিয়ে বশীভূত ক'রে তার অধীনস্থ লোকদের ধরে নিয়ে যাওয়া হ'ত।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে ফিজিস্থিত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ (এ'দের বলা হ'ত পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় হাই কমিশন) এই ব্ল্যাক-বার্ডিং ব্যবসায় সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করলেন। সে সময় সলোমন দ্বীপপুঞ্জে কোপ্রার চাষ প্রচুর পরিমাণে শুরু হয়েছিল—এই কোপ্রা ব্যবসায়ে কাজের জন্য যথেষ্ট কুলির প্রয়োজন ছিল। তাই স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে কুলি সংগ্রহের জন্য কর্তৃপক্ষ একপ্রকার চুক্তি-প্রথার প্রবর্তন করলেন। এই চুক্তি অনুসারে প্রত্যেক কুলিকে দুই বছরের জন্য ইউরোপীয় কোপ্রা ব্যবসায়ীর অধীনে কাজ করতে হ'ত। চুক্তির দু'বৎসরের মধ্যে কুলির পক্ষে যেমন কাজ ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না, তেমনি মালিকের পক্ষেও কুলিকে তাড়ানো সম্ভব ছিল না। শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে বিবাদ সংঘটিত হলে স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ সে-বিবাদ মীমাংসা করে দিতেন। চুক্তির সময় কাউকে জোর ক'রে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাতে চুক্তিবন্ধ না করা হয়, সেদিকেও কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট দৃষ্টি রাখতেন। কোপ্রার কাজের জন্য প্রধানত ম্যালেইটা দ্বীপ থেকেই শ্রমিক সংগ্রহ করা হ'ত। এই ব্যবস্থায় কাজকর্ম বেশ ভালভাবেই চলেছিল। অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে যে একই কুলি প্রায় বার বছর ধ'রে একই কোপ্রা ব্যবসায়ে কাজ করছে, দু'বছরের চুক্তি শেষ হবার পর সে আবার নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হ'য়েছে।

কোপ্রা কথাটার মানে আর কিছু নয়—এর মানে নারিকেলের শুষ্ক শাঁস। এই কোপ্রা ব্যবসায়ে নানারকম কার্য বিভাগ আছে—কোপ্রা তৈয়ারী, কোপ্রা কাটা, কোপ্রা জ্বাল দেওয়া প্রভৃতি। এই সব দ্বীপে যথেষ্ট নারিকেল গাছ আছে—নারিকেল ঝুনো হ'য়ে যে পর্যন্ত গাছ থেকে আপনি না পড়ে সে পর্যন্ত গাছেই থাকে। গাছ থেকে পড়লে নারিকেল ছুলে তার শাঁসটি বের করে নেয়া হয় এবং মৃদু আগুনে জ্বাল দেওয়া হয়। এই নারিকেলের থেকেই জ্বাল দেবার জন্য খড়ি পাওয়া যায়। নারিকেল গাছের শুকনো পাতা এবং নারিকেলের খোসা জ্বাল দেবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কোপ্রা জ্বাল দিতে দশ ঘণ্টা থেকে বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগে। জ্বাল দেওয়া হয়ে গেলে নারিকেল শাঁসের ওজন প্রায় অর্ধেক কমে যায়—এই অবস্থায় তখন স্থানীয় কোপ্রা ব্যবসায়ীদের কাছে এগুলি বিক্রী করা হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আবার বিদেশীয় বড় বড় কোম্পানীর কাছে এগুলি বিক্রী করে। এমনি করে কোপ্রা শেষ পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়ে হাজির হয়। গুণানুসারে কোপ্রা দিয়ে নকল মাখন, পশুর খাদ্য কিংবা সাবান প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। কোপ্রাই সোলমন দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম ব্যবসায়। কোপ্রার বাজার যখন মন্দা থাকে তখন সময় সময় দ্বীপবাসীরা ট্রোকাস, ঝিনুকের ব্যবসায়ের দিকে নজর দেয়। এই ঝিনুক দিয়ে চীনাদের ট্রেপাং নামক প্রিয় খাদ্য প্রস্তুত হয়।

বর্তমানে সোলমন দ্বীপপুঞ্জের বেশীরভাগ অধিবাসীই খৃস্টধর্মাবলম্বী। এই ধর্মপ্রচারের মূলে আছে খৃস্টীয়

ধর্মপ্রচারকদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা এবং শাসক সম্প্রদায়ের কঠোর দমননীতি। এর ফলে গত পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে এই দ্বীপবাসীদের প্রভূত উন্নতি হয়েছে—নরখাদক এবং নৃমুণ্ড-শিকারী আদিম অসভ্য জাতি আজ সভ্যতার আলোক লাভ করেছে। আজ এই দ্বীপবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সুদক্ষ ডাক্তার, শিক্ষক এবং কেরাণী পাওয়া যায়। বিভিন্ন খৃস্টধর্ম প্রচারসমিতির হাতেই সর্বপ্রকার শিক্ষার ভার ছিল—দ্বীপবাসীদের শিক্ষা বিধান করতে গিয়ে এই সব সমিতিকে নানাপ্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তার মধ্যে একটি সমস্যা এই যে, এদের আদিম জীবন-যাত্রা থেকে সভ্যতার অজুহাতে যে-সব আমোদপ্রমোদ জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তার পরিবর্তে অন্য কিছুর ব্যবস্থা করা। গোষ্ঠী-গত যুদ্ধ এবং পার্শ্ববর্তী দ্বীপ লুণ্ঠন এই সব আদিম জাতির নিত্যনৈমিত্তিক কার্য ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এই সব যুদ্ধবিগ্রহ আজ অবৈধ ব'লে ঘোষিত হয়েছে। ফলে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এরা যেন এদের প্রকৃতি-গত স্বাভাবিক বীর-স্বভাব হারিয়ে ফেলে কিছু-মাত্রায় বিষণ্ণ ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকতার স্থানে দেখা দিয়েছে কৃত্রিমতা—আধুনিক সভ্যতা এদের জীবনে কিছুটা বিপদপাতই যেন করেছে। যাহ'ক, এরা ধীরে ধীরে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করেছে।

সলোমন দ্বীপপুঞ্জে শিক্ষা এবং সভ্যতা বিস্তারে আরেকটা প্রধান অন্তরায় এই যে, এই দ্বীপপুঞ্জে এমন কোন একটি ভাষা পাওয়া যায় না, যার যথেষ্ট পরিমাণে সার্বজনীনত্ব আছে। এই দ্বীপপুঞ্জে অসংখ্য ভাষা আছে; কিন্তু এর কোনটারই বিস্তৃতি খুব বেশী নয়। একমাত্র ম্যালেইটা দ্বীপেই প্রায় আট নয়টা ভাষা আছে। কোন একটি বিশেষ মূল ভাষা থেকে এই সব ভাষার উদ্ভব হয়েছে কিনা জানা যায় না—তবে এই সব ভাষার মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈষম্য এত বেশী যে, এক গ্রামের অধিবাসীরা পার্শ্ববর্তী আরেকটি গ্রামের ভাষাই ভালভাবে বুঝতে পারে না। কাজেই সোলমন দ্বীপপুঞ্জে জাতীয় ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা চলতে পারে এমন কোন ভাষাই নেই। ফলে ইংরেজীকে এ দ্বীপপুঞ্জের শিক্ষার বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থার ফলে পিড্গিন্ (Pidgin) ইংরেজী নামে একরকম ইংরেজীর সৃষ্টি হয়েছে। নানাপ্রকার দেশীয় ভাষার সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলেই এই পিড্গিন্ ইংরেজীর উদ্ভব হয়েছে। এই পিড্গিন্ ইংরেজী এত অদ্ভুত যে, খাঁটি ইংরেজেরা এই ইংরেজী শুনে হাসি সংবরণ করতে পারে না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে এই পিড্গিন্ ইংরেজী সোলমন দ্বীপপুঞ্জে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

সোভিয়েট পারিবাবিক জীবন

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় পঁচিশ বৎসরের চেষ্টায় সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট মানব-সভ্যতার ইতিহাসে যে নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে, ফাসিস্ত শক্তি আজ তাহার বিলোপসাধনে কৃতসংকল্প। পৃথিবীতে এত বড় যুদ্ধ ইতিপূর্বে হয় নাই; অপরিমেয় বিনাশ ও অননুমেয় হিংস্রতার দিক দিয়া ইহা সকল যুদ্ধকে অতিক্রম করিয়াছে। সার্বিক যুদ্ধের বিষম আবর্তনে রাষ্ট্রের সর্বশক্তি যুদ্ধমুখীন হইয়া উঠিয়াছে। উভয় পক্ষই চরম অবস্থার জন্য প্রস্তুত।

সোভিয়েট রাষ্ট্র পরিচালিত দুগ্ধশালা

বিবদমান দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে যেমন মাঝপথে আপোষ হওয়া সম্ভব, এক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নয়। ইহা পরস্পর বিরোধী দুই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে সংঘাত। একের অস্তিত্ব অন্যের ধ্বংসের কারণ। এই যুদ্ধে ফাসিস্ত পক্ষের পরাজয় ঘটিলে রণক্লান্ত জনসাধারণ স্বভাবতই ফাসিস্ত পন্থার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিবে এবং যুদ্ধের অপরিহার্য পরিণতি আর্থিক দুর্গতি ও বেকার সমস্যার দরুণ য়ুরোপে সাম্যবাদের অনুকূল আবহাওয়া দেখা দিবে। গত মহাযুদ্ধের পরও জার্মানীতে লোক ঠিক এই অবস্থায় পড়িয়া সাম্যবাদকামী হইয়া উঠিয়াছিল। পশ্চিম য়ুরোপ ও আমেরিকার ধনপতিরা সেদিন জার্মানীতে মূলধন পাঠাইয়া তথাকার ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিপতিদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা না করিলে ইতিহাস হয়ত আজ অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইত। অর্থ-নৈতিক স্থূল বিচারে অবশ্য মনে হয়, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্দেশ্যেই গত মহাযুদ্ধের বিজয়ী পক্ষ ভার্সাই সন্ধির পর জার্মানীতে অর্থ ঢালিয়া তথাকার শিল্পপতিদিগকে জিয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ এক হাতে সাহায্য করিয়া তাহারা আর এক হাতে তাহা কাড়িয়া লইবার প্রয়াস পায়। কিন্তু কূটনৈতিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে একথা বলা ছাড়া উপায় থাকে না যে, আর্থিক দুর্গতির দরুণ জার্মানীতে পাছে পুঁজি-বাদের অবসান ঘটিয়া সোভিয়েটতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, এই আশঙ্কায়ই বিজয়ী পক্ষের পুঁজিবাদীরা সেদিন জার্মান শিল্প-পতিদিগকে অর্থসাহায্য করার জন্য বেশী ব্যগ্র হইয়াছিল। জার্মানীতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার দুশ্চিন্তায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের শাসকগণ পুঁজি-বাদীদের অঙ্গুলিসঙ্কেতে সেদিন যাহা করিয়াছিলেন, আজিকার এই মহাযুদ্ধ তাহারই পরিণতি। জার্মানীতে তখন ক্ষীয়মান পুঁজিবাদ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিবার সুযোগ না পাইলে হিটলারের অভ্যুত্থান সম্ভব হইত না এবং এই মহাযুদ্ধও হয়ত বাধিত না। মানব জাতির ইতিহাসে ইহা এক বিষম কলঙ্ক।

পক্ষান্তরে জার্মানী যদি বিজয়ী হয়, তবে বর্তমান সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতে বাধ্য। মানুষের মনে সোভিয়েট আদর্শ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার বাস্তব রূপ লোকচক্ষুর অগোচর হইবে। আদর্শ যত বড়ই হোক, সামরিক বলের কাছে কোন রাষ্ট্রের পরাজয় এবং বিজয়ীর ইচ্ছানুযায়ী বিজিত দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন ইতিহাসে কিছু নূতন নয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তথা-কার লোকের মনে যে সামাজিক বোধ জাগিয়াছে এবং যে শ্রেণীবৈষম্যের ভাব লোপ পাইতে চলিয়াছে, সোভিয়েট শক্তির পরাজয় ঘটিলে বাহিরের ইন্ধন ও প্ররোচনায় সেখানে এই সামাজিক বোধ বিস্মৃত হইয়া আবার শ্রেণীস্বার্থের চেতনা আসা কিছু অসম্ভব নয়। সেদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তার সমাজ-ব্যবস্থাও ভাঙিয়া পড়িবে। তেমন দুর্দিনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই আজ সোভিয়েট য়ুনিয়নের আপামর-জনসাধারণের এই মরণ-পণে সংগ্রাম। যে মুক্তির আস্বাদ তাহারা পাইয়াছে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে তাহাদের অদৃষ্টে যে অশেষ দুর্গতি আছে, এ সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ সচেতন। সোভিয়েট জনসাধারণ জানে, এ যুদ্ধ শাসকবর্গের খেয়াল চরিতার্থের জন্য নয়, প্রত্যেক সোভিয়েট পরিবার রক্ষার প্রশ্ন ইহার সহিত বিজড়িত।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে জমিদার নাই, সমগ্র জমি জন সাধারণের। কাজেই প্রত্যেক সোভিয়েট প্রজাই মনে করে যে, শত্রুর আক্রমণ হইতে সে তাহার নিজেরই জমি রক্ষা করিতেছে। সেখানে কারখানাসমূহের কোন ব্যক্তিগত মালিক নাই; কারখানাগুলি জনসাধারণের সম্পত্তি। সুতরাং প্রত্যেকেই মনে করে যে, শত্রুর আক্রমণ হইতে সে তাহার নিজেরই কারখানা রক্ষা করিতেছে। সর্বোপরি সেখানকার জনসাধারণ জানে যে, সোভিয়েট ব্যবস্থায় তাহাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কতখানি উন্নতি হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে তাহারা সচেতন বলিয়াই আজ সর্বস্ব পণ করিয়া তাহারা আত্মরক্ষায় বদ্ধ-পরিকর। তাহাদের এই দৃঢ়তার মূলে যে পারিবারিক জীবনের প্রেরণা রহিয়াছে, বর্তমান নিবন্ধে সেই সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিছু বলিব।

সোভিয়েট পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কুচক্রীদের কুৎসিত প্রচারকার্যের ফলে অদ্যাবধি অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা না রহিয়াছে, এমন নয়। সোভিয়েট বিদ্বেষীরা লোকের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া নিরঙ্কুশভাবে এই প্রচারকার্য চালাইয়াছেন। রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধার পর লোকের মনে সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে আগ্রহ বাড়িয়াছে এবং এতকাল যাঁহারা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে নির্জলা মিথ্যা বলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মুখ দিয়াও এখন কিয়ৎপরিমাণে সত্য কথা বাহির হইতেছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র শয়তানের রাজ্য এবং সেখানে কেবল দুর্নীতিরই প্রশ্রয়—এই একতরফা প্রচারকার্যের পথ অনেকটা বন্ধ হইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে পারিবারিক জীবন বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা যে পারিবারিক জীবনে অভ্যস্ত, সেই মানদণ্ডে বিচার করিলে অবশ্য সোভিয়েট পরিবারগুলির সত্তা উপলব্ধি করা সত্যই কঠিন; কিন্তু স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারমুক্ত স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিলে দেখা যায়, সোভিয়েট পরিবারগুলি আবর্জনামুক্ত হইয়া নব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে মাত্র, পারিবারিক মূল সূত্র ছিন্ন হয় নাই। ব্যষ্টির জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তি আসায় পারিবারিক শৃঙ্খল খসিয়া পড়িয়াছে; নরনারীর অনাবিল হৃদয়বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত হইবার অবসর পাওয়ায় অকুণ্ঠিত এবং অবিকৃত ভালবাসার ভিত্তিতে দাম্পত্য জীবন গড়িয়া উঠিতেছে। মানুষের জীবনধারা যেখানে সত্যাশ্রয়ী, সেখানে দুর্নীতির প্রশ্রয় কম। মিথ্যাশ্রয়ী জীবন-ধারায় আবর্জনার বিড়ম্বনা বেশী। মানব জীবনের পূর্ণ বিকাশের দ্বারাই এই সত্যের সন্ধান হওয়া সম্ভব এবং ব্যষ্টির জীবনের পূর্ণ বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় অর্থনৈতিক পরাধীনতা। সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রে সেই ব্যষ্টির অর্থনৈতিক পরাধীনতা বিদূরণেরই চেষ্টা করা হইয়াছে এবং তার ফলে সোভিয়েট পরিবারগুলি নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে প্রথমেই সোভিয়েট নারী-সমাজের কথা বলিতে হয়। বিবাহিত, অবিবাহিত প্রত্যেক নারীকেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে জীবিকার্জনের জন্য উৎসাহিত করা হয়। পুরুষের সমান পারিশ্রমিক নারী পায় এবং যোগ্যতা অনুসারে পদোন্নতি হয়। পদোন্নতি ব্যাপারে পুরুষ ও নারীতে কোন বৈষম্য নাই। ইহার ফলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অসংখ্য

সহরের কর্মরত সোভিয়েট গৃহিণী

নারী এখন স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করে। সন্তান লালন-পালন এবং সাংসারিক কাজকর্ম যাহাতে জীবিকার্জনের পথে অন্তরায় হইয়া না দাঁড়ায়, তজ্জন্য শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার জন্য সরকারী শিশু মঙ্গলালয় এবং কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়সমূহ আছে। এছাড়া প্রত্যেক অফিস বা কারখানা সংলগ্ন ভোজনালয় থাকায় রান্নাবান্নার জন্যও মেয়েদিগকে বাড়িতে বসিয়া থাকিতে হয় না। অবশ্য স্বামীর উপার্জনের উপর নির্ভর করিয়াই কেহ যদি সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে চায়, তাহাতেও কোন আপত্তি নাই। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য কোন নারী আগ্রহান্বিত হইলে তাহার জন্য সেই পথ সর্বদাই উন্মুক্ত। পারিবারিক জীবনের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যে কতখানি দরকার, সমাজ সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই তাহা উপলব্ধি করিবেন। বহুক্ষেত্রেই এই অর্থ নৈতিক পরাধীনতার দরুণ নারীসমাজকে পুরুষ সমাজের কাছে নিগৃহীত হইতে হয় এবং অর্থনৈতিক কারণে দাম্পত্য জীবন বিকৃত হইয়া উঠে। আর্থিক প্রয়োজনে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নারীর আর এখন স্বামী খুঁজিতে হয় না বা সেই ভয়ে স্বামীর

আশ্রয়ে থাকার বাধ্যবাধকতাও নাই। নরনারীর পারস্পরিক ভালবাসার উপরই এখন সেখানে দাম্পত্য জীবন প্রতিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য, এই অর্থনৈতিক মুক্তির ফলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে পতিতাবৃত্তির অবসান ঘটিয়াছে। সন্তানসন্ততির কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রধানত সোভিয়েট বিবাহ-বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে। বিবাহ বিচ্ছেদের পদ্ধতি সেখানে অপেক্ষাকৃত সহজ; একপক্ষের উপস্থিতিতে অপরপক্ষ দরখাস্ত করিলেই বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর করা হয়। পথ সহজ বলিয়াই যে সেখানে কথায় কথায় বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়া থাকে, এমন নয়। জীবনধারা সহজ হওয়ায় মানুষের দাম্পত্য জীবনের সমস্যাও অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং তাছাড়া কতকগুলি আর্থিক ও নৈতিক দায়িত্ব থাকায় পারত-পক্ষে কেহ বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে যায় না। বিবাহ বিচ্ছেদ কমাইবার জন্য প্রত্যেকবার বিবাহ বিচ্ছেদের উপর ক্রমবৃদ্ধি হারে সরকারী ফী ধার্য আছেঃ প্রথম বারের বিচ্ছেদে ৫০ রুবল (রুশ মুদ্রা); দ্বিতীয় বারে ১৫০ রুবল এবং তৃতীয় বারে ৩০০ রুবল—এই হারে ফী আদায় করা হয়। এছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদের পরও সন্তানের ভরণপোষণের খরচ বহন করিতে পিতা বাধ্য। এই সব কারণে স্বভাবতই বিবাহ বিচ্ছেদ কম হয়। তবে স্বামী-স্ত্রীতে নিতান্ত মনের অমিল হইলে জোর করিয়া তাহাদিগকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ রাখার ব্যবস্থাও সেখানে নাই।

শিশু কল্যাণই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। সমাজেই প্রত্যেক শিশুই যাহাতে জীবনের প্রারম্ভে সমান সুযোগ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বিশেষ নজর দিয়া থাকেন। এইজন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কোন সন্তানকেই অবৈধ বলিয়া বিবেচনা করা হয় না। বিবাহের আগে সন্তান জন্মিলেও পিতাকে জনকত্ব স্বীকার করিতেই হইবে এবং সেই সন্তানের ভরণপোষণের জন্য তাহার আয়ের এক-চতুর্থাংশ দিতে সে বাধ্য। কেবল আইনের ভয়েই নয়, নৈতিক বোধ হইতেও সোভিয়েট পুরুষেরা আজকাল এই দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করে না।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে সন্তান লালনপালনের ভার সাধারণত মায়েরাই পাইয়া থাকেন। সেই ক্ষেত্রে পিতাকে এক সন্তানের জন্য তাহার আয়ের এক চতুর্থাংশ, দুই সন্তানের জন্য এক-তৃতীয়াংশ এবং তিন বা ততোধিক সন্তান থাকিলে আয়ের অর্ধাংশ দিতে হয়। সন্তানের জননী ইহা পাইয়া থাকেন। অবিবাহিত জীবনে সন্তান জন্মিলেও এই দায়িত্ব পালন করিতে হয়।

অবশেষে সোভিয়েট পারিবারিক জীবনে ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে দুই-চারি কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। সোভিয়েট রাষ্ট্র ধর্মকে বাদ দিয়া চলিলেও ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম সেখানে নিষিদ্ধ হয় নাই। ধর্মব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন উৎসাহ নাই এবং কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের সমর্থন বা অর্থসাহায্য পায় না কিন্তু কোন ধর্মমতের প্রতি রাষ্ট্রের বিদ্বেষও নাই। খৃষ্টান, মুসলিম, বৌদ্ধ—সকল ধর্মই রাষ্ট্রের নিকট সমান ব্যবহার পায়। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে সকলেই স্ব স্ব ধর্মমত মানিয়া চলিতে পারে; কিন্তু ধর্মের ধ্বজা ধরিয়া কেহ রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করিলে তাহা সহ্য করা হয় না।

বর্তমান যুদ্ধে জয়পরাজয়ের উপর এই সোভিয়েট পারিবারিক জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সোভিয়েট আদর্শ ও চিন্তাধারাকে ফাসিস্ত শক্তি শেষ পর্যন্ত নির্মূলে করিতে সক্ষম হইবে কি না ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দিবে। তবে জার্মান অধিকৃত সোভিয়েট এলাকায় অদ্যাবধি তাহা যে সম্ভব হয় নাই তার প্রমাণ শুধু এই যে, সোভিয়েটবিরোধী কোন তাঁবেদার গবর্নমেণ্ট হিটলার এ পর্যন্ত সেখানে দাঁড় করাইতে পারেন নাই। পৃষ্ঠদেশে সোভিয়েট গেরিলাদের অতর্কিত আক্রমণে তাঁহার বাহিনী সর্বদাই বিষম বিব্রত।

পূব সাইবেরিয়ার ভবিষ্যৎ ?

ভানু গুপ্ত

জাপান এবার সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করবে কি না তা নিয়ে জল্পনাকল্পনার শেষ নেই। ব্রিটেন, আমেরিকা ও চীন—এই তিন সূত্রে স্রোতের মতো এই সব খবর আসে। মাঝে মাঝে আবার সংবাদের তর্জনী ভারতবর্ষের দিকে ঘুরিয়ে দৃশ্যপটের পরিবর্তন করা হয়; কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে, আবার দেখা যায় সাইবেরিয়ার দিকে মুখ করে লক্ষ লক্ষ জাপানী সৈন্য আর হাজার হাজার কামান বিমান রেসের ঘোড়ার মতো সারি বেঁধে ছুটবার হুকুমের জন্যে উদ্যত হয়ে আছে। মোটমাট আবহাওয়া বেশ জমিয়ে তৈরী করা হচ্ছে।

কিন্তু তাই বলে বল্‌ছি না যে, সোভিয়েট সাইবেরিয়ার উপর জাপানী আক্রমণের কোনো সম্ভাবনা নেই। কথা হচ্ছে, যেভাবে এইসব সংবাদ রটানো হয়, সেটা অনেক সময় হাস্যকর হয়ে পড়ে, যার ফলে লোকে এই সব গবেষণা অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করে। বিশেষ করে' লোকে যখন দেখে যে, জাপান দক্ষিণে বা দক্ষিণ-পশ্চিমে অস্ট্রেলিয়া বা ভারতবর্ষের দিকে না এগিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নকে আঘাত করতে গেলে ব্রিটেন ও আমেরিকার উপর থেকে চাপ কমে যায়, তখন লোকে স্বভাবতই এই ধরণের জল্পনা-কল্পনাকে প্রচারকার্যের পর্যায়ে ফেলে।

জাপান কোন্ দিকে আক্রমণ করবে, তা নিশ্চিতভাবে বল্‌তে পারেন একমাত্র জাপানী হাইকমাণ্ড। বাইরের লোকে চারদিকের অবস্থা বিচার করে' শুধু একটা অনুমান করতে পারে এবং কার্যত এ অনুমান ব্যর্থও হতে পারে। সে ধরণের বিচারের মধ্যে না গিয়ে বলা যায়, জাপানের সাইবেরিয়া আক্রমণের পক্ষে যেমন কতকগুলো কারণ আছে, তেমন বিপক্ষও বেশ বড় কয়েকটা কারণ আছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই পূর্ব ভূভাগের পরিচয় নিতে গেলেই সে কারণগুলো বোঝা যাবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের রাজ্য চীন এবং জাপানের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে প্রসারিত। সুতরাং সামরিক অবস্থানের দিক দিয়ে জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য অংশের তুলনায় এ অঞ্চলে কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ বা শিল্প-সম্পদ নেই। কর্ষণযোগ্য জমিও এখানে খুবই কম, বেশীর ভাগ জায়গা ঊষর ও পর্বতময়। লেনা নদীর অববাহিকায় সোনা পাওয়া যায়, তা ছাড়া আর তেমন কোনো খনিজ পদার্থ পূর্ব সাইবেরিয়ায় পাওয়া যায় না। আর যা সম্পদ পাওয়া যায়, তা আহরণের উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। পূর্ব সাইবেরিয়ার প্রধান বন্দর ভ্লাডিভস্টক-এ সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য বড় বন্দররে মতো জাহাজ চলাচল করে না। ১৯৩১ সালে এ বিরাট ভূভাগে জনসংখ্যা ছিল মোট ৫০ লক্ষের কিছু বেশী; এই অধিবাসীরা এইভাবে বিভক্ত : রুশ সংযুক্ত সাধারণতন্ত্রের সুদূর প্রাচ্য এলাকা—১৫,৯৩,৪০০; ইয়াকুট্‌স্ক সাধারণতন্ত্র—৩,০৮,৪০০; বুরিয়াৎ-মঙ্গোল সাধারণতন্ত্র—৫,৭৫,০০০; রুশ সংযুক্ত সাধারণতন্ত্রের পূর্ব সাইবেরিয়ান এলাকা—২৫,৬৮,৪০০। ইয়েনিসেই নদীর পশ্চিমেও খানিকটা অংশ এই হিসেবের মধ্যে ধরা হয়েছে। জাপান ও কোরিয়ার ১০ কোটি লোকের তুলনায় এই জনসংখ্যা অকিঞ্চিৎকর।

সুদূর প্রাচ্যে সোভিয়েটের সামরিক কর্মতৎপরতার পক্ষে পূর্ব সাইবেরিয়ার শূন্যতা বিঘ্নকর। সেই জন্যে সোভিয়েট গভর্নমেন্ট এই অঞ্চলের উন্নতি সাধনের নীতি কয়েক বছর ধরে অনুসরণ করে' আস্‌ছেন। গভর্নমেন্ট ট্যাক্স থেকে রেহাই দেওয়ার লোভ দেখিয়ে বৈকাল হ্রদের পূর্বে অধিবাসী পত্তন করবার ব্যবস্থা করেন এবং আমুর নদীর উত্তরে বিরোবিজান নামে ইহুদীদের জন্যে একটা স্বায়ত্ত-শাসনশীল এলাকা প্রতিষ্ঠা করেন। রাস্তা এবং রেলওয়ে নির্মাণের কাজে কয়েদীদের শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু এ সব চেষ্টা সত্ত্বেও এখনও পূর্ব সাইবেরিয়ার প্রান্তর বেশী কিছু উন্নত হয় নি।

এখনও সোভিয়েট সুদূর প্রাচ্য সৈন্যবাহিনী স্থানীয় কৃষি ও শ্রমশিল্পের উপর নির্ভর করতে পারে না। সে বেশী নির্ভর করে পশ্চিমের সরবরাহের উপর। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ের লাইন ডবল করায় সরবরাহের সুবিধে অনেক বেড়ে গেছে। চিতা-ভ্লাডিভস্টক লাইনের যে অংশ মাঞ্চুরিয়ার ভিতর দিয়ে গেছে, সেটা এর আগে মাঞ্চুকুওর কাছে বিক্রী করে দেওয়া হয়। এই লাইন আগে চাইনীজ ইস্টার্ণ রেলওয়ে নামে অভিহিত ছিল। এই লাইনটা জাপানীদের দখলে। সুতরাং আমুর নদীর উত্তর দিকে গিয়ে খাবারস্ক হয়ে যে লাইন গেছে, সেটাই ভ্লাডিভস্টকে যাওয়ার একমাত্র লাইন। জাপান যদি মাঞ্চুকুও থেকে ক্ষিপ্র আক্রমণ করে' এই লাইন বিচ্ছিন্ন করে, কিংবা মঙ্গোলিয়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে বৈকাল হ্রদের দক্ষিণে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে কেটে দেয়, তাহলেও লালফৌজ মুস্কিলে পড়বে না; কারণ বৈকাল হ্রদের উত্তরে আর একটা রেলওয়ে লাইন তৈরী হয়েছে; এই নতুন লাইনের পূর্ব প্রান্ত হচ্ছে ভ্লাডিভস্টকের উত্তরে উপকূলবর্তী নতুন শহর সোভিয়েটস্কায়া। দুই বছর আগেকার কথা বলছি, এখন হয়তো ঐ লাইন ভ্লাডিভস্টক পর্যন্তই এসেছে।

ভ্লাডিভস্টককে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ একটা বড় বিমান ও নৌঘাঁটি হিসেবে গড়ে তুলেছেন। এখানে সোভিয়েটের যথেষ্ট সংখ্যায় সাবমেরিন আছে, যারা যুদ্ধ বাধলে জলবেষ্টিত জাপানকে বেশ বিব্রত করতে পারবে। কিন্তু জাপানীদের আসল ভয় ভ্লাডিভস্টকের বিমান। ভ্লাডিভস্টক থেকে জাপানের সুরুগা শহরের দূরত্ব হচ্ছে ৪১০ মাইল; কিওতো ও ওসাকার দূরত্ব আর একটু বেশী। টোকিওর ততটা ভয় নেই; কারণ টোকিওর দূরত্ব প্রায় ৭০০ মাইল, তা ছাড়া টোকিও যাওয়ার পথে আছে শিনানো পর্বত, যেখান থেকে বিমানধ্বংসী কামান সোভিয়েট বিমানকে বিপদে ফেলতে পারবে।

পূর্ব সাইবেরিয়া সমৃদ্ধ না হলেও কয়েকটা জিনিস আছে, যা জাপানের পক্ষে প্রয়োজনীয়। টার্টারি উপসাগরে সোভিয়েট দরিয়ার ভিতরে ও ঠিক বাইরে এবং কামশাট্‌কার পশ্চিম উপকূলের কাছে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মাছ জাপানীদের একটা বড় খাদ্য এবং এই মাছের দরিয়া নিয়ে সোভিয়েটের সঙ্গে তাদের অনেক বিরোধ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা মাছ ধরবার অধিকার নিয়ে চুক্তি করেছে। জাপানের সাখালিন দ্বীপের উত্তরার্ধটা সোভিয়েটের দখলে; এই অংশে তেল আবিষ্কৃত হয়েছে। তেল জাপানীরা চায়। ১৯২৫ সালে উত্তর সাখালিনের তৈল আহরণ নিয়েও সোভিয়েটের সঙ্গে তাদের একটা চুক্তি হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে পূর্ব সাইবেরিয়ায় এমন কোনো অর্থনৈতিক প্রলোভন নেই, যার জন্যে জাপান সোভিয়েটকে আক্রমণ করতে পারে। মাছ ও তেল যা আছে, তার উপর জাপানীদের লোভ আছে সত্যি, কিন্তু সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তির ফলে সে লোভ আংশিক চরিতার্থ হয়েছে। এখন ঐ মাছ ও তেল পুরোপুরি দখল করবার জন্যে সোভিয়েটের মতো একটা প্রবল সামরিক শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করা জাপান যুক্তিযুক্ত মনে করবে কি না সন্দেহ। লাল ফৌজ যে বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীর চেয়ে যথেষ্ট বেশী শক্তিশালী, সে বিষয়েও জাপানের কোনো সংশয় থাকার কথা নয়; কয়েকবার সীমান্ত সংঘর্ষে জাপান নিজেই তার আস্বাদ পেয়েছে। সব চেয়ে বড় কথা, ইংরেজ, ডাচ ও মার্কিনদের হাত থেকে সুদূর প্রাচ্যে তাদের বহুবিস্তৃত উর্বর ও প্রাকৃতিক সম্পদ-সমৃদ্ধ জায়গা ছয় মাসের যুদ্ধে ছিনিয়ে নেওয়ায় জাপানের অর্থনৈতিক এমন কোনো অভাব নেই, যে কারণে সোভিয়েটের সঙ্গে সে লড়াই বাধাবে।

কিন্তু সোভিয়েটকে পূর্ব প্রান্তে অক্ষুণ্ণ থাকতে দিলে জাপানের নিজের আক্রান্ত হবার ভয় সব সময়েই থেকে যায়। ভ্লাডিভস্টক থেকে বিমানহানা তার পক্ষে একটা বিভীষিকা। সুতরাং অতর্কিত আক্রমণে ঐ ঘাঁটি দখল করে' নেওয়ার মতলব তার মনে থাকা অস্বাভাবিক নয়। আর একটা ভয় সোভিয়েট যদি ভবিষ্যতে চীন যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে। ভারতবর্ষ বা অস্ট্রেলিয়া জয়ের অভিযানে যখন সে জড়িয়ে পড়বে, তখন সোভিয়েট যদি তাকে আক্রমণ করে বসে, তাহলে তার পক্ষে দুই রণাঙ্গণ সামলানো দুঃসাধ্য হবে। এ অবস্থায় বড় শত্রুকে আগে ঘায়েল করবার ইচ্ছা তার হতে পারে। পশ্চিম দিকে জার্মান আক্রমণ এ বিষয়ে তার খুব বেশী রকম সহায়ক। যদিও সুদূর প্রাচ্যের লাল ফৌজ সম্পূর্ণ পৃথকভাবে সংগঠিত, তবু ইওরোপে সোভিয়েটের বিপর্যয় সুদূর প্রাচ্যে তার শক্তিকে খানিকটা ক্ষুন্ন করবেই। আর সুদূর প্রাচ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, সরবরাহ, শ্রমশিল্প ইত্যাদির দিক থেকে সোভিয়েটের চেয়ে জাপানের পক্ষেই যুদ্ধ চালানোর সুবিধা বেশী।

অতএব বর্তমানে সোভিয়েট ইউনিয়নকে জাপানের আক্রমণ করা বা না করা—দুই সম্ভাবনার পক্ষেই সমান সবল যুক্তি দেখানো যায়। মনে হয় শীত পড়ার আগেই জাপানী বাহিনী এই জল্পনাকল্পনার চূড়ান্ত মীমাংসা করে' দেবে।

রক্সী—'একরাত'

শালিমার পিকচার্সের এই নূতন ছবিটি সম্প্রতি রক্সী সিনেমায় প্রদর্শিত হচ্ছে। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন পৃথিবরাজ, নীনা, মুবারক, গুলাব প্রভৃতি। পরিচালনা করেছেন ডব্লিউ জেড আহমেদ।

সুন্দরী তরুণী নীনা মাতৃহীন, বিমাতার ক্রোড়েই সে মানুষ। সে ভালবাসত ডাঃ রাজেন্দ্রকে। নীনার বিমাতার বাসনা—নীনার সঙ্গে রাজেন্দ্রের বিয়ে না দিয়ে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া। এই স্বার্থসিদ্ধির জন্য ষড়যন্ত্র করে সে নীনার বিয়ে দিল এক চরিত্রহীন মাতালের সঙ্গে—লোক দেখানো আড়ম্বরের আড়ালে যার ধনভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে এসেছে। স্বামী-গৃহে নীনার লাঞ্ছনার সীমা নেই। রক্ষিতা, মদ আর জুয়ার অর্থ তাকেই যোগাতে হয় পিতার কাছ থেকে ভিক্ষা করে এনে। অবশেষে

নৃত্যশিল্পী গায়ত্রী রায়

নানা ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে নীনা পুনরায় রাজেন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়।

ছবির গল্পের নানা চমকপ্রদ ঘটনা আছে যা অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য। তবে treatment এর গুণে স্থানে স্থানে মনকে আকর্ষণ করে। ছবিতে অবান্তর দৃশ্যের শেষ নেই এবং সেই কারণেই ছবির দৈর্ঘ্যদোষ মনকে পীড়া দেয়। এ ছবিতে অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবার মতো একটিও চরিত্র নেই। পৃথিবরাজের অভিনয় সাধারণ শ্রেণীর। নায়িকা নীনার চেহারা সুন্দর, কিন্তু অভিনয়-দক্ষতা তার নেই। ছবিটিতে নৃত্য-গীতের আয়োজন প্রচুর আছে—

জীবন সঙ্গিনী

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের ছবি—চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়; কাহিনী—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়; সংগীত পরিচালক হিমাংশু দত্ত; গীতিকার—শৈলেন রায়।

বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, রতীন ব্যানার্জি, তুলসী লাহিড়ী, সন্তু মুখার্জি, শ্রীমতী পান্না, প্রতিমা দাশগুপ্তা, শ্রীমতী পদ্মা, রেণুকা রায়, শ্রীমতী জ্যোতি, মীরা দত্ত, অরুণা দাস, শীলা হালদার, শ্রীমতী ছায়া প্রভৃতি।

জীবন সঙ্গিনী ছবিটি 'উত্তরা' ও 'বিজলী' চিত্রগৃহে একযোগে প্রদর্শিত হচ্ছে, বিপুল দর্শক সমাগমের মধ্যে। ছবির গল্পের বিষয়-বস্তু বর্তমান সমাজের কোন সমস্যা নিয়ে নয়। সনাতন হিন্দু নারীর আদর্শ নিয়ে জয়গান, আর হিন্দু নারীর আত্মত্যাগের দ্বারা তার মহিমা প্রচার—এইটিই হ'লো ছবির প্রতিপাদ্য বিষয়। ছবির গল্পটি সাজানো হয়েছে একটি কাল্পনিক বিলিতিভাবাপন্ন সমাজকে খাড়া করে। ড্রয়িংরুম, নাচগান, ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা, গার্ডেন পার্টি, পিয়ানো বাজিয়ে গান গাওয়া, সুট্ পরে ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি মধ্যবিত্তশ্রেণীর দর্শকদের চোখ ধাঁধানোর জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার প্রচুর আয়োজন এই ছবিতে করা হ'য়েছে।

বাঙলা দেশের ছবির সাফল্য নির্ভর করে বাঙালী মেয়েদের উপর। বাঙলা দেশের মেয়েরা যে ছবি গ্রহণ করে, তার পয়সার মার নেই। সেদিক ভেবে প্রযোজক ছবিতে ভাঁড়ামী ও ট্র্যাজেডির অবতারণা ক'রে তাকে চরমে এনে ছেড়েছেন। হাসি ও কান্না দুইই এ ছবিতে আছে, তবে সূক্ষ্ম রসের সাহায্যে নয়।

পরিচালকের বাহাদুরীর আমরা তারিফ করছি, কেননা বাঙালী সেণ্টিমেণ্টকে কিভাবে নিংড়ে কিস্তিমাৎ করতে হয়, পরিচালক তা জানেন এবং ভালভাবেই জানেন। সেদিক দিয়ে তিনি সফল হ'য়েছেন আশ্চর্য রকমে। অভিনয়ের দিক দিয়ে ছবিটি সত্যই প্রশংসা পাবার যোগ্য—কারণ প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিজ নিজ চরিত্র সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। এমন কি মাস্টার বিজুর অভিনয় পর্যন্ত স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়েছে। ছবির সংগীতাংশ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, গানগুলি সুগীত হলেও সুরের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। ছবির আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ প্রশংসনীয়।

নৃত্যশিল্পী গায়ত্রী রায়

কুমারী গায়ত্রী রায় নৃত্যকলায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে নৃত্যকলামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন নৃত্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাধিকবার ভারতের বিশিষ্ট স্থানে নৃত্যকলা প্রদর্শন করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৩৭ সালে গায়ত্রী দেবী প্রথম লীলা দেশাইয়ের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন স্থানে নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন, সে বৎসরই তিনি কমলেশ কুমারীর দলের সঙ্গে আরেকবার উত্তর ভারত ঘুরে আসেন। ১৯৩৯ সালে সেরাইকেলার ছউ নৃত্যসম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি নিউ এম্পায়ারে অবতীর্ণা হন এবং তাঁর কয়েকটি একক নৃত্য দর্শকদের আনন্দ দান করে।

সেরাইকেলা দলের সঙ্গে তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে নৃত্যকলা প্রদর্শন ক'রে কবিগুরুর প্রশংসা লাভ করেন। তারপরে তিনি সাধনা বসুর নৃত্যসম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দেন এবং দুইবার ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। ১৯৪২ সালে সাধনা বসুর দলের সঙ্গে উত্তর ভারতের বড় বড় শহর ও দেশীয় রাজ্যে নৃত্যকলা প্রদর্শন করে সাধনা বসুর পরই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সম্প্রতি কুমারী রায় কলকাতার একটি বিশিষ্ট সিনেমা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছেন। আমরা এই শ্রীময়ী নৃত্যশিল্পীর উন্নতি কামনা করি।

কঙ্কালময়ীর সাধনা

তারাকুমার ঘোষ, এম-এ

প্রত্যয়ের অন্তরাগ বেদনা-তিমিরে
লুপ্ত হ'ল অনাত্মীয় সঙ্কোচে।
ব্যর্থ বলি উপহাসে নর-ঋষিদের
অমর সাধনাচয়।
বিলাস বিভব সম যত তত্ত্ববাণী
বিছরিছে পাণ্ডিত্যের আলস্য সঞ্চয়ে
বেড়িয়া অক্ষমে ক্ষুব্ধ ছলনার জালে।
আদি-অন্ত প্রশ্ন তাহাদের
নিত্য রিক্ততার তীরে মানিছে বিস্ময়।

দেহেরে কঙ্কাল করে অকালে যৌবনে,
আত্মারে প্রবাসী,
মুকুরে আপন কায়া ব্যবধান মানে
অপরিচয়ের বেদনায়,
পূর্ণতার কূলে আঁকে বঞ্চনা-তিলক
বিশ্বের যে রীতি;
তার বিনাশন-বাণী কোথায় জগতে?
অসহায় মুকুদলে লয়ে বনান্তরে
যে ছলনা করিছে সংহার;
যে বঞ্চনা নগ্নমূর্তি রাজপথে হাঁটে
অসঙ্কোচে অচেতন লক্ষ তালি দিয়া,
সদ্যোজাত নির্মল কোরকে
উৎপাটিতে মানে নাক' দ্বিধা,
কোথা তার অন্তিম নির্বাণ?
নব জীবনের সত্য লভিতে জগতে
সুন্দরের রূপায়নে আমার প্রয়াস।

সেই সাধনায়,
আমারে চাহিবে কাল সক্ষমের পদে
বরিতে নূতন করি,
জানে সে সৃষ্টির নব প্রভাতের বাণী,
তাই সে নির্মম।
অন্ধশক্তি ভীষণ দুর্বার
তাই লয়ে প্রত্যক্ষ সত্যের যাত্রা।
মোর ভীরু কামনার নাহি অবকাশ।
তাহার ডম্বরু,
আমারে বাজাতে হবে যাত্রীদের দলে;
পদক্ষেপে কাঁপিবে ধরণী,
আকাশেতে প্রাণের স্পন্দন,
প্রলয়ান্তে মঙ্গলের রচিতে বেদিকা
আমার সাধনা।
দানব নিগড় হ'তে মহিমা-লক্ষ্মীরে
সদ্য মুক্ত করি,
মানবের নিত্যকার জীবন-উৎসবে
প্রসারিতে বৈভব আসন;
তমো মাঝে অনির্বাণ প্রদীপের শিখা
ধরিতে নির্ভয়ে,
ধ্বনিতে রিক্তের বিশ্ব
পূর্ণতার উদাত্ত সংগীতে
মোর যাত্রা-পথের সন্ধান।
আত্ম-মুক্তি লক্ষ্য নহে মোর।
মানবের দেবতারে জানাই বন্দনা।
যার আশীর্বাণী লভি'
যৌবন করিবে পূজা সুন্দরের
আনন্দ সংগীতে।
বেদনা-বিধুর ত্যজি লজ্জিতের
কুণ্ঠা-ভীতি-গ্লানি
সক্ষমের লভিবে অভয়।
অকারণ নির্মমতা দিবে নাক' আঁকি
খণ্ডিত হৃদয়ে,
দুর্বলেরে করিতে পীড়ন,
কলঙ্ক-কালিমা।
অক্ষয় অম্লান জ্যোতি আসিবে ধরায়।
সেই মোর সত্যের সাধনা।

বেঙ্গল জীমখানা ক্রিকেট লীগ

গত বৎসর সর্বপ্রথম বেঙ্গল জিমখানা ক্রিকেট লীগ প্রবর্তন করেন। কয়েক বৎসর নানা আলাপ আলোচনার পর বেঙ্গল জিমখানার পরিচালকগণের পক্ষে এইরূপ একটি হিতকারী ব্যবস্থা কর সম্ভব হয়। বাঙলার ক্রিকেট ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায় সূচনা করে। বিভিন্ন দলের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণও উৎসাহিত হন। নিজ নিজ দলের সম্মান বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্রীড়া-কৌশলের উন্নতির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে। বাঙলার ক্রিকেট খেলার উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়। বাঙলার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ, বিশেষ করিয়া বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের সম্মান ভারতীয় ক্রীড়া-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা জাগে। কিন্তু এই বৎসর সেই ব্যবস্থা বন্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। বেঙ্গল জিমখানার পরিচালকগণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও একরূপ বাধ্য হইয়াই এইরূপ বন্ধ করিলেন। গত বৎসর যে সকল দল যোগদান করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই নাকি ক্রিকেট খেলার উপযোগী মাঠ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে সকল আশ্রয়স্থল নির্মিত হইয়াছে তাহাই নাকি বিভিন্ন দলের ক্রিকেট খেলার মাঠে প্রসারতা নষ্ট করিয়াছে। এই সংবাদ উৎসাহী ক্রিকেট খেলোয়াড়গণকে বিশেষভাবেই হতাশ করিবে; কিন্তু উপায় কি? অদূর ভবিষ্যতে প্রচলিত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে আশা করা অন্যায় হইবে না।

জো লুই

ক্রিকেট লীগের খেলা বন্ধ হইলেও ক্রিকেট খেলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ইহবে না। যে সকল দলের মাঠে বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষার উপযুক্ত আশ্রয়স্থল নির্মিত হয় নাই, তাঁহারা বিনা বাধায় উক্ত খেলার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। পূর্বে যেরূপভাবে বিভিন্ন দল বিভিন্ন দলের সহিত খেলার ব্যবস্থা করিত, এই বৎসর সেই নিয়মেরই পুনরাবৃত্তি করা হইবে। এই সকল খেলায় যোগদান করিয়া খেলোয়াড়গণ অনুশীলনের সুযোগ ও সুবিধা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবেন না। ইহাও সুখের বিষয়।

জো লুইকে পুনরায় লড়িতে হইবে

পৃথিবীর বিখ্যাত নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই পুনরায় নিজ অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন বলিয়া জানা গেল। এই প্রতিযোগিতা আগামী ১২ই অক্টোবর নিউইয়র্কে ইয়াঙ্কী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হইবে। জো লুইর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন বিলি কন। ইতিপূর্বে বিলি কনকে একবার জো লুইর সহিত লড়িতে হইয়াছিল। সেই প্রতিযোগিতায় ১২ রাউণ্ড পর্যন্ত বিলি কন সমানে লড়িতে সক্ষম হন। হঠাৎ ১৩ রাউণ্ডের সময়ে জো লুইর একটি মুষ্টাঘাত বিলি কনকে ভূপতিত করে। এইবারের প্রতিযোগিতায় কি ফল হইবে বলা যায় না। বিলি কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সংবাদ পাইবা মত্র অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব প্রতিযোগিতা অপেক্ষা অধিকতর শক্তি লইয়া লড়িতে পারিবেন। জো লুই বর্তমানে সৈন্যদলে যোগদান করায় বিশেষ ব্যস্ত আছেন। তাঁহার অনুশীলন করিবার পর্যন্ত সময় নাই তবে তিনি নাকি এক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, দুই সপ্তাহের অনুশীলন তাঁহাকে লড়িবার উপযুক্ত শক্তিদান করিবে। বিজয়ী হইবার ভরসা আছে বলিয়াই তিনি এইরূপ বলিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার সাফল্য সকল "কালা আদমির" কাম্য। এইবার লইয়া ২০ বার জো লুইকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইতেছে। ইতিপূর্বে কোন মুষ্টিযোদ্ধাকে নিজ সম্মান রক্ষার জন্য এত অধিকবার লড়িতে হয় নাই। "কালা আদমির" এই কৃতিত্ব লাভ সাদা আদমিদের নিকট অসহনীয় হওয়ার ফলেই এইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া মনে হয়। সৈন্য দলে যোগদান করিয়াও এই জন্য জো লুই রেহাই পাইতেছেন না। জো লুই এই প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করুন ইহাই আমাদের কামনা।

কুচবিহার কাপ প্রতিযোগিতা

কলিকাতার অন্যতম বিশিষ্ট ফুটবল প্রতিযোগিতা কুচবিহার কাপের ফাইনাল বা শেষ খেলা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই খেলায় বাঙলার দুইটি বিশিষ্ট দল ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বিশিষ্ট ক্লাবদ্বয়ের মিলনে অনেকেই উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু খেলা দেখিয়া সকলকেই হতাশ হইতে হইয়াছে। খেলায় দর্শনযোগ্য কিছুই ছিল না। অতি সাধারণ শ্রেণীর খেলা বলিলেই চলে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এই খেলায় এক গোলে মোহনবাগান ক্লাবকে পরাজিত করে। ১৯২৪ সালে এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাব মিলিত হয় এবং ইস্টবেঙ্গল এক গোলে বিজয়ী হয়। এই প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইহাই দ্বিতীয় জয়লাভ। গত বৎসর মোহনবাগান ক্লাব এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। প্রতিযোগিতা প্রবর্তনের পর হইতে এই পর্যন্ত মোহনবাগান ক্লাব এই খেলায় যতবার বিজয়ী হইয়াছে কোন ভারতীয় দলের পক্ষেই তাহা সম্ভব হয় নাই। ইহার পরেই এরিয়ান্স ক্লাবের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এরিয়ান্স ক্লাব বর্তমানের একমাত্র ক্লাব যাহারা এই প্রতিযোগিতায় পর পর তিন বৎসর বিজয়ী হইতে পারিয়াছে। ইতিপূর্বে ন্যাশানাল এসোসিয়েশন এই কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছিল। ঐ ক্লাবের বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নাই। ১৮৯৩ সালে প্রথম এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয় এবং ভারতীয় দলসমূহই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার একমাত্র অধিকারী। নিম্নে পূর্ববর্তী বিজয়ীগণের নাম প্রদত্ত হইল:—

১৮৯৩ সাল—ফোর্ট উইলিয়াম আর্সেনাল, ১৮৯৪—ন্যাশানাল, ১৮৯৫-৯৬—ফোর্ট উইলিয়াম আর্সেনাল, ১৮৯৭-৯৯—ন্যাশনাল, ১৯০০—হেয়ার স্পোর্টিং, ১৯০১—ন্যাশনাল ১৯০২—মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯০৩—ন্যাশনাল, ১৯০৪-৫—মোহনবাগান, ১৯০৬—মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯০৭—মোহনবাগান, ১৯০৮—এরিয়ান্স, ১৯০৯—মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯১০—এরিয়ান্স, ১৯১১—প্রতিযোগিতা বন্ধ, ১৯১২—মোহনবাগান, ১৯১৩—প্রতিযোগিতা বন্ধ, ১৯১৪—টেলিগ্রাফ, ১৯১৫—তাজহাট, ১৯১৬—মোহনবাগান ১৯১৭—কুমারটুলি, ১৯১৮-১৯—তাজহাট, ১৯২০— খেলা বন্ধ, ১৯২১-২২—মোহনাবাগান, ১৯২৩—ভবানীপুর, ১৯২৪—ইস্ট-বেঙ্গল, ১৯২৫—মোহনবাগান, ১৯২৬—মেডিক্যাল কলেজ, ১৯২৭—ভবানীপুর, ১৯২৮—মোহনবাগান, ১৯২৯—ভবানীপুর, ১৯৩০—ই বি আর, ১৯৩১—মোহনবাগান, ১৯৩২-৩৪—এরিয়ান্স, ১৯৩৫-৩৬—মোহনবাগান, ১৯৩৭—টাউন ক্লাব, ১৯৩৮—ই বি আর ম্যানসন, ১৯৩৯—এরিয়ান্স, ১৯৪০—স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ১৯৪১—মোহনবাগান।

বোম্বাই রোভার্স কাপ

ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট ফুটবল প্রতিযোগিতা বোম্বাই রোভার্স কাপ অনুষ্ঠিত হইতেছে। মাত্র ১৪টি দল যোগদান করিয়াছে। সৈনিকদল কয়েকটি যোগদান করিয়াছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে কোন বিশিষ্ট দল যোগদান করে নাই। কলিকাতা হইতে বাটা কোম্পানীর দল যোগদান করিয়াছে। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইল সত্য কিন্তু প্রতিযোগিতার বিশিষ্টতা বজায় থাকিল না। এই জন্য পরিচালকগণকে দোষী করা যায় না। সারা ভারতব্যাপী যে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিয়াছে তাহাতে অনেক অঞ্চলের ট্রেন চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইয়াছে। বোম্বাই যাইবার পথে নিশ্চিন্ত মনে যাইবার উপায় নাই। এই জন্যই অনেক বিশিষ্ট দলের যোগদানের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যোগদান করা সম্ভব হইল না। ১৯৪০ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব উক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইয়া বাঙলার ফুটবল দলের যে সম্মান অর্জনে সমর্থ হইয়াছিল বাটা কোম্পানীর দলের খেলোয়াড়গণ সেই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশা হয়। দল শক্তিশালী করিয়া গঠন করা হইতেছে শুনা গেল। সুনাম ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করুক ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

মহালক্ষ্মী স্পোর্টস ক্লাবের খেলোয়াড়গণের সম্বর্ধনা

মহালক্ষ্মী কটন মিলের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের মিলের স্পোর্টস ক্লাবের খেলোয়াড়গণ ট্রেডস কাপ ও উইলিয়াম ইয়ঙ্গার কাপ প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করায় খেলোয়াড়গণকে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্বর্ধনা করেন। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। একটি করিয়া প্যান্ট, জার্সী ও কোট উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয় ভূরি ভোজনের পর। বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী ও সাংবাদিকগণকেও এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। উক্ত ক্লাবের যিনি পরিচালক বা প্রাণস্বরূপ শ্রীযুত রাখাল দত্তকেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। মিলের কর্মচারীদের প্রতি এইরূপ সম্মান প্রদর্শন ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় মিলের কর্তৃপক্ষগণ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। মহালক্ষ্মী কটন মিলের কর্তৃপক্ষগণ সেই হিসাবে এক নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাতে কর্মচারিবৃন্দ যে উৎসাহলাভও করিলেন, তাহা ভবিষ্যতে উক্ত কোম্পানীকে সকল বিষয়ের উন্নতিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। মহালক্ষ্মী কটন মিলের কর্তৃপক্ষগণের ন্যায় ভারতীয় অন্যান্য মিলের কর্তৃপক্ষগণ যদি কর্মচারীদের সহিত সমভাবে দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ প্রকাশ করেন, তবে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় মিল কর্মীদের মধ্যে যে দুষ্ট আবহাওয়া অবলোকন করিয়া আমরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া থাকি তাহা বিদূরিত হইয়া নূতন এক আনন্দদায়ক সমাজ সৃষ্টি করিবে।

৮ই সেপ্টেম্বর

গত ২৯শে আগস্ট তারিখে ৫ হাজারের অধিক লোকের এক জনতা বোলপুর রেল স্টেশন আক্রমণ করে এবং রেলওয়ে সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। জনতার মধ্যে সাঁওতাল, হিন্দু ও মুসলমান ছিল এবং উহারা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। একজন রেল পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, একজন দারোগা এবং আটজন কনেষ্টবল ইষ্টক বর্ষণে আহত হয়। পুলিশের গুলী চালনায় সাতজন আহত হয়।

গতকল্য শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়কে বাঙালোরে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখিবার জন্য সেণ্ট্রাল জেলে প্রেরণ করা হয়।

কলিকাতায় কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে একখানি ট্রামগাড়ী ভস্মীভূত করা হয়।

৯ই সেপ্টেম্বর

শিলিগুড়ীতে এক বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলী বর্ষণের ফলে ৪ জন নিহত ও ১০।১২ জন লোক আহত হইয়াছে। উক্ত জনতা একটি মিছিল করে এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করিয়া স্থানীয় থানা আক্রমণের চেষ্টা করে। পুলিশ মহকুমা হাকিমের আদেশানুযায়ী গুলী চালায়।

উত্তর কলিকাতায় হাতিবাগানের সন্নিকটে গ্রে স্ট্রীটের উপর একখানি ট্রামগাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। ফলে ট্রামগাড়ীখানি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়।

বোম্বাইয়ের সাতারা জেলার খাটভ তালুকে এক জনতা কাছারী আক্রমণ করিলে পুলিশ গুলী চালায়। ফলে চারিজন নিহত ও তেরজন আহত হয়।

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলের বন্দীরা জেল কর্মচারীদের উপর আক্রমণ চালাইয়া জেল হইতে বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করে এবং ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও কার্ডিং মাষ্টারকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের দুইজনকেই জীবন্ত দগ্ধ করে। জেল কর্মচারীদের মধ্যে ৩ জন নিহত হয়। গুলী চালানার ফলে বন্দীদের ২৮ জন নিহত এবং ৮৭ জন আহত হয়।

বোম্বাইয়ে পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতার উপর চারিবার গুলী চালনা করে। ফলে চারিজন আহত হয়। অদ্য বোম্বাইয়ে ১৫৬ জন নারী ও দুই শত পুরুষকে গ্রেপ্তার করা হয়।

যুক্ত প্রদেশে ১,৪৩,৬০০৲ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে।

১০ই সেপ্টেম্বর

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল কমন্স সভায় ভারত সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন যে, ভারতের অবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বর্তমান আন্দোলনে এ যাবৎ ৫ শতেরও কম লোক মারা গিয়াছে। তিনি বলেন যে, কংগ্রেস ভারতের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নহে। ইহা ভারতের অধিকাংশের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নহে। জনগণের, এমনকি ইহা হিন্দু জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নহে। ইহা ব্যবসাদার ও পুঁজিওয়ালাদের সাহায্যপুষ্ট একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। এই কংগ্রেসের সহিত বৃটিশ ভারতের ৯ কোটি মুসলমানের, ৫ কোটি অনুন্নত অথবা অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের এবং দেশীয় রাজ্যের সাড়ে নয় কোটি প্রজার মৌলিক বিরোধ আছে।

এলাহাবাদে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী ও মিঃ ফিরোজ গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর দুমকার ২০ মাইল পূর্বে পলাসী নামক স্থানে সৈন্যদল ও পুলিশ এক জনতার উপর গুলী চালায়। জনতা একটি মদের দোকান পুড়াইয়া দিতেছিল। গুলী চালনায় তিনজন নিহত হয়।

১১ই সেপ্টেম্বর

গত ৯ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ের পশ্চিম খান্দেশ জেলার অন্তর্গত নানদারবার নামক স্থানে পুলিশের গুলী বর্ষণের ফলে ৪ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হইয়াছে। বিক্ষোভ প্রকাশকালে একজন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরকে ছোরা মারা হয়। গতকল্য কোলাবা জেলায় বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী আক্রান্ত হয়।

দুমকা সদর মহকুমায় এক অশান্ত জনতার প্রতি গুলী বর্ষণ করা হয়। ফলে কয়েকজন হতাহত হইয়াছে। দেওঘর ও দুমকা মহকুমায় কয়েকজন কংগ্রেসকর্মীকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১২ই সেপ্টেম্বর

কমন্স সভায় ভারত সম্পর্কিত বিতর্কের জবাব দান করিতে গিয়া ভারত সচিব মিঃ আমেরী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। ভারতে গণবিক্ষোভ সম্পর্কে মিঃ আমেরী জানান যে, তিনশতের মত রেল ষ্টেশনের উপর আক্রমণ চালান হয় এবং কমপক্ষে ২৪ খানি রেলগাড়ী লাইনচ্যুত করার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিহার প্রদেশেই এই গোলযোগের সমধিক প্রচণ্ডতা পরিলক্ষিত হয়।

উক্ত প্রদেশে ৬৫ খানি থানার উপর আক্রমণ চালান হয় এবং ৪০ খানি থানা ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়।

মেদিনীপুরের সংবাদে প্রকাশ যে, তমলুক হইতে পাঁচ মাইল দূরে দুই তিন হাজার লোকের এক বিরাট জনতা গত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে দনীপুর চাউলের কল আক্রমণ করিতে যাইলে পুলিশ গুলীবর্ষণ করে। জনতা ঐ মিলের ফটক ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং মিলের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে—তাহারা পুলিশ ও মিলের মালিকদের তাড়া করে। পুলিশ গুলী বর্ষণ করে। মোট ২৫ রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করা হয়। তিনজন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়।

গত রাত্রিতে বজবজে উপকূলরক্ষী বাহিনীর সৈনিকগণের মধ্যে ব্যক্তিগত কারণে একটি বিবাদ বাধে। অতঃপর একজন সৈনিক তাহার রাইফেল হইতে গুলী ছোড়ে বলিয়া প্রকাশ। ফলে তাহার দলের তিনজন সৈনিক নিহত এবং সাতজন আহত হয়।

যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর কানপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য করিয়াছেন।

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ সাব জেলের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ৭৬ জন বন্দী চলিয়া গিয়াছে।

বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত মোহনলাল সকসেনাকে লক্ষ্ণৌয়ে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কলিকাতার সমস্ত সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অনুমোদিত কলেজ এবং উহাদের হোষ্টেল ও মেসগুলি ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে পূজাবকাশ পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

১৩ই সেপ্টেম্বর

আমেদাবাদে মহিলা দিবস উপলক্ষে মহিলাগণ শোভাযাত্রা বাহির করিলে পুলিশ তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করে। কোনও কোনও স্থানে কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করিতে হয়। গোলেমদার নিকটে পুলিশের উপর প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়। জনতার উপর পুলিশ গুলী চালায়। ফলে একজন আহত হয়।

গতকল্য সন্ধ্যায় কানপুর কালেক্টরী ভবনের একটি কক্ষে

আগুন জ্বলিতে দেখা যায়। প্রকাশ, আগুনে বোমা ধরণের কোনও দ্রব্য ঐ কক্ষে পাওয়া গিয়াছে।

১৪ই সেপ্টেম্বর

বাঙলা—গতকল্য এক জনতা কালনা ডাকঘর ও ডাক বাংলোতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। বর্ধমান হইতে ছয় মাইল পূর্বে বর্ধমান-কালনা রোডের উপর কালিয়ারা ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসের কাগজপত্র ভস্মীভূত হইয়াছে। মাদারীপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় গোলযোগ চলিতেছে। ঢাকায় বিভিন্ন স্থানের টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটা হইয়াছে। গত ৯ই সেপ্টেম্বর রাজসাহীতে এক বিরাট জনতা রাজসাহীর বোয়ালিয়া থানা ঘিরিয়া ফেলে—পুলিশের লাঠি চার্জে বহুলোক আহত হয়। জনতা রাজসাহী সেন্ট্রাল জেল আক্রমণের চেষ্টা করে।

বিহার—গত সপ্তাহে লাহেরিয়াসরাই স্টেশনে পুলিশের গুলী চালনায় তিনজন নিহত হইয়াছে। মুঙ্গের জেলায় প্যাসেঞ্জার ট্রেণ চলাচল বন্ধ আছে। মুঙ্গের জেলায় মানসী রেলওয়ে স্টেশন লণ্ডভণ্ড ও অগ্নিদগ্ধ করা হইয়াছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ভাগলপুর ত্যাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

আসাম—শিলংয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, দরঙ্গ, কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলার 'শান্তিসেনা' নামক প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। নওগাঁ জেলার কতকগুলি মৌজাতে ৬৭ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য হইয়াছে। সম্প্রতি বে-আইনী ঘোষিত সুরমা উপত্যকা ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত শিবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস এম এল এ গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বাঙলার গবর্ণর স্যার জন হার্বার্ট বাঙলার উভয় আইনসভার এক যুক্ত অধিবেশনে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সরকারী কংগ্রেস দল তাঁহাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহাতে যোগদান করেন নাই।

নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। কংগ্রেস দলের সদস্যগণ অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে যুদ্ধ সংক্রান্ত যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য এডোয়ার্ড বেন্থল বলেন যে, সাম্প্রতিক গোলযোগের ফলে রেলওয়ের কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই; ক্ষতির পরিমাণ সম্ভবত এক কোটি টাকার কম হইবে না। অনুরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে স্যার গুরুনাথ বেউর জানান যে, এ পর্যন্ত যে সমস্ত রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তৎসমুদয় হইতে জানা যায় যে, লুণ্ঠিত অর্থ ও স্ট্যাম্প বাবদ ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ টাকা। অদ্য কেন্দ্রীয় পরিষদ ভবনের দ্বারে শত শত ছাত্রছাত্রী প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বহু ছাত্রছাত্রীকে গ্রেপ্তার করিয়া লরীতে তুলিয়া সরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়।

১০ই সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—স্ট্যালিনগ্রাদের পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। নভরোসিস্ক এলাকায় যুদ্ধ প্রচণ্ডতর হইয়া উঠে। জার্মানরা শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে রুশ ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হয়।

পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের হেড কোয়ার্টার্স হইতে ঘোষণা করা হয় যে, জাপানীরা নিউগিনির ওয়েন স্ট্যানলি পর্বত এলাকায় প্রতিপক্ষের ব্যূহে প্রবেশের কৌশল অবলম্বন করিয়া প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। জাপানীরা কিছু অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহারা এখন পোর্ট মোরসবি হইতে মাত্র ৪৪ মাইল দূরে আছে।

বৃটিশ বাহিনী অদ্য মাদাগাস্কারের পশ্চিম উপকূলের বন্দরে আক্রমণ চালায়। বিরাট এক নৌবহর একই সঙ্গে মাদাগাস্কারের পশ্চিম উপকূলের বন্দর মাজুঙ্গা, দিয়েগো-সুয়ারেজের ১২০ মাইল দক্ষিণে আম্বাজা এবং মাজুঙ্গার ৩৪০ মাইল দক্ষিণে মোরানদাভার উপর আক্রমণ চালায়।

১১ই সেপ্টেম্বর

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের হেড কোয়ার্টার হইতে ঘোষণা করা হয় যে, ওয়েন স্ট্যানলি এলাকায় জাপানীদিগকে সাময়িকভাবে রুখিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত এলাকায় ঘোরতর সংগ্রামের ফলে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, স্ট্যালিনগ্রাদের পশ্চিমে রুশরা ৩টি জনবসতিপূর্ণ এলাকা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। একদল জার্মান ট্যাঙ্কবাহী সৈন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ ভূমি দখল করিয়াছে। গত ১২ ঘণ্টার মধ্যে স্ট্যালিনগ্রাদ রণাঙ্গনে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নভরোসিস্ক-এ জার্মানরা শহরের উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

১২ই সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, বহু দিন তুমুল যুদ্ধ করিবার পর সোভিয়েট সৈন্যগণ নভোরাসিস্ক ত্যাগ করিয়াছে। স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সোভিয়েট বাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া জার্মানদিগকে আবার পূর্ব স্থানে ঠেলিয়া দিয়াছে। মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, আরও বহুসংখ্যক নূতন জার্মান ও ইতালীয়ান ডিভিসন পৌঁছানোতে স্ট্যালিনগ্রাদের বিপদাশঙ্কা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে বলা হয় যে, স্ট্যালিনগ্রাদের পশ্চিমে উভয়পক্ষ তুমুল যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়াছে—এক ঘণ্টার জন্যও যুদ্ধের বিরাম হইতেছে না। স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে জার্মানদের অগ্রগতি প্রতিহত হইয়াছে। লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনে সিনটাভিনো নামক স্থানে জার্মানরা ভীষণভাবে পরাজিত হইয়াছে। মস্কো বেতারে প্রকাশ, সোভিয়েট বাহিনী গ্রজনী তৈলখনি অঞ্চল হইতে ৬০ মাইল দূরে টেরাক নদীর তীরবর্তী রণাঙ্গনে কতকগুলি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ উচ্চভূমি পুনরধিকার করিয়াছে।

১৪ই সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, স্ট্যালিনগ্রাদের প্রবেশ দ্বারে সোভিয়েট সৈন্যেরা দৃঢ়তার সহিত ফন বকের বাহিনীকে বাধা দিতেছে। ভলগাকে পিছনে রাখিয়া তাহারা ক্রমবর্ধমান এই বাহিনীর গতি প্রতিরোধ করিতেছে। শহরের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অর্ধ চন্দ্রাকারে জার্মান বাহিনী শহরের নিকটবর্তী হইতেছে।

গতকল্য সোভিয়েট বোমারু বিমানবহর জার্মানী ও রুমানিয়ার বিভিন্ন স্থানে বোমা বর্ষণ করে।

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ৯ই আশ্বিন, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 26th September, 1942 [৪৬শ সংখ্যা

হীরেন্দ্রনাথ—

গত ৩০শে ভাদ্র মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরলোকগমন করিয়াছেন। বাঙালী জাতির বড়ই দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে। এক বৎসর পূর্বে আমরা রবীন্দ্রনাথকে হারাইয়াছি; আজ বাঙালী জাতির অন্যতম গৌরবস্থল হীরেন্দ্রনাথকে আমরা হারাইলাম। বাঙলার আকাশ হইতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের পতন ঘটিল। হীরেন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে বাঙলা দেশের গত অর্ধ শতাব্দীকালের ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা দেশে দেশমাতৃকার সাধনায় যে যজ্ঞানল প্রজ্জ্বলিত করেন, তাহার মন্ত্রধ্বনি হীরেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে। বাঙলা দেশ এবং বাঙলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হীরেন্দ্রনাথ প্রণোদিত হন। ভারতের নিজস্ব সম্পদ বেদ বেদান্ত, উপনিষদ পুরাণ-সমূহের অন্তর্নিহিত উদার আদর্শকে হীরেন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন বাঙলা ভাষার ভিতর দিয়া জাতির নিকট প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হীরেন্দ্রনাথ এই দিক হইতে জ্ঞানযোগী ছিলেন; কিন্তু কর্ম-যোগের দিক হইতেও তাঁহার জীবন বাঙলার ইতিহাসের রাজ-নীতিক অধ্যায়কে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বিগত স্বদেশী আন্দোলনের সময় হীরেন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, ডাক্তার এনি বেসান্ট, লোকমান্য তিলক—ইঁহাদের সহকর্মিস্বরূপে বলিষ্ঠ জাতীয়তার পথে স্বাধীনতা লাভের প্রেরণা জাতির রাজনীতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে ব্রতী হন। জাতীয় শিক্ষা এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে হীরেন্দ্রনাথ তখন যেসব বক্তৃতা প্রদান করেন, সেগুলি সমগ্র দেশে নব ভাবের স্রোত প্রবাহিত করিতে সাহায্য করে। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া জাতি নিজের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হয়। হীরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা ছিল; তিনি অকাট্য যুক্তির কৌশলে প্রতিপক্ষের মর্মে কঠোরভাবে আঘাত করিতে জানিতেন। সিদ্ধান্ত ছিল তাঁহার সুস্পষ্ট। শ্রোতাদের মনকে অভ্রান্তভাবে নিজের মতের অনুকূলে আনিবার পক্ষে তাঁহার বক্তৃতার প্রভাব ছিল অসামান্য। কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ শুধু বক্তাই ছিলেন না; প্রকৃতপক্ষে কথা তাঁহার জীবনে কোন-দিনই বড় ছিল না, বড় ছিল কাজ। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে হীরেন্দ্রনাথের একটি বড় কাজ হইল জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের জন্য তাঁহার সাধনা। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ প্রতিষ্ঠার সময় হইতে হীরেন্দ্রনাথ অন্যতম উদ্যোক্তা হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং বাঙলার রাজনীতিক জীবনের বহু বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া জীবনের শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের তিনি সেবা করিয়া গিয়াছেন। হীরেন্দ্রনাথের জীবনের অপর একটি বড় কাজ হইল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্পর্কে তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনা। এই প্রতিষ্ঠানেরও প্রথম হীরেন্দ্রনাথ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সমগ্র বাধাবিঘ্ন ও বিপদ আপদের মধ্য দিয়া তিনি সাহিত্য-পরিষদকে দেশ ও জাতির গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনের প্রায় সবগুলিতেই হীরেন্দ্রনাথ যোগদান করিয়াছেন এবং এতৎ-সম্পর্কিত সকল কাজেই তিনিই ছিলেন অগ্রণী। গত ২২শে শ্রাবণ কলিকাতা টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের যে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়, শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও হীরেন্দ্রনাথ সে সভায় পৌরোহিত্য করেন। তিনি যে এত সত্বরই আমাদের মধ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন, আমরা সেদিনও তাহা মনে করিতে পারি নাই। প্রকৃতপক্ষে হীরেন্দ্র-নাথের মৃত্যু বাঙলার ইতিহাসে একটা বিপর্যয়কর ব্যাপার। বাঙলা দেশের সাহিত্য, বাঙলার সভ্যতা এবং বিশিষ্ট সংস্কৃতির ভিত্তিতে বলিষ্ঠ জাতীয়তা বিকাশের যে ধারা এতদিনও প্রবাহিত হইতেছিল, তাঁহার মৃত্যুতে তাহা ছিন্ন হইতে বসিল। হীরেন্দ্র-নাথের সাধনা, বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে—বিশেষভাবে এদেশের আধ্যাত্মচিন্তারাজ্যে হীরেন্দ্রনাথের অসামান্য অবদান তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

হীরেন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ—

রাজনীতিক চিন্তা সাধনায় হীরেন্দ্রনাথ বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং পরানুকরণমূলক আদর্শবাদকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এক একটা জাতি নিজস্ব বিশিষ্ট আদর্শে গড়িয়া উঠে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তাঁহারও এই বিশ্বাস ছিল যে, ধর্মের সহিত যে রাজনীতির সম্পর্ক নাই, ভারতের মাটিতে সে জিনিষের স্থান হইবে না। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার নীতিতে হীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন না। লোকমান্য তিলক এবং শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় গীতার আদর্শের উপর তাঁহার রাজনীতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং হিংসা ও অহিংসা এই দুইয়ের ঊর্ধ্বে লোকসেবার বৃহত্তম আদর্শ প্রভাবে আত্মনিবেদনের প্রেরণাকেই তিনি রাজনীতির সকল উন্নতির মূলীভূত শক্তি বলিয়া মনে করিতেন। হীরেন্দ্রনাথ বৈদান্তিক ছিলেন। তাঁহার বেদান্ত-সাধনা গীতার সমন্বয়বাদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি সকল পথে মানব-জীবনের অন্তর্নিহিত পরম সত্যকে একান্তভাবে উপলব্ধিকেই তিনি বড় বলিয়া বুঝিতেন এবং এই দিক হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্যস্বরূপে হীরেন্দ্রনাথ কৃষ্ণতত্ত্বকে জীবন দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' নামক বিখ্যাত পুস্তকে হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার দার্শনিক চিন্তার ধারাকে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি একাধারে কর্মী, জ্ঞানী এবং ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। সর্বোপরি তিনি ভারতের বিশিষ্ট ভাবধারার ভাবুক এবং প্রাণবান জাতীয়তাবাদী পুরুষ ছিলেন। হীরেন্দ্রনাথকে হারাইয়া বাঙলা দেশের, শুধু বাঙলা কেন, সমগ্র ভারতের যে ক্ষতি ঘটিল, তাহা পূরণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং হীরেন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

জ্ঞানী ও গুণিগণের স্বরূপ—

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের মুখে ভারতের বড়লাটের শাসন পরিষদের জ্ঞানী ও গুণিগণের গুণ-গরিমার কথা শুনা গিয়াছিল তাহা ভারতের সর্বত্র এতদিনে ব্যক্ত হইয়াছে এবং ভারত সচিবের মুখে প্রশংসিত এই সব 'স্বদেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী'দের জলুষের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সেদিন ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনীতিক অবস্থা সম্পর্কিত বিতর্কের আসরে স্যার সুলতান আহম্মদ, ডাক্তার আম্বেদকর এবং শ্রীযুক্ত মাধবশ্রীহরি আণে এই ত্রিরত্ন যে আলো ছড়াইয়াছেন, তাহাতেই একাদশ রত্নের আর আর লুকানো মাণিকের স্বরূপ বুঝিয়া লওয়া গিয়াছে। এই ত্রিরত্নের বক্তৃতার তাপেই জাতীয়তাবাদে জাগ্রত ভারতের চিত্ত যথেষ্ট উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং অবশিষ্ট আটজনের আর মুখ বাড়াইয়া কথা বলিবার সুযোগ থাকিবে না। সেদিন পরিষদের আসরে বক্তৃতায় অবতীর্ণ ত্রিরত্নের মধ্যে দুইজন, স্যার সুলতান আহম্মদ এবং ডাক্তার আম্বেদকর—ইঁহাদের গুণ আমাদের পূর্ব হইতে জানা ছিল; সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে নূতন বুঝিবার বা জানিবার বিশেষ কিছুই নাই। স্যার সুলতান আহম্মদ বহুদিন হইতেই আমলাতন্ত্রের আবহাওয়ার মধ্যে পুষ্ট এবং পরিবর্ধিত। দীর্ঘ দাসমনোবৃত্তির প্রভাবে তাঁহার মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া যাইবে এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবীতে তাঁহার ন্যায় ক্ষীণপ্রাণ ব্যক্তি যে শিহরিত হইয়া উঠিবেন ইহা স্বাভাবিক; ডাক্তার আম্বেদকরও বহু সাধ্যসাধনার পর এবং দেশের জাতীয় সংহতির ক্রমাগত শত্রুতা সাধন করিয়া এতদিনে প্রভুদের কৃপায় হাতে স্বর্গ পাইয়াছেন, সুতরাং অন্ধ প্রভুভক্তির আবেগে তিনি যে বেহায়াপনা দেখাইতে পশ্চাৎপদ হইবেন না, ইহাও বুঝা যায়; কিন্তু শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আণের আচরণ সকলকে বিক্ষুব্ধ এবং বিস্মিত করিয়াছে। শ্রীযুক্ত আণে বহুদিন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এখনও তিনি লোকমান্য তিলকের অনুগামী বলিয়া নিজকে পরিচয় দেন। আমলাতন্ত্রের বিষাক্ত পরিমণ্ডলের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার যে নৈতিক অধোগতি ঘটিয়াছে, তাহা সত্যই শোচনীয়। ভারতের কোন দলই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত-সম্পর্কিত বর্তমান নীতিকে সমর্থন করিতে পারিতেছেন না এমন কি যাঁহারা শ্বেতাঙ্গ, তাঁহারাও প্রকাশ্যভাবে তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন অথচ দেশসেবার সকল অতীত স্মৃতি ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া শ্রীযুক্ত আণে সেই নীতির সমর্থন এবং সেই নীতি অনুসরণের জন্য আস্ফালন করিয়াছেন। অধঃপতন ইহার চেয়ে আর কতদূর হইতে পারে? কিন্তু ইঁহাদের এই অধঃপতন জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে বিমলিন করিতে সমর্থ হইবে না। সমগ্র দেশ ও জাতির জাগ্রত জনগণের ধিক্কার ইঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিবে এবং পরানুগ্রহপুষ্ট ইঁহাদের ন্যায় জীবের সকল বাধা লঙ্ঘন করিয়াই জাতি স্বমহিমার বলিষ্ঠ সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। মান, যশ এবং প্রতিষ্ঠার দায়ে আত্মপ্রতারণাকারীদের জন্য সব দেশে এবং সব জাতিতে যে স্থান নির্ণীত হইয়া থাকে, ইঁহারাও সেই স্থান লাভ করিবেন।

শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য—

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব ম্যাক্সওয়েল সাহেব জানান যে, "গ্রেপ্তার হওয়ার সময় তাঁহার যে ওজন ছিল, বর্তমানে তাঁহার ওজন তদপেক্ষা কম," "সন্ধ্যার দিকে শরৎচন্দ্রের শরীরের উত্তাপ সামান্য বৃদ্ধি পায়," "মারকারায় অত্যধিক বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে শ্রীযুত বসুর স্বাস্থ্য কিছু খারাপ হইয়াছে।" স্বরাষ্ট্র সচিবের মতে ইহাতে উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই, কারণ ডায়াবিটিস থাকিলে স্বাস্থ্য যে ভাল থাকিবে না, ইহাতে আর আশ্চর্য কি?" সত্যই ত; বিচারের বালাই যেখানে নাই, কেন আটক করা হইল, সে সম্বন্ধে প্রমাণসাপেক্ষ কৈফিয়তের যেখানে অপেক্ষা নাই, সেখানে সকলই সম্ভব। সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী এবং জনরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু জানান যে, বাঙলা সরকার শরৎচন্দ্রের মুক্তির জন্য চেষ্টার ত্রুটি

করেন নাই। প্রথমত তাঁহারা প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার বিচার প্রার্থনা করেন, ইহা সম্ভব না হইলে বাঙলা দেশের কোন জেলে তাঁহাকে প্রেরণ করিতে বলেন, তাহাও অসম্ভব হইলে, অন্ততঃ-পক্ষে শরৎচন্দ্রকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া রাখিতে অনুরোধ করা হয়; কিন্তু ভারত সরকার ইহার কোন প্রস্তাবেই রাজী হন নাই। শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে ভারত সরকারের এই-রূপ ভ্রূক্ষেপহীনতা মানবতার দিক হইতেও আপত্তিজনক। তাঁহার সম্বন্ধে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের সমস্ত অনুরোধ নির্বিকারচিত্তে ভারত সরকার যেভাবে উপেক্ষা করিতেছেন, তাহাতেই তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ উন্মুক্ত হইয়াছে।

শোক সংবাদ—

মনীষী হীরেন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইজন বিশিষ্ট বাঙালীর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক ডাক্তার হীরালাল হালদার এবং নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাক্তার হালদার আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। দার্শনিক এবং দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে বাঙলার বাহিরেও তাঁহার খ্যাতি বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলার মনীষী সমাজের গুরুতর ক্ষতি ঘটিল। নাট্যকার এবং অভিনেতা হিসাবে যোগেশচন্দ্র খ্যাতিলাভ করিয়া-ছিলেন। 'সীতা' নাটক লিখিয়া তিনি যথেষ্ট সুযশ অর্জন করেন। আমরা ইঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শিক্ষকদের দুর্দশা—

কলিকাতা শ্যামবাজার টাউন স্কুলের ১১ জন শিক্ষককে সম্প্রতি বিনাবেতনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি দেওয়া সম্প্রতি বিনাবেতনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি লইতে বাধ্য করা হইয়াছে অর্থাৎ ইঁহাদের চাকুরী গিয়াছে। রাধারমণ সরকার মহাশয় ইঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি সেদিন আকস্মিকভাবে রাজপথে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সুদীর্ঘকাল একই স্কুলে দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষকতা করিবার পর ৫৫ বৎসর বয়সে হঠাৎ বেকার অবস্থায় পতিত হইয়া রাধারমণবাবু অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই দুশ্চিন্তার ফলেই সম্ভবত তাঁহার এমন শোচনীয় মৃত্যু ঘটিল। রাধারমণবাবু যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কলিকাতা এবং শহরতলীর বহু শিক্ষক বর্তমানে সেইরূপ বিপন্ন অবস্থায় পড়িয়াছেন। কলিকাতায় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইবার পর শিক্ষকদের বেকার-সমস্যার সমাধান সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই; অথচ বহু পূর্বেই এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল। কিছুদিন পূর্বে বাঙলা সরকার এই ঘোষণা করেন যে, বিপজ্জনক অঞ্চল হইতে বিদ্যালয় সমূহ স্থানান্তর এবং ছাত্রদিগের ও শিক্ষকদের ব্যয় নির্বাহের আনুকূল্য করিবার পরিকল্পনায় সরকার ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন, কিন্তু যে কারণেই হউক গভর্নমেন্টের সে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় নাই। শিক্ষকদের এই বেকার সমস্যার প্রতিকার করিবার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা উচিত, এ সম্বন্ধে একথা অনেকেরই মনে উঠিবে। সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলার শিক্ষা সচিব খান বাহাদুর আবদুল করিম জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাতে পূজার পূর্বে শিক্ষকদের বেতন দিতে পারে, সেইজন্য বাঙলা সরকার ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবেন। এ সিদ্ধান্তে সকলেই খুসী হইবেন। শিক্ষামন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, মফঃস্বলের জরুরী অঞ্চলসমূহের সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, বর্তমানে জরুরী অঞ্চল ছাড়াও বাঙলা দেশের অনেক স্থানের বেসরকারী স্কুলসমূহের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। আমরা আশা করি, সেগুলির আর্থিক সাহায্যের সম্বন্ধেও কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন। দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়া বিনা বেতনে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য শিক্ষকদিগকে ছুটি লইতে বাধ্য করিবার মত অসঙ্গত ব্যবস্থা যাহাতে কোথায়ও অবলম্বিত না হয়, এবং যাঁহাদের সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাঁহাদের চাকুরী যাহাতে না যায় কিংবা চাকুরী গিয়াছে এই অজুহাতে তাঁহারা যাহাতে সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত না হন, আমরা সেজন্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

পরলোকে হরদয়াল নাগ—

বাঙলার বর্ষীয়ান জননায়ক হরদয়াল নাগ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। নাগ মহাশয়ের জীবন দেশপ্রেমের প্রবল প্রেরণায় প্রণোদিত কর্মময় জীবন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে চাঁদপুরের নেতাস্বরূপে নাগ মহাশয় তাঁহার অগ্নিময়ী বাণীতে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। তাহার পর বাঙলার বুকের উপর দিয়া রাজনীতিক বিপর্যয়ের অনেক স্রোত বহিয়া গিয়াছে; অনেক নেতার রাজনীতিক মতের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে; কিন্তু নাগ মহাশয়ের মতের কোন দিন পরিবর্তন ঘটে নাই। পরাধীনতার সঙ্গে তিনি কোন দিন আপোষ-নিষ্পত্তি করেন নাই। বৈদেশিক প্রভাব-বিনির্মুক্ত পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শকে তিনি নিজের কোন কাজে ম্লান হইতে দেন নাই। বহু বাধাবিঘ্ন, বিপুলে ত্যাগবলে পরাভূত করিয়া নাগ মহাশয় দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শকে অনির্বাণ রাখিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যেও আমরা তাঁহাকে যেমন অকুতোভয় লক্ষ্য করিয়াছি, পরবর্তী রাজনৈতিক সকল আন্দোলনের ভিতরই তিনি তেমনই অকুতোভয়তার সঙ্গে সাধনার বলিষ্ঠ ধারাটি সমভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এ দেশে মানুষ আছে সত্য, কিন্তু মান যশে যিনি গলেন না, বিঘ্ন বিপদে যিনি দমেন না, আঘাতের উপর আঘাতের মধ্যে সমান অচঞ্চলভাবে যিনি মাথা উঁচু রাখিতে পারেন এমন লোক লক্ষের মধ্যে একজন পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। নাগ মহাশয় লক্ষের মধ্যে এমন একজন মানুষ ছিলেন। কর্মময় গৌরবময়

জীবনের দীর্ঘ ব্রত উদ্যাপন করিয়া তিনি নবতি বর্ষ বয়সে আমাদের ভিতর হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে; কিন্তু আমাদের তবু শোকের কারণ আছে। আমরা এমন একজন শক্ত মানুষ আর সহজে পাইব না। এ দেশে প্রয়োজন এইরূপ শক্ত মানুষের—প্রয়োজন তাঁহার ন্যায় পৌরুষ এবং বীর্যবত্তার। নাগ মহাশয়ের বলিষ্ঠ জীবন, আদর্শের সাধনায় তাঁহার অধৃষ্য এবং অনমনীয় নিষ্ঠা আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে উদ্বুদ্ধ করুক।

আপোষ-নিষ্পত্তির চেষ্টা—

হিন্দু মহসভার নেতৃগণ বর্তমান রাজনীতিক সমস্যার আপোয-নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য বন্দী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কবিবার জন্য বড়লাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বড়লাট তাঁহাদিগকে সে অনুমতি দান করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন; কিন্তু মহাসভার নেতারা এখনও নিরাশ হন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন, ভারতের সকল দল যদি এক হইয়া একটা দাবী উপস্থিত করেন, তবে ভারতের রাজনীতিক আবহাওয়া এমন আকার ধারণ করিবে যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সে ক্ষেত্রে ভারতের দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। ভারতের রাজনীতিক আবহাওয়ার জন্য যদি বাধ্য হইতে হয়, সে কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু বাধ্য না হইলে যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিয়া লইবেন ইহা মনে হয় না। তাঁহাদের সে মতলব যে নাই, 'স্টেটসম্যান' পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক মিঃ আর্থার মুর সে কথাটা ঐতিহাসিক যুক্তি-পরম্পরা সহকারে অকাট্যভাবে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দান করিবার অভিপ্রায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কোন দিনই নাই। ভারতের সাম্প্রদায়িক অনৈক্য এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের একটা অজুহাত মাত্র; প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করিতেন না। মনোবৃত্তির অনমনীয়তা যেখানে এতখানি সেখানে আপোষ-আলোচনার কোন চেষ্টা সার্থক হইতে পারে না; তবু চেষ্টা চলিতেছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক এই চেষ্টার সম্পর্কে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে বিভিন্ন রাজনীতিক দলের নেতৃবৃন্দকে লইয়া একটি সম্মেলন আহবান করিবেন শুনা যাইতেছে। ইতিমধ্যে ইহাও প্রকাশ যে মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের নিকট একখানা চিঠি দিয়াছেন এবং সে চিঠিতে ভারতের দাবী মানিয়া লইবার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে পুনরায় অনুরোধ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী যে দাবী, অর্থাৎ কংগ্রেসের যে দাবী বর্তমান ক্ষেত্রে ভারতের সকল রাজনীতিক দলের সকলেরই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবার সেই একই দাবী। ভারত-প্রবাসী শ্বেতাঙ্গগণ পর্যন্ত ভারতের অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এই দাবী সমর্থন করিতেছেন; কিন্তু তাহাতে কি হইবে? ভারতে থাকিয়া ভারতের অবস্থা ইঁহারা যতটা বুঝেন তাহার চেয়ে বেশী বুঝেন, সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে মিঃ চার্চিল ও আমেরী সাহেবের দল এবং তাঁহাদের উত্তর সাধক স্যার সুলতান আহম্মদের স্বমুখের পরিচয়েই যাহারা নিজেরা নিজেদের প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কাহারও প্রতিনিধি নহেন, সেই বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যগণ। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বর্তমান মতিগতির যতদিন পর্যন্ত পরিবর্তন সাধিত না হইবে ততদিন ভারত সরকারের নীতির কোন পরিবর্তন ঘটিবারও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং একান্ত যাহারা আশাশীল, তাঁহারা যাহাই বলুন, অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান সমস্যার সমাধানের কোন সম্ভাবনা আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

বাঙলার খাদ্য সমস্যা—

সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বাঙলা দেশের খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনাকালে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী বলেন, কেবল বাঙলা দেশের পক্ষেই যে আজ এই সমস্যা দেখা দিয়াছে ইহা নয়, সিংহল এবং ভারতের অন্য কয়েকটি অঞ্চলেও চাউলের অনাটন ঘটিয়াছে। বাঙলা গভর্নমেন্ট ভারত গভর্নমেন্টকে জানাইয়াছিলেন যে, বাঙলা দেশে যথেষ্ট পরিমাণ চাউল নাই। ভারত গভর্নমেণ্ট মানবতার দিক হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে চাউল দিয়া সাহায্য করিবার জন্য বাঙলা গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করেন। বাঙলা দেশের এই চাউলের অভাবের কথা ভারত সরকার জানানো সত্ত্বেও ফল কি হইবে আমরা জানি না। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী এইটুকু আশ্বাস আমাদিগকে দিয়াছেন যে, বাঙলা দেশে চাউলের অভাবজনিত সমস্যা সত্যই বড় জটিল আকার ধারণ করিয়াছে; এই সমস্যা সমাধানের জন্য যতটা চেষ্টা করা সম্ভব, তাঁহারা তাহাতে ত্রুটি করিবেন না। আমরা আশা করি, বর্তমানে চাউলের এই সঙ্কটকলে বাঙলা দেশের বাহিরে বাঙলা দেশ হইতে যাহাতে চাউল পাঠাইতে না হয়, মন্ত্রীরা তৎপ্রতি সমধিক অবহিত হইবেন। আমরা জানি, সিংহলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে এবং সেখানে চাউলের প্রয়োজন। ভারত হইতে যাহাতে চাউল পাওয়া যায় সেজন্য সিংহলের মন্ত্রী ব্যারণ জয়তিলক ভারতে আসিয়াছেন। তিনি বাঙলা দেশেও চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এবং এখন দিল্লীতে গিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে ধরাধরি করিতেছেন। দুঃস্থকে সাহায্য করা খুবই ভাল এবং বাঙালী সেজন্য সর্বদাই প্রস্তুত আছে; কিন্তু বর্তমানে বাঙালী নিজেরই নিরন্ন। এমন অবস্থায় সিংহলকে অন্ন দিয়া সাহায্য করিবার সামর্থ যেমন তাহাদের নাই; ভারতের অন্য কোন প্রদেশকেও সেইরূপ সাহায্য করিতে তাহারা অসমর্থ। ভারত সরকার বাঙলা দেশের অন্নসমস্যার এ গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন কি?

মৃত পতঙ্গ

সুমণি মিত্র

শান্ত কিন্তু নিরলস তার জীবন। বাধাহীন নিরুদ্বেগ জীবনের মধ্যে যে নিভৃত শান্তি আত্মগোপন করিয়া অকুণ্ঠিত-চিত্তে আপনাকে বিতরণ করিতেছিল, তাহার মধ্যে দারিদ্র্যের একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি আসিয়া রঘুবীরকে যখন পীড়া দেয়, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারে না। তাই স্ত্রীর মুখে অন্ন যোগাইবার কোন উপায় না করিতে পারিয়া সে এক মোটর-চালকের চাকুরি গ্রহণ করিল।

এতটা সহজে নিজের দীনতা স্বীকার করিয়া লইবার মত পাত্র সে নয় ; কিন্তু যখন অভাবটা তাহার কণ্ঠ নিষ্পেষণের জন্য এতটা ব্যগ্র হইয়া উঠিল, তখন অসহ্য দাস্যভাবটাকে মানাইয়া লইবার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল। এতটা কষ্টের পরও রমা অসুস্থ হইয়া পড়িল। রঘুবীর আপনার সাধ্যের বাহিরে খাটিয়া যাহা পাইল, তাহা ডাক্তার খরচেই ব্যয় হইয়া যাইতে লাগিল ; উদ্বৃত্ত অর্থে যে তাহার অন্য অভাব মিটিবে, সে আশা রহিল না।

সেদিন সকাল সকাল সে সকল কার্য সারিয়া লইয়া গাড়ি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল—সবকার হইতে ডাক আসিয়াছে, না গেলে উপায় নেই। সার্ভেয়ার বাবু বাড়ির দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ; পার্শ্ববর্তী গ্রামের নন্দ মুহুরির জমি বিলি-বণ্টন করা হইবে, তাই মাপজোকের প্রয়োজন। রঘুবীর শীঘ্রই প্রস্তুত হইয়া গ্রামের পথে অগ্রসর হইল। দূরে শ্যামল-ক্ষেতের আল বাহিয়া একটা সরুপথ সর্পিল গতিতে গ্রামান্তরের পানে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মের প্রাতে সমস্ত গ্রামখানিতে একটা স্বচ্ছন্দ চাঞ্চল্য সাড়া তুলিয়াছে। কৃষকেরা গ্রামান্তরে চলিয়াছে। শিশুরা খেলিতেছে। মেয়েরা ঘাটের পথে যাইতে যাইতে কত কি কৌতুকালাপ করিতেছে, কখনও বা নীরবে চলিয়াছে কখনও বা হাসিতে ফাটিয়া পড়িতেছে। স্নানের ঘাটে কাহার মামলার হিসাব-নিকাশ হইতেছে আর তাহারই জন্য সজোরে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। দূরের ডোবাটায় কয়েকটা মাছরাঙা উন্মুখ হইয়া জলের অভ্যন্তরে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে ; এমনি আরও কত কি। কিন্তু রঘুবীরের এই সব কিছুই চোখে পড়িল না, চোখ মেলিয়া দেখিতেও সে চাহিল না। সে তখন আপনার স্মৃতির পটে এই পৃথিবীর আর একটি অন্তরঙ্গ প্রাণীর যেসব ছবি অঙ্কিত দেখিতেছিল, তাহার মাধুর্যও বুঝি ইহাদের চেয়ে কিছু কম নয়।

যাহা হোক, রঘুবীর চতুর্দিকে শূন্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গাড়ি চালাইতে লাগিল।

অবশেষে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার পূর্বেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ঝোপে-ঢাকা পথটি নিতান্ত অকালেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। তাহার মধ্যে অন্ধকারকে শাসাইয়া দুটি সন্ধানি আলোকরশ্মি গ্রাম্যপথটাকে কুণ্ঠিত করিয়া দিয়া ক্রূর উজ্জ্বলতায় ঝোপগুলির প্রান্তে কি যেন খুঁজিতে লাগিল। রঘুবীর স্টিয়ারিং হুইলে হাত দিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। আজ রাত্রের মধ্যে তাহাকে যেমন করিয়াই হোক গন্তব্য-স্থানে পৌঁছিতেই হইবে। কাল সকালে সার্ভেয়ার বাবুকে কাজে লাগিতে হইবে যে। কিছু ভয় নাই, রমা ভালই থাকিবে, কৈলাসকে ত সে সেখানে রাখিয়াই আসিয়াছে, তখন আবার চিন্তা করিতে যাওয়া কিসের জন্য ?

কিন্তু বলাবাহুল্য, এই চিন্তাকে হটাইবার জন্য ভগবান আমাদের হাতে কোনও অস্ত্র দেন নাই। সুতরাং রঘুবীরকে চিন্তা করিতেই হইল। কিন্তু এই চিন্তাটি যখন কৃষ্ণবর্ণ সূত্রটিকে অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল, তখনই ঘটিল বিপদ।

পথ চলিতে চলিতে রঘুবীর অকস্মাৎ গাড়ি থামাইয়া দিল। সম্মুখে ঐ সংকীর্ণ গ্রাম্যপথটায় কাহার ছায়া পড়িয়াছে না! তাহার সুডোল অঙ্গের গঠনভঙ্গী তাহার পরিচিত। দুইহাত দুইদিকে বিস্তৃত করিয়া দিয়া সার্চলাইটের আলো ঢাকিয়া ফেলিবে যেন!

ব্রেকে টান পড়িয়া গাড়ি গতিশূন্য হইল। সার্ভেয়ার বাবু কহিলেন, "থামালি কেন রঘু? যেতে দেরি হয়ে যাবে যে।"

রঘুবীর কহিল, "একঠো আওরাৎ লোগ রাস্তাকো বীচ্মে খাড়া রহা, গাড়িকো অগাড়ি নেহি যানে দেনেকা মৎলব্।"

সার্ভেয়ার বাবু ঈষৎ উষ্ণতার সহিত কহিলেন, "আওরাৎ লোগ্ না তোর মাথা,—গাড়ি চালা।"

রঘুবীর দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সজোরে গাড়ি চালাইয়া দিল। কিছুদূর গিয়া আবার মনে হইল যেন সেই নারীমূর্তি পুনরায় পথরোধ করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। গাড়ি আবার থামিল। সার্ভেয়ার বাবুর ধমকানিতে গাড়ি আবার চলিল।

২

পরের দিন যখন গাড়ি ফিরিল তখন মধ্যরাত্রি। রঘুবীর দুর্বার আগ্রহে ঘরের পানে ছুটিয়া গেল। কৈলাস সেই রকম-ভাবেই রমাকে আগলিয়া বসিয়া আছে। রমাও পূর্বের মতই নিস্পন্দ হইয়া শুইয়া আছে। চুলের গোছাটি সেইরকমই কপালের অর্ধভাগ ঢাকিয়া ছাইয়া আছে। মাথাটা হাতের উপর তেমনি সন্তর্পণে রাখা আছে। শুধু তখনকার অবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার পার্থক্য এই যে, তখন ঐ নমিত বক্ষ ক্ষণে ক্ষণে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু এখন আর সে স্পন্দনটুকুও নাই।

রঘুবীরের মনে হইল সময়টা বুঝি আর কাটিতে চাহে না। রাত্রির জমাট অন্ধকার আর তাহার ভাল লাগিল না। সে ভাবিতে লাগিল কখন এই অন্ধকার হইতে সে অব্যাহতি পাইবে। তাহার অশ্রুকরুণ দৃষ্টি এই অন্ধকারকে ভেদ করিয়া, ঐ নক্ষত্র-লোকের আরও ঊর্ধ্বে পৌঁছিয়া বিধাতার পায়ে মিনতি

(শেষাংশ ২৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাত

বোম্বে যাইবার সংকল্প অনুপমের স্থির হইয়া গেল। পকেট মরুভূমির মত শূন্য, টিকেটের পয়সা বা বোম্বাই যাইয়া দু-চার দিন হোটেলে থাকিবার সঙ্গতি নাই. অথচ সেই দিনই বোম্বাই যাত্রা স্থির করিয়া সে সাজসজ্জা করিতে লাগিয়া গেল। দেওয়াল-পঞ্জিকায় তেরোই জুলাইটা সাবধানবাণীর মত চোখের সম্মুখে দোদুল্যমান ; ও-বাড়ির জানালাটা মাঝে মাঝে খোলে মাঝে মাঝে বন্ধ হয়, মাথার উত্তাপ ফ্লাইং পয়েণ্টে। পরিয়াছে খাকি হাফ্‌-প্যাণ্ট, গায়ে হ্রস্ব-হাত সার্ট। প্যাণ্টের পকেট হইতে মণি-ব্যাগটা খুলিয়া হাতের তেলোতে পয়সাগুলি ঢালিয়া ফেলিল। গুণিয়া দেখিল, তাহাদের পরিমাণ খুব তাচ্ছিল্যের নহে, নগদ ১৮৵০ পয়সার সে মালিক। কিঞ্চিৎ নাড়িয়া চাড়িয়া সদীর্ঘশ্বাসে পয়সাগুলি সে আবার ব্যাগে ভরিল। এমন সময় দেখিতে পাওয়া গেল, ব্যাগের পিছন দিকের পকেটে কাগজ উঁকি মারিতেছে। কৌতূহলী হইয়া অনুপম সেগুলি তাড়াতাড়ি টানিয়া বাহির করিল। অকস্মাৎ অনুপমের চোখের দুইটি কোণ করুণ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল।

ভজহরিকে বারবার হাঁক দিল, কিন্তু এবার সেই সদা-প্রস্তুত সদা-সতর্ক লোকটির নিকট হইতে কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। অনুপম ঘরের বাহির হইয়া আসিয়া আরও ডাকিল, ভজহরির কোনও সন্ধানই মিলিল না। অনুপমের চোখ দুইটি অশ্রুতে সজল হইয়া উঠিয়াছে ; ধরাগলায় নিজে নিজেই বলিতে লাগিল—ব্যাটা টের পেয়েছে। বোম্বে যাবার মত পয়সা আমার কাছে নেই, বোম্বে গিয়ে খেয়ে থাকবার পয়সা নেই। তাই ওর যথাসর্বস্ব দিয়ে গেল!

অনুপম স্থির করিল, সে এই টাকা ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিবে। ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এত বড় আত্মত্যাগের অমর্যাদা সে কিছুতেই করিবে না। তারপর রহিল তাহার ভবিষ্যৎ এবং তাহার অসীম কৃতজ্ঞতাবোধ।

গায়ে একটা কোট চাপাইয়া, ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্রের মধ্য হইতে শুধুমাত্র একটা কম্বল কাঁধে উঠাইয়া অনুপম অনিশ্চিতের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। বিছানাপত্র, ট্রাঙ্ক-বাক্স, জামাকাপড় সমস্ত কিছুই ঘরে পড়িয়া রহিল।

সমস্ত মেসটার মধ্যে কেহই অজানা পথে এই দুঃসাহসিক অভিযানের গৌরবময় দিকটা সম্বন্ধে কিছুই জানিল না. শুধু উপরের বারান্দার এক কোণা হইতে মেসের ভৃত্য ভজহরি ঝুঁকিয়া পড়িয়া বোম্বেযাত্রীর পথ মঙ্গলআলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। অশ্রুতে তাহার চক্ষু ছলছল ; কাপড়ের খুঁটায় বারবার সে চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, 'ঠাকুর, কাজটা বাবুকে পাইয়ে দিও ; বড় ভালো মানুষ, কিন্তু বড়ই অভাবে পড়েছেন। দূরদেশে যাওয়া যেন সার্থক হয়।'

অনুপম টিকিট-ঘরের ধার-কাছ দিয়াও গেল না ; সোজা হাঁটিয়া প্লাটফর্ম-টিকিটের যন্ত্রটির কাছে আগাইয়া গেল এবং মাত্র একটি আনার বিনিময়েই একটি টিকিট সংগ্রহ করিয়া ছাড়িল। এই টিকেটের সাহায্যেই প্লাটফর্মে প্রবেশ করা গেল। অতঃপর বোম্বে মেলের এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আরোহণ ও কম্বল বিছান।

কাজটা যে বে-আইনী হইতেছে, তাহাতে অনুপমের সন্দেহ নাই। কিন্তু সব চেয়ে বড় ধর্ম নিজেকে বাঁচান। ভজহরির দয়ায় যে ক'টি টাকা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যতের জন্য তুলিয়া রাখিয়া সে ধরা না পড়িয়া বোম্বে পর্যন্ত পৌঁছিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

* *

দুইদিন পরে অনুপম বোম্বে পৌঁছিল। ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করিয়া আসিয়া অন্যান্য যাত্রিদের মতই টিকিট কালেক্টরের হাতে টিকিট গুঁজিয়া দিল এবং অম্লানবদনে প্লাট-ফর্মের বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িল এবং রুমাল দিয়া ঘাম মুছিয়া ফেলিল।

সামনের খবরেরকাগজওয়ালার কাছ হইতে এক কপি 'বম্বে ক্রনিকাল' কিনিয়া সে আগাইয়া আসিল। অপরিচিত শহর, অপরিচিত জনতা, ভাষা, ভঙ্গি সবই আলাদা। এই অপরিচিত রাজ্যের অজানা রাস্তায় নাম ভুলিয়া যাওয়া কোম্পানী সে কি করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিবে! মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সে অর্ধস্বগত উচ্চারণে ভাবিতে লাগিল—কি জানি ছাই, নামটা কোম্পানীর? দেড়গজি অদ্ভুত নাম বাবা। লজ্জিকের নাম গুলাকে লজ্জা দিয়ে ছাড়ে। প্রথম অক্ষর 'K' জেনে আর কোন্ লাভটা হচ্ছে। বোম্বের কোম্পানীগুলো ত আর অক্ষর হিসেবে সাজান নেই (হলে বেশ হতো কিন্তু)। আর শহরখানাকেও ত

ছোট মনে হচ্ছে না যে, 'K'র কৃপাতে আমার তীর্থস্থানটা খুঁজে বের করা যাবে......

ভাবিতে ভাবিতে অনুপম সামনের রাস্তাটা দিয়াই আগাইতে লাগিল। রাস্তার মোড়ে এক পুলিশ সার্জেণ্টকে দেখিয়া তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিল, —দেখ, এই শহরে আমি নবাগত ; তুমি কি দয়া করে বলে দেবে শহরের ব্যবসা-অঞ্চল কোন্‌টা?

সার্জেণ্ট কিছুক্ষণ বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, 'ব্যবসা-অঞ্চল কোনও একটা বিশেষ রাস্তায় নয়। তুমি কি কাজের খোঁজ করচ?'

অনুপম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ।'

সার্জেণ্ট তাহাকে ফোর্ট অঞ্চলে যাইবার ট্রাম দেখাইয়া দিল।

অর্ধঘণ্টাকাল পরে দেখা গেল, বোম্বের এক জনাকীর্ণ রাস্তা দিয়া অনুপম ডান দিকের ও বাঁ দিকের প্রত্যেক বাড়ির দিকে সবিশেষ অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হন্‌হন্ করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝেই দু'একজন পদাতিকের সহিত ধাক্কা লাগিয়া বসিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহার গতি কিছুমাত্র হ্রাস পাইতে পারিতেছে না। সংক্ষেপে মাপ চাহিয়াই চতুর্দিকে ব্যাকুলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে সে ছুটিয়া চলিয়াছে। দালানের পর দালান। কত যে সওদাগরি আপিস, তার সীমাসংখ্যা নাই। দু-একটা কোম্পানীর আদ্যাক্ষর 'K' আছে। তাদের দেখিলেই অনুপম চমকাইয়া থামিয়া যায়। বার বার নামটা পড়ে এবং চোখ বুজিয়া সম্পূর্ণ এক মিনিট ভাবিবার পর ঘাড় নাড়িয়া মনে মনে বলে,—উঁহু, এ নয়, এটা নয়। নামের প্রথম দিকটার একটা অসভ্যজাতির নামের সংগে মিল থাকা চাই......কী দেড়গাজি নাম রে বাবা......

রাস্তার একটা ঘড়িতে দেখা গেল, দশটা বাজিতে সাত মিনিট বাকি। ত্রস্ত হইয়া অনুপম ডবল জোরে পা চালাইল। মুস্কিল এই যে, রাস্তার কাহারও কাছেই কোনও সাহায্য চাওয়ার উপায় নাই। সে না জানে কোন্ রাস্তায় যাইবে, না জানে কোম্পানীর নাম। সুতরাং জিজ্ঞাসা করিবে কি। একমাত্র ভরসা অধ্যবসায়। কিন্তু এই বিরাট অপরিচিত নগরে তাহার সার্থকতা কতটুকু? সময়ই বা কোথায়। লক্ষ লক্ষ কোম্পানীর মধ্যে তাহার দেড়গাজি নামের কোম্পানীটা খুঁজিয়া বাহির করা অপেক্ষা গন্ধমাদন খুঁজিয়া আনাও হয়ত সহজ। এদেশে সকলের নামই ত দেড়গাজি!

আর একটি ঘড়িতে দেখা গেল ১১টা বাজিতে দশ মিনিট মাত্র বাকি। হতাশায় ও ব্যর্থক্ষোভে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত অনুপম নিজের চুল টানিতে লাগিল। কিন্তু পা দুটিকে সে সামান্যও বিশ্রাম দিল না, ঠোঁট কঠিনভাবে কামড়াইয়া, মুখে চোখে তীব্র ব্যাকুলতা লইয়া অনুপম প্রাণপণে সমুখে হাঁটিয়া চলিল।

ভদ্রচেহারার একজন লোক কিছুক্ষণ ধরিয়াই অনুপমের কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করিতেছিলেন। পরনে ফর্সা ধুতি, কোঁচা সামনে দো-ভাঁজ করা, গায়ে লম্বা কোট, মাথায় চকলেট-রঙা ফেল্টের গোল টুপি; পায়ে স্যাণ্ডাল। অনুপমকে সামনের বাড়িটার সমুখে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া তিনি পিছন হইতে ক্রমেই কাছে অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

(ক্রমশ)

মৃত পতঙ্গ

(২৮৭ পৃষ্ঠার পর)

জানাইতে চায়। নিস্তব্ধ রাত্রির যে প্রাণটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহার স্পন্দনও বুঝি রহিত হইয়া গিয়াছে। ধরণীর যেন কোথাও প্রাণস্পন্দন নাই। সকলেই বুঝি কোন এক সময়ে এমনি করিয়াই আপনারও অজ্ঞাতে নিষ্ঠুর মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িবে। তৃতীয়ার একফালি চাঁদের কিরণটুকু যেন অন্যান্য দিনের অপেক্ষা বিশীর্ণ, ম্লান হইয়া গিয়াছে। ধরণীর নিভৃতবক্ষে কোন্ অন্ধরন্ধ্রে যে প্রাণচঞ্চলতাটুকু ছিল, তাহাও বুঝি একসাথে লোপ পাইয়াছে।

কেমন করিয়া বিনিদ্র রজনী কাটিয়া গেল, তাহা আর নূতন করিয়া বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। রঘুবীর উঠিয়া কৈলাসকে সংগে লইয়া রমার শব দাহ করিতে চলিল। মনের আগুন রঘুবীরকে আবার দাহ করিবে না ত! ফিরিয়া আসিয়া রঘুবীর শোক করিবার অবকাশ পাইল না, ধূলি-ধূসরিত গাড়িটাকে পরিষ্কার করিতে চলিল। এতটুকু একটা কাপড় জলে ভিজাইয়া সে গাড়ির সার্চলাইটের ময়লা ধুইয়া ফেলিল; কিন্তু বালব্-এর সামনে যে একটি মৃতপতঙ্গ দুইটি ডানা বিস্তৃত করিয়া, উন্মাদিনী নারী যেমন সব কিছুকে আগলাইয়া দাঁড়ায়, তেমনি করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা যে তাহার নেকড়ার চাপে খসিয়া পড়িল, তাহা সে দেখিতেই পাইল না।

মুশলিম লীগের ঐতিহাসিক ভূমিকা

রেজাউল করীম এম-এ, বি এল

বর্তমান কংগ্রেসের নূতন সংগ্রামের মুখেই মুসলিম লীগ যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার সহিত এই লীগের ছত্রিশ বৎসর পূর্বেকার ঐতিহাসিক ভূমিকার তুলনা করা যাইতে পারে। সে সময়, এমনি ধরণের আর একটা সংগ্রামের মুখে মুসলিম লীগ যে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, আজ তিন যুগ অতীত হওয়ার পর যখন দেশের নানা স্থানে নানা পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তখনও লীগ সেই একই ভূমিকায় একই ধরণের অভিনয় করিতেছে। আজিকার ভারতবর্ষ ছত্রিশ বৎসর পূর্বেকার ভারতবর্ষ নহে। কিন্তু এই ছত্রিশ বৎসরেও মুসলিম লীগের আদর্শের ও কর্মপন্থার কোনও পরিবর্তন হয় নাই। সাম্রাজ্যের সেবায় তখন লীগ যাহা করিয়াছিল, আজিও তাহাই করিতেছে। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের ধারা নানা খাতে, নানা পথে ও নানাভাবে প্রবাহিত হইয়া আজ যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে জাতির ইতিহাসে একটা যুগসন্ধিক্ষণ বলা যাইতে পারে। সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত জড়তা, সমস্ত সংকোচ দূরে ফেলিয়া দিয়া জাতি এক সংগ্রামপূর্ণ, বিপদপূর্ণ ও উদ্বেলিত সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হইতেছে। ইহার ফলাফলের উপর দেশের স্বাধীনতা, জাতির মুক্তি ও অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। এই যুগ সন্ধিক্ষণে দেশের বিভিন্ন স্তরের লোক কে কি অংশ গ্রহণ করিতেছে বা গ্রহণ করিতে পারে, তাহা বিবেচনা করিবার সময় নিশ্চয় আসিয়াছে। কে দেশকে গৌরবের সহিত মুক্তির দিকে আগাইয়া দিতেছে, আর কে দেশকে সংগ্রাম হইতে পিছাইয়া দিতেছে তাহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। কারণ দেশের সত্যকার বন্ধু চিনিবার ইহাই অবসর।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পদে পদে ব্যাহত, আড়ষ্ট ও বিড়ম্বিত করিবার জন্য সেই স্বদেশী যুগ হইতে আমাদের দেশেরই এক দল লোককে খাড়া করা হইয়াছিল। বড়লাট লর্ড মিণ্টো ও ভারত সচিব লর্ড মর্লির গোপন চিঠিপত্র হইতে প্রমাণিত হয় যে, কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। সেই সময় কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা মত যে সব দল বা উপদল স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাধা দিবার জন্য জন্মলাভ করিয়াছিল এবং জন্মলাভ করিয়াই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, মুসলিম লীগ ছিল তাহাদের অন্যতম। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাধা দিবার জন্য সেই যে মুসলিম লীগ প্রধান ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করিল, আজ ছত্রিশ বৎসর পরেও সে সেই স্থান হইতে (Post) এক চুলও নড়িল না। পৃথিবীতে কত ওলটপালট হইয়া গেল, ভারতে কত পরিবর্তন ও বিবর্তন হইয়া গেল কিন্তু প্রভু নির্দিষ্ট একই পদে দাঁড়াইয়া লীগ একই ব্রত পালন করিয়া যাইতেছে। পরিবর্তন বিবর্তন আন্দোলন-আলোড়নের প্রচণ্ড ধাক্কা লীগের ব্যূহ ভেদ করিতে পারে নাই। আপনার মনে, আপনার বেগে আপনার আনন্দে লীগ আজ ছত্রিশ বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যেক ধাপে বাধা দিয়া আসিতেছে। কংগ্রেসের পাল্টা প্রতিষ্ঠানরূপে (Counterpoise to the Seditious Congress people) গঠিত হইয়া লীগ সাম্রাজ্য সেবার মহান ব্রত গ্রহণ করিয়া অদ্যাবধি বিশ্বস্ত অনুচরের মত আপনার নির্দিষ্ট ব্রত পালন করিয়া যাইতেছে। লীগ দাঁড়াইয়া আছে একই পদের উপর, কিন্তু কাজ করিয়া যাইতেছে বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন ছুতা ধরিয়া এবং বিভিন্ন শ্লোগান তুলিয়া। প্রত্যেক সময় তাহার সমস্ত আক্রমণ গিয়া পড়িয়াছে স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর। কখনও মুসলিম স্বার্থের নামে, কখনও হিন্দু রাজের ভীতি দেখাইয়া, কখনও ইসলামের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার লোভ দেখাইয়া লীগ এতাবৎ যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, আজ ছত্রিশ বৎসর পর আবার সেই ধুয়া তুলিয়া সেই একই ভূমিকা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। যাহাদের প্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্য লীগের জন্ম হইয়াছিল, আজ আবার তাহাদের সেই প্রয়োজন হইয়াছে, সুতরাং লীগ ব্যতীত কে এমন সুষ্ঠুভাবে সে প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে? প্রত্যেক সংগ্রামের মুহূর্তে মুসলিম লীগ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ কিরয়া সারা বিশ্বকে দেখাইতে চাহিয়াছে যে, ভারতের স্বাধীনতা মুসলমানের জন্য ক্ষতিকর। স্বদেশী আমল হইতে অসহযোগের আমল পর্যন্ত লীগ বরাবর ইহাই করিয়াছে। সে যুগের নরমপন্থী কংগ্রেসের নরম ও সামান্য দাবী স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া কর্তৃপক্ষ যখনই এদেশের নানা সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তখনই লীগ তাঁহাদের সুরে সুর মিলাইয়া ঘোষণা করিয়াছে, "সত্যিই ত, এত সমস্যার মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া চলে না"—তাহা হইলে মুসলমানের কি হইবে? তাহারা ধনেপ্রাণে মারা যাইবে"—এখানে লীগের মনে ভাবটা এইরূপ—"আমরা বেশ আছি! রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব!" বৈদেশিক প্রভুত্ব থাকুক, তাহাতে লীগের আপত্তি নাই, কিন্তু যত আপত্তি যত মায়াকান্না এদেশের লোকের হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর হইতে দেখিয়া! ইহাই হইল লীগের ঐতিহাসিক ভূমিকা। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে লীগ মুসলমান সমাজকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু উহা খিলাফৎ সমস্যার সহিত জড়িত ছিল বলিয়া লীগ তখন মুসলমান সমাজকে সাম্রাজ্যের সেবায় নিয়োজিত করিয়া ইসলামের কর্তব্য পালন করিয়া কৃতকার্য হইতে পারে নাই। মুসলমানের সেই বিপদের দিনে, যখন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে পড়িয়া বিরাট তুর্কি সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হইয়া পড়িতেছিল, তখন মিস্টার জিন্না তাঁহার বশংবদ সঙ্গীসহ খিলাফৎ সমস্যাকেও ধামাচাপা দিতে চাহিয়াছিলেন। আজ তাঁহার মুখ হইতে ইসলাম বিপন্নের ধুয়া উঠিতেছে, কিন্তু সেই আসল বিপদের

দিনে তিনি নেপথ্যে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর নানা কলকৌশল ও গোপন চক্রান্তের সাহায্যে যখন অসহযোগ আন্দোলন থামিয়া গেল, তখন মিঃ জিন্না নির্জন বাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পকেট হইতে লীগকে বাহির করিয়া আবার জাতীয় সংগ্রামকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন এবং ইসলামের সেবার নামে স্বদেশের দাসত্ব বন্ধনকে সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন। প্রথম আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সাম্রাজ্যের সেবার জন্য লীগের ডাক পড়িল এবং জাতির সেই ভীষণ পরীক্ষার সময় মুসলিম লীগ আবার একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আইন অমান্য আন্দোলনকে ত বাধা দিলই, তা'ছাড়া সেই সময় দেশের সর্বত্র যেসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়া উঠিল সেগুলির সহিত জড়িত হইয়া দেশময় একটা বিভীষিকা সৃষ্টি করিতে কুণ্ঠিত হইল না। তারপর আসিল গোলটেবিল বৈঠক। সেখানেও মুসলিম স্বার্থের নামে জাতীয় দাবীকে বাধা দিবার জন্য মুসলিম লীগ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। সেখানে লীগওয়ালারা বেনথাল সাহেবের সহিত গোপন আলোচনা করিতে পারিল, ডাঃ আম্বেদকারের সহিত মিলিয়া 'মাইনরিটিজ প্যাক্ট' করিতে পারিল, উপরিতন কর্তাদের সহিত মাখামাখি করিতে পারিল; কিন্তু পারিল না শুধু গান্ধীজীর সহিত মিটমাট করিতে। যাঁহার সহিত আপোষ করিলে জাতীয় দাবী ও মুসলিম দাবী একই সঙ্গে পূর্ণ হইত, কেবল তাঁহাকেই পরিহার করিয়া চলিল। ফলে এই হইল যে, গান্ধীজীর জাতীয় দাবীকে লীগওয়ালারা বেনথাল এন্ড কোংএর সহিত মিলিত হইয়া সমবেতভাবে বাধা দিল। তাই রিক্তহস্তে সকলকেই স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে হইল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের ভেদনীতিকে পরিপূর্ণ রূপ দিবার জন্য আমাদের উপর চাপাইয়া দিলেন—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। এতদিন মুসলিম লীগ যে পথে ও যে নামে দেশদ্রোহিতার ভূমিকা গ্রহণ করিতেছিল, বাঁটোয়ারার পর সে পথে ও সেই নামে আর কিছু করা চলিল না। কারণ সুদীর্ঘ যুগের সাম্প্রদায়িক দাবী বাঁটোয়ারাতে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল। তাই আরম্ভ হইল দুই জাতির 'থিওরী' প্রচার। আর ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইতেছে "পাকিস্থান"। ছত্রিশ বৎসর পূর্বে স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে লীগ যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, আজ আবার অন্য নামে ঠিক সেই ঐতিহাসিক ভূমিকাই গ্রহণ করিল। কংগ্রেসের আসন্ন "জাতীয় গভর্নমেন্ট" প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে মুসলিম লীগ যে মনোভাব দেখাইতেছে, তাহা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, স্বাধীনতার আন্দোলনে বাধা দেওয়া ব্যতীত তাহার অন্য কোন কাজ নাই,—অন্য কোন ব্রত বা উদ্দেশ্য নাই। আমেরিকা, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশের সাম্রাজ্যবাদীগণ কংগ্রেসের বর্তমান আন্দোলনকে নিন্দা করিতেছেন। শুধু তাই নহে, তাঁহারা ইহাতে রীতিমত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন, নিন্দা বা বাধা শুধু তাঁহাদের পক্ষ হইতে হইলে চলিবে না,—এদেশের একটা শক্তিশালী দলের পক্ষ হইতেও নিন্দাসূচক প্রস্তাব উঠা দরকার। মডারেট ও ধীরপন্থিগণের কোন প্রতিপত্তি নাই। সারা বিশ্ব যদি ইহাই বুঝে যে, এ বিষয়ে ভারতে ভিন্ন মত নাই তাহা হইলে সমূহ বিপদ। সুতরাং একটা দল খাড়া করা দরকার। কে সেই ভার লইবে? মুসলিম লীগ অক্ষত দেহে বিদ্যমান থাকিতে ভাবনা কি? ছত্রিশ বৎসর পূর্বে মুসলিম লীগ জাতির সংগ্রামের মুখে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল আজ আবার লীগের ডাক পড়িল সেই ভূমিকা গ্রহণ করিবার জন্য। তাই লীগের বিশ্বস্ত নেতা মিঃ জিন্না একটি ঐতিহাসিক বিবৃতি দিয়া সারা বিশ্বকে জানাইয়া দিলেন যে, ভারতীয় মুসলমান জাতীয় আন্দোলনের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। তিনি আরও জানাইয়া দিলেন যে, কংগ্রেস 'হিন্দু রাজ' প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। মুসলমানগণ কিছুতেই হিন্দু-প্রভুত্ব সহ্য করিবে না। সেই স্বদেশী যুগের দিনে মুসলমানের স্বার্থের নামে যে ধূয়া তুলা হইয়াছিল, আজ দীর্ঘ তিন যুগ পর সেই একই ধূয়া, সেই একই হিন্দুভীতির জিগির তুলা হইতেছে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন কৌশল তাঁহাদের জানা নাই। বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, লীগের মতলবখানা এই যে, পাকিস্থান যদি না হয়, তবে বর্তমান পরাধীনতা শতগুণে শ্রেয়ঃ। ইহার দ্বারা লীগ মুসলমান সমাজের সম্মান বাড়াইল না কমাইল তাহা বিচার করিতে প্রত্যেক মুসলমানকে অনুরোধ করিতেছি।

লীগের বিগত ৩৬ বৎসরের ইতিহাস হইতে ইহাই দেখা গেল যে, ইহা সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভ। সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। আর বরাবরই ইহা সাম্রাজ্যবাদেরই সেবা করিয়া আসিতেছে। লীগের যে-সব মুসলমান 'স্বাধীনতা চাই' বলিয়া বড়াই করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরকে বলি, "বুকে হাত দিয়া বল, সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল এই লীগ কি কোনও দিন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে পারিবে? এই লীগের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া তোমরা কি সারা বিশ্বের মুসলমানের মাথা নত করিতেছ না?" আমি এই কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, লীগের আশ্রয়ে ভারতীয় মুসলমানের মুক্তি নাই। যে প্রতিক্রিয়াশীল দল সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানীকে পদে পদে বাধা দিয়াছিল, যে ধর্মান্ধ দল কামাল পাশার মস্তক বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিল, আর যে অদূরদর্শী দল আমানুল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপদে বাচ্চাইশেকোকে বসাইয়াছিল, বর্তমান মুসলিম লীগ তাহাদেরই উত্তরাধিকারী। তাই পূর্বাহ্নে মুসলমান সমাজকে লীগের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সাবধান করিয়া দিতেছি।

সমরেশ গ্রামে আসিয়া শুনিল, আভা পাগল হইয়া গিয়াছে।

ব্যথায় তাহার মনটা টন টন করিয়া উঠিল। অনেক দিনের অনেক কথা প্রাণে জাগিল। আভার মা গ্রাম-সম্পর্কে সকলের ঠান্‌দিদি হইতেন। তখন দেশে আসিলেই সে তাহাদের বাড়ি বেড়াইতে যাইত। তবে কেন যে যাইত, সে প্রশ্ন নিজেকে কখনও করে নাই। কিন্তু আভার মা করিতেন। ঠানদিদি ও নাতি, সুতরাং পরিহাসের সম্বন্ধ। তাই সহাস্যকৌতুকে কহিতেন, "কি বর, এতদিন পরে বুঝি মনে পড়ল? তা' এখন দেখতে এলে না দেখা দিতে এলে?"

যেন ধরা পড়িয়াছে, এমনি দোমনাভাবে সমরেশ শুধাইত "কা'কে?"

এক গাল হাসিয়া আভার মা কথাটা ঘুরাইয়া লইতেন, "কাকে আবার, আমাকে!"

তখন সমরেশের বয়স অল্প। প্রথমে সে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিত। তারপর সহজভাবে তাঁহার পরিহাসে যোগ দিতে চেষ্টা করিয়া কহিত, "দুটোই সত্যি রাঙাদিদি! দেখতে এলে আর দেখা না দিয়ে উপায় নেই।"

আভার মা মুখ তুলিয়া কৃত্রিম ঔৎসুক্যে কহিতেন, "তাহলে আমাকে তোমার পছন্দ হয়, বল?"

সমরেশ সহাস্য কলরবে কহিত, "আপনার মত ঠানদিদিকে যার পছন্দ না হয়, সে নাতি নামের অযোগ্য। কিন্তু আভা কোথায়?

আভার মা'র মুখের হাসি এবার কণ্ঠস্বরে ফুটিত, "ও আভা দেখে যারে কে এসেছে!"

আভা কোমরে আঁচল জড়াইয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া বঁটি পাতিয়া তরকারী কুটিতেছিল। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলিয়া আসিয়া কহিত, "ও সমরেশ, তুমি? অনেকদিন পরে যে।"

দুজনেই একবয়সী, তাই পরস্পরকে নাম ধরিয়া ডাকিত। সমরেশ হাসিমুখে কহিত, "একেবারে না আসার চাইতে অনেক-দিন পরে আসাও ভাল, নয় কি?"

আভা কহিত, "তা সত্যি?" তারপর তাহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিত, "মা গো, দেখতে দেখতে কত বড়টি হয়ে উঠলে। এখন তোমাকে যেন লজ্জা করে। অনেক বদল হয়েছে কিন্তু তোমার মধ্যে। প্রথমত গলার স্বর। মা'র সঙ্গে যখন কথা কইছিলে, রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে কানে আসছিল; আমি ত চিনতেই পারিনি একেবারে। ভেবেছিলাম কে না কে"

গলার স্বর ভারী হইয়াছে, একথা কাহারও মুখে শুনিলে তখন তাহার মনে লজ্জা হইত। বিশেষত সুন্দর মেয়েদের সামনে সে যেন সহজভাবে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিত না। তখন তাহাদের মনে হইত স্বর্গের দেবী, নিজেকে নিতান্ত পৃথিবীর লোক। সুতরাং সে অপ্রতিভ হইয়া পড়িত। তবু কিছু বলা প্রয়োজন মনে করিয়া কহিত, "তুমিও আগের চেয়ে অনেক বড় হ'য়ে গিয়েছ আভা, আর হয়েছ অনেক সুন্দর" বলিয়াই তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিত আর একখানি নিরুত্তর রাঙা মুখের পানে তাকাইয়া।

পর মুহূর্তেই তাহারা বয়সের আলোচনা ভুলিয়া যেন আবার সেই ছেলেবেলায় ফিরিয়া যাইত। কোথায় ডুমুর গাছের পাতা বুনিয়া মৌ চুষকি পাখী বাসা বাঁধিয়াছে তাহাই দেখিতে ছুটিত।

সমরেশ কহিত, "ও ত টুনটুনির বাসা!"

আভা কহিত, "কক্ষনো না। দেখছ না পুরুষ পাখীটা কোকিলের মত কুচ্‌কুচে কাল। মেয়েটা অবশ্য টুনটুনিরই মত দেখতে।"

সমরেশ খানিক ভাবিয়া গম্ভীরভাবে কহিত, "কিন্তু কত ছোট। আমার ত দূর থেকে টুনটুনি বলেই মনে হচ্ছিল।"

আভা কহিত, "পাখীদের মধ্যে কিন্তু পুরুষ সুন্দর।"

সমরেশ দুষ্টুমি করিয়া কহিত, "মানুষের মধ্যে যেমন মেয়েরা ভাল দেখতে!"

আভা ভুরু নাচাইয়া কহিত, "নয় ত কি?" তারপরে খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিত, "শহরে পচে মরছ, পাখী চিনবে কোথা থেকে? টুনটুনিরা কি অমন শিষ্ দিয়ে ডাকতে পারে?"

সমরেশ কহিত, "না, তারা কেবল টুন্‌টুন ক'রে নেচে বেড়ায়!"

তারপর খালি হাসি আর হাসি! যার কোনো অর্থ নাই। ছোটদের প্রাণখোলা আনন্দের অকারণ উচ্ছ্বাস! এমনি কত দিনের কত হাসি গল্প,—না বলা ব্যথার ব্যঞ্জনায় যাহা ছিল রহস্য-মধুর! আজ আর সে সব কথার কোনো মানে নাই। জীবন-অভিধানের কোনো পাতায় তার কোনো অর্থ আজ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আজ আভা পাগল! কিন্তু কেন?—বহুদিন সঞ্চিত অবরুদ্ধ বাষ্পভরা হৃদয়ের ক্ষুব্ধ প্রকাশ কি এই মস্তিষ্ক বিকৃতি? সমরেশ ঔৎসুক্যের সহিত সে উৎসকেই আবিষ্কার করিতে ছুটিল।

আজ আর আভার মা'র মুখে হাসি ছিল না। পরিহাস যেন তিনি অনেকদিন হইল ভুলিয়া গিয়াছেন। সেই মানুষ যে এই মানুষ, তাঁহাকে আজ না দেখিলে সমরেশের প্রত্যয় হইত না। শুধু তাঁর সস্নেহ সম্ভাষণে সমরেশ তাঁহাকে চিনিল। তিনি কহিলেন, "এস সমরেশ!" তারপর আটচালা হইতে এক-খানা তালপাতার চেটাই খুলিয়া লইয়া বিছাইয়া বলিলেন, "বস, দাদা!"

সমরেশ শুধাইল, "আভা কেমন আছে?"

তিনি বিষাদমাখা স্বরে সংক্ষেপে বলিলেন, "ভাল না।"

"শুনলাম, হঠাৎ নাকি তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে"

"কার কাছে শুনলে?"

"মতি মামার কাছে। তাই ত তা'কে দেখতে এলাম।"

"আর দাদা, কি-ই বা দেখবে?" বলিয়া আভার মা জোরে নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

"এখন কেমন আছে সে?"

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আভার মা কহিলেন, "ওই শোন!"

সমরেশ সোৎসুকে শুনিল, পাশের বন্ধ ঘরে খিল্ খিল্ করিয়া একটি মেয়ে অজস্র হাসিতে খাটের উপর যেন লুটাইয়া পড়িতেছে।

সমরেশের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। আভার হাসি!

অজ্ঞাতসারে সমরেশ বলিল, "আভা এই ঘরে আছে?"

আভার মা প্রশ্ন করিলেন, "কি করে বুঝলে তুমি?"

কিন্তু তাহা ত কথায় প্রকাশ করা যায় না। শুধু সমরেশের প্রত্যেক অণুপরমাণু তাহা অনুভব করে। সুতরাং সে চুপ করিয়া রহিল।

আভার মা কহিলেন, "বিয়ে দিয়েছিলাম আভার ভাল ঘরেই—সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করে। জান ত মেয়ের ওপর কি ঝোঁকই ছিল ওনার। পাড়াগাঁয়ের স্কুলে যতদূর সম্ভব লেখা-পড়া শিখিয়ে, বড় করে, নিজের ভালমন্দ জ্ঞান হ'লে তবে আভার বিয়ে, এই ছিল তাঁর সাধ।"

নতশিরে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে সমরেশ কহিল, "আপনাদের ত পয়সাকড়ি আছে এবং জায়গা জমিরও অভাব নেই। তখন আভার সুপাত্র জোটানর বিশেষ অসুবিধা কিছু ছিল না।"

হ্যাঁ, তার ওপর আবার আভা দেখ্‌তে সুন্দর। মা বলে' আমি বলছিনে, একথা নিঃসম্পর্কীয় লোকেও অনেকে বলেছে। অনেক ভাল জায়গা থেকে ওর সম্বন্ধ এসেছিল শুনেছ ত? কিন্তু উনি ছিলেন কেমন একগুঁয়ে। নিজে যা' ভাল বলে বুঝতেন, কারো কথায় তা ছাড়তেন না। সবাইকে উনি ফিরিয়ে দেন।"

সমরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তা জানি।"

আভার মা কহিলেন, "এমন কি তোমার বাবাকেও তিনি চেয়েছিলেন ওকে তোমার জন্যে।"

সমরেশ মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল। বিগত দিনের প্রত্যাখ্যানের ভিতর আজ আর সে জ্বালা ছিল না। তাহা হইলে এমন করিয়া এত সহজে সে আজ খবর লইতে আসিতে পারিত না।

তখন আভার মা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর কপালে করাঘাত করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, "সবই ভবিতব্য!"

আভার শ্বশুরবাড়ির পরিবাররা শাক্ত। কালীপূজায় বড় ধুম তাহাদের বাড়িতে। অমাবস্যা তিথির নিশীথ রাত্রে প্রকান্ড শ্যামাপ্রতিমার সামনে শঙ্খ-ঘণ্টা রোলে তন্দ্রাতন্ধ পল্লী চমকিত করিয়া মায়ের পূজার্চনা হয়। পূজাশেষে অসংখ্য ছাগবলি হয়। এমন কি এই লইয়া নাকি পার্শ্ববর্তী গ্রামের দত্তবাবুদের সঙ্গে তাঁহাদের প্রতিযোগিতাও চলে বিপরীত রকম। ঐ রাত্রে মায়ের প্রসাদী কারণসলিল পানে কাহারও বারণ নাই। ঢাক-ঢোল বাদ্যভান্ডের সহিত কালীমাতার জয়ধ্বনি উঠিতে থাকে। আভার মা কহিতে লাগিলেন, "আমার নেমন্তন্ন হ'ত প্রতি বৎসর। তবে নিজের ঘর-সংসার ছেড়ে যাওয়া ঘটত না কোনো বারেই। কিন্তু বাছার দুর্ভোগ দেখা নিতান্তই আমার অদৃষ্টে আছে, সেইজন্যে সেবারে আমার যাওয়া ঘটেছিল।"

সমরেশ প্রশ্ন করিল, "আভা তখন শ্বশুরবাড়িতেই ছিল বুঝি?

"হ্যাঁ, ওকে ত বড় একটা এখানে পাঠাত না। বড়লোকের ঘরে মেয়ে দেওয়ার এই এক জ্বালা। আর আমাকে নিয়ে যেতে জামাই সেবার নিজে এসেছিল!"

"শক্তিপদবাবু?"

"হ্যাঁ, সে নিজেই।" বলিয়া আভার মা যেন একটু গর্বের সহিত সমরেশের মুখের পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তারপর বলিলেন, "তবে আমার কপাল পুড়েছিল। জামাইয়ের যত্ন নেওয়া আর আমার বরাতে ঘটে নি!" বলিয়া তিনি উদ্গতপ্রায় অশ্রু আঁচলের খুঁট দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন।

ব্যাপারটা যে কি ঘটিয়াছিল, ঔৎসুক্যের আবেগে তাহাই জানিবার জন্য সমরেশ কহিল, "কি হয়েছিল তাঁর? কোনো অসুখ করেছিল বুঝি?"

"শক্তিপদ দিব্যি সুস্থ, সবল, মোটাসোটা গাঁটাগোটা লোক—রোগ বালাই তার কাছে ঘেঁসত না কোনদিন।"

এমন সময় রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে আভা হা হা করিয়া বার বার অর্থহীন অট্টহাসিতে খাটের উপর যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

আভার মা কহিলেন, "ঐ শোন!"

এবার সমরেশের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। সে উঠিয়া কহিল, "আভার সঙ্গে একবার দেখা করেই, আমি যেতে চাই, দিদি!"

"তা যাস'খনে। মোটেই আসিস না ত আজকাল। যখন এলি দুদন্ড বোস্, কথাবার্তা ক'!" তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কথাবার্তাই বা কবি কার সঙ্গে? তুই এলে যার কত আহ্লাদ হ'ত, সে ত আজ জ্যান্তে মরা।"

সমরেশ সৌজন্যতার সহিত কহিল, "কেন দিদি, আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলেও ত আমি আনন্দ পাচ্ছি। ওদের সব কথা শুনেছি।"

তখন আভার মা ঘটনাটির যে বিবৃতি দিলেন, তাহা এইরূপঃ—শক্তিপদদের অবস্থা ছিল ভাল এবং ছেলেটিও বড় সৎ। ভাত কাপড়ের জন্য বিদেশে চাকরী করিতে ছুটিতে হয় নাই কোন দিন। যা' পৈত্রিক জমিজমা ছিল তাহা দেখাশোনা করিয়া সে দেশেতে দিন কাটাইত। কালীপূজা উপলক্ষে শাশুড়ীকে তাহাদের বাড়িতে লইয়া যায়। শক্তিপদদের দেশে চকমিলান কোঠাবাড়ি—প্রকান্ড ঠাকুর দালান। সেইখানেই ধুম-ধামের সঙ্গে প্রতি বৎসর শ্যামাপূজা হয়।

সে বৎসরও তেমনিভাবে অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে শ্যামা-পূজা সাঙ্গ হইল। ঢাকের বাজনার বোল ফিরিল এবং বলি-দানের পর্ব আসিল। ভক্তজন মা মা শব্দে দালান কাঁপাইয়া কালী প্রতিমার সামনে সাষ্টাঙ্গে ভূমিশায়ী হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। শক্তিপদ ডাকহাঁক করিয়া কহিল, "ওরে, পাঁঠা-গুলোরে চান করাতে নে বা নারে।"

পুরোহিত ঠাকুর বলি উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়া বসিলেন।

শক্তিপদ ব্যস্তসমস্তভাবে জোরগলায় বলিল, "ওরে পেঁচো, ভুতো, হাবা, ছোঁড়াগুলো সব ঘুমিয়ে পড়ল যে! ওদেরি বা দোষ দেব কি? রাত ত হয়েছে কম নয়। তার ওপর সমস্ত দিন হটরাহটরি করে ঘুরে বেড়িয়েছে। ও ঢাকীরা, বাজা না জয়ঢাকগুলো জোরসে, খোকাবাবুদের ঘুম ভাঙুক।" বলিয়া শক্তিপদ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রলয় শব্দে ঢাকীরা ঢাক বাজাইতে শুরু করিয়া দিল।

অভ্যাস নাই অথচ মদ খাইলে যেমন লোকে সহসা মাতাল হয়, শক্তিপদর অস্বাভাবিক উল্লাস ধ্বনির মধ্যে তেমনি নেশার আমেজ। রাত্রি জাগরণে চোখ হইয়াছে জবাফুলের মত লাল। তার উপর মার প্রসাদী সিঁদুরে কপাল লিপ্ত, বিশৃঙ্খল কুঞ্চিত অলকের অগ্রসীমান্তে গিয়া উঠিয়াছে তাহার ভঙ্গিমা। লাল চেলিপরা, যেন কোন ভৈরবের চেলা। শক্তিপদ হাঁকিয়া কহিতেছিল, "ও পাড়ার দত্তদের বলে আসা হয়েছিল?" চারিদিকে তাকাইয়া কহিল, "কেউ ত আসেনি দেখি. এলে দেখে যেত বলির বহর—আর আমার কালো মায়ের মুখের রাঙা হাসি।"

বলির বাজনা শুরু হইয়াছে। অথচ পুকুর ঘাট হইতে পাঠা আসিতেছে না। পুরোহিত কহিলেন, "মেজবাবু আপনি একটু এগিয়ে দেখুন হয়। কখন পাঠা চান করাতে নে গেছে—এখনো ছোঁড়াদের উদ্দিশ নেই। এদিকে সময় হয়ে এয়েছে।" এমন সময় শক্তিপদর ভাইপো আসিয়া খবর দিল, "কাকাবাবু, পাঠাগুলো ঠান্ডায় জলে নামতে চাচ্ছে না।"

শক্তিপদ চোখ ঘুরাইয়া কহিল, "বটে। কোন দিকে বা তাকাই? যেদিকে না দেখব সেই দিকেই বিভ্রাট ঘটবে। না, মা'র পুজো আর নিঃঝঞ্ঝাটে করতে দিলে না দেখি।" বলিয়া পুকুর ধারে ছুটিল।

কামার উপস্থিত আছে বটে, তবে সে জানে সময়কালে ঢাকের বাজনা বাজিলেই শক্তিপদ তাহার হাত হইতে খাঁড়া টানিয়া লইয়া নিজেই 'কোপ' করিবে। কখনো খেয়াল খুসী মত পাঠার পা মুড়িয়া হাড়িকাঠে ফেলিবে। কখনও বা দেয়-বিচ্ছিন্ন মুণ্ড মাথায় করিয়া মা কালীর পদমূলে বহিয়া আনিবে। তার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিবে উত্তপ্ত রুধির ধারা! তাই পুরোহিত উভয়েরই কানে প্রসাদী ফুল বিল্বপত্র গুঁজিয়া কপালে রক্তচন্দনের টিকা দাগিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শক্তিপদ কহিল, "এই যা একটুখানি কষ্ট। ঠান্ডা জলে দুপুরে রাতে নাকানি চোবানি। তারপরেই ত খাঁড়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম রক্ত ছুটবে। বেটা পাঠারা এটুকু বোঝে না কেন?"

ভুতো হাসিয়া কহিল, "দেখ না মেজকা ওদের একটু আক্কেল নেই।" শক্তিপদ হাসিতে সায় দিয়া কহিল, "তাহলে আর পাঠা বলেছে কেন? একটু ফুল বিল্বপত্রের লোভ দেখা, তাহলে নামবে খন।"

হাবা কহিল, "তাও করে দেখিচি কাকা!"

শক্তিপদ কহিল, "অগত্যা গলার দড়ি ধরে জলে নেমে টানতে হবে; চল, দেখি।"

শক্তিপদ ঐ বেশেই জলে পড়িল। তার পর ছাগল-গুলোকে সমবেতভাবে দড়ি ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া জলে নামাইল। এবং তাহাদের গা দলাই মলাই করিয়া স্নান করাইতে লাগিল। তাহারা তারস্বরে তাহাদের আপত্তি ঘোষণা করিল, কিন্তু কোন অনুযোগই টিকিল না!

শেষে, তাহাদের ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ডাঙায় ফেলিয়া দিতে দিতে বলিল, "যা বেটারা, মার কাছে যাবি, একটু শুদ্ধ হয়ে যাবিনে। চান করিয়ে দিচ্ছি, তাতেও আপত্তি—নইলে আর ছাগল বলেছে কেন?

তারপর ভ্রাতুষ্পুত্রদের দিকে চাহিয়া কহিল, "যারে পেঁচো, ভুতো, হাবা—ওদের দড়ি ধরে নে যা না। ঠাকুর মশায় জোর তাগাদা দেছেন, শীঘ্রি যেতে।"

ভাইপো ভুতো দুঃখিতভাবে কহিল, "তুমি না গেলে 'কোপ' করবে কে কাকা?" "আরে যারে বাবা! যাব 'খন। আগে একটু শুদ্ধু হয়ে নেই—সমস্ত গা যে ছাগলে গন্ধ হয়ে গেল। এক-থু। ছেলেরা ছাগল-দলের দড়ি ধরিয়া ঠাকুর দালানের পানে রওনা হইল।

তারপর পূজার গোলযোগ মিটিয়া গেলে গভীর রাতে শক্তিপদর খোঁজ পড়িল।

কোথাও সে নাই।

কেহ তাহাকে পুকুর হইতে উঠিতেও দেখে নাই। জাল টানিয়া টানিয়া হয়রাণ হইয়া শেষে পুকুরের এক কোণে তাহার শব পাওয়া গেল।

সমরেশ রুদ্ধশ্বাসে শুনিয়া কহিল, "তারপর আভা কি করলে? খুব কাঁদতে লাগল?"

আভার মা কহিলেন, "তাকে কেউ কাঁদতে দেখেনি। একটু কাঁদতে পারলে মেয়েটা বোধ হয় বেঁচে যেত। মুখে শুধু এক কথা, 'আমার স্বামী ত মরে নি। সে ত পুকুরে চান করতে গেছে—আবার সে ফিরে আসবে। তোমরা তাকে আমার কাছে আসতে দিচ্ছ না।' স্বামীকে সহসা মদ খেয়ে মাতলামি করতে দেখে সে দিন সে যেমন হেসেছিল, সে উচ্চ রোলের অট্টহাসি তার আজীবন অক্ষয় হয়ে রইল। সে হাসি অভাগীর মুখ দিয়ে যেন আর ঘুচল না। এখন ভাতের সঙ্গে মাছ না পেলে সে রাগ করে, পেড়ে কাপড় পরতে চায়। হাতের নোয়া হাত থেকে কেউ খুলতে পারে নি। মাঝে মাঝে নির্জন বিলের মধ্যে একলা গিয়ে বসে থাকে। শিকল দিয়েও বাঁধতে হয়েছিল দিন কতক। এখন আর কি করব, ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখি।"

"এমন সময় পাশের বন্ধ ঘর হইতে ললিত কণ্ঠে আভা তেমনি হা হা রবে উচ্চ হাসি হাসিয়া খাটের উপর গড়াইতে লাগিল।

সমরেশ শিহরিয়া উঠিল। এই প্রথম আভার হাসি তাহার কাছে বিভীষিকাপূর্ণ বোধ হইল।

আভার মা সভয়ে কহিলেন, "ঐ শোন!" সমরেশ নীরবে কি যেন ভাবিতে লাগিল। আভার মা কহিলেন, "সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আভাকে দেখতে যাবে ত চল।" এবার সমরেশ অনামনস্কভাবে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িল।

সে আভার মৃত্যু হইয়াছে। আজ ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সমরেশ মনকে কোন মতেই প্রস্তুত করিতে পারিল না।

রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা ১৩১৮ সালের ৩০শে আশ্বিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তখন কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছিল। সেই সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে সেদিন যা আলোচনা হয় তার সারমর্ম নীচে দেওয়া গেল। ইহা সেই সময়ে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। ঐ সালের ১১ই কার্তিক তিনি এ সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধ রিপন কলেজ হলে পাঠ করেন। পরবর্তী অগ্রহায়ণের প্রবাসী ও তত্ত্ববোধিনীতে উহা প্রকাশিত হয়।

"আজকাল যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়াতে পৃথিবীতে একটা কান্ড দেখা যাচ্ছে এই যে, বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে আদানপ্রদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। দূরদূরান্তরের লোকের আহার-বিহার, আচার অনুষ্ঠান একটা একীকরণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তেমনি বর্তমান যুগে আবার ঠিক উল্টা আর একটা ব্যাপারও দেখা দিয়েছে, কতকটা বিশ্বের কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিক শক্তির মতো। এ পর্যন্ত যে সমস্ত ছোট ছোট জাতি কোনো একটা বড় জাতির অন্তর্গত হয়ে আস্তে আস্তে আত্মবিসর্জন করছিল তারা ক্রমে যেন তাদের ঘুম ভেঙে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বেলজিয়ামের অন্তর্গত ফ্লেমিশ, অস্ট্রিয়া ও রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছোট ছোট রাজ্য, ইংলন্ডের অন্তর্গত আয়র্লন্ড এবং ওয়েল্‌স্ নিজেদের ভাষা, সাহিত্য, শাসন প্রণালী প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমস্ত অংশেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চাচ্ছে। এতদিন ইংলন্ড ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের যে সুখস্বপ্ন দেখছিল এবারকার ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে তা ভেঙেছে। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি থেকে সেখানকার যে সমস্ত প্রতিনিধি এসেছিলেন তাঁদের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, যেখানে ফেডারেশনের নামে কোথাও কারো স্বাতন্ত্র্যে একটুও আঘাত লাগে সেখানে কেউ ছেড়ে দিতে রাজি নয়, কাজেই ফেডারেশনের আশা ক্রমেই সুদূরপরাহত হয়ে পড়ছে, যদিবা এই ফেডারেশন এখন সম্ভব হত তাহলেও স্বভাবের নিয়মে এটা বেশী দিন টিঁকতে পারতো না। কারণ দূর দূরান্তরে অবস্থিত এত বড় প্রকান্ড একটা ব্যাপারকে একত্রে রাখা একটা অসম্ভব ব্যাপার। কেবল mechanical forceএর (জড় শক্তির) দ্বারা একত্র করলেই ত একত্র করা হয় না—বরং তাতে ভবিষ্যতের দ্বিগুণ বিরোধের পথ খোলা রাখা হয়। যেমন ধর আমাদের দেশের একটি বড় পরিবার, মুখে বলতে পারি যে, আমাদের পরিবার এক কিন্তু কাজে পদে পদে অনৈক্যের ঘোষণা করে খালি মুখে এক বললেই কি আমরা এক হয়ে গেলুম। আমাদের নানাজনের স্বার্থ নানাভিমুখী, কাজেই এই বিচিত্র স্বার্থ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করবেই। আমি হয়ত কম রোজগার করি বলে তুমি যে নাকি বেশী রোজগার কর তোমার মনে খট্‌কা লাগবেই। তোমার ছেলেরা খারাপ বলে আমার ছেলেদের হয়ত তাদের থেকে দূরে রাখা দরকার মনে করি। এ অবস্থায় যদি জোর করে আমরা একত্র থাকতে যাই তাহলে হবে এই যে একত্র থাকতে তো পারবই না মাঝের থেকে একটা explosion (বিস্ফোরণ) ঘটিয়ে আমরা বিচ্ছিন্ন হব। অতএব এই অবস্থায় আমার করা উচিত এই যে, বৃহৎ পরিবারকে আগে থেকেই বিভিন্ন করে দিয়ে কতকগুলি বিশেষ উৎসব নির্দিষ্ট করে দেওয়া যখন সকলে একত্র হবে। তাহলেই পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য এবং একতার একটি সামঞ্জস্য রক্ষিত হবে।

হিন্দু যে তার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে, এও বর্তমান কালের এই ভাবটি প্রকাশ করছে। এই দেখে কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন যে, তাহলে ত মুসলমানের সঙ্গে আমাদের মিলবার আর কোনো পথ থাকবে না। মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর একটা যথার্থ পার্থক্য আছে তা মানতেই হবে এই অবস্থায় কি করে তাদের সঙ্গে মেলা যায় সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। একদল বলছেন এই প্রভেদকে একেবারে ঘুচিয়ে দাও—এমন কি নিজেকে হিন্দু বলা পর্যন্ত ত্যাগ করো তাহলেই মুসলমানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারবে। এ কথাটা কি সত্য? ইংরেজদের সম্বন্ধে একদিন আমরা এই রকম একটা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলুম। আচারে, ব্যবহারে, আহারে, বিহারে, শয়নে-স্বপনে একদল লোক সাহেবিয়ানার অনুকরণে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল তা সকলেরই জানা কথা। এমন কি আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত লোক বিলাতে থাকতে আমি তাঁকে জন ব্রাইটের সঙ্গে এক সভায় বক্তৃতা করতে শুনেছি। সে এমন আশ্চর্য ব্যাপার যে তাঁর পরে ব্রাইট্ যখন বক্তৃতা করলেন তখন সকলেরই মনে হয়েছিল এমনি কি তফাৎ। তিনি যদি পার্লিয়ামেণ্টে ঢুকতেন ত সেখানকার বড় বড় বাগ্মীদের সঙ্গে যে টেক্কা দিতে পারতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সমস্ত অত্যদ্ভুত ক্ষমতা সত্ত্বেও আমাকে বলতেই হবে তিনি একটা ক্ষণিক বুদ্বুদ মাত্র। আমাদের সমাজ ও সভ্যতার আদর্শকে তিনি নিজের জীবনে উদ্ঘাটিত করতে পারেন নি যার দ্বারা বিশ্বমানব লাভবান হতে পারতো। সে আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে রামমোহন রায়ের মধ্যে। তিনি তাঁর জাতীয়তা থেকে ভ্রষ্ট না হয়েও বিদেশের সমস্ত উচ্চ আদর্শকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন এবং সেই জাতীয়তা সত্ত্বেও ইংরেজ, মুসলমান কারো সঙ্গেই মিলতে তাঁর বাধা হয় নি। রামমোহন রায় যে রকম অন্তরঙ্গভাবে ইংরেজদের সঙ্গে মিশতে পেরেছেন কোনো ইংরেজ-অনুকরণকারীর পক্ষে তা অসম্ভব, কারণ অনুকরণকারী স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ইংরেজের শ্রদ্ধা উদ্রেক করে না ঘৃণা উদ্রেক করে। এ যদি ইংরেজদের সম্বন্ধে সত্য হয় তা হলে আমি যদি নিজেকে হিন্দু না বলি বা আমি যদি মুসলমানের সঙ্গে আমার যা প্রভেদ আছে তা সমূলে উচ্ছেদ করে দি তাহলেই দেশের সমস্ত মৌলবীরা এসে আমার বাড়িতে দাড়ি নাড়তে আরম্ভ করবে এর কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে আমাকে কি করতে হবে? না মুসলমানের সঙ্গে আমার যে পার্থক্য আছে তাকে সার্থক করতে হবে। পার্থক্য বজায় রেখে আমাদের সমাজের ভিতরে যে অভিপ্রায়টি আছে তাকে বিকশিত করে তুলতে হবে, তা যদি না করি তা হলে আমরা আত্মহত্যা কোরবো এবং বিশ্বমানবকেও বঞ্চিত করবো। যদি করি তাহলে দেখবো যে আমরা এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছব যেখানে মুসলমান, ইংরেজ, আফগান সকলের সঙ্গেই আমরা মিশতে পারি।

যেমন ধর বাংলা এবং গুজরাটি ভাষার সম্বন্ধে, বাংলার সঙ্গে গুজরাটির একটা যথার্থ প্রভেদ আছে। আমার ইচ্ছা যে পরস্পর পরস্পরের ভাষার চর্চা করে বুঝতে পারে। তাহলে আমি কি করবো? আমি কি গুজরাটি ভাষাকে কেবল সংস্কৃতবহুল করে তুলে সকলের বোধগম্য করার চেষ্টা করবো? তাহলেই কি সব জাতি গুজরাটি ভাষার অনুশীলন করতে আরম্ভ করবে? না যদি ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের লোকেরা শুনতে পায় যে গুজরাটি ভাষায় খুব চমৎকার একটা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তাহলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? সেই সাহিত্যের সৃষ্টি যদি হতে হয় তাহলে কৃত্রিম উপায়ে গুজরাটি ভাষার বিশেষত্বকে ভেঙে দিলে চলবে না—তাকে তার স্বাভাবিক পথে চলতে দিতে হবে। তারপর সে যদি অপরূপ সাহিত্যের মধ্যে আপনাকে সার্থক করতে পারে ত অভিধান এবং ব্যাকরণের সমস্ত বাধা অতিক্রম করেও গুজরাটি ভাষা শিক্ষা করতে লোকে কুণ্ঠিত হবে না। আজ গুজরাটিতে বাংলা বই এত তর্জমা হচ্ছে কেন? না বাংলা এমন একটি সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছে যা সহজেই গুজরাটের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের গঠনভার গ্রহণ করেছেন হিন্দুর কোন্ আদর্শকে তাঁরা সামনে রেখেছেন সেইটেই বিবেচ্য। তাঁরা যদি হিন্দুত্ব বলতে এর নিম্ন এবং সংকীর্ণ অংশটাকেই বোঝেন তাহলে তার প্রতিবাদ করতেই হবে। আমি নিশ্চয় জানি সত্যের বিরুদ্ধ বলে সে চেষ্টা কখনো সফল হতে পারে না। তাঁরা যদি সত্য এবং ন্যায়ের চেয়ে উপরে বা তার সমান করে আচারের স্থান নির্দেশ করেন তাহলে বর্তমান হিন্দু সমাজের মত তাঁদের মধ্যেও সত্যের আসন নেবে যাবে। এই স্থানে আমাদের সমাজের অবস্থাটা একবার বিবেচনা করে দেখো। শাস্ত্রে আচারের উপরে বেশী জোর দেওয়াতে সমাজ আজ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির চেয়ে আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিকে বেশী সম্মান দিচ্ছে। অথচ সত্যনিষ্ঠ হওয়ার চেয়ে আচারনিষ্ঠ হওয়া ঢের বেশী সহজ, কাজেই আমাদের সমাজে ব্যক্তির উপরে সত্যের জন্য বিশেষ তাগিদ নেই—আচার রক্ষা হইলেই তার নিষ্কৃতি। তাই আজ বিধবা বিবাহ করলে লোকের জাত যায় আর উন্মত্ত ব্যভিচার সমাজে অসঙ্কোচে বিচরণ করছে।

বলতে পারো যে, যাঁরা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন ভার গ্রহণ করেছেন তাঁদের দ্বারা আচারপ্রধান আদর্শই স্থাপিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু তা নিয়ে দুঃখিত হলে চলবে না। যাঁরা যে ভাব নেন তাঁরা সেটার যোগ্য। হিন্দুর উদার আদর্শসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি যদি এ কাজে অগ্রসর না হন তাহলেই বোঝা যাবে এ কাজের যোগ্য তাঁরা নন।"

প্রশ্ন—আপনি বললেন যে ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে সংস্কৃতায়িত করলে তার ভিতরে সাহিত্যের প্রাণ বিকাশের অসুবিধা ঘটে, কিন্তু পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই সময়ে বলেছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষা কোন কালে কোনো জাতির কথ্য ভাষা ছিল না—এটি একটি তৈরী ভাষা যার দ্বারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যিকেরা আপনাদের ভাব প্রকাশ করেছেন। আপনার কথা যদি সত্য হয় তা হলে সংস্কৃতে এমন চমৎকার সাহিত্যের সৃষ্টি হল কি করে?

উত্তর—সংস্কৃত যে জনসাধারণের ভাষা ছিল না তার একটা প্রমাণ যে সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কোথাও তাদের কথা পাবে না। কেবল একখানা নাটকে ডোমটোমদের কথা আছে—সেও অতি সামান্য। কালিদাসের ঋতু সংহারে প্রকৃতির উৎসবের কাহিনী, কিন্তু তার মধ্যে কৃষক যারা প্রকৃতির মধ্যে নিত্যনিয়ত বাস করছে তাদের কোনো কথা নেই। বর্ষাকালের বর্ণনা হচ্ছে তাতে সকলেই আনন্দিত হচ্ছে কিন্তু আনন্দিত হচ্ছে না খালি চাষারা—তাদের নামগন্ধ কোথাও নেই। সেদিন কনটেম্পোরারি রিভিয়ুতে জর্জিয়ান আর্টের কথা পড়ছিলুম। তাতে লেখক বলছেন এ আর্ট কেবল একটা সম্প্রদায়ের (class) আর্ট ছিল—কেবল বড় বড় লোকের ছবি আঁকা হচ্ছে। সে সময়ের আর্ট আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সে আর্টে জনসাধারণের কোনো চিহ্নই নেই। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যও সেই রকম একটা সম্প্রদায়ের (class) সাহিত্য। কেবল রাজারাজড়াদের কাহিনীই চলছে। তখনকার কবিদের নজর কেবল যাঁর আশ্রমে তাঁরা ছিলেন তাঁর এবং তাঁর রাজসভার প্রতি—তাঁদের কি ভাল লাগবে না লাগবে সেইটেই তাঁদের বিশেষ বিবেচনা করবার বিষয় ছিল। যেমন ধর ভারতচন্দ্র রায়ের বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল। এই কাব্য দুটির কেবল মানুষ নয় দেবতাও উচ্চ চরিত্রের নয়। এতে কি এই প্রমাণ হয় যে বাংলাদেশের সমস্ত জনসাধারণ এই চাচ্ছিল? তা নয়। ঐ কাব্য দুটি ভারতচন্দ্র যে রাজার আশ্রিত ছিলেন তাঁর এবং তাঁর রাজসভার বিকৃত রুচির পরিচয় মাত্র। তাহলে বাংলার জনসাধারণের পরিচয় আছে কোন্ খানে? আছে কৃত্তিবাস কাশীরাম ও মুকুন্দরামে। মুকুন্দরামের মধ্যে বাংলার ভাঁড় দত্ত, কালকেতু প্রভৃতিকে আপনার লোক বলে চেনা যায়। গ্রামের কবি তাঁর চারদিকের সমাজকে তাঁর কাব্যে অঙ্কন করেছেন। কৃত্তিবাস পড়তে পড়তে স্পষ্টই বোঝা যায় ভক্তির স্রোতে বাংলার সমাজ তখন কি রকম অভিষিক্ত হয়ে গিয়েছিল। কৃত্তিবাসের রাবণ পর্যন্ত রামের প্রচ্ছন্ন ভক্ত।

এ সমস্ত বাধা সত্ত্বেও সংস্কৃত সাহিত্য এত বড় হল কি করে? কবিদের ব্যক্তিগত প্রতিভার জোরে তাঁরা তখনকার কালের প্রাকৃত ভাষায় ভাব প্রকাশ করেন নি কেন? কমিউনিকেশনের অভাববশত তখন প্রাকৃত ভাষা অল্প কিছুদূর অন্তরই রকম রকম ছিল, কাজেই ভারতবর্ষের সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লিঙ্গোয়া ফ্রাঙ্কাস্বরূপ (সাধারণ ভাষা) সংস্কৃতেই সকলে ভাব প্রকাশ করতেন। সংস্কৃত সাহিত্যের এক রামায়ণ মহাভারতকে জনসাধারণের কাব্য বলা যেতে পারে। ওর আখ্যানগুলি হয়ত আগে প্রাকৃত লোকদের মুখে মুখে চারিদিকে ছড়িয়েছিল। সেই সব crude (অপরিণত) প্রাকৃত কাব্য থেকে রামায়ণের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেই সব প্রাকৃত কাব্য এখন লোপ পেয়েছে।

আমাদের বাংলাদেশেও আমি এখন যে সব কবিতা লিখছি সেগুলি শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে। কিন্তু

খানেও একটা প্রাকৃত সাহিত্য এমনি লোকের মুখে মুখে চলছে এবং সেইজন্যে ক্রমে পরিবর্তিত ও নষ্ট হচ্ছে। তাই সাহিত্য পরিষদ থেকে সেগুলি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করা উচিত। এর মধ্যে যে সব অমূল্য রত্ন আছে তার পরিচয় বাউলের গানে কিছু পাওয়া যায়।

প্রশ্ন—ভারতবর্ষের মধ্যযুগে অনেক Sculpture ও Architectureএ (মূর্তি ও সৌধশিল্পে) তো জনসাধারণের চিত্র আছে। তবে সাহিত্যে নেই কেন?

উত্তর—হাঁ, সম্ভবত বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে আছে, কিন্তু সে এখনো অনাবিষ্কৃত। জনসাধারণের ধর্ম যেই এল অমনি শিল্পের মধ্যেও তার স্থান হল। আমাদের দেশের জনসাধারণ ধর্মেই জাগে।

সাধক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একদিন

ইংরেজি ১৯১৫-১৬ সালে একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয় তাহার সারমর্ম একটি পুরানো খাতা হইতে নিচে উদ্ধার করিলাম।

প্রশ্ন—সংসারে আমরা যে সমস্ত দুঃখ পাই, তাকে ঈশ্বরের দান বলে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করার উপদেশ আছে, কিন্তু সংসারের অনেক দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করলেই দেখা যায় সেগুলি আমাদের কোন না কোন ত্রুটিবশত ঘটেছে। সেগুলিকে তাঁর দান কি করে বলি?

উত্তর—যে সমস্ত দুঃখ আমাদের নিজের দোষে ঘটে, তাকে তিনি দিয়েছেন মনে করে আপনার ত্রুটির কথা ভুললে চলবে না। বরঞ্চ সেই ত্রুটির জন্যে অনুশোচনা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে সে রকম না হয় তার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এও মনে করতে হবে এ তাঁরই দান। ত্রুটিকে সংশোধন করবার জন্য হচ্ছে আঘাত। তবে সেই অনুশোচনাটাকে অত্যন্ত বাড়িয়ে তোলাটা স্বাস্থ্যকর নয়। যে সমস্ত দুঃখকে ভগবানের দান বলে গ্রহণ করবার কথা আছে সে হচ্ছে অন্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত দুঃখ। এই দুঃখকে প্রণতির দ্বারা গ্রহণ করতে হবে এবং তার ক্ষতিকে মন থেকে খেদিয়ে রাখতে হবে।

প্রশ্ন—সংসারের যা কিছু ঘটছে সমস্তই যখন তাঁর কাছ থেকেই হচ্ছে তখন অন্যায়ও ত তাঁর কাছ থেকেই হচ্ছে?

উত্তর—আমাদের দিক থেকে যেটা অন্যায় বলে বোধ হচ্ছে সেটা তাঁর দিক থেকে অন্যায় নয়। যেমন ধর একজন সৈনিক দেশের আক্রমণকারী শত্রুকে মারছে। তার কাজকে আমরা একজন ডাকাতের নরহত্যার সঙ্গে এক কোঠায় ফেলি না কারণ প্রথম ব্যক্তির কাজের ক্ষেত্র অনেক বড়। তার কাজকে বরং আমরা প্রশংসাই করি। ছোট সংসারের ক্ষেত্রেই যখন একই রকমের বিচারের মাপকাঠি (Standard of Judgement) আলাদা হয় তখন অনন্ত দেশকালব্যাপী যাঁর কাজ তাঁর কাজকে সাধারণ মানুষের মাপকাঠিতে মাপা কি উচিত? তিনি মানুষ করেছেন বটে, কিন্তু তিনি খুনী নন।

প্রশ্ন—আজকালকার দিনে মানুষের জীবিকা অর্জনের চেষ্টাই এত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে যে, সাধনার কথা ভাববার সময় করা শক্ত—এ অবস্থায় মানুষ সাধনা করবে কি করে?

উত্তর—যখনি একটু অবকাশ পাবে, তখনি নিজের ভিতরে যে একটি eternal element (অনন্ত সত্তা) আছে তার কথা ধ্যান করবে। তখন সব কাজের কথা ভুলতে চেষ্টা করবে—তোমার নামরূপ সমস্তই।

প্রশ্ন—তাহলে কি আমাদের কাজের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয় না এবং কাজগুলিকে নিতান্তই drudgery ও slavery বলে মনে হয় না?

উত্তর—না এতে করে কাজের গুরুত্ব কমবে না বরং কাজের মধ্যে একটা অনন্তের সুর লাগবে—একটি প্রসন্নতা ব্যাপ্ত হবে। কাজকে drudgery ও slavery মনে করা নিজের attitude-এর উপরে নির্ভর করে। অবশ্য কতকগুলি কাজ আছে যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে সাধনাকে সাহায্য করে যেমন দেশহিত বা লোকহিত। শুধু জীবিকা অর্জনের জন্য যে কাজ তার সম্বন্ধে অবশ্য এ কথা বলা যায় না। তাতে তোমার কাছ থেকে এইটুকু আশা করা যায় যে, তুমি যা করছ তাতে ফাঁকি দিচ্ছ না। ধর তুমি দেশহিত বা লোকহিত কিছু করতে পারছ না। জীবিকার জন্যে তোমায় মাস্টারি করতে হচ্ছে। তুমি আনন্দের সঙ্গে এ কাজ করার চেষ্টা করবে—মনে করবে আমি এই ছেলেদের মানুষ করার ভার নিয়েছি। কাজকে drudgery ও slavery বলে কখনো ভেবো না।

আমাদের প্রতিদিনের কাজগুলিকে গাছের পাতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তারা বাতাস থেকে আলো থেকে যে খাদ্য আহরণ করে তা গাছকে দিয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের গুরুত্ব ঐ অতটুকু, তারা আমাদের অনন্ত জীবনকে তার দেয়টুকু দিয়ে কোথায় চলে যায়।

প্রশ্ন—আমাদের শারীরিক জীবনের একটা ক্ষুধা আছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের সে রকম কোন ক্ষুধাবোধ নেই কেন?

উত্তর—মানুষের দুঃখ এবং অতৃপ্তিই তার আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষুধা। মানুষ ভাবে টাকা বা মান পেলেই তার কষ্ট দূর হবে, কিন্তু তা হয় না। এ দুটোই যার আছে তার হয়ত আর একটা কিছু দুঃখ আছে। হয়ত সব বিষয়ে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, যার টাকা নেই সেই বেশী সুখী। যাই হোক, ভূমাকে না পেলে মানুষের এই দুঃখ দূর হয় না।

মানুষের অবস্থাটা এখন বড় শোচনীয়। উভচর প্রাণীর মত আমরা এখন দৈহিক এবং আত্মিক দুটো জীবন যাপন করছি। আমাদের আধ্যাত্মিক বোধটা এখনো তেমন জাগ্রত হয়নি। কাজেই দৈহিক জীবনটাকে একমাত্র সত্য বলে মনে হয়। সেই জন্যেই মহাপুরুষদের সঙ্গ বা জীবনী পাঠ উপকারী। তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক বোধটি পূর্ণ বিকশিত।

ইংরেজী সাহিত্যে ইউরোপের পুনর্জন্ম

শত্রুঘ্ন রায়

গত মহাযুদ্ধ সারা জগতে একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। ইংরেজী সাহিত্যের সুর গেল বদলে, হঠাৎ যেন গানের মাঝখানে তাল ভঙ্গ হয়। ১৯১৭ সালে বের হল টি, এস, ইলিয়টের 'প্রুফ্রক' কবিতা। সকলে চমকে উঠল সে কবিতা পড়ে। রুপার্ট ব্রুক এক নিমেষে গেল বাতিল হয়ে।

হুসম্যান এবং রুপার্ট ব্রুক প্রমুখ জর্জিয়ান কবি। এ ছাড়া সাহিত্যে হাস্যরস পরিবেশন করে গেছেন, সার জেমস বারি, জেকবস বারি পেন প্রভৃতি। এ'দের সকলের লেখার মধ্যেই ১৯১৪ সালের পূর্বের ইংরেজ সমাজের নিখুঁত ছবি সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। অবশ্য বার্নার্ডশ বা এইচ, জি, ওয়েলস এবং হুসম্যান বা হার্ডির লেখার মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য যথেষ্ট আছে।

আর্নল্ড বেনেট্

এইচ, জি, ওয়েলস্

ব্রুক ও ইলিয়টের কবিতার মধ্যে দেখা গেল, আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ভাষায়, ভাবে, অধ্যাত্ম সম্পদে, মানব জীবনের রহস্য অনুসন্ধানে উভয়ের কবিতায় একটুও মিল নেই। উত্তর-সামরিক ও পূর্বসামরিক যুগের যে কোনও সাহিত্যিকের মধ্যেই এই তুলনামূলক বিভেদ দেখা যায়। এই পার্থক্য আরও প্রকট হবে যদি আমরা জয়েস, লরেন্স, হাকসলি এবং উইন্ড-হ্যাম লুইসের লেখার সঙ্গে ওয়েলস, বেনেট ও গলসওয়ার্দির লেখা পাশাপাশি রেখে সমালোচনা করি। সাহিত্য ক্ষেত্রে নবাগত লেখকগণ তুলনায় অনেক কম লিখেছেন। তাঁরা প্রধানত টেকনিকের ওপর নজর দিয়েছেন বেশী, জগতের মলিনতা তাঁদের চোখে ধরা দিয়েছে নতুন রূপে, মানব জীবনের ওপর তাঁরা আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। তাঁদের লেখা আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলে একটা অভিনব পটভূমি।

পূর্ব সামরিক যুগের লেখকদের মধ্যে নামকরা হচ্ছেন টমাস হার্ডি (অবশ্য তিনি নভেল লেখা কিছু আগে ছেড়ে দিয়ে ছিলেন), শ, ওয়েলস, কিপলিং, বেনেট, গলসওয়ার্দি ও জোসেফ কনর্যাড। কবিদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে, এ, ই,

কিন্তু একটি জিনিসের অভাব তাঁদের প্রায় সকলের লেখার মধ্যেই ধরা পড়েছে। তাঁদের নিজের সমাজের বাইরে কোন কিছুর সম্বন্ধে তাঁদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। তাঁরা যেন বহির্জগতের সমস্ত ঘটনাকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করে গেছেন। তাই অনেক বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও তাঁরা কেহই ইউরোপীয় ভাবধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নি। বেনেট ও গলসওয়ার্দি ফরাসী ও রুশ আদর্শ গ্রহণ করলেও সে আদর্শের সততা রক্ষা করতে পারেন নি।

এ'রা সকলেই মধ্যশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভদ্রলোকের জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। এ'দের মনে বিশ্বাস আছে এই রকম জীবনই চলবে চিরকাল ধরে; কালের সঙ্গে তাল রেখে এ জীবন সভ্যতার পথে আরও এগিয়ে যাবে। হার্ডি ও হুসম্যানের মত নৈরাশ্যবাদীরাও বিশ্বাস করেন, মানুষ এই-ভাবেই চলবে উন্নতির পথে। এ ছাড়া এ'রা সকলেই মানুষের অতীত ইতিহাসকে সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত করেছেন। বড় বিসদৃশ লাগে ইতিহাসকে এ'দের এই প্রকাশ্য উপেক্ষা। অতীতের ইতিহাসে কত গৌরবময় অধ্যায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে, রত্নের পরিপূর্ণ আকর রয়েছে সংগুপ্ত। এ'রা নির্লিপ্ত দর্শকের মত দূরে দাঁড়িয়ে শুধু দেখে গেছেন। উদাহরণ স্বরূপ আর্নল্ড বেনেটের নাম করা যেতে পারে। সাহিত্যিক সমালোচনা তিনি অনেক লিখেছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার প্রায় সকল গ্রন্থকেই তিনি উপেক্ষা করে গেছেন। সমসাময়িক লেখক-গণ ছাড়া অন্য কারও সম্বন্ধে তাঁর তেমন কৌতূহলও নেই। বার্নাড শর মতেও অতীতের অনেক কিছুই অনুন্নত ও জরা-

জীর্ণ বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত। এইচ, জি, ওয়েলস পৃথিবীর ইতিহাস লিখেছেন বটে, কিন্তু তিনিও অতীতের দিকে তাকিয়ে আছেন বিস্ময় ভরা বিরক্তির সঙ্গে। নিজের যুগের শ্রেষ্ঠত্ব মানুন আর না মানুন, পূর্ববর্তী কালের সাহিত্য সম্পদের ওপর তাঁদের অবিচার সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েচে। তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেন নি তাঁদেরই উত্তরাধিকারীরা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ কবিদের এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ফরাসী কবিদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে, আর মধ্যযুগের দার্শনিকদের চিন্তাধারাকে গরীয়ান করে তুলবে।

মোটামুটি বক্তব্য হচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষকে দুঃখ-কারার মাঝ থেকে উদ্ধার করে অনন্ত সুখের সন্ধান দিতে পারে, কিন্তু অন্ধের মত সে নিজের এই বিরাট সম্ভাবনার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ওয়েলসের লেখার মধ্যে ছড়িয়ে আছে আকাশ-কুসুম রচনা আর বিদ্রূপের মিহি ধার। কখনো তিনি লিখবেন, মানুষের যাত্রাপথ শুরু হয়েচে চাঁদের দেশে আর গহণ সাগরের তলায়; কখনো বা লিখবেন, ক্ষুদে দোকানদারেরা দেউলে হবার হাত থেকে রেহাই পেয়ে কোন মতে টিঁকে রয়েচে মফঃস্বলের ছোট ছোট শহরে। ওয়েলস কিন্তু বলে যাচ্ছেন,—

ডি, এইচ্, লরেন্স

টি, এস্, ইলিয়ট্

জেমস্ জয়েস্

অবশেষে স্বপ্নও বাস্তবে পরিণত হল। গত মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই লিখতে আরম্ভ করলেন, জয়েস, ইলিয়ট, পাউণ্ড, হাকস্‌লি, লরেন্স এবং উইণ্ডহ্যাম লুইস। এঁদের লেখা পড়লেই মনে হবে আত্মগরিমার বিষাক্ত বাষ্পে ভরা একটা বেলুন ফুটো হয়ে গেছে; সভ্যতার অগ্রগতির সম্বন্ধে ধারণা যেন ওলটপালট হয়ে গেছে। এঁদের ধারণা জগৎ উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে না, মানুষের জয়যাত্রার পথে পড়েচে বাধা। কেবলমাত্র মৃত্যু হার কমিয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা করে শত শত এরোপ্লেন ও দ্রুতগামী মোটরকার গড়িয়েই মানুষ উন্নত হয় না। এঁদের মধ্যে প্রায় সকলেরই মন অতীতের সুরে বাঁধা, সে যেন তার সমস্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার মুক্ত করে দিয়েচে এঁদেরই জন্য। রাজনীতির ধার এঁরা কেউ ধারেন না। পূর্বগামীদের মত নারীদের ভোটাধিকার, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ প্রভৃতি সংস্কারমূলক ব্যাপার নিয়ে এঁরা মোটেই মাথা ঘামান না। চার্চের ওপর পূর্বগামীদের চেয়ে এঁরা অনেকটা বন্ধুভাবাপন্ন। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীও অনেকটা রোম্যাণ্টিক যুগের লেখকদের মত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এইচ, জি, ওয়েলসের ছোট গল্পের বই 'The country of the blind' ও ডি, এইচ, লরেন্সের ছোট গল্পের বই 'England, my England' এবং 'The Prussian officer' তুলনা করা যেতে পারে। ওয়েলসের গল্পের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, আর তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিম্ন মধ্যশ্রেণীর ইংরেজ সমাজের আলেখ্য। তাঁর ক্ষুদে দোকানদারেরা যদি শুধু বিজ্ঞানসম্মতভাবে কাজ করে, তাহলেই তাদের সকল দুঃখের অবসান হবে। বিজ্ঞানই হচ্ছে 'সর্বজ্বরহর গজসিংহ'। অতএব ঢালো টাকা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য, সব সংস্কার গুঁড়ো হয়ে ডাষ্টবিনে জমা হবে, সব অশান্তির মূলোচ্ছেদ হবে।

লরেন্সের গল্পে বিজ্ঞানের ওপর এই বিশ্বাসের একান্ত অভাব, বরং একটু বিদ্বেষের ছোঁয়া আছে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট আগ্রহের ইঙ্গিতও নেই। এরূপ কোন আভাসও লরেন্স কোথাও দেন নি যে, সমাজ কর্তৃক নিপীড়িত কোন ব্যক্তি উন্নত ধরণে শিক্ষা পেলে জীবন সংগ্রামে জয়ী হবে। আমরা শুধু দেখি, তিনি জোর গলায় প্রচার করেচেন, সভ্য হয়েই মানুষ তার সব সম্পদ ফেলেচে হারিয়ে। তাঁর সব বই-এর বিষয়বস্তুই হচ্ছে যে, ইংরেজ ভাষাভাষী মানুষ জীবনকে সমগ্রভাবে উপভোগ করবার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েচে। তাদের যৌন জীবনকে লক্ষ্য করেই তিনি এই কথা বলেচেন। কিন্তু তাই বলে তিনি অবাধ যৌন স্বাধীনতার পক্ষে ওকালতি করেন নি। তিনি যা বলচেন তার সার মর্ম হচ্ছে যে, বর্তমান যুগের মানুষকে সম্পূর্ণ প্রাণবান বলা যায় না। হয় তার জীবনের গণ্ডী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অথবা সে সকল সীমানার বাইরে। লরেন্স কিন্তু তার সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশে অনিচ্ছুক। বর্তমান সমাজ গঠনকে তিনি সমগ্রভাবে গ্রহণ করেছেন এবং সামাজিক পরিবর্তনের সদিচ্ছা তাঁর গল্পের মধ্যে বিশেষ নেই। মানুষ বাস করবে বাদুড়ের মত পৃথিবীর

বুক আঁকড়ে ধরে; সে উপভোগ করবে ধরিত্রীর শস্যসম্পদ, আলো, জল; যৌন জীবনের ভিতর দিয়ে অনুভব করবে সে রক্তের ঝিরিঝিরি। অসভ্য ও আদিম মানুষের জীবন সভ্য লোকের চেয়ে অনেক বেশী সুসংগত, তারাই জীবনের উৎসধারা পান করে চলেছে অনাদিকাল থেকে। এরাই উত্তর ইটালীর বাসিন্দা সেই ইট্রাস্‌ক্যানরা, পূর্বরোমীয় যুগের লোক।

এইচ জি ওয়েল্‌সের মতে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের উন্নতির পথ প্রতিহত করে আদিমযুগে ফিরে যাওয়া বোকামির চূড়ান্ত। কিন্তু একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, ওয়েলসের বিজ্ঞান উপাসনা ও বার্ণার্ড শ'র ফেবিয়ান মতবাদের সংগে তুলনা করলে লরেন্সের আদর্শকে অনেক উঁচুতে স্থান দিতেই হবে। মহাযুদ্ধের ঘটনাবলীই উত্তর-সামরিক যুগের লেখকদের মতবাদ গঠন করতে সহায়তা করেছিল। উন্নতির পরিণতি হল পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম হত্যাকাণ্ডে। অবশ্য যুদ্ধ না ঘটলে বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার ওপর লরেন্সেরও অসন্তোষ পরিস্ফুট হয়ে উঠত।

এবার আমরা তুলনা করব দুখানি বিরাট নভেল,—জেমস্ জয়েসের 'Ulysses' ও জন্ গলস্‌ওয়ার্দির 'The Forsyte Saga.'

সাত বছর ধরে (১৯১৪ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত) জয়েস্ 'ইউলিসিস্' লিখেছিলেন। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোন কৌতূহল ছিল না এবং সে সময় তিনি ইটালী ও সুইজারল্যাণ্ডে সামান্য বেতনে শিক্ষকতা করতেন। ইউলিসিসের মধ্যে দুটি জিনিস ফুটে উঠেচে। প্রথমটি হচ্ছে টেক্‌নিকের ওপর লেখকের কড়া নজর। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বস্তুতান্ত্রিকতার জয়লাভ ও ধর্ম বিশ্বাসের অবসান হওয়াতে লেখকের মতে বর্তমান জীবন নিরর্থক ও নোংরামিতে ভরা।

একটি দিনের ঘটনাবলীর বিবরণ নিয়ে ইউলিসিস্ লেখা হয়েছে। ঘটনার সাক্ষী হচ্ছে একজন দরিদ্র ইহুদী ভ্রমণকারী। বইটা বাজারে বের হলে ভয়ানক হৈ চৈ পড়ে যায়। জয়েসের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল যে, তিনি স্বেচ্ছায় জগতের সমস্ত কদর্যতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন কর্মতালিকা খুঁটিয়ে বিচার করলে এত মলিনতা ও বোকামি ধরা পড়ে যে, জয়েসকে আমরা মোটেই অভিযুক্ত করতে পারি না। মানুষ চার্চের শিক্ষার ওপর আর আস্থা স্থাপন করতে পারছে না, কাজেই বর্তমান জগৎ সমগ্রভাবে নিরর্থক হয়ে দাঁড়িয়েচে। সারা বইখানায় লেখকের এই বিশ্বাসই চূড়ান্তভাবে ফুটে উঠেচে। বইখানার অনেক অংশ প্যারডিতে ভরা। ব্রোঞ্জ যুগের আইরিশ উপকথা আর সমসাময়িক সংবাদপত্রের খবর,—সব কিছুরই প্যারডি এতে পাওয়া যায়। সেই সময়কার নামকরা লেখকদের মত জয়েসও ইউরোপীয় সাহিত্য ও সুদূর অতীতের ভাবধারার ওপর তাঁর সাহিত্যিক জীবনের ভিত্তি গঠন করেচেন। বিংশ শতাব্দীর স্বাস্থ্যরক্ষার নীতিমালা আর মোটরকার তাঁকে আকৃষ্ট করে নি।

গলস্‌ওয়ার্দির বই ফরসাইট্ স্যাগার গণ্ডী ইউলিসিসের তুলনায় অনেক সংকীর্ণ। সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টির দিক থেকে বিচার করলে উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই হতে পারে না। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, দুখানি বইতেই আমরা তৎকালীন সমাজের একটা বিস্তৃত বিবরণ পেতে পারি। গলস্‌ওয়ার্দি সমাজের বিরুদ্ধে মুষল ধারণ করেচেন বটে, কিন্তু তিনি ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া সমাজ থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়েচেন। মানুষ একটু নিষ্ঠুর, মানুষ একটু অর্থ প্রিয় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন নয়, এই হচ্ছে মোটামুটি তাঁর মত। সমসাময়িক ইংরেজ সমাজের বাইরে কোন কিছুর সংগে তাঁর সংস্রব নেই, বিদেশীদের সম্বন্ধে তিনি পোষণ করতেন একটা ঘৃণার ভাব। জয়েস, ইলিয়ট্ অথবা লরেন্স আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সমগ্র মানব জাতির ইতিহাস রয়েচে, তাঁদের লেখার মধ্যে সংগুপ্ত, ইউরোপ ও অতীতের প্রতি তাকিয়ে দেখবার অধিকার তাঁদের আছে।

যুদ্ধোত্তর ও যুদ্ধ পূর্ব যুগের লেখকদের মধ্যে এই বিরাট বিভেদের একমাত্র কারণ হচ্ছে ১৯১৪—১৯১৮ সালের মহাযুদ্ধ। অবশ্য যুদ্ধ না ঘটলেও বর্তমান সভ্যতার ফলে এরূপ পরিস্থিতি ঘটা অসম্ভব ছিল না। যুদ্ধ শুধু দেখিয়েছিল, সভ্যতার উত্তুংগ শিখর কত শীঘ্র ধূলিসাৎ হতে পারে। যে ব্রিট্যানিয়া একদিন সাগরমেখলা ধরিত্রীর সর্বত্র তার আধিপত্য বিস্তার করেছিল, ১৯১৮ সালের পরে সেই সংকীর্ণ পৃথিবীর কুক্ষিগত হয়ে বাস করবার আশা সকলেরই কল্পনার বাইরে দাঁড়াল। বিগত কুড়ি বৎসরের ভয়াবহ ইতিহাসের একটা পরিণাম আমরা দেখতে পাই,—প্রাচীন সাহিত্যকে আধুনিক সাজে সজ্জিত করা। প্রতিহিংসা, দেশভক্তি, নির্বাসন, অত্যাচার, জাতিবিদ্বেষ, ধর্মবিশ্বাস, রাজভক্তি, দেশনায়কপ্রীতি যেন হঠাৎ বাস্তবে পরিণত হয়েচে। তৈমুরলংগ ও চেংগিস্ খাঁকে আর অবিশ্বাস্য জীবরূপে কল্পনা করা যায় না। ম্যাকেয়াভেলি পেয়েছে চিন্তাশীল দার্শনিকের আসন। যুদ্ধোত্তর সাহিত্যিকেরা ইংলণ্ডের শতাব্দীর কৃষ্টির মোহ ভেঙে দিয়েচে। তারা ইউরোপের সংগে মিতালী পাতিয়েচে, ঐতিহাসিক জ্ঞান তাঁরা এনেচে ফিরিয়ে। এই ভিত্তির ওপরেই বর্তমান ইংরেজী সাহিত্য হয়েচে স্থাপিত; এবং যে উৎস ইলিয়ট্ প্রমুখ সাহিত্যিকেরা প্রবাহিত করেচে তার ধারা এখনও অব্যাহত রয়েচে।

পান্থ পাদপ গাছ

হিমাংশু সরকার

উদ্ভিদের বহু অদ্ভুত সৃষ্টির মধ্যে পান্থ পাদপ জাতীয় গাছ একটি উদাহরণ। অনেকেই বোধ হয় এই জাতীয় গাছের সম্বন্ধে পূর্ব থেকেই জানেন। এই জাতীয় গাছের প্রকার ভেদ পৃথিবীর বহু স্থানেই পাওয়া যায়। এর মধ্যে এই গাছের প্রাচুর্য আফ্রিকা মহাদেশের জঙ্গলেই কিছু বেশী। এ ছাড়া বিভিন্ন স্থানের মরুভূমিতেও এই জাতীয় গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

এদেশের একটি পান্থ-পাদপ গাছ

এই গাছের বিশেষত্ব এই যে, গাছগুলো কাটবার পর এগুলো থেকে বহু পরিমাণে জলের মত রস নির্গত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ জঙ্গলে এবং মরুভূমিতে এই জাতীয় গাছের রস দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে। এই রস দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণের কথা অনেক ভ্রমণকারীর ভ্রমণ বিবরণীতে উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই পান্থ পাদপ গাছ লতা জাতীয় এবং বৃক্ষ জাতীয় হয়। আমাদের দেশে অনেক ধনী ব্যক্তিদের সখের বাগানে এই গাছের একটি জাত দেখতে পাওয়া যায়। এই গাছগুলোর পাতা অনেকটা কলাপাতার মত এবং ভূমি থেকে কিছু উপরে একটা শক্ত কাণ্ডের ওপর থেকে এই পাতাগুলো লম্বা ডাঁটাশুদ্ধ একটার পর একটা সাজান থাকে। ইংরেজীতে একে ট্রাভ্‌লারস্ ট্রী বলে। নাম থেকেই বোঝা যায় যে, ভ্রমণ সংক্রান্ত কিছু থেকেই এই নামের উৎপত্তি। এই গাছের গা কোন কিছু ধারাল অস্ত্র দ্বারা চেরবার পর এর থেকে জলের মত রস বহু পরিমাণে বের হয়। তবে দেখা গেছে যে, এদেশে এই ট্রাভ্‌লারস্ ট্রী'র গা থেকে চেরবার পর খুব সামান্য পরিমাণে রস বের হয়। আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থানের জঙ্গলে এই পান্থ পাদপ জাতীয় গাছ কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে এই গাছের সম্বন্ধে ভালরূপে অনুসন্ধান না করার দরুণ এর সম্বন্ধে আমাদের দেশে এ পর্যন্ত খুব বেশী জানা যায় নি।

এই প্রবন্ধে আমি এই পান্থ পাদপ গাছের লতা জাতীয় গাছের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করব। ঘটনাটি আমি আমার পিতা, ডাঃ সরসীলাল সরকারের নিকট শুনেছিলাম।

বহুদিন পূর্বে চাম্পারণ ডিস্ট্রিক্টে যখন ত্রিবেণী ক্যানাল খোঁড়া হচ্ছিল, তখন সেই স্থানে আমার পিতা গভর্নমেণ্ট হতে নিযুক্ত ডাক্তার ছিলেন। রায় বাহাদুর শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মহাশয়ও তখন ঐস্থানে গভর্নমেণ্টের ইঞ্জিনিয়াররূপে কাজ করছিলেন। ক্যানেলের কাজ তখন গণ্ডক নদীর উপরস্থ ভইসা-লোটন নামক স্থানে হচ্ছিল।

একদিন রায় বাহাদুর ব্যানার্জি এবং আমার পিতা বন ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করবার জন্য বের হয়ে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেন। কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর পিতা তৃষ্ণার্ত হয়ে রায় বাহাদুর ব্যানার্জির মনোযোগ আকর্ষণ করেন— কারণ তাঁদের সঙ্গে কোনরূপ পানীয় জলের বন্দোবস্ত ছিল না। রায় বাহাদুর ব্যানার্জি তখন পিতাকে জানান যে, পানীয় জলের জন্য কোনরূপ চিন্তার কারণ নেই, কারণ তিনি বলেন যে, ঐ বনে একরূপ লতা জাতীয় গাছ আছে, যেগুলো কাটবামাত্র তার থেকে সুন্দর পানীয় জলের মত রস পাওয়া যায়। সঙ্গের লোকদের সাহায্যে শীঘ্রই এই গাছ খুঁজে বার করে একটা দা দিয়ে গাছটির গোড়াটা কাটবামাত্র তার থেকে প্রচুর জলের মত রস নির্গত হতে লাগল। একটা পাত্রে করে এই রস সংগ্রহ করে দেখা গেল যে, ইহা পরিষ্কার জলেরই মত। শৈলেন্দ্রবাবুর কথামত ঐ জলের মত রস পান করে পিতা ঠিক জলপানের মতই তৃপ্তিলাভ করলেন।

সেই সময় পিতার বন্ধু রায় বাহাদুর ডাঃ হীরালাল সিংহ মহাশয় গভর্নমেণ্টের কেমিক্যাল একজামিনারের পদে অধিষ্ঠিত থাকায় পিতা কিছু পরিমাণে এ লতার রস রায় বাহাদুর ডাঃ সিংহের নিকট পরীক্ষার জন্য পাঠান। তিনি এই রস পরীক্ষা করে জানান যে, এই রস চোয়ান জলের মতই পরিষ্কার, তবে এতে অতি সামান্য পরিমাণে গঁদের মত বস্তু আছে।

পরে এই লতার কিছু অংশ শিবপুরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব বোটানিক্যাল গার্ডেনের নিকট পাঠান হয়। তিনি জানান যে, ইহা একটি Vitis speciesএর গাছ। এদেশে এই speciesএর তিনটি গাছ পাওয়া যায়। খুব সম্ভব এইটির

(শেষাংশ ৩০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হীরেন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় গত মঙ্গলবার প্রায় দেড় ঘটিকার সময় শ্যামবাজারে তাঁহার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটস্থ বাস-ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ একজন বৈদান্তিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও প্রগাঢ় দেশপ্রেমিককে হারাইয়াছে। মৃত্যুকালে শ্রীযুত দত্তের ৭৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারী কলিকাতার চোরবাগানের বিখ্যাত দত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল গড়গোবিন্দপুরে। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ দত্ত ইঁহার পিতা; তিনি ১৮৮৪ সালে চোরবাগান হইতে উঠিয়া শ্যামপুকুরে ১৩৯নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে বাড়ি নির্মাণ করিয়া বসবাস করেন। হীরেন্দ্রবাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র।

বাল্যকাল হইতেই হীরেন্দ্রবাবু খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে হীরেন্দ্রবাবু পর পর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলিই বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি বি এ পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করেন। তৎপর ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম এ পাশ করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। পরবর্তী বৎসর তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তৎপর বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি এটর্নীসিপ পরীক্ষায় পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নীর কাজে যোগদান করেন এবং তদবধি তিনি ঐ কার্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি বিখ্যাত এটর্নী ফার্ম মেসার্স এইচ এন দত্ত এন্ড কোম্পানীর সিনিয়ার পার্টনার ছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে ১৯০২—৩ সালে হীরেন্দ্র-নাথকে যখন আমরা দেখি, তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসরের কম। কিন্তু সেই সময়েই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার খ্যাতি বাঙলার বিদ্বৎ সমাজে—যুবক ও ছাত্রমহলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন উজ্জ্বল রত্ন; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র মন্থন করিয়া সেই সময়েই তিনি অমৃত আহরণ করিয়া মাতৃভাষায় পরিবেশন করিতেছিলেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই যে একটা বিশেষ দিক তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন, চিরজীবন তাহারই সাধনা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের জাতীয় সম্পদ—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান বাঙলাভাষার মধ্য দিয়া জাতির নিকট তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া প্রচার করিয়াছেন। ভগীরথ যেমন ধূর্জটীর জটাজাল হইতে জাহ্নবী-প্রবাহকে মর্ত্যলোকে আনয়ন করিয়াছিলেন, প্রাচ্য সংস্কৃতির ভাবধারা তিনি তেমনি আধুনিক বাঙালী জাতির নিকট বহন করিয়া আনিয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্লাবন হইতে বাঙালীকে জাতির বহির্মুখী চিত্তকে রক্ষা করিবার জন্য মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি যে কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, হীরেন্দ্রনাথ তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়া জাতির জন্য জ্ঞানযোগীর মত সাধনা করিয়াছেন। তাঁহার এই কার্যের মূল্য আজ হয়ত সকলে না বুঝিতে পারেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে।

হীরেন্দ্রনাথের স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রেম কিরূপ গভীর ছিল, তাহার পরিচয় স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমরা পাইয়াছি। স্বদেশী আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তিনিও ছিলেন অন্যতম প্রধান কর্মী। তখনকার নব জাতীয়তা আন্দোলনের তিনিও ছিলেন অন্যতম প্রবর্তক। সে যুগে 'মডারেট' বা নরমপন্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যে 'গরম' পন্থী দল দাঁড়াইয়াছিলেন, হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই দলেরই একজন নেতা। পরবর্তীকালে মিসেস বেশান্ত, লোকমান্য তিলক প্রভৃতি যে 'হোমরুল' আন্দোলন প্রবর্তন করেন, হীরেন্দ্র-নাথ তাহাতেও প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের তিনি একজন প্রধান কর্মী ছিলেন এবং ১৯২০ সাল পর্যন্ত নিয়মিতভাবে কংগ্রেসে যোগদান করিতেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যে 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন' আরম্ভ হইয়াছিল, হীরেন্দ্রনাথ তাহাতে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া বহু লোক এ আন্দোলনে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদে

তিনি প্রথম হইতেই ছিলেন। আন্দোলন মন্দীভূত হইবার পরে অনেকে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ সেই দুঃসময়েও উহাকে ত্যাগ করেন নাই। অভিত্যাগিকের মত তিনিই একান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় স্যার রাসবিহারী ঘোষের বিরাট দান সংগৃহীত হইয়াছিল এবং আজ যে যাদবপুরের বিরাট জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে হীরেন্দ্রনাথের অক্লান্ত সাধনা ও কর্মশক্তির দান কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

বাঙলার আর একটি মুখ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎও' হীরেন্দ্রনাথের নিকট অশেষ ঋণে ঋণী। এই প্রতিষ্ঠানেও প্রথম হইতেই হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন এবং সমস্ত বাধাবিঘ্ন, বিপদ-আপদের মধ্য দিয়া উহার সেবা করিয়া আসিয়াছেন। সাহিত্য পরিষৎ যে আজ বাঙালী জাতির গৌরবের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় মনস্বী হীরেন্দ্রনাথের দানও অসামান্য। বাঙলার আর একটি প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল থিওজফিক্যাল সোসাইটি' বা তত্ত্ববিদ্যা সমিতির প্রতিষ্ঠার মূলেও হীরেন্দ্রনাথের কর্মশক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল। পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, অশেষ শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য নিখিল ভারত থিওজফিক্যাল সোসাইটিতেও তাঁহার আসন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের আজীবন সৌহার্দ্য ও ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বাঙলার এই দুই অসামান্য প্রতিভাই বাঙালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য যে আধুনিককালে সমধিক নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শেষ জীবনে বার্ধক্যও জ্ঞানযোগী হীরেন্দ্রনাথকে অবসন্ন করিতে পারে নাই। মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা ও প্রচার করিয়াছেন। গত ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুস্মৃতিসভায় কলিকাতা টাউন হলে হীরেন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সার্বজনিক অনুষ্ঠানে উহাই তাঁহার শেষ যোগদান। সেদিনও ভাবি নাই, এত শীঘ্র তিনি আমাদের মধ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতির নহে, সমগ্র ভারতের যে অপরিসীম ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার অমর আত্মা তাঁহার চিরদিনের আকাঙ্ক্ষিত ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করুক, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পান্থ পাদপ গাছ

(৩০৩ পৃষ্ঠার পর)

বৈজ্ঞানিক নাম Vitis repanda; তবে এই গাছ কাটলে যে প্রচুর পরিমাণে জলের মত রস বার হয়, সে কথা না জানা থাকার দরুণ তিনি গভর্নমেন্টের ইকনমিকস্ বোটানিস্টের তৎকালীন অফিস, ১নং সদর স্ট্রীটে খোঁজ নিতে বলেন। সেখানে খোঁজ নেওয়ায় ইকনমিক্স্ বোটানিস্ট জানান যে, ঐটি একটি দ্রাক্ষা জাতীয় গাছ, তবে এর থেকে যে প্রচুর জলের মত রস বের হয়, সেটা সম্বন্ধে তিনি কোনরূপে সঠিক খবর দিতে পারেন না।

কিছুদিন পূর্বে দেওঘরে থাকাকালীন পিতা বোটানির প্রফেসার ডাঃ সহায়রাম বসুর নিকট কথা প্রসঙ্গে এই গাছের কথা বলেন। ডাঃ বসু তখন পিতাকে বলেন যে, তাঁরও এক বন্ধু শ্রীসুশীলকুমার সেন ভাওয়াল রাজার জঙ্গলে ভ্রমণকালে এইরূপ গাছের অভিজ্ঞতার কথা তাঁর নিকট বলেছিলেন। ডাঃ বসু এবং আমার পিতা এ সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে ৩।৫ পুরান পল্টন, রমনা, ঢাকায় সুশীলবাবুকে ঐ জাতীয় কিছু অংশ ডাকযোগে দেওঘরে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। সুশীলবাবু তখন ডাঃ বসুকে ঐ গাছের দুটি টুকরা পাঠান। এর মধ্যে যে টুকুরাটি কিছু পরিমাণে সজীব ছিল, সেটিকে একটি টবে পুঁতে জীবিত করবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেটা সফল হয় না।

এই প্রবন্ধের শেষে আমি আমাদের দেশের উৎসাহী অনুসন্ধানকারীদের এই জাতীয় গাছ নিয়ে কোনরূপ গবেষণা করা সম্ভব কি না, এ সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তা করে দেখবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

খাদ্য সমস্যা

শ্রীক্ষিতিনাথ সুর

বাঙালীর অন্নবস্ত্রের সমস্যা বর্তমানে খুব জটিল ও আতঙ্কজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার আশু সমাধান না হইলে সাধারণ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের দুর্দশার অন্ত থাকিবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সুতরাং চিন্তাশীল বাঙালীর এই দিকে দৃষ্টি দিয়া যতটুকু ব্যবস্থা করা যায়, তাহার জন্য চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য।

অধিকতর খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করা সম্পর্কে সরকারী প্রচারকার্য চলিতেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এজন্য যতবেশী প্রচারকার্য করা দরকার এবং যত বেশী দেশসেবক কর্মীর সহায়তা প্রয়োজন তাহা হয় নাই। তাহা হইলেও আন্দোলন অত্যন্ত সুসময়ে শুরু হইয়াছে। বাঙলা দেশ চাউলে আত্মপোষক নয়। এইজন্য প্রতি বৎসর ব্রহ্মদেশ, শ্যাম প্রভৃতি স্থান হইতে চার কোটি মণ চাউল আমাদের দেশে আমদানী হয়। বর্তমান বৎসরে তাহা আদৌ আসিবে না। তদুপরি সরকারী চুক্তির জন্য প্রতি মাসে কয়েক লক্ষ মণ করিয়া চাউল সিংহলে প্রেরণ করিতে হইবে। ইহাতে বাঙলায় অভাব আরও বাড়িবে। কিন্তু তাহা সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই।

দেশের সাধারণ লোক এবং কৃষকরা এই সব ব্যাপার অনেক সময় খবর রাখে না। দেশের এইসব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে দেশে প্রচুর খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হয় তাহার জন্য সকলকে চেষ্টা করিতে হইবে। সরকারী প্রচারকার্যের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। আমাদের খাদ্যের মধ্যে চাউলই প্রধান। সেজন্য যাহাতে ধানের চাষ আরও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাহা করিতে হইবে। তাহা বাদে বিভিন্ন প্রকারের ফল, আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য যাহাতে বর্তমান মরসুমেই অন্য বৎসরের অপেক্ষা অনেক বেশী আবাদ হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মুসুর, মটর প্রভৃতি ডালের চাষ যত বেশী হয় তত ভাল। এইসব দ্রব্যের চাষ বর্ষার পরেই আরম্ভ হইবে—সুতরাং এখনো আন্দোলন চালাইয়া কৃষকদের সজাগ করিবার সময় আছে।

আমাদের নিত্য আবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অনেকগুলি বাঙলার বাহির, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসে। একটু প্রচারকার্য চালাইয়া কৃষকদের সজাগ করিতে পারিলে বর্তমান বৎসরেই তাহার কিছু প্রতিকার হইতে পারে। যদি আমাদের বাঁচিতে হয়, তবে ইহা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এইজন্য যতটা প্রচারকার্য হওয়া দরকার তাহার অনেকটা সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রের দ্বারা হইতে পারে। কিন্তু তাহা হয় নাই। এইদিকে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সকলের কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার। তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা শীঘ্র ও সাফল্যের সহিত জনমত গঠন করিতে পারিবেন।

গত কয়েক মাসের মধ্যে সরিষার তেলের দাম দ্বিগুণ হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহা আরও বাড়িবে। বিহার সংযুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে নিয়মিতভাবে ইহা আসা আরম্ভ হইলেও, দূর পল্লীগ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র লোকদিগকে দীর্ঘ দিন বর্ধিত মূল্যে ইহা কিনিতে হইবে। বাঙলা দেশের অনেক স্থানে সরিষা বেশ ভালভাবেই উৎপন্ন হয়। কার্তিক মাসে ইহা বোনা হয়; সুতরাং এখনো চেষ্টা চলিলে আগামী মরসুমেই ইহার চাষ বাড়িতে পারে। বাঙলায় বৎসরে ২০ লক্ষ মণ সরিষার তেল আমদানী হয়। তাহা বাদে, কলিকাতা শহরে ২৬ লক্ষ ১৮ হাজার মণ সরিষা ও রাই আমদানী হয়। ইহার প্রধান অংশ বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে আসে। সরিষা কলিকাতা শহর বাদে বাঙলার অনেক শহরে ও গঞ্জে ব্যবসায়ীরা স্বতন্ত্রভাবে আমদানী করিয়া থাকেন—সুতরাং মোট আমদানীর পরিমাণ আরও অনেক বেশী। সরিষার চাষ বাড়িলে খইলও দেশে বেশী উৎপন্ন হইবে। উহা জমির সার ও গো-মহিষাদির খাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারিবে। বৎসরে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মণ খইল বাঙলায় আমদানী হয়।

সরিষা সম্পর্কে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা কর্তব্য। ঘি-র দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার জন্য সাধারণ বাঙালী ঘি ব্যবহার করিতে পারে না। তৈলজাতীয় উপাদানের মধ্যে একমাত্র সরিষার তৈলই বাঙালীর সাধারণ খাদ্য। ভারতের অন্যান্য অনেক অঞ্চলে নারিকেলের তেল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অভ্যাসবশত বাঙালী তাহা এখনও পারে নাই এবং বর্তমান অবস্থায় তাহাও সরিষার তেল অপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। সুতরাং নারিকেল তেল পরীক্ষা এখন চলিতে পারে না আমাদের সরিষার তেলের উপরই নির্ভর করিতে হইবে।

ডাল-কলাই সম্পর্কেও বাঙালী পরনির্ভরশীল। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ৯ লক্ষ ৯৬ হাজার মণ ডাল-কলাই বাঙলার বাহির হইতে কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে। বাঙলায় মোট আমদানীর পরিমাণ উহা অপেক্ষা অনেক বেশী। এখনো ব্যবস্থা করিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে। ইহার জন্য প্রবল প্রচারকার্য আবশ্যক এবং তাহা আজই আরম্ভ করিতে হইবে।

চিনি-গুড়ের ব্যাপারেও বাঙালী প্রচুর পরিমাণে পরনির্ভরশীল। এক কলিকাতা শহরেই ১১ লক্ষ ৪৫ হাজার মণ গুড় বা গুড়জাতীয় জিনিস আমদানী হইয়া থাকে। বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে কলিকাতায় পূর্বোক্ত বৎসরে চিনি আসিয়াছে ৭ লক্ষ ৩২ হাজার মণ। যাভা চিনির হিসাব ধরিলে আরও অনেক বেশী হইবে। যাভা চিনি বন্ধ হওয়ায় সমস্যা সঙ্গীণ হইয়াছে। সরকারী বিবরণে দেখা যাইতেছে, ভারতে

প্রচুর চিনি মজুত আছে—চিনির অভাব নাই। কিন্তু কার্যত চিনির মূল্য এত বাড়িয়াছে ও উহা এত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে, ধনীদের নিকটও চিনি বিলাসদ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। এই সমস্যার আশু সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। তবে আগামী মরসুমে যাহাতে আখ চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, তাহার জন্য এখন হইতেই সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্ট হওয়া দরকার। বাঙলা দেশে এখনো বহু জমি অনাবাদি পড়িয়া থাকে। সেই সব অঞ্চলে যাহাতে আখের চাষ আরম্ভ হয় বা বৃদ্ধি হয়, তাহা করা দরকার। গুড় আমাদের দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের একটি প্রিয় ও প্রধান খাদ্যদ্রব্য। ইহার স্থায়ী অভাব অত্যন্ত গভীরভাবে অনুভূত হইবে। ইহা বাদে আর একটা কথা ভাবিয়া দেখা উচিত—চিনির কারখানাগুলি প্রধানত বিহার ও যুক্তপ্রদেশে অবস্থিত। কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়া অন্যায়। ইহাতে অযথা অনেক অর্থ নষ্ট হয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়।

আরও কয়েকটি দ্রব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। আলু বাঙালীর, বিশেষত শহর অঞ্চলের অধিবাসীদের নিত্যব্যবহার্য অথচ পুষ্টিকর ও প্রিয় খাদ্য। কিন্তু ইহাতেও বাঙলার বাহিরের উপর নির্ভর করিতে হয়। ব্রহ্মদেশ হইতে প্রচুর আলু আসিত, বর্তমানে তাহা বন্ধ। কিন্তু তাহা বাদে মহিশূর, নৈনিতাল, আসাম, যুক্তপ্রদেশ বিহার প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও প্রচুর আলু কলিকাতা ও বাঙলা দেশের গঞ্জে গঞ্জে আমদানী হয়। ব্রহ্মদেশ ও যুক্তপ্রদেশ হইতে ৬০ লক্ষ মণ আলু আমদানী হইয়া থাকে। আলুর চাষের সময় আসিতেছে, এখন হইতে এদিকে দৃষ্টি দিলে কিছু প্রতিকার হইতে পারে। তবে ব্রহ্মদেশীয় আলুর অভাব সামলাইয়া উঠা সহজ নহে।

পেঁয়াজ আমাদের দেশের কৃষকদের প্রিয় খাদ্য। কিন্তু ইহাতেও বাঙলা আত্মপোষক নয়। প্রচুর পরিমাণে পেঁয়াজ বিহার, বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসে। ইহার চাষের সময় আসিতেছে—ইহার চাষ যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার জন্য চেষ্টা করা দরকার।

এই ব্যাপারে অধিক আলোচনা করিয়া লাভ নাই। এই সমস্যার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি অবিলম্বে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। নিজেদের সমস্যা ও অসুবিধা নিজেরা অনুভব করিয়া নিজেরাই তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিলে, অন্য কেহ তাহা করিয়া দিবে না। বাঙলা দেশের সকল জনহিতকর সাধারণ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিত লোকেরা ইহার প্রতি মনোযোগী না হইলে ইহার সমাধান হইবে না। কারণ, কৃষকরা ইহার গুরুত্ব বুঝিবে না। তাহা বাদে, পাটের কাঁচা টাকার লোভে তাহারা নিজেদের স্বার্থের প্রতিও চাহিয়া দেখিতে চাহিবে না। অধিকতর খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিবার প্রশ্ন আজ বাঙালীর জীবন-মরণের প্রশ্ন—ইহার প্রতি উদাসীন দৃষ্টিতে চাহিয়া অপরের কর্তব্যবুদ্ধির উপর নির্ভর করিবার মত আত্মঘাতী নীতি যেন আমরা গ্রহণ না করি।

পরলোকে হরদয়াল নাগ

গত ২০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার রাত্রি সাড়ে দশটার সময় বাঙলার বর্ষীয়ান জননেতা শ্রীযুত হরদয়াল নাগ তাঁহার চাঁদপুরস্থিত হরদয়াল কুটীরে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯০ বৎসর হইয়াছিল।
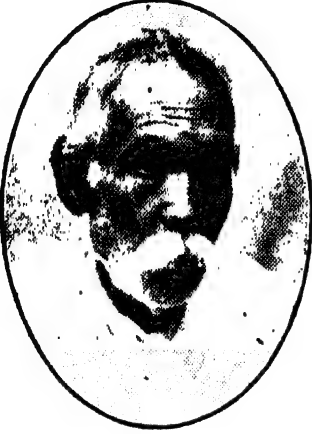
শ্রীযুত হরদয়াল নাগ চাঁদপুর মহকুমার কাশিমপুর নামক গ্রামে বাঙলা ১২৬০ সালের ২৯শে ভাদ্র (১৮৫৩ ইং সালের সেপ্টেম্বর) অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গুরুপ্রসাদ নাগ। তিনি তাঁহার পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ আরও দুইটি ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীযুত নাগ মহাশয়ের নয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি স্বগ্রামে থাকিয়াই প্রথম লেখাপড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ স্থির করেন যে, তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা করিয়া বিদেশে অর্থোপার্জন করিবেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত নাগ মহাশয় নিজ বাড়িতে থাকিয়া নিজেদের বিষয় সম্পত্তি শাসন ও সংরক্ষণ করিবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই ব্যবস্থা কার্যে পরিণত হয় নাই।

তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইং ১৮৮৪ সালের নভেম্বর মাসে চাঁদপুরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি আইন ব্যবসায় সুনাম অর্জন করেন এবং প্রথম শ্রেণীর আইন ব্যবসায়ী বলিয়া পরিগণিত হন।

তিনি আইন ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বহু বৎসর যাবৎ বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। আইন ব্যবসায় কার্য কালীন তিনি স্থানীয় সর্বপ্রকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও জনসাধারণের কল্যাণজনক আন্দোলন ও অনুষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যানস্বরূপে বহু বৎসর কার্য করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের তিনি একজন পূর্ণ সমর্থক। দেশসেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া দেশের ডাকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় ব্যারিস্টারী ছাড়ার পর ইং ১৯২১ সালের ২৪শে জানুয়ারী সর্বসাধারণের সভায় তিনি আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন এবং তার পর হইতে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আজীবন কংগ্রেস নীতিতে বিশ্বাসী এবং আজ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে চরকাসেবী ছিলেন।

তিনি ইং ১৮৮৬ সালে জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেসের) প্রথম কলিকাতা অধিবেশনে যোগদান করেন এবং তারপর হইতে ইং ১৯২২ সালে কংগ্রেসের কোকনদ অধিবেশন পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনে যোগ দিয়াছেন এবং তিনি বহুকাল নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্য ছিলেন।

শ্রীযুত নাগ মহাশয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনে যোগ দিয়াছেন। ইং ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বহরমপুর বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তথায় এক সার গর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি ইং ১৯২১ ও ১৯২২ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ডিক্টেটর নিযুক্ত হইয়া বাঙলার বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের আদর্শ সম্বন্ধে বহু সভায় বক্তৃতা করেন। ইং ১৯৩০ সালে ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জিলায় লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের ডিক্টেটর নিযুক্ত হইয়া নোয়াখালি অবস্থান করতঃ আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে শ্রীযুত নাগ মহাশয় ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবে পৌরোহিত্য করিবার জন্য শ্রীযুত নাগ মহাশয়ই যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া কলিকাতায় আমন্ত্রিত হন এবং ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে দেশবন্ধু পার্কে তিনি বিরাট জনতার সম্মুখে 'জাতীয় পতাকা' উত্তোলন করেন। তারপর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রায় দশ হাজার লোকের সভায় বক্তৃতা করেন। স্বদেশপ্রাণ ও সর্বত্যাগী এই নেতার প্রতি কলিকাতাবাসীরা ঐ সময় উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে প্রবল আন্দোলন হইয়াছিল ঐ সময় কংগ্রেস নেতৃগণ জাতির শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে যে নীতি সমর্থন করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং যে আন্দোলনের ফলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয়, ঐ সময় শ্রীযুত নাগ মহাশয়ের চেষ্টায় ও উদ্যোগে ১৯০৬ সালের মে মাসে "চাঁদপুর জাতীয় বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একমাত্র তাঁহারই অদম্য ও অক্লান্ত চেষ্টায় আজ পর্যন্ত দাঁড়াইয়া আছে। তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চাঁদপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের স্থান সম্বন্ধে এক বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় এবং স্থানীয় জনসাধারণের ঔদাসীন্যে বিক্ষুব্ধ হইয়া নাগ মহাশয় ৭ দিন অনশন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুত নাগ মহাশয় বহু বৎসর যাবৎ ত্রিপুরা জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং আজীবন চাঁদপুর মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কংগ্রেসের কাজে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি মহকুমার গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিতেন। তিনি কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যের নীতিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী এবং মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংসা আন্দোলনের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ১৯২১ ও ১৯২৫ ইং সালে বাঙলা প্রদেশে পরিভ্রমণকালে দুইবার চাঁদপুরে আগমন করিয়াছিলেন। ঐ

সময় তিনি নাগ মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ, ৺বিপিনচন্দ্র পাল, ৺দেশবন্ধু দাশ, ৺দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত, ৺দীনবন্ধু এন্ডরুজ, ৺শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ৺ভূপেন্দ্র বসু, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, ডাক্তার ৺প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, ৺জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জি, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, কর্ণেল ইউ এন মুখার্জি, যত্রমোহন সেন, ৺যমুনালাল বাজাজ, ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃগণ চাঁদপুরে আগমন উপলক্ষে নাগ মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

১৯২১ সালে আসাম প্রদেশের চা বাগানসমূহ হইতে ছোটনাগপুর, বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশবাসী বহু সহস্র কুলী, বাগানের মালিক ও পরিচালকগণের অত্যাচার ও অসদ্ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত হইয়া দলে দলে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া কেহ বা পদব্রজে কেহ বা রেলযোগে তাহাদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যাসহ দেশে ফিরিবার পথে চাঁদপুরে আসিয়া সমবেত হয়। সরকারের নির্দেশ অনুসারে স্থানীয় সরকারী কর্মচারিগণ ঐ কুলীদিগকে গোয়ালন্দ পেঁাছিবার জাহাজে উঠিতে বাধা প্রদান করেন। শ্রীযুত নাগ মহাশয় তাঁহার সহকর্মিগণসহ নিঃসহায় ও প্রপীড়িত কুলীদের সাহায্যকল্পে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ সময় চাঁদপুরে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিভাগীয় কমিশনার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্মচারিগণ এখানে আগমন করিয়া কুলীদিগের অভিযানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ঘটনা গুরুতর আকার ধারণ করিলে, দেশপ্রিয় জে এন সেনগুপ্ত, শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত, ৺দেশবন্ধু দাশ প্রভৃতি প্রবীণ জননায়কগণ এখানে আগমন করেন। শহরময় দিনের পর দিন হরতাল চলিতে থাকে। দোকানপাট, হাটবাজার কয়েক দিনের জন্য বন্ধ থাকে। ঐ সময় শহরবাসীদের খাদ্যাদি নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং কুলী রিলিফ কমিটির নির্দেশানুসারে দৈনন্দিন আবশ্যকীয় খাদ্য জিনিস খরিদ বিক্রয় এক নির্দিষ্ট স্থানে চলিতে থাকে এবং permit system অনুসারে শহরবাসী খাদ্য জিনিস খরিদ করিতে সক্ষম হইত। এমন কি স্থানীয় ইউরোপীয় অধিবাসী ও সরকারী কর্মচারীদিগকেও ঐ কমিটির অনুমতিপত্র লইয়া দৈনন্দিন খাদ্য জিনিস ঐ নির্দিষ্ট স্থান হইতে খরিদ করিতে হইত। কুলী আন্দোলনের সময় চাঁদপুরে কিছুদিনের জন্য স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ঐ সময় এ বি রেলওয়ের কর্মচারিগণ ধর্মঘট করে, গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়া যায়, স্টীমার চলাচলও অনির্দিষ্টভাবে বিশৃঙ্খলার সহিত চলিতে থাকে। বহু কুলী সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কুলী রিলিফ কমিটি চাঁদপুর হইতে নৌকাযোগে বহু শত কুলীকে গোয়ালন্দ প্রেরণ করে। অবশেষে গভর্নমেণ্টের সহিত বোঝাপড়া হইয়া অবশিষ্ট কুলিগণকে স্টীমারযোগে চাঁদপুর হইতে গোয়ালন্দ পেঁাছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কুলী ধর্মঘট আন্দোলন শ্রীযুত নাগ মহাশয় অগ্রভাগে থাকিয়া সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন এবং ঐ আন্দোলন চাঁদপুরের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

তিনি ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মূত্ররোগে আক্রান্ত হইয়া তিন মাস পর্যন্ত শয্যাশায়ী ছিলেন। ঐ সময় তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অনেকেই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া চিঠি প্রেরণ করেন এবং তাঁহার আরোগ্য কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। ঐ রোগমুক্ত হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। বর্তমানে তাঁহার সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল ছিল, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল—লোক দেখিয়া চিনিতে পারিতেন না। তাঁহার শ্রবণশক্তিও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তথাপিও একজন চালকের সাহায্যে কংগ্রেসের কাজে নগ্নপদে শহর পরিভ্রমণ করিতেন এবং জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কুমিল্লায়ও যাতায়াত করিতেন।

১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মালিকান্দায় গান্ধী সেবা সঙ্ঘের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের জন্য তিনি তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির অভাবে পূর্বের ন্যায় জনসেবা ও দেশসেবার কাজে খাটিতে পারেন নাই বলিয়া সর্বদা দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকিতেন। তথাপি তিনি অন্যের দ্বারা প্রতিদিন খবরের কাগজ পাঠ করাইয়া দেশের সর্বপ্রকার আন্দোলন ও খবরের সহিত যোগ রাখিয়া চলিতেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিলে তিনি আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে গান্ধীজীর নির্দেশেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন। মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারে তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং সরকারী নীতিতে মনোবেদনা বোধ করিতে থাকেন। তিনি জাতীয় জীবনের চরম সংকটময় সময় জাতির দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য এই রোগশয্যা হইতেও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।

নাগ মহাশয়ের ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত মধুর ছিল। ছোট বড় শত্রু মিত্র সকলেই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। তিনি দৃঢ়চেতা, স্পষ্টভাষী ও সত্যানুরাগী ছিলেন, ভগবানে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁহার সরল অনাড়ম্বর জীবন দরিদ্র ভারতেরই প্রতীক ছিল, তাঁহার নিকট হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ছিল না, চাঁদপুর মসজিদ নির্মাণে তাঁহার দান ও প্রচেষ্টা ভুলিবার নহে। বয়সে তিনি প্রবীণ হইলেও সংস্কারমুক্ত ছিলেন। সমাজ সংস্কার কার্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। রাজনৈতিক আদর্শ ক্রমেই প্রগতির দিকে ছুটিলেও তিনি উহার সহিত সমান তালেই চলিয়াছিলেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক মতবাদ পছন্দ করিতেন এবং দরিদ্র জনগণের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের গণনেতা। দরিদ্র জনগণের ব্যথা কোথায় জানিতেন এবং তাহাদের আশা ও ভাষাকে রূপ দেওয়ার জন্য আজীবন কাজ করিয়া গিয়াছেন।

বয়সে তাঁহার দেহে জীর্ণতা আসিলেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মনে জীর্ণতা আসে নাই। তাঁহার বলিষ্ঠ মন এবং স্বচ্ছ বুদ্ধি জাতির সেবায় শেষ দিন পর্যন্ত নিয়োজিত হইয়াছে। তিনি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়া, বুদ্ধি পরামর্শ দিয়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জাতির সেবা করিয়া গিয়াছেন।

এই স্বদেশপ্রাণ, আত্মত্যাগী, স্বাধীনতাকামী, দেশবরেণ্য নেতার মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।
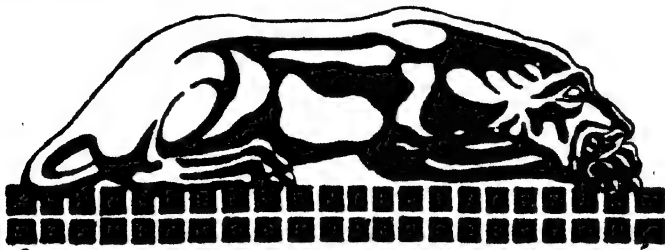
ব্ল্যাক্-আউট্

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

যুদ্ধের ত্রাসে নগরীর দীপ নিভেছে।
ঘন অরণ্যে জনতা-শ্বাপদ ভ্রাম্যমান।
অন্ধকারেই অনেকের চোখ-ও বহ্নিমান।
কালের চাকায় উল্টো রথের টান কি?

রাতের শহরে দোতলা বাসের পরিক্রম ঃ
ম্যাডাগাস্কারে মাস্টোডনের পদক্ষেপ?
ঢাকা-দেওয়া আলো জ্বলে সুতীক্ষ্ম হিংস্রতায়।
প্রত্নতত্ত্ব আদিমতা নিয়ে ফিরল কি?

রাত দশটায় দোতলা বাসের নির্জনে;
মনেরে পেয়েছে আধুনিকতার দর্শনে ঃ
মানুষ কি তবে ফিরে যাবে তার প্রারম্ভে?
মানুষে পশুতে সব ভেদাভেদ লুপ্ত কি?

সহসা আকাশে নবজীবনের স্বপ্ন ঃ চাঁদ!
এ-আর-পি-আঁটা বাড়ির শিওরে আবির্ভাব।
কোথা ব্ল্যাক-আউট? চাঁদের আলোয় বাস উজল ঃ
প্রেতের শিরেও নামে দেবতার আশীর্বাদ?

ভবিষ্য

শ্রীপুলিন মিত্র

আকাশের পরে বসতি রচনা ক'রে,
সৃষ্টির লয়ে করিব দ্বিতীয় সৃষ্টি,
মরন-জয়ের চির পিপাসার জোরে
এ'হবে আমার নবযুগে নব কৃষ্টি।

বিশ্বামিত্র এখন রয়েছে মিশে
আমাদের ঘিরে বায়ুর দীর্ঘশ্বাসে;
তারি আকাংখা ছুটিছে যে দশদিশে,
অন্ধ হইয়া বিপুল অট্টহাসে।
সব দিয়ে তাই মরণ-জয়ের আশা
বক্ষের মাঝে রেখেছি সংগোপনে
রেখে দাও আজ যত ফিকে ভালবাসা
মৃদু প্রেমিকের ছায়াঘন অঙ্গনে।

এই পৃথিবীতে কপট অক্ষখেলা
কতদিন আর চলিবে নির্বিবাদে,
তারার আলোকে দেখেছি রাত্রিবেলা
মিথ্যার ভয়ে সত্য গোপনে কাঁদে।
প্রলয় ঝঞ্ঝা উঠেছে ভুবন ব্যেপে,
সত্য উঠিবে মিথ্যার ছাই হ'তে,
পৃথিবী উঠিছে থনে থনে কেঁপে কেঁপে—
ভেসে যাবে শব নূতন কালের স্রোতে।

নবীন প্রভাত দেখা দিবে যেই ক্ষণে,
নীল ঈথারের জমাট ভিত্তি পরে
নূতন পৃথিবী প্রথম প্রবর্তনে,
অক্ষয় হব ত্রিশঙ্কু অম্বরে।

মানসী প্রতিমা

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সরকার

মানসী প্রতিমা ওই, কি মধুর সৌন্দর্যবিগ্রহ
প্রদক্ষিণ করি তারে আরতি করিছে অহরহঃ
নদ নদী বৃক্ষলতা, ধরণীর যত কিছু সব;
নবোদ্ভিন্ন শতদল, সরসীর কামনাসম্ভব,
আনন্দে যেমতি শোভে ক্রীড়াময় সলিল উপরি।
প্রেমের পূজার মূর্তি! দিন দিন যতই নেহারি
আকাঙ্ক্ষা যে বেড়ে যায়; মুগ্ধনেত্রে কাছে যেতে চাই

আবেগে বিহ্বল হয়ে, পা দুখানি চুমিবারে ধাই,
কিন্তু হায়, পাদপীঠ কোথা? কোথা সে চারুচরণ?
পরশ কাতর বুঝি, ধ্যানগম্য, হৃদয়স্বপন।
আমার এ রূঢ়স্পর্শ—অনায়ত্ত, পঙ্কিল অধর,
অশুচি, মলিন কর—থাক্, থাক্; অধীর অন্তর
স্থির হও; ওই হের, প্রসারিত সম্মুখে তোমার
অফুরন্ত তপস্যায়, অর্চনায় কালপারাবার।

গত বুধবার অপরাহ্ণ ৩টা ২০ মিনিটের সময় নট-নাট্যকার শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি গত সোমবার সামান্য জ্বরে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর দিন তাঁহার রক্তপ্রস্রাব হয়।

শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সংস্পর্শে আসিবার পর তাঁহার নট-জীবনের সূত্রপাত হয়। তাঁহার রচিত 'সীতা' নাটক নাট্য-জগতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। তারপরে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে তাঁহার বহু নাটক সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছে এবং তিনিও বিভিন্ন মঞ্চে ও বহু চিত্রে অভিনয় করিয়া যশের অধিকারী হইয়াছিলেন।

মৃত্যুসংবাদ পাইয়া শ্রীযুত নরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুত শিশির মল্লিক, শ্রীসন্তু সেন, শ্রীখগেন্দ্র চ্যাটার্জি, শ্রীছবি বিশ্বাস, শ্রীরবি রায়, শ্রীসুশীল মজুমদার, শ্রীনীরেন লাহিড়ী, ডাঃ রাম অধিকারী, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন মুখার্জি, জীবনতোষ ঘটক, সুধীর দাস প্রমুখ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য শ্রীযুত চৌধুরীর গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

১৯২৩ সালে যোগেশচন্দ্র প্রথম তাঁহার নাদির শাহ (পরে দিগ্বিজয়ী নামে অভিনীত হয়) নাটকখানি লইয়া নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের নিকট আসেন। তখন তিনি গোবরডাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। শিশিরকুমার তাঁহার চরিত্রসৃষ্টির কৌশল দেখিয়া তখনই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন—কিন্তু সে সময় নাদির শাহ অভিনয় করা নানা কারণে তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ১৯২৪ সালে শিশিরকুমারের নির্দেশ অনুযায়ী ৭ দিনের মধ্যে 'সীতা' নাটকখানি তিনি লিখিয়া দেন। এই সীতা বাঙলার নাট্য পিপাসুদের মনে কতখানি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নহে। তাঁহার প্রণীত সীতা, দিগ্বিজয়ী, বিষ্ণুপ্রিয়া, পরিণীতা, বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে অতুলনীয় সম্পদ্। বাঙলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিকে নাট্যরূপ দান করিয়াও তিনি নাট্য-সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন। মহানিশা, চরিত্রহীন, বাঙলার মেয়ে, পতিব্রতা প্রভৃতির নাট্যরূপ তিনিই দিয়াছেন।

অভিনেতা হিসাবে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। তাঁহার মত স্বাভাবিক ও সাবলীল অভিনয় অনেক খ্যাত অভিনেতার নিকট হইতেও খুব কম পাওয়া যায়।

১৯৩১ সালে তিনি শিশির সম্প্রদায়ের সহিত আমেরিকায় অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস গোবরডাঙ্গাতে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণীয় নহে।

নিউ সিনেমা, গণেশ—'মাতা'

কীর্তি পিকচার্সের ছবি—শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করিয়াছেন শোভনা সমর্থ, চন্দ্রকান্ত, মুবারক, মতি প্রভৃতি। পরিচালনা—গুণজাল।

অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী স্যার হীরালালের পত্নী বিমলার একমাত্র দুঃখ তাহার কোন সন্তান নাই। ডাক্তারের পরামর্শে অস্ত্রোপচারের দ্বারা সন্তান লাভের আশায় স্যার হীরালাল পত্নীকে লইয়া বিলাত যাইতেছিল. সমুদ্র মধ্যে জাহাজে আগুন ধরিয়া যাওয়ায় হীরালাল স্ত্রী বিমলার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মালয়ের কূলে উপনীত হয়। সেখানে অনুরাধা নামে একটি তরুণীর সহিত তাহার প্রণয় হয় ও বিবাহ করে। বোম্বাই হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদপত্রে হীরালাল জানিতে পারে যে, তাহার পূর্ব স্ত্রী বিমলা তাহার সন্তানের প্রথম জন্মতিথি উপলক্ষে হাসপাতালে ১০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছে। এই সংবাদে হীরালাল উত্তেজিত হইয়া পড়ে এবং বোম্বাই চলিয়া যায়। কিন্তু বিমলা তাহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়। হীরালাল এই অপমানে পাগল হইয়া যায়। অনুরাধা তাহার শিশুসহ হীরালালের খোঁজে বোম্বাই যায় এবং নানা নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়া তাহাদের মিলন হয়।

ছবিটি গল্পের দিক দিয়া দুর্বল হইলেও মাতৃরূপকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা সফল হইয়াছে। মালয়বাসিনীদের নৃত্য দৃশ্যটি হাস্যকর। প্রধান ভূমিকায় শোভনা সমর্থর অভিনয় প্রশংসনীয় হইয়াছে। তাঁহার গলায় গানগুলি শ্রুতিমধুর।
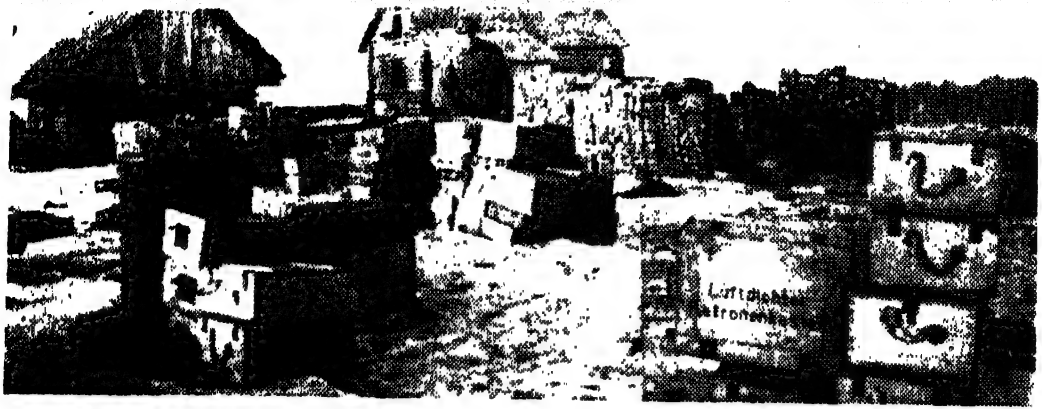
জার্ম্মাণ বাহিনী লেনিনগ্রাদ রণাংগনে এই রসদ ত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়।

উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার ডারউইন পোতাশ্রয়ে ঘন ঘন বিমান আক্রমণ চালিয়েও জাপ বিমান বাহিনী এই গোপনীয় তৈলাধারগুলিকে লক্ষ্যে আনিতে পারে নাই।

ইলিয়ট শীল্ড প্রতিযোগিতা

আই এফ এর পরিচালিত ইলিয়ট শীল্ড একটি বিশিষ্ট আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়, বিশেষ করিয়া কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ফুটবল খেলার স্পৃহা ও খেলার উন্নতি করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ফলবতী হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তাহা হইলেও দীর্ঘদিন পরিচালিত হওয়ায় বিভিন্ন কলেজের ফুটবল দল এই শীল্ড বিজয়ী হইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর সামান্য কয়েকটি দল যোগদান করিলেও ক্রমশ যোগদানকারী দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গত কয়েক বৎসর হইতে যেরূপ যোগদানকারী দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহাতে আশা হইয়াছিল ইহা সারা বাঙলা দেশের সকল কলেজ দলকে একত্র করিতে পারিবে। এই উৎসাহ বৃদ্ধিতে পরিচালকগণের বিশেষ দৃষ্টি ছিল বলিলে অন্যায় হইবে। তবে কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়াম উৎসাহী ছাত্রমণ্ডল সমিতির পরিচালকগণের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই বৎসর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশিত হইবার পরই দেখা গেল বহু দল যোগদান করিয়াছে। প্রতিযোগিতাটি বেশ দর্শনযোগ্য হইবে এইরূপ আশা জাগিল। হঠাৎ জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় সারা দেশব্যাপী বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হইল। ছাত্রগণ এই আন্দোলনে দলে দলে যোগদান করিতে লাগিলেন। ফলে কলেজের যোগদানকারী ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাইল। এই অবস্থার মধ্যেও ইলিয়ট শীল্ড প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান বন্ধ হইবে বলিয়া শোনা গেল না। আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার স্কুল কলেজসমূহ বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন ধারণা হইল ইলিয়ট শীল্ড প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান নিশ্চয় এই বৎসর স্থগিত থাকিবে। কলেজ বন্ধ সুতরাং বিভিন্ন দল গঠন করিবে কিরূপে? এই ধারণা করিবার কারণও যথেষ্ট দেখা গেল। যোগদানকারী দলসমূহের অনেকেই প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। মাত্র তিন চারি দল অবসর গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা খেলিবার উৎসাহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আই এফ এর পরিচালকগণ কি করেন, অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। বর্তমানে এই প্রতিযোগিতার অবসান হইতে চলিয়াছে। সিটি কলেজ ও ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল ফাইনালে উঠিয়াছে। এই দুইটি দলের মধ্যে শেষ মীমাংসার খেলা হইবে। সেমি ফাইনাল খেলায় ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল দল যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতে এই দলই ইলিয়ট শীল্ড বিজয়ী হইবে সে বিষয় কোনই সন্দেহ নাই।

কলেজ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দল কিরূপে গঠিত হইল এই প্রশ্নই আমাদের মনে জাগিতেছে। মেডিক্যাল কলেজ বা স্কুল বন্ধ হয় নাই, সুতরাং তাহারা দল গঠন করিতে পারে। কিন্তু যোগদানকারী অপর কলেজসমূহের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইল এই প্রশ্নের কোনই মীমাংসা আমরা করিতে পারি নাই। এই সম্পর্কে অনেক কিছুই আমাদের কর্ণগোচর হইতেছে। আমরা এই সকল বিশ্বাস না করিলেও শুনিতে হইতেছে বলিয়াই দুঃখিত। এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণতায় যখন বাধা ও বিপত্তি দেখা দিয়াছে, তখন অনুষ্ঠান না হওয়াই সমীচীন ছিল। সামান্য কয়েকটি দল লইয়া অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব রাখার সার্থকতা বিশেষ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

বাঙলার সন্তরণ মরসুম

বাঙলার সন্তরণ মরসুম শেষ হইল। বাঙলার সন্তরণ পরিচালকমণ্ডলী বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন কয়েকদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান করিবার জন্য উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া নীরব রহিয়া গেলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় কি বাধা সৃষ্টি করিল অথবা কতদূরে তাঁহারা এই বিষয় বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়াছিলেন সেই সম্পর্কেও কিছুই অবগত হওয়া গেল না। কেন গেল না তাহা তাঁহারাই জানেন। তবে দুঃখ হয় সন্তরণ মরসুম ব্যর্থ হইল দেখিয়া। মরসুমের প্রথমে পরিচালকমণ্ডলী যদি অবহেলা না করিতেন, বাঙলার সন্তরণ মরসুমের এইরূপ শোচনীয় পরিণতি আমাদের দেখিতে হইত না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কলিকাতায় গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দেওয়ায় বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া গেলেও কলিকাতার বাহিরে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট সংখ্যক সাঁতারু প্রত্যহ যোগদান করিত। এই সকল নবগঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের উৎসাহও ছিল, কেবল বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন, পূর্ব প্রচলিত সকল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা না করিতে পারিলেও কয়েকটির ব্যবস্থা নিশ্চয় করিবেন, এই বিশ্বাস থাকায় তাঁহারা কোনরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন নাই। তাহার পর মরসুম যখন শেষ হইয়া আসিল তখন তাঁহারা ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময় বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ প্রচার করিলেন যে তাঁহারা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেছেন। কোন্ কোন্ স্থানে ও কি কি বিষয় প্রতিযোগিতা হইবে তাহা তাঁহারা সাধারণ বার্ষিক সভায় স্থির করিবেন ও পরে সকলকে জানাইবেন। এই প্রচারের ফলে অনুষ্ঠানের উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় নিজেদের আয়োজন বন্ধ করিলেন। বেঙ্গল এমেচার এসোসিয়েশন কি করেন তাহাই জানিবার ও দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। এই সাধারণ বার্ষিক সভা আগস্ট মাসে হইবার কথা। সভা হইয়াছে কি হয় নাই, তাহা এই পর্যন্ত জানিতে পারা গেল না। মধ্য হইতে অপেক্ষা করিতে করিতে সন্তরণ মরসুম শেষ হইয়া গেল। সুতরাং দেখা

যাইতেছে বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনই কার্যত এই শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী। এই বৎসরের অভিজ্ঞতার পর সাধারণ সাঁতারু বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের উপর আস্থা রাখিবেন বলিয়া মনে হয় না। আগামী বৎসরে ইহার ফল দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সাংবাদিকগণের খেলাধুলা ও ব্যায়াম

বাঙলার সাংবাদিকগণ এতদিন সংবাদ পরিবেশন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। কোনরূপ খেলাধুলা বা আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতে দেখা যাইত না। সুযোগ ও সুবিধার অভাবের জন্যই যে এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। অনেক আলাপ আলোচনার পর একটি সঙ্ঘ গঠিত হইল, তখন সাংবাদিকগণ মনে করিলেন "মিলনের স্থান হইল।" দুই এক বৎসর এই সঙ্ঘের উদ্যোগে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হইল। তাহার পর দেখা গেল উহা একটি আলোচনা সঙ্ঘেই পরিণত হইয়াছে। অভাব অভিযোগ আলোচনা করিয়াই এই সঙ্ঘের সভ্যগণ সময় অতিবাহিত করেন। খেলাধুলা ব্যায়াম বা আমোদ-প্রমোদের দিকে ইঁহাদের কোনরূপ দৃষ্টি নাই। বিভিন্ন সংবাদপত্রের খেলাধুলা বিভাগের পরিচালকগণের নিকট ইহা অসহনীয় হইল। তাঁহারা একত্র হইয়া একটি ক্লাব গঠনের চেষ্টা করিলেন। সংবাদপত্র সত্ত্বাধিকারিগণের নিকট ইঁহারা ক্লাব গঠনের জন্য সাহায্য চাহিলেন। সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের উদ্যোক্তাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁহারা এই সকল লোকের নিকট হইতে কোনরূপ সহানুভূতি অথবা সাহায্য লাভ করিলেন না। কিন্তু ইহাতে উৎসাহিগণ হতাশ হইলেন না। তাঁহারা "প্রেস ক্লাব" নামক একটি ক্লাব গঠন করিলেন। কলিকাতার বিশিষ্ট দলসমূহের সহিত ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করিলেন। সকল খেলায় সাফল্যলাভ না করিলেও বিভিন্ন খেলায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন তাহাতে অনেকেই চমৎকৃত হইলেন। প্রথম দুই তিন বৎসর এই প্রেস ক্লাবের সভ্যগণকে ফুটবল মরসুমের সময়ই একত্র হইতে দেখা গেল। ইহার পর ইঁহারা ক্রিকেট খেলায় উৎসাহী হইলেন। বিশিষ্ট দলসমূহকে অনুরোধ করায় খেলিবার অধিকার লাভ করিলেন। এই সকল খেলাতেও সাংবাদিকগণ সুনামের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। ইহার পর হইতে এই সকল সাংবাদিকগণকে ফুটবল ও ক্রিকেট মরসুমের সময় বিভিন্ন দলের সহিত খেলিতে দেখা গেল। সাধারণ সংবাদপত্রসেবিগণ ইঁহাদের কার্যকলাপ দেখিয়া উৎসাহিত হইলেন। অনেকেই এই দলে যোগদান করিবার উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন। ফলে এই বৎসরের জানুয়ারী মাসে স্থির হইল যে বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি স্থায়ী ক্লাব গঠন করা হউক। এই ক্লাব গঠিত হইল। নিয়ম হইল যে, সংবাদ পরিবেশন কার্যের সহিত যাহারা জড়িত আছেন, তাঁহারাই এই ক্লাবের সভ্য হইতে পারিবেন। দৈনিক সাপ্তাহিক, মাসিক সকল সংবাদপত্রের লোকেই ইহাতে যোগদান করিতে পারিবেন। একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইল এবং সকল সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি ক্লাব গঠিত হইল। এই ক্লাবের নাম হইল 'পেন এণ্ড ইঙ্ক ক্লাব'। স্পোর্টস অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইল। যোগদানকারী সকল সভ্যের চাঁদায় ও সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের অর্থে এই অনুষ্ঠান বিশেষ আড়ম্বরের মধ্যে গড়িয়া উঠিল। বিভিন্ন বিভাগে তীব্র প্রতিযোগিতা অনুভূত হইল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দল ব্যক্তিগত ও দলগত চ্যাম্পিয়ান হইলেন। এই ক্লাবের কার্যকলাপ দেশের গুরুতর পরিস্থিতির জন্য কয়েক মাস বন্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে পুনরায় এই ক্লাবের সভ্যগণ খেলাধুলা আরম্ভ করিয়াছেন। ফুটবল খেলায় ইঁহারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। নিয়মিত অনুশীলনের সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও ইঁহারা যেরূপ ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন। পূজার পূর্বে ইঁহারা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিতেছেন। নাটক, নৃত্য-গীতাদির ব্যবস্থাও হইতেছে। সকল খেলায় কিরূপে যোগদান করা যায় সে বিষয় ইঁহারা চিন্তা করিতেছেন। বাঙলার সাংবাদিকগণের খেলাধুলা, ব্যায়াম, আমোদ-প্রমোদ করিবার অভাব সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয়, তাহার জন্য ইঁহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রের সত্ত্বাধিকারিগণ যাঁহারা পূর্বে উক্ত ক্লাব গঠন প্রচেষ্টায় বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই তাঁহারাও পর্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছেন। সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের অনেকের দৃষ্টি ইঁহাদের দিকে পড়িয়াছে। উৎসাহী একনিষ্ঠ বিভিন্ন সংবাদপত্রের খেলাধুলা বিভাগের পরিচালকগণের প্রচেষ্টা বাঙলা দেশে যে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিল তাহা চিরস্থায়ী হউক ইহাই আমাদের কামনা।

এ্যাথলেটিকস্ মরসুমের কি হইবে?

বাঙলা দেশের এ্যাথলেটিকস্ মরসুম আগত প্রায়। অক্টোবর মাস হইতেই ইহার সূচনা হয়। এই সময়ের জন্য কি ব্যবস্থা হইতেছে, এখনও জানা যায় নাই। এই বিভাগের বাঙলা দেশের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হইতেছেন বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন। এই এসোসিয়েশনের সাধারণ বার্ষিক সভা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচনকার্য শেষ হইয়াছে। এই সকল নির্বাচিত সভ্যগণ কি ব্যবস্থা করিতেছেন আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয়। সন্তরণ মরসুমের অভিজ্ঞতার পর এই সকল বিষয় এখন হইতেই সকলের জানা ভাল। মরসুমের শেষ সময়ে জানিলে কোনই ফল হইবে না। অনুশীলনকার্য অক্টোবর মাস হইতেই আরম্ভ হয়। যদি পূর্বেই জানা থাকে যে, কোন প্রতিযোগিতা এই বৎসর হইবে না, তাহা হইলে অনুশীলনে সময় ব্যয়িত করিয়া এ্যাথলীটগণের পরে দুঃখ করিবার কোনই কারণ থাকিবে না। সারা মরসুম ধরিয়া অনুশীলন করিয়া তাঁহারা বেঙ্গল অলিম্পিকের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পরিশ্রম ব্যর্থ করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করিতে পারিবেন না। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সুনাম বজায় থাকিয়া যাইবে। দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া এখনই তাঁহারা তাঁহাদের ইতিকর্তব্য স্থির করিয়া ফেলুন। ব্যবস্থা হইতেছে অথবা হইবে এইরূপ কতকগুলি কথার অবতারণা হইতে তাঁহারাও অব্যাহতি পাইবেন। এ্যাথলীটগণও আশা ও নিরাশার মধ্যে দোদুল্যমান মানসিক পীড়া হইতে রেহাই পাইবেন। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সুনাম রক্ষা পায় ও এ্যাথলীটগণ অযথা মনঃকষ্ট না পান এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমরা এ্যাথলেটিকস্ মরসুমের কি হইবে এই প্রশ্ন করিতেছি।

১৫ই সেপ্টেম্বর

বাঙলা—বালুরঘাটের সংবাদে প্রকাশ যে, গতকল্য পাঁচ হাজার লোকের এক জনতা মিছিল করিয়া বালুরঘাট শহরে প্রবেশ করে। তাহারা স্থানীয় দেওয়ানী আদালত ভবন সাব-রেজেস্ট্রি অফিস ও কো-অপারেটিভ বিল্ডিংসমূহে হানা দিয়া অগ্নিসংযোগ করে। পরে কতকগুলি কাগজ ও নথিপত্র ভস্মীভূত হয়। জনতা স্থানীয় পোস্ট অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, দুইটি পাটের অফিস, আবগারী দারোগার অফিস, রেলওয়ে আউট-এজেন্সী অফিস এবং শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত কয়েকটি আবগারী দোকানে হানা দেয়। শহরের উপকণ্ঠে কয়েকস্থানে টেলিগ্রাফের তার কর্তিত দেখা যায়। এই সম্পর্কে প্রায় কুড়িজন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়।

কালনার সংবাদে প্রকাশ, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর জনতা কালনা রেলওয়ে স্টেশন ও পোস্ট অফিস পোড়াইয়া দিয়াছে।

বিহার—গত ১১ই সেপ্টেম্বর বিহার শরিফে পুলিশের গুলীতে ৪ জন নিহত হয়। বর্শার আঘাত হইতে ডেপুটি পুলিশ সুপার অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছেন। বর্শার আঘাতে একজন কনেস্টবল আহত হইয়াছে। ৭ই সেপ্টেম্বর ভাগলপুর জেলার বিপুরে জনতা কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইবার উপক্রম হইলে সৈন্যেরা গুলী চালায়; ফলে একজন মারা যায়, তিনজন আহত হয়। ৯ই সেপ্টেম্বর তেলঙ্কিতে (ভাগলপুর জেলা) সেনাদের গুলী চালনায় একজন মারা যায়।

আমেদাবাদে গুজরাট কলেজের সম্মুখে এক জনতার উপর পুলিশের গুলী চালনার ফলে একজন ছাত্রী আহত হয়।

১৬ই সেপ্টেম্বর

বাঙলা—ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য বিক্রমপুর পরগণার (মুন্সীগঞ্জ মহকুমা) তালতলা বাজারে পুলিশের গুলীতে তিনজন নিহত এবং একজন আহত হইয়াছে। এক বিরাট জনতা স্থানীয় পোস্ট অফিসের নিকট সমবেত হয় এবং সভা করিতে চাহে। সভা-ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে অস্বীকার করিলে পুলিশ জনতার উপর লাঠি চালায়। জনতা ইটপাটকেল ছোড়ে। পুলিশ গুলী চালায়। ফলে জনতার মধ্য হইতে তিনজন নিহত ও একজন আহত হয়।

উড়িষ্যা—ঢেনকানাল দরবারের এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১০০০ লোকের এক জনতা মারাত্মক অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া বৈষ্ণব পট্টনায়কের নেতৃত্বে অগ্রসর হইতে থাকে। পুলিশ দল দেখিয়াই উহারা গুলী চালায় এবং অনুমান ৫০টি গুলী ছোড়ে। পুলিশও গুলী ছোড়ে। ফলে তিনজন আহত হয়। হস্তে আহত অবস্থায় পট্টনায়ক পলায়ন করে।

শোক সংবাদ

মনীষী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কলিকাতায় তাঁহার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ডাঃ হীরালাল হালদার ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

নট-নাট্যকার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর

বাঙলা—বগুড়া জেলার জেলুরপাড়া রেল স্টেশনে আপ্ সান্তাহার-বোনারপাড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একখানি ১ম ও ২য় শ্রেণীর বগীতে আগুনে লাগিয়া যায়। মুন্সীগঞ্জের জগদীপুরে থানার বিভিন্ন ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে হানা দিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা যাবতীয় কাগজপত্র পোড়াইয়া দেয়। কলিকাতা জেনারেল পোস্ট অফিসের বারান্দায় অবস্থিত একটি ডাক বাক্সে প্রজ্জ্বলিত বস্ত্রখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। বাক্সের চিঠিগুলি বিনষ্ট হইয়াছে। গতকল্য বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় এম এল এ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মাদ্রাজ—মাদ্রাজের কবীর তালুকে আলুব পুলিশ ফাঁড়িতে এবং তিনেভেলী জেলার কোয়েলপটা তালুকে কাদাম্লনগদী নামক স্থানে একটি পুলিশ ফাঁড়িতে আগুন লাগান হইয়াছিল।

বোম্বাই—গতকল্য নাসিকে এক জনতা পঞ্চবটি পুলিশ চৌকি ঘেরাও করে এবং চৌকি হইতে পুলিশের লোকদের ইউনি-ফরমসমূহ অপসারিত করিয়া রাস্তার পার্শ্বে সেগুলিকে পোড়াইয়া দেয়। আমেদাবাদে একটি রেলওয়ে সেতুর উপর বোমা বিস্ফোরণ হয়।

১৮ই সেপ্টেম্বর

বাঙলা—হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার কতকগুলি মিলের বহুসংখ্যক শ্রমিক সত্যনারায়ণ চাউল কল আক্রমণ করে। তথা হইতে তাহারা উপরোক্ত কলের মালিকের গুদাম ও কয়লার ডিপো লুণ্ঠন করার জন্য যাত্রা করে। উহারা স্বত্বাধিকারীর উপর মারধর চালায় এবং নগদ প্রায় ৫০,০০০্ টাকা লুঠ করে। আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ গুলী চালায়। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর জনতা উলুবেড়িয়ার সন্নিহিত তুলসীবেড়িয়া গ্রামের এক গুদাম আক্রমণ করে এবং ২৫০০্ মূল্যের ধান ও চাউল লুঠ করে। মুন্সীগঞ্জের তালতলা পোস্ট অফিসের সম্মুখে আহূত এক জনসভা পুলিশ ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় এবং ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্তা আশালতা সেন প্রমুখ ১৫ জন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

বাঙলা সরকার বর্ধমান জেলার অধীন কালনা মিউনিসি-প্যালিটির অধিবাসীদের উপর ৩০ হাজার টাকা, গেণ্ডারিয়া (ঢাকা) ও বেলডাঙ্গার (মুর্শিদাবাদ) অধিবাসীদের উপর পাঁচ হাজার টাকা, বোলপুর ইউনিয়নের অধিবাসীদের উপর দশ হাজার টাকা এবং হেতমপুর ইউনিয়নের অধিবাসীদের উপর দশ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, আটক বন্দী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তির জন্য বাঙলা সরকারের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।

বিহার—সাহাবাদ জেলার সাসারামে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর এক চৌকিদারের নেতৃত্বে এক জনতা একদল সৈন্যকে আক্রমণ করে। সৈন্যদল জনতার উপর গুলী চালায়, ফলে চৌকিদার সহ ছয়জন নিহত হয়। আর এক জনতাকে সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ করে এবং গুলী করিয়া তিনজনকে হত্যা ও একজনকে জখম করে।

মাদ্রাজ—গত ১৫ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ ও সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ের একটি স্টেশন জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। জনতা হনসুর কুসুগোল, অমরগোল ও বারাদগী—এই চারটি স্টেশনের ক্ষতি করে।

গতকল্য রাত্রে এলাহাবাদ রেল স্টেশনে একটি পার্শ্বেলে আগুন জ্বলিয়া উঠে। অনুমান এই যে, উহার মধ্যে একটি দেশী বোমা ছিল।

১৯শে সেপ্টেম্বর

বাঙলা—বর্ধমানের খবরে প্রকাশ, আজ সকালে প্রায় ১০০ জন বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী বর্ধমান হইতে ২৫ মাইল দূরে সদর মহকুমার অন্তর্গত জামালপুরে পোস্ট অফিসে হানা দিয়া কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলিয়াছে এবং টাকাপয়সা লুঠ করিয়াছে।

মুন্সীগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, ১৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রে এক জনতা মালখানগর সাব পোস্ট অফিস ও ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে অগ্নিসংযোগ করে।

বাঙলা সরকার এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, সেনাবিভাগের লোকজন কোন লোককে থামিতে বলিলে সে যদি না থামে, তবে তাহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে।

২০শে সেপ্টেম্বর

বাঙলার বর্ষীয়ান্ জননেতা শ্রীযুত হরদয়াল নাগ তাঁহার চাঁদপুরস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯০ বৎসর হইয়াছিল।

বাঙলা—বর্ধমানের সংবাদে প্রকাশ, প্রায় তিনশত লোকের এক জনতা গতকল্য বর্ধমান সদর মহকুমার অন্তর্গত জামালপুর থানা বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের জামালপুর রেল স্টেশন এবং পোস্ট অফিস পোড়াইয়া দিয়াছে। জনতা পোস্ট অফিস ও আবগারী দোকানের টাকাকড়ি লইয়া চলিয়া যায় এবং আসবাবপত্র পোড়াইয়া দেয়।

বিহার—ভাবুয়া মহকুমার ভালানীকালন গ্রামে দুইশত লোকের এক জনতা পুলিশ ইন্সপেক্টর ও ১৭ জন সশস্ত্র কনেস্টবলকে আক্রমণ করে। উভয়পক্ষে গুলী চলে। ফলে ছয়জন আহত হয়। লাসারাই-এ জনতার উপর গুলীচালনার ফলে ৯ জন নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে। ভাগলপুরে অমরপুর পুলিশ স্টেশন পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সিংভূম, ধানবাদ ও সাঁওতাল পরগণায় রেলওয়ে লাইন তুলিয়া ফেলা হইতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

২১শে সেপ্টেম্বর

বাঙলা— প্রকাশ যে, এক জনতা মাদারীপুরের গোঁসাইরহাট অফিস, মুন্সীগঞ্জের পূর্ব-সিমুলিয়া কম্বাইন্ড সাব পোস্ট অফিস, ত্রিপুরা জিলার ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন বোর্ড অফিস এবং বিক্রমপুরের ভাগ্যকুল ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। মাদারীপুরের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৬ই সেপ্টেম্বর মাদারীপুর স্কুলপ্রাঙ্গণে পুলিশ লাঠি চালনা করে। ফলে কয়েকজন ছাত্র আহত হয়। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর কুমিল্লায় শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা চন্দ ও আরও দশজনকে ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার করা হয়।

মাদ্রাজ—গত ১৯শে সেপ্টেম্বর তিনেভেল্লী জেলার কুলসেখর পতনমে একটি লবণগোলা জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। জনতা একটি ঘর পোড়াইয়া দেয় এবং এসিস্টান্ট সল্ট ইন্সপেক্টর মিঃ ডবলিউ লোনে জনতা বিতাড়িত করিতে যাইয়া নিহত হন।

বিহার—গয়া এবং আরার নিকটে টেলিগ্রামের তার কাটা হইয়াছে। সাহাবাদ জেলার নয়ানগরের নিকট তিনজন রাজনৈতিক বন্দীকে জনতা পুলিশের নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইয়া যায়।

১৬ই সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে বলা হয় যে, পশ্চিমদিক হইতে স্টালিনগ্রাদের উপর আঘাত হানিবার ও কীলক প্রবেশ করাইবার উদ্দেশ্যে শক্তিশালী রিজার্ভ বাহিনীর সাহায্যে জার্মানরা যে আক্রমণ চালায়, তাহা প্রতিহত হইয়াছে।

১৭ই সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, স্টালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠে সোভিয়েট বাহিনী প্রচণ্ড সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকে। মজদক এলাকায় সোভিয়েট বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি লোকালয় দখল করে।

জাপানী প্রচার বিভাগের প্রেসিডেন্ট মিঃ মাসায়ুকী তানি জাপানের পররাষ্ট্র সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—স্টালিনগ্রাদের বহির্ভাগে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। কয়েকটি ছোট ছোট জার্মান সৈন্যদল স্টালিনগ্রাদের রাজপথসমূহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। সোভিয়েট সৈন্যদের সহিত তাহাদের হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দিনের শেষে সমস্ত জার্মান সৈন্যদলের আক্রমণ প্রতিহত হয় এবং তাহারা হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, সাইবেরিয়া হইতে নূতন রুশ সৈন্য আসিয়া স্টালিনগ্রাদে পৌঁছিয়াছে। জার্মানগণ স্টালিনগ্রাদ অঞ্চলে বিমানযোগে নূতন নূতন সৈন্য আমদানী করিতেছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত মিত্র বাহিনীর সদর কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ইস্তাহারে প্রকাশ, ওয়েনস্টানলি এলাকায় জাপানীরা প্রবল চাপ দিতেছে। ওয়েনস্টানলি এলাকা দিয়াই জাপানীরা মোরস্বি বন্দর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

লণ্ডনের সংবাদে বলা হয় যে, রাজকীয় বিমান বাহিনী জার্মানীতে উহার প্রচণ্ড আক্রমণে আট হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় চারি টন ওজনের এক-একটি বোমাবর্ষণ করিতেছে।

১৯শে সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—স্টালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। সোভিয়েট সৈন্যেরা প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করে। মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, একমাত্র দক্ষিণ অভিমুখী অভিযানেই ১৩ লক্ষ জার্মান সৈন্য নিহত হইয়াছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত মিত্রপক্ষের ঘাঁটি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, আয়োরিবাওয়া পার হইয়া জাপানীরা নূতন কোন অভিযান আরম্ভ করে নাই। আকাশপথে এই স্থানটি ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। ওয়েনস্টানলি পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ চলিতেছে।

মাদাগাস্কারে ব্রিটিশ বাহিনী অব্যাহতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

২০শে সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—স্টালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। গতকল্য জার্মানরা কতকগুলি রাস্তা অধিকার করে; কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যেই কয়েকটি রাস্তা হইতে বিতাড়িত হয়। মজদক অঞ্চলে জার্মানদের এক পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত হয়।

সোভিয়েট ইস্তাহারে মজদক এলাকায় যুদ্ধকালে জেনারেল ফন ক্লাইস্ট নিহত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জার্মান নিউজ এজেন্সীর সংবাদে উহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

গতরাত্রে ব্রিটিশ বিমানবহর মিউনিকের উপর বোমাবর্ষণ করে।

স্বপ্ন-দেখা মেয়ে—শ্রীআশীষ গুপ্ত প্রণীত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী। মূল্য দুই টাকা।

'ইহাই নিয়ম', 'বন্দিনী সুভদ্রা' এবং 'নব নব রূপে'র পরে এটি আশীষবাবুর চতুর্থ গল্প সংকলন। সবথেকে আগে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে গল্প নির্বাচনের ভঙ্গী। মোট আটটি গল্পে 'স্বপ্ন-দেখা মেয়ে' সম্পূর্ণ। 'টাণ্টালাস' হ'চ্ছে প্রথম। এর মহাশ্বেতা, সুমিত্রা, শিবানী অপূর্ব; হরিনারায়ণ, ক্ষেমঙ্করী, ভূতো আরো অপূর্ব। শিবানীর আকাঙ্ক্ষিত জীবন স্বপ্নকে লেখক অদ্ভুত লিপিকুশলতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই বইতে আশীষবাবুর প্রচ্ছন্ন অথচ চমৎকার মার্জিত একটি শাণিত ব্যঙ্গের চাবুক আমরা প্রায় প্রত্যেক গল্পেই লক্ষ্য করেছি। 'ভাগ্যহীন লেখক'এর মধ্যে এই বিদ্রূপ অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটেছে। 'সাময়িকী'র লেখক অবনীকুমারের চিঠির মধ্যে যে চিন্তা দেখলাম তাতে আমাদের সমাজের আধুনিকতম সমস্যা মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। 'নিজের রোজগারে'র কাহিনী ভোলা সহজ নয়।

'অপূর্ণ' গল্পের দমকলের খালাসী সনাতনকে লেখক জীবন্ত ক'রে তুলতে পেরেছেন। সবথেকে আমাদের আনন্দ দিয়েছে 'অতন্দ্র' গল্পটি। ভাব প্রকাশে এবং সুষ্ঠু চিন্তা দুর্লভ, সকলের উপরে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের তীব্র কষাঘাত এর মধ্যে দেখেছি তা অনবদ্য। বেণু, মাধবী, বিষ্ণুশরণ ও বিশ্বেশ্বর, ললিতা ও সর্বশেষের মহাদেববাবু চিরজীবি।

'সুকুমারী' গল্পটির মধ্যে মানব চরিত্রের যে দিকটা লেখক দেখিয়েছেন তা অত্যন্ত সুন্দর, কিন্তু এতো তীব্র রূঢ় বাস্তবতা মনকে ও আঘাত করে। পরিবেশন অত্যন্ত চমৎকার।

জনমন—সাপ্তাহিকপত্র। কার্যালয়—ভোলা, বরিশাল। প্রথম বর্ষ; তৃতীয় সংখ্যা।

পত্রিকাখানি বোধ হয়, কমিউনিষ্ট মতাবলম্বী। সরকারী নীতির এ সমালোচনার মোড়কে 'কংগ্রেসের নীতির অযৌক্তিকতা ও অপকারিতা' প্রকাশ 'সংশয়ের' অবকাশ রাহিত্যমূলক উক্তিতে তাহাই ব্যক্ত হয়। সম্পাদকীয় মন্তব্যে বেশ সুকৌশলে এলাহাবাদে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে গান্ধীজীর সহিত অমীমাংসিত আলোচনার যে বিবরণ এই সরকার কর্তৃক সুকৌশলে প্রচার করা হইয়াছিল তারই সুযোগ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং পণ্ডিত জওহরলাল প্রথমে খসড়াতে যে আপত্তি তুলিয়াছিলেন, তাহাও ফলাও করিয়া বলা হইয়াছে; কিন্তু মহাত্মাজী বৈদেশিক সেনাদলকে ভারতবর্ষে অবস্থান করিবার অনুকূল অবস্থাতে উপস্থিত হইবার পর পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহার আপত্তি প্রত্যাখ্যান করেন এবং মহাত্মাজীর প্রস্তাবের পূর্ণভাবে সমর্থন করেন, তাহা চাপিয়া যাওয়া হইয়াছে। বলাবাহুল্য আমরা এরূপ মতের সমর্থন করিতে পারি না। দেশের স্বাধীনতাকে সর্বপ্রথমে স্বীকার না করিয়া 'জনমন' এবং 'গণযুদ্ধ' এই ধরণের জিগীরের কোন মূল্য নাই, কিন্তু উহা অনর্থক।

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরিলীলামৃত—গদ্য ভাগ, প্রথম খণ্ড। ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরিলীলামৃত কার্যালয়, ২৯নং রামকান্ত মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা। গ্রন্থ গদ্য ও পদ্য দুই ভাগে অনূ্যন ত্রিশ খণ্ডে প্রকাশযোগ্য। মূল্য প্রতিখণ্ড স্থায়ী গ্রাহক পক্ষে ১, টাকা এবং সাধারণ পক্ষে পাঁচ সিকা।

ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাসের শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরিলীলামৃত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং উপকৃত হইয়াছি। ভগবানের অলৌকিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা সকলের হয় না; আধুনিককালে কেহ কেহ ইহা প্রয়োজন বোধও করেন না; কিন্তু বাঙলা দেশে এই যে একটি সোনার মানুষ আসিয়াছিলেন, এদেশের দীন দরিদ্র, অবজ্ঞাত লাঞ্ছিতের বেদনা যাঁহার অন্তরে অগ্নিময় আবেগ লইয়া কাজ করিয়াছিলেন, যুগাগত জীর্ণ সংস্কারকে চূর্ণ করিয়া যিনি সকলকে আপনার করিয়া লইবার জন্য উদার আহ্বান করিয়াছিলেন, আধ্যাত্মিকতার কথা ছাড়িয়া দিলেও পার্থিব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলেও সেই প্রভু জগদ্বন্ধুকে জানিবার চিনিবার এবং তাঁহার বৈপ্লবিক প্রেরণায় প্রণোদিত হইবার প্রয়োজন দেশের লোকের রহিয়াছে। মানব কল্যাণের নিমিত্ত তাঁর আত্যন্তিক তপস্যা, সমাজের উন্নয়নের জন্য তাঁর একনিষ্ঠ সংকল্প ও সাধনা, তাঁর প্রাণপূর্ণ ত্যাগময় জীবনের বলিষ্ঠতা এই সঙ্কট-কালে উজ্জ্বল বর্তিকাস্বরূপে আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গঠনের সাধন-পথে আলোকসম্পাত করে। বাঙলার বিশিষ্ট অবদান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার সমগ্র রসমাধুর্য সাধকের কথায় তত্ত্বমার্গাগ্র প্রভু জগদ্বন্ধুর লৌকিক জীবনে মূর্ত হইয়া উঠে। ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু ভক্ত এবং সাধক পুরুষ, তিনি অন্তরের অনুভূতির আলোকে সে মাধুর্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার ভাষা কবিত্বপূর্ণ এবং মধুর। যাঁহারা সাধক ভক্ত, তাঁহারা সে মাধুর্য আস্বাদন করিবেন; আর যাঁহারা সে পথের পথিক নহেন, তাঁহারাও এই পুণ্য জীবন পাঠ করিলে বাঙালী জাতিকে জানিতে, চিনিতে এবং বুঝিবার পক্ষে সাহায্য লাভ করিবেন। বাহ্যাচার সর্বস্ব সাম্প্রদায়িকতা এবং সঙ্কীর্ণতাই বর্তমানে বাঙলা দেশে ধর্মের নামে অধিকাংশক্ষেত্রে চলিয়া যাইতেছে। প্রাণের উদার অনুভূতি নাই, ত্যাগের ছন্দ নাই জীবনে, অনপেক্ষ আনন্দের আশ্রয় নাই সেখানে। জাতি আজ প্রকৃত প্রেমের স্পর্শ পাইতেছে না—সে নির্জীব এবং দুর্বল। এমন দুর্যোগের মধ্যে প্রভু জগদ্বন্ধুর উদার আদর্শ দেশবাসীর সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়া ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দেশের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার যতীমোহন দাশগুপ্ত প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই মহদনুষ্ঠানে তাঁহাকে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। আমরা আশা করি, দেশবাসী সকলে একাজে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। বাঙলা দেশের সামাজিক এবং রাজনীতিক জীবনের জাগরণের দিক হইতেও এই কর্তব্য রহিয়াছে। প্রভু জগদ্বন্ধুর বাণী সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে রাজনীতির বাণী না হইলেও রাজনীতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে ত্যাগময় যে প্রেরণার প্রয়োজন সেই প্রেরণায় মূলে শক্তি তিনি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। এই মানুষটির অন্তরে দেশের লোকের জন্য যে তাপ ছিল তাহার তীব্রতা সকলকে উপলব্ধি করুন। এই তাপই ধর্মের স্বরূপ এবং সেই তাপ জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার মূলে সকল দেশের এবং সকল যুগে মুখ্যভাবে কাজ করে। জাতির অগ্রগতির পথে পরানুকরণের নীতি বিশেষ কাজ করে না। কাজ করে দেশপ্রীতি, অর্থাৎ দেশের নরনারীর সকলের প্রতি প্রীতিরই ভাব এবং সেই প্রীতির পথ না ধরিতে পারিলে কোন বাঁধাবুলি বা শ্লোগানই আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল মোচন করিতে সমর্থ হইবে না। প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনের অনুধ্যানে অধ্যাত্ম সাধকের ভাষায় সেই "লোকলাবণ্য-নির্মুক্তি" অন্য কথায় সকল মানুষকে আত্মীয়ের দৃষ্টিতে দেখিবার আলোক রহিয়াছে। আমরা এমন গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। যাঁহারা ভক্ত, যাঁহারা অধ্যাত্ম রসে রসিক তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে তো উপকৃত হইবেনই, জাতীয় সাহিত্য এবং রাজনীতির দিক হইতেও এমন গ্রন্থের বহুল প্রচারের প্রয়োজন রহিয়াছে। আমরা আশা করি, সেই প্রয়োজন সাধনে গ্রন্থকার দেশবাসীর আন্তরিক আনুকূল্য লাভ করিবেন। কাগজের এই দুর্মূল্যের দিনেও ছাপা এবং কাগজ সুন্দর।
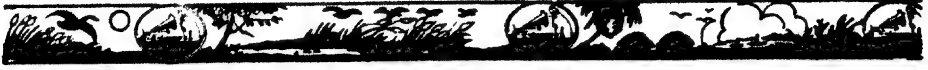
সতী তুলসী

অভিশপ্তা স্ত্রী রাধিকার সখীর অপূর্ব্ব কৃষ্ণানুরাগ—মর্ত্ত্যে সতী তুলসীরূপে জন্মগ্রহণ — শঙ্খচূড় দৈত্যের বিনাশ। এন ২৭০৩৬ হইতে ২৭০৪১।

সিরাজদ্দৌলা

পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীনতার সংগ্রাম—দেশ ও জাতির শেষ গৌরব। এন ১৭২০৬ হইতে ১৭২১৩।

নিমাই-সন্ন্যাস

এই নাটকের রেকর্ডগুলি প্রত্যেক ঘরে থাকিয়া হরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া শ্রোতৃগণের জীবন ধন্য ও সার্থক করিবে। এন ৩১৪৯ হইতে ৩১৬৩।

লায়লীমজনু

পারসিক কবির অমর প্রেম-কাহিনী—অনন্য সাধারণ অভিনয় ও প্রযোজনা। এন ৭৩৯৫ হইতে ৭৪০০।

গয়াতীর্থ

গয়াতীর্থ মাহাত্ম্যের সেই পুণ্য কাহিনী পিতৃপুরুষের স্মৃতি-তর্পণের আদিকথা প্রত্যেক হিন্দুর পবিত্রতম কর্ত্তব্যের গাথা! এন ২৭৩১৭ হইতে ২৭৩২১।

রাণী ভবানী

হিন্দুর গৌরবময় পালা-নাটক "রাণী ভবানী"। এন ২৭১৯৬ হইতে ২৭২০২।

মীরাবাঈ

কৃষ্ণ-প্রেমিকা তপতী মীরার অপূর্ব্ব জীবন-কথা মধুর ভজন - গীতাবলী। এন ৭১৪৩ হইতে ৭১৫৪।

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠে পাশাপাশি বসে শোন্‌বার মতো।

"হিজ্‌ মাষ্টারস্‌ ভয়েস্‌" রেকর্ড

দি গ্রামোফোন কোং লিঃ—দমদম—বোম্বাই—মাদ্রাজ—দিল্লী VR—19

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ১৬ই আশ্বিন, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 3rd October, 1942 [৪৭শ সংখ্যা

দেশপ্রেমের অভিনয়

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বড়লাটের শাসন-পরিষদের ত্রিরত্ন, স্যার সুলতান আহম্মদ, ডাক্তার আম্বেদকর এবং শ্রীযুক্ত মাধবশ্রীহরি আণে তাপ বিকীরণ করিবার পর রাষ্ট্রীয়-পরিষদের বিতর্ক শাসন-পরিষদের দুইজন সদস্য স্যার মহম্মদ ওসমান এবং স্যার যোগীন্দ্র সিং উজ্জ্বল করিয়াছেন। স্যার মহম্মদ ওসমানের উক্তির মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই। তিনি প্রভুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কংগ্রেসের উপর যত দোষ আরোপ করিয়াছেন এবং সেজন্য সত্যের অপলাপ সাধন করিতেও যথারীতি সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার দুইটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,—'বর্তমান অশান্তি দমন করিবার জন্যই কংগ্রেসকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে হইয়াছিল।' এখানে আমাদের প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কংগ্রেস যখন বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়, তখন বর্তমান অশান্তি ছিল কি? ৮ই আগস্ট রাত্রি ১০টার সময় নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন শেষ হয় এবং সেই শেষ অধিবেশনেও বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ এবং আপোষ-আলোচনার পথই উন্মুক্ত ছিল। আন্দোলন আরম্ভ করা হইল, এমন ঘোষণা কংগ্রেস হইতে তখনও করা হয় নাই, কোন দিন করা হইবে তাহাও নিশ্চয় করিয়া জানান হয় নাই। রাত্রি শেষেই কংগ্রেস কমিটিসমূহ বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়; সুতরাং দেখা যাইতেছে অপরাধ করিবার পূর্বেই দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শুধু ইহাই নয়। স্যার মহম্মদ ওসমান কংগ্রেসের উপর অভিযোগ আরোপ করিয়া আরও একটি গুরুতর উক্তি করেন। তিনি বলেন,—'কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত শঙ্কর রাও বোম্বাইয়ের অন্তর্গত মারোল এবং ঘাটিকো পারের জনসভায় বক্তৃতাকালে জাপানের পক্ষপাতিত্ব করিয়া বক্তৃতা করেন।' শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও, এখন কারাগারে আবদ্ধ আছেন; সুতরাং স্যার মহম্মদ ওসমানের এই উক্তির প্রতিবাদ হইবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত শান্তিলাল সা মারোল এবং ঘাটিকো-পারের জনসভাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং অপর কতিপয় পদস্থ ব্যক্তি এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে,—'শ্রীযুক্ত শঙ্কর রাও ঐ ধরণের কোন কথা বলেন নাই। স্যার মহম্মদ ওসমান স্বয়ং ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন না; শান্তি এবং আইন রক্ষায় অতিরিক্ত আগ্রহ-সম্পন্ন পুলিশ কর্মচারীদের রিপোর্টই তাঁহার সম্বল বলিতে হইবে। ইঁহাদের রিপোর্ট যে কতখানি বেদবাক্যের মত সত্য হইতে পারে তাঁহাদের উপরওয়ালা প্রভুদের সত্যের প্রতি সম্যক অনুরাগ হইতেই তাহা আন্দাজ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহার পর স্যার যোগীন্দ্র সিং আসরে নমেন। তিনি তাঁহার কণ্ঠ উচ্চ অধ্যাত্মরসে আপ্লুত করিয়া বলেন,—'আমি মানুষকে নহে ভগবানকে তুষ্ট করিতে চাহি।' কেবল ইহাই নহে, তাঁহার হিতোপদেশ আরও উচ্চ সুরে চড়াইয়া তিনি বলেন—'আমরা কিছুই হারাই নাই, আমরা যদি বাস্তব সত্যকে বিচার করিয়া চলি এবং সকল উপদলীয় এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ বিস্মৃত হই, তবে আমরা বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে ভারতবর্ষকে পূর্ণস্বরাজ দান করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারি। এই অধিকার ভারতবাসীদিগকে দান করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিয়া বৃটেন শক্তিশালী হইতে পারে।" খুব ভাল প্রস্তাব। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, কংগ্রেসের চেষ্টাও তো ইহাই ছিল। মহাত্মা গান্ধী তো বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আপোষ-আলোচনা চালাইতেই চাহিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের যে দাবী, সেই দাবীর সম্বন্ধে ভারত সচিব আমেরী ও তাঁহার অনুগত কয়েকজন উত্তর-সাধকেরই শুধু মত-বিরোধ নতুবা ভারতের সকল দলের দ্বারাই তাহা সমর্থিত হইয়াছে। স্যার যোগীন্দ্র সিং কথায় যাহাই বলুন, কাজে কি করিয়াছেন? কার্যত তিনি ভারত গভর্নমেণ্টের বর্তমান দমন নীতিরই সমর্থন করিয়াছেন; প্রভুদের মনই যোগাইয়াছেন, জনমতের অনুবর্তন করেন নাই। আপোষ-আলোচনার পথ প্রশস্ত রাখিতে সাহায্য করেন নাই। ভগবানকে তুষ্ট করিতে হইলে অন্তত মনে মুখে এক হইতে হয়।

দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অশান্তি দমনকল্পে পুলিশ ও মিলিটারী যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং নিষ্প্রয়োজনে লোকের উপর জুলুম করা হইয়াছে এই সকল অভিযোগের তদন্ত করিয়া সত্যাসত্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই প্রস্তাবে নিয়োগী মহাশয় অশান্তি ও উপদ্রব দমনকল্পে গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার যে অধিকার আছে তাহা অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার যুক্তি হইল এই যে, ভারতে এখনও জঙ্গী আইন জারী করা হয় নাই; এরূপ ক্ষেত্রে যাহাতে বে-সামরিক শাসনের অন্তরালে সামরিক শাসন হইয়া দাঁড়ায় গভর্নমেণ্টের পক্ষে এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত নহে। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে স্যার সুলতান আহম্মদ এই সব অভিযোগের কারণ যে নাই এমন কথা বলিতে পারেন নাই। তিনি বলেন—'গভর্নমেণ্ট এমন কথা বলিতে চাহেন না যে, কোথাও অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ হয় নাই কিংবা নির্দোষকে সাজা পাইতে হয় নাই। যদি তেমন কোথাও ঘটিয়া থাকে, সমর বিভাগ এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহের দৃষ্টি সে সব ক্ষেত্রে আকৃষ্ট করিতে হইবে, তবেই অপরাধীদের সাজা হইবে।' চমৎকার যুক্তি বলিতে হয়! কোথায় কোন ক্ষেত্রে অভিযোগের কারণ ঘটিয়াছে এবং সেগুলির সত্যাসত্য নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যেই তো তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নিয়োগী এই উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, সরকারী সংবাদ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কল্যাণে তাহার সামান্য অংশই জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, তিনি এবং শ্রীযুক্ত এল এম যোশী অভিযোগের সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করেন এবং সেইগুলি হইতেই অভিযোগের গুরুত্ব সরকার পক্ষের উপলব্ধি করা উচিত ছিল; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ সকল ব্যাপারে যে তদন্ত করা হইবে না, ভারত সরকার পূর্ব হইতেই তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। আইন সচিব স্যার মহম্মদ ওসমান এবং তাঁহার সতীর্থ বড়লাটের শাসন-পরিষদের স্বদেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী, বিজ্ঞ এবং গুণিগণের কাছে এগুলি ধর্তব্যের মধ্যে নয়; কিন্তু দমন নীতির অপপ্রয়োগের প্রতিক্রিয়ার ফল যে কল্যাণকর হয় না এটুকু বুঝিবার মত দূরদর্শিতা তাঁহাদের থাকা উচিত ছিল। শাসন-পরিষদের ভৈরবী চক্রের মধ্যে পড়িলে স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধির কিরূপ অধোগতি ঘটে ইহাতে সে পরিচয়ই পাওয়া গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা লেকচার

মৌলানা আজাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৫ সালের জন্য কমলা লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছেন। "মুসলিম এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের পরিণতি" এই সম্পর্কে তিনি বক্তৃতা করিবেন। বলা বাহুল্য কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হিসাবে মৌলানা আজাদ এই সম্মান লাভ করেন নাই। মুসলিম সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার পাণ্ডিত্য আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার ন্যায় একজন মনীষী পুরুষকে এই সম্মান দান করিবার সুযোগ লাভ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই গৌরবান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবার সময় পাঁচজন মুসলমান সদস্য একান্ত অযৌক্তিকভাবে মৌলানা সাহেবের এই নিয়োগের প্রতিকূলতা করেন। প্রতিবাদিগণ প্রকাশ্যে কথাটা বলেন নাই বটে; কিন্তু মৌলানা সাহেবের রাজনীতিক মতই যে লীগ-প্রভাবিত তাঁহাদের মনোবৃত্তিকে তাঁহার নিয়োগ প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, ইহা বুঝা যায়। সভাপতিস্বরূপে বিচারপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস তাঁহাদের প্রতিবাদের যথাযোগ্য উত্তর দেন। শ্রীযুত বিশ্বাস বলেন, রাজনীতিক মত এই লেকচারারশিপের পদে নিযুক্ত হইবার পক্ষে কোন বিঘ্ন বলিয়া গণ্য হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ইংলণ্ডেও বড় বড় রাজনীতিক নেতাগণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের লেকচারারের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। একজন প্রকৃত গুণী ব্যক্তির সমাদরে অন্তরায় ঘটাইতে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পাঁচজন সিনেটর এইরূপ অনুদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেজন্য দুঃখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের মত দেশের বিদ্বজ্জন সমাজের সকলেই ইহাতে ক্ষুব্ধ হইবেন। ইহাতে উক্ত মুসলমান সিনেটরদের সম্মান নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ইঁহাদের এমন মনোবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত এবং নিন্দিত হইয়াছে, ইহা সুখেরই বিষয়।

বিমান হইতে গুলী বর্ষণ—

কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর কলিকাতায় জনতার উপর মেসিনগানের গুলী বর্ষণ করা হইয়াছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে সরাসরি উহা অস্বীকার করা হয়। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে যে, বিহারের তিন জায়গায়, উড়িষ্যার এক জায়গায় এবং বাঙলার এক স্থানে বিমান হইতে জনতার উপর মেসিনগানযোগে গুলী বৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং বাঙলা দেশে এই গুলী বৃষ্টি করা হইয়াছিল কৃষ্ণনগর হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণে রাণাঘটের নিকটে একটি স্থানে। উড়ো জাহাজযোগে মেসিনগান হইতে গুলী চালান সাধারণ ব্যাপার নহে, নিতান্ত বিপর্যয়কর কোন কিছু না ঘটিলে এমন ব্যবস্থা করা দরকার হইতে পারে, এ ধারণা আমাদের হয় না। রাণাঘাট বা কৃষ্ণনগর কলিকাতা হইতে অধিক দূর নয়, এখনও কয়েকখানা ট্রেন উভয় স্থান ও কলিকাতার মধ্যে যাতায়াত করে। কলিকাতার এত নিকটে এমন কাণ্ড ঘটিয়া গেল, অথচ কেন ঘটিল এবং তাহার ফল কি যে হইল ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে পারিল না, ইহা অদ্ভুত বলিয়াই মনে হয়। ভাগ্যে পণ্ডিত কুঞ্জরু প্রশ্ন

করিয়াছিলেন তাহাতেই চাপা খবরটা প্রকাশ পাইল। কিন্তু পণ্ডিতজীর প্রশ্নের উত্তর পাইয়াও আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই; আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগিতেছে এই যে, এই ব্যবস্থার ফলে কতজন লোক হতাহত হইয়াছিল, যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহারা কোথায় ও কি অবস্থায় আছে এবং তাহারা কি অপরাধ করিয়াছিল আর যে অপরাধ করিয়াছিল তাহাতে এইরূপ সমরোদ্যম অবলম্বিত হইবার পক্ষে সত্যই আবশ্যক ছিল কিনা।

উজ্জ্বল আদর্শ নিষ্ঠা

সিন্ধুপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী আল্লাবক্স গভর্নমেন্ট দত্ত 'খান বাহাদুর' এবং ও বি ই উপাধি বর্জন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বড়লাটের নিকট তিনি একখানা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত পত্রে তাঁহার উপাধি বর্জনের কারণ সম্বন্ধে আল্লাবক্স বলেন,—"কমন্স সভায় মিঃ উইনস্টল চার্চিল সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহার ফলে ভারতের প্রতি শুভেচ্ছাসম্পন্ন সকল ব্যক্তিই অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছেন। ইঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, ভারতের প্রতি দীর্ঘদিনের অবিচার হয়ত দূর করা হইবে; কিন্তু ঐ ঘোষণার দ্বারা নিশ্চিত হইল যে বৃটেন ভারতে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব ত্যাগ করিতে চাহে না। এরূপ অবস্থায় আমার পক্ষে বৃটিশ গভর্নমেন্টের সম্মান চিহ্ন ধারণ করা সম্ভবপর হইল না। যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে ঐগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারিতেছি না। সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী আল্লাবক্সের উপাধি বর্জনে রবীন্দ্রনাথের কথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ উপাধি বর্জন করেন। ঐ সময় তিনি যে তেজোদ্দীপ্ত উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক চির-স্মরণীয়তা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন,—"আমাদের অপমানের বোঝা অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পাশে সম্মানের চিহ্ন শুধু আমাদের লজ্জাকেই স্ফুটতর করে।" সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী একজন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক পুরুষ। জাতির চিরন্তন অবমাননার আঘাত তাঁহার চিত্তকে উত্তপ্ত করিবে ইহা স্বাভাবিক। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এবং ভারত সচিব হইতে আরম্ভ করিয়া বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যগণ পর্যন্ত ভ্রান্তভাবে মুসলমান সম্প্রদায় ভারতের স্বাধীনতার পরিপন্থী ইহা প্রতিপন্ন করিয়া যেভাবে সাম্রাজ্যবাদ এদেশে দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত কূটকৌশল অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন আল্লাবক্স সাহেব ভারত সম্পর্কে বৃটিশ গভর্নমেন্টের সেই নীতির মূলীভূত একান্ত অন্যায় এবং ঔদ্ধত্যকে মান-সম্মানের তকমা দিয়া চাপা দিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছেন। তিনি তেজস্বী পুরুষ; ততটা দৈন্য স্বীকার করিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তিনি মান যশের তকমাকে তুচ্ছ করিয়া আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন; বিবেককে ক্লিষ্ট করেন নাই। তাঁহার এই তেজস্বিতা মনুষ্যত্বের মহিমাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে।

দুঃখের দিন

দেশ জোড়া দুঃখের দিন পড়িয়াছে। বড় দুঃখের দিনেও বাঙালী পূজার কথা ভুলিতে পারে না; কিন্তু এবার তাহাও ভুলিয়াছে। অন্যান্য বৎসরের বিচারে পূজার বাজার বাঙলা দেশে আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়; কিন্তু এবার তাহা কোথাও উপলব্ধি হয় না। সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বাঙলা দেশের রাজস্ব সচিব ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান দ্রব্য-দুর্মূল্য এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতির সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করেন; তাঁহার সে বিবৃতিও আমাদের মনে কোনরূপে আশার উদ্রেক করে নাই। চাউলের দুর্মূল্যতার সমস্যা সর্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় আগামী বৎসরে যে ধান্য উৎপন্ন হইবে, তাহাতে বাঙলার অভাব মিটাইয়া এক কোটি মণ চাউল উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। ভবিষ্যতের সে ভরসায় থাকা চলিত, যদি বর্তমানের অভাব না থাকিত; কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসের আরও দুই মাস দেরী; এই দুই মাস কাটিবে কিসে? বাঙলার সর্বত্র ইতিমধ্যেই চাউলের দারুণ অভাব দেখা দিয়াছে। কোন কোন স্থানে দস্তুরমত অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে ডাক্তার মুখোপাধ্যায়, এ অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে, এমন কোন আশ্বাস আমাদিগকে দিতে পারেন নাই। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, মানবতার দায়ে বাঙলা দেশ হইতে অন্যত্র কিছু চাউল প্রেরণের অনুমতি দিতে হইয়াছে। মানবতা খুবই ভাল জিনিষ, কিন্তু বাঙলা দেশেও এ মানবতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র বহু স্থানে একান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই সঙ্গে বাঙলা সরকারের সে বিবেচনা আগে করা কর্তব্য ছিল। শুনিতেছি বাঙলা সরকার ৯ লক্ষ টন চাউল কিনিয়া দুর্দিনের জন্য মজুত করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের মতে দুর্দিন আসিতে আর বাকি নাই। এই ৯ লক্ষ টন চাউল বাঙলা সরকার যদি বাজারে ছাড়েন, তবে আগামী বৎসরের ফসল উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত দেশের লোকের অন্নাভাবেব পরিপূরণ হইতে পারে। অন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আশা তো জাগেই না, বরং অধিকতর দুর্দিনেরই আশঙ্কা দেখা দেয়। তিনি বলেন, বিহারের কতকগুলি কলে উৎপন্ন সমগ্র চিনি বাঙলায় আমদানী করিবার জন্য ভারত সরকার অনুমতি দিয়াছেন, তবে রেলপথের গোলযোগের জন্য সে চিনি আমদানী করিতে বিঘ্ন ঘটিতেছে; সুতরাং সে বিঘ্ন কতদিনে কাটিবে বলিবার উপায় নাই। লবণের সম্বন্ধে অর্থ সচিবের উক্তি এই যে, বাঙলা দেশে বর্তমানে যে লবণ আছে তাহাতে বড় জোর দুই মাস চলিতে পারে। ইহার পর আমদানীর ব্যবস্থা যদি অব্যাহত থাকে, তবে লবণের তেমন অভাব হইবে না। কিন্তু কোন কারণে যদি জলপথে লবণ আমদানীতে বিঘ্ন ঘটে, তবে লবণ সমস্যাও গুরুতর আকার ধারণ করিবে; সুতরাং লবণের সম্বন্ধেও ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। কেরোসিনের সমস্যা তো আরও জটিল। যতটা দরকার ততটা কেরোসিন তো মিলিবেই না, অর্ধেক পরিমাণেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে পরামর্শ দান করা হইয়াছে; কিন্তু আমাদের কথা এই যে, অর্ধেক পরিমাণও এখন পাওয়া যাইতেছে না, সিকি পাওয়াই মূল্যের অনুপাতে দুর্ঘট হইয়াছে। ইহার পর বস্ত্র সমস্যা। পূজার বাজার আসিয়া পড়িল। কাপড়ের মূল্যও উত্তরোত্তর চড়িতেছে; বহু বিজ্ঞাপিত স্ট্যান্ডার্ড ক্লথের দর্শন যে কবে মিলিবে কিছুই ঠিক নাই।

বর্তমান অশান্তি ও সেনাদল

ভারতীয় পূর্ব সীমান্তবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল এন এম এস আরুইন গত ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে সেনাদলের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া সম্প্রতি এক বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন,—"বর্ষা আসিয়া পড়ায় আমাদের দারুণ ক্লেশের কারণ ঘটে, কিন্তু সেই বর্ষার জন্য সম্ভাবিত বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আমরা বিশ্রামও পাই, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা যে সময় বাধাবিঘ্নের সঙ্গে যথাসম্ভব সাফল্যের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলাম, তখন পশ্চাদ্দিক হইতে আমাদিগকে ছুরিকাঘাত করা হয় এবং ভারতরক্ষা কার্যে আমাদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়। তোমরা ভারতীয় এবং ব্রিটিশ সেনাগণ, তোমাদিগকে দুর্দিন কাটাইতে হইয়াছে। ভারতবর্ষের একদল লোকের বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য আমাদের দুঃখকষ্ট বৃদ্ধি পায়। আমাদের গতিবিধির পথের উপর বিঘ্ন সৃষ্টি করায় আমাদের অনেক নৈরাশ্যের কারণ ঘটে এবং কিছু সময়ের জন্য আমরা ছুটি হইতে বঞ্চিত হই। উপরে দৈব-দুর্যোগ, চারিদিকে ব্যারাম-পীড়া এবং পিছনে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা, এগুলি একত্রভাবে আমাদের উদ্যম ব্যর্থ করিতে চেষ্টিত হয়। আমাদিগকে আমাদের কর্তব্য হইতে বিচ্যুত করিবার সে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও আইন ও শান্তিরক্ষার কার্যে সিভিল গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতীয়দের উপর গুলী চালানোর কঠিন কাজ করিতে হইয়াছে; কিন্তু তোমরা দৃঢ়তার সঙ্গে, বিচারশীলতার সঙ্গে এবং ধীরতার সহিত সে কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছ। এই সঙ্কট মুহূর্তে এদেশের কতকগুলি লোক ধ্বংসকার্য এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার দ্বারা সমরোদ্যমে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হয়। জার্মানদের নিষ্ঠুর নরহত্যার পদ্ধতিতে এই আতঙ্ক দূর করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই, ধীরতার পথই আমাদের পথ। কিন্তু ধীরতা বলিতে দুর্বলতা বুঝিও না। আমি তোমাদিগকে প্রকাশ্যভাবে বলিতেছি যে, ধনসম্পত্তি এবং আমাদের গতিবিধির পথ নিরাপদ রাখিবার জন্য তোমরা যেরূপ কাজ করা আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তাহা সর্বদা আমার সমর্থন লাভ করিবে; কিন্তু তোমাদের কাজ ক্ষেত্রোপযোগী কঠোর হওয়া কর্তব্য।" এমন ধরণের বক্তৃতা ভারতের অবস্থার ভীষণতাকে অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার করিতে সাহায্য করিবে বলিয়াই আমাদের মনে আশঙ্কা হয়।

জাপানের ভবিষ্যৎ সমরনীতি

ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল নয়াদিল্লীতে একটি ভোজসভায় ভারতের সামরিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। জাপানের ভবিষ্যৎ কর্মোদ্যম সম্পর্কে তিনি বলেন, তাহারা অস্ট্রেলিয়া বা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার মত কোন বড় কিছু বর্তমানে আরম্ভ করিবে বলিয়া মনে হয় না। চুংকিংয়ের চীনা সামরিক মহলেরও এই বিশ্বাস যে, জাপানীরা খুবসম্ভব ভারত আক্রমণের জন্য উদ্যোগ করিবে না। ব্রহ্মদেশে বর্তমানে জাপানীদের মাত্র সাড়ে তিন ডিভিসন সৈন্য আছে; এত অল্প সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ অধিকার করা যে সম্ভব নহে, জাপানীরা ইহা জানে। পক্ষান্তরে ভারতীয় পূর্ব সীমান্ত বাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল আরুইন সম্প্রতি সেনাদল লক্ষ্য করিয়া একটি বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, গত ৫ মাস হইল জাপ সেনাদের কোন কর্মতৎপরতা দেখা যাইতেছে না, কিন্তু তাহা হইতে এমন বুঝা ঠিক হইবে না যে, জাপানীরা স্থলপথে বা জলপথে ভারত আক্রমণের চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছে কিংবা ভারতের কোন স্থানের উপর তাহারা আর বোমা বর্ষণ করিবে না। ইংলণ্ডের সহকারী প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী সেদিন কানাডাবাসীদিগকে এই কথা শুনাইয়াছেন যে, জাপানীদের আতঙ্ক এখনও কাটিয়া যায় নাই। এই সব সামরিক এবং রাজনীতিক বিশেষজ্ঞগণের বিভিন্নরূপ আলোচনা এবং গবেষণা হইতে অন্তত এই একটি সত্য সর্বসম্মতভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে রুশিয়ার অবস্থার উপরই সব নির্ভর করিতেছে। জেনারেল ওয়াভেল বলিয়াছেন, সব নির্ভর করিতেছে রুশিয়ার উপর। উত্তরে এবং দক্ষিণে ককেশাসে যদি রুশবাহিনী সুসংবদ্ধ থাকে, তবে জার্মানী তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিবে না। এই দিকেই ভারতের পশ্চিম বাহু।" চীনা সামরিকগণও বলিতেছেন, জাপান যদি তাহার সমরনীতিতে সার্থকতা লাভ করিতে চায় তবে রুশিয়াকে দুর্বল করা তাহার পক্ষে প্রয়োজন; জার্মানী রুশিয়াকে এখনও দুর্বল করিতে পারে নাই। কিন্তু যে রুশিয়ার সমরশক্তির উপর মিত্রপক্ষের ভবিষ্যৎ এতটা নির্ভর করিতেছে, তাহার বর্তমান অবস্থা কি? মার্কিন প্রেসিডেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপে মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকী সম্প্রতি খোলাখুলিভাবে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আগামী শীতকালে রুশিয়ার খাদ্যাভাব দেখা দিবে, হয়তো তদপেক্ষা খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হইবে। জ্বালানী মিলিবে না। লক্ষ লক্ষ রুশগৃহে অভাব সৃষ্টি হইবে। সৈন্যবাহিনী ও অত্যাবশ্যক কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকেরা ছাড়া প্রায় সকলেই বস্ত্রহীন, বহু প্রয়োজনীয় ঔষধ একেবারেই নাই।" মিঃ উইলকির মতে, এরূপ অবস্থায় ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির দ্বারাই রুশিয়াকে সর্বাধিক সাহায্য করা যায়। এজন্য যদি পরবর্তী গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়, তখন আর কোন কাজ হইবে না—সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। এতদিন পর্যন্ত এই দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রশ্ন সম্বন্ধে ইংরেজপক্ষের কোন কথা স্পষ্ট শুনা যায় নাই; কিন্তু সেদিন এটলী সাহেব একেবারে রুদ্রমূর্তি ধরিয়া যাহারা দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির কথা বলেন, তাহাদিগকে 'নির্বোধ' 'শত্রুর ক্রীড়নক' এই সব কড়া কথা বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, মিত্রপক্ষের সমর-পরিকল্পনা দায়িত্বহীন জনসাধারণের দাবী দ্বারা পরিবর্তিত হইতে পারে না; কিন্তু রুশিয়াও তো মিত্রশক্তির অন্যতম। সম্মিলিত পক্ষের সমরনীতির দুর্জ্ঞেয় রহস্য আমাদের বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে ইহা স্বীকার করি এবং রুশিয়ার জনসাধারণও হয়তো নির্বোধ; কিন্তু মিঃ উইলকী; যিনি এত বড় একজন রাজনীতিক এবং আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের পরেই যিনি সে দেশে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় ব্যক্তি বলিয়া শুনিতে পাই, তিনিও কি নির্বোধ এবং তিনিও কি শত্রুর কথাতেই নাচিতেছেন?

আট

অনুপম অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে কোম্পানীর নামটা গিলিয়া ফেলিতে লাগিল। রাস্তায় দারুণ ভিড়; জনতার ধাক্কায় অনুপমের টাল সামলাইয়া দাঁড়াইয়া থাকাই মুস্কিল। কিন্তু কোম্পানীর নামের প্রথম অক্ষরটা K; সুতরাং ভিড়ই হউক আর বজ্রপাতই হউক, যতক্ষণ না সে নামটি বার বার আওড়াইয়া চক্ষু বুজিয়া এক মিনিট ধ্যান না করিতে পারিবে, ততক্ষণ কিছুতেই সরিবে না। ইতিমধ্যে সেই ভদ্রব্যক্তিটি আসিয়া অনুপমের কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অনুপমের নাম পড়া শেষ হইলে সে সবেমাত্র চক্ষু বুজিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত ভদ্রলোকটি দক্ষ কয়টা আঙুল অনুপমের প্যাণ্টের পকেটে প্রবেশ করাইয়া অবলীলাক্রমে তাহার মনিব্যাগটা তুলিয়া লইলেন।

অনুপম সিদ্ধান্ত করিল, উহুঁ এটাও নয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্যাণ্টের পকেটে সামান্য আকর্ষণ অনুভব করিল। মুহূর্তে সে ঘটনাটা বুঝিতে পারিল এবং চট করিয়া ডান হাতটা দিয়া সেই দক্ষ অংগুলিযুক্ত হাতটা চাপিয়া ধরিল। ভদ্রলোক এমনটা আশঙ্কা করেন নাই। কিন্তু সর্ব অবস্থার জন্যই তিনি শিক্ষিত হইয়াছেন, জোরে টান দিয়া হাতটা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অনুপমের বজ্রমুঠি! সে তো হাত ছাড়িলই না, চকিতে ঘুরিয়া 'ডাকু, ডাকু' বলিয়া বিরাট চীৎকার উঠাইল। পুলিস পুলিস, পাকিটমার'। ভদ্রলোক যতই পালাইতে চেষ্টা করে, অনুপম ততই তাহাকে জোরে চাপিয়া ধরে।

ভিড়বহুল রাস্তায় মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের চতুর্দিকে ভিড় জমিয়া গেল। অনুপম 'পুলিস পুলিস' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, ভিড়ের মধ্য হইতে অনেকেও 'পুলিস' বলিয়া হাঁক শুরু করিয়া দিল। ইতিমধ্যে ভদ্রলোকের কাছ ঘেঁষিয়া ভিড়ের যে সকল লোক দাঁড়াইয়াছিল, ভদ্রলোকটি তাহাদের একজনের হস্তে মনিব্যাগটা অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে চালান করিয়া দিলেন এবং নিতান্ত আইনভীরু লোক হিসাবে তিনি চীৎকার তুলিলেন, পুলিস, পুলিস।

শীঘ্রই পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অনুপম তাহার অপূর্ব হিন্দীতে না ইংরেজীতে অভিযোগ করিবে, তাহা স্থির করিবার পূর্বেই আমাদের ভদ্রলোকটি করুণ আর্তনাদ করিয়া আরম্ভ করিল—এই বাঙালী আমার পকেট মারবার জোগাড় করেছিল; আমি একটুর জন্য বেঁচে গেছি। ধরা পড়ে উল্টে আমার উপর দোষ চাপাবার চেষ্টা করচে; হাঁক দিয়ে লোক জড়ো করেচে।

অনুপম বিস্মিত হইয়া পরক্ষণে ক্রুদ্ধ চীৎকার করিয়া কহিল, একদম ঝুট, এটা একেবারে পাকা জোচ্চর। একেবারে দুষ্মন। আমার মনিব্যাগ উঠিয়ে নিয়েছে, পুলিসম্যান। এবং দ্বিধান্বিত পুলিসম্যানকে সততার নিশ্চিত প্রমাণ দিবার জন্য জনতাকে দেখাইয়া বলিল, এদের জিজ্ঞেস করো। আমিই 'গাঁট কেটেচে' বলে আগে চেঁচিয়েছি না?

জনতার মধ্য হইতে কেহ বলিল,—এই বাবু আগে চেঁচাইয়াছিলেন সত্য। কেহ বলিল, পকেট মারিতে দেখি নাই। কেহ কহিল, পরস্পর পরস্পরকে ধরিয়া আছে দেখিতে পাই।

গাঁটকাটা কহিলেন, 'ময় শরীফ আদমি হুঁ; ময় পাকিট মারেঙ্গে, এ ক্যায়া তাজ্জব কি বাত? উ বাঙালী হ্যায়; বোমা বানানেওয়ালেকো জাত। উ পাকিটমার......

অনুপম প্রতিবাদ করিয়া কহিল, বটে; আমি পাকিটমার, আর তুমি ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। পাহারাওয়ালা, দেখো হামারা পাকিট। বলিয়া সমস্তগুলি পকেটই দেখাইয়া দিল।

গাঁটকাটাও না দমিয়া কহিলেন—'হামারা ভি পাকিট দেখো। সিফ' এক রুপায়া ছোড়কে আউর কুছ নেই। বলিয়া সেও তাহার সমস্ত পকেট দেখাইতে লাগিল। দেখা গেল, সত্যসত্যই একটা টাকা ছাড়া তাহাতে আর কিছু নাই।

পাহারাওয়ালা মুস্কিলে পড়িয়া কহিল, দুজনই থানায় চলো। অনুপম বার বার প্রতিবাদ করিল, ১১টার মধ্যে অফিস খুঁজিয়া বাহির না করিতে পারিলে চাকরী ফসকাইবে, তাহা জানাইল। কিন্তু তাহার অপূর্ব হিন্দিতে পাহারাওয়ালা প্রবুদ্ধ হইল না এবং দুজনকে ধরিয়াই থানার দিকে অগ্রসর হইল।

এসিসট্যাণ্ট পুলিস কমিশনারের অফিস। এসিসট্যাণ্ট পুলিস কমিশনার চেয়ারে বসিয়া আছেন; পাশে একজন ইন্সপেক্টর। টেবিলের সম্মুখে অনুপম এবং দূরে দেওয়ালের কাছে গাঁটকাটা 'ভদ্রলোক'। দুজন পুলিসও আছে ঘরের ভিতর।

এসিসট্যাণ্ট কমিশনার জাতে গুজরাতী। তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমে অনুপম বাঙালী মনে করিয়াছিল এবং আশ্বস্ত বোধ করিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহার ধারণা বদলাইয়া গেল এবং ইন্সপেক্টরের স্পষ্ট বৈরীতা লক্ষ্য করিয়া সে প্রমাদ গণিল।

সুখের বিষয় পুলিস সাহেব তাহাকে ইংরেজীতেই জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং হিন্দিতে বলিতে না হওয়ায় সে স্পষ্ট করিয়াই মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিল।

'তুমি কোথায় থাক ?'

মাত্র আজই কলকাতা মেলে এখানে এসে পেঁাচেছি।'

'কোথা থেকে আসচ ?'

'কলকাতা থেকে।'

'তুমি বাঙালী ?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে কেন এসেচ ?'

অনুপম জবাব দিবার পূর্বেই ইন্সপেক্টর ঘাড় নাড়িয়া অর্ধস্বগত উক্তি করিলেন—বাঙালী! বোম্বেতে আজই এসে পেঁাছেচি! ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হচ্চে।

কোন্‌টা সন্দেহজনক, বাঙালী হওয়া, না—আজই আসিয়া পেঁাছান, তাহা অনুপম উপলব্ধি করিতে পারিল না, সে একবার-মাত্র ইন্সপেক্টরের দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া পুলিস সাহেবের প্রশ্নের জবাব দিয়া কহিল, এখানেরই একটা ফার্মে আমার কাজ হয়েচে। আমি কাজে যোগ দিতে এসেচি, কিন্তু......'

'ফার্মের নাম কি ?'

নাম কি? এই রে, সর্বনাশ করিয়াছে। অনুপমের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে শুরু করিল। তোতলাইয়া সে কহিল, 'অবস্থাটা এই; মানে হলো গিয়ে, ব্যাপারটা একটু না বুঝিয়ে বল্লে......'

'এর মধ্যে বোঝাবার কি আছে ফার্মের নাম জানো না ?'

'মুস্কিল হলো এই যে......'

'মুস্কিলই বটে। এর পরও তুমি যে কাহিনী বলেছ, সেটা আমাকে বিশ্বাস করতে বল ? তুমি বলচ, বম্বের একটা ফার্মে তুমি কাজ পেয়েছ; অথচ ফার্মেরই নাম বলতে পার না ?'

ওদিক হইতে গাঁটকাটা সহর্ষে চেঁচাইয়া বলিলেন, দেখিয়ে হুজুর, ক্যায়সা জুয়াচোর। বাঙালী হলো বোমাওয়ালার জাত। কি সর্বনেশে কথা বলুন তো। বেমালুম আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। খপ্ করে যেই ধরে ফেল্লুম, নিতান্ত ভালমানুষ সেজে হাঁকডাক সুরু করে দিল। বাঙালী ছাড়া আর কেউ...

গুজরাটী পুলিস সাহেব জোরে ধমক দিয়া কহিলেন, চুপ রও এবং একবার অনুপমের দিকে ও পরে পুলিসদ্বয়ের দিকে চাহিয়া হুকুম দিলেন, বাবুজীকো হাজত মে লে যাও।

সিপাহীরা অগ্রসর হইয়া আসিল। অনুপম বুঝিল, এইবার আর রক্ষা নাই। দেড়গজী নামটা কি বিপদেরই যে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু চাকরিটা ফসকাইল তাহাই নয়, নামটা ভুলিয়া যাওয়ায় এখন সে পকেটকাটা প্রতিপন্ন হইতে চলিয়াছে। চাকরির অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাহাকে শুধু চাকরি হইতে বঞ্চিত করিয়াই খুসি নয়; তাহার বিধানের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া মরিয়া হইয়া চাকরি সংগ্রহ করিতে আসায় এই-বার রীতিমত শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছে- অনুপম সক্রোশে ভাবিল। অতঃপর সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচাইয়া কহিল, না বিশ্বাস করলে আমি আর কি করতে পারি। কিন্তু আমি খাঁটি সত্য কথা বলেচি; মিথ্যে কথা বলার আমার অভ্যাস নেই। কলকাতায় থাকতেই চাকরির চিঠিটা হারিয়ে গিয়েছিল; আমি এখানে ফার্মটাকে খুঁজে বার করবার জন্য এসেচি; কোম্পানী আমদানী রপ্তানির ব্যবসা করে; মস্ত একটা দেড়গজী নাম। তোমাদের দেশের নাম মনে রাখে কার সাধ্য। ভুলে গিয়েচি। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, তার আদ্যাক্ষরটা ইংরেজী K। ঐটুকু মাত্র সম্বল নিয়ে এই অজানা দেশের অজানা রাস্তায় একটা নাম ভুলে যাওয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করবার চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম। আজই আমার কাজে যোগ দেবার তারিখ। এই সময়ে তোমাদের শহরের একটা গাঁটকাটা আমার পকেট থেকে আমার মনিব্যাগটা উঠিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও তার হাতখানা চেপে ধরলুম, এই আমার অপরাধ। এত চেষ্টার চাকরিটা খোয়ালাম, এইবার তোমাদের শহরে আসার অপরাধে জেলেও চলেচি।

ইন্সপেক্টর মৃদুস্বরে টিপ্পনী কাটিয়া কহিলেন, আবার রাগ দেখান হচ্চে। কিন্তু শুধু মুখের কথার উপর নির্ভর করা চলে না; তোমাকে প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে।

গাঁটকাটাও সময় বুঝিয়া কহিল, এ বিলকুল ঝুটমুট। নিজেই তো ও বলচে, ও বেকার। খাওয়ার পয়সা সংগ্রহের জন্য চমৎকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেচে। বাঙলাতে তো খেতে পারে না......

পুলিস সাহেব জোরে ধমকাইয়া কহিলেন, চুপ রও। ফালতো মৎ বকো...' এবং অনুপমের দিকে চাহিয়া কহিলেন, ফার্মের নামটা দেখালে তুমি চিনতে পারবে ?

অনুপম একটু ভাবিয়া কহিল, হয়ত পারব।

পুলিস সাহেব টেবিল হইতে টেলিফোন ডাইরেক্টরী তুলিয়া লইলেন। কে—শীর্ষক নামগুলি বাহির করিয়া কহিলেন, খুঁজে বের করো......

ইন্সপেক্টরের গোল গোল চোখ দুটি হইতে চোখ-দুটি বাহির হইয়া আসিল। সাধুকে চোর প্রমাণ করার অপূর্ব আনন্দের স্বাদ তিনি জানেন। এই স্বাদের আগাম আভাসে তিনি পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন।

অনুপম ভীত, ত্রস্ত, দুর্বল আঙুলে পাতা উল্টাইতে লাগিল। পাতার উপর দৃষ্টি একাগ্র করিয়া প্রতিটা নামের উপর দিয়া সে আঙুল বুলাইয়া গেল; কিন্তু নামটা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। মুখ পাংশু, আঙুল কম্পমান, দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া উঠিতেছে। যে নামটা সম্ভব মনে হইতেছে, তাহার উপর আঙুল রাখিয়া সে চোখ বুজিয়া ফেলে এবং পরের মুহূর্তে চোখ মেলিয়া হতাশায় ঘাড় নাড়ে।

মিনিটের পর মিনিট পার হইয়া যাইতে লাগিল। কাহারও দিকে না চাহিয়াও অনুপম বুঝিতে পারিল, তাহারা ধৈর্যের শেষ মাত্রায় আসিয়া পেঁাছিয়াছে। কিন্তু উপায় কি? কিছুতেই যে নামটা পাওয়া যাইতেছে না। বড় কোম্পানী; আমদানী রপ্তানির ব্যবসা করে, তাহাদের টেলিফোন থাকিবে না, ইহা অবিশ্বাস্য। নামটা খুঁজিয়া বাহির করিতে অসমর্থ হইয়া কি করিয়া সে ইঁহাদের বিশ্বাস করাইবে যে, সে প্রকৃতই সত্য কথা বলিয়াছে।

তবু সে প্রাণপণে নামগুলির উপর দিয়া আঙুল বুলাইয়া যাইতে লাগিল। বুকটা ধড়াস ধড়াস করিতেছে, মাথায় সমস্ত

(শেষাংশ ৩২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইটালীর ব্যাপারে আমার কোন স্বার্থ নেই। তুমি আমার কাছে এসেছ কেন? তোমাকে কে পাঠিয়েছে?"

"কিন্তু তুমি ত আমাকে ত্রিশ বছর ধরে জানো" স্ত্রীলোকটি কাঁদতে কাঁদতে বললে। "আমি যে সর্বদা ভদ্রভাবে জীবিকা অর্জন করে আসছি একথা তুমি জানো। জানো ত আমি সর্বদা আমার ব্যবসার দিকে নজর দিয়ে আসছি......" ড্যানিয়েল স্বর চড়িয়ে বাধা দিল: "আমি জানতে চাই তোমাকে কে পাঠিয়েছে!" "কেউ না!" ক্যাটেরিনা জবাব দিল। পরে আরও শান্ত সুরে বলল: "আমি তোমাকে বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত। আমি আর তোমাকে ধরে রাখব না!"

সে তারদিকে পিছন ফিরে গর্ডোলা এবং মিনুসিওর দিকে যাবার রাস্তায় পা বাড়াল। ড্যানিয়েল তার অনুসরণ করে চলল—কিছুক্ষণ পরে সে আবার আলোচনা শুরু করল।

"কেউ যদি তোমাকে না পাঠিয়ে থাকে, তবে তুমি আমার কাছে এলে কেন?" ড্যানিয়েল তাকে জিজ্ঞাসা করল।

"আমি উপদেশ চাই বলে" ক্যাটেরিনা সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিল।

"কি রকমের উপদেশ?"

"ভদ্রলোকের প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত কিনা সেই বিষয়ে" হঠাৎ থেমে ক্যাটেরিনা বলল। "কি যে করব আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমি সারা জীবনে এরকম চিন্তিত আর উদ্‌ভ্রান্ত হইনি কখনও। যদি গ্রহণ করি, তবে কিছুটা অর্থ পাব বটে কিন্তু যারা আমার কখনও কোন অপকার করেনি, এমনই লোকের অনিষ্ট সাধন করতে হবে আমাকে। যদি প্রত্যাখ্যান করি, তবে আমাকে ফ্যাসিস্ত বিরোধী বলে ধরা হবে এবং নানা রকমভাবে আমার উপরে অত্যাচার চলবে। তুমি ত আমাকে ত্রিশ বছর ধরে জানো, জানো বোধ হয় যে আমি ফ্যাসিস্তও নই, ফ্যাসিস্ত বিরোধীও নই। তুমি ত জানো যে, আমি ভদ্রভাবেই সর্বদা জীবিকা অর্জন করেছি এবং নিজের ব্যবসার দিকে নজর দিয়েছি।"

ড্যানিয়েল গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে রইল।

ক্যাটেরিনা কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে চলল—ড্যানিয়েল পুনরায় তার অনুসরণ করল।

পথের শেষে অ্যাগোস্টিনো অপেক্ষা করছিল।

"শোন" ড্যানিয়েল স্ত্রীলোকটিকে বললে, "ভয় পেয়ো না। আমাকে এইমাত্র যেসব কথা বললে সেসব অ্যাগোস্টিনোকে বল এবং সে তোমাকে যা করতে বলে তাই কর!"

ড্যানিয়েল তাদের গর্ডোলার দিকে যেতে দেখল এবং তারপর তার শূকরগুলোর পরিচর্যার জন্য খোঁয়াড়ে ফিরে গেল।

একদিন সে আর তার মেয়ে আঙুরের ক্ষেতে কাজ করছিল—এমন সময় অ্যাগোস্টিনো এসে হাজির হ'ল। সেই শূকরীটার বাচ্চা হবার পরে এই তাদের প্রথম দেখা।

পোকার হাত থেকে আঙুরের গাছগুলোকে বাঁচানোর জন্য আজকের কার্যহীন সকালটাকে ড্যানিয়েল নিযুক্ত করেছিল তাদের সেবায়। ছোট একটা ধাতুনির্মিত বুরুশ নিয়ে সে পোকায়-লাগা অংশগুলো খুঁজে ফির্‌ছিল আর সিলভিয়া ফুটন্ত জল-ভরা একটি জলপাত্র হাতে নিয়ে ফিরছিল তার পিছে পিছে, পোকায়-লাগা জায়গায় সেই জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল। অ্যাগোস্টিনো একটি লরি বোঝাই করে ইট নিয়ে যাচ্ছিল। গাড়িটার গতি কমিয়ে সে বলে উঠল: "ওহে, সে কাজটা অগ্রসর হয়েছে।"

"কোন্ কাজ?" ড্যানিয়েল তৎক্ষণাৎ তার কথা বুঝতে না পেরে জবাব দিলে।

"আমি যা বলছি তা তুমি জান।' অ্যাগোস্টিনো একটা হাত নেড়ে আবার গাড়িটা জোরে চালিয়ে দিল। ড্যানিয়েল অসম্মতি-সূচক মাথা নাড়ল।

"তারা সাহসী, সদাশয় এবং ভাবপ্রবণ কিন্তু তারা বড় বেশী কথা বলে!"

সিলভিয়া বহু দিন ধরে বাবাকে যে-কথা বলতে চাইছিল সেকথা বলার জন্য দৃঢ়সংকল্প করল। সে বলল: "বাবা, আমি জানি তুমি ইটালির স্বাধীনতার জন্য অনেক কিছু করছ, যদিও তুমি এ বিষয়ে কোন কথা বল না। আমার খুব ইচ্ছা হয় যে তোমাকে সাহায্য করি!"

"ওই ছোট ডালগুলো জড় করে পুড়িয়ে ফেল", তার পিতা জবাব দিল।

"এ মুহূর্তে তোমার জন্য শুধু এই কাজটিই আছে।"

সিলভিয়া তার আদেশ শুনল। ড্যানিয়েল দেখতে লাগল সে আঙুরের গাছের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, অবনত হয়ে ছোট ডাল-গুলোকে ছোট ছোট স্তূপে জড় করছে। গত নভেম্বরে সিলভিয়ার বিংশতিতম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে—গর্ব এবং ভয়ে ভরা মন নিয়ে ড্যানিয়েল তাকে দেখতে লাগল, কারণ এই মেয়েটিই ছিল তার সবচেয়ে বেশী মূল্যবান এবং সবচেয়ে বেশী অনিশ্চিত সম্পদ।

এর কয়েকদিন পরে একদিন রবিবার সকালে আবার অ্যাগোস্টিনোর সাথে ড্যানিয়েলের দেখা হ'ল। গত রাত্রে একটি খেঁক-শিয়াল ক্যাডেনাজ্জো এবং বোবা সাক্কোর কয়েকটি মোরগের খোঁপে হানা দিয়েছিল—তাই নিয়ে ড্যানিয়েলের সঙ্গে ফিলোমেসার কথা হচ্ছিল। "প্রায় পঞ্চাশটি মোরগের বাচ্চাকে ঘাড় মটকানো অবস্থায় পাওয়া গেছে" ফিলোমেসা বলল।

ড্যানিয়েল মন্তব্য করল: "যদি ঘাড় মটকিয়ে রক্ত খেয়ে থাকে, তবে ত ওটা খেঁকশিয়াল নয়, তবে ওটা মার্টেন (এক জাতীয় মাংসাসী নকুল)।" ক্যাডেনাজ্জো থেকে একজন শোফার এল—এ বিষয়ে তার মত জিজ্ঞাসা করা হল। সে বলল: "ওটা নিশ্চয়ই খেঁকশিয়াল—তবে একটা নয় বোধ হয় অনেকটি। একটা মোরগের খোঁপে ত শুধু লেজের পালক ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি!"

ফিলোমেসা ড্যানিয়েলকে বলল: "আমাদের মুরগীর বাচ্চা সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে। গতবার ত অসুখ লেগে অনেক মুরগীর বাচ্চা মরে গেছে—এবার যদি খেঁকশিয়ালের পাল্লায় পড়ি তাহলেই গেছি।" "আমরা ফাঁদ পাতব" ড্যানিয়েল বলল। এমনি সময় অ্যাগোস্টিনো এসে হাজির হল। সে ড্যানিয়েলকে আড়ালে নিয়ে বলল যে, সব কাজ ভালভাবেই অগ্রসর হচ্ছে। "ক্যাটেরিনা আমার উপদেশ মতই চলছে" সে বলল। "গোয়েন্দাটা নিশ্চয়ই টোপ গিলবে। আমাদের নজর রাখতে হবে।"

ড্যানিয়েল উত্তেজিত হয়ে বলল: "তুমি কি করতে চাও?"

"আমাদের ফাঁদ পাততে হবে" অ্যাগোস্টিনো জবাব দিল।

ফাঁদ কথাটার উল্লেখে ড্যানিয়েল না হেসে থাকতে পারল না। তাদের দুজনের আলাপের এই একটি মাত্র কথাই ফিলোমেসা শুনতে পেল এবং ছোঁ মেরে কথাটাকে ধরল বলা চলে।

"শুধু ফাঁদ দিয়ে চলবে না" সে অ্যাগোস্টিনোকে বলল। "খেঁকশিয়াল ভয়ানক চালাক এবং টোপ ছোঁয়ার আগে চতুর্দিক ভাল করে দেখে নেয়। একবারেই টোপটাতে কামড় দেয় না—পা দিয়ে সেটাকে নিজের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করে। ইস্পাতের ফাঁদ পেতে রাখা অবশ্য ভাল—তবু সেই সঙ্গে কিছুটা বিষাক্ত খাদ্যও এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রাখা ভাল।"

অ্যাগোস্টিনো প্রথমটা এই উপমাত্মক গল্পের মর্মোদ্ধার করতে পারল না।

স্ত্রীর দিকে ফিরে ড্যানিয়েল বলল: "বিষাক্ত খাদ্য ছড়িয়েই বা নিশ্চয়তা কোথায়? খেঁকশিয়ালটা যদি বেশী দিনের উপোসী হয়, তবে টুকরো টাকরা খাবার খাবেই না। আর যদি এক টুকরো বিষাক্ত মাংস বা বিষাক্ত চেস্টনাট খায়ও, তবু সে বিষয়ে কাজ করবে তার নিশ্চয়তা নেই। একটা অজানা খেঁকশিয়াল [illegible]

হয়, আর স্ট্রীকনাইনের শক্তি যদি কম হয়, তাহলে ওর পেটে শুধু ব্যথা হবে—তাতে ত আর মুরগীর বাচ্চা খাওয়া বন্ধ হবে না। আর স্ট্রীকনাইনের শক্তি যদি খুব বেশী হয়, তবে বমি করে পেট খালি করে দেবে এবং ওর মুরগীর বাচ্চা খাবার ক্ষমতা আরও বেড়ে যাবে।"

তার আসার আগে কি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল এতক্ষণে বুঝতে পেরে অ্যাগোস্টিনো বলল : "বলতে গেলে খেঁকশিয়াল ধরা অসম্ভব ব্যাপার।" "না অসম্ভব নয়, তবে ভয়ানক কঠিন" ড্যানিয়েল জবাব দিল, "আর শুধু কথায় ধরা পড়েছে এমন খেঁকশিয়াল কখনও দেখা যায় নি।" তার ছোট মেয়ে তাকে ডাকছিল বলে ফিলোমেনা বাড়ির মধ্যে চলে গেল আর পুরুষ দুজন তাদের আলোচনা চালানোর জন্য ফলের বাগানে ঢুকল। "অনেক কান্নাকাটি করে এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্যাটেরিনা কাজটা করতে সম্মত হল" অ্যাগোস্টিনো তাকে বলল। "ইটালীয় গোয়েন্দাটি গতকাল আবার তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল এবং কোন খবর থাকলে প্যাল্লাঞ্জায় তার কাছে চিঠি লেখার জন্য একটা ঠিকানাও রেখে গেছে।"

"বিশেষ করে নজর রাখার জন্য সেকি তাকে কারও কারও নাম দিয়ে যায়নি?"

"এ পর্যন্ত ত দেয়নি" অ্যাগোস্টিনো বলল, "তবে রোজ যেসব ইটালীয় শ্রমিক সীমান্ত পেরিয়ে আসে, তারা কোন সন্দেহজনক রাজনৈতিক কর্মী কিংবা পলাতক আশ্রয়প্রার্থীর সঙ্গে মেলে কিনা তার খোঁজ নিতে এবং তাদের নাম জানতে সে তাকে বলেছে। সে তাকে আরও বলেছে যে, যেসব লোক গোপনে সুইৎজারল্যান্ড থেকে ইটালিতে বিপ্লবাত্মক বই এবং পুস্তিকা পাঠায় তাদের খবর দিতে পারলে সে অনেক টাকা পাবে।"

"কাউকে বিশেষ করে সন্দেহ করা হয় কিনা সে বিষয়ে সে তাকে কিছু বলে নি?" ড্যানিয়েল জিজ্ঞাসা করল।

"এ পর্যন্ত ত বলেনি" অ্যাগোস্টিনো জবাব দিল। "সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ক্যাটেরিনা যদি কোন কিছুতে জড়িত হয়ে বিপদগ্রস্ত হয়, তবে জুরিখে তার বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। সে টিসিনোতে ত্রিশ বছর ধরে বাস করেছে—কাজেই স্বভাবতই সে আবার বড় শহরে বাস করার স্বপ্ন দেখছে।"

"আমার সঙ্গে ইটালিয় বিপ্লবীদের যে কোন যোগ আছে ক্যাটেরিনা কি একথা বিশ্বাস করে?" ড্যানিয়েল জিজ্ঞাসা করল।

"নিশ্চয় না" অ্যাগোস্টিনো তাকে আশ্বস্ত করল। "সে যখনই আমার সঙ্গে কথা বলে তখনই সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে যে সে চিরকাল নিজের কাজ দেখে এসেছে এবং দেখবেও—আর সিনর ড্যানিয়েল প্রকৃত ভদ্রলোক, তা ছাড়া তিনি টিসিনো নিবাসী এবং কখনও রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোন যোগ ছিল না, প্রমাণ করা যায় যে......" সিলভিয়া উপরতলায় তার ছোট ঘরটা থেকে বাবাকে অ্যাগোস্টিনোর সঙ্গে কথা বলতে দেখে ফেলেছিল। সে বলল: "আমি নীচে আসতে পারি?"

"নিশ্চয়ই পার!"

মেয়েটি ফলের বাগানে এল—তাকে আসতে দেখেই তাদের কথাবার্তার বিষয়ও বদলে গেল; তারা আবহাওয়া সম্বন্ধে আলাপ করা শুরু করল।

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় ড্যানিয়েল মুরগীর খোপের বাইরে ইস্পাতের ফাঁদ পেতে রাখত, টুকরো টুকরো বিষাক্ত খাবারও ছড়িয়ে রাখত; কিন্তু খেঁকশিয়াল আর আসত না। তেমনি তার জন্য পাতা ফাঁদে পড়ার জন্য অ্যাগোস্টিনোর খেঁকশিয়ালেরও কোন তাড়া ছিল না ব'লেই মনে হচ্ছিল। অন্তত ড্যানিয়েল এ বিষয়ে আর কিছু শুনতে পায় নি। "পাড়াগেঁয়ে লোকের জীবনে অবিরাম যুদ্ধ লেগেই আছে" ড্যানিয়েল প্রায়ই বলত, "খারাপ আবহাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ, পাখীর সঙ্গে যুদ্ধ, পোকার সঙ্গে যুদ্ধ, কিন্তু সব চেয়ে বিশ্রী হচ্ছে খেঁকশিয়ালের সঙ্গে যুদ্ধ।" আঙুর গাছের পোকার বিরুদ্ধে অভিযানের শেষ হয়েছিল, কাজেই ড্যানিয়েল এবার ফলের গাছের পোকা ধ্বংস করতে আত্মনিয়োগ করেছিল। সে শুকনো ডাল, মরা ছাল এবং শেওলার হাত থেকে গাছগুলোকে মুক্ত করল এবং সিলভিয়া একখন্ড তার দিয়ে গর্তের পোকাগুলোকে মেরে ফেলল। যখন সমস্ত গাছের গুঁড়িগুলো পরিষ্কার করা হ'ল, তখন ফিলোমেনা এসে সেগুলোকে চূণকাম ক'রে দিল।

"এখন গাছগুলো ত মাটির দিক থেকে বিপন্মুক্ত হ'ল" ড্যানিয়েল মেয়েকে বলল, "কিন্তু আকাশের হাত থেকে তাদের কি করে বাঁচাই?" সে সামনের দরজায় অ্যাগোস্টিনোকে দেখতে পেল। তার জন্য অপেক্ষমান অ্যাগোস্টিনো সিলভিয়ার সঙ্গে রসিকতা করছিল।

"সর্বশেষ খবর কি?" ড্যানিয়েল তাকে জিজ্ঞাসা করল।

বার্গামোর লোকটি জবাব দিল : "ফাঁদ পাতা হয়েছে।"

"আর খেঁকশিয়াল?"

"তাকে আজ রাত্রে ধরা হবে" অ্যাগোস্টিনো ঘোষণা করল।

তারপর কি ক'রে খেঁকশিয়ালকে ধরা হবে অ্যাগোস্টিনো সেটা বুঝিয়ে দিল।

"ক্যাটেরিনা তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, জরুরী একটা খবর আছে। রিভা পিয়ানায় হ্রদের তীর পুরনো স্যান কুইরিকোর গির্জার বাইরে তার সঙ্গে রাত নয়টার সময় দেখা করার ব্যবস্থা সে ক'রেছে। আমি এবং আর দুইজন লোকও এই সাক্ষাতের সময় হাজির থাকব।" তুমি কি পুলিশকে খবর দেওয়া উচিত ব'লে মনে কর না?" ড্যানিয়েল বলল।

"সেটা বোকার মত কাজ হবে। শীঘ্রই তা হ'লে কনসাল অফিসে এ খবর পৌঁছে যাবে এবং খেঁকশিয়ালও হাজির হবে না।" ড্যানিয়েল এ কথার জবাব দিতে পারল না, কারণ পুলিশের মধ্যে যে সংশয়জনক লোক ছিল, একথা সবাই জানত। কিন্তু এর ফলে ইটালীয় আশ্রয়প্রার্থীদের যে বিপদ ঘটতে পারে সে কথা ভেবে ড্যানিয়েল বিরত হ'ল। "টিসিনোবাসীদেরই এ কাজটা করা উচিত" সে বলল। কিন্তু অ্যাগোস্টিনোর তাতে আপত্তি ছিল।

"তা' করতে গেলে অনেক লোক জড়িয়ে পড়বে" সে বলল। "আর তা ছাড়া ইটালীয় খেঁকশিয়ালের জন্য ইটালীয় ফাঁদেরই প্রয়োজন।" সেদিন সন্ধ্যায় ড্যানিয়েল লোকার্নোর ট্রেনে চাপল। রাত দশটার দিকে সে হ্রদের তীরে স্যালেগ্গীর দিকে হাঁটতে হাঁটতে অ্যাগোস্টিনোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল; কি ক'রে ঘটনাটি সমাপ্ত হল সে এসে এ খবর তাকে দেবে। রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় অ্যাগোস্টিনোর বদলে মিনুসিওর ইটালীয় সূত্রধর লুকা এসে হাজির হ'ল। "অ্যাগোস্টিনোর হাতে সামান্য আঘাত লেগেছে" সে বলল। "ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতের দিকে লোকের নজর পড়বে এই জন্যই সে আসে নি।" ড্যানিয়েলের মনে তখন অনিশ্চিত আশঙ্কা। "আর অন্য লোকটি?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"তাকে ওখানে ভূপতিত অবস্থায় রেখে আসা হয়েছে। সে আর দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে সাক্ষাতের জায়গায় এসেছিল। তারা তাকে ক্যাটেরিনার সঙ্গে একা রেখে চলে গেল—ব'লে গেল তারা ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে আসবে। তারা ন্যাভেগ্নার দিকে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত আমরা গির্জার পিছনে অপেক্ষা ক'রে রইলাম। ইতাবসরে ক্যাটেরিনা কান্না এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলা শুরু করল এবং গোয়েন্দাটিকে কতকগুলো বাজে কথা বলতে লাগল। মাঝে মাঝেই সে গোয়েন্দাটিকে বলতে লাগল যে, সে কখনও কারও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নি এবং করবেও না—তবে ইটালীতে যে-সব বিপ্লবী বই এবং পত্রিকা যায় সে-সব যে লোকার্নোর ম্যাডোনা ডেল্ স্যাসোর ফ্রান্সিস্কান্ সঙ্ঘারাম থেকে যায় সে কথা সে জানে!"

এই চমৎকার কাল্পনিক কাহিনী শ্বনে ড্যানিয়েল্ প্রাণ খ্বলে হাস্তে লাগল।

"অ্যাগোস্টিনো আমাদের গির্জার পিছনে রেখে একাই তার কাছে এগিয়ে গেল" ল্বকা ব'লে চল্ল। "আমাদের মধ্যে ঠিক হয়েছিল যে, লোকটা যদি প্রথমে তার রিভল্ভার ব্যবহার করার লক্ষণ দেখায়, তবে সে শ্বধ্ব তার রিভলভারটা বের করবে। অ্যাগোস্টিনো এমনভাবে তার কাছে গেল যেন সে দৈবক্রমে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। অন্ধকার ছিল ব'লে সে একটা সিগারেট ধরাল এবং ম্যাচের আলোতে তাকে চিন্তে পারল। সে বলল ঃ 'ওঃ এত চেনা ম্বখ দেখছি। তুমি ইটালীয় গোয়েন্দা!' সে সিগারেটটা ফেলে দিল—তারপরেই শ্বর্ব হল য্বদ্ধ। আমরা গ্বপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে এলাম—ক্যাটেরিনা পালিয়ে গেল।"

"তোমরাও কি যোগ দিলে?"

"তার দরকার হ'ল না। অন্য কেউ আসে কিনা সেই বিষয়েই আমরা শ্বধ্ব নজর রেখেছিলাম। শীঘ্রই অ্যাগোস্টিনো লোকটাকে কাব্ব ক'রে ফেল্ল। সে লোকটাকে ফেলে এত জোরে তার মাথায় আঘাত করল যে, সে আঘাতে পাথর পর্যন্ত ভেঙে যায়। অ্যাগোস্টিনো যে কত বলবান্ তা আমরা জানতাম; কিন্তু তার মধ্যে এত ঘৃণা সঞ্চিত ছিল সে খবর আমরা রাখতাম না।"

"ভুলে যেয়ো না যে ফ্যাসিস্তরা তার ভাইকে হত্যা ক'রে ছিল" ড্যানিয়েল্ বল্ল। "তার হাতে আঘাত লাগল কি ক'রে?"

"গোয়েন্দাটা তার হাত কামড়ে দিয়েছিল। সে অ্যাগোস্টিনোর বাঁ হাতটা দাঁত দিয়ে চেপে ধ'রেছিল—ছেড়ে দিতে চাই ছিল না। অ্যাগোস্টিনো পাগলের মত অন্য হাত দিয়ে তার চোয়ালে ঘ্বসী মারল, কিন্তু তব্ব সে ছাড়ল না। কাজেই অ্যাগোস্টিনো তার গলা ধ'রে খ্বব জোরে টিপে দিল।"

"সেকি ওকে মেরে ফেল্ল নাকি? ভীত হ'য়ে ড্যানিয়েল্ জিজ্ঞাসা কর্ল।

"দেখে ত তাই মনে হ'ল!"

"তবে তার পালিয়ে যাওয়া দরকার। হয়ত তার পক্ষে ফ্রান্সে যাওয়াই ভাল।"

এই রকম দ্বর্ঘটনার ফলে ড্যানিয়েল্ সে রাত্রির মত লোকার্নোয়ে থাকাই ঠিক কর্ল এবং ভোর বেলা বেলিন্‌জোনায় যাওয়া মনস্থ করল।

তার পরিবারকে নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যে সে তাদের কাছে ফোন করার জন্য একটা কাফেতে গিয়ে ঢুকল।

"কি ভাগ্যি, তুমি নিজেই ফোন ক'রেছ" সিল্ভিয়া তখনই বল্ল। "আমি একঘণ্টা ধ'রে ফোনে তোমাকে খ্বঁজে বেড়াচ্ছি।"

"ব্যাপার কি?" ড্যানিয়েল সচকিত হ'য়ে প্রশ্ন করল।

"না আমাদের বিশেষ কিছ্ব হয় নি" সিল্ভিয়া বলল। "কিন্তু আমাদের বাড়ির খ্বব কাছে গর্ডোড়লার রাস্তায় দ্বটো গাড়িতে ভীষণ সংঘর্ষ হ'য়েছে এবং একটি লোক খ্বব আহত হয়েছে। ডাক্তার বললেন যে, সে এত ভীষণ আঘাত পেয়েছে যে, তাকে দ্বরে নিয়ে যাওয়া ম্বস্কিল—তাই তিনি তাকে রাখার জন্য বাড়ির খোঁজ ক'রেছিলেন। আমাদের সব প্রতিবেশীই তাঁকে বলেছে যে, আমাদের বাড়িতেই আহত লোকটিকে সাময়িকভাবে রাখা চলে। মা বললেন যে, তোমার অন্বপস্থিতিতে তিনি অপরিচিত লোককে বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারেন না, কিন্তু আমি বললাম যে, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই তোমার সম্মতি পাওয়া যাবে!"

"নিশ্চয়ই" ড্যানিয়েল বলল। "তাকে কোথায় রেখেছ?"

"দোতালায়, আমার ঘরে" সিল্ভিয়া জবাব দিল "আমি ল্বইসার সঙ্গে শোব।"

"লোকটির কি জীবন সম্বন্ধে সংশয় আছে?"

"ডাক্তার সেকথা বলবেন না। আমি নিজেই পরিচর্যা করব বললাম—তব্ব তিনি আজ রাত্রে একজন নার্স পাঠিয়ে দেবেন।"

"লোকটার বাড়ি কোথায়? তার নামই বা কি?"

তার মেয়ে বলল ঃ "সে এখনও অজ্ঞান অবস্থায় আছে। নিশ্চয়ই সে ধনী বংশের সন্তান কেননা ডাক্তার মাকে অগ্রিম টাকা দিতে চাইলেন!"

ড্যানিয়েল বলল ঃ "শোন, আমি সাহায্য করার জন্য আজ রাত্রে বাড়ি যেতে পারছি না ব'লে দ্বঃখিত। আমাকে আজ রাত্রে লোকার্নোয় থাকতে হবে এবং জর্বরী দরকারে কাল সকালে বেলিন্‌জোনায় যেতে হবে। কিন্তু তুমি ত জানো আমি তোমাকে বিশ্বাস করি—কাজেই ডাক্তার যা করতে বলেন করো এবং খ্বসী মনেই করো!"

আহত লোকটি তখনও বেঁচে আছে কি না জানার জন্য পরদিন সকালে ড্যানিয়েল আবার বাড়িতে ফোন করল। সিলভিয়া দোকানে গেছিল ব'লে ল্বইসা জবাব দিল।

"বেচারী লোকটি একটু ভালই হয়েছে। রাত্রে একজন নার্স এসেছিল কিন্তু সিলভিয়াও ঘ্বমাতে যায় নি......এই মাত্র ডাক্তারবাব্ব এলেন।"

ডাক্তার টেলিফোন ধরলেন।

ড্যানিয়েল বলল ঃ "ডাক্তারবাব্ব, আপনি খ্বসী মত আমার বাড়ি ব্যবহার কর্বন। এ রকম সময়ে আমি নিজে বাড়িতে নেই ব'লে সত্যই দ্বঃখিত।"

"লোকটি যে নিশ্চয়ই সেরে উঠবে সে কথা বলতে পারি" ডাক্তার বললেন। "সে খ্বব ভীষণ আঘাতই পেয়েছিল—তবে এখন বলতে পারি যে আর কোন আশঙ্কার কারণ নেই। সমস্ত খরচপত্র যাতে নির্বিঘ্নে নির্বাহ হয় সে ব্যবস্থা আমি করব।"

"লোকটা কে? তার আত্মীয় স্বজনেরা কোথায় থাকে?" ড্যানিয়েল প্রশ্ন করল।

"সে বলোনার একজন ইটালীয় এঞ্জিনিয়ার—তার নাম আম্বার্টো-স্টেলা, আপনি হয়ত তার নাম শ্বনে থাক্তে পারেন" ডাক্তার বল্লেন। "সে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন শেখার জন্য স্বইট্জারল্যান্ডে এসেছিল।"

"সে যে-ই হোক্, আপনি আমার বাড়ি এবং আমার পরিবারকে আপনার কাজে লাগান" ড্যানিয়েল্ জবাব দিল।

রিভা পিয়ানায় গত রাত্রে হত্যা-প্রচেষ্টার খবর প্বলিশ কতটা জানে, বেলিন্‌জোনায় গিয়েই ড্যানিয়েল্ সে বিষয় খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা কর্ল। এ বিষয়ে নিজেই প্রথম আলাপ করবে এতটা বোকা সে ছিল না—অন্যের আলোচনার জন্য সে অপেক্ষা ক'রে রইল। কাজেই সে তার উকিলের সঙ্গে দেখা করতে গেল এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এমন কয়েকটি তুচ্ছ বিষয় নিষ্পত্তির জন্য আদালতে গেল যার জন্য কিছ্বমাত্র তাড়ার কারণ ছিল না। সে বহ্ববার পথে থেমে পরিচিত লোকদের সঙ্গে আলাপ কর্ল এবং দ্বখানি প্রাতঃকালীন পত্রিকা কিনল কিন্তু কোথাও গত রাত্রের ঘটনা সম্বন্ধে একটি কথাও ছিল না। স্পষ্ট বোঝা গেল যে বেলিন্‌জোনায় এ বিষয়ে কেউ কিছ্বই জান্তে পারেনি।

অবশেষে সাহস সঞ্চয় ক'রে ড্যানিয়েল্ তার উকিলের কাছেই একথা পাড়্ল।

"আমি শ্বনলাম যে গত রাত্রে লোকার্নোর বাইরে ইটালীয়দের মধ্যে একটা রাজনৈতিক হাঙ্গামা হ'য়ে গেছে", সে বল্ল।

উকিল জবাব দিলেন; "হোলেও হ'তে পারে—তবে আমরা কিছ্বই জানি না। নিশ্চয়ই বেশী কিছ্ব ঘটে নি'—কারণ ঘটনা যদি গ্বর্বতর হ'ত, তবে নিশ্চয়ই আমরা এ বিষয়ে সব জানতে পার্তাম। এখানে ফ্যাসিস্ত এবং ফ্যাসিস্ত-বিরোধীদের মধ্যে সম্বন্ধ বড় খারাপ।"

ড্যানিয়েল খ্বব চিন্তিত হ'য়েছিল কিন্তু এই জবাবে সে

নিশ্চিন্ত হ'ল। লুকোর কল্পনাই যে ঘটনাটিকে খুব বাড়িয়ে ব'লেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ড্যানিয়েল নিজের মনে মনে বল্‌ল যে এই ইটালীয়রা বেশ সুন্দর, সদাশয় এবং ভাবপ্রবণ জাতি কিন্তু তারা বড় বেশী কথা বলে। যাক্‌, বেশ ভালই হ'য়েছে, তা' নইলে আগোস্টিনো এবং ক্যাটেরিনাকে সুইট্‌জারল্যাণ্ড ছেড়ে যেতে হ'ত।

একটি রাত বাড়ি ছেড়ে থাকাতে এবং একদিনের কাজ মিছামিছি নষ্ট হওয়াতে সে বিরক্ত হ'য়েছিল। বাড়ি যাবার পথে ট্রেনে কয়েকটি চাষা আলোচনা কর্‌ছিল যে, ম্যাগাডিনোতে একটি খে'কশিয়াল মুরগীর বাচ্চাকে আক্রমণ ক'রেছিল।

তাদের একজন বল্‌ল, "খে'কশিয়াল গুলো বড় চালাক। ফাঁদওয়ালা মানুষের চেয়েও তারা বেশী চতুর।"

আরেকজন বল্‌ল, "ইটালীয়দের আবিষ্কৃত একটি নতুন ফাঁদ বেরিয়েছে।" প্রথম লোকটি জবাব দিল, এতে খুব শব্দই হয় কিন্তু কাজ হয় না কিছুই।"

"সেটা সত্যি কথা" ড্যানিয়েল বল্‌ল। "এতে খুব বেশী শব্দই হয়, কাজ হয় না। শুধু ভয়ানক গণ্ডগোলই হয়।"

বাড়িতে ফিরেই ড্যানিয়েল দোতালায় গেল রোগীকে দেখতে। সে দেখল সিল্‌ভিয়া দরজায় বাধা সৃষ্টি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। নীরবতার নির্দেশ স্বরূপ সে তার মুখের উপর একটা আঙ্গুল রাখল্‌।

"তাকে একেবারে শান্তিতে রাখতে হবে" সে তার কানে কানে বলল। "কোন লোক তাকে দেখতে যেতে পারবে না এবং কোন কথাবার্তা বলা চলবে না। ডাক্তার বলেছেন যে, ও উত্তেজিত হ'তে পারে এমন কিছুই করা চলবে না।"

"আমি করতে পারি এমন কিছুই নেই?" ড্যানিয়েল হতাশ হ'য়ে বলল।

সিলভিয়া মৃদুস্বরে বলল : "নীচে যেতে যাতে শব্দ না হয় সেজন্য তুমি বুট খুলে নীচে যাও!"

ড্যানিয়েল বুট খুলে নীচে বাগানে গেল। সে কাঠের ঘরে গিয়ে বেড়ার জন্য কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটতে সুরু করল। কাজ সুরু করতে না করতেই স্লিপার পায়ে সিলভিয়া ছুটে এল।

"বাবা, তুমি কি পাগল হয়েছ! বাড়িতে ভীষণভাবে আহত একজন লোক, আর তুমি এমন শব্দ করছ!"

ড্যানিয়েল কুড়ুলটা সরিয়ে রাখল।

সে মৃদুস্বরে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করল : "আমি কি অন্তত মাটি খুঁড়তে পারি?"

সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে সিলভিয়া দোতালায় ফিরে গেল।

এর কিছুক্ষণ পরেই সে তার বড় মেয়েকে ঝুড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল। সে তৎক্ষণাৎ বাড়িতে ফিরে বুট খুলে দোতালায় গেল। রোগীর ঘর থেকে নার্স বেরিয়ে এল এবং তাকে ভিতরে যাবার অনুমতি দিল। "তবে শুধু এক মুহূর্তের জন্য কিন্তু!"

সিলভিয়ার সংকীর্ণ বিছানাটায় সে দেখল ব্যাণ্ডেজে বাঁধা শুধু একটা বিরাট মাথা। অবশ্য এতে হাসার কিছু ছিল না, তবু তার তুষার দিয়ে তৈরী মানুষের কথা মনে পড়ল। মাথাটা যেন একটা বিরাট সাদা বল—তার মধ্যে একটা ছোট চোখের গর্ত আর কিঞ্চিৎ বড় একটা মুখের গর্ত।

নার্স তাকে দরজার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল : "বহুক্ষণ দেখেছেন—আর নয়!" বুট হাতে করে নীচে যাবার পথেই তার সঙ্গে সিলভিয়ার দেখা হ'ল।

সে তিরস্কারের সুরে জিজ্ঞাসা করল : "তুমি কোথায় ছিলে?"

"বাবার সঙ্গে কথা বলার এই কি ধরণ নাকি?" সে বলল এবং ফলবাগানে তার মাটি খোঁড়ার কাজে ফিরে গেল।

সে যখন মাটি খোঁড়ায় ব্যস্ত ছিল, তখন তার বউ তার সঙ্গে কথা বলার জন্য বেরিয়ে এল।

স্ত্রী অভিযোগ করল : "সিলভিয়া নিজের বোধ-শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সে কাল থেকে ঘুমায় নি' কিংবা এক মুঠো খাবারও খায় নি'!"

"সে তার প্রকৃত বোধ শক্তির খোঁজ পেয়েছে" ড্যানিয়েল জবাব দিল। "ওর হৃদয়টা খুব ভাল!"

"ভয়ানক ভাল?" তার মা বল্‌ল।

"ভয়ানক ভাল? লোকের হৃদয় আবার ভয়ানক ভাল হয় কি করে?"

ড্যানিয়েল মেয়ের উপর খুসী হয়েছিল। সে গর্ব এবং ভয়ের সঙ্গে মেয়ের দিকে তাকাল।

ফলের বাগানের নীচু দেয়ালটার পাশে কতকগুলো প্রিমরোজ ফুল ছিল। সিলভিয়া এসে রোগীর ঘরের জন্য ফুল তুলতে লাগল।

"কিন্তু ও ত ফুল দেখতে পাবে না। ওর চোখ ত ব্যাণ্ডেজ করা" ফিলোমেনা ধীরে প্রতিবাদ করল।

"কিন্তু মা" সিল্‌ভিয়া বলল, "তুমি চোখ বুজেও ফুল দেখতে পার।"

ড্যানিয়েল সেদিনটা বেশীরভাগ সময় পাহাড়ে আঙুরের ক্ষেতে কাজ করে কাটল। সন্ধ্যায় ফিরে এসে সে রোগীর খবর জানতে চাইলে সিলভিয়া তাকে বলল যে, ও খুব শীঘ্র উন্নতির দিকে যাচ্ছে। নার্সকে ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল—সিলভিয়া একাই তার ভার নিল। ড্যানিয়েল দু'একবার মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকে দেখতে গেল। রোগীকে বেশ চমৎকার লোক বলে মনে হল। ড্যানিয়েলের অনেক বিষয় চিন্তা করার ছিল, কিন্তু সে সিল্‌ভিয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য না করে পারল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় তিরস্কারের সুরে তার স্ত্রী বলল : "তুমি অন্য বিষয়ে একটু কম নজর দিয়ে মেয়ের বিষয়ে একটু বেশী নজর দিলে পারতে।"

ড্যানিয়েল জবাব দিল : "সিলভিয়া ত আর এখন শিশু নয়—তা'ছাড়া ও বুদ্ধিমতী!"

স্ত্রী উত্তর দিল : "ও বুদ্ধিমতী বটে তবে অনভিজ্ঞা।" সে কয়েকদিন ধরে এ বিষয়ে বড় চিন্তিত হ'য়েছিল এবং মন থেকে এই গুরুভার নামিয়ে ফেলবে ব'লে স্থির করেছিল।

ড্যানিয়েলও চিন্তিত হ'ল।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে জিজ্ঞাসা করল: "এ বিষয়ে তার সঙ্গে আমার কথা বলা উচিত বলে কি তুমি মনে কর?"

"হাঁ, এবং অনতিবিলম্বে," তার স্ত্রী জবাব দিল।

পরদিন ড্যানিয়েলের ভ্যাল্‌ভারজাস্কার কমা নামক স্থানে একটি বন্ধুর কাছে এক বস্তা কলাই নিয়ে যাবার কথা ছিল। সে সিলভিয়াকেও সঙ্গে নিয়ে গেল। ওখানে তার কাজটা ছিল একটা অছিলা, তাড়াতাড়ি সে কাজ শেষ করল এবং তাদের সবরকম আতিথ্য প্রত্যাখ্যান কর্‌ল।

যে-সব বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল তাদের সে বল্‌ল : "আমি বরং মেয়ের সঙ্গে হে'টেই বাড়ি ফিরব। কিছুদিন যাবত ওকে বড় ম্লান দেখাচ্ছে, ওর কিছুটা মুক্ত বাতাসের প্রয়োজন এবং ওর মনেরও বিশ্রাম প্রয়োজন।"

পিতা এবং কন্যা নীরবে গর্ডোলার দিকে হে'টে চলল। নীচের উপত্যকায় যে নদীটি ফেনা তুলে ছুটে চলছিল, তার উপর দিয়ে পথটি গেছিল এ'কে বে'কে।

"আমরা কি নদীর তীর দিয়ে যেতে পারি না?" সিলভিয়া জিজ্ঞাসা করল।

"মনে হয়, না," ড্যানিয়েল জবাব দিল, কিন্তু মেয়ে যা' চায় তাই করতে সে ভালবাসত ব'লে বল্‌ল যে শীঘ্র ফেরার তাড়া যখন নেই, তখন একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যেতে পারে।

তারা মইয়ের মত খাড়া একটা পথ দেখতে পেল। এই রাস্তাটি অনেক এ'কে বেঁকে ঘুরে ফিরে অবশেষে তাদের নদীর তীরে এমন একটা জায়গায় এনে ফেলল যেখানে নদীটি একটি পাহাড়ের দেয়ালে ফেন উদ্গীরণ করে আছড়ে পড়ছিল। নিকটেই নদীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র শান্ত পরিষ্কার জলাশয় সৃষ্টি হয়েছিল—সেখানে জল এত পরিষ্কার যে নীচের প্রত্যেকটি পাথর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। এতক্ষণ পিতা এবং কন্যার মধ্যে মাত্র অল্প এবং তুচ্ছ কথার বিনিময় হ'য়েছিল। এতেই ড্যানিয়েল্‌ পরিষ্কার বুঝতে পারল সিলভিয়ার মধ্যে কত বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে।

জলের নীচে এক ফুট বিস্তৃত একফালি বালির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে শেষ পর্যন্ত সিলভিয়া মন্তব্য করল : "কি সুন্দর পাথর ?"

"ওত মাছের ডিম", তার বাবা বুঝিয়ে দিল। "সেপ্টেম্বরের শেষে নদীর নীচের দিক থেকে ট্রাউট মাছ নদীর উৎসের দিকে যেতে শুরু করে। স্ত্রী মাছগুলো ডিম পাড়ার জন্য বালুকাময় সুরক্ষিত স্থানের খোঁজ করে। তারা পাথর খণ্ডগুলোকে লেজ দিয়ে সরিয়ে রেখে ডিম পাড়ে—এই ডিম পাথরের গায়ে লেগে থাকে।"

"এমনি ক'রে ট্রাউট মাছের জন্ম হয় নাকি ?"

"পরে অবশ্য পুরুষ মাছরা ডিমগুলোকে প্রাণবান করে। তারা মেয়ে মাছগুলোর পথ অনুসরণ করে যায় এবং যেখানে ডিমগুলো পড়ে থাকে সেই পাথরের উপর এক প্রকার গাঢ় দুধের মত পাতলা পদার্থ ছিটিয়ে দেয়। কয়েকদিন পরেই ডিমগুলো ফাটতে শুরু করে।"

যেখানে এমনি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে সেই বালুকাময় স্থানের দিকে সিলভিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"কি সুন্দর, সরল!" সে বলল।

"বাছা, ট্রাউট্‌ মাছরা ত আর গীর্জায় যায় না।"

বাড়ি ফেরার পথে তাদের মধ্যে এই আলোচনাই শুধু হয়েছিল।

"তুমি সে বিষয়ে ওর সঙ্গে কথা ব'লেছিলে ?" ড্যানিয়েলের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল।

"হাঁ।"

"তারপর ?"

"কিছু না!"

একদিন এঞ্জিনিয়ার সর্বপ্রথম তার ঘর ছেড়ে বেরুলো এবং ফলের বাগানে এসে একটা চেয়ারে শুলো। ক্যাটেরিনা ও ড্যানিয়েল এক সঙ্গে গর্ডোলা থেকে ফিরে এল। এঞ্জিনিয়ার হঠাৎ ডাকল : "কুমারী সিলভিয়া!"

ক্যাটেরিনা তার গলার স্বর শুনে ঐ জায়গায় যেন শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর যে বেড়াটা বাগান থেকে রাস্তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছিল, তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। "সিনর, ড্যানিয়েল" সে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপতে কাঁপতে বলল, "সিনর ড্যানিয়েল, ওই লোকটাই ত সেই গোয়েন্দা যার কথা আমি তোমাকে ব'লেছি।"

"তুমি পাগল হ'য়েছ!" ড্যানিয়েল্‌ ব'লে উঠল এবং তার[illegible]র তার অনুপস্থিতিতে কি ক'রে লোকটাকে তার বাড়িতে আনা হ'য়েছিল সে গল্প বল্‌ল।

ক্যাটেরিনা আবার বেড়ার কাছে গিয়ে সিল্‌ভিয়ার সঙ্গে রহস্যালাপে রত লোকটিকে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখল।

"নিশ্চয়ই, এই সেই লোক," সে বল্‌ল, "ও আমাকে দেখার আগেই আমি চলে যাচ্ছি।"

"বেশ যাও", ড্যানিয়েল্‌ ম্লান হ'য়ে উঠল। "কাল এই সময়ে অ্যাগোস্টিনোকে আস্‌তে ব'লো এবং লোকটা যাতে তাকে দেখতে না পায়, তার জন্য আমি সাবধানতা অবলম্বন করব!"

কিছুক্ষণ পরে সিল্‌ভিয়া এসে বাবার সঙ্গে কথা বলা শুরু করল। "আমাদের রোগী এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল", সে তাকে বল্‌ল। "তুমি যদি মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বল, তবে খুব ভাল হয়। তুমি দেখবে দৈবক্রমে আমাদের বাড়িতে কি চমৎকার একটি লোক এসেছে!"

"নিশ্চয়ই, ওর সঙ্গে কথা বলার আমার খুব ইচ্ছা আছে" ড্যানিয়েল্‌ তার হৃদয়াবেগ লুকানোর চেষ্টা ক'রে জবাব দিল। "আমরা সবাই ত একসঙ্গে খেতে বসতে পারি!"

খাবার সময় অবস্থা কিন্তু অসহ্য হ'য়ে উঠল। নিজের দুই মেয়ের মধ্যে এই লোকটির ব'সে থাকার দৃশ্য সে সহ্য করতে পারল না। সে মাথা ধরার অজুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

পরে অন্য সবাই বেরিয়ে এল এবং ফল বাগানে তার সঙ্গে একত্রিত হ'ল।

"কাগজে কি খবর আছে?" তথাকথিত এঞ্জিনিয়ার, গৃহকর্তাকে জিজ্ঞাসা করল। "কয়েক সপ্তাহ ধ'রে আমি কাগজ চোখেই দেখিনি।"

"রোজই একটা না একটা দুর্ঘটনা লেগেই আছে", ড্যানিয়েল্‌ বল্‌ল। "গতকাল ফ্রান্সে একটা ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা হয়ে গেছে; কয়েক শ' লোক মারা গেছে!"

এঞ্জিনিয়ার, ড্যানিয়েলের কথার সূত্র ধরে জবাব দিল : "রোজই একটা দুর্ঘটনা ঘটছে। কিন্তু লোকেরা যে রকমভাবে নিয়তির টানে এগিয়ে চলে সেটা আরও কত ভীষণ! কালকের দুর্ঘটনায় নিহত এই শত শত লোকের কথা একবার ভাবুন। একই গাড়িতে ছাত্র, কৃষক, ভ্রমণকারী, ব্যবসায়ী, সামরিক কর্মচারী, ডাক্তার, দর্জি, আইনজীবী প্রভৃতি সবাই ছিল। তারা একই গাড়িতে ছিল—অথচ এক গাড়িতে ছিল না। কৃষকেরা ভাবছিল বাজার দরের কথা, আইনজীবীরা ভাবছিল লিজিয়ন্‌ অফ্‌ অনারের (Legion of Honour) ক্রসের কথা, সামরিক কর্মচারীরা ভাবছিল বিত্তশালিনী পাত্রীর কথা, ডাক্তাররা কল্পনায় গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করছিল এবং ছাত্ররা সদ্য কেনা নতুন টাইয়ের বিষয় দিবা-স্বপ্ন দেখছিল। এমনিভাবে তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের গাড়িতে ভ্রমণ করছিল। এ জগতে প্রত্যেক লোকই নিজের গাড়িতে ভ্রমণ করে। কিন্তু হঠাৎ তাদের সবাইকে একই গাড়িতে তুলে দেওয়া হ'ল—মৃত্যুর গাড়িতে। কৃষকের বুটের নীচে ছাত্রের টাই গড়িয়ে পড়ল, সামরিক কর্মচারীর তরবারি ভেদ করল ভ্রমণকারী ব্যবসায়ীর বুক, দর্জির নতুন মডেল ধোঁয়া এবং অগ্নিশিখার মধ্যে হারিয়ে গেল। নিজেদের অজ্ঞাতসারে সবাই একই গাড়িতে চাপল।"

"কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই এ মৃত্যুজনিত একতাকে ধ্বংস করতে ছুটল।" ড্যানিয়েল্‌ বল্‌ল। "তারা ফারকোটে ঢাকা শবদেহ-গুলো অন্য সব শবদেহ থেকে আলাদা ক'রে রাখল।"

"কাজেই মৃত্যুর পরেও লোকেরা পরস্পরের শত্রু থাকতেই বাধ্য হয়?" সিল্‌ভিয়া প্রশ্ন করল।

"মানুষের প্রকৃতি, মানুষের ভাগ্য এবং সমাজ মানুষকে যা তৈরী করে, এগুলোর মধ্যে গভীর প্রভেদ আছে", রোগী জবাব দিল। "আমি যখন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম, তখন এই ভাবটাই সর্বদা আমার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমাদের প্রত্যেকে তার বিশেষ ট্রেণে ভ্রমণ করে—অথচ আমরা সবাই একই রেলপথের যাত্রী।"

"মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা এবং বিভেদের উপরই বর্তমান সমাজ সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত", ড্যানিয়েল্‌ বল্‌ল। "মানব জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকেই তাদের শ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। তাদের শ্রমের ফল তাদের হাত থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতেই তার উপরে তাদের আর কোন অধিকার থাকে না—তখন তার উপর

[illegible] শত্রুদের অধিকার। উৎপাদনই উৎপাদকের শত্রু। প্রাণহীন বস্তুপুঞ্জ আজ মানুষের অন্ধ পূজার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।"

সিল্ভিয়া প্রশ্ন করল: "সর্বদাই কি তাই থাকবে?"

"আমি যখন যুবক ছিলাম", রোগীটি জবাব দিল, "আমি আমাদের বর্তমান সমাজের থেকে বিভিন্ন নতুন ধরণের এক সমাজের স্বপ্ন দেখতাম..."

ড্যানিয়েল্ উঠে গিয়ে মাটি খোঁড়া শুরু করল। সামনেই বসন্ত—তার অনেক কাজ করার ছিল। সে সক্রোধে মাটির বুকে কোদাল চালাতে লাগল, সমস্ত দেহভার দিয়ে ডান পায়ে মাটি চেপে ধরল এবং তারপর বিচ্ছিন্ন মাটির ঢেলাগুলোকে এক দিকে সরিয়ে রাখল। তার পিছনে ফিলোমেনা নিড়েন দিয়ে মাটি সমান করতে লাগল। ফলের বাগানে ভিজে মাটির একটা মিষ্টি গন্ধ বেরুতে লাগল। ড্যানিয়েলের ক্লিষ্ট চিন্তাগ্রস্ত মুখের উপর বড় বড় ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। সন্ধ্যায় মন্টোসেনোরির উপরে প্রথম তারা না দেখা দেওয়া পর্যন্ত আহত লোকটি বাগানেই শুয়ে রইল।

তার চারপাশে উপবিষ্ট পরিবারটিকে সে শান্তভাবে বল্ল: "বহু বহু বছর আমি আকাশের দিকে চেয়ে দেখিনি।" সিল্ভিয়া উঠে গেল এবং একটা বই নিয়ে ফিরে এল।

"আপনাকে দেখে আমার টল্স্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' (War and Peace) বইটার প্রথম খণ্ডের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়", সে বল্ল। "১৮০৫ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে রুশ এবং ফরাসীদের যুদ্ধে প্রিন্স অ্যান্ড্রেই আহত হ'য়েছিলেন। টলস্টয় তাঁর সম্বন্ধে এই কথাগুলো বলছেন:

'গোলন্দাজটির সঙ্গে ফরাসী দুজনের যুদ্ধের ফল জানার জন্য এবং যুদ্ধে গোলন্দাজটি নিহত হ'য়েছে কিনা জানার জন্য তিনি পুনরায় তাঁর চোখ খুল্লেন। বন্দুকগুলো রক্ষা পেয়েছে না শত্রুর হাতে পড়েছে তাও তিনি জানতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি মাথার উপরে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। আকাশ পরিষ্কার ছিল না, তবু তার কি অপরিমেয় উচ্চতা, আর আকাশের বুকে ধীরে ধীরে ধূসর মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল। কি সুন্দর নিস্তব্ধ নীরবতা, প্রিন্স অ্যান্ড্রেই নিজের মনে বল্লেন, আমাদের এই হৈ চৈ, গণ্ডগোল এবং যুদ্ধের সঙ্গে এর কত তফাৎ! অনন্ত উচ্চ আকাশে মেঘের শান্ত শোভাযাত্রার সঙ্গে ফরাসী এবং গোলন্দাজের যুদ্ধের কোনই সম্পর্ক ছিল না; তারা তখন ভীষণ উত্তেজিত মুখে কামান পরিষ্কারের নলটার জন্য পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। আমি ইতিপূর্বে আকাশের দিকে তাকাইনি এটা কি ক'রে সম্ভব হ'য়েছে? আর আমি যে অবশেষে আকাশের দিকে তাকিয়েছি এটা কত সৌভাগ্যের বিষয়! আকাশের অসীমতা ছাড়া আর সবই বৃথা, নিরর্থক এবং অবাস্তব! এর বাইরে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আকাশেরও অস্তিত্ব নেই। শান্তি এবং নীরবতা ছাড়া আর কিছু নেই। এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

চাঁদ উঠেছিল এবং চাঁদের আলোয় ম্যাগাডিনো উপত্যকা ভেসে যাচ্ছিল।

লুইসা বল্লে: "আমাদের মত চাঁদেরও চোখ এবং নাক আছে।"

সিল্ভিয়া ছোট বোনকে শিখিয়ে দিল: "ওগুলো পর্বত আর সমুদ্র।"

"যদি চাঁদের অধিবাসীরা এখন এই মুহূর্তে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে, তব তাদের কাছেও পৃথিবী যে এই রকমই মনে হ'চ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই", এঞ্জিনিয়ার বল্লে। "পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলো উপর থেকে কেমন দেখায়? চাঁদের থেকে ইটালিকে নিশ্চয়ই 'কমা'র মত, সুইট্জারল্যান্ডকে 'ফুলস্টপে'র মত দেখায়।"

"ওখান থেকে মুসোলিনীকে কেমন দেখায়?" লুইসা বল্ল।

"কিংবা মোট্টাকে? ড্যানিয়েল প্রশ্ন করল।

প্রত্যেকেই হেসে উঠল।

পরদিন অ্যাগোস্টিনোকে আসতে দেখে ড্যানিয়েল্ এগিয়ে গেল এবং এঞ্জিনিয়ার রোদে ফলের বাগানে শুয়েছিল ব'লে, বাগানের ওদিকের রাস্তা দিয়ে তাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। দুজনে লুইসার ঘরে উঠে গেল। গোয়েন্দাটি যাতে তাকে না দেখতে পারে সেজন্য পর্দার আড়ালে লুকিয়ে অ্যাগোস্টিনো তাকে দেখতে লাগল।

অ্যাগোস্টিনো ফিস ফিস ক'রে বল্ল: "ওই সেই লোক!"

পরে হাত দুটি ঘষতে ঘষতে আবার বল্ল: "অন্তত এবার আর ও আমাদের হাত থেকে মুক্তি পাবে না।"

"নিশ্চয়ই তুমি ঠাট্টা করছ।" ড্যানিয়েল এমন স্বরে কথা বল্ল যে, অ্যাগোস্টিনোর কান খাড়া হয়ে উঠল।

"খেঁকশিয়াল ফাঁদে পড়েছে," সে বল্ল। "তুমি কি তাকে ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যেতে দিতে চাও? আমরা কোন চেষ্টা না করা সত্ত্বেও, অবশেষে তাদেরই একজন, যারা ইটালির কয়েদে এবং দ্বীপে আমাদের কমরেডদের হত্যা করে, আমাদের হাতে এসে পড়েছে। আমরা কি তাকে চলে যেতে দেব?" অ্যাগোস্টিনোর গলার স্বরে রাগের আভাস।

"সে এখন আমার বাড়িতে; সে আমার অতিথি," ড্যানিয়েল শান্ত স্বরে জবাব দিল।

"সে গোয়েন্দা," অ্যাগোস্টিনো বল্ল।

"সে গোয়েন্দা ছিল, কিন্তু এখন সে আমার অতিথি," ড্যানিয়েল পূর্ববৎ শান্তভাবে বল্ল। "সে মৃতপ্রায় অবস্থায় আমার বাড়িতে এসে আতিথ্য ভিক্ষা করেছিল। আমার বাড়িতেই সে সেরে উঠল......"

অ্যাগোস্টিনো নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"কিন্তু এ-সব দ্বিধাসঙ্কোচ কেন?" সে বলল। "তুমি ত ভালভাবেই জান ফ্যাসিস্তরা কি উপায়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়, তারা ত কোন নৈতিক দ্বিধাসঙ্কোচের ধার ধারে না।"

"আমি জানি," ড্যানিয়েল জবাব দিল। "সেই জন্যই ত আমি ফ্যাসিস্ত নই।"

"এই নৈতিক দ্বিধাসঙ্কোচের জন্য আমরা পরাজিত হয়েছিলাম।"

"এবং এর জন্যই আমরা জিত্ব," ড্যানিয়েল বলল্।

এই রকম এক গুঁয়েমির বিরুদ্ধে অ্যাগোস্টিনো শুধু ধীরে মাথা নাড়তেই পারল।

"সে আর কতদিন এখানে থাকছে?" তারপর সে জিজ্ঞাসা করল।

"হয়ত আরও এক সপ্তাহ, কারণ ও এখনও বড় দুর্বল।"

"তবে আমাদের হাত থেকে পালিয়ে যাবার আগে ওর সম্বন্ধে আবার কথা বলার সুযোগ আমরা পাব," অ্যাগোস্টিনো বল্ল।

ড্যানিয়েল তার পরিবারকে এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ঠিক করল। সে তাদের চিন্তিত করতে চাইল না। তার অতিথি যাতে কিছু লক্ষ্য না করে সে বিষয়েও সে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করল। তার স্ত্রীর এক বোনের সম্প্রতি সন্তান হয়েছিল ড্যানিয়েল স্ত্রী এবং সিলভিয়াকে নিয়ে তাকে দেখতে যাবে স্থির করল। রোগীর যত্ন করার জন্য লুইসাকে রেখে যাওয়া হল।

মেয়েটি তথাকথিত এঞ্জিনিয়ারকে বল্ল: "আপনি কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাদের বাড়িতে আছেন—অথচ আপনি বাড়িটাই ঠিক মত দেখেন নি।"

"আমি সারাক্ষণ বিছানায় বদ্ধ ছিলাম বলেই সেটা সম্ভব হয়নি," সে জবাব দিল।

লুইসা তাকে প্রত্যেকটি জিনিস দেখাতে লাগল; দোতালায় তার

নিজের ঘর যেটাতে এখন সে আর সিলভিয়া শোয় এবং ভাঁড়ার ঘর যার মধ্যে আলু, পেঁয়াজ, ফল এবং বাগানের যন্ত্রপাতি রাখা হয়—এ সবই সে তাকে দেখাল। দেয়ালে দুখণ্ড লাল কাগজ দিয়ে সাজান ফ্রেমে আঁটা একখানি ছবি এঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

"ম্যাট্টিওট্টি" (Matteotti)।

'এঞ্জিনিয়ার' একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

"ম্যাট্টিওট্টি কে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"ম্যাট্টিওট্টি গরীবদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই তিনি মুসোলিনী কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন।"

"তুমি কি ফ্যাসিস্ত বিরোধী?"

"নিশ্চয়ই।"

"সিল্‌ভিয়াও কি তাই নাকি?

"ও আবার আমার চেয়ে বেশী ফ্যাসিস্তবিরোধী।"

"আর তোমার বাবা?"

"তিনি আবার আমাদের প্রত্যেকের চেয়ে বেশী ফ্যাসিস্ত বিরোধী। তবে তিনি এ বিষয়ে কথা বলেন না, তিনি কাজ করেন।"

তারপর লুইসা তাকে তেতালায় নিয়ে গেল।

"এটা বাবা আর মার ঘর।"

"আর ঐ ঘরটা কিসের?"

"ওঘরে কারও ঢোকা নিষেধ—বাবার নিষেধ আছে। ওখানে অনেক কাগজপত্র আছে—সেগুলো অগোছালো হয়ে যায় বাবা তা চান না।"

লুইসা এবং এঞ্জিনিয়ার বাগানে ফিরে এল।

পরের আধ ঘণ্টা সে বাগানের পথে পায়চারী করে বেড়াল। তারপর মন স্থির করে লুইসার কাছে গিয়ে বল্‌লঃ "তুমি আমার হয়ে একটা টেলিগ্রাম করে আসবে?"

সে মেয়েটিকে অর্থ এবং টেলিগ্রামটি দিল; তারপর তাকে বলল যে, সে ক্লান্ত হয়েছে—এখনই বিছানায় যেয়ে শুয়ে পড়বে।

পরদিন সিলভিয়া এঞ্জিনিয়ারের প্রাতঃরাশ নিয়ে গেল, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পেল না। দরজায় তালা লাগানো ছিল। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে; সিলভিয়া চীৎকার করা শুরু করল, পরিবারের সবাই ব্যাপার কি জানার জন্য এগিয়ে এল। ড্যানিয়েল ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে গেল।

ঘর খালি, গতরাত্রে বিছানায় কেউ শোয় নি' এঞ্জিনিয়ারের মালপত্রও সেখানে ছিল না।

"সে চলে গেছে!" সিলভিয়া চীৎকার করে উঠল।

"সে বিদায় না জানিয়েই চলে গেল," লুইসা বল্‌ল।

"সে নিশ্চয়ই কাল রাত্রে চলে গেছে," বিছানাটা দেখিয়ে ফিলোমেনা বল্‌ল।

দুই লাফে ড্যানিয়েল তেতালায় উঠে গেল—সেখানে শোনা গেল তার পাগলের মত চীৎকার আর গালাগালি। "চোর! বদমায়েস! বিশ্বাস ঘাতক! সে আমার সব কাগজপত্র নিয়ে গেছে!" সে ঝড়ের বেগে প্রলাপ বক্‌তে লাগল যেন।

মেয়েরাও তাড়াতাড়ি ওপরে গেল। ঘরটা বিশৃঙ্খল হয়েছিল। মেঝের উপর ড্রয়ার থেকে সব বের করে ফেলা হয়েছিল।

সেই মুহূর্তে অ্যাগোস্টিনো এসে হাজির হল। তখনও সে কিছু জানত না, তবু তাকে বিবর্ণ এবং উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

"গতরাত্রে গোয়েন্দাটি পালিয়ে গেছে এবং সঙ্গে সীমান্ত ব্যবসায়ের কাগজ সমেত আমার বেশীর ভাগ কাগজপত্রই নিয়ে গেছে। যে-সব লোক এর মধ্যে জড়িত আছে, তাদের এখনই সাবধান করে দিতে হবে," ড্যানিয়েল অ্যাগোস্টিনোকে বল্‌ল। "নষ্ট করার মত একটি মুহূর্তও নেই।"

"আজ সকালে লুইনা স্টেশনে কুড়িজন শ্রমিক ধরা পড়েছে," অ্যাগোস্টিনো বল্‌ল। "এই শ্রমিকরা দিনের বেলা কাজের জন্য সুইটজার্ল্যান্ডে আসে আর রাত্রিতে ইটালিতে ফিরে যায়।"

সিলভিয়া প্রবল বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিল বাবা এবং অ্যাগোস্টিনোর দিকে, যেন তারা সুন্দর অভিনয় করছিল।

"না!" সে কাঁদতে শুরু করল। "না, না! একথা সত্য নয়! নিশ্চয়ই এটা পরিহাস। ঈশ্বরের দোহাই, অ্যাগোস্টিনো, বল এটা সত্য নয়।"

ড্যানিয়েল সোজা হয়ে দাঁড়াল।

"যারা এখনও ধরা পড়েনি, তাদের কি করে বাঁচানো যায় সে-কথা আমাদের এখনই ভেবে দেখতে হবে।" সে বল্‌ল।

সে এবং অ্যাগোস্টিনো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

সেদিন অনেক রাত্রে ড্যানিয়েল ফিরে এল।

ফিলোমেনা এবং লুইসা স্টোভের পাশে বসেছিল। আর সিলভিয়া বসেছিল অন্ধকার রান্নাঘরের পিছন দিকটায় একটা বাক্সের উপরে।

"যে সব লোক গোপনে বিপ্লবী কাগজপত্র নিয়ে যায়, আজ খুব ভোরে তারা ধরা পড়েছে," রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ড্যানিয়েল বল্‌ল। "দুপুরে একটা বইয়ের দোকানে পুলিশ হানা দিয়েছিল। ক্যাটেরিনার বাড়িতে পুলিশ গেছিল—মনে হয় অ্যাগোস্টিনোও ধরা পড়েছে এবং নিশ্চয়ই সুইট্‌জার্ল্যান্ড থেকে বিতাড়িত হবে। এখানে এখনও পুলিশ আসে নি?"

ফিলোমেনা বল্‌লঃ "না।"

ড্যানিয়েল দরজায় বসে পড়ল।

অনেক রাত হ'ল—প্রথমবার মোরগ ডাকল, কিন্তু কেউ শুতে যাবার কথা ভাবলেও না। যে দোতালায় এই গতকাল পর্যন্ত এঞ্জিনিয়ারটি ছিল, সেখানে কারও পা দেবার ইচ্ছা করছিল না। দ্বিতীয়বার মোরগ ডাকল। ফিলোমেনা এবং লুইসা স্টোভের পাশেই বসে রইল। অন্ধকার রান্নাঘরের পিছন দিকে কাঠের বাক্সে সিলভিয়াও বসে রইল এবং দরজায় ড্যানিয়েল বসে রইল। কেউ যেন মরে গেছিল—তারা সবাই মিলে যেন মৃতদেহ পাহারা দিচ্ছিল। তৃতীয়বার মোরগ ডেকে উঠ্‌ল।

যন্ত্রণাক্ষুব্ধ কুকুরের ডাকের মত একটা জন্তুর তীক্ষ্ন চীৎকারে নীরবতা ভেঙে গেল—তারপরেই শোনা গেল মুরগী এবং মুরগীর বাচ্চার দীর্ঘ এবং উত্তেজিত ডাক। লাফিয়ে উঠে ড্যানিয়েল বাগানের মধ্য দিয়ে ছুটে গেল মুরগীর খোপের দিকে, গিয়ে দেখল যে, একটা খেঁকশিয়ালের থাবা ফাঁদে আটকে গেছে। কুঁজো পিঠে জন্তুটা তিনটি মুক্ত পা দিয়ে আটকানো পা'টা খোলার জন্য চেষ্টা করছিল। ড্যানিয়েলকে আসতে দেখে সে ফাঁদের শিকলের বাধা অগ্রাহ্য করে এপাশে ওপাশে পাগলের মত লাফানো শুরু করল।

"অবশেষে!" ড্যানিয়েল বলে উঠল। সে মুরগীর খোপের পাশে রাখা একখানি কুড়ুল তুলে নিয়ে এমনভাবে পশুটাকে কোপানো শুরু করল যেন সে একটা ওক্ গাছ কাটছিল। সে জন্তুটার মাথা, পিঠ, পেট এবং পায়ে আঘাত করল এবং মৃতদেহ-টাকে খণ্ড খণ্ড ও রক্তাক্ত চূর্ণবিশেষে পরিণত করার পরও বহুক্ষণ ধরে সে কুপিয়ে চলল।*

---

*ইটালীয় লেখক Ignario Silone-এর The Fox গল্পের অনুবাদ।

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী *

(শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

চিঠিপত্রের একটি বিশেষ স্বাদ আছে, যা অন্য জাতীয় সাহিত্যে মেলে না। বিশেষ করে' রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের। কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তিজীবন এমন অনাড়ম্বরভাবে কাছে আসেনা, কল্পনার বর্ণচ্ছটা অনেক সময়ে জীবনকে আড়াল করে' রাখে। আবার সকলের চিঠিতে সরসতা নেই, হয়তো সাংসারিক হিসাব কিতাবের কথায় তার ষোলো আনা ভরা, হৃদয় সেখানে আনন্দের সন্ধান পায় না। রবীন্দ্রনাথের চিঠি যে এমন সহজ অথচ এত মধুর, তার কারণ তাঁর ব্যক্তিজীবনই পরিপূর্ণ কবিতা, তাঁর দৃষ্টিই সৌন্দর্যমায়াময়। কবিতা যাঁদের জীবনের প্রতিচ্ছায়া নয়, ব্যবহৃত শিল্পরচনা, তাঁদের কাব্যের মাধুর্য কথায় বা চিঠিতে ফোটে না ; কারণ, সে সময়ে তাঁরা ভাবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের 'চিঠিপত্র' সব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা। পড়াশুনোর উপদেশ থেকে আরম্ভ করে' কবির জীবনাদর্শ, বিচিত্র অনুভূতি, প্রকৃতির রূপচ্ছবি, আশ্রমিক কর্মের নির্দেশ—সবই এতে আছে।

রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ জীবনচরিত রচনার পক্ষে এই উপাদানের মূল্য যথেষ্ট। আশ্রমকর্মী, বন্ধুবান্ধব এবং দেশী ও বিদেশী খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের প্রসঙ্গ, নানাসময়ে কবির মনোভাব, সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে কবির মতামত—এ সকল তথ্য কবির চরিতকারের পক্ষে অপরিহার্য। কবিকে যাঁরা সৌখীন, ভাববিলাসী, সংগ্রাম-বিমুখ বলে' মনে করেন, তাঁরা ধারণা পরিবর্তনের কারণ অনেক চিঠিতেই পাবেন। দু'নম্বরের চিঠি থেকেই উদ্ধৃত করি :

"Statesman কাগজের চাঁদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে 'বন্দে মাতরম্' কাগজ পাঠাতে থাকব। ওটা খুব ভালো কাগজ হয়েছে। কিন্তু অরবিন্দকে যদি জেলে দেয় তা হলে ও কাগজের কি দশা হবে জানিনে। বোধ হয় জেল থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে না। আমাদের দেশে জেল খাটাই মনুষ্যত্বের পরিচয়স্বরূপ হয়ে উঠছে। জেলখানার ভয় না ঘোচাতে পারলে আমাদের কাপুরুষতা দূর হবে না। দু'চারজন করে জেলে যেতে যেতে ওটা অভ্যাস হয়ে যাবে—বিশেষ কিছু মনে হবে না। যেমন আমাদের ম্যালেরিয়া আছে, মাঝে মাঝে ভুগছি, মাঝে মাঝে সারছে, মাঝে মাঝে মরছিও—জেলখানাটাও আমাদের ভদ্রসমাজের একটা নিত্যনৈমিত্তিক অনিবার্য আধিব্যাধির মধ্যে গণ্য হয়ে উঠবে।" দেশপ্রীতির উন্মাদনা তাঁকে উৎসাহিত করেছে কিন্তু আত্মহারা করেনি। সাফল্যলাভের জন্য যে ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাস নয়, ধীর অবিরাম গঠনমূলক কর্মের প্রয়োজন, একথা তিনি বার বার বলেছেন:

"প্রথমেই প্রকাণ্ড করে' ফেঁদে যে কিছু আয়োজন হয়েছে প্রত্যেকবারেই সমস্ত দেশ আশান্বিত হয়ে উঠেছে এবং তার পরেই দুর্গতির লজ্জা ভোগ করতে হয়েছে। এখন এই সমস্ত চেষ্টার বিফলতা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। এখন আমার মনে আর সন্দেহমাত্র নেই যে, আমাদের দেশে যদি কোনো কাজকে সফল করতে হয় তবে একলা ছোটরকম করে আরম্ভ করে লোকচক্ষুর অগোচরে তাকে ধীরে ধীরে মানুষ করে তোলাই তার প্রকৃষ্ট উপায়। সেইটেই স্বাভাবিক পন্থা।"

দেশে বিদেশে ঘুরে কবি যেখানে যা ভালো জিনিস দেখেছেন—শিল্পরীতি, কলকব্জা, ছবি—অমনি তাই আমদানী করে কাজে লাগানো যায় কিনা ভেবেছেন। বোলপুরে ধানভানা কল, 'পটারি', ছাতার কারখানা ইত্যাদি চালাবার বন্দোবস্ত, আবার ছাত্রদের চিত্রকলা শেখাবার উদ্দেশ্যে বহু অর্থ ব্যয়ে বিখ্যাত জাপানী চিত্রকরদের আঁকা ছবি নকল করিয়ে আনা তাঁর কর্মব্রতের এবং অবিশ্রান্ত উদ্যমের পরিচয় দিচ্ছে।

বিভিন্ন দেশের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর সদাজাগ্রত উৎসাহ এবং কৌতূহল লক্ষ্য করবার বস্তু। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, জনসেবা—সকল ক্ষেত্রে কোথায় কি নতুন আবিষ্কার বা নতুন আয়োজন হচ্ছে, আগ্রহে তিনি তার সন্ধান নিয়েছেন। গয়ায় পড়ো জমিতে কি করে' খেঁসারির চাষ সম্ভব হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার কি গাছ আংশিকরূপে জলের অভাব দূর করে, জাপানে কি রকম হাল্কা এবং টেঁকসই বাসনপত্র তৈরি হয়, কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা তাঁর কত প্রবল এবং পড়বার বিষয় কত বিস্তৃত, দু'একখানা চিঠি থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। একখানা চিঠিতে তিনি বই চেয়ে পাঠাচ্ছেন :

(১) ভাইকাউণ্ট হাল্ডেনের 'দি পাথওয়ে টু রিয়ালিটি' (২য় খণ্ড)।

(২) ফ্রেডারিক সডির 'দি ইণ্টারপ্রেটেশন অব্ রেডিয়াম।'

(৩) রবার্ট এচ লকের 'রিসেণ্ট অ্যাডভানসেজ্ ইন দি স্টাডি অব ভ্যারিয়েশন হেরেডিটি অ্যাণ্ড ইভলিউশন।

ডাক্তারী শাস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি সযত্নে আলোচনা করতেন, কোন কোন চিঠি থেকে জানা যায়।

নব্য রাশিয়ার কর্মসাধনা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। বুদ্ধি, আগ্রহ এবং নিষ্ঠা থাকলে যে অল্প পুঁজি নিয়েও অনেক ভালো কাজ করা যায়, তার বহুল দৃষ্টান্ত কবি সেখানে দেখেছেন। নবীন রাশিয়ার সাম্যতন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থারও তিনি পক্ষপাতী। "যে-রকম দিন আসছে, তাতে জমিদারীর উপরে কোনদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরো পাকা হয়েছে। যেসব কথা বহুকাল ভেবেছি, এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারী ব্যবসায়ে আমার লজ্জা হয়।"

শান্তিনিকেতনকে তিনি সর্বতোভাবে জাতিগঠনের কেন্দ্র করে' তুলতে চেয়েছিলেন। তাই গ্রামের মাঝখানে গ্রামবাসীদের জীবনের সঙ্গে যোগ রেখে সেখানে শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু যখন সে শিক্ষার ধারা দেশের জীবন ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে' সাহেবিয়ানার দিকে মোড় ফিরতে চেয়েছে, কবি তখন বিষম বেদনা অনুভব করেছেন : "শুনলুম............ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, শান্তিনিকেতনে লণ্ডন ম্যাট্রিক তরানোর একটা খেয়াঘাট বসাবে। শুনে একটুও ভালো লাগছে না—শান্তিনিকেতনের আদর্শ যে ক্রমশই বিগড়ে চলেছে, এ তারই একটা নিদর্শন—ষোলো আনা ইঙ্গবঙ্গ snobbish ভাবে যে স্বর্গলোক কামনা করে আমাদের মধ্যেই সেই নেশা যদি প্রবেশ করে তাহলে কোথায় গিয়ে উত্তীর্ণ হবে? কলেজ ব্যাপারটা ক্রমশই শান্তিনিকেতনের মধ্যে বিজাতীয়তার পথ প্রশস্ত করতে বসেছে। ব্যারিস্টার মহলের ছেলেদের সাহেবি দীক্ষা দেবার ভার আমাদের নিতে হবে নাকি?"

দেশের সঙ্গে তাঁর সর্বাঙ্গীণ অচ্ছেদ্য যোগ তিনি অনুক্ষণ অনুভব করতেন। এ দেশের প্রকৃতি, সমাজ, সাহিত্য এবং সভ্যতা গড়ে' তুলেছে তাঁর জীবন। এরই জলবায়ু, আকাশ বাতাসে তিনি বর্ধিত, মেঘে রৌদ্রে, বনচ্ছায়ায়, নদীকল্লোলে তিনি পান করেছেন স্বর্গীয় অমৃত।

সেই অমৃতের সন্ধান তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর সাহিত্যে, এই পত্রাবলীতেও।

মরণের মধ্য দিয়ে তিনি আজ উত্তীর্ণ অমরলোকে ; শান্ত চিত্তে আমরা স্মরণ করি বাণী—"যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ, মৃত্যু যাঁর ছায়া, অমৃতও যাঁর ছায়া।" অস্তমিত রবির সংহৃত রশ্মি প্রবেশ করুক আমাদের অন্তরলোকে, উদ্দীপ্ত করুক আমাদের প্রাণবহ্নিকে।

---

* চিঠিপত্র (২য় খণ্ড)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়; ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। প্রথম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৪৯।

৺পূজায় বাংলায় বস্ত্র-সমস্যা

অধ্যাপক—শ্রীবরদা দত্তরায় এম এ

কোন এক বিদেশী মনীষী বলিয়াছেন, India is a land of festivities. 'ভারতবর্ষ উৎসবের দেশ'। সত্যি সত্যিই যাঁহারা উত্তর ভারতের হোলী, মধ্যভারতের দেওয়ালী, লক্ষ্ণৌএর ইদ, উড়িষ্যার রথ, দক্ষিণ ভারতের দশহরা এবং বাঙলার দুর্গাপূজা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বিদেশী হইলেও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ভারতের জনসাধারণ যদিও বন্যায় ভাসে, অনাবৃষ্টিতে পুড়ে, দুর্ভিক্ষে কাঁদে এবং মহামারীতে মরে, তবু ইহারা আনন্দ করিতে জানে। বাঙলা দেশে আবার বারো মাসে তেরো পার্বণ। তার উপর সবার চাইতে বড়, সবার চাইতে আপামর সাধারণের আনন্দের এই দুর্গাপূজা, যাকে বাঙালী এক কথায় বলে, 'পূজা'। এই পূজায় বাঙলার জনসাধারণ যেখানেই থাকুক এবং যেভাবেই থাকুক, তাহাদের আত্মীয়স্বজনের তত্ত্ব-তালাস করে, যাঁহারা শ্রদ্ধার, যাহারা প্রীতির, যাহারা স্নেহের, তাহাদিগকে অন্য কিছু দিয়া প্রাণের আবেগ জানাইতে না পারিলেও, একখানি কাপড় দিয়াও প্রাণের আবেগ জানাইতে চেষ্টা করে। ইহা বাঙলার এবং বাঙালী হিন্দুর চিরাচরিত প্রথা। কোন্ সুদূর অতীত হইতে যে এইভাবে পরস্পর অভিনন্দন প্রথা বাঙলা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ও আচরিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু এক কালে যাহা হয়ত ছিল আনন্দের নিদর্শন, আজ তাহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে প্রথা, যাহার ব্যতিক্রম করা অন্য দেশে সম্ভবপর হইলেও ভারত কিংবা বাঙলা দেশে সম্ভবপর নয়। যাঁহারা ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙলার সামাজিক জীবনের সহিত পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে, বাঙলার সামাজিক বন্ধনের বনিয়াদ্ গ্রথিত রহিয়াছে ঐ প্রথায়। বাঙালী ধার করিতে পারে, গহনা বন্ধক দিতে পারে, পৈতৃক ভদ্রাসন পর্যন্ত বিক্রী করিতে পারে, তবু সে সহজে "বাপপিতামহ"র প্রথা পরিবর্তন করিতে রাজী হয় না। যুদ্ধের এই ঘনঘটায়, বস্ত্রের এই অগ্নিমূল্যের সময়ে এবং অর্থাগমের দুর্দিনে বাঙালী কিভাবে যে এবার পূজায় "নূতন কাপড়" দিয়া আত্মীয়-কুটুম, আশ্রিত, প্রতিপালিত এবং স্নেহমুখর কচি ও কাচাদিগকে খুসী করিবে, তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিবে, তাহাই এখন প্রধান সমস্যা।

গত জানুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ের কলমালিক সমিতির (Mill Owners' Association) যে বিবৃতি বাহির হইয়াছিল, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, গত বৎসর কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ৩৮৮টি। এ বৎসর আরও দুইটি নূতন কল স্থাপিত হওয়াতে কলের সংখ্যা বাড়িয়া এখন দাঁড়াইয়াছে ৩৯০টি। পূর্ব বৎসরের অনুপাতে এ বৎসর কলসমূহে তুলার ব্যবহারও বৃদ্ধি পাইয়াছে, দুই লক্ষ ছিয়াশী হাজার কেণ্ডি। (১ কেণ্ডি=৭৮৪ পাউণ্ড) অন্যদিকে দেখা যায় যে, কাপড়ের কলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৪০ ইং সালে যেখানে এক কোটি ছয় হাজার টাকু এবং দুই লক্ষ তাঁতে কাজ হইয়াছিল, আলোচ্যবর্ষে সেখানে কাজ হইয়াছে মাত্র ৯৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকুতে এবং ১ লক্ষ ৯৮ হাজার তাঁতে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ বৎসর কলের সংখ্যা ও তুলা ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও আসলে বস্ত্রশিল্পের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। বিদেশী মাল আসা একরূপ বন্ধ, কাজেই দেশে কাপড়ের চাহিদা বাড়িয়াছে, অন্য দিকে যুদ্ধের উপযোগী বস্ত্রাদির চাহিদার চাপও পড়িয়াছে, ফলে কাপড়ের কলে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টার স্থানে ৬০ ঘণ্টা কার্যকাল বৃদ্ধি করিয়া সরকারী চাহিদা ও অন্যান্য চাহিদা মিটাইতে হইয়াছে। এই চাহিদা মিটাইবার অজুহাতে তুলার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে যে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হইয়াছে, একথা প্রকাশ পায় না। আয় ব্যয় সমান হইয়া স্থিতিশূন্য হইলে যেমন কোন আর্থিক অবস্থাকে উন্নত বলে না, আলোচ্যবর্ষে কাপড়ের কলগুলির অবস্থাও দাঁড়াইয়াছে তাই। অন্যথা, যদি সত্যসত্যই কাপড়ের কলের অবস্থা ভাল হইত, তাহা হইলে একদিকে যেমন আমরা কাপড়ের কলের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিতে পাইতাম, অন্যদিকে তেমনি তাঁত ও টাকুর সংখ্যাও বর্ধিত দেখিতে পাইতাম।

এই ত গেল গতবর্ষের সাধারণ অবস্থা। আমেদাবাদ, ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার। সেখানের কলগুলি ৪০ নম্বরের নীচের নম্বরের সূতায় কাজ করিতে পারে না। মিহি সূতা পাইতে হইলে বিদেশী তুলার প্রয়োজন। যুদ্ধের আতঙ্কে বিদেশী মালবাহী জাহাজ সাগর পাড়ি দিয়া আশা নিরাপদ নয়। কাজেই বস্ত্রশিল্পের উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস হইয়াছে আমেদাবাদ ও বোম্বাই প্রদেশে। বাঙলা এবং অন্যান্য প্রদেশে বরং উন্নতি দেখা গিয়াছে। বাঙলা দেশে ১৯৪০ ইং সালে কাজ হইয়াছিল ১০৩১৫ (দশ হাজার তিনশ' পনের)টি তাঁতে এবং ৪৫২৭০০ (চারি লক্ষ বায়ান্ন হাজার সাত শ' টাকুতে আলোচ্যবর্ষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বৎসর দশ হাজার ছয় শ পনেরটি তাঁতে (১০৬১৫) চারি লক্ষ ঊনষাট হাজার (৪৫৯০০০) টাকুতে কাজ হইয়াছে। উপরিউক্ত শংখ্যার বহর দেখিয়া আশা হইয়াছিল যে, যুদ্ধের এই সুযোগে বাঙলা দেশ হয়ত কোন রকমে ফাঁড়া কাটাইয়া উন্নতির পথে চলিতে পারিবে, কিন্তু গত বৎসর জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে আবার চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। বাঙলা দেশ জাপানের আক্রমণের সিংহদ্বার। কাজেই জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার কাপড়ের কলের ও অন্যান্য শিল্পের বহু শ্রমিক বোমার আতঙ্কে কাজ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। পেটের দায়ে নূতন শ্রমিক কাজে ভর্তি হইলেও তাহাদের দ্বারা তেমন কাজ পাওয়া যায় না। বিদেশ হইতে তুলার আমদানী যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও এতকাল বাঙলা দেশ মধ্য ও পশ্চিম ভারত হইতে ভারতীয় দেশী তুলা আমদানী করিয়া কাজ চালাইতে পারিয়া-

ছিল, কিন্তু মালগাড়ির অভাবে বর্তমান সময়ে তাহাও বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ব্যাপার এখানেই শেষ হইলে না হয় একটা পথ পাওয়া যাইত। কিন্তু বাঙলার উপকণ্ঠে কয়লার খনি ও কয়লার জোগান যথেষ্ট পরিমাণে মালগাড়ির অভাবে পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। তদুপরি বর্তমান অবস্থায় কলকব্জা একবার নষ্ট হইলে যে সহজে তাহা মেরামত কিংবা বদলান যাইবে, সে আশাও সুদূরপরাহত। এই জাতীয় অভাব, আশংকা ও উদ্বেগের মধ্য দিয়া যে সব কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, তাহার দামও, কাজে কাজেই বেশী পড়িতেছে। (বঙ্গীয় কল-মালিক সমিতির গত আগস্ট মাসের বিবৃতি হইতে)

অন্যদিকে বাঙলার তাঁতের কাপড় প্রসিদ্ধ। আশা ছিল যে, বাঙলার এবং ভারতের কলসমূহে যুদ্ধের দরুণ অবস্থা-বৈগুণ্য হইলেও হয়ত বাঙলার পল্লীর লক্ষ লক্ষ তাঁত কাপড় বুনিয়া বাঙলার নগ্নতা নিবারণ করিতে সাহায্য করিবে; কিন্তু গত জানুয়ারী মাসে তাঁতশিল্পের অবস্থার যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সে আশাও যে ফলবতী হইয়া বাঙলার বস্ত্র-সমস্যা মিটাইতে পারিবে, সে আশা করা যায় না। এতকাল ভারতে বিদেশ হইতে, বিশেষ করিয়া জাপান হইতে সূতা আসিত। দেশীয় তাঁতীরা ঐ সূতা এবং ভারতীয় কলের প্রয়োজনাতিরিক্ত সূতা লইয়া কাজ করিত। জাপান শত্রু হওয়ার পর হইতে জাপানী সূতা আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়াছে এবং দেশীয় কলগুলিতে যে সূতা উৎপন্ন হয়, তাহাতে তাহাদের অভাবই ভালরূপে মিটিতেছে না। কাজেই তাঁতীদের অবস্থা যে বস্ত্রাভাব মিটাইবার পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নহে, সে কথা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি ভারত সরকার তাঁতীদিগকে সূতা সরবরাহ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে যে খুব সুবিধা হইবে, সে আশাও করা যায় না। মাঝে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সদস্য-পরিকল্পিত গরীব-দুঃখীদের জন্য 'স্ট্যান্ডার্ড ক্লথের' কথা শুনা গিয়াছিল এবং তৎপ্রসঙ্গে নানারূপে জল্পনাকল্পনাও কিছুদিন খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত সদস্যের স্ট্যান্ডার্ড ক্লথের পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

কাজেই এবার বস্ত্রের এই অগ্নিমূল্যের দিনে এবং অর্থাভাবের সময়ে বাঙলার বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হইবে কিসে? 'আনন্দময়ীর আগমনে' বাঙলার চারিদিকে আনন্দ ছড়াইয়া পড়ে নূতন জামা-কাপড়ে। কিন্তু যেখানে চাহিদা অপেক্ষা যোগান কম এবং যেখানে মাল মজুত থাকিলেও গাড়ির অভাবে মাল আমদানী করা একরূপ অসম্ভব, সেইখানে বাঙলায় এবার পূজায় বস্ত্র-সমস্যা মিটিবার কোন পন্থাই দেখা যায় না। অথচ বাজার প্রত্যহই বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহারা জোড়া কাপড়ের স্থলে একখানি কাপড় কিনিয়া কোন রকমে মুখরক্ষা করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহারা এক মাস পূর্বে কাপড়ের যে দাম দেখিয়া গিয়াছিলেন, সেই দর অপেক্ষা প্রতি কাপড়ে চারি আনা, ছয় আনা দর বাড়িয়া গিয়াছে। পূজার হাওয়া আরও একটু নিকটতর হইয়া আসিলে, দর আরও বাড়িবে। এ অবস্থায় স্বার্থপর ব্যবসায়ীরা যাহাতে অযথা দর বৃদ্ধি করিয়া খরিদ্দারকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে না পারে, সেই জন্য সরকারের তরফ হইতে কড়া দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। অন্যদিকে খরিদ্দারের পক্ষ হইতেও যথাসম্ভব কম করিয়া কাপড় কেনা দরকার। কারণ কাপড়ের জোগান এবার নানা কারণেই কম। যেখানে জোগান কম, চাহিদা বেশী, সেখানে দিনের পর দিন দর বাড়িবে মাত্র। যথাসম্ভব কম কাপড় খরিদ করিলে হয়ত জোগান ও চাহিদা পাশাপাশি থাকিয়া কোন রকমে বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে পারে, অথচ তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

মাদাগাস্কার

ভবানী পাঠক

ভারত মহাসাগরের বুকে যত দ্বীপ আছে, তার মধ্যে বৃহত্তম দ্বীপ মাদাগাস্কার। আফ্রিকার উপকূল থেকে কিছু দূরে মাদাগাস্কার ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ এলাকার প্রহরীর মত জেগে রয়েছে। এই দ্বীপ এতোদিন ফরাসী সরকারের অধীন ছিল। মাত্র কয়েকদিন হলো বর্তমান মহাযুদ্ধের আলোড়নে পড়ে রাজধানীটি বৃটিশের অধীনে এসেছে। যাতে এক্সিস পক্ষের হাতে না পড়ে, সেইজন্য আগেভাগেই বৃটিশ শক্তি যুদ্ধনীতির দিক থেকে মাদাগাস্কারের রাজধানী অধিকার করতে বাধ্য হয়েছে। তাই মাদাগাস্কার আজ সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। মার্কো পোলো বা ভাস্কো-ডা-গামার যুগে যখন লোকে মাদাগাস্কার নামে বিরাট এক দ্বীপদেশের কথা শুনেছিল, তখনও এতটা চিন্তা তর্ক আলোচনার রব ওঠেনি। এই দ্বীপদেশের আশপাশ দিয়েই বিভিন্ন মহাদেশগামী জাহাজের যাতায়াত চলে। বাণিজ্যের দিক দিয়ে মাদাগাস্কারের গুরুত্ব যেমন, রাজনীতিক ও যুদ্ধনীতিক কারণেও তেমন।

আজ অবশ্য মাদাগাস্কারের কথা সকলের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতোদিন ধরে এই দ্বীপদেশটির জীবনের কথা পৃথিবীবাসীর কাছে তেমনভাবে প্রচারিত হয়নি। বৃহত্তর পৃথিবীর চিন্তার আসর থেকে এই দ্বীপটি এতোদিন তার নিরালা সুখ-দুঃখেই ঢাকা পড়েছিল।

দূর অতীতে, তের শতকের প্রায় শেষের দিকে বিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলোর জাহাজ ভেনিসের পতাকা উড়িয়ে একদিন মাদাগাস্কারের দ্বীপের কূলে এসে ভিড়লো। তার আগে মার্কো পোলো বঙ্গোপসাগরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন; তাঁর ইচ্ছে ছিল শীতের সময় যাতে সিন্ধু নদের মোহনায় পৌঁছতে পারা যায়। সিংহলের কাছাকাছি আসতে বাতাসের গতি বদলে গেল। ক্রমে ক্রমে সেই হাওয়ার পাকে পড়ে মার্কো পোলোর জাহাজ দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললো। নাবিকেরা বুঝেছিল যে, আরও পুরো পাঁচটি পূর্ণিমা না কেটে গেলে বাতাসের গতি উত্তরমুখো হবে না। এমনি অবস্থায় একদিন ঠিক সূর্যাস্তের আগে তাদের চোখে পড়লো একটি দুই-মাস্তুলওয়ালা আরবী নৌকা হাল ভেঙে ও পাল ছিঁড়ে অসহায়ের মত ভেসে চলেছে; সেই নৌকার পাটাতনের উপর পড়েছিল কয়েকজন শীর্ণ অনশন জীর্ণ অর্ধোন্মাদ আরবী সদাগর। মার্কো পোলো তাদের নিজের জাহাজে তুলে নেন। এই আরবীদের কাছেই শোনা গেল যে, তারা দক্ষিণ দিকের দ্বীপের দিকে যাচ্ছিল হাতীর দাঁত কেনবার জন্য, কিন্তু হঠাৎ ঝড়ে পড়ে বাধ্য হয়ে তাদের দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে চলে আসতে হয়েছে।

এই কাহিনী শোনার পরও অনেক দিন পর্যন্ত মার্কো পোলো নিকটে বা দূরে কোন নতুন দেশের দিশা পাননি। এর পর একদিন অমাবস্যার দিনে মার্কো পোলোর জাহাজ হঠাৎ এক উপকূলে এসে ঠেকলো। সমস্ত সকাল জাহাজে বসে নাবিকেরা

রাজধানী তানানারিভো

প্রচণ্ড রোদের জ্বালায় পুড়তে লাগলো। উপকূলে কোন জনমানবের চিহ্ন দেখা গেল না। রাত্রিবেলায় উপকূলের বনজঙ্গল থেকে বন্যপশুদের নিদারুণ চিৎকার শুনে তারা শিউরে উঠতে লাগলো। বিরাট আকারের বানর জাতীয় জীবজন্তু জাহাজের দিকে তাকিয়ে গর্জন করতে লাগলো। তারা দ্বীপের ভেতরের দিকে প্রবেশ করার একবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পাহাড় জঙ্গলের দুরতিক্রম্যতার জন্য তা সম্ভব হয়নি। তার পরের পূর্ণিমাতে তারা উপকূলের অন্যদিকে অগ্রসর হলো।

উপকূলের বিস্তৃতি দেখে মার্কো পোলো মনে করলো যে, তারা একটি মহাদেশের সন্ধান পেয়েছে।

মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে নানা আজগুবি কাহিনী পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে লেখা আছে যে, তারা এই দ্বীপের উপকূলে এসে একদিন একটি পাখী দেখতে পান। পাখীটা নাকি আকারে তাদের জাহাজটার সমান ছিল। আর সেই পাখীটা একটা হাতীকে ঠোঁটে কামড়ে নিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। আরবীদের কাছে আরও নানারকম গল্প শুনে মার্কো পোলোর মনে করলো যে, একটি মহাদেশের সন্ধান পাওয়া গেছে। অতএব, এর পরের বার আরও অনেক জাহাজ নিয়ে এসে এই

মহাদেশটি অধিকার করতে হবে। কিন্তু মার্কো পোলো এই পরিকল্পনাকে ভবিষ্যতে কাজে দেখাতে পারেন নি।

মার্কো পোলোর মৃত্যুর ২০০ বছর পরে লোরেন্সো নামক এক পর্তুগীজ জাহাজের ক্যাপ্টেন নিগ্রো বিক্রীর ব্যবসায়ের জন্য মোজাম্বিক থেকে ঘুরে লিসবনে আসে। এই ক্যাপ্টেনের কাছে আবার লোকে মাদাগাস্কার দ্বীপের কথা শুনতে পেল,—এই দ্বীপদেশের অধিবাসীরা কালো বলেই ঠিক আফ্রিকার নিগ্রোদের মত নয়। সাধারণ লোকে বানরের মাংস খায়। নদীগুলি হাঙরে কুমীরে ভরা।

গ্রামের গৃহস্থ

তারপর এক শত বছর পরে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুই তাঁর প্রাসাদে অমাত্য রিচিলুর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। রিচিলু রাজার সামনে একটি মানচিত্র পেতে বসেছিলেন। এই মানচিত্রটি পর্তুগাল থেকে হাতিয়ে আনা হয়েছিল। রিচিলু রাজা লুইকে বুঝিয়ে বলেন যে, ওলন্দাজ আর পর্তুগীজের আফ্রিকার উপকূলে বেশ প্রতিপত্তি জমিয়ে বসেছে; কিন্তু আফ্রিকার উপকূল থেকে সামান্য দূরে এই বিরাট একটি দ্বীপদেশ আছে, তার খবর তারা একদিন জেনে থাকলেও আজ ভুলে গেছে। সুতরাং ফরাসী রাষ্ট্রশক্তির অনুকূলে এই দ্বীপটিতে একটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করা হোক।

লুই এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন এবং একটি ফরাসী কোম্পানীকে উপযুক্ত জাহাজ ও সৈন্য দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বলেন।

এর পর আরও কিছুদিন কেটে যায়। ২৫০ বছর পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এক প্রত্যুষে মাদাগাস্কারের জাতীয় রাজধানী আন্তানানারিভো যুদ্ধদামামা আর বিউগলের ধ্বনিতে চমকে জেগে ওঠে। রাজার প্রাসাদের ওপরে ফরাসী পতাকা উড়লো, ফরাসী সেনাদল পথ দিয়ে মার্চ করে গেল।

জোসেফ সাইমন গালিয়ানি—ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ সেনাদল নিয়ে এসে রাজপ্রাসাদের দ্বারে এসে দাঁড়াল। ম্লানমুখে বেদনার্ত শত শত মাদাগাস্কারীয় নরনারী শিশু সাদা কাপড় পরে পথের দুপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সেই দৃশ্য।

চারজন ফরাসী সৈনিক প্রাসাদের ভেতর গিয়ে আবার বিউগল ধ্বনির সংগে বেরিয়ে এল। সংগে স্বাধীন মাদাগাস্কারের শেষ রাজ্ঞী—বন্দিনী রাণাভালোনা।

দুঃখে মনস্তাপে বিষণ্ণ রাণী রানাভালোনা ছবির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ক্যাপ্টেন গ্যালিয়ানি ঘোষণাপত্র পড়লেন—"ফরাসী সাধারণতন্ত্রের নামে আমি এইক্ষণে ঘোষণা করিতেছি যে, রাণী রাণাভালোনা অদ্য হইতে সিংহাসনচ্যুতা হইলেন। অদ্য হইতে এই দ্বীপদেশ মাদাগাস্কার ফরাসী সাধারণতন্ত্রের উপনিবেশসমূহের পর্যায়ভুক্ত হইল। রাণী রানাভালোনা এই মুহূর্তে রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। জীবৎকাল পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল।"

রাণী রানাভালোনা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষের সম্মুখে। তাঁর দুই চোখ জলে ভেসে গেল। এইভাবে মাদাগাস্কারের স্বাধীনতা ফ্রান্সের রাহুগ্রাসে লুপ্ত হয়ে গেল।

পৃথিবীতে যত দ্বীপ আছে তাদের আকারে মাদাগাস্কার চতুর্থ স্থান অধিকার করে। বৃহত্তম দ্বীপ হলো গ্রীণল্যান্ড, তারপর নিউগিনি এবং বোর্ণিও। চতুর্থ হলো মাদাগাস্কার। দ্বীপটির আয়তন ২২৮,৫০০ বর্গমাইল। আফ্রিকার উপকূল থেকে এর দূরত্ব মাত্র ২৫০ মাইল। কিন্তু জলবায়ু, জীবজন্তু ও মানুষের জীবনযাপন প্রণালীর দিক থেকে আফ্রিকার সংগে মাদাগাস্কারের খুব সামান্যই সাদৃশ্য আছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, এই দ্বীপটি কোন অধুনালুপ্ত মহাদেশের অবশিষ্ট মাত্র। হয়তো এককালে অস্ট্রেলিয়ার সংগে এই দ্বীপ যুক্ত ছিল। আবার অনেকে অনুমান করেন যে, এই দ্বীপ ভারতের অংশ ছিল। এই সব ভূতাত্ত্বিক গবেষণার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে বলা যায় না। বহু বিভিন্ন উপজাতীয় মানুষে এই দ্বীপটি অধ্যুষিত। মোট জনসংখ্যা ৩৫ লক্ষ।

মাদাগাস্কারের পূর্ব-উপকূলবাসী জাতির নাম—বেতসিমিসারাক। দৈহিক গুণে ও লক্ষণে এদের সংগে যাভাবাসীদের অদ্ভুত মিল আছে।

পশ্চিম উপকূলের লোকেরা হলো—সাকালাভা। এদের দৈহিক গঠনে নিগ্রোত্বের প্রভাব খুব বেশী রকম আছে কিন্তু এই নিগ্রোত্ব আফ্রিকার নিগ্রোত্বের মত নয়! সুপ্রাচীনকালে মহাসাগরীয় অন্যান্য দ্বীপদেশবাসী নিগ্রো জাতির একটি বংশ হয়তো এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল।

তা ছাড়া আছে—আন্তাকারান, আন্তানদ্রয় ওমহাফানি জাতি, এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যে আরবী লক্ষণ পরিস্ফুট।

জলবায়ুর ব্যাপারে মাদাগাস্কারের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরিদৃশ্য দেখা যায়। কোথাও শীতের আধিক্য, কোথাও গ্রীষ্মের। তামাতাভে বন্দরে বছরের ১৮০ দিন বর্ষা লেগে থাকে, অথচ দক্ষিণের ফোর্ট দোফিনে বন্দরে মাত্র ২৭ দিন বৃষ্টি হয়।

মাদাগাস্কারের গাছপালা একান্তভাবে তারই নিজস্ব। এই জাতীয় গাছপালা পৃথিবীর অন্য কোন অংশে দেখা যায় না। অবশ্য বর্তমানে নানা দেশে এই সব গাছপালা আমদানী করে ফলান হয়েছে। মাদাগাস্কারের জন্তু জানোয়ারের মধ্যে একমাত্র

হিংস্র হলো এর কুমীর। আর সব জন্তুরা নিরীহ। মর্কট জাতীয় 'লেমুর' লক্ষ লক্ষ দেখা যায়। ভূতাত্ত্বিকেরা মাদাগাস্কারকে যে লুপ্ত মহাদেশের অংশ মনে করেন, সেই অনুমিত মহাদেশের নাম তাই 'লেমুরিয়া' রাখা হয়েছে।

মাদাগাস্কারের প্রধান প্রধান শহরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—তানানারিভে, মাজুঙ্গা, মানকারা, তামাতাভে। মজুঙ্গা শহরের সব কারবার আরবী আর চীনাদের হাতে। সরকারী কর্মচারীর অধিকাংশই আরবী।

সংগীত-নিরতা তরুণীর দল

এই দ্বীপদেশে ঠিক ভারতবর্ষের মত গরুর গাড়ির প্রচলন আছে। এদেশে সবচেয়ে কষ্ট পাবে নিরামিষাশী লোক। নিরামিষ খাদ্যের দাম সবচেয়ে বেশী, মাংস সবচেয়ে সস্তা। ৩৫ লক্ষ লোক আর ৫০ লক্ষ গরু নিয়ে এই দেশ। এক সের মাংস আর এক সের আলুর দাম একই পড়ে।

জীবনযাত্রায় তাড়াহুড়া কাকে বলে তা মাদাগাস্কারের লোকের অনুভবের অগম্য। কুঁড়ে কথাটাও তাই এদের মধ্যে নেই। ধীরে সুস্থে গড়িমসি করে সব কাজ করাই এদের নিয়ম।

রাজধানী তানানারিভের রূপ পর্যটকের চোখে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। শহরের চারদিকে ধানক্ষেতের সবুজ সমুদ্র, পথ দিয়ে শত শত রিক্সাগাড়ি ছুটে যায়। লোকজনদের চলাফেরার মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা নেই। মোটকারের চলার জন্য এই রকম ভীড়ওয়ালা পথ মোটেই সুবিধার নয়। তার উপর সড়কগুলি আঁকা বাঁকা। তা ছাড়া চড়াই উতরাই আছে। কিন্তু এই চড়াইগুলি রিক্সাকুলীরা যেভাবে গাড়িভরা বোঝা নিয়ে একদমে দৌড়ে উঠে পড়ে তা গিয়ারগর্বী মোটরকারের পক্ষেও বিস্ময়কর। নরনারী সকলেই সাদা কাপড় পরে। রঙীন কাপড়ের চলন খুব কম। বাড়িগুলি প্রায় সবই লাল রঙের।

মাদাগাস্কারের শস্য-সম্পদ খুব বেশী আছে ভুট্টা, কফি, কোকো, চিনি, তামাক, চাউল, লংকা প্রভৃতি। খনিজ সম্পদের মধ্যে—সোনা, গ্রাফাইট, নিকেল, সীসা, মাঙ্গানীজ ও পঞ্চাশ রকমের মূল্যবান পাথর। কিন্তু যতখানি সম্পদ এই মাদাগাস্কারের ভূমি থেকে আহরণ করা যেতে পারে, শ্রমিকের অভাবে তা হয় না। অধিবাসীদের উপর ট্যাক্সের পর ট্যাক্স চাপিয়ে শাসকপক্ষ লোকের মধ্যে কর্মপ্রবণতা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু এই চেষ্টা তেমন সুফল লাভ করেনি—করতে পারেও না। বিদেশ থেকে শ্রমিক আমদানী করার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু নিগ্রো শ্রমিকদের আফ্রিকাতেই চাহিদা রয়ে গেছে। চীনা শ্রমিকেরা মাদাগাস্কারের রোদ সহ্য করতে পারে না। ইন্দোচীন থেকে আন্নামী শ্রমিকদের আনবার চেষ্টা করা হয়েছে।

রাজধানীর আসল নাম ছিল—আন্তানানারিভো অর্থাৎ 'এক হাজার গ্রামের শহর'। ফরাসীগণ সংক্ষিপ্ত করে 'তানানারিভে' নাম রেখেছে। মাদাগাস্করীয়েরা সাধারণত 'মালাগসী' নামে পরিচিত।
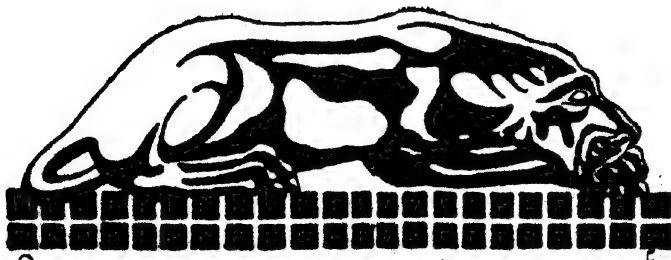
এই বৃহৎ জীবজগতে মানুষই কেবল সংগীতপ্রিয় নয়, সংগীতের উপর নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুদের অনেকেরই অনুরাগ আছে। সংগীতে মুগ্ধ হয়ে হাতীকে তাল দিতে অনেকেই দেখে থাকবেন। শিক্ষিত ঘোড়াও ব্যান্ড-বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলে। পক্ষীকুলের অনেকের সুমধুর কণ্ঠস্বরে মানুষ মুগ্ধ হয়ে তাদের অনুকরণ করেছে। জীবজগতে এমনি যখন সংগীতের জলসা চলেছে, সে সময়ে কীটপতঙ্গরাও একেবারে নীরব শ্রোতা হয়ে বসে নেই। তাদের অনেকেই এই সংগীতে যোগ দিয়েছে, তবে তারা সংগীতজ্ঞ নয়, তারা বাদ্যকার।

প্রখর রৌদ্রে ঝিঁঝি পোকার ঐক্যতান নিস্তব্ধ বনভূমিকে মুখরিত করতে অনেকেই শুনে থাকবেন। অনেকের ধারণা আছে, ঝিঁঝি পোকারা গান ধরেছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন, কীটপতঙ্গ গান গাইতে কিম্বা গলা থেকে কোন আওয়াজ বের করতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন, কীটপতঙ্গদের কোন কণ্ঠস্বরীয় যন্ত্র (vocal organ) নেই। সুতরাং এদের কাছ থেকে কণ্ঠস্বর আশা করা বৃথা। ফুসফুসের মধ্যের বায়ুকে কণ্ঠনালী এবং মুখের মধ্যে দিয়ে নিয়ে শব্দ তৈয়ার করার শক্তিকেই আমরা কণ্ঠস্বর বলবো। কীটপতঙ্গদের কোন ফুসফুস নেই, এমন কি তারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের জন্য মুখ ব্যবহার করে না। কীটপতঙ্গের দেহের দুপাশে ছোট ছোট গর্ত আছে। এইগুলির নাম 'spiracles'—এই গর্তগুলির মধ্যে দিয়েই শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চলে। গর্তগুলির মধ্যে শব্দ তৈয়ারী করবার এক অপূর্ব কৌশল আছে। কীটপতঙ্গদের শব্দ এক অদ্ভুত ধরণের। একটি খুব ছোট বাক্সের মধ্যে একটি মৌমাছিকে বন্দী করে রাখলে

বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা

দেখবেন এই বন্দী অবস্থায় ডানা দুটি ব্যবহার করতে না পেরেও মৌমাছিটি বেশ জোরে শব্দ করতে পারছে। উইচিংড়ের বাদ্য-সংগীতের সঙ্গে আমরা পরিচিত আছি। ক্রিকেটস এবং কিন্ডার্ড

এ্যামানিটা বংশের অন্তর্ভুক্ত বিষাক্ত ছত্রাক
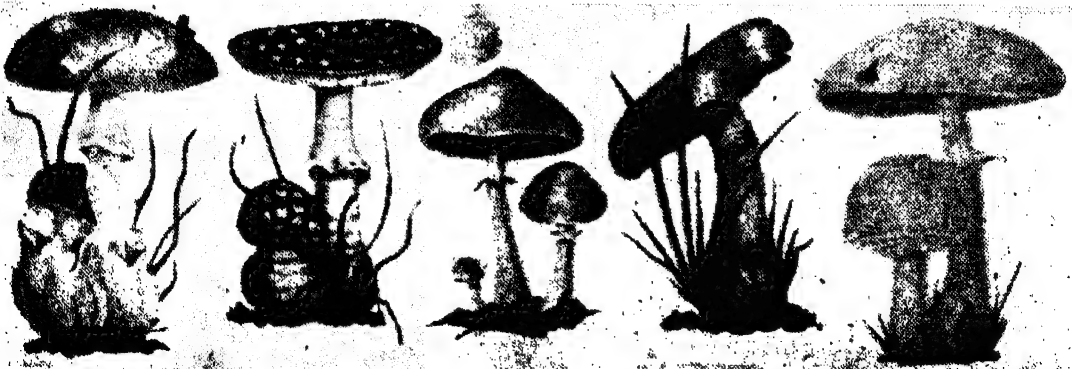
গল্প শেষ হ'লে 'চৌরঙ্গী'র মৃত্যু দর্শকের মনে করুণ ছাপ রেখে যেতে পারে না। দুর্ঘটনার প্রাবল্যের মত ছবিটিতে বিবেক-বাণীরও বাহুল্য দেখা গেল। নায়ক যখনই ভুল পথে এগুতে চাইছে তখনই তার মৃত পিতামহ কিংবা তার বিবেকের কাছ থেকে আকাশ-বাণী হচ্ছে। এ অবাস্তবতা দর্শকের মনকে পীড়িত করে। ছবিখানিতে Hold Back the Don, Waterloo Bridge Pygmalion প্রভৃতি দু-তিনখানি ইংরেজী ছবির প্রভাব দেখা গেল। মোটের উপর ছবিখানি স্টাণ্টপ্রধান; অনেক রকম প্যাঁচ ক'সে ছবিখানি জমানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রধান নারী চরিত্র দুটি প্রায় একই ছাঁচে তৈরী বলে ছবিতে বৈচিত্রের অভাব—সেই চিরন্তন প্রেম আর স্বার্থত্যাগ। অথচ যে সমস্যা নিয়ে ছবিটা শুরু হয়েছিল, তাতে ভালো লেখকের হাতে এ গল্পের সুন্দর পরিণতি হ'তে পারত। ছবির কাহিনী দুর্বল হ'লেও সংলাপ কিন্তু বেশ সুন্দর হ'য়েছে। সংলাপের পারম্পর্য এবং তীক্ষ্ণতা অতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অভিনয়ে জ্যোতিঃপ্রকাশই বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেনঃ তিনি বরাবর একটানা অভিনয় ক'রে গেছেন। ছায়া দেবীর ভূমিকায় খুব বেশী বৈশিষ্ট্য না থাকায়, 'চৌরঙ্গী'তে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ অভিনয় নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি। নবাগতা অভিনেত্রী প্রমীলা ত্রিবেদীর চেহারায় যথেষ্ট জৌলুস না থাকলেও, তিনি মোটের উপর মন্দ অভিনয় করেন নি। 'চৌরঙ্গী'তে দাঁড়িয়ে তাঁর ভিক্ষা চাওয়ার মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট কৃত্রিমতা পরিস্ফুট—গলার স্বর এবং ভাবভঙ্গী তাঁর সহজ ও স্বাভাবিক হয়নি। তবে শেষের দিকে তিনি মন্দ অভিনয় করেন নি। নায়কের পিতার ভূমিকায় ডাঃ হরেন মুখার্জি'র অভিনয় চলনসই। নৃত্যশিল্পী গায়ত্রী রায়ের অভিনয় করার মত কিছু ছিল না; তাঁর নাচ উল্লেখযোগ্য। চৌরঙ্গীর সঙ্গীতাংশ যত উচ্চাঙ্গের হবে মনে করেছিলাম, তা' হয়নি; তবে বেশীর ভাগ গানই উপভোগ্য হ'য়েছে। দৃশ্যসজ্জা ও আলোক চিত্রণ মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গের হ'লেও নিরবিচ্ছিন্ন পারম্পার্য রক্ষিত হয়নি। শব্দ-যোজনা মন্দ নয়। ছবিখানির মধ্যে পরিচালক নবেন্দু সুন্দরের পরিচালনা প্রতিভার কোন অভিনবত্ব দেখলাম না।

রক্সি—'ফুলওয়ালা বাপ'

আচার্য আর্ট প্রডাকসনের নূতন ছবি। প্রযোজক—এন আর আচার্য, পরিচালনা—কিশোর সাহু, সংগীত—রামচন্দ্র পাল, কাহিনী—ডি এন নায়ক। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন—কিশোর সাহু, প্রতিমা দাসগুপ্তা, অঞ্জলি দেবী প্রভৃতি।

প্রথমে কাহিনীটি বলে দেওয়া যাক। প্রাণনাথ ও পুষ্পা পাশাপাশি বাড়িতে থাকে। একজনের বেহালা বাজনায় ও আরেক-জনের গান গাওয়ায় দুজনেই উত্যক্ত হয়ে বিরোধের মধ্যে পরিচিত হোলো এবং সেই পরিচয়ই পরিণত হোলো ভালবাসায়। এক দুশ্চরিত্র দুর্বৃত্তও এর মধ্যে আছে। সে পুষ্পার পাণিপ্রার্থী। পুষ্পার জন্য আসা যাওয়া করে।

প্রাণ ও পুষ্পার পাকা দেখার দিন। বাড়িতে উৎসবের আয়োজন হয়েছে। এমন সময় প্রাণনাথের কপালে এসে জুটলো এক মাতৃ-পরিত্যক্ত শিশু। দুশ্চরিত্র লোকটি পুষ্পাকে বোঝালে প্রাণনাথই এ শিশুর পিতা, সুতরাং পুষ্পার মনে প্রাণনাথের প্রতি ঘৃণা দেখা দিল। প্রাণনাথ সব রকম ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করে, সকল অপবাদ মাথায় পেতে নিয়ে শিশুটিকে মানুষ করতে লাগল। পরে একদিন প্রকাশিত হোলো যে পুষ্পার পাণিপ্রার্থী সেই দুশ্চরিত্র লোকটিই এই শিশুর পিতা—একটি অসহায় নারীর সর্বনাশের পরিণাম। পুষ্পা ও প্রাণনাথের মিলনের বাধা কেটে গেল।

গল্পটির মধ্যে কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়, কোনো সমাজ সমস্যা অথবা কোন করুণ ট্র্যাজেডীর অবতারণা করা হয় নি। গল্পটি হাল্কা সুরে বাঁধা, মাঝে মাঝে নায়ক নায়িকার বিরহ-মিলন দোলা মাধুর্য দান করছে। 'Bachelor mother ও Forty little mother" এই দুটি বিদেশী ছবির প্রভাব অনেকখানি রয়েছে, তবে এই রূপান্তর অপ্রশংসার নয়।

অভিনয়ের দিক দিয়ে প্রতিমা দাসগুপ্তাকে সর্বাগ্রে প্রশংসা জানাচ্ছি। তাঁর অভিনয়ে প্রাণ আছে—আড়ষ্টতা নেই। কিশোর সাহু মন্দ করেন নি, তবে প্রতিমার কাছে তিনি ম্লান হয়ে পড়েছেন। গানের দিক দিয়ে ছবিটি সমৃদ্ধ।

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন

বাঙলার সন্তরণ মরসুম শেষ হইয়াছে। সাঁতারুগণও অনুশীলন ত্যাগ করিয়াছেন। সকল সন্তরণ প্রতিষ্ঠানও মরসুম শেষ হওয়ায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঠিক এই সময় বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন একটি সাঁতারু দল রংপুরে বিভিন্ন সন্তরণের ও ওয়াটারপোলো খেলার কৌশল প্রদর্শন করিবার জন্য প্রেরণ করিতেছেন দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। উদ্দেশ্য রংপুরে সন্তরণ কৌশল সম্বন্ধে প্রচার করা। বর্তমান অবস্থায় এই উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইবে কি? নির্বাচিত সাঁতারুগণও কি নিজ নিজ খ্যাতি অনুযায়ী কৌশল প্রদর্শন করিতে পারিবেন? দেশব্যাপী যে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিয়াছে, তাহার মধ্যে নির্বাচিত সাঁতারুগণের সকলে কি কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে স্বীকৃত হইবেন? যদি ইঁহাদের মধ্যে অনেকে যাইতে স্বীকৃত না হন, তবে তাঁহাদের স্থানে কাহাদের লওয়া হইবে সেইরূপ কোন তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে কি? এই সকল প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা করিয়া হয়তো বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষগণ রংপুর ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা তাঁহাদের প্রকাশিত সংবাদ হইতে বুঝিতে পারা যায় না। তাঁহারা নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে জানাইতে সক্ষম হইলেন এই বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে এই সকল ভ্রমণ ব্যবস্থা মরসুমের প্রথম হইতে করিলেই ভাল হইত। কলিকাতার বিশিষ্ট সাঁতারুগণ যাঁহারা এতদিন জরুরী অবস্থার জন্য নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহারা উৎসাহ পাইতেন। কলিকাতার বাহিরের বিভিন্ন জেলার উৎসাহী সাঁতারুগণও এই সকল বিশিষ্ট সাঁতারুগণের নৈপুণ্য ও কৌশল অবলোকন করিয়া তাহা আয়ত্ত করিবার সুযোগ ও সময় পাইতেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তাহা হওয়া অসম্ভব। বিশিষ্ট সাঁতারুগণের কৌশল দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইবেন। ছয় মাস পরে যখন মরসুম আরম্ভ হইবে, তখন তাঁহারা ঐ সকল কৌশল শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবেন। কিন্তু এই ছয় মাস তাঁহারা কিরূপে কৌশলের নিখুঁত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি মনে রাখিবেন ইহাই চিন্তার বিষয়। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় ভ্রমণ ব্যবস্থা স্বার্থক হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা বন্ধ হইয়া যাক ইহাও আমাদের ইচ্ছা নহে। কারণ আমরা জানি এইরূপভাবে বিশিষ্ট সাঁতারুগণকে একত্র করিয়া বাঙলার বিভিন্ন জেলায় কৌশল প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করা ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই। এইরূপ ভ্রমণ ব্যবস্থার প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা বহুবার বহু প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু কেন জানি না তাহা পরিচালকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, অথবা তাঁহাদের ব্যবস্থা করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে নাই। সেইজন্য মনে হয় এই ব্যবস্থা যে কোন অবস্থার মধ্যে হইয়া থাকুক না কেন, ইহা বন্ধ হওয়া সমীচীন হইবে না। ইহার প্রচলন হওয়া দরকার। এই বৎসরে হয়তো আর কোন ভ্রমণ ব্যবস্থা হইবে না। কিন্তু তাহা হইলেও যখন একবার এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন প্রতি বৎসর অনুরূপ ব্যবস্থা না করিয়া পরিচালকমণ্ডলী রেহাই পাইবেন না। পরিচালকমণ্ডলীর ভ্রমণ ব্যবস্থা সময়োপযোগী না হইলেও, এইজন্যই আমাদের সমর্থন লাভ করিতেছে। ভ্রমণ ব্যবস্থার ফলে রংপুরে সন্তরণের যে উৎসাহ জাগিবে সে বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। নিম্নে রংপুর ভ্রমণকারী সাঁতারুগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইলঃ—

বীরেন বসাক। ইনি ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশনের সভ্য। ওয়াটারপোলো খেলায় গোলরক্ষকতায় ইনি বিশেষ পারদর্শী।

দিলীপ মিত্র। ইনিও ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশনের সভ্য। ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সন্তরণ ইঁহার কৌশল দর্শনযোগ্য। ওয়াটারপোলো খেলাতেও পারদর্শী।

পি মিত্র। ইনি ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশনের একজন তরুণ সভ্য। ডাইভিং, পিঠ সাঁতার ও বুক সাঁতার বিষয় ইনি কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন।

জি দে। ইনি ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশনের সভ্য। ওয়াটারপোলো খেলায় ও ডাইভিংয়ে ইনি পারদর্শী।

এস ক্ষেত্রী। ইনি সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের বিশিষ্ট সভ্য। দীর্ঘদূর সন্তরণে ইঁহার সুনাম ছিল। বর্তমানে ওয়াটারপোলো খেলায় রক্ষণ বিভাগে ইনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

শচীন নাগ। ইনি হাটখোলা সুইমিং ক্লাবের সভ্য। ইনিই গত দুই বৎসর ১০০ মিটার সন্তরণে ভারতীয় রেকর্ড করিয়াছেন। ওয়াটারপোলো খেলায় আক্রমণভাগে ইনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতেছেন।

যামিনী দাস। ইনি হাটখোলা ক্লাবের সভ্য। সন্তরণের সকল বিষয় ইনি যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। ওয়াটারপোলো খেলায় সেন্টার হাফ হিসাবে ইনি যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহা অতুলনীয়।

গোপীনাথ দে। ইনিও হাটখোলা ক্লাবের সভ্য। ডাইভিং বিষয় ইনি জ্ঞান রাখেন। ওয়াটারপোলো খেলায় গোলরক্ষকতায় ইনি অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

আশু দত্ত। ইনি বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির সভ্য। ডাইভিংয়ে ইনি বাঙলার তথা ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সন্তরণের ও ওয়াটারপোলোয় ইঁহার কৌশল দর্শনযোগ্য।

প্রফুল্ল মল্লিক। ইনি বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির সভ্য। বুক সাঁতারে ইনি এক সময় ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ওয়াটারপোলো খেলায় আক্রমণভাগে ইনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন

হরিহর ব্যানার্জি। ইনি বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির সভ্য।

বুক সাঁতারে ইনি বর্তমানে ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ২০০ মিটার বুক সাঁতারে ইনি ভারতীয় রেকর্ড করিয়াছেন।

গোরহরি দাস। ইনি বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির সভ্য। এক সময় ইনি বাঙলার বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ওয়াটারপোলো খেলায় গোলের সুযোগ ব্যর্থ হইতে দিতে ইঁহাকে খুব কমই দেখা গিয়াছে। বোম্বাই, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ইনি গোলদাতা হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বাঙলায় ইঁহার সমতুল্য ওয়াটারপোলো খেলোয়াড় বর্তমানে নাই।

দুর্গা দাস। ইনি কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবের সভ্য। এক সময় ইঁহার সমতুল্য ফ্রি স্টাইল সাঁতারু বাঙলায় বিরল ছিল। ওয়াটারপোলো খেলায় রক্ষণভাগে ইনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।

মণি চ্যাটার্জি। ইনি ভবানীপুর ক্লাবের সভ্য। পিঠ সাঁতারে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন।

বিজয় চক্রবর্তী। ইনিও ভবানীপুর ক্লাবের সভ্য। সন্তরণের বিভিন্ন বিষয় ও ওয়াটারপোলো খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।

মানু চ্যাটার্জি। ইনি তালতলা সুইমিং ক্লাবের তরুণ সভ্য। ফ্রি স্টাইল কৌশল ইনি বিশেষ আয়ত্ত করিয়াছেন।

শ্যামু চ্যাটার্জি। ইনিও তালতলা সুইমিং ক্লাবের সভ্য। ফ্রি স্টাইল, বুক সাঁতার, পিঠ সাঁতার বিষয় ইঁহার কৌশল দর্শন-যোগ্য।

রংপুর ভ্রমণের জন্য যে সকল সাঁতারুগণকে নির্বাচিত করা হইয়াছে। তাঁহাদের কৌশল দেখিয়া সাধারণ সাঁতারুগণ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিতে পারিবেন এই বিষয় আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

লুই ওকনের মুষ্টি যুদ্ধ লইয়া গণ্ডগোল

পৃথিবীর হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা জো লুইর সহিত বিলি কন আগামী ১২ই অক্টোবর নিউ ইয়র্কের ইয়াংকী স্টেডিয়ামে লড়িবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রতিযোগিতা লইয়া নানারূপ গণ্ডগোল দেখা দিয়াছে। এই গণ্ডগোলের কারণ হইয়াছে, তাঁহারা উভয়েই আমেরিকার সৈনিক বলিয়া। সমর বিভাগ এই প্রতিযোগিতা অনুমোদন করিতেছেন না। তাঁহাদের মতে সমর বিভাগের লোক পেশাদারের ন্যায় ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে সমর বিভাগের অপমান। আমেরিকার সমর পরিষদের সম্পাদক প্রচার করিয়াছেন যে, এই প্রতিযোগিতা তিনি হইতে দিবেন না।

তিনি প্রতিযোগিতা বন্ধ করিলেন। জো লুই ও কন অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উপর তিনি হুকুম-জারী করিয়াছেন, যেন তাঁহারা অনুশীলন ত্যাগ করিয়া সমর বিভাগের কার্যে লিপ্ত হয়। মিঃ মাইক জেকব যিনি এই প্রতি-যোগিতার প্রবর্তনকারী তিনি সমর পরিষদের মত পরিবর্তন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অপর দিকে জো লুই ও কন প্রচার করিতেছেন যে, তাঁহারা লড়িবেন ও কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সময় যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহার সমস্তই আমেরিকার সমর বিভাগকে প্রদান করা হইবে। এই সকল আলাপ আলোচনার ফল কি হইয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে যতদূর মনে হয় এই প্রতি-যোগিতা হইবেই। এই প্রতিযোগিতা দেখিবার জন্য দর্শক সমাগমও অধিক হইবে।

ইলিয়ট শীল্ড প্রতিযোগিতা

আই এফ এর পরিচালিত ইলিয়ট শীল্ড প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। আমরা শীল্ড বিজয়ী সম্পর্কে যে দলের নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম, ফলত তাহারাই বিজয়ী হইয়াছে। তবে ফাইন্যাল খেলাটি দুই দিন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে ক্যাম্বেল স্কুল ও সিটি কলেজ উভয়ে একটি করিয়া গোল করায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনে ক্যাম্বেল স্কুল এক গোলে বিজয়ী হয়। ক্যাম্বেল স্কুল ইতিপূর্বে কখনও এই প্রতিযোগতায় সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতেছে একমাত্র কলেজ যাহার পক্ষে এই শীল্ডটি নববার লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল। নিম্নে পূর্ববর্তী বিজয়ীগণের নাম প্রদত্ত হইলঃ—

১৮৯৪-৮ বিশপ কলেজ, ১৮৯৯ সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, ১৯০০ সি এম এস স্কুল, ১৯০১ সি ই কলেজ, ১৯০২-৩ সি এম এস স্কুল, ১৯০৪-৮ প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৯০৯-১১ স্কটীশ চার্চ কলেজ, ১৯১২ প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৯১৩ মেডি-ক্যাল কলেজ, ১৯১৪ প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৯১৫ মেডিক্যাল কলেজ, ১৯১৬-১৭ মেট্রোপলিট্যান কলেজ, ১৯১৮ কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ, ১৯১৯-২০ বিদ্যাসাগর কলেজ, ১৯২১ বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজ, ১৯২২ স্কটীশ চার্চ কলেজ, ১৯২৩ বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজ, ১৯২৪-২৫ মেডিক্যাল কলেজ, ১৯২৬ স্কটীশ চার্চ কলেজ, ১৯২৭-২৯ বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজ, ১৯৩০ প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৯৩১-৩২ সিটি কলেজ, ১৯৩৩ যাদবপুর কলেজ, ১৯৩৪ বঙ্গবাসী কলেজ, ১৯৩৫ স্কটীশ চার্চ কলেজ, ১৯৩৬ বঙ্গবাসী কলেজ, ১৯৩৭ বিদ্যাসাগর কলেজ, ১৯৩৮ রিপন কলেজ, ১৯৩৯ প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৯৪০-৪১ রিপন কলেজ।

ভারতীয় টেনিস ক্রমপর্যায় তালিকা

সম্প্রতি ভারতীয় টেনিস ক্রমপর্যায় কমিটির সম্পাদক এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতি হইতে জানা গেল এই বৎসর ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশিত হইবে না। এই ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশের অসুবিধা কোথায় সেইটা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমপর্যায় তালিকা গঠিত হয় পূর্ব বৎসরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল হইতে। আমাদের যতদূর মনে আছে, ভারতের সকল বিশিষ্ট টেনিস প্রতিযোগিতাই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ফলাফল না পাওয়ার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। টেনিস ক্রমপর্যায় গঠনকারী কমিটি কেন তালিকা প্রস্তুত করিবেন না, তাহা প্রকাশ করিলে সকলের মনে যে নানারূপ সন্দেহ জাগিতেছে, তাহা দূর হইতে পারে।

২২শে সেপ্টেম্বর

বাঙলা—ফরিদপুরের সংবাদে প্রকাশ, গত শনিবার (১৯শে সেপ্টেম্বর) ভাঙ্গা কালীবাড়ির সন্নিকটে একটি বে-আইনী শোভাযাত্রা ও সভা ছত্রভঙ্গ করিতে গিয়া ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত সাব ইন্সপেক্টর রোহিণীকুমার ঘোষ নিহত হইয়াছেন এবং দুইজন কনস্টেবল আহত হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের সংবাদে প্রকাশ, গত রাত্রে কৃষ্ণনগর রেল স্টেশনে দণ্ডায়মান দুইখানি লোক্যাল ট্রেনের ৪ খানি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বগীতে আগুন লাগে এবং সম্পূর্ণরূপে অগ্নিদগ্ধ হয়। মুন্সীগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, গত রাত্রে এক জনতা দীঘির পাড়ের পোস্ট অফিসে আগুন ধরাইয়া দেয়। বাঁকুড়ার সংবাদে প্রকাশ, পাত্রসায়ের থানার বালসী ডাকঘর ভস্মীভূত হইয়াছে।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় শ্রীযুত নিশীথনাথ কুণ্ডু এম এল এ বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। সিউড়ীর সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা রাণী চন্দ ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ২৫০, টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

উড়িষ্যা—গত ১৬ই সেপ্টেম্বর পুরী জেলায় প্রায় পাঁচ শত লোকের এক জনতা থানায় প্রবেশ করে এবং জোর করিয়া থানা দখল করিবার চেষ্টা করে। উহারা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করিয়া কয়েকজন পুলিশকে আহত করিলে পুলিশ গুলী চালনা করে। ফলে একজন নিহত ও ১১ জন আহত হয়। কটক জেলায় জনতা বহু সরকারী বাড়ি আগুনে দিয়া পোড়াইয়া দেয়।

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে স্যার মহম্মদ ওসমান জানান যে, বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে পুলিশের গুলী চালনার ফলে ৩৯০ জন নিহত ও ১০৬০ জন আহত এবং সেনাদলের গুলীতে ৩৩১ জন নিহত ও ১৫৯ জন আহত হইয়াছে। তিনি জানান যে, ২৫৮টি রেল স্টেশন ধ্বংস ও ৪০ খানি ট্রেন লাইনচ্যুত হইয়াছে

২৩শে সেপ্টেম্বর

বাঙলা—ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, ঢাকা হইতে প্রায় ১৮ মাইল দূরে নবাবগঞ্জে এক সশস্ত্র জনতার উপর পুলিশের গুলী চালনার ফলে এক ব্যক্তি নিহত ও কয়েক ব্যক্তি আহত হয়। বর্শার আঘাতে আহত হইয়া একজন কনস্টেবল মারা গিয়াছে। মুন্সীগঞ্জের খবরে প্রকাশ, এক জনতা সোমবার (২১শে সেপ্টেম্বর) টঙ্গীবাড়ি থানার বালিগাঁও পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করে। কলিকাতায় প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, যশোহর রেল স্টেশনে অগ্নি সংযোগ করা হইয়াছে।

বোম্বাই—বি বি এণ্ড সি আই রেলওয়ের চার্চগেট স্টেশনে একখানি লোক্যাল ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বোমা বিস্ফোরণ হয়।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে দেশরক্ষা পরিষদের সেক্রেটারী জানান যে, বিভিন্ন রণক্ষেত্রে মোট ২০৯৬ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত এবং ৮৫২১ জন আহত হইয়াছে। যুদ্ধে বন্দী ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা ৮৪,৮৩৩ এবং নিখোঁজের সংখ্যা ৯৮,৩৪৮ জন।

২৪শে সেপ্টেম্বর

বিহার—ভাবুয়া মহকুমার ভারাকি গ্রামে এক জনতা সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে আক্রমণ করে। ধানবাদে মাহুদার নিকটে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লাইনে এক স্থান হইতে ফিশপ্লেট অপসারিত হয়।

দেশের সাম্প্রতিক গোলযোগ দমনে পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ শোনা গিয়াছে, তৎসম্পর্কে তদন্ত করার জন্য পরিষদ কর্তৃক একটি কমিটি নিয়োগের সুপারিশ করিয়া শ্রীযুত কে সি নিয়োগী প্রস্তাব উত্থাপন করিলে অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে তৎসম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই পরিষদের বর্তমান অধিবেশন শেষ হইয়াছে।

২৫শে সেপ্টেম্বর

কুমিল্লার সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ অভয় আশ্রম এবং কান্দিরপাড় ডিসপেন্সারী দখল করিয়াছে।

বোম্বাই—দাদরে ও আমেদাবাদে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশ গুলী চালায়। আমেদাবাদে চারিবার বোমা বিস্ফোরণ হয়; ফলে একজন নিহত হয়।

২৫শে সেপ্টেবর

রাষ্ট্রীয় পরিষদে পণ্ডিত কুঞ্জরুর এক প্রশ্নের উত্তরে স্যার এলান হার্টলী জানান যে, নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে বিমানপোত হইতে জনতার উপর গুলী বর্ষণ করা হইয়াছিলঃ—(১) নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণে রাণাঘাটের নিকটে, (২) বিহার সরিফ হইতে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণে পাটনা জেলার অধীন গিরিয়াকের নিকটবর্তী রেল লাইনে, (৩) কুরসেলার প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণে ভাগলপুর জেলায় ভাগলপুর-সাহেবগঞ্জ রেল লাইনে, (৪) মুঙ্গের জেলার পাসরাহা এবং মহেশখুণ্টের মধ্যবর্তী হাজিপুর ও কাটিহার রেল লাইনে একটি রেলওয়ে হল্টে এবং (৫) তালচের স্টেটের অধীন তালচের শহরের দুই তিন মাইল দক্ষিণে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গভর্নমেণ্ট পাটের একটা ন্যায়সঙ্গত মূল্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিতে অকৃতকার্য হইয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করিয়া বিরোধী দলের পক্ষ হইতে উত্থাপিত গভর্নমেণ্টের নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব ৪৩—৯৭ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

২৬শে সেপ্টেম্বর

বাঙলা বালুরঘাটের সংবাদে প্রকাশ, তপন থানার এলাকাধীন পারিলহাটের সন্নিকটে জনতার উপর পুলিশের গুলী চালনার ফলে কয়েকজন আহত হইয়াছে। প্রকাশ, গত ২৪শে সেপ্টেম্বর বহুলোক তীর ধনুক লইয়া পারিলহাটের নিকট সমবেত হয়। জনতা পুলিশের উপর তীর নিক্ষেপ করিলে পুলিশ গুলী চালনা করে। ফলে জনতার কয়েকজন আহত হয়।

কৃষ্ণনগরের সংবাদে প্রকাশ, ডাউন কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেন পোড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল। প্রকাশ যে, গাড়িখানির একখানি প্রথম শ্রেণীর বগী গাড়ি হইতে ধূম নির্গত হইতে দেখা যায়।

বোম্বাই—থানা জেলা জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনজন পুলিশ আহত হইয়াছে। গতকল্য পুনায় ফার্গুসন কলেজ ভবনে এক বিস্ফোরণ হয়। মাতুঙ্গার জি আই পি রেলওয়ে ওয়ার্কসপে আগুন লাগে।

সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লাবক্স বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নীতির প্রতিবাদে 'খানবাহাদুর' এবং 'ও বি ই' খেতাব বর্জন করিয়াছেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর

বাঙলা—বর্দ্ধমানের সংবাদে প্রকাশ, জনতা বর্দ্ধমান শহর হইতে ৮ মাইল দূরে সাগরাইয়ে জেলা বোর্ডের ডাক বাংলো ও আশ্রয়প্রার্থীদের দুইটি চালাঘর পোড়াইয়া দিয়াছে। বর্দ্ধমান হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী ভাণ্ডারদিহির ডাকঘর ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

২৮শে সেপ্টেম্বর

বাঙলা—কাঁথির সংবাদে প্রকাশ যে, গত ২২শে সেপ্টেম্বর পুলিশ কাঁথি থানার এলাকায় কাঁথি-রামনগর রোডের ৪র্থ মাইলে এক জনতার উপর গুলী বর্ষণ করে। ফলে দুই ব্যক্তি নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। বর্দ্ধমানের সংবাদে প্রকাশ রায়না থানার

অন্তর্গত দুইটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে।

আসাম—তেজপুরের খবরে প্রকাশ, জনতা ঢেকিয়াজুলি ও সাহাপুরে থানা আক্রমণ করিলে পুলিশ গুলী চালায়। আসামে ১৫ জন পরিষদ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিহার—চম্পারণে এক জনতা জোড়শহর থানা আক্রমণ করিলে সৈন্যবাহিনী গুলী চালায়; ফলে দুইজন নিহত হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গা জেলায় এক জনতা বাহোরার দারোগাকে আক্রমণ করিলে দারোগা গুলী চালায়। ফলে বহুলোক আহত হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে মিসেস অরুণা আসফ আলী এবং শ্রীযুত যুগলকিশোর খানা এই দুইজন কংগ্রেস নেতার জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে ফেরার বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

২৯শে সেপ্টেম্বর

উড়িষ্যা—গত ২২শে সেপ্টেম্বর ভদ্রক হইতে ৮ মাইল দূরে কাটলসী নামক স্থানে ৪ হাজার লোকের এক জনতা পুলিশ দলকে আক্রমণ করে। ফলে একজন সাব ইন্সপেক্টার ও কয়েকজন কনেষ্টবল আহত হয়। হাসপাতালে তাহাদের দুইজনের মৃত্যু হইয়াছে। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর নীলগিরি রাজ্যের বহরমপুর গ্রামে ষ্টেট পুলিশের গুলী চালনায় একজন নিহত ও একজন আহত হয়।

২০শে সেপ্টেম্বর

বাঙ্গলা—বালুরঘাটের সংবাদে প্রকাশ, কয়েকজন সাঁওতাল ও রাজবংসী একটি পুলিশ দলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের বন্দুকগুলি কাড়িয়া লয় এবং পুলিশ কর্তৃক ধৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। কাঁথির সংবাদে প্রকাশ, কাঁথির নিকট গুলী চালনায় আহতদের মধ্যে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ফরিদপুরের সংবাদে প্রকাশ, ফরিদপুর হইতে ১২ মাইল দূরবর্তী বসন্তপুর রেল ষ্টেশনে গতরাত্রে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়।

২৯শে সেপ্টেম্বর

বোম্বাই—আমেদাবাদে জনতার ও ছাত্রদের মিছিলের উপর পুলিশ গুলী চালনা করে।

বাঙ্গালোরের খবরে প্রকাশ, শিকারপুর তালুকের আমিলদার ও একজন সাব ইন্সপেক্টার গ্রামবাসিগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে।

২৯শে সেপ্টেম্বর

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক ঘোষণা করেন যে, গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে গুলী চালনা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের লইয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হইবে।
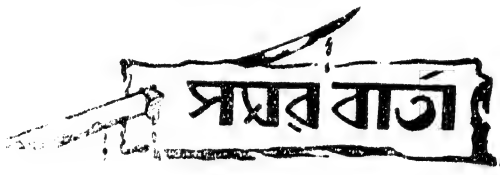
২৩শে সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, প্রত্যহ ষ্ট্যালিনগ্রাদের বাড়িগুলি কয়েকবার করিয়া হাত বদল হইতেছে। এক এলাকায় জার্মানরা কয়েকটি রাস্তা দখল করিতে সমর্থ হয়। ষ্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রতিপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করা হয়।

বৃটিশ বাহিনী মাদাগাস্কারের রাজধানী আন্টানানারিভো দখল করে।

২৪শে সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, ষ্ট্যালিনগ্রাদের রাজপথে এ পর্যন্ত যত যুদ্ধ হইয়াছে, তন্মধ্যে গতকল্য বৃহত্তম সংগ্রাম হয়। দুই শত জার্মান ট্যাঙ্ক, লরী বোঝাই কয়েক সহস্র পদাতিক সৈন্যসহ শহরে প্রবেশ করে। জার্মান গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। রাশিয়ান গার্ড বাহিনী ট্যাঙ্কধ্বংসী রাইফেল, কামান ও হাতবোমা এবং পেট্রল বোতল লইয়া সিংহ বিক্রমে যুদ্ধে রত হয় এবং জার্মানদের আক্রমণ প্রতিহত করে।

২৫শে সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন— মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, ষ্ট্যালিনগ্রাদের উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে প্রচণ্ডতম বাধা সত্ত্বেও রুশ বাহিনী অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। উহারা দুইটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ উচ্চভূমি এবং একটি জনপদ দখল করে।

২৬শে সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ সোভিয়েট সৈন্যেরা ষ্ট্যালিনগ্রাদের মধ্যে কয়েকটি বড় বাড়ি পুনরধিকার করিয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মিঃ ওয়েন্ডেল উইল্কী মস্কোতে বিদেশী সাংবাদিকদিগকে একটি লিখিত বিবৃতি দেন। উহাতে তিনি 'ইউরোপে প্রকৃত দ্বিতীয় রণাঙ্গন' এবং [illegible] উইলকি বলেন যে, ৫০ লক্ষ রুশ নিহত, আহত অথবা নিখোঁজ হইয়াছে। হিটলার-পদানত রুশ ভূখণ্ডে অন্তত ৬ কোটি রুশ দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। আগামী শীতকালে রুশ দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিবে; হয়ত তদপেক্ষা খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হইবে। জ্বালানি প্রায় পাওয়াই যাইবে না। সৈনবাহিনী ও অত্যাবশ্যক কার্যে নিয়োজিত শ্রমিকরা ছাড়া প্রায় সকলেই বস্ত্রহীন। বহু প্রয়োজনীয় ঔষধ একেবারে নাই। তথাপি কোন রুশের মনে কর্তব্য তাদের প্রশ্ন জাগে নাই। রুশগণ জয় অথবা মৃত্যু—এই দুইটির একটিকে বাছিয়া লইতেছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে বলা হয় যে, ষ্ট্যালিনগ্রাদে জার্মানরা প্রচণ্ডতম বিমানাক্রমণ চালাইতেছে। নগরের রাস্তায় রাস্তায় সংগ্রাম চলিতেছে। শহরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সংগ্রামে লালফৌজ সাফল্য লাভ করিয়াছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রচার বিভাগের প্রধান কর্তা মঃ আলেকজান্দ্রভ এক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, ষ্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্মানরা ১০ লক্ষ সৈন্য নিয়োগ করিয়াছে।

২৮শে সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, জার্মানরা ৩৫ মাইলব্যাপী সমগ্র বৃহত্তর ষ্ট্যালিনগ্রাদ বোমা ও গোলাগুলী দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করিতেছে। যুদ্ধের গতি অনিশ্চিত।

২৯শে সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, নূতন ট্যাঙ্ক এবং ৩০ হাজার পদাতিক সৈন্য লইয়া আক্রমণ চালাইয়া জার্মানরা ষ্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছে। লেনিনগ্রাদের উত্তরে সিনায়াভিনোতে সহসা প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। গতকল্য লেনিনগ্রাদের পূর্বে রুশ সৈন্যদল নেভা নদী অতিক্রম করে।
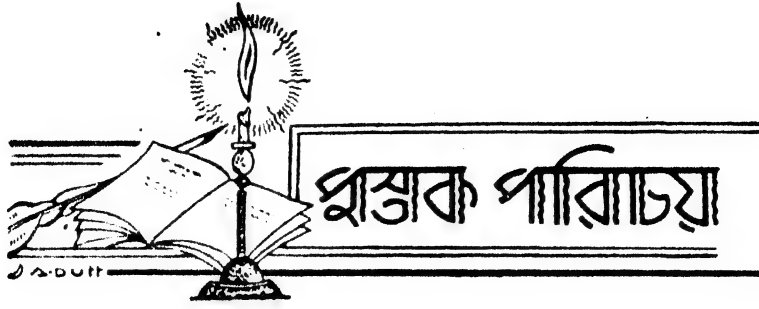
আলেখ্য :—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী; ৪২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গল্পের বই। রামপদবাবু বাঙলা সাহিত্যে প্রথিতযশা লেখক; কথা-সাহিত্যিক হিসাবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। 'আলেখ্য' তাঁহার সে যশ আরও বর্দ্ধিত করিবে। বইখানাতে দশটি গল্প আছে। সব কয়টি গল্পই আমাদের ভালো লাগিয়াছে। লেখক বাঙলা দেশের নরনারীর অন্তরের বেদনার যোগসূত্রে মানবমনের মূলীভূত সার্বভৌম সত্তার সঙ্গে পাঠকের চিত্তকে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। রসসৃষ্টির সার্থকতা এইখানে। গল্পগুলি সবই সরস ও মধুর। এমন পুস্তকের সর্বত্র সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই। ছাপা এবং বাঁধাই মনোরম। প্রকাশক বঙ্গ ভারতী গ্রন্থালয় এজন্য প্রশংসার্হ।

নাগ বংশানুচরিত :—শ্রীসুরেন্দ্রকুমার নাগ প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র রায়, ৪১নং শম্ভুবাবু লেন, ইটালি, কলিকাতা।

ঢাকার বিখ্যাত বারদীর নাগ চৌধুরী পরিবারের বংশানুচরিত। পুস্তকের পৌরাণিক পুরাবৃত্তের অংশ আমাদের নিকট অবান্তর মনে হইল। ইতিহাসের দিক হইতে এই পরিবারের পূর্বজন্ম কৃতি পুরুষগণের যেটুকু পরিচয় আমরা এই পুস্তকে পাইয়াছি, তাহা ভালো লাগিয়াছে। যাঁহারা এই বংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁহারা পুস্তখানা পাঠ করিলে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

লেনিন :—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাশ শর্মা। প্রকাশক—থিঙ্কার্স সার্কেল, ৫১।৩, সাঁড়ি লেন, কলিকাতা। মূল্য নয় আনা।

রাধশয়ের লিখিত লেনিনের জীবনীর ছায়া অবলম্বনে পুস্তকখানি লিখিত। বইখানি আমাদের ভালো লাগিয়াছে। লেনিনের প্রাণ-পরিচয় বইখানার ভিতর পাওয়া যায়। এমন মহাপ্রাণ পুরুষের জীবনী বাঙলার ঘরে ঘরে পঠিত হওয়া উচিত। লেনিনের জীবনী এমন সরস ভাষায় দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া লেখক দেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। আমরা দেশের তরুণদিগকে বইখানা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

পল্লবের চার অধ্যায় :—শ্রীগৌতম সেন, শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীপুরুষোত্তম সেন, ৩৮।ডি, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

গৌতম সেন বাঙলার আধুনিক কথাসাহিত্যে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার নিজস্ব একটি বিশিষ্ট রচনাভঙ্গী আছে। পল্লবের চার অধ্যায়ে তাঁহার এবং তাঁহার সতীর্থ শচীন্দ্রনাথ বসুর লেখার ভিতর বাঙলার কথাসাহিত্যে আধুনিকতার একটি অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙলার তরুণ-তরুণীর মনের গোপন কথা ও ব্যথা পল্লবের চারি অধ্যায়ের পৃষ্ঠাকে ছন্দোময় করিয়াছে। ভাষার সাবলীল গতি, অভিব্যক্তির ও অন্তর্দৃষ্টির বিগাঢ়তা সত্য প্রকাশে স্বচ্ছতার দীপ্ত উপন্যাসখানকে উজ্জ্বল করিয়াছে।

গোধূলির বাঁশি :—(গানের ও স্বরলিপির বই) শ্রীপ্রাণেশ দাস প্রণীত। লেখক কর্তৃক শ্রীহট্ট মির্জাজাঙ্গাল হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—আর, বি, দাস এণ্ড কোং, ৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও যতীন এণ্ড কোং, পটুয়াটুলী, ঢাকা। মূল্য এক টাকা।

এই গানের বইখানার রচয়িতা শ্রীহট্টে একজন সুকণ্ঠ বিখ্যাত গায়করূপে পরিচিত। শুধু শ্রীহট্টে নয়, ঢাকা বেতারকেন্দ্রের মারফতে প্রচারিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীত বাঙলা দেশের সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। সম্প্রতি আমরা তাঁহাকে কবি, তথা সঙ্গীত রচয়িতারূপে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। গোধূলির বাঁশিতে মোট ২০টি গান আছে। ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়া গানগুলি সুন্দর। গানের বিচার স্বরলিপি দ্বারা না করিয়াও এইমাত্র বলিতে পারি যে, সঙ্গীত ও কাব্য-পিপাসুগণের নিকট এই বইখানা সমাদৃত হইবে।

একদা নিশীথকালে :—শ্রীমনোজ বসু, প্রাপ্তিস্থান—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বইখানি মনোজবাবুর কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। ইতিপূর্বে বহু সুখপাঠ্য গল্প লিখে মনোজবাবু সাহিত্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুপরিচিত হয়েছেন। এই বইখানিতেও তাঁর সেই গল্প বলবার বিশিষ্ট সরস ভঙ্গী অব্যাহত রয়েছে। সমস্ত গল্পগুলিই বেশ সাবলীল, স্নিগ্ধ এবং রসোচ্ছল। 'অভিভাবক', 'চক্ষু চিকিৎসা', 'খাজাঞ্চি মশাই' ও 'ভাইঝি' আমাদের নিকট বিশেষভাবে উপভোগ্য মনে হোল। 'রাণীগঞ্জ বরফের দেশ' গল্পটিতে স্ত্রীর নিকট প্রতিষ্ঠা রক্ষার চেষ্টার মধ্যে স্বামী রমানাথ দত্তের চরিত্রটি যুগপৎ কৌতুক ও করুণ রস পরিবেশন করেছে। কিন্তু জীবনের সহজ এবং সরল দিকটি যেমন লেখকের চোখে পড়েছে, এর অপেক্ষাকৃত দুর্বোধ জটিল অংশটি যেন তিনি ঠিক তেমন ক'রে লক্ষ করেন নি। গল্পগুলি অনেকের কাছে নিতান্তই কিশোরপাঠ্য বলে মনে হ'তে পারে। মনোজবাবুর ভবিষ্যৎ রচনা জীবনের আরও নানা বৈচিত্র্যের উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ হবে ব'লে আমরা প্রত্যাশা করি।

জগৎ কোন্ পথে—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত। মূল্য এক টাকা চার আনা। প্রকাশক—এস কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২, নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা।

১৩৪৬ সালে যোগেশবাবু লিখিত আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ হয়; ইহার পর দ্বিতীয় সংস্করণও শেষ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি তৃতীয় সংস্করণ করিতে হইল, ইহাতে বোঝা যায় যে, পুস্তকখানি কতটা জনপ্রিয় হইয়াছে এবং ইহা হইবারও কারণ আছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থা কিশোর কিশোরীদের বুঝিবার মত সরস করিয়া উপস্থিত করিবার অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় যোগেশবাবুর আলোচ্য গ্রন্থখানাতে পাওয়া যায়। ইহার উপর বহু চিত্রের সন্নিবেশে পুস্তকখানা সমধিক আকর্ষণীয় করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানা ভালো করিয়া পড়িলেই ছেলেমেয়েদের মনে বর্তমান জগতের অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে এবং তাহারা যে হাতে পাইলে এমন বই গরজ করিয়া পড়িবে, শুধু পড়িবেই নয়—পড়িয়াও ছাড়িতে পারিবে না, একথা আমরা বলিতে পারি। এমন পুস্তকের বহুল প্রচার সর্বতোভাবেই বাঞ্ছনীয়। এমন দুর্মূল্যের দিনেও ছাপা, বাঁধাই এবং কাগজ—সকল দিক হইতে সুন্দর। ২১০ পৃষ্ঠা পূর্ণ পুস্তকের মূল্য সুলভই রাখা হইয়াছে বলিতে হইবে।

৯ম বর্ষ] শনিবার, ২৩শে আশ্বিন, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 10th October, 1942 [৪৮শ সংখ্যা

গান্ধী জয়ন্তী

গত ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জীবন ৭৩ বৎসরের সীমা অতিক্রম করিয়া ৭৪তম বর্ষে অগ্রসর হইল। এই বয়সে মানুষ কর্মজীবনের সমস্ত ন্যস্ত করিয়া বিশ্রাম সুখের সন্ধান করে এবং বিশেষভাবে এদেশের মানুষ কর্মক্লেশহীন ধর্ম-জীবনের নির্লিপ্ততার আশ্রয় লয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর জীবন অনন্যসাধারণ। তিনি অতিমানব। প্রথম জীবন হইতে তিনি ত্যাগ এবং দুঃখ বরণের পথে দেশসেবার যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ অশীতিবর্ষের সন্নিকটে আসিয়াও বিরামহীনভাবে তাঁহার সেই সাধনা চলিতেছে। সে গতিতে মন্থরতা তো কিছুমাত্র আসেই নাই, বরং উত্তরোত্তর বিবর্ধিত বেগে তাহা জাতির যুগাগত যত জীর্ণতা এবং দীনতাকে ধৌত করিয়া লক্ষ্যের অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। এ জাতির মধ্যে এমন জীবনের তুলনা মিলে না। সমগ্র জগতেও সকল দিক হইতে এমন অনন্যসাধারণ মানব-জীবনের তুলনা বিরল। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-ব্রত, তাঁহার অটল সত্যনিষ্ঠা, অক্ষুণ্ণ পবিত্রতা এবং উদার মানবপ্রেম পৃথিবীর সর্বত্র তাঁহাকে মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং বুদ্ধ ও খৃস্টের সহিত তাঁহাকে একত্র আসন দিয়াছে। কিন্তু গান্ধীজীর দীপ্ত স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতার সাধনায় তাঁহার সঙ্কল্পনিষ্ঠার অত্যুজ্জ্বল আদর্শই আমাদিগকে সমধিক বিস্মিত করে। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে কর্মময় সাধনার শৌর্যময় যে সমন্বয় আমরা তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষ করি, তাহার জ্যোতিতে আমাদিগের চিত্ত উদ্দীপ্ত হয় এবং তাঁহার নিকট আমাদের মস্তক শ্রদ্ধায় আনত হয়। মহাত্মাজী আজ কারারুদ্ধ। কিন্তু জাতির এমন সঙ্কটকালে তাঁহার ন্যায় মহামানবকে এই অবরুদ্ধ জীবন যাপন করিতে হইতেছে, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য; কেবল আমাদেরই দুর্ভাগ্য নয়, যাঁহারা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও

নিজে বন্ধন-মুক্তির অতীত। আদর্শের অপ্রতিহত প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত এই মহামানবের চরণে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

আমেরীর ওকালতি

ভারতের দাবীর স্বপক্ষে মার্কিন দেশের জনমতের কিছু চাপ আসিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের উপর পড়িবার আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। ভারতসচিব আমেরী সাহেব এই আতঙ্ক এড়াইবার জন্য সেদিন বিলাতের ক্যাক্সটন হলে ভারতের রাজনীতিক, ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকা অবলম্বন করিয়া এক বড় বক্তৃতা দিয়াছেন। কংগ্রেসের দাবী যে অনিষ্টকর, এই কথা তিনি মুখবন্ধেই বলিয়া লইয়াছেন এবং এই কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, নিজেদের দলের স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করাই হইল কংগ্রেসীদের প্রধান মতলব। তাঁহার এই উক্তিতে সত্যের কত বড় নির্লজ্জ অপলাপ রহিয়াছে, সকলেই জানেন। সকলেই অবগত আছেন যে, কংগ্রেস নিজেদের দলের প্রতিষ্ঠা চাহে নাই। মুসলিম লীগের হাতে যদি ভারতের শাসনাধিকার ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহাতেও কংগ্রেসের আপত্তি নাই। কংগ্রেস সে কথা স্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছে; কিন্তু ভেদ-বৈষম্যের ধারাটা জিয়াইয়া না রাখিলে যে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত স্বার্থ সিদ্ধ হয় না; তাই ভারতের অনুগত দলবিশেষকে উৎসাহিত করিবার জন্যই ভারতসচিবের এই চাল। ইহা ছাড়া, আমেরী সাহেবের আলোচ্য বক্তৃতার মধ্যে আর একটা সূক্ষ্ম চাল রহিয়াছে। সে চালটা প্রধানত মার্কিন জনমতকে উদ্দেশ্য করিয়াই সম্ভবত প্রযুক্ত হইয়াছে। আমেরী সাহেব দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ভারতে ব্রিটিশ-শাসন একটা বাহিরের বস্তু নয়, উহা ব্রিটিশ নেতৃত্বে এবং ব্রিটিশ আদর্শে প্রবর্তিত হইলেও ভারতেরই নিজস্ব বস্তু।

প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, কেবল ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবার কালের জন্য নয়, চিরকালের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ছত্রছায়াতলে অবস্থান করাই ভারতবাসীদের পক্ষে কল্যাণকর। যাহারা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে, আমেরী সাহেবের মতে তাহারা ভারতের স্বার্থহানি করিতেই উদ্যত হইয়াছে। এই অবসরে ভারতসচিব মহোদয় বিশ্বজনীন আদর্শের দিক হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির তত্ত্ব বিশ্লেষণে ও প্রচুর রাজনীতিক এবং দার্শনিক পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভাই ভাই গলাগলি ধরিয়া এই সাম্রাজ্যের সন্তানমণ্ডলী মিলন-মন্দিরের অভিমুখে কি ভাবে জয়গান গাহিয়া চলিয়াছে, মামুলী সেই সব যুক্তিও তিনি এক্ষেত্রে নূতন করিয়া আওড়াইতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমেরী সাহেবের এই সব কথা আমাদের কাছে এত পুরানো হইয়া গিয়াছে যে, আমরা সেগুলির উত্তর দেওয়া দরকার বোধ করি না; শুধু তাঁহাকে এই কথাটা শুনাইয়া দিতে চাই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহিমা আমাদের উপলব্ধি করিতে বাকি কিছুই নাই। সে প্রেমের পাথারে দীর্ঘ দিন হইতেই আমরা হাবুডুবু খাইতেছি। কিসে ভারতের স্বার্থ বেশী, তাহা বুঝিবার লোক ভারতবর্ষে যথেষ্টই আছে, সেজন্য ভারতবাসীরা আমেরী সাহেবের দ্বারস্থ হইতে চাহে না। স্বাধীনতার জন্য ভারতের যে দাবী, তাহা সর্বজনীন দাবী এবং সে দাবী পূর্ণ স্বাধীনতারই দাবী। আমেরী সাহেবের ওকালতি ভারতের সে দাবীর সংকল্পশীলতাকে শিথিল করিতে সমর্থ হইবে না।

শোক সংবাদ—

'রয়টার' ও এসোসিয়েটেড প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ কুমুদিনী-মোহন নিয়োগী মহাশয় গত ২৯শে সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। নিয়োগী মহাশয় কিছুদিন হইল ব্লাডপ্রেসারে পীড়িত হন। সম্প্রতি তিনি ছুটিতে ছিলেন। সাংবাদিক জীবনে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। রিপোর্টারের কার্য হইতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে তিনি সাংবাদিক জীবনের শীর্ষস্থানীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার পরলোকগমনে বাঙলা দেশে এখন প্রবীণ সাংবাদিকের অভাব ঘটিল। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন। আমরা তাঁহার বিধবা সহধর্মিণী ও পরিজনবর্গের গভীর শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পূজার বাজারের অবস্থা—

চিনির সমস্যার কিছু সমাধান হইয়াছে দেখা যাইতেছে। বাঙলা সরকার কলিকাতা শহরে একশত দোকানে চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইসব দোকানে ছয় আনা সের দরে চিনি পাওয়া যাইবে এবং প্রত্যেক ক্রেতা দৈনিক আধ সের করিয়া চিনি লইতে পারিবেন। এইরূপ দোকানের সংখ্যা আরও বাড়ান হইবে বলিয়া আশ্বাস দান করা হইয়াছে। জনসাধারণের চিনির অভাবটা যে এইভাবে কিছু পরিমাণে মিটাইতে সমর্থ হইয়াছেন, এজন্য বাঙলা সরকারের নবপ্রতিষ্ঠিত সিভিল সাপ্লাই বিভাগকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি: কিন্তু এক চিনি ছাড়া পূজার বাজারে অন্য সব দিক হইতেই অন্ধকারাচ্ছন্ন। চাউলের দর আপাতত কমিবার কোন আশাই নাই। আলু বাঙালীর একটি প্রধান খাদ্য; কিন্তু আলুর মণ বর্তমানে ২০ টাকারও উপরে। বাঙলা সরকার বীজ আলু কিনিয়া পুনরায় উহা কৃষকদের কাছে বিক্রয় করিবার জন্য পনের লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন; সুতরাং সেই বীজে আলু ফলিবে, তবে দর কিছু কমিতে পারে। আপাতত কমিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কৃষিমন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশ হইতে আলু আসিত; এখন উহা আর পাওয়া যায় না। তারপর যানবাহনের অসুবিধার জন্য অন্য স্থান হইতে আলু আমদানী করার সুবিধা হইতেছে না। লবণের দর কর্তৃপক্ষের মতে এমন কিছু বেশী চড়ে নাই; কিন্তু আমাদের মতে যথেষ্টই চড়িয়াছে; আর যদি না চড়ে, তবেও রক্ষা। পূজার বাজারে বস্ত্র সমস্যাই হইল প্রধান সমস্যা। স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের আশায় দেশের লোকে দিন গণিতেছিলেন; কিন্তু বাঙলার কৃষিমন্ত্রী সে আশায় একেবারে নিরাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, পূজার আগে সে বস্ত্র বাঙলার বাজারে আমদানী করা যাইবে না। স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে বাঙলা দেশের যে পরিমাণ চাহিদা, তাহা মিটাইতে গেলে মোট মালের শতকরা ৯০ ভাগই নিঃশেষ হইবে; সুতরাং অতি লোভের ফলে সবই নষ্ট হইয়াছে। ভারত সরকার যাহাতে তাঁহাদের অসুবিধা দূর করিয়া বাঙলা দেশকে ঐ কাপড় জোগাইতে পারেন, সেজন্য বাঙলা সরকার অনুরোধ করিবেন; সুতরাং "দিল্লী এখনও বহু দূরে।"

ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতি

স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় সম্প্রতি দেরাদুনের রোটারি ক্লাবে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলগত ঐক্যের সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্যার যদুনাথের মতে প্রধানত তিনটি উপাদান জাতির সংহতির মূলীভূত কারণস্বরূপে নির্ণীত হইয়া থাকে—(১) ভৌগলিক অবস্থান, (২) ঐতিহাসিক, এবং (৩) সংস্কৃতিগত কারণ। ইহাদেরই পূর্ণতা রাজনীতিক জাতীয়তায় বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্যার যদুনাথ ভৌগলিক, ঐতিহাসিক এবং সংস্কৃতিগত কারণসমূহের পর্যালোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ভারতবাসীদের মধ্যে ধর্ম এবং বর্ণগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটা ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কবীর, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি ধর্মপ্রবর্তকগণ হিন্দু এবং মুসলমান-নির্বিশেষে এদেশের লোককে সংস্কৃতিগত একটা ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই সব মহাপুরুষের প্রভাবে বিভিন্ন ধর্মের গণ্ডিবদ্ধ গোঁড়ামী ভাঙিয়া ভারতীয় একটি বিশিষ্ট ভাবধারা এদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং জাতিকে ঐক্যের পথে লইয়া গিয়াছে। স্যার হার্বার্ট রিজলীর ন্যায় ভারতবাসীদের জাতীয়তার দাবীর বিরোধী ব্যক্তিকেও সেকথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন, ভারত-বাসীদের মধ্যে নানা দিক হইতে বৈষম্য রহিয়াছে, তথাপি হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত প্রসারিত এই বিরাট দেশের জনগণের মধ্যে চরিত্রগত একটি [illegible]

বৈশিষ্ট্য যে গড়িয়া গিয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। উপসংহারে স্যার যদুনাথ বলিয়াছেন, ঐক্যের এইসব উল্লেখযোগ্য উপাদান কতদিনে রাজনীতিক ঐক্যে প্রকাশপ্রাপ্ত হইবে, তাহা ভগবানের উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের মতে স্যার যদুনাথ এই ক্ষেত্রে একটু অবিচার করিয়াছেন। বেচারা ভগবানের উপর এ সম্বন্ধে দায়িত্ব চাপাইয়া কোন লাভ নাই এবং তাহ উচিতও নয়। তাঁহার দিক হইতে এদিকে চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের দোহাই দিয়া মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা রাজনীতিক ক্ষেত্রে যাঁহারা নিজেদের স্বার্থের জন্য উস্কাইয়া তুলিতেছেন, ভারতের শাসন ব্যাপারে সেই তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের ক্ষমতাই এজন্য দায়ী এবং সে ক্ষমতা যতদিন অপসৃত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত ভারতে রাজনীতিক ঐক্যের পূর্ণ বিকাশের পথে প্রতিকূলতারও ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

পার্লামেন্টে ভারত-কথা

ভারতীয় শাসন সংস্কারবিধি সংশোধনের জন্য পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। এই সংশোধনের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করাতে যে কয়েকটি প্রদেশে শাসনতন্ত্র প্রত্যাহৃত হইয়াছে, সেই কয়েকটি প্রদেশে যুদ্ধ শেষ হইবার তারিখ হইতে আরও এক বৎসরকাল পর্যন্ত বর্তমান অবস্থা বহাল রাখা। ইহা ছাড়া এই কয়েকটি অপ্রধান উদ্দেশ্যও থাকিবে—(১) জরুরী আদালতের বিচারে কাহারও মৃত্যুদণ্ড হইলে এবং তাহা হাইকোর্ট বা সেই কোর্টের কোন জজের দ্বারা সমর্থিত হইলে প্রিভি কাউন্সিলে আর আপীল চলিবে না। (২) বেতনভুক সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য হইবার পক্ষে অতঃপর কোন বাধা থাকিবে না। (৩) ব্রহ্ম গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে ব্রহ্ম শাসন আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। দেখা যাইতেছে, ভারতের বর্তমান রাজনীতিক সমস্যা সমাধানের প্রকৃত কোন প্রয়াস এই প্রস্তাবের মধ্যে নাই। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের যদি ইচ্ছা থাকিত, তবে এই সুযোগে তদুপযোগী শাসনবিধির সংস্কার সাধন তাঁহারা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্ষেত্রে শাসনবিধি সংস্কারে কোন অসুবিধা থাকে না; অথচ ভারতের দাবীর দিক হইতে শাসন সংস্কারের কথা তুলিলেই তাঁহাদের মুখে বাঁধা বুলি আছে যে, যুদ্ধকালীন এই অবস্থার মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নীতি বুঝিতে বিলম্ব ঘটে না। ভারতবাসীদের হাতে তাঁহারা প্রকৃত কোন অধিকার ছাড়িয়া দিবেন না, ইহাই হইল তাঁহাদের নীতি এবং অধিকার ছাড়িয়া দিতে হয়, এমন কোন আপোষ-প্রস্তাবের তাঁহারা প্রতিকূলতাই যে করিবেন, ভারতসচিব সেদিন পার্লামেণ্টে স্পষ্টভাবেই তাহা বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে ঐক্যমত হইয়াও যদি কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহেন, তাঁহারা তেমন অনুমতি দিবেন না। শাসন-পরিষদের সদস্য স্যার সুলতান আহাম্মদ ব্যবস্থা-পরিষদে বক্তৃতার মুখে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, ভারতের বিভিন্ন দলের মধ্যে যদি ঐক্য ঘটে, তবে সে ক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীদের দাবী অস্বীকার করিতে সমর্থ হইবেন না। ভারতসচিব অনুগতজনের সে উক্তি সংশোধন করিয়াছেন, ভারতসচিবের এতৎসম্পর্কিত উক্তির মধ্যে স্যার সুলতান আহাম্মদের প্রতি সোজাসুজি ভর্ৎসনা না থাকিলেও সে ভাব বেশ একটু আছে। ভারতসচিব বলেন, স্যার সুলতান মীমাংসার সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যাহা আশা করিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতে তাহা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না, তবু একথা বলিয়া দেওয়া ভাল যে, ভারতশাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব যাহাতে অস্বীকৃত হয়, ভারতবাসীদের পক্ষ হইতে এমন কোন দাবীই বর্তমানে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সমর্থন করিবেন না। ভারতসচিবের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের মধ্যে ঐক্যের প্রশ্নও এক্ষেত্রে তাঁহাদের পক্ষে অবান্তর। ভারতবাসীদের হাতে তাঁহারা ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবেন না, ইহাই তাঁহাদের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত। ইহা সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে, স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের কয়েকজন সদস্য পার্লামেণ্টে ভারত সম্পর্কিত এই আলোচনার অবসরে ভারতীয় স্বাধীনতার দাবী পার্লামেণ্টে উপস্থিত করিবার জন্য নোটিশ দিয়াছেন। ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে সেদিন লণ্ডনে যে জনসভা হইয়াছে, সেই সভাতেও ঐ দাবী করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, লর্ড মার্লে, লর্ড ট্রাবোলগী প্রভৃতি পার্লামেণ্টের কতিপয় বিশিষ্ট সদস্য এবং অধ্যাপক হেরল্ড লাস্কি, মিঃ সি ই জোয়াদ, জুলিয়ান হাক্সলী, মিঃ সি এইচ রেলী প্রভৃতি মনীষীগণের একটি বিবৃতিতেও ভারতের জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী সমর্থন করা হইয়াছে। ভারতবাসীদের প্রতি ঔদার্যবুদ্ধিই যে এইসব ব্রিটিশ পুরুষকে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য আজ এমন উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে, আমরা ইহা মনে করি না। ব্রিটিশ জাতির বৃহত্তর স্বার্থই ইহার সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বর্তমান কর্ণধারগণ সে সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন কি? অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের সে সম্বন্ধে যথেষ্টই সন্দেহ রহিয়াছে।

পরিষদে তাণ্ডব

সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্যার নাজিমুদ্দীন ও মিঃ সুরাবর্দীর নেতৃত্বে বিরোধী দলের এক তাণ্ডবলীলার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। কোয়ালিশন দলের পক্ষ হইতে মিঃ বদরুদ্দোজা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কিত একটি প্রস্তাবের এই মর্মে একটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে, 'জনসাধারণের আন্তরিক এবং সক্রিয় সহযোগিতার দ্বারা ভারতের রক্ষা-ব্যবস্থা যাহাতে প্রকৃতরূপে শক্তিশালী হইতে পারে, তজ্জন্য বর্তমান অচল অবস্থার অবিলম্বে অবসান করা উচিত এবং ভারতের সর্বশ্রেণীর জনগণের সন্তোষজনক উপায়ে ভারতবাসীদের হাতে দেশ শাসনের পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর করা কর্তব্য।' বদরুদ্দোজা সাহেবের এই সংশোধন প্রস্তাবে লীগওয়ালাদের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠে। উঠিবারই তো কথা। প্রথমত, এই প্রস্তাবে দেশের লোকের হাতে দেশ শাসনের সর্ববিধ ক্ষমতা হস্তান্তর

করিতে বলা হইয়াছে; কিন্তু শুধু তাহাই নয়, ভারতের সর্ব-শ্রেণীর জনগণের সন্তোষজনক উপায়ে সেই ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার দাবী ইহাতে রহিয়াছে। এই প্রস্তাব যদি প্রতিপালিত হয়, অর্থাৎ ভারতের সর্বশ্রেণীর জনগণের পক্ষে সন্তোষজনক ঐক্যের একটা ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে লীগের পাকিস্থানী আদর্শই যে পণ্ড হয়। সর্বশ্রেণীর জনগণের সন্তোষ সাধনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করা তো পরোক্ষভাবে ভারতের অখণ্ড জাতীয়তাকেই স্বীকার করা। ভেদ বজায় রাখিতে হইবে, অনৈক্য অটুট রাখিতে হইবে, না হইলে লীগের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় কিসে এবং নাজিমুদ্দীন-সুরাবর্দী দলের যে বৃহত্তর প্রয়োজন, ভেদ-বৈষম্যকে জাগাইয়া নিজেদের প্রভুত্ব বাঙলা দেশের শাসনকেন্দ্রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা, তাহাও যে পণ্ড হইয়া যায়। সে দায় হইল বড় দায়। হীন স্বার্থের এই দায়ের কাছে লীগ দলের ভদ্রতা এবং শিষ্টাচার-জ্ঞান তুচ্ছ হইয়াছে। তাঁহারা গুণ্ডামির কলঙ্কও বরণ করিয়া লইয়া তাঁহাদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ঝুঁকিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের এই উত্তেজনা বাঙলার মুসলমানদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না।

রুশিয়ায় মিত্রশক্তির সাহায্য

কিছুদিন পূর্বে রুশিয়াকে সাহায্য করিবার জন্য ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মার্কিন জাতির প্রতিনিধিস্বরূপে মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কী যে উক্তি করেন, ইংলণ্ডের সহকারী প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলি তাহাতে উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তিনি বলেন, সমরনীতির সম্বন্ধে যাহাদের বর্ণজ্ঞান নাই এবং যাহারা শত্রুর কথাতেই নাচে, তাহারাই এই ধরণের সব কথা বলিয়া থাকে। সম্প্রতি স্বয়ং স্ট্যালিন মার্কিন সংবাদপত্রের জনৈক প্রতিনিধির নিকট যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতেও কিন্তু মিঃ উইল্কীর সেই উক্তিই সমর্থিত হইতেছে। রুশিয়ার সাহায্যের জন্য মিত্রশক্তি যাহা করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে

শারদীয়া সংখ্যা 'দেশ'

...দেশ পত্রিকার আগামী সংখ্যা শারদীয়া সংখ্যা-রূপে অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। পূর্বানুসৃত প্রথানুযায়ী পরবর্তী সপ্তাহে 'দেশ' প্রকাশ বন্ধ থাকিবে। ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে ৩১শে অক্টোবর, ১৪ই কার্তিক।

সম্পাদক—'দেশ'

স্ট্যালিন বলেন, জার্মান বাহিনীর আক্রমণের যতটা ঝুঁকি নিজেদের ঘাড়ে লইয়া রুশিয়া মিত্রশক্তিবর্গকে সাহায্য করিতেছে, তাহার তুলনায় মিত্রশক্তির সাহায্যের পরিমাণ খুবই সামান্য। স্ট্যালিন আরও বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা রুশিয়া সর্বপ্রধান বলিয়া মনে করে। স্ট্যালিন নিশ্চয়ই শত্রুর কথায় নাচিবার মত লোক নহেন এবং রণনীতির সম্বন্ধে তাঁহার বিচক্ষণতা ইতিমধ্যেই পর্যাপ্ত-রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার এই উক্তির পর এটলি সাহেব কি বলিবেন জানি না। 'দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকদের দাবীতে মিত্রশক্তির সমর-পরিকল্পনা পরিবর্তিত হইতে পারে না', মিত্র-শক্তির সমরনীতির সম্বন্ধে স্ট্যালিনের সুস্পষ্ট উক্তির পরে এটলীর ঐ উক্তির যৌক্তিকতা আর থাকে না। রুশিয়া আজ সর্বস্ব পণ করিয়া সংগ্রাম করিতেছে। স্ট্যালিনগ্রাদ রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে রুশ পক্ষের শৌর্য, বীর্য সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছে। এ সংগ্রাম ইতিহাসে অপূর্ব বলা চলে। রুশিয়ার এই বিপদকালে রুশিয়াকে সাহায্য করিবার জন্য মিত্রশক্তির সমধিক উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক। তাঁহারা রুশিয়াকে যে সাহায্য করিতেছেন, তাহা যথেষ্ট নহে।

প্রাত্যহিক

বিজন ভট্টাচার্য্য
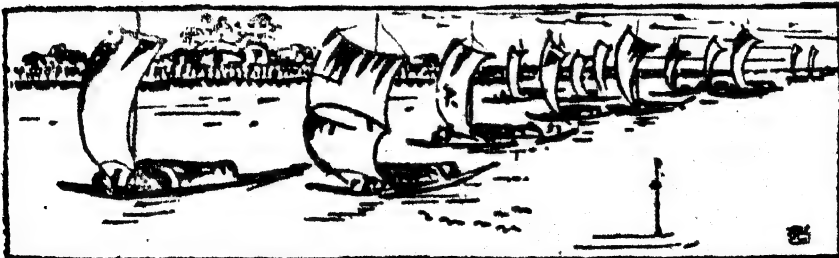
শুভ প্রাতঃকাল। অন্ধকারের পর আলোকের শুভাগমন। নিষ্ক্রিয় নিষুপ্ত পৃথিবীতে কর্তব্যের সুইচ টিপিয়া দিকে দিকে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত হইবার ব্যাপক সঙ্কেত।

তবু আর দশ মিনিট। মাথার বালিসটা ঠিক করিয়া পাশ বালিসটা বুকের ভিতর আঁকড়াইয়া ধরি। আধো ঘুম আধো জাগরণ বেশ লাগে। তন্দ্রার ঘোরে শুনি কলতলায় ছর ছর শব্দে জল পড়িতেছে। এমন কেহ নাই যে চৌবাচ্চার নলটা কলের মুখে লাগাইয়া দেয়। পরে স্নানের সময় আবার এই জল লইয়াই খণ্ড যুদ্ধের অবতারণা হইবে। রোজই হয় অথচ রোজই জল এইরকম নিরর্থকভাবে অপচয় হইয়া যায়। কেহ বলিবার বা দেখিবার নাই। ব্যস্ এইটুকুই। তারপরই বিস্মৃতি।

মনের চোখে ভাসিয়া ওঠে কলিম্পং টু গ্যাংটক মোটার রুট। পথে সিংতামের একটি রেস্তোরাঁয় বসিয়া আমি আর বিধুবাবু আলুর দম সহযোগে গরম গরম তন্দুরী খাইতেছি। তারপর হঠাৎ দেখি সিংতামের হোটেলও নয় তন্দুরীও নয়। একদম সানিভিলা। ইভার জন্মদিনে এক গাদা সুদৃশ্য মেয়ের মাঝখানে বসিয়া মহানন্দে স্যাণ্ডউইচ খাইতেছি। ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালার মিঠে বোলের সঙ্গে দেয়াসুলো এটিকেট দোরস্ত পাগঙ্ক-শুভ্র তরুণীদের খিল খিল হাসির জলতরঙ্গ বাজিতেছে। শাসন করা সত্ত্বেও বসন মানিতেছে না। সযত্নে অযত্ন বিন্যস্ত স্বর্ণাঞ্চল থাকিয়া থাকিয়া খসিয়া পড়িতেছে। ইভা হাঁসের মত আড়চোখে আমার দিকে তাকাইয়া কি যেন বলিতে যাইবে এমন সময় হঠাৎ ফট ফট ফট ফট হুস্—স—স—স..হোস পাইপের শব্দ। রাস্তায় জল দিতেছে। নিকুচি করিয়াছে কর্পোরেশনের জনস্বাস্থ্য বিভাগের। ঝাড়ু মার। মনে পড়িল ভাগ্যচক্রে কানা-কেষ্টর গান—স্বপন যদি মধুর এমন হোক সে মিছে...। হাসিয়া

ফাল্গুনের শেষাশেষি হইলেও ভোরের দিকে এখনও একটু শীত শীত করে। জানি পায়ের কাছেই আছে চাদরটা ভাঁজ করা। কষ্ট করিয়া একটু টানিয়া লইবার উৎসাহ চাই মাত্র।

জরিয়া হইয়া। হরেবংশী আমার টুঁটি চাপিয়া ধরিল

কিন্তু তবু মন সরিল না, পাছে ঘুমঘোর চটিয়া যায়। অগত্যা কোঁচার খুঁটটাই অতি কষ্টে গায়ে টানিয়া দিলাম।

পাখী ডাকিতেছে। অবশ্য শ্যামা দোয়েল টোয়েল না,—পাতিকাক। গলাটা একটু কর্কশ। তা হোক। তবু পাখী তো! আর তাই বা কেন। কাক যদি কা কা ভুলিয়া কুহু কুহুই ডাকিত তবে সেইটাই কি খুব সুখের হইত! কি জানি। হয় তো হইত। কিন্তু তবু ওর সেই চেরাগলার প্রগল্ভ বাচালতা, লাগুক না তা অন্য কাহারো কানে বিষ, আমার রসবোধের পর্দায় এমন অপূর্ব সুরসঙ্গতি ঘটাইত যে আমি মুগ্ধ হইয়া যাইতাম।

তবু শুইয়াই রহিলাম। এই উঠি আর কি! আবার

পৃথিবীর কর্মকোলাহলে তন্দ্রার আমেজ তখন ছুটিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ সচকিত হইলাম। নীচতলায় হরবংশীবাবুর সঙ্গে আবার যেন কাহার বিবাদ বাধিয়াছে।

—আপনি কথা দিয়েছিলেন কিনা বলুন।

—কি কথা!

—যে মঙ্গলবার সকালে আপনি টাকা দেবেন।

—হ্যাঁ দিয়েছিলাম। তা ব'লে তুমি কি ভেবেছো যে আমি আমার কথা ঘুরিয়ে নেব! মিথ্যে কথা বলবো! বলবো দিই নি কথা!

—কথা দিয়েছিলেন তো কথা রাখুন! টাকা দিন!

—তা কথা দিয়েছিলাম রাখতে পারলাম না। কি করবো!

—কি করবো মানে! কথার একটা দাম নেই!

—আরে রাখুন মশাই! আমারিই ভারী দাম আছে তার আবার আমার কথার!

—এসব কথা বুঝি নে। আপনি আমার টাকা দেবেন কি না বলুন!

—কি আপনি খামখা বাজে কতকগুলো বকছেন। কথা দিলেই যে কথা রাখতে হবে এমন কি কোন কথা ছিল! পঞ্চাশবার ধরে বলছি দিছলাম কথা রাখতে পারলাম না। এখন তার আমি করবো কি! ভারী একেবারে কথার দাম নিতে এসেছেন। নিজেই বড় রাখেন কি না। হুঃ, কথা দিয়েছিলেন আর কথা দিয়েছিলেন। আরে দিয়েছিলেন রাখতে পারলেন না, এই সোজা বুঝটা কিছুতেই আসছে না? এর ভেতর কারচুপি তো কিছুটি নেই। সকাল বেলা ভদ্দরলোকের পাড়ায় খামখা চেঁচামিচি।

শুইয়া শুইয়া হরবংশীবাবুর সওয়ালের তারিফ না করিয়া পারিলাম না। কিন্তু বিতন্ডার প্রকোপ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল; সুতরাং মধ্যস্থতা করিয়া আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া দিবার আগ্রহে, কর্তব্যজ্ঞানে নয়, উঠিয়া গেলাম।

দেখিলাম পাওনাদারের নাকের উপর তর্জনী তুলিয় হরবংশীবাবু খবরদারী করিয়া বলিতেছেন, দিন একদিন আমরাও ছিল, জানলেন! Once born with a silver spoon in my mouth—এ গালগল্প নয় মশাই, রীতিমত ফ্যাক্ট। এরকম দু দশ টাকা, হুঃ, হরবংশী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া বলিলেন, কোন্‌দিক দিয়ে যে বেরিয়ে গেছে খেয়ালই হয় নি! আর আজ মাত্তর দশটা টাকার জন্যে আপনি এসেছেন আমার......।

—আহা তা দিয়ে দিলেই তো ন্যাটা চুকে যায়। দু বছর ধরে ঘোরাবার দরকার ছিল কি! মুখে ও-রকম রাজা উজীর সবাই......।

এই, মুখ সামলে—বলে দিচ্ছি: হরবংশী রুখিয়া ঘুরিয়া দাঁড়ান।

পাওনাদারের আস্তিনটা চকিতে হাতের উপর লাফাইয়া ওঠে। বলে, আচ্ছা টাকা আমি আদায় করতে পারি কি না একবার দেখে নিচ্ছি।

হরবংশী যেন আমাকে দেখিয়াও দেখিলেন না। পিছন ফিরিয়া পাওনাদারের সামনাসামনি একটা মুখবোমা ছুঁড়িয়া মারিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা! সব সম্বন্ধীই দেখলে এখন তুমিই যা বাকী আছো।

পাওনাদার ঘাড় ফুলাইয়া রুখিয়া উঠিল, এই—মুখ খারাপ করবে না বলে দিচ্ছি। শালা নেমকহারাম!

গাছকোমর কাপড় বাঁধিয়া পিছনেই দাঁড়াইয়াছিলেন কৃষ্ণভামিনী—হরবংশীর আমরণ সহযাত্রী। আগুন তাহার সাক্ষী আছে। সকড়ি হাত, অনবগুন্ঠিতা। মাথার মাঝখানে গোলা সিন্দুরের কাঁচা সড়ক শারীরিক ও মানসিক উত্তাপে গলিয়া গলিয়া নিম্নপ্রবাহী।

পাশের একখানা আধলা ইট কুড়াইয়া লইয়া পাওনাদার হিংস্র হুংকার ছাড়িল, আজ শালা তোমার একদিন কি আমার একদিন।

একদম মরিয়া হইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণভাবিনী আর পারিলেন না। দুই উরু চাপড়াইয়া আসন্ন সর্বনাশের আতঙ্কে তুড়ি লাফ মারিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, ওগো তোমরা, গেল সব আমার—ঠেকাও।

পাওনাদার চরমপত্র দিল, আর এক পা এগিয়েছো কি ঝেড়ে দেবো বলছি।

হরবংশীরও খুন চাপিয়া গিয়াছে। ঝটকা মারিয়া কৃষ্ণভামিনীর দৃঢ়মুষ্টি হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া লইয়া তিনিও সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন, ঝাড় না দেখি মুরোদখানা একবার!

অন ওথ, ঠিক ঝেড়ে দেবো বলছি: পাওনাদারের মুখে স্থির প্রস্তুতির কঠোর শপথ শোনা যায়।

ঠিক তারপরই আর কি সম্ভাবিত গুরুতর পরিস্থিতিটা অনিবার্য হইয়া উঠিবার কথা অর্থাৎ আধলা ইটের বলিষ্ঠ আঘাতে হরবংশীর দেনার দায়ে ডুবন্ত মাথাটা চৌচির করিয়া দিয়া সেরখানেক মধ্যবিত্ত রক্তের নিদারুণ অপচয়।

মনের গহনে কে যেন জবাবদিহি করিয়া উঠিল, চোখের ওপর একটা খুনখারাবি হয়ে যাচ্ছে আর কৌতূহলী তুই তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস্। লজ্জাও করে না। আবার দাঁত বার করে হাসা হচ্ছে! ধিক্ ধিক্ তোরে ভীরু।

বুঝিলাম, ইনিই সেই মহাত্মা বিবেক। দেহ মনের উপর চার আনার কর্তৃত্বও নাই অথচ সব কিছুর মধ্যে ওঁর ফোঁপর দালালি আছেই। কিন্তু ক্রমেই দংশন তীব্রতর হইয়া উঠিল এবং ভাবী বিপদাশঙ্কায় আমি বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিলাম।

করুণা হইল হরবংশীর উপর। অবশ্য বুঝিলাম, চলতি বিচারের কোন এজলাসেই হরবংশীর এই মামলা কোন দিক দিয়া সমর্থন করা যায় না; কিন্তু তাহার প্রাত্যহিক বাড়ন্ত অবস্থার সহিত আমার বহুদিনকার পরিচয় অন্তরে—আহা কষ্ট পাচ্ছিস্, আচ্ছা নে একটা আধলা—গোছের মহানুভবতার উদ্রেক করিল। মনে পড়িল একদিনের ঘটনা। ছেঁড়া একখানা জংলা সাড়ির সংগোপনে হরবংশীর ষোড়শী কন্যা নিভা যেদিন তাহার বুকের স্তন দুইটা লুকাইবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লজ্জায় চোখমুখ রাঙা করিয়া ফেলিয়াছিল।

পাওনাদারের দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ ছুঁড়িয়া আগাইয়া গেলাম হরবংশীর দিকে। সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞাসা

করিলাম, কি হয়েছে হরবংশীবাবু! যেন কিছুই জানি না আর কি।

হরবংশীবাবু আমার দিকে তাকাইয়া হাসিবার ভাণ করিয়া বলিলেন, কৈ, কিছু না।

হাসিয়া বলিলাম, অ, তা বেশ। তারপর আছেন কেমন!

এ-হে-হে-ইঃ বিকৃতমুখে হরবংশী আমার মুখের উপর হাত উল্টাইয়া ধরিলেন।

পাওনাদার যে তখনও অনুচ্চকণ্ঠে হরবংশীবাবুর কোষ্ঠী রচনা করিয়া চলিয়াছিল, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকার না ঘটায় তাহা আমি স্পষ্ট অনুধাবন করিতে পারিতেছিলাম। হরবংশীবাবুও যে তাহা না বুঝিতেছিলেন এমন নয়। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তিটির পরিচিতির উপর দূর হইতে থুতনির একটা ঘা মারিয়া হরবংশীবাবুকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে ও লোকটি! খামাখা বক বক ক'রছে।

হরবংশী অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া লইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, ঐ আমার এক.........।

বাকী শব্দটা তৃতীয় ব্যক্তিটির দুই দাঁতে পিষিয়া ছিটকাইয়া পড়িল, বাবা।

আমি যেন শুনিয়াও শুনিলাম না। অন্যদিকে মনোযোগের ভাণ করিলাম।

হরবংশীবাবুর জ্বলন্ত দৃষ্টিটা একবার চকিতে পাওনাদারের আগাপাস্তলা ঝলসাইয়া আমার গায়ে ছেঁকা মারিতে মারিতে সরিয়া গেল।

বুঝিলাম হরবংশীর জ্বালাটা কোথায়! অন্তরঙ্গ হইয়া বলিলাম, ব্যাপার কি হরবংশীবাবু!

মোলায়েম তীক্ষ্ম উত্তর হইল, আপনার কেন এত কৌতূহল বলুন তো!

অযাচিত দাক্ষিণ্যের প্রতি দারিদ্রের এই স্পর্ধিত অবহেলায় ব্যথিত ও রুষ্ট হইলাম। ভাবিলাম, প্রয়োজন নাই আমার আন্তরিকতায়। মরুক হরবংশীবাবু। ফিরিয়াও গেলাম কিছু দূরে। কিন্তু হরবংশীর এই অশিষ্ট আচরণের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া যাহা পাইলাম, তাহাতে আবার আমার এ হেন মনোভাবের নিরর্থকতাই প্রমাণ হইয়া গেল।......এ আমি কার ওপর রাগ করছি!

হরবংশীবাবুর প্রতি আমার অনুকম্পার মাত্রাটা আরও বাড়িয়া গেল।

আবার ঘনিষ্ঠভাবে আগাইয়া গেলাম হরবংশীবাবুর দিকে। বাঁ হাতখানা নিজ হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, আমার সঙ্গে কোন কিছু [illegible]

হরবংশীবাবু মুখ ব্যাজার করিয়া রহিলেন।

উত্তর দিল পাওনাদার, বলবেন যে তার কি উনি মুখ রেখেছেন

ঘা খাওয়া গোখুরোর মত হরবংশী ফোঁস করিয়া রুখিয়া

কৃষ্ণকামিনী, হরবংশীবাবু এবং নিভা

উঠিলেন, এ্যাও, খবরদার বলছি মুখ সামলে!

মুস্কিল হইল আমার। যেন চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছি।

কিন্তু পাওনাদার দমিবে কেন! হরবংশীকে তুচ্ছজ্ঞানে উড়াইয়া দিয়া সে বলিল, আরে রাখো বাপু তোমার ঐসব মেজাজের কথা। ধার শোধবার মুরোদ নেই, তার আবার লম্বা-চওড়া বুলি! নির্লজ্জ কাহাকা!

মুখোস যখন খুলিয়াই পড়িল, তখন আবার লজ্জা কিসের!

হরবংশীবাবুর গলা পঞ্চমে চড়ে। তারস্বরে 'গেট আউট', 'গেট আউট' বলিতে বলিতে তিনি পাওনাদারের দিকে ছুটিয়া যান।

পাওনাদার হরবংশীর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলে এই খবরদার বলছি। তোমার আমি......।

কি সর্বনাশ!

ছুটিয়া গিয়া উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়া দাঁড়াইলাম।

রোষকষায়িত নেত্রে পাওনাদারকে শাসাইয়া বলিলাম,

চওড়া চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি। তোমার মুখের সাজা আমি......।

পাওনাদার আমার বগলের তলদেশ দিয়া একটা ফরোয়ার্ড ড্রাইভ দিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইল। সার্টের কলার ধরিয়া তিন ঝাকুনি মারিয়া আবার সামনে আনিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, তোমার যা বলবার আছে বলো না। কত টাকা তোমার পাওনা।

অত্যাচারিতের ভাব মুখে ফুটাইয়া পাওনাদার সবিনয় নিবেদন জানায়, দেখুন দেখি একবার অবিচারটা। মাত্তর দশটা টাকার মামলা। আর তাই এই আজ না কাল, আজ না কাল ক'রে দু-দুটো বছর ধ'রে ঘোরাচ্ছে। আপনিই বলুন তো স্যার। আবার বলে—'দিছলুম কথা, রাখতে পারলুম না।' কি আমার মুক্তি রে......।

পাওনাদারের আর একটা আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টা আমার বিশেষ চেষ্টায় প্রতিহত হইল।

হরবংশীবাবু কিন্তু তখনও ক্ষান্ত হন নাই। আড়ালে থাকিয়া মাঝে মাঝে অস্বস্তিকর মন্তব্য করিতেছিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা দিয়ে কথা রাখে আজকাল সব ব্যাটা! আমার আর জানতে বাকী নেই।

মহামুস্কিলেই পড়া গেল।

নিম্ন হরবংশীর উদ্ধত উক্তি মাঝে মাঝে অসহ্য লাগিতেছিল। এক একবার মনে হইতেছিল, দেই এই প্রত্যক্ষ সোলুপতাটাকে হরবংশীর দিকে লেলাইয়া। আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া রক্তাক্ত করিয়া দিক দারিদ্র্যের এই আস্ফালনকে। কিন্তু পরক্ষণেই উৎকৃষ্টতর জ্ঞানের তর্জনী আমার এই সাময়িক নির্বুদ্ধিতার উচ্ছৃঙ্খল আবেগকে সংযত করিয়া দিতেছিল।

রুদ্ধস্বরে পাওনাদার বলিল, দেখছেন কথার ছিরি। মুখ খারাপ ক'রে গালাগালি দিচ্ছে। সাবধান ক'রে দিন বলছি। নইলে ভাল হবে না।

হরবংশীবাবুর কিন্তু এটা সত্যই অন্যায়। শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখে ও সব কি কটূক্তি!

পিছন ফিরিয়া ভৎসনার সুরে হরবংশীবাবুকে বলিলাম, বলি অসভ্যের মত মুখ খারাপ করে কোন লাভ হবে কি? দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন কৃষ্ণভামিনী। বলিলাম, চুপ ক'রতে বলুন না ওঁকে। আচ্ছা মজা যা হোক।

আস্কারা পাইয়া পাওনাদার বলিল, ও সব সমান। কেউ কম যায় না।

পাওনাদারকে সজোরে একটা ধমক দিয়া বলিলাম, এওপু, জুতিয়ে একেবারে মুখ ছিঁড়ে ফেলে দেবো বলছি, খবরদার। তুমি টাকা পাবে টাকা নিয়ে যাও। দিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার পাওনা।

ওষধির গন্ধে খল বিষধর যেমন ঝাঁপির ভিতর সঙ্কুচিত হইয়া যায়, টাকার প্রতিশ্রুতিতে পাওনাদারও তেমনি কাঁচুমাচু হইয়া গেল। হাত কচলাইয়া বলিল, দেবেন স্যার আপনি টাকা!

সর্বধর্মী হইবে কেন! ঝাঁঝিয়া উঠিলাম, চুপ! বলেছি তো একবার।

তিন মাথা এক করিয়া হরবংশী ফটকের চৌকাঠের উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিলেন। পাশেই দাঁড়াইয়াছিলেন স্ত্রী কৃষ্ণভামিনী। বলিলাম, যান ওঁকে ভেতরে নিয়ে যান, টাকাটা আমিই দিয়ে দিচ্ছি। হরবংশী হাঁ—না—কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। শুধু নিজ দুর্ভাগ্যকে স্মরণ করিয়া আপন মনে অস্ফুটে কি যেন বিড়বিড় করিলেন বুঝিতে পারিলাম না।

সিঁড়ি ভাঙিগয়া নীচে নামিয়া আসিতেছি হঠাৎ চৌকাঠের সামনে হরবংশী ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া আমার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। আমার অভিজাত নাকের উপর আঙ্গুল তুলিয়া শাসাইয়া বলিলেন, হু আর ইউ! তুমি আমার দেনা দেবার কে হে। আমি কি তোমার করুণা প্রার্থী যে দয়া করতে এসেছো?—রাসকেল, শুয়ার, উল্লুক কোথাকার!

হতভম্ব হইব কি ঠাস করিয়া প্রৌঢ় হরবংশীর চোয়াড়ে গালের উপর নিরাশী দশ আনা ওজনের একখানা চড় জমাইয়া দিব, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

হরবংশীবাবুকে বলিলাম, ইতরতার একটা সীমা আছে, বুঝলেন হরবংশীবাবু! বাইরের কে না কে থার্ড-পার্সন এসে আপনার গুষ্টিশুদ্ধ লোকের বেইজ্জৎ ক'রে গেলে আমাদেরও যে গায়ে লাগে, মর্যাদা হানি হয়, এ কথাটা যদি আপনি বুঝতেন তা হ'লে আপনার মুখ দিয়ে ও রকম ছোট কথা বেরুতো না। আপনি এত নীচ, এত সংকীর্ণ!

হরবংশী আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, তুমি কি একেবারে মাতব্বর হ'য়ে গেছ হে, যে না চাইতেই আগু বাড়িয়ে দয়া করতে এসেছো! বাপ ঠাকুর্দা টাকা জমিয়ে রেখে গেছে আর তুমি তাই নবাবী ক'রে তো ভেঙ্গে ভেঙ্গে খাচ্ছো। মুরোদটা তো এই। একজন পরিচয় জিজ্ঞেস করলে এখনও বলো, হরেন ঘোষের নাতি আর সুরেন ঘোষের ছেলে। ব্যক্তিগতভাবে তোমার নিজের কি পরিচয় আছে শুনি! চুরি, ডাকাতি, লাম্পট্য ক'রে পূর্ব পুরুষ টাকা জমিয়ে গেছে আর আজ এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গর্ভাঙ্কেও তুমি সেই সঞ্চিত ঐশ্বর্যের জোরে বুক ফুলিয়ে দয়া ক'রে বেড়াচ্ছো! আমি দুস্থ, বিত্তহীন, মেয়েদের পরণের কাপড় কিনে দিতে পারি নে, তুমি তাদের শাড়ী কিনে দাও, মোটার ক'রে বেড়িয়ে নিয়ে এসো; এ সব অবিচার না, অত্যাচার না!

আবেগে হরবংশীবাবুর রক্তচক্ষু সজল হইয়া আসিল। একটা সুগভীর বেদনায় তাঁহার কালো পুরু ঠোঁট দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু আমার ক্ষাত্র রক্ত ততক্ষণে টগবগ করিতেছে। জারজ আভিজাত্যের প্রত্যেকটা শিরা-উপশিরা তখন অক্ষম দারিদ্র্যের বুকের উপর একটা পদাঘাতের উন্মাদনায় দুর্যোধন হইয়া উঠিয়াছে। কোন কিছু ভাবিবারও অবকাশ পাইলাম না। হাতের নোটখানা পাওনাদারের চোখের উপর কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া আমি হরবংশীবাবুর শীর্ণ দেহটায় একটা লাথি মারিয়া বসিলাম।

হিটলারের স্ট্র্যাটেজী

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আরবের লরেন্স এক সময় বলিয়াছিলেন যে, একমাত্র লেনিনই বিপ্লবের কথা ভাবিয়াছিলেন উহাকে রূপ দিয়াছিলেন এবং অবশেষে তিনি বিপ্লবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। লেনিনের সঙ্গে হিটলারের আদর্শগত পার্থক্য থাকিলেও হিটলার সম্বন্ধেও এই উক্তি করা চলে। হিটলার আরও একটু অগ্রসর হইয়াছেন। বিপ্লবের পূর্বেই তিনি তাঁহার ভাবী কর্ম-

আরবের লরেন্স

পদ্ধতি 'মাইন কাম্প'এ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রাজনৈতিক চিন্তাধারায় হিটলার ভিন্নধর্মী হইলেও সমরনীতিতে তিনি বলশেভিক বিপ্লবের নীতি ও কৌশলগুলি ভালভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন। লেনিন বলিতেন,—

> "The soundest strategy in war is to postpone operations until the mortal disintegration of the enemy renders the delivery of the mortal blow both possible and easy."

হিটলারের উক্তিতেও ইহার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। তিনি বলেন,—

> "Our real wars will in fact all be fought before military operations begin."

অর্থাৎ,—সামরিক অভিযান আরম্ভ হইবার আগেই আমাদের যথার্থ যুদ্ধ হইয়া যাইবে।

হিটলার আরও বলেন,

> "How to achieve the moral breakdown of the enemy before the war has started—that is the problem that interests me. Whoever has experienced war at the front will want to refrain from all avoidable bloodshed."

অর্থাৎ,—যুদ্ধ আরম্ভ হইবার আগে কিভাবে শত্রুর নৈতিক দৃঢ়তা বিনষ্ট করা যায়, এই কথাই আমি বিশেষভাবে ভাবি। রণাঙ্গনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই অনাবশ্যক রক্তক্ষয় এড়াইবার চেষ্টা করিবেন।

অতএব যাঁহাদের ধারণা যে হিটলার সমর পরিচালনায় লোকক্ষয়ের প্রতি দৃকপাত করেন না তাঁহারা উদ্ধৃত উক্তি হইতে সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যে সামরিক বল প্রয়োগে হিটলার কতখানি মিতব্যয়ী। রুশ রণাঙ্গনে বিপুল লোকক্ষয় দেখিয়া একথা মনে করার কোন কারণ নাই যে, হিটলার নিছক বিজয়-গৌরব অর্জনের জন্য স্বপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া এইরূপ নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। সোভিয়েটতন্ত্র ও নাৎসীতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক বিরোধ বর্তমান; সুতরাং ক্রমবর্ধমান সোভিয়েট শক্তি হিটলারের ভয়ের কারণ এবং সেই জনাই তাঁহার রুশিয়া-অভিযান। এই অভিযানে তাঁহাকে সমকক্ষ সামরিক শক্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এতৎপূর্ববর্তী অন্যান্য অভিযানে সামরিক বল ছাড়া নানা কৌশলে তিনি যেমন প্রতিপক্ষের নৈতিক দৃঢ়তা বিনাশে সক্ষম হইয়াছেন, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আভ্যন্তরীক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির তেমন সুযোগ তিনি পান নাই। অদ্যাবধি অধিকৃত সোভিয়েট এলাকায় কোন বিভীষণ বাহিনীর অস্তিত্বের কথা শুনা যায় নাই। হিটলারের বাহিনীকে প্রতিপদ ভূমি যুদ্ধ করিয়া দখল করিতে হইতেছে। সামরিক বলে সমকক্ষ এবং নৈতিক বলে সুদৃঢ় সোভিয়েট বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে এই জনাই হিটলারকে এত বেশী সৈন্য ও সমরোপকরণ হারাইতে হইতেছে। কিন্তু সেইজন্য হিটলারের শক্তি অদূর ভবিষ্যতেই নিঃশেষ হইয়া আসিবে এমন মনে করার কোন কারণ নাই। সোভিয়েট যুক্ত-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে তিনি একে একে য়ুরোপের দেশগুলি গ্রাস করিয়াছেন। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, সেই সব দেশ আজ তাঁহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য। কতকগুলি দেশ হইতে তিনি প্রত্যক্ষ সৈন্যসাহায্য পাইতেছেন এবং কতকগুলি দেশ হইতে তিনি সম্পদ ও শ্রমিক সংগ্রহ করিতেছেন। বিজিত

কাজে শ্রমিকদিগকে নিয়োগ করিতে তেমন কোন ভয় বা আশঙ্কার কারণ নাই। আধুনিক 'টোটালিটেরিয়ান' বা সার্বিক যুদ্ধে শ্রমিকের প্রয়োজন কত বেশী এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। রণাঙ্গনে একজন সৈন্য প্রেরণ করিতে হইলে তাহার পশ্চাতে নিতান্ত কম পক্ষে পাঁচজন শ্রমিক নিয়োগ করা দরকার। অর্থাৎ প্রতি যোদ্ধায় পাঁচজন শ্রমিক প্রয়োজন। যুদ্ধে দশ লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিতে হইলে তাহাদের অস্ত্র নির্মাণ ও রসদ সরবরাহের জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমিক দরকার। সুতরাং বিজিত দেশসমূহে শ্রমিক সংগ্রহ করিয়া হিটলার বেশী সংখ্যায় জার্মানদিগকে যুদ্ধে পাঠাইতে পারিতেছেন। এই কারণেই হিটলারের যোদ্ধ্সংখ্যা বহুলাংশে বাড়িয়াছে এবং রুশ রণাঙ্গনে অপরিমেয় ক্ষতি সত্ত্বেও তাঁহার শক্তির উৎস নিঃশেষ হইতেছে না। যুদ্ধের প্রথম পর্বে স্বল্পমূল্যে এই যে শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্র তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন এখানেই তাঁহার স্ট্র্যাটেজীর সাফল্য। তাঁহার প্রতিপক্ষ তখন সামরিক চালে ঠকিয়া গিয়াছে; যাকে ইংরেজীতে বলে, "Missing the bus"।

পররাষ্ট্র আক্রমণের মূলে অনেকগুলি কারণ থাকে; তবে সবগুলিকে একত্র করিলে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য দাঁড়ায় এই যে, প্রতি-পক্ষ রাষ্ট্রের উপর বলপূর্বক স্বরাষ্ট্রের নীতি চাপান। মানুষের ইচ্ছাই শক্তির মূল উৎস। অপরের উপর নিজের নীতি চাপাইবার সহজতম পন্থা হইল তাহার ইচ্ছাশক্তিকে জয় করা। এই সত্যকে স্বীকার করিলেই আর 'রক্তারক্তি' যুদ্ধ জয়ের একমাত্র পথ বলিয়া ধরা চলে না; যুদ্ধ জয়ের অস্ত্র হিসাবে অর্থনৈতিক চাপ, প্রচারকার্য, কূটনৈতিক চাল প্রভৃতির প্রয়োজনও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। মাত্র একটি বিষয়ের উপর জোর না দিয়া সবগুলি একত্র প্রয়োগের দ্বারাই অধিকতর সুফল লাভের সম্ভাবনা বেশী। সমস্ত ক্ষেত্রে সবগুলি উপায় প্রযোজ্য নাও হইতে পারে; যেখানে যেটি প্রয়োগের দ্বারা বেশী ফললাভের সম্ভাবনা, সেখানে সেটিই প্রযোজ্য। অর্থাৎ এমনভাবে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে স্বল্পতম মূল্যে প্রতিপক্ষের ইচ্ছাশক্তিকে বশ করা যায়। যুদ্ধান্তে তাহাতে ফল ভাল হয়। কোন যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করিতে গিয়া যদি কোন জাতি অপরিমিত রক্তক্ষয়ের দরুণ অসার হইয়া পড়ে, তবে সেই যুদ্ধজয়ের মূল্য অতি কমই হয়। ক্যাপ্টেন লিডেল হার্ট বলেন,—

"Strategy should seek

weakens oneself disproportionately to the effect attained. To strike with strong effect, one must strike at weakness."

অর্থাৎ,—স্ট্র্যাটেজী নিরূপণে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কিভাবে প্রতিপক্ষের বাহিনীর সংযোগস্থলে প্রবেশ করিয়া উহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। প্রতিপক্ষের সবল স্থানে ঘা দিয়া ফললাভ করিতে হইলে নিজেরও যথেষ্ট ঘা খাইয়া দুর্বল হইতে হয়। আঘাত করিয়া সর্বাপেক্ষা ভাল ফললাভের উপায় হইল (প্রতিপক্ষের) দুর্বল স্থানে ঘা দেওয়া।

অতএব দেখা যায়, তুমুল যুদ্ধের দ্বারা প্রতিপক্ষের ধ্বংস সাধন অপেক্ষা তাহাকে নিরস্ত্র করাই বেশী লাভজনক। তাহাতে নিজের ক্ষতি কম এবং জয়লাভের ফল অপেক্ষাকৃত শুভ হয়। কেবল রক্তাক্ত পথে বিজয়লাভের চেষ্টা করিলে শক্তিক্ষয়ের দরুণ স্বপক্ষের অসারতা আসার সম্ভাবনা থাকে এবং তাহাতে যে-কোন সুযোগ হারাইলে ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইতে পারে। শত্রু নিধনের চেয়ে কিভাবে শত্রুকে শক্তিহীন করিয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য করা যায়, স্ট্র্যাটেজিস্টের তাহাই ভাবা উচিত। যুদ্ধ সম্বন্ধে অতিশয় সাধারণ কথা হইল এই যে, একজন শত্রুকে

হিটলার

দলে মহামারীর মত গ্রাস সংক্রামিত হইতে পারে। আর একটু বড় করিয়া দেখিলে বলা যায়, বিপক্ষের সেনাপতির মনে কোন-রূপ দ্বিধা বা আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে পারিলে তদ্দ্বারা এমনও হইতে পারে যে, তাঁহার সৈন্যদলের সমস্ত সমরোদ্যমই নষ্ট হইয়া গেল। আরও একটু বড় করিয়া দেখিলে একথা অবশ্যই বলা চলে যে, কোনও একটি দেশের গভর্নমেণ্টের মনোভাবকে যদি নৈতিক চাপে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলা যায়, তবে এমনও হওয়া অসম্ভব নয় যে, সেই গভর্নমেণ্ট তাহার সমস্ত সমরায়োজনই বাতিল করিয়া দিবে—অবশ হাত হইতে তরবারি খসিয়া পড়ার মত তাহার সমরোদ্যম কোথায় মিলাইয়া যাইবে।

লেনিন স্ট্যালিন
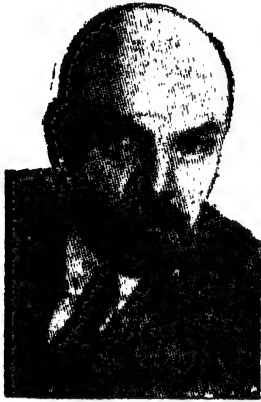
কোন দেশের শক্তি নিরূপণে যে তাহার জনবল ও সংগতিই সর্বাগ্রে ধর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই দুই-এর সমন্বয়ে যে সমর-সামর্থ্য গড়িয়া ওঠে তাহার মূলভিত্তি আভ্যন্তরীক শৃঙ্খলা ও দেশবাসীর মনোবল। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নৈতিক দৃঢ়তা ও সরবরাহ প্রণালীই সামরিক দেহের প্রাণকেন্দ্রে শক্তিসঞ্চার করে। শিলাবৃষ্টি হইলে শিলা কুড়াইয়া আমরা অনেক সময় ডেলা পাকাই। যতই আমরা উহাতে বাহির হইতে চাপ দেই ততই উহা আরও বেশী শক্ত হয় এবং গলিতেও অধিক সময় লাগে। কূটনীতি এবং সমরনীতিতেও এই কথা খাটে। বাহির হইতে প্রতিপক্ষকে সরাসরি চাপ দিতে গেলে সাধারণতই সে বেশী দৃঢ় হইয়া বসে এবং শক্তি-সংহতির ফলে তাহার প্রতিরোধ-ক্ষমতা আরও বাড়িয়া যায়। অতএব কূটনৈতিক ও সামরিক-ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের মানসিক ও দৈহিক শক্তির সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া তাহাকে পরাভূত করায় প্রকৃষ্ট পন্থা হইল বাঁকা পথে আক্রমণ। স্ট্র্যাটেজীর মূল লক্ষ্য যথাসম্ভব প্রতিপক্ষের প্রতিরোধশক্তি হ্রাস করা। তার সঙ্গে আরও বলা দরকার যে, কোন লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইলে একাধিক লক্ষ্যের দিকে নজর দেখাইতে হইবে। প্রতিপক্ষ যেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে না পারে যে আসল লক্ষ্য কোনটি। ইহা দ্বারা কেবল যে প্রতিপক্ষই বিভ্রান্ত হয় এমন নয়, কোন বিশেষ লক্ষ্যে উপনীত হইতে না পারিলে স্বপক্ষের সৈন্যদলে অবসাদ বা পরাজয়ের গ্লানি আসার

হিটলার স্ট্র্যাটেজীর এই মূল সূত্রগুলিই ভালভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন। এই মনস্তাত্ত্বিক স্ট্র্যাটেজী অবলম্বন করিয়াই তিনি জার্মানীতে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেন; কখনও পুঁজিবাদী কখনও সমাজতন্ত্রীদের সমর্থক হইয়া তিনি নিজের সুবিধা করিয়া লন। একবার এদিকে একবার সেদিকে—প্রথম হইতেই তিনি এই নীতি অবলম্বন করেন। কাহাকেও তিনি বুঝিতে দেন নাই তাঁহার আসল লক্ষ্য কোন্ দিকে। এইভাবে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর কর্তৃত্ব হস্তগত করিয়া তিনি বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পর বৎসরই পূর্ব পার্শ্ব হইতে আক্রমণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য তিনি পোলাণ্ডের সঙ্গে দশ বৎসরের মেয়াদে এক শান্তি-চুক্তি করিলেন। ভার্সাই সন্ধিতে অস্ত্রবল সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে হিটলার তাহা অগ্রাহ্য করিয়া অস্ত্রবল বাড়াইলেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সামরিক বলে তিনি রাইনল্যাণ্ড দখল করিলেন। সেই বৎসরই তিনি স্পেনের গৃহ-যুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ছিল স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া পশ্চিম য়ুরোপে বৃটেন ও ফ্রান্সের একটি শত্রু সৃষ্টি করা। ফ্রাঙ্কোর জয়ের দ্বারা তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে বলিয়া তিনি যখন নিশ্চিন্ত হইলেন তখন আবার তিনি পূর্বদিকে মুখ ফিরাইলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অস্ট্রিয়ায় অভিযান চালাইলেন। ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ার পার্শ্বদেশ বিপন্ন হইল। গত মহাযুদ্ধের পর স্বপ্রভাবিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ সৃষ্টি করিয়া ফ্রান্স জার্মানীর চারিদিকে যে প্রাচীর খাড়া করিয়াছিল, হিটলার কূটনৈতিক চালে তাহা ভাঙ্গিয়া দিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক চুক্তির দ্বারা তিনি যে কেবল সুদেতেন-ল্যাণ্ডই ফিরিয়া পাইলেন এমন নয়, চেকোশ্লোভাকিয়ার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিলেন। তারপর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি হৃতবল চেকোশ্লোভাকিয়াকে গ্রাস করিয়া পোলাণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বদেশে বাহু বিস্তার করিলেন। একরূপ বিনা রক্তপাতেই তিনি এতগুলি দেশে 'শান্তি-অভিযান' চালাইয়া মধ্য য়ুরোপে ফরাসী আধিপত্য খর্ব করিলেন। কেবল তাহাই নয়; চারিদিকের প্রতিকূল বেষ্টনীকে তিনি অনুকূল করিয়া লইলেন। ইহাকেই বলা যায়, রণাঙ্গনে শত্রুকে ঘা দিবার আগে সুবিধাজনক স্থান অধিকার করা। ইহা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে জার্মানীর অস্ত্রবৃদ্ধির সুবিধা হয় এবং পরোক্ষভাবে তাহার শত্রুবর্গের শক্তি হ্রাস পায়; কেন না বৃটেন ও ফ্রান্স একে একে তাহাদের ক্ষুদ্র মিত্র-শক্তিগুলিকে হারাইতে থাকে। এইভাবে হিটলার ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালের মধ্যে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিলেন যাহাতে বাহির হইতে সরাসরি আক্রান্ত হইবার ভয় আর তাঁহার রহিল না। সেই সময় বৃটেন আর একটি চালে ভুল করিয়া বসিল। রুশিয়ার সহিত কোনরূপ বুঝাপড়া না করিয়াই সে অকস্মাৎ পোলাণ্ড ও রুমানিয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল; অথচ উক্ত দুই রাজ্যেই বৃটেন হইতে সামরিক সাহায্য পাঠান কঠিন। একমাত্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বুঝাপড়া

...হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া পোলাণ্ড ও রুমানিয়াকে ...ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অবস্থা আরও খারাপের দিকে ...। এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা স্পষ্টত প্রকাশ পাইল যে, বৃটেনের ...ণনীতি অনুসরণের আর অভিপ্রায় নাই।' হিটলার তখন ...তাড়ি সামরিক বলে পোলাণ্ড দখল করিয়া পূর্ব দিকে ...ন্ত সম্প্রসারিত করিলেন। অতঃপর য়ুরোপের রণাঙ্গনে ...চক্র যেভাবে গড়াইয়াছে তাহা অল্পবিস্তর সকলেই জানেন।

হিটলারের এই ষ্ট্র্যাটেজীক সম্প্রসারণের আসল উদ্দেশ্য ষ্ট্যালিন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মধ্য য়ুরোপেই হিটলারের প্রসারণচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকিবে না এবং উহা যে এক ভাবী সমরের ক্ষেত্রপ্রস্তুত করা মাত্র—একথা পূর্বাহ্ণে বুঝিতে ...য়াই মঃ ষ্ট্যালিন সেই ভাবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে ...গলেন এবং তদুদ্দেশ্যেই তিনিও পশ্চিম দিকে সীমান্ত রেখা ...ইয়া দিলেন। হিটলার তাঁহার চক্ষে ধূলি দিতে পারেন নাই। ষ্ট্যালিন তখন পশ্চিম দিকে সোভিয়েট এলাকা না বাড়াইলে ...লারের বাহিনী আক্রমণের প্রথম চোটেই গিয়া যে লেনিনগ্রাদ ...মস্কোতে উপনীত হইত, একথা এখন ষ্ট্যালিনের পরম শত্রুও ...কার করিতেছে।

রুশিয়া অভিযানের আগে হিটলার বৃটেনের মৈত্রী ...ভের আশায় তাঁহার অন্তরঙ্গ হের হেসকে বৃটেনে পাঠাইয়া ...ক এক চাল চালিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন হের হেস ...ন্ত সোভিয়েট বিদ্বেষী একথা বৃটেনের শাসকগণ জানেন; ...সেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মিলিত অভিযান চালাইবার জন্য হেস হয়ত বৃটিশ শাসকগণের মৈত্রী লাভে সমর্থ হইবেন।

হের হেসকে লইয়া বৃটেনে তখন নানারূপ জল্পনা-কল্পনাও চলে। এমন কি কোন কোন সংবাদপত্রে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রশংসাও করা হয়। Pat Sloan তাঁহার Russia Resists নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

> "It appears that Hess might have been openly wel'ome in official circles, if the masses of the people had not reacted very strongly against thi- pro-Hess propaganda, and thus forced a change of tune."

অর্থাৎ,—এইরূপ হেস সমর্থক প্রচারকার্যের বিরুদ্ধে জনসাধারণ তীব্র অসন্তোষ জানাইয়া সুর পরিবর্তনে বাধ্য না করিলে মনে হয়, সরকারী মহলে হেস হয়ত প্রকাশ্যেই সংবর্ধনা পাইবেন।

যে কারণেই হোক, হিটলারের সেই চাল ব্যর্থ হয়। মিঃ চার্চিল বেতারে ঘোষণা করেন,—

> "Any man or State who fights against Nazidom will have our aid.....We shall give whatever help we can to Russia."

অর্থাৎ,—যে কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র নাৎসীশাসনের বিরুদ্ধে লড়িবে, সেই আমাদের সাহায্য পাইবে।......আমরা যতদূর পারি রুশিয়াকে সাহায্য করিব।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সামরিক চুক্তির আলোচনায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সহিত নানারূপ টালবাহানা করিয়া বৃটেন যে ভুল করিয়াছিল, হিটলারের এই চালে আর সে সেইভুল করিল না। হিটলারকে অগত্যা পশ্চাতে শত্রু রাখিয়াই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অভিযান চালাইতে হইল। ষ্ট্যালিনের ষ্ট্র্যাটেজীর কাছে হিটলারের ষ্ট্র্যাটেজী কতখানি সফল হয় তাহাই আজ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

মধ্যবিত্ত

(৩৬২ পৃষ্ঠার পর)

মরিয়া হইয়া হরবংশী আমার টুঁটি চাপিয়া ধরিল। ...বিক হিংস্রতায় হাত কামড়াইয়া মণিবন্ধের ছাল চামড়া ছিন্ন ...ন করিয়া দিল। সামনেই পড়িয়াছিল আধলা ইটখানা। ...পাত না করিয়া আমি সেটি তুলিয়া লইলাম। কৃষ্ণভামিনী ...র্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আশপাশ হইতে দুই চারজন ...ক খবরদারী করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। ভয় বিহ্বল ...জমাদারের মুখখানাও যেন একবার চকিতে দেখিতে পাইলাম। ...বাকে মেরো না", "মেরো না আমার বাবাকে" বলিয়া একটা মেয়ে কাঁদিয়া উঠিল। বোধ হয় নিভা। কিন্তু আমি তখন দুর্মদ। সইট উৎক্ষিপ্ত হাতখানি আমার ইতিমধ্যেই হর-বংশীর কপালের উপর মারাত্মক আঘাত করিয়া বসিয়াছে।

পূর্বে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, শেষ পর্যন্ত তাহাই ঘটিল। দেখিলাম, হরবংশীর চৌচির কপালের কালো চামড়া ফুঁড়িয়া সের খানেক মধ্যবিত্ত রক্ত মাটির উপর পড়িয়া চাপ বাঁধিয়া গিয়াছে

আবর্তন

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

চালদা-অটোমোবাইল এসোসিয়েশন। নামটা খুব বড় হলে—চালদা একটি মহকুমা বড় জায়গা। কিন্তু নিকটবর্তী রেল স্টেশন থেকে প্রায় ১৮।২০ মাইল। পূর্বে একমাত্র গরুর গাড়ি বা ...র গাড়ি ছাড়া আর কোন যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল না। এখন অটোমোবাইল এসোসিয়েশনই তার অভাব পূরণ করেছে। চালদা ...র মহকুমার মধ্যে তাদের বাস সার্ভিস। বেশ চালু লাইন। কারণ ...ঞ্জ শুধু রেল স্টেশন নয়, জেলার সদর আর গংগাতীর সুতরাং ...মন—রাঢ়দেশের লোকের রথ দেখা আর কলা বেচা দুটো কাজই ...র হয়, অর্থাৎ মোকদ্দমা আর গংগাস্নান এক ক্ষেপে দুই-ই হয়।

পূর্বে যখন প্রথম মোটর সার্ভিস হয়, তখন এসোসিয়েশন ...নি সকলেই পৃথকভাবে চালাত, ভাড়া ছিল দশ আনা। ...টো মোটর, তার তুলনায় তখন বেশী লোক মোটরে যাতায়াত ...ত না। তাদের হিসাবে নাকি এটাকে 'জলখাবার' বেলার পথ ...য়ে যেত। জলখাবার—কথাটার অর্থ হচ্ছে যে, বেলা ১০টার সময় ...মবাসীরা জলযোগ সারে, সুতরাং তারা ভোর ভোর চালদা থেকে ...রে নাইতে গংগাতীরে গিয়ে নেয়ে জলযোগ সারতে পারবে। ...হু তা হলো কি হয়? বিপদ হল মোটরওয়ালাদের—প্যাসেঞ্জার ...না। সারাদিনে রোজগার হয় কোনদিন বা সাড়ে তিন টাকা, ...কোনদিন বা চার টাকা। তখন শুরু হ'ল কম্পিটিশন, এক এক ...কোম্পানী খুব জোর ক্যানভাস শুরু করলে। ভাড়া কমতে লাগল—৬ ...ন ৪ আনা এবং শেষকালে এমন হ'ল যে, কেউ মোটরগুলোর দিকে ...লেই তাকে নিয়ে বাসওয়ালাদের টানাটানি হেঁচড়া হেঁচড়ি শুরু, ...কেউ বা তাকে পাঁজা কোলা ক'রে তুলে নিজে নিজেদের বাসের ...হাত কেউ বা তার সুটকেশ বোঁচকা নিয়ে অন্য আর একটা ...স তুললে। সে যতই হাত পা ছোড়ে 'কাকস্য পরিবেদনা' কিছুতেই ...ড়ে না। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। এই নিয়ে বাসওয়ালাদের মধ্যে ...মধ্যে হাতাহাতি শুরু হত। অনেক জল্পনা-কল্পনা লাভ ...তির হিসাব নিকাশের পর ঠিক হ'ল যে, একতাই বল, সুতরাং ...মালিকরা এক সংগে মিলে একটা কোম্পানী খুললে, সকলেই ...র তার পার্টনার। সেই দিন থেকে চালদা অটোমোবাইল এসো-সিয়েশনের জন্ম হল। এই হচ্ছে তার জন্ম ইতিহাস। তারপর থেকে বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই চলে আসছে।

খান ৭।৮ মোটর তাদের সম্পত্তি। সবগুলোই যেন এই মাত্র ...র্ড কোম্পানীর কারখানা থেকে বেরিয়ে আসছে এমনি ব্যাপার। ...হেড লাইটের কাঁচ বোধ হয় অনেকেরই নাই। মুখটা জোর করে ...কে নারকেল দিয়ে আটকান। ষ্টিয়ারিং হুইল কারও বা দড়ি দিয়ে ...বাঁধা সর্বাংগে পড়েছে তালির উপর তালি। রং চটে গায়ে ...ধুলো মেখে বিবর্ণ মূর্তিতে মোটরগুলো একটা বাঁশতলায় দাঁড়িয়ে ...তার শেষ বিচারের দিন গুণছে। হায়রে, কারখানা থেকে যখন ...বেরোয় তখন কি এগুলো ভেবেছিল যে, রাঢ়দেশের হাটুভোর ধুলো-...র মধ্যে শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই, সমানভাবে কাঁপতে ...কাঁপতে আর্তনাদ ক'রে তাদের ছুটতে হবে।

রাস্তার এক পাশে খানিকটা জায়গা, চারিদিক তার নিবিড় ...বন, দিয়ে ঘেরা—নারকেল গাছও দু'চারটা মাথা তুলে আছে, এ ...পাশে ওপাশে ছোট বড় খানা-ডোবা, নারিকেল গাছ, বাঁশবন, কুল গাছ, ...র গাছ ঘেরা এই জায়গাটি হচ্ছে এদের গ্যারেজ। মাথার উপর ...র নীল আকাশ, নীচে ধরিত্রী মাতা! কি সুন্দর পরিকল্পনা! ...একপাশে ...মাটির দোতালা, তাতে দু'খানা ঘর আর একটা বারান্দা। ঘর দুটোর একটাতে অটোমোবাইল এসোসিয়েশনের হেড অফিস—অন্যটি লেডীজ ওয়েটিং রুম। বারান্দার এক ধারে যদু শাস্ত্রীর 'কুহকিনী ষ্টল' অর্থাৎ চা পান বিড়ির দোকান। কোণে একটা উনুনের উপর একটা কড়ায়ে ক'রে জল গরম হচ্ছে, দুটো ছোকরা বিড়ি বাঁধছে তাদের চুল পিছন দিকে ফেরান। বেশ কেতাদুরস্ত করে ছাটা, ঘাড়টা একেবারে বেলের মত চাঁছা। দুই হাতে বিড়ির পাতাটাকে নিয়ে একটু মসলা পুরে গুটাতে গুটাতে নাকী সুরে গান ধরেছে—

"আজি সবার রংএ রং মিশাতে হবে।" প্যাসেঞ্জার দু'চারজন একটা খাটে কেউ বা কয়েকটা আধভাংগা সস্তা দামের টিনের চেয়ারে বসে আছে। একজন নব্য সভ্য ঘন ঘন হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বিরক্তি ভরে মন্তব্য করছেন—"টাইম—টাইম কি আর এদের আছে, যখন তখন চালালেই হল? ট্রেণ বোধ হয় ধরতে পারব না! বাঙালীর ঘড়ি এই রকমই হয়। ননসেন্স?"

হরিপদবাবু অফিসের ভিতর বসে নাকের ডগায় চশমাটা তুলে নিয়ে লাল নীল পেন্সিল দিয়ে টিকিটের উপর নম্বর, তারিখ বসাচ্ছেন আর ঢুলছেন। গোলগাল ভুঁড়িওয়ালা লোক ঘরের ভাপসা গরমে ঘেমে নেয়ে উঠেছেন। হাতের রক্ষা কবচটা পিছলিয়ে একেবারে কব্জির কাছে নেমে এসেছে—সেদিক খেয়াল নেই। তিনি ঢুলছেন আর পেন্সিলটা থেকে থেকে নেড়ে নিচ্ছেন, অলস দুপুর মধ্যাহ্ন কাটতে চায় না, বেচারীর বড় কষ্ট। একে মোটা মানুষ তাতে আবার এই গুমোট গরম। মাথার ঠিক থাকে না। তার উপর আবার পাই পয়সার হিসাব। হরিবাবু বলেন, "আরে আমি আছি তাই অফিস মোটর আছে, নইলে এতদিন অক্কা পেয়ে যেত। আমি যেভাবে চালাই। পথের উপর সোনার তাল পড়ে থাকলেও ফিরে চাইনে। চুরি ধম্মো ভয়াবহ।" কিন্তু হরিবাবু মাইনে পান ১৫. টাকা। এতেই সংসার চালিয়ে তিনি নাকি বেশ দু'পয়সা করেছেন

এ হেন কর্ণধার হরিদা (তিনি নাকি মোটর অফিসের কমন-দাদা—বাবাও বলেন—দাদা, তাঁর ছেলেও ডাকে হরিদা) হঠাৎ ঝিমুনি বন্ধ করে একটু সচকিত হয়ে উঠলেন। তাকের উপর মান্ধাতার আমলের টাইমপিসটা দেখে গোলগাল মুখের ভাব গেল বদলিয়ে। বিরাট গোঁফ জোড়াটা পাক দিয়ে একটা চটা ছাড়া কলাইকরা এনা-মেলের গেলাসে এক গ্লাস জল খেয়ে করমচার মত লাল চোখ দুটোকে রগড়াতে রগড়াতে বাইরে এলেন। প্যাসেঞ্জার বাহিনীর দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে খাটের তলায় ছেঁড়া চটি জোড়াটার মধ্যে পা চালিয়ে বিরাট ভুঁড়ির উপর কাপড়টাকে আটকাবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে হাঁকলেন—"ওরে ও রমণা, বলি তিনটের ট্রিপ যাবে কখন? বেলা যে পড়ে গেল। গাড়ি বার কর। যেন সব নবাবপুত্তুর নিজের মেজাজে চলবেন।"

গ্রীষ্মের ক্লান্ত মধ্যাহ্ন শেষে মোটর অফিস মুখরিত হয়ে উঠল প্যাসেঞ্জারদের কোলাহলে। মোটরখানা টলতে টলতে এসে অফিসের সামনে দাঁড়াল। অধিকাংশ সকলেই নিরীহ গ্রামবাসী মোট পুঁটুলি বোচকা প্রভৃতি কতক বগলে, কতক হাতে নিয়ে গাড়ীতে উঠবার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করল। এ বলে আমি আগে ঢুকব ও বলে আমি আগে। একে সরু দরজা একটার বেশী লোক ঢোকে না তার উপর আবার এই হাংগামা, হরিদার মধ্যস্থতায় একে একে সকলে ঢুকল। মেয়েছেলেও আছে, তারা কোন রকমে দেহটাকে জড়িয়ে বতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র সংস্করণ করে বসে আছে। বেঞ্চি মেঝে কোন জায়গাই বাদ নাই। কিন্তু হরিদার

প্যাসেঞ্জার বোঝাই করা থামে না। যত আসে তিনি ঠেলে ভিতরে পুরে দেন, জায়গা নাই বললে—বলেন—"গাড়ি চললেই জায়গা হবে। ওগো কর্ত্তা বলি পা দুটো আর একটু গুটোও না বাঁদিকে একটু তুলে নাও। ব্যস! ওগো মোড়ল একি রকে বসে তামাক খাচ্ছ? একটু ছোট হয়ে বোস। এ হচ্ছে কেম্পানীর গাড়ি। সকলে মিলে যেতে হবে তো। ওঠ ঘোষের পো—এই কোনটাও দাঁড়াও।" হরিদার মুখে খই ফুটে চলেছে।

তারপর শুরু হল টিকিট পর্ব।

"ওগো মা লক্ষ্মী কোথা যাবে মা?"

"যাব বাছা গোঁসাইপুরে।"

হরিদা বলেন—"ওগো ও ছেলেটির টিকিট লাগবে যে", অবাক হয়ে মেয়েটি উত্তর দিল—"সে কি বাছা। গাঁটি সাহেব এলে পয়সা লেইনি, আর তুমি বাছা টিকট লেবে?"

"এ বাপু কোম্পানীর গাড়ি পয়সা নিতেই হবে। আমাকে হিসেব মিলাতে হবে তো। দাও বাপু ঝামেলা করো না—পয়সা দাও।"

অগত্যা চাদরের খুট থেকে পয়সা বার করে দিলে। টিকিট চাইলে হাতের ক্যাভেণ্ডার সিগারেটের সুটকেশ থেকে টিকিট বই বের করে বললেন, "এ সব বড় টিকিট, ছোট টিকিট নাই। তা আমি এদিকে বলে দিলাম—" বলা বাহুল্য ছেলেটির ভাড়ার পয়সা হরিদার ফতুয়ার পকেটে আশ্রয় নিয়েছে। ওপাশে বসেছিল এক তাঁতী। এক গাঁট গামছা নিয়ে শহরে চলেছে। হরিদার নজর এড়াবার জন্যই বেশ ঢেকে ঢুকে মোটটিকে নিয়েছে। কিন্তু 'সকলি গরল ভেল', হরিদা ঘড়েল লোক—শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখে তিনি মালুম পান। তাঁতীর সঙ্গে লাগল টানাটানি। হরিদ বলেন—"মানুষে জায়গা জোড়া ক'রে বসে বলেই ত পয়সা দিতে হয়। গামছার মোটটা অনেকখানি জায়গা নিয়েছে—কেন তার পয়সা লাগবে না শুনি? এ কোম্পানীর গাড়ি, আমাকে হিসেব দিতে হবে তো?" একখানা গামছা তাঁর ফতুয়ার তলাকার পকেটে ঢুকতে তিনি তর্ক থামালেন।

টিকিট চেক করার পর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে গাড়ির ভিতর ছাদ সব দেখে শুনে গাড়ি ছাড়বার হুকুম দিলেন। একটা লোক বয়োবৃদ্ধ অথর্ব মোটরটাকে স্টার্ট দেবার জন্য প্রাণপণে হ্যাণ্ডেল ঘুরাতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। অনেক কসরৎ ঝাঁপাঝাঁপির পর গাড়িটা আর্ত্তনাদ করে উঠল, গোঁ ভট্ ভট ভটাস। নানারকম শব্দ করতে করতে গাড়িটা ছুটল, পিছনে ধুলোর রাশ উড়িয়ে জেলেপাড়ার বাঁকের মুখে মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিকে হরিদাও হাঁফ ছেড়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে খাটটার উপর অসহায়ের মত ধপ্ করে বসে গেলেন। এ সময়টা তাঁর শান্তি নাই। এই টিকিটগুলোর হিসাব না মিলাতেই দুটোর গাড়ি আসবে ওদিক থেকে। হাঁফাতে হাঁফাতে ভারী দেহখানাকে ভিতরে টেনে নিয়ে গেলেন।

কোন্ ভাঙ্গা টেবলটার ধারে বসে বসে হরিদা এক মনে হিসাব করছেন, হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন। কান খাড়া করে শুনতে পেলেন গুরু গুরু শব্দ। ২টার গাড়ি আসছে। এই কোম্পানীর একটা সুবিধা এই যে, হরিদা ঘুমিয়ে পড়লেও গাড়ির শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। শব্দ শুনে "ধ্যাত্তোর" বলে হাতের পেন্সিলটা ফেলে রেখে বাইরে এলেন। একটু পরেই 'বিদ্যুৎ' এসে অফিসের সামনে দাঁড়াল। বনেট ভেদ করে টগবগ করে জল ফোটার শব্দ আসছে, উপরকার খোলা মুখটা দিয়ে ভস্ ভস্ করে স্টিম বেরুচ্ছে। গাড়িখানার নাম 'বিদ্যুৎ।' কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন আরকি। তার বর্ণনা দেব না, কারণ কোম্পানীর মালিক বা হরিদার কানে এ কথা গেলে আর আমাকে আস্ত রাখবে না। বাধ্য হয়েই বর্ণনা দিলাম না।

হরিদা গাড়িখানাকে গ্যারেজরূপ বাঁশবনে পুরে সকলের কাছ হতে টিকিট নিতে লাগলেন। মোট পুঁটুলির ভার [illegible]

হাতে করে ওজন করে দেখে ছেড়ে দেন। একজন নাকি জায়গা [illegible] ড্রাইভারের পাশে বসে এসেছে। হরিদা তাকে চার্জ করে[illegible] First classএর টিকিট। সে দেবে না, হরিদাও ছাড়বে না। [illegible] নিয়ে তুমুল ঝগড়া। ছোকরা আবার বলেছে "কোম্পানী কি তোম[illegible] বাবা—যে তোমার এত দরদ?" আর যায় কোথা? হরিদা [illegible] করেছেন—"বটেইত! কোম্পানী আমার বাবা নয়ত কি তোমার বা[illegible] এমন বাবা পেলে বর্ত্তিয়ে যেতে। এখন দাও চার গণ্ডা পয়সা [illegible] ভাড়া আর কোম্পানীর আইন মতে ৪ গণ্ডা পয়সা ফাইন—[illegible] ৮ আনা।"

ছোকরা কিছুতেই দেবে না—হরিদাও নাছোড়বান্দা। [illegible] এক কথা। "কোম্পানীর গাড়ি, হিসেব মিলাতে হবে ত? প[illegible] চাই—"

শেষে রফা হ'ল ৫ আনা। ৫ আনা পয়সা দিয়ে ছো[illegible] রেহাই পেল। সে গাল দিতে দিতে গেল—বেটা কাবলীওয়ালা [illegible] বাবার গাড়ি—ইত্যাদি।

ফণি ড্রাইভার এসে বললে—'হরিদা একটা বিড়ি দাও [illegible] মাইরি, মুখটা সাদা হয়ে গিয়েছে।"

হরিদা বোমা ফাটার মত শব্দ করে—একটা অলঙ্কার প্রয়ো[illegible] করে জবাব দিলে—'আহা হা—চাঁদ আমার রে। বিড়ি কোথা পা[illegible] নগদ তিন আনা লোকসান—কোম্পানী যে পথে বসবে সে খেয়া[illegible] আছে? না শুধু বিড়ি দাও—আর বিড়ি দাও। থাম সব [illegible] করে দিচ্ছি।'

মেজাজ খারাপ দেখে—ফণে সরে পড়ল।

দেখতে দেখতে 'গঙ্গাপুজো এসে পড়ল—এই সময় কোম্পান[illegible] বা তার কর্ম্মচারীদের বেশ দু'পয়সা আয় হয়। বার দেশের লোক গঙ্গার মুখ দেখতে পায়, না গঙ্গাতীর থেকে অনেক দূরে। এই স[illegible] সকলে—বিশেষত মেয়ে আর ছেলের দলই গঙ্গাস্নান করতে [illegible] সারা বছরের সঞ্চিত পাপরাশি—গঙ্গাজলে ধুয়ে [illegible] মৃত্যুকালে ত গঙ্গা পাবে না—তাই বেঁচে থাকতেই গঙ্গাস্নানটা সে[illegible] নেয়। দলে দলে যাত্রী পুজোর দুচার দিন আগে হতে গিয়ে গ[illegible] তীরে বাসা বাঁধে।

প্রত্যেকে বগলে—মোট বেঁধে কাপড়-চোপড় নিয়েছে কেউ বিরাট এক পুঁটুলি—মুড়ি-চিড়ে ইত্যাদি, কেউবা পুঁটুলিটা বগ[illegible] নিয়ে এক পাল বড় ছোট ছেলেমেয়েকে হাত ধরাধরি অবস্থায় টান[illegible] টানতে নিয়ে আসছে, কেউবা আসছে ৮ ক্রোশ—কেউবা ১০।[illegible] ক্রোশ বা তারও বেশী দূরে থেকে—উস্কো খুস্কো চেহারা রুক্ষ চু[illegible] তাও আবার ধুলোতে বিবর্ণ। এক হাঁটু ধুলো—মুখ শু[illegible] গিয়েছে। এত কষ্ট সহ্য করেও তারা আসছে এবং আসবে[illegible] অধিকাংশ মেয়েই বিধবা। এই সময় মটর অফিসে এলে—অর্থ[illegible] হরিদার রাজত্বে এলে—বাঙলার যে মেয়েদের মধ্যে অধিকাং[illegible] বিধবা এটা বুঝতে দেরী হয় না। কেউবা বিরাট দেহ [illegible] পুঁটুলি খুলে ছেলেমেয়েদের চারিদিক বসিয়ে ভোগ লাগা[illegible] মুখে এক মুখ মুড়ি পুরে মধ্যে মধ্যে ছেলেমেয়েদের সাবধান [illegible] দিচ্ছে, ওলো খেঁদী, বলি আদিখ্যেতা আর করিসনা, টকটক [illegible] গিলে নে বাবা, ভিজেন করিসনে, গাড়ি দাঁড়িয়ে রইছে—খেয়ে নি[illegible] আগে চড়বি—দেখিস হাঁ করে যেন আবার তাকিয়ে থাকিস [illegible] বুঝেছিস লো।' খেঁদী নামধারী বালিকাটি মুড়িগুলো চিবি[illegible] একটা কোঁৎ করে ঢোক গিলে তাদিকে উদরে পাঁঠিয়ে পানদোক্তা[illegible] লাল ছোপ লাগান দাঁতগুলো বের করে উত্তর দিলে ছিঃ আমি [illegible] কিছুই বুঝিনে, আমার মত বোকা কে? সেদিন ও-পাড়ার [illegible] আমাকে—আর বলতে হল না বাধা দিয়া বক্তা রমণী মুখ ঝামটা [illegible] উঠিল—"আঃ মর! মরণ আর কি! দিন দিন [illegible] বাব কাল সোয়ামীর ঘর করতে যাবি মুখে [illegible]

সময় নেই, অসময় নেই সারাক্ষণ সোমত্ত মেয়ের ঘরের জানলাটার দিকে তাকিয়ে থাকত। বলি, এটা কি সচ্চরিত্তিরের লক্ষণ।'

'যথেষ্ট হয়েচে, এইবার থাম দেখি,' গৃহিণী কহিলেন, 'তোমার মেয়েকে তো গিলে খায় নি, চেয়ে দেখেচে। দেখেচে বলেই তো আজ বিয়ে করবার প্রস্তাব করে' পাঠিয়েচে। মেয়ে কি তোমার মোগল-হারেমের বেগম যে চোখের দৃষ্টিতেই গলে যায়'......

'ও নিশ্চয়ই ভাল ছেলে নয়। আগে রাখ, আমি ভাল করে' খোঁজখবর করিয়ে নিই। এসব ছেলেদের কিছুই বিশ্বাস নেই। মেয়ের কাছে এসব কথা কিন্তু এখনও তুলে বস না গিন্নী...... বড় খারাপ অভ্যাস হয়েছিল তোমার মেয়ের.....কে জানে জানলা দিয়ে ইসারা-ফিসারা চলতো কিনা.... যত সব,' বলিয়া বকর বকর করিতে করিতে ভুজঙ্গধর বাহির হইয়া গেলেন।

দূরে হইতে দেখিয়া আর প্রাণ ভরে না। কবি শিহরণ যতই দূরবীণটা ব্যবহার করিতে লাগিলেন, ততই একটা আক্ষেপ তাহার বুকটা পূর্ণ করিয়া তুলিল।

কয়দিন হইল তিনি ৯১ নম্বরের 'গুন্ডা'টাকে দেখিতে না পাইয়া আজই তিনি ভজহরিকে তাহার বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরে ভজহরি জানাইল—'তিনি বোম্বাইতে চাকরি পেয়ে চলে গেছেন যে। নগত চারশো টাকা মাইনে।' উত্তর শুনিয়া কবি হৃষ্টই হইলেন; পথ হইতে কণ্টক সরিয়া গিয়াছে; এইবার কি কুসুমাস্তৃত পথে অভিসার যাত্রা করা যাইবে না ?

'এইখানটায় কি করা হচ্ছে শুনি ?'

কবি শিহরণ—হাওয়া খাইতে পার্কে বসিয়াছেন, চমকাইয়া দেখিলেন, বেঞ্চের পিছনেই বেশ জোয়ান দেখিতে প্রৌঢ় গোছের এক বেঁটে ভদ্রলোক দণ্ডায়মান। বুঝিতে কষ্ট হইল না, ইহারই গোঁফের তলা হইতে অমন পুরুষ কণ্ঠে প্রশ্নটা আসিয়াছে।

কবি ঢোঁক গিলিয়া স্খলিত কণ্ঠে কহিলেন, একটু মলয় বায়ু......পার্কের উন্মুক্ততার মধ্যে একটু মলয়'......

'মলয় বায়ুটা কি এই রেলিংটার ধারে সীমাবদ্ধ ?'

'আজ্ঞে ?'

'বলি, আমার বাড়ির এই জানলাটার মধ্য দিয়েই কি জল কান্তার সমস্ত মলয় বায়ু প্রবাহিত হয় নাকি ?' ভুজঙ্গধর চেঁচাইয়া কহিলেন। 'এসব কি ফাজলামি করা হচ্চে ছোকরা, বলতো ? নিজেকে বড় চালাক ঠাওরাচ্চ, না ? মলয় বায়ু !... মেয়েটা আমার বেওয়ারিশ সম্পত্তি নয় বুঝেচ। শোন ছোকরা, ইচ্ছে হোক হাঁ করে' এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। শোন ছোকরা, শুনে রাখ, মেয়ে আমার বাকদত্তা......বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেচে। এসব হ্যাংলাপনা আর চলবে না। এই সাবধান করে' দিয়ে গেলুম। এইবার সরে' পড়। ভবিষ্যতে যেন আর সাবধান করতে না হয়, বুঝেচ ?' বলিয়া ভুজঙ্গধর গোঁফ পাকাইতে আরম্ভ করিলেন।

কবি শিহরণ বুঝিয়াছে। গোঁফ পাকানোটাও তাহার ভাল লাগিল না। সে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ভাবটা এই ইতরলোকের সঙ্গে সে তর্ক করিতে চাহে না। অতঃপর সে বেঞ্চ হইতে উঠিয়া মলয় বায়ুতে চাদর উড়াইয়া উত্তর-মেরুর

বাড়ির দিকে আগাইয়া আসিতে আসিতে ভুজঙ্গধর দেখিলেন, মেয়ের ঘরের জানালা খোলা এবং জানালার ধারে মেয়ে সেই কাবাক ধরণের চোখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। 'তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে বাঁচা যায়,' ভুজঙ্গধর শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, 'সোমত্ত মেয়ে ঘরে রাখা কি সোজা কথা!'

এইরূপভাবে ভুজঙ্গধরবাবুর মেয়ে প্রতিভার বিয়ে ঠিক হইল। ভুজঙ্গধর অবশ্য 'ভাবি-জামাইয়ের অতীত অনুচিত আচরণের কথা স্মরণ করিয়া ব্যাপারটার উপর বিশেষ প্রসন্ন ন[হেন] কিন্তু দেখা গেল ঐ অনুচিত আচরণটাকে গৃহিণী আমলই দিলেন না। অন্যান্য দিক বিবেচনা করিয়া দেখা গেল, বোম্বাইয়ের কিকুভাই বিমলদাস অ্যান্ড ভাজিফদার কোম্পানী লিমিটেডের অনুপমকুমার মিত্র অনুপযুক্ত পাত্র নহে। সুতরাং আর অমত করা গেল না। কন্যাকে আর চোখে চোখে রাখিয়া পাহারা দিতে হইবে না, ভুজঙ্গধর ইহা হইতে সন্তোষ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলেন এবং দৃঢ়তার সহিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিবাহিত হইলে কোম্পানীর পৌনে দুইশত টাকা মাহিনা দেওয়ার কথাটা সম্পূর্ণ গাঁজা!

দশ

মস্ত একটা অফিস। কেরাণী, টাইপিস্ট, চাপরাসী, কলিং বেলের শব্দ, দূরে লিফটের দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার আওয়াজ, নূতন নূতন লোকের সমাবেশ। পার্টিসন দিয়া আড়াল করা এক কোণার একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখে সাহেবী পোষাক পরা যে কর্মচারীটি বসিয়া পেন্সিলটা চিবাইতেছে, সে-ই এই গল্পের নায়ক অনুপম কুমার। বেশ সুস্বাদু পেন্সিল; বাঁ হাতে কাগজগুলি চাপিয়া রাখিয়া সে বেশ আনন্দের সঙ্গে তারিয়া তারিয়া চর্বণ করিতেছে। ইহাতে সুফল হইল, সমস্যার সমাধান হইল, কঠিন যা ছিল সহজ হইয়া গেল। কাগজের উপর আঁচড় পড়িল।

এক মাসের কিছু বেশি দিন ধরিয়া সে কাজ আরম্ভ করিয়াছে চাকরি সংগ্রহে সে যে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়াছিল তাহাতে প্রথম দিন হইতেই সে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তার পর ইতিমধ্যে ম্যানেজার সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া ইয়ংগেশওয়ালা অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর চাপরাশীর সঙ্গে পর্যন্ত সে রীতিমত ভাব করিয়া লইয়াছে।

লেখা সমাপ্ত করিয়া সে সবেমাত্র একটা আরামের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে এমন সময় সম্মুখের দেওয়াল পঞ্জিকাটায় তাহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, তারিখটা আজ ১৫ই জুলাই। মুহূর্তে আরাম অন্তর্হিত হইল। ভুজঙ্গধর বিবাহে একরকম সম্মতি দিয়াছেন সত্য তবে সর্ত করিয়াছেন, যে বিবাহের কিছু পূর্বে তাহাকে উপস্থিত হইতে হইবে এবং ইনটারভিউতে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে তবেই প্রস্তাবটা পাকা করা হইবে। গরজ বড় বালাই; অনুপম তাহাতেই রাজী হইয়া চিঠি দিয়াছে। সুতরাং পরবর্তী সমস্যা ছুটি সংগ্রহ। মাত্র সেই দিন কাজে ঢুকিয়াছে এরই মধ্যে ছুটি পাওয়া সহজ নয়; ছুটি চাহিতেও

অনুপম চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল, তারপর নানা টমেণ্টের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া ম্যানেজারের ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

ম্যানেজার বেশ অমায়িক ফুর্তিবাজ লোক। আর্জি দিয়া ইংরেজিতে কহিলেন, 'সে কি হে, এক মাস হলো মাত্র যোগ দিয়েছ, এরই মধ্যে ছুটি! এখন-দেশে যাওয়ার কি না।'

অনুপম নখ খুঁটিয়া কহিল, খুব জরুরী কিনা, প্রায় জীবন-মরণ ব্যাপার। নইলে কিছুতেই আমি.....

'এতোই জরুরী? বিয়ে নাকি?'

'আজ্ঞে ঠিক তাই'। অনুপম স্বীকার করিল। 'আর কথা এই যে, শীগগির যদি না যেতে পারি, তবে কনে ফস্কে যাবে।'

'বটে' ম্যানেজার মিটিমিটি হাসিয়া কহিলেন, 'তবে তো গুরুতর কথা। চাকরিটা ফসকাচ্ছিলে, আবার কনেও যদি ফসকে যায়, তবে তো ভয়ংকর কথা'.....

'আজ্ঞে হাঁ।'

ম্যানেজার কলম উঠাইয়া লইলেন। মৃদু হাসিয়া কহিলেন, 'এক সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর করলাম। তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে এসো। মধুযামিনীটা কোথায় কাটাবে?'

মাথা নিচু করিয়া অনুপম কহিল, 'আজ্ঞে ট্রেনেই।'

নাচিতে নাচিতেই অনুপম বাহিরে আসিল। বাহিরের চেয়ারের সাথে ঠোক্কর খাইল, একজন কেরাণীর গায়ে হুমড়ি খাইয়া পড়িল এবং তা সত্ত্বেও লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতে লাগিল। এখনি একটা টেলিগ্রাম পাঠাইতে হইবে ভুজঙ্গধরকে। সুতরাং মুহূর্তকাল নষ্ট করা যায় না। মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল বাড়ির ঐ মেয়েটার মুখটা, নানা ঋতুতে নানারূপ হইয়া ওঠা মুখ। হঠাৎ খাইয়া সম্মুখে চাহিয়াও দেখিল একটি মুখ:—এটি দারোয়ানের মুখ, ইয়াসিন ওয়ালা ইয়াকুব ওয়ারেস!

ইহার পর একটা অবান্তর অনাবশ্যক কাল বাদ দেওয়া গেল।

হাওড়া স্টেশনে বম্বে মেল যাত্রার জন্য গর্জন করিতেছে। প্ল্যাটফর্মে বিস্তর নরনারীর ভিড়; কুলি ও ফেরিওয়ালার হাঁক-ডাক। ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা পড়িল; গাড়ি নড়িয়া উঠিল। এমন সময় দেখা গেল, একটি সেকেণ্ড ক্লাস কুপেতে ফিনফিনে ধুতি-পরা জামাই জামাই গোছের এক ছোকরা। জামাই-ই বটেন। ইনি অনুপমকুমার মিত্র। তার পাশেই দেখা গেল একটি মেয়ে। অনুপমের মধুযামিনী শুরু হইয়াছে।

অনুপম কহিল, কেমন?

প্রতিভা জবাব দিল, হুঁ।

'চাকরি পাওয়ার কথাটা তখন মিথ্যে বলি নি, প্রমাণ হলো তো?'

'কোথায় প্রমাণ হলো', দুষ্টুমির সুরে প্রতিভা কহিল, 'আগে বম্বে যাই, তবে তো।'

'চাকরিটা নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করেচি। স্ত্রীও নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করেচি। কেউ একটুও সাহায্য করে নি, মনে থাকে যেন।'

'আর একজন নিত্য প্রার্থনা করেছে।'

'প্রার্থনাতে কিছু হয় না।'

'এই তো হলো। বলিয়া ও-বাড়ির মেয়ে প্রতিভা মেসের ছেলে অনুপমের হাতটা ধরিয়া ফেলিল। এইবার অনুপম কহিল, ঠিক। হয়। আশ্চর্য উপায়ে গাঁটকাটার দায় হতে রক্ষা পেয়েছিলাম।'

'পাশের থার্ডক্লাস কামরায় একজন সাহেব চলিয়াছেন। পুরান, ঠিক মাপের চাইতে ডবল বড় একটা প্যাণ্ট পরনে, গায়ে ওপেন-ব্রেস্ট কোট, হাতা এত লম্বা যে, ভূতের হাতের মত হাত ঢাকা পড়িয়াছে। পায়ে আগাউঁচু জুতা; পায়ে মোজা নাই। সাহেব বিড়ি ফুঁকিতেছেন। ইনি ভজহরি। বেশ গোঁফ হইয়া গর্বিতভাবে সে বিড়ি ফুঁকিতেছে। বাবু যে চাকরি পাইয়াছেন, এটা যেন তারই কৃতিত্ব।

এমন সময় গাড়িতে টিকিট পরীক্ষার জন্য চেকার উঠিল। পূর্বে হইলে ভজহরি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত। এইবার সে ভ্রূক্ষেপই করিল না, ধোঁয়ায় কুণ্ডলী সৃষ্টি করিয়া চলিল।

'দুটো টিকিট! আর একটা কার?'

'একটা বেশিই কেনা হয়েচে,' ভজহরি ধোঁয়া ছাড়িয়া নির্লিপ্তস্বরে জবাব দিল।

'কেন?' বিস্মিত হইয়া চেকার প্রশ্ন করিল।

'সেবার বাবু যখন বোম্বাই গেলেন,' ভজহরি পা নাচাইতে নাচাইতে কহিল, 'থার্ড কেলাসেই গিয়েছিলেন। কিন্তু টিকিট কেনে নি! এইবার রেল কোম্পানীকে ক্ষতি পুষিয়ে দিলেন।'

(সমাপ্ত)

াগ্রগণ্যা সুন্দর পতিলাভ কর। শুভে, তুমি স্বামী সৌভাগ্য-ণী হইবে এবং নারায়ণ সমান পুত্র লাভ করিবে। জগদম্বিকে লোকে সকলের পূজার পূর্বে তোমার পূজা হইবে। নিখিল হ্মাণ্ডে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠা হইবে। তুমি ভক্তিনম্রভাবে আমাকে ংখ্যবার প্রদক্ষিণ করিয়াছ, তজ্জন্য আমি জন্মে জন্মে তোমার পর সন্তুষ্ট হইয়া আছি। অতএব তাহার ফললাভ কর। ন্তে, তীর্থ, অভীষ্ট দেবতা, গুরু, মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতিতে হাদের যেরূপ আস্থা তাহাদের সেইরূপ ফলই সিদ্ধ হয়। ই বলিয়া তিনি ব্যাঘ্র চর্মাসনে যোগাসন করিয়া পরব্রহ্ম ধ্যানে মগ্ন হইলেন। শৈলজা তাঁহার পাদমূল ধৌত করিয়া সেই রণামৃত পান করত বহিঃশুদ্ধ বস্ত্রে চরণদ্বয় মার্জনা করিয়া লেন। অতঃপর বিশ্বকর্মা বিরচিত রত্ন সিংহাসন ও অপূর্ব ধুপর্ক প্রদান করিলেন। মন্দাকিনী বারি পাদ্যরূপে দিয়া র্ঘ্যাদি দানপূর্বক নীলকণ্ঠের কণ্ঠে মালতী মালা অর্পণ রিয়া পুষ্পাঞ্জলি চতুষ্টয় দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। বস্ত্র জ্ঞোপবীত, ধূপ, দীপ, অলঙ্কার, আচমনিয়, নৈবেদ্য, পানীয়, াম্বূল প্রভৃতি যোড়শোপচারে পূজা সমাপ্ত করিয়া পুনরায় ণত হইলেন। পার্বতী এইরূপে প্রতিদিন শঙ্করকে পূজা রিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন।

অপ্সরাগণের মুখে সমস্ত শুনিয়া ইন্দ্র কামদেবকে প্রেরণ রিলেন। প্রতিদিনের মত পার্বতী পূজার জন্য শিব-সমীপ-তী হইয়াছেন, এমন সময় পঞ্চশর শর নিক্ষেপ করায় সেই অমোঘবাণও দেবাদিদেবের নিকট নিষ্ফল হইল। শঙ্কর ক্রোধে ম্পিত হইতে লাগিলেন। দেবগণ প্রমাদ গণিলেন। কামদেব হ দেবগণ তাঁহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিবের তৃতীয় নেত্র-সম্ভূত ভীষণ অনল ক্ষণকাল মধ্যেই মদনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে দেবতারা বিষাদিত হইলেন এবং পার্বতী বদন নত করিলেন। দেবগণ শোকাতুরা রতিকে প্রবোধ দিয়া ভীত চিত্তে অন্তর্হিত হইলেন। পার্বতী রতি বিলাপে মূর্চ্ছাতুরা হইয়াছিলেন। পরে চেতনা লাভ পূর্বক সেই গুণাতীত চন্দ্রশেখরের স্তব করিতে লাগিলেন; কিন্তু শঙ্কর সেই রোদনপরায়ণা পার্বতীকে পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান করিলেন। পার্বতীর দর্পভঙ্গ হইল। তিনি রূপ যৌবনের গর্ব ত্যাগ করিয়া সখীগণকেও মুখ দেখাইতে পারিলেন না। পিতামাতা, সখীগণ নিষেধ করিলেও, দেবী সে নিষেধ বাক্য উপেক্ষাপূর্বক পিতৃ-গৃহে না গিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন। তিনি মহর্ষিগণেরও দুঃসাধ্য সম্বৎসরব্যাপী অতি কঠোরতম তপস্যাতেও যখন শিব সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেন না, তখন অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যতা হইলেন। তখন আশুতোষের করুণার উদ্রেক হইল।

শঙ্কর এক খর্বাকৃতি বিপ্রবালকরূপে পার্বতী সমীপে উপস্থিত হইলেন। বালকের পরিধানে শুক্লবাস, গলদেশে শুক্র যজ্ঞোপবীত। হস্তে ছত্র ও দণ্ড, বক্ষে বিলম্বিত পদ্মবীজের মালা ও ললাটে উজ্জ্বল তিলক। বালককে দেখিয়া স্নেহের উদয় হওয়ায় পার্বতী হাস্য করিতে লাগিলেন দেবীর তপস্যাশ্রম আলোকিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজবর তুমি কে? দেবীর প্রশ্নে ঈষৎ হাস্য সহকারে অতি সুমধুর বাক্যে সেই বালক বলিলেন, কান্তে, আমি তপস্বী দ্বিজবালক, ইচ্ছা অনু-সারে ভ্রমণ করিয়া থাকি। সুন্দরী, তুমি কে? কেন তুমি এই দুর্গম নির্জন কাননে তপস্যা করিতেছ? তুমি কাহার কন্যা, কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তোমার নাম কি? তপস্যার ফলদায়িণী হইয়া কেনই বা আপনি এই তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছ! তুমি কি মূর্তিমতী তপোরাশি? তুমি কি জ্যোতিঃ-রূপা পরমেশ্বরী মূল প্রকৃতি? ভক্তের ধ্যানে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছ? অথবা তুমি সম্পদ্রূপা ত্রৈলোক্য লক্ষ্মী, ভক্তের রক্ষার নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? তুমি কি নিখিল জননী সাবিত্রী অথবা অখিল বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ভারতী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তুমি কে আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। অথবা তুমি যেই হও, তর্কের প্রয়োজন নাই। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। পতিব্রতা নারী প্রসন্না হইলে নারায়ণ তাহার উপর প্রসন্ন হন। তরুমূলে সিক্ত হইলে যেমন তাহার শাখা প্রশাখা সিক্ত হয়, তেমনই নারায়ণ সন্তুষ্ট হইলে জগৎ সন্তোষে থাকে। দেবী বালকের বাক্য শুনিয়া হাস্য সহকারে মধুর স্বরে বলিলেন, আমি সাবিত্রী, লক্ষ্মী অথবা বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নহি, আমি শৈলকন্যা পার্বতী। হে দ্বিজ আমি পূর্ব জন্মে দক্ষালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সতী নামে পরিচিতা ছিলাম। শঙ্কর আমার পতি ছিলেন। আমি পিতার মুখে পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করি। এ জন্মেও পুণ্যবলে শঙ্করকে পাইয়াছিলাম। কিন্তু অদৃষ্ট দোষে তিনি মদনকে ভস্ম করিয়া আমাকে পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। তিনি চলিয়া গেলে আমি মনস্তাপে পিতার গৃহ হইতে বনে আসিয়া তপস্যা করিতেছি। কিন্তু তপস্যা সফল না হওয়ায় অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগের সংকল্প করিয়াছি। তুমি আগমন করায় তাহাতে বাধা পড়িয়াছে। তুমি এক্ষণে অন্যত্র গমন কর। আমি অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা দূর করি। যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, জন্মে জন্মে যেন শিবকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হই। আমি কামনা করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিব এবং পরজন্মে শিবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইব। এই বলিয়া দ্বিজ বালকের নিষেধ না শুনিয়াই তিনি অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অঙ্গস্পর্শে অগ্নিও চন্দনের ন্যায় শীতল হইল। তখন সেই বিপ্র বালক তাঁহাকে বলিলেন, সেই অশরীরিকে পতিরূপে লাভ করিলে কি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে? কোন্ রমণী সংহার কর্তাকে পতিরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা করে? তিনি সংহার কর্তা, তিনি তো মঙ্গল মোক্ষপ্রদ নহেন। যাহা হউক তোমার কল্যাণ, তুমি পিতৃ-গৃহে গমন কর, আমার আশীর্বাদ ও তোমার তপস্যার ফলে সেইখানেই তোমার সুদুর্লভ শঙ্করের দর্শন লাভ ঘটিবে। বালক অন্তর্হিত হইলেন। দুর্গাও শিব শিব জপ করিতে করিতে পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

একদিন হিমাচল মন্দাকিনী তীরে তপস্যার্থ গমন করিলে সহসা এক ভিক্ষুক অন্তঃপুরে মেনকার নিকট আসিয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। ভিক্ষুক অতি বৃদ্ধ, তাহার পরিধানে র বস্ত্র ও দক্ষিণ হস্তে শিঙ্গা, বাম হস্তে ডমরু, সর্বাঙ্গে বিভূতি [illegible] জটা। গান শুনিয়া মেনকা ও পার্ব

মূর্ছিত হইলেন। পার্বতী দেখিলেন, ব্যাঘ্র চর্ম পরিহিত শঙ্কর তাঁহার হৃদয়দেশে উদিত হইয়াছেন এবং বর গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। পার্বতী বলিলেন, তুমিই আমার পতি হও। শিব 'তাহাই হইবে' বলিয়া হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইলেন। চেতনা লাভ করিয়া পার্বতী দেখিলেন—ভিক্ষুক নৃত্য করিতেছে। মেনকাও সংজ্ঞালাভ করিলেন। তিনি স্বর্ণপাত্রে বিবিধ রত্ন লইয়া ভিক্ষা দিতে গেলে ভিক্ষুক তাহা গ্রহণ করিলেন না তিনি পার্বতীকে ভিক্ষা চাহিলেন। মেনকার ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন, মহাদেব আমার উমার বর হইবে, আর ভিক্ষুকের স্পর্ধা দেখ। এমন সময় গিরিরাজ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া প্রাঙ্গণে ভিক্ষুককে দেখিলেন এবং সমস্ত শুনিয়া রক্ষীদিগকে বলিলেন, ভিক্ষুককে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও। রক্ষিগণ কিন্তু ভিক্ষুকের সমীপস্থ হইতে সাহসী হইল না। এ দিকে হিমালয় দেখিলেন, ভিক্ষুক চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন, তিনি স্বয়ং নারায়ণ। পরক্ষণেই দেখিলেন, তিনি বৃষবাহন চন্দ্রমৌলি শঙ্কর। দেখিতে দেখিতে ভিক্ষুক অন্তর্হিত হইলেন। তখন মেনকা ও পর্বত-পতি বুঝিতে পারিলেন, আশুতোষ দয়া করিয়া স্বয়ং গৃহে আসিয়াছিলেন এবং অদৃষ্ট দোষে বঞ্চনা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা মনে মনে শঙ্করকে স্মরণ করিলেন।

তাঁহাদের শিবভক্তি দেখিয়া দেবগণ চিন্তান্বিত হইলেন। একে তো সৎপাত্রে কন্যা দান অপরাপর দান হইতে শ্রেষ্ঠ। তার উপর স্বয়ং চন্দ্রশেখরের করে কন্যা দান হিমালয় নারায়ণ সাযুজ্য লাভ করিবে। তাহা হইলে ভারত রত্নগর্ভা নামে বঞ্চিত হইবে। কারণ হিমালয় অনন্ত রত্নের আকর। দেবগণ বৃহস্পতিকে বলিলেন, আপনি গিয়া হিমালয়ের নিকট শিবনিন্দা করুন। অনিচ্ছায় কন্যা দিলে পুণ্য হানি ঘটিবে। সুতরাং হিমালয়ের মোক্ষ হইবে না। দেবগণকে ভর্ৎসনা করিয়া বৃহস্পতি শিব-নিন্দা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, শিবনিন্দা মহাপাপ, নরকের হেতু। পরনিন্দা মাত্রেই বিনাশজনক। তোমরা শিবের নিকট যাও। তিনিই হিমালয়ে গিয়া নিজেই নিজের নিন্দা করিয়া আসিবেন। তাহাই হইল। দেবতাদের প্রার্থনায় শিব ব্রাহ্মণ বেশে হিমালয়ের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধানে মনোহর বস্ত্র ললাটে তিলক, হস্তে ছত্র ও দণ্ড করে স্ফটিক মালা, গলে বাঁধা বস্ত্রাবৃত শালগ্রাম। হিমালয় তাঁহার পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি ঘটক। আমি সর্বস্থানে যাই, সকলের মনের কথা জানিতে পারি। তুমি শিবকে কন্যাদান করিবার সংকল্প করিয়াছ। তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবদের জিজ্ঞাসা কর শিব নিরাশ্রয়, সঙ্গহীন, রূপহীন গুণ-হীন, শ্মশানবাসী। সে ভূতপতি এবং যোগী। সে দিগম্বর, বিভূতি ও সর্পভূষণ, সুতরাং ব্যালগ্রাহী। মৃত্যুর বিষয় অপরি-জ্ঞাত সেই ভবে অনাথ ও অজ্ঞাত বয়স অতি বৃদ্ধ সর্বাশ্রয় ভ্রমণ-কারী। একমাত্র কালরূপে সর্পেই সে সদয়, তাহার মস্তকে জটাভার এবং সে নির্ধন। এহেন শিবকে কন্যা দান একেবারেই অকর্তব্য। এই সমস্ত বলিয়া তিনি শীঘ্র শীঘ্র স্নানাহার [illegible] হিমালয় গৃহ হইতে [illegible]

কাটিয়া অনর্থ বাধাইলেন—কিছুতেই শিবকে কন্যাদান করিব না। তিনি পার্বতীকে লইয়া ক্রোধাগারে চলিয়া গেলেন। অরুন্ধতী আসিয়া তাহাকে বুঝাইলেন। সপ্তর্ষিগণ আসিয়া হিমালয়কে শম্ভুর মহিমা শুনাইলেন, দুর্গার পূর্বজন্ম কথা বলিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণের পরাক্রমের কথাও স্মরণ করাইয়া দিলেন। আবার পুণ্যের প্রলোভনও দেখাইলেন। মেনকা ও হিমালয় কন্যাদানে সম্মত হইলেন।

চতুর্দিকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হইল। মার্গশীর্ষ মাসের সোমবারে বিবাহের দিনস্থির করিয়া শিবের নিকটে মঙ্গল পত্র পাঠানো হইল। তণ্ডুলের পর্বত, চিপিটকের পর্বত ও তৈল, ঘৃত, ক্ষীর, দধি, গুড়, আসব ও নবনীত আদিপূর্ণ দীর্ঘিকা প্রস্তুত করাইয়া হিমালয় পিষ্টক ও লড্ডুকাদির প্রচুর আয়োজন করিলেন। বিবাহের দিনে সুসজ্জিতা পার্বতীকে নারীগণ দূর্বাক্ষতযুক্ত দর্পণ ধারণ করাইলেন। বরযাত্রিগণ সহ শিব যখন হিমালয়ে আসিলেন, তখন দেখা গেল তাঁহার হস্তেও রত্নময় দর্পণ শোভা পাইতেছে। তিনি তখন একবদন, দ্বিনয়ন, রত্না-ভরণে ভূষিত, নবযৌবনমণ্ডিত সর্বচিত্তহারী মনোহর রূপ ধারণ করিলেন। সকলেই পার্বতীর ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যুবতীগণ ধন্য ধন্য বলিয়া নানাজনে নানারূপে হাবভাব প্রকাশ করিলেন। অতঃপর অন্তঃপুর পরিচারিকাগণ সুসজ্জিত পার্বতীকে রত্ন সিংহাসনে বসাইয়া বাহিরে আনিলেন এবং শিবকে প্রদক্ষিণ করাইলেন। গিরিরাজ পুরোহিতের সহিত আসিয়া যথারীতি কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সম্প্রদানের পর তিনি বিবিধ রত্ন ও রত্নময় পাত্র যৌতুক দান করিলেন। তাহার পর লক্ষ গো, রত্নময় কম্বল, সহস্র সহস্র উত্তম হস্তী, ত্রিশ লক্ষ অশ্ব, বিশুদ্ধ রত্নভূষিতা অনুরক্তা লক্ষ দাসী, পার্বতীর ভ্রাতৃতুল্য শত সংখ্যক দ্বিজবালক, রত্নেন্দ্রসার নির্মিত একশত রথ শঙ্করকে দান করিলেন। শঙ্কর গিরিরাজ প্রদত্ত দ্রব্যসহ পার্বতীকে স্বস্তি বলিয়া গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মহাদেব পার্বতীকে বাম পার্শ্বে বসাইয়া যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ শেষে ব্রাহ্মণকে শত সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিলেন। এইবার সকলে হরপার্বতীকে গৃহে প্রবেশ করাইলেন এবং নির্মঞ্ছনাদি শেষে বরবধূকে বাসর ঘরে লইয়া গেলেন।

বাসর গৃহে প্রবেশ করিয়া মহাদেব দেখিলেন তথায় ষোড়শজন মনোহারিণী রমণী সহ অসংখ্য দেবকন্যা, নাগকন্যা, মুনিকন্যা প্রভৃতি অবস্থান করিতেছেন। শিব রত্নাসনে উপ-বেশন করিলে সকলেই শিবকে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। প্রথমেই সরস্বতী বলিলেন, মহাদেব এখন তো প্রাণাধিক সতীকে পাইয়াছ, তাহার সর্বাবয়ব সুন্দর মুখচন্দ্র দেখিয়া আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া কালাতিপাত কর, আমার আশীর্বাদে তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটিবে না। লক্ষ্মী বলিলেন দেবেশ, সতী বিরহে প্রাণ তো বিগতপ্রায় হইয়াছিল, তুমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া সেই সতীকে বক্ষে লইয়া সুখে অবস্থান কর। এই নারীগণকে আবার লজ্জা কি? সাবিত্রী বলিলেন, শম্ভু, আর খেদ করিও না, এক্ষণে স্বয়ং ভোজন করিয়া সতীকে ভোজন করাও এবং [illegible] তাম্বুল [illegible]

রতি বলিলেন, আপনি তো পার্বতীকে পাইয়া দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করিলেন, কেন অকারণে কামকে ভস্মীভূত করিলেন? এই বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে কামের দেহাবশেষ ভস্মমুষ্টি বাহির করিয়া বাসর ঘরেই কাঁদিতে লাগিলেন। কান্না শুনিয়া ব্রহ্মা নারায়ণ আদি বাসরেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাদেব স-সম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রতিকে দেখাইয়া বলিলেন, যাহা হয় করুন। নারায়ণ বলিলেন, মহাদেব শীঘ্র কামকে জীবিত কর। এই বলিয়াই শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দেবীগণও অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাদেবের কৃপাদৃষ্টিতে সেই ভস্মরাশি হইতে কামদেব পুনরুজ্জীবিত হইলেন। কাম মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিয়া নারায়ণ প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের সঙ্গেই অবস্থিতি করিলেন। হিমালয় বরযাত্রিগণকে ভোজন করাইয়া শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এদিকে শম্ভু বাসরঘরে পার্বতীকে বাম দিকে বসাইয়া মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া আপনি ভোজন করিলেন। তখন দেবমাতা অদিতি বলিলেন, শীঘ্র পার্বতীর আচমনের নিমিত্ত জল দান কর। শচী বলিলেন যে, সতীর শবদেহ বক্ষে ব্রহ্মাণ্ডময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছ, সেই প্রিয়তমাকে আবার লজ্জা কি? লোপামুদ্রা বলিলেন, স্ত্রীগণের এই ব্যবহার আছে যে, স্বামী বাসরঘরে ভোজন করিয়া প্রিয়তমাকে তাম্বূল প্রদান করত তাহার সহিত শয়ন করিবে। অরুন্ধতী বলিলেন, আমিই মেনকাকে বলিয়া পার্বতীকে তোমায় দান করাইয়াছি। অতএব তুমি ইহাকে বিবিধ প্রবোধ বাক্যে সন্তুষ্ট করত ইহার সহিত বিহার কর। অহল্যা বলিলেন, তুমি বৃদ্ধাবস্থা ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই মেনকা তোমাকে প্রাত্র মনোনীত করিয়াছেন। তুলসী বলিলেন, সতীকে পরিত্যাগ ও কামকে দগ্ধ করিয়া আবার কেন সতীর জন্য বশিষ্ঠকে পাঠাইয়াছিলে? স্বাহা বলিলেন, তুমি নারীগণের কোন কথার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাক। বিবাহে রমণীগণের প্রগলভতা ব্যবহারসিদ্ধ। রোহিণী বলিলেন, হে কামশাস্ত্রবিশারদ তুমি পার্বতীর অভিলাষ পূর্ণ কর। স্বয়ং কামী হইয়া কামিনীকে কামসাগর পার করিয়া দাও। বসুন্ধরা বলিলেন, কামপীড়িতা রমণীগণের সমস্ত স্বভাব তুমি অবগত আছ। নারী স্বামীকে রক্ষা করে না, স্বামীই রমণীকে রক্ষা করে। শতরূপা বলিলেন, ক্ষুধাতুর ভোগী ব্যক্তি ভোগ্য দ্রব্য ব্যতীত তৃপ্ত হয় না। যাহাতে স্ত্রীর তুষ্টি হয় তাহাই কর। সংজ্ঞা বলিলেন, তোমরা কোন নির্জন প্রদেশে মনোহর শয্যা রচনাপূর্বক রত্নপ্রদীপ ও তাম্বূল দিয়া পার্বতী সহ শঙ্করকে সেই স্থানে পাঠাইয়া দাও। এইবার মহাদেব উত্তর করিলেন। শঙ্কর বলিলেন, দেবীগণ আমার নিকট এরূপ বাক্য বলিবেন না। সাধ্বী জগজ্জননীগণের পুত্রের নিকট এরূপ চপলতা কেন? তখন দেবীগণ লজ্জিতা হইয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। শঙ্কর মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া আচমন করত তাঁহার সহিত তাম্বূল গ্রহণ করিলেন।

প্রভাতে দেবগণ কৈলাসে প্রস্থান করিলেন। মহাদেবও পার্বতী সহ যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। মেনকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আশুতোষ, তুমি পার্বতীর সহস্র দোষ ক্ষমা করিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিও। পার্বতী কাঁদিতে লাগিলেন। হিমালয় আসিয়া পার্বতীকে বক্ষে ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। নারায়ণ সকলকে প্রবোধ দিলেন। তখন পার্বতী মাতাপিতা ও গুরুজনকে প্রণাম করিলেন। অতঃপর তাঁহারা কৈলাসে উপস্থিত হইলে দেবপত্নীগণ প্রদীপ সহ মঙ্গল কর্ম সমাধা করিলেন। মহাদেব সতীকে তাহার পূর্বালয় দর্শন করাইয়া পূর্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিলে পার্বতী বলিলেন আমার সমস্তই স্মরণ আছে, তুমি মৌনাবলম্বন কর। দেবগণ ভোজনান্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হরপার্বতী সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিছুদিন গত হইলে, হিমালয় ও মেনকা পুত্র মৈনাককে কৈলাসে পাঠাইয়া হরপার্বতীকে সঙ্গে লইয়া আসিতে বলিলেন। মৈনাক কৈলাসে গিয়া হরপার্বতীকে লইয়া আসিলেন। পার্বতী রথ হইতে নামিয়া পিতামাতা ও গুরুজন-দিগকে প্রণাম করিলেন। হরপার্বতীকে দেখিয়া সকলেই আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ভগবান চন্দ্রশেখর নিত্য ষোড়শ উপচারে পূজিত হইয়া শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একমাত্র এই উপাখ্যান আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, পুরাণখানির বর্তমান রূপ বেশী দিনের পুরাতন নহে। পুরাণখানি বোধ হয় কম বেশী প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে সংকলিত হইয়াছিল। এবং এই পুরাণের বর্তমান রূপদাতা বাঙালী ছিলেন। বাঙলায় রাধাকৃষ্ণ কথা, হরপার্বতী কথা ও মনসা মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতির কথার যে একটি স্বতন্ত্র লৌকিক ধারা প্রচলিত ছিল, ব্রহ্মবৈবর্তে তাহার পরিচয় আছে।

নাটক

রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চলন্ত কালের স্রোত—
উন্মাদ উচ্ছল বেগে।
ছুটে চলে তরঙ্গের তোরণে তোরণে;
ধ্বসিয়া ধ্বসিয়া ওঠে ধরা,
নিখিলের ভিত্তিমূলে দিয়ে যায় নাড়া।
পাঁজরে পাঁজরে ধরে চিড়;
ধ্বসে পড়ে ধীরে ধীরে লক্ষ শত যুগের সাধনা।
ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা
মানসিক জীবনের যত ইতিহাস।
মিশরের পিরামিড; চীনের প্রাচীর।

কালস্রোতে ভেসে যায়
জীবন যৌবন ধন মান।
স্পষ্টবাদী ইতিহাস;
বলে গেল কতবার কত যুগ-যুগান্তের
অজানা রহস্য আর বিপুল বিকৃতি।
কত রাজ্য ভাঙা গড়া;
কতবার কত রক্ত নিয়ে গেল কারা।
দধিচীরা আজ নাই;
আজো কিন্তু বজ্র আছে খাড়া।
শ্মশানে ফসল হ'ল,
কবরের কফিনেতে রচা হ'ল
যুগের কাঠামো।
কত সূর্য উঠেছিল
পশ্চিমেরে কতবার কত ব্যঙ্গ করি;
পলাশীতে কতবার পলায়নের হ'ল সমারোহ।

কিছুই রবে না বাকি;
ক্ষমাহীন মহাকাল করিতে জানে না ক্ষমা
যুগ হ'তে যুগান্তরে এই স্রোতে
ভেসে গেল পশু ও মানুষ
গ্রাম মাঠ নগর প্রান্তর
রোম ; ব্যাবিলন!
নাচিয়া তাথিয়া ওঠে কাল
ডমরুর দুর্জয় আগ্রহে।
দিকে দিকে ধ্বংসের তাণ্ডব—
কুলিশ-কঠোর মহাকাল।
শতাব্দীর শবগাত্রে আজো আছে লিখা,
উলঙ্গ কালের নৃত্য বহ্নিমান কত [illegible];
সালামিস্ আর গ্যালিপলি;

এখনো অনেক বাকি!
আজো তার হয় নাই শেষ।
আকাশ ধোঁয়ায় ভরা,
বিষবাষ্পে কম্পমান তারাদের দল।
নিম্নে কালস্রোত;
রক্ত স্রোতে ভেসে যায়
গ্রাম মাঠ নগর প্রান্তর
সভ্যতার যত ইমারত—
পোলাণ্ড ; হেলাস্ ; স্পেন।
এ কাল নহে ত কাল,
এ যে মহাকাল।
মানুষের ইতিহাসে নির্দ্বন্দ্বী নায়ক;
এ নাটকে শুরু কোথা—
সমাপ্তি সে আরো কত দূর?

দিন

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার চোখের কোণে যদি বাদুড়ের
কাঁপে কালো পাখা,
যদি শোন একা বসে কালো বাদুড়ের
নিশীথের ডাকা,
আর যদি কাঁপে বন হু-হু বাতাসেতে
বিরাম-বিহীন;
মনে ক'রো এলো তবে স্বপনে রঙীন—
আমাদের দিন।

ওদিকে প্রদীপ-শিখা যদি নীল হয়ে
ধীরে নিবে যায়,
রাতের শিশির যদি ঝরে ফিকে-নীল
আঁখির পাতায়,

আকাশের শুকতারা কেঁপে কেঁপে যদি
হয়ে আসে ক্ষীণ;
জেনে রেখো, এলো তবে স্বপনে রঙীন—
আমাদের দিন।

তোমার অলকে গোঁজা সুরভি কুসুম
যদি যায় ঝরে,
তোমার আঁখির 'পরে সোনালী আলোক
যদি যায় মরে,
পথ-চলা গান সাথে যদি থেমে যায়
হৃদয়ের বীণ;
[illegible]
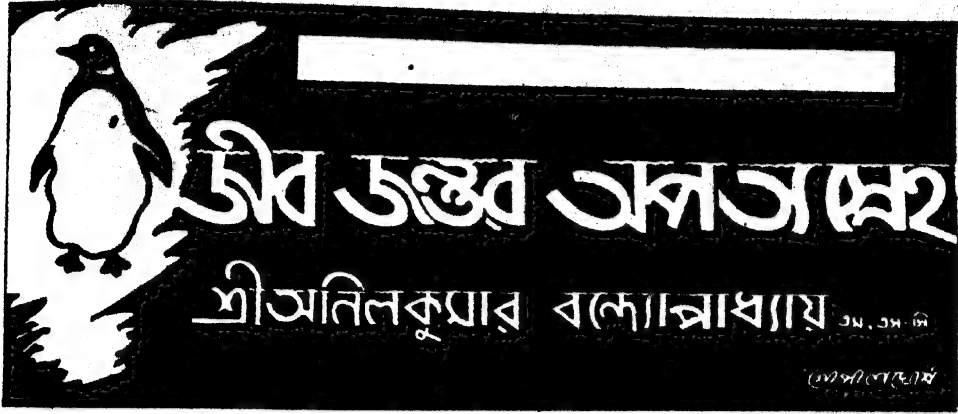
পৃথিবীতে বাস করিয়াও আমরা যে অপার্থিব জিনিষ ভোগ করিয়া থাকি তাহা মাতা-পিতার অপত্য স্নেহ। সন্তানের প্রতি মমতা সকল দুঃখকে সহনীয় করিয়া আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে—বাৎসল্য রসের উষ্ণ-প্রস্রবণ মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব প্রদান করিয়াছে—এই অপত্য স্নেহ মাতা-পিতাকে স্বর্গীয় জ্যোতিতে দেদীপ্যমান রাখিয়াছে।

মনুষ্য সমাজে সন্তানের জন্য গর্ভস্থ ভ্রূণ হইতে আজীবনকাল মাতাপিতার স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত এতই সাধারণ ও স্বাভাবিকতার পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে মনে হয় এই বাৎসল্য-রস বুঝি কেবলমাত্র মানব হৃদয়েই ফল্গু-ধারার ন্যায় বহিয়া থাকে—বুঝি আর কোন জীব ইহার অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা সর্বৈব ভ্রান্ত। সহজাতবৃত্তি বা instinct-এর ন্যায় এই অপত্য স্নেহ অনেক নিম্নতর প্রাণীর মধ্যেও বিদ্যমান থাকিয়া পৃথিবীকে শোভনসুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

বানরগণ সাধারণত বাসা বাঁধিয়া বাস করিবার পক্ষপাতী নয়, তথাপি সন্তান পালনে তাহাদিগকে যথেষ্ট যত্ন লইতে ও শ্রম স্বীকার করিতে দেখা যায়। বানর শিশুর বৃক্ষারোহণের প্রাথমিক প্রচেষ্টাগুলি ইহারা অপরিসীম ধৈর্যের সহিত নিরীক্ষণ করিতে থাকে ও কখন কখন তাহাদের সাহায্যার্থে আপনার লেজ ঝুলাইয়া দিয়া আরোহণ প্রচেষ্টায় প্ররোচিত করিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা লেজ ধরিয়া টানাটানি করিয়া মজা পাইবার দুষ্টবুদ্ধিতাকে প্রশ্রয় দেয় না। বানর-মাতা যেমন স্নেহ করিতে জানে তেমনি শাসন করিতেও জানে এবং প্রয়োজন বুঝিলে অবাধ্য দুষ্ট সন্তানের সংশোধনের জন্য দক্ষিণ হস্তের প্রবল চপেটা-ঘাত করিতেও বিরত হয় না। দক্ষিণ আমেরিকার গায়না অঞ্চলে এক প্রকার নিশাচর বানর আছে। সন্তান স্তন্যপান ছাড়িয়া অন্য আহার্যে মনোনিবেশ করিলেও মাতা অনেক দিন অবধি সন্তানের প্রত্যেক গ্রাস খাদ্য আগে আপনি চাখিয়া বিষাক্ত অথবা খাইবার যোগ্য কিনা পরীক্ষা করিয়া পরে তাহাকে ভক্ষণ করিতে দেয়।

বাদুড় এবং শশক-মূষিকাদিবর্গের নানা জাতির মধ্যেও শিশু পালনের অনুরূপ রীতি প্রচলিত আছে।

সিংহ-শাবকদিগকে শিকার ধরার প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদের মা শুইয়া শুইয়া আপনার লেজ একবার এদিকে একবার ওদিকে ঘুরাইতে ফিরাইতে থাকে। চঞ্চলমতি শাবকগণ তাহাতে যেন একটা মজার খেলা পায় এবং ছুটিয়া গিয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া লেজের অগ্রভাগ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। তথাপি তহাদের মা খুশী মনেই এই-সব দুরন্তপনা সহিয়া থাকে।

পার্বত্য ছাগ-শিশু যাহাতে প্রথম হইতেই পর্বতের বন্ধুর

বানর তাহার শাবককে আদর করিতেছে

পথ চলাচলে অভ্যস্ত হইতে পারে—উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিবার জন্য যাহাতে পা সুদৃঢ় হয়—সেজন্য তাহাদের মা অনেক সময় অর্ধশায়িতভাবে অবস্থান করে, আর শাবকগণ তাহার গায়ের উপর উঠা-নামা করিয়া গড়াইয়া পড়িয়া খেলার ছলে আরোহণ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে।

খেলার ছলে ব্যতীত কোন কোন প্রাণীর মধ্যে সন্তান-সন্ততিকে দস্তুরমত জোর করিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও প্রচলিত

আছে। শীতপ্রধান আলাস্কার সিন্ধু-সিংহ নামে অটার গোষ্ঠি অন্তর্গত বহিষ্কর্ণযুক্ত সীল জাতীয় এক প্রকার প্রাণী আছে ইহারা জলচর হইলেও পনের-বিশ মিনিট অন্তর জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া শ্বাস গ্রহণ করে এবং বাচ্চা হইবার কালে ডাঙ্গায় আসিয়া বাস করে। শাবকের এক মাস বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই মাতাপিতা তাহাকে সন্তরণ শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে এবং সে তখন জলে নামিতে একান্ত অনিচ্ছুক ও ভীত হইলেও তাহারা একরকম জোর করিয়াই তাহাকে সাগর জলে ঠেলিয়া দেয়।

পার্বত্য অঞ্চলের স্বর্ণ-ঈগল অতি চমৎকারভাবে আপন শাবককে উড়িবার শিক্ষা দিয়া থাকে। ইহারা সন্তানকে প্রথমে একটুকরা খাদ্যের লোভ দেখায়। পরে সেই টুকরাটি ঠোঁটে লইয়া আস্তে আস্তে খানিকটা উড়িয়া যায় ও শাবককে অনুসরণে প্ররোচিত করে। পরিশেষে মা বাসার কাছাকাছি কোন স্থানে তাহা নিক্ষেপ করে। তখন লুব্ধ শাবক তাহার ডানায় ভর করিয়া খাদ্যখণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

মনুষ্য সমাজে মাতৃহারা অনাথ শিশুকে যেমন কোন কোন আত্মীয়া অথবা বেতনভোগিণী ধাত্রী সন্তানবৎ স্নেহে পালন করিয়া থাকেন পশুপক্ষীর মধ্যেও অনুরূপ বাৎসল্য-রস দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে ওয়ালটার গুডফেলো নামে এক বিখ্যাত পক্ষী-সংগ্রহকারী জাভা দেশীয় চড়ুই পাখীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, সিঙ্গাপুরের পাখীর বাজারে এক একটি খাঁচায় প্রায় গোটা পঞ্চাশেক বাচ্চা ও একটি বা দুইটি ধাড়ী পাখী থাকে। যখন খাঁচায় খাবার দেওয়া হয়, তখন বাচ্চাগুলিকে খাওয়াইবার জন্য ধাড়ী চড়াইয়ের যে কি অপরিসীম আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় তাহা সত্যই দেখিবার জিনিস। আপনার ঠোঁটে খাবার তুলিয়া ইহারা শাবকদের মুখে পুরিয়া দেয় এবং তাহাদের নিজেদের জন্য যে একটি কণারও প্রয়োজন

পেঙ্গুইন তাহার বাচ্চার পালক পরিষ্কার করিতেছে

কোকিল তাহার শিশুকে খাবার দিতেছে

সে কথা স্মরণ হইবার বহু পূর্বেই সমস্ত খাদ্য নিঃশেষ হইয়া যায়।

দক্ষিণ মেরুর পেঙ্গুইন পাখীর অপত্য-স্নেহ এতই প্রবল যে কোন শাবক মাতৃ-পিতৃহীন হইলে ইহারা সবাই মিলিয়া তাহাকে লালন-পালনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে এবং এতগুলি পালক মাতাপিতার ভালবাসার চোটে প্রায়ই সেই শাবকের প্রাণান্ত ঘটিয়া থাকে। আবার ডিম্ব প্রসব করিয়া সেই ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইবার পূর্বেই যদি কোন পেঙ্গুইন মারা যায়, তাহা হইলে সেই অপ্রস্ফুটিত ডিম্বে তা দিবার জন্য স্ত্রী পেঙ্গুইনদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায় এবং ফলে তাহা প্রায়ই নিষ্পেষিত হইয়া নষ্ট হয়।

মনুষ্য সমাজে সন্তান পালনের দায়িত্ব মাতাপিতা উভয়েই বহন করে। প্রাণি জগতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণত এই ভার স্ত্রী প্রাণীই বহিয়া থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রী প্রাণীরা শুধু গর্ভধারণ ব্যতীত আর কিছুই করে না, সন্তান পালনের সব দায়িত্বটুকুই পিতার উপর গিয়া পড়ে।

দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিলের জঙ্গলে মারমোসেট নামে এক জাতীয় কাঠবিড়ালাকৃতি ক্ষুদ্র বানর আছে। চপলমতি স্ত্রী-মারমোসেট সদ্যপ্রসূত সন্তানের প্রতি কোনই মমতা প্রদর্শন করে না। পিতা পরম যত্নে সন্তানকে কোলে তুলিয়া লয় এবং যে পর্যন্ত না শাবক যথেষ্ট বড় হয় ততদিন তাহাকে বুকে লইয়াই সে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে বিচরণ করিতে থাকে। কেবল মাঝে মাঝে সন্তানের ক্ষুধা পাইলে তাহাকে স্তন্যপান করাইবার জন্য মায়ের কাছে ধরিয়া দেয়। মাতা এমনই নিষ্ঠুর যে নিতান্ত

অনিচ্ছাবশত কোন গতিকে স্তন্যদান সমাধান করিয়াই নূতন কোন খেলার আশায় সন্তানকে ফেলিয়া স্থানান্তরে ছুটিয়া যায়।

রিয়া, এমু ও অন্যান্য অস্ট্রিচ বা উট পাখীদের মধ্যে সন্তান পালনে পুরুষের দায়িত্বই বেশী। পুরুষেরা বালি খুঁড়িয়া ডিম পাড়িবার গর্ত তৈয়ারী করে এবং পরে সেই ডিম যাহাতে নষ্ট না হয় সেজন্য পাহারা দিয়া থাকে। যেখানে উত্তাপ অপেক্ষাকৃত কম সেখানে ডিমে তা দিতে হয় এবং এই কার্যও পুরুষেই সম্পাদন করিয়া থাকে। দীর্ঘ চল্লিশ দিন ধরিয়া পুরুষ অস্ট্রিচ ডিমের উপর বসিয়া থাকে। ক্বচিৎ হয়ত স্ত্রী-পাখী দয়িতের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে একটু বিশ্রাম করিতে দিবার জন্য সহযোগার্থ আগাইয়া যায়।

মাকড়সা ও তাহার ডিম

উভচর ব্যাঙের মধ্যেই পিতার অপত্য-স্নেহের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় রিনোডার্মা ডারুইনি (Rhinoderma darwini) নামে এক জাতীয় অতি ক্ষুদ্র ব্যাঙ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষ ব্যাঙের গলার তলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের দুই পার্শ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত এক স্বরস্থলি আছে। স্ত্রী-ব্যাঙ ডিম্ব প্রসব করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ ব্যাঙ সেগুলি গিলিয়া ফেলিয়া আপনার স্বরস্থলিতে সংরক্ষিত রাখে। ডিমগুলি ক্রমে তাহাতেই প্রস্ফুটিত হয় এবং পরে ব্যাঙাচিরা লেজবিহীন ক্ষুদ্র ব্যাঙরূপেই বাহির হইয়া আসে।

এলাইটিস নামে ইউরোপের এক জাতীয় সাধারণ ব্যাঙকে "ধাত্রী ব্যাঙ" নামে অভিহিত করা হয়। স্ত্রী ব্যাঙ যে ডিমগুলি প্রসব করে সেগুলি লম্বা লম্বা মালার আকারে গ্রথিত থাকে। পুরুষ ব্যাঙ সেই ডিমের মালাগুলি তাহার পিছনের দুই পায়ে বেশ করিয়া জড়াইয়া লয় এবং সাবধানতার সহিত মৃত্তিকা-নিম্নস্থ কোন গহ্বরে চলিয়া যায়। রাত্রিকালে সে অতি সন্তর্পণে সেই গর্ত হইতে উঠিয়া ডিমগুলি নিকটবর্তী কোন পুষ্করিণীর জলে ভিজাইয়া লয় অথবা নিকটে কোন জলাশয় না থাকিলে সেগুলি শিশিরসিক্ত করিয়া লয়; এবং যতদিন না ডিম ফুটিয়া ব্যাঙাচি বাহির হইয়া আসে ততদিন এইরূপ চলিতে থাকে।

দীর্ঘাকৃতি নল-মাছের (Syngnathus) এবং ক্ষুদ্রাকার সিন্ধু ঘোটক মাছের (Hippocampus) পুরুষেরা তাহাদের পার্শ্বদেশের গাত্রচর্ম বা কোমর-পাখনাদ্বয়ের সম্মেলনে শরীরের তলদেশে ডিম্ব সঞ্চয় বা শাবক সংরক্ষণের জন্য এক প্রকার থলি নির্মাণ করে। প্রসবকালে স্ত্রী-মাছ আপন ডিম্বগুলি পুরুষের সেই থলিতে প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং কালক্রমে তথা হইতে বাচ্চা বাহির হইয়া আসে।

উপরি উক্ত দৃষ্টান্তগুলি হইতে বুঝিতে পারি, অপত্য-স্নেহ শুধু মানুষের একার সামগ্রী নয়। আমাদের দৃষ্টিকে স্থূলে "অহমিকা"র মধ্যে নিবদ্ধ না রাখিয়া যদি একটু উদার একটু সম্প্রসারিত করিয়া আমাদের চতুঃপার্শ্বে মেলিয়া ধরিতে পারি, তাহা হইলে নিম্নতর জীবের মধ্যেও অপত্য-স্নেহের বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হই। এই বাৎসল্য-রস-নির্ঝর লোকচক্ষুর অন্তরালে সর্বকালে সর্বজীবের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া সৃষ্টিকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে—এই স্নেহসুধার অভিসিঞ্চন যুগে যুগে প্রচার করিয়া আসিতেছে স্নেহময়ী প্রকৃতির শাশ্বত মহিমা।

বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ

(৩৭৭ পৃষ্ঠার পর)

: ও দৌর্বল্য শারীরবৃত্ত কারণে (Physiological) বটে এবং কারণ আবিষ্কার্য; ধরা যাক তা গ্রন্থির উপর নির্ভর করে। যদি হয়, তবে কল্পনা করা যেতে পারে যে, হৃদয়বান শারীরবিদদের আন্তর্জাতিক গুপ্ত সমিতি একদিন পৃথিবীর সকল দেশের [illegible]কবর্গকে ধরে বলপূর্বক এমন কিছু তাদের শরীরে ইনজেকট্ করে দিতে পারে, যাতে তাঁরা মানবসমাজের প্রতি অনুকম্পায় পূর্ণ হয়ে উঠবেন, তবে হয়তো পৃথিবীতে সত্যযুগ আসতে পারে। [illegible]ম্মাৎ মসিয় পয়ঁকারে রূঢ় জেলার খনি-মজুরদের শুভাকাঙ্ক্ষী হবেন, লর্ড কার্জন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বন্ধু হয়ে উঠবেন, [illegible]পতি স্মটস জর্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসীদের জন্য [illegible]ণায় গলে যাবে, এবং আমেরিকার সরকার সে দেশের রাজবন্দী-দের প্রতি সদয় হবেন। কিন্তু হায় তার পূর্বে শারীরবিদদের [illegible]জদের শরীরেই সেই প্রেম-আরিস্ট প্রয়োগ করতে হবে। কারণ না করলে তাঁরা নূতন সৈন্যদের শরীরে সামরিক জিঘাংসার [illegible]ক্ষণ দিয়ে খেতাব ও অর্থ উপার্জনে সন্তুষ্ট থাকবে। কাজেই [illegible] আন্তরিক অনুকম্পাই কেবল মানবসমাজকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু অনুকম্পা সৃষ্টির উপায় জানা থাকলেও তা কোন কাজে আসবে না, যদি না আমরা আগে থাকতে অনুকম্পায়ী হয়ে থাকি। এ ছাড়া, আর একটিমাত্র সমাধান আছে, তা হচ্ছে সেই উপায়, যা গালিভরের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বর্ণিত Honynhum-রা য়াহু-দের বিরুদ্ধে অবলম্বন করেছিল, অর্থাৎ সমূলে বিনাশ; দেখে শুনে মনে হচ্ছে যে, য়াহু-রা সে পদ্ধতি পরস্পরের উপর প্রয়োগ করতে কৃতসংকল্প।

বিজ্ঞানের জন্য আমাদের সভ্যতা ধ্বংস হতে পারে। একমাত্র আশা দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীর অধীনতায় পৃথিবীব্যাপী শাসন-ব্যবস্থার সম্ভাবনায়। তারপরে ক্রমশ একটা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জগদ্ব্যাপী গভর্নমেণ্ট গড়ে উঠতে পারবে। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের অসার্থকতার কথা স্মরণ করলে হয়তো এ বিকল্পের চেয়ে আমাদের সভ্যতার বিনাশই কাম্য মনে হবে।

মূল ইংরেজি হইতে শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত।
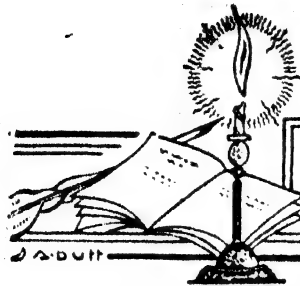
শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি—(প্রথম কিরণ), শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। প্রকাশক—শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামী, ভাজনঘাট, নদীয়া।

গ্রন্থকার গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণব সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি একজন পরম ভক্ত এবং বৈষ্ণব। বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রগাঢ়। আলোচ্য গ্রন্থখানাতে আমরা তাঁহার সেই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় পাইয়াছি এবং তাঁহার সেই পাণ্ডিত্য অন্তর্দৃষ্টি ও সমানুপ্রবেশশীলতায় কতটা উদ্দীপ্ত, পুস্তকখানা তাহা প্রতিপন্ন করিবে। নাম এবং নামী অভেদতত্ত্ব আলোচ্য গ্রন্থখানির ইহাই হইল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ সিদ্ধান্ত বৈষ্ণব সমাজের সর্বজনমান্য; গ্রন্থকার সে সিদ্ধান্তকে দার্শনিক যুক্তির বিচারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এ কার্যে তিনি যে চিন্তাশীলতা ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বাঙলা ভাষায় তাহা বিরল বলিতে হয়। গ্রন্থকারের বিচারপদ্ধতি এবং সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার ভঙ্গীটি সহজ এবং সুন্দর; দার্শনিক পারিভাষিকতায় তাহা আড়ষ্ট হইয়া উঠে নাই। তিনি শুধু দার্শনিক পণ্ডিত নহেন, সাধনাত্মক প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা রসসম্পর্ক তিনি লাভ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে এই কাজটি এমনভাবে সম্ভব হইয়াছে এবং এজন্যই তাঁহার যুক্তিপ্রণালী বৈজ্ঞানিক হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ন্যায় দুরূহ বিষয়ে এমন গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় খুব কমই আছে এবং এই বিশেষ বিষয়টির সম্বন্ধে এমন পুস্তক নাই, একথা বলা চলে। এই একখানা গ্রন্থ পাঠ করিলেই ষট্‌সন্দর্ভের অন্তর্নিহিত যে পরম তত্ত্ব, অনেকে তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন; প্রকৃতপক্ষে শ্রীজীব গোস্বামীর সন্দর্ভনিচয় পাঠ না করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিশিষ্টতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সন্দর্ভনিচয়ের সম্যক্ আলোচনা হয় না। আলোচ্য গ্রন্থখানার ভিতর দিয়া সুপণ্ডিত এবং সাধনপরায়ণ গ্রন্থকার সন্দর্ভনিচয়, বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বেদান্ত ভাষ্য, গোপালতাপনী, সর্ব-সম্বাদিনী এক কথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূলীভূত শাস্ত্রসমূহের সার সত্য বাঙলা ভাষায় পাঠক সমাজের নিকট অভিনবভাবে এবং মৌলিক প্রকারে উপস্থিত করিয়াছেন। এই দিক হইতে আলোচ্য গ্রন্থখানি বাঙলা ভাষার একটি বিশেষ অভাব দূর করিবে। গ্রন্থখানা সম্পাদন করিতে গ্রন্থকার গোস্বামী মহাশয়কে সুদীর্ঘ আট বৎসর সাধনা করিতে হইয়াছে। তাঁহার সে সাধনা সার্থক হইয়াছে। এজন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিত শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থন-পত্র এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ডি-লিট মহাশয়ের লিখিত সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ ভূমিকা গ্রন্থখানির ভাবসম্পদকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বিদ্বজ্জন সমাজে এ গ্রন্থের সর্বত্র সমাদর হইবে। আমরা গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া পরম উপকৃত হইয়াছি।

অন্তঃশীলা—শ্রীরামময় দাশ প্রণীত। মূল্য পাঁচসিকা। প্রাপ্তিস্থান—পল্লীবাণী কার্যালয়, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

কবি রামময় দাশ একজন সত্যকার কবি। মনে যে মধুর রসের স্পর্শ লাভ করিলে সব সুন্দর, কল্যাণময় এবং মঙ্গলময় হয়, তিনি সে স্পর্শ পাইয়াছেন। তাঁহার 'অন্তঃশীলা'র চতুর্দশপদী কবিতাগুলি আমাদের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। বাঙলার কাব্যরসিকগণ তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। কবির হাত বড় মিষ্টি, অল্পের মধ্যে আমরা শুধু এইটুকুই বলিলাম।

ঘূর্ণিপাক—শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীহরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আওতলা, নোয়াখালি।

কবিতাগুলির ভিতর একটা বেদনার উষ্ণ অনুভূতি আছে এবং সেই হিসাবে লেখকের কবিত্ব ...

রাষ্ট্রপতি—শ্রীহরিনারায়ণ রায় বি-এ প্রণীত। মূল্য চারি আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসূর্যনারায়ণ রায়, পোঃ বাবুপুর ... নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর বাজার।

উপন্যাস হিসাবে লেখক সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই; বইখানাতে দার্শনিকতার ভিত্তিতে ভালো ভালো আধ্যাত্মিক উপদেশ ... এবং সমাজধর্মেরও একটা আদর্শ উপস্থিত করা হইয়াছে। যাঁহারা উপন্যাস চাহেন না, উপদেশ চাহেন, তাঁহাদের কাছে বইখানা ভাল লাগিবে।

সেবকের নিবেদন—দীন সেবক। প্রকাশক—শ্রীললিতমোহন ... চৌধুরী; বগুড়া সারস্বত সঙ্ঘ, বগুড়া। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

পুস্তকখানি আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের জনৈক আশ্রমবাসী সেবক ভক্তের লেখা। গুরুকৃপাই আধ্যাত্মজীবন লাভের প্রধান উপায় এবং শরণাগতি ও আত্মনিবেদনেই তাহার সার্থকতা, লেখক পুস্তকখানায় এই তত্ত্ব ... করিয়াছেন। পাঠকগণ এই পুস্তকে সাধন-জগতের অনেক গূঢ় সত্যের সন্ধান লাভ করিবেন। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

নিগমস্মৃতি—শ্রীশক্তিচৈতন্য ব্রহ্মচারী প্রণীত। মূল্য চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—দক্ষিণ বাঙলা সারস্বত আশ্রম, হালিসহর, ২৪ পরগণা।

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের চরিত অবলম্বনে ... কবিতা এই পুস্তকে আছে। ঐ সম্প্রদায়ের ভক্তগণ ইহা পাঠে আনন্দ পাইবেন।

বিশ্ববাণী—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মুখপত্র। মাসিক পত্র। বার্ষিক মূল্য আড়াই টাকা। প্রতি সংখ্যা চার আনা। কার্যালয়—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ মহাশয়ের লিখিত 'অদ্বৈতবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধটি আলোচ্য সংখ্যাকে উজ্জ্বল করিয়াছে। ... ধারাবাহিকরূপে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইতেছে। বেদান্তভূষণ মহাশয় ... মতবাদ খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠা করিতেছেন; তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ, যুক্তিভঙ্গী সুন্দর। চিন্তাশীল পাঠকগণ এ লেখা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। বাঙলা ভাষায় এই ধরণের দার্শনিক আলোচনা দুর্লভ। 'হুয়েন সাঙের ভারত-প্রবেশ ও ভ্রমণ' লেখাটি তথ্যপূর্ণ।

নিশি-গন্ধা—অনিলকুমার ভট্টাচার্য। প্রকাশক—অর্চনা পাব্লিশিং ওয়ার্কস, ৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে অনিলকুমার ভট্টাচার্যের নাম অপরিচিত নয়। আধুনিক নানা সাময়িকপত্রে তাঁর ছোট গল্প নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। 'নিশি-গন্ধা' অনিলবাবুর প্রথম গল্পসঙ্কলন। এদিক থেকে বইখানিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে প্রথম উদ্যম হিসাবে 'নিশি-গন্ধা' প্রশংসার দাবী করতে পারে। সর্বশুদ্ধ মোট ... ছোট গল্প বইখানিতে স্থান পেয়েছে। 'নিশি-গন্ধা', ... 'মায়াবিনী ছন্দা' প্রভৃতি গল্পগুলোতে অনিলবাবুর বৈশিষ্ট্য সব চেয়ে বেশী ফুটে উঠেছে। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি লেখকের গল্পের প্রধান উপজীব্য হলেও, তিনি খাঁটি বাস্তববাদী নন। ... কল্পনার রঙে রাঙানো প্রতিটি গল্প পাঠকের মনে কাব্যিক অনুভূতি জাগায়। এ বইয়ের প্রায় প্রত্যেকটি গল্পই সুখপাঠ্য হয়েছে। পারিপার্শ্বিক জীবন সম্বন্ধে আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং আরও সজাগ শিল্প-চেতনা ...

১২.৩.৪৪

ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের সৌভাগ্য

ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণই বহুকাল হইতেই উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের সহিত সম-প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত দক্ষতা যে ভারতীয় খেলোয়াড়দের আছে, ইহাও বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। স্বর্গগত মহারাজা রণজিৎ সিং, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র দলীপ সিং, পতৌদির নবাব প্রভৃতি ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়-গণ ইংলণ্ডের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ খেলিবার জন্য নির্বাচিত হন—উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন বলিয়া ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্বর্গগত অমরসিং, অমরনাথ ভারতীয় খেলোয়াড় হইয়াও ইংলণ্ডের বিভিন্ন দলে কয়েক বৎসর পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে খেলিয়াছেন, উপযুক্ত দক্ষতাই তাহা সম্ভব করিয়াছে। ইংলণ্ড অথবা অস্ট্রেলিয়ার বিশিষ্ট ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণের সময় ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এমনকি, ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের ইংলণ্ড ভ্রমণ ও উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শনের কথা ইংলণ্ড অথবা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ বিস্মৃত হইতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। তথাপিও দুর্ভাগ্য, ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের যে এই পর্যন্ত ইংলণ্ড অথবা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট পরিচালকগণের সুনজরে পড়িতে সক্ষম হন নাই। ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ ইংলণ্ড অথবা অস্ট্রেলিয়ার সহিত টেস্ট ম্যাচ বা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায় যোগদান করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, ইহা এখনও পর্যন্ত স্বীকার করিয়া লন নাই। ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহিত যে সকল টেস্ট ম্যাচ খেলা হইয়াছে, তাহা কেবল বিশেষ ব্যবস্থার ফলেই হইয়াছে। ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানের মধ্যে যে সকল টেস্ট ম্যাচ খেলা হয় তাহার পর্যায় ভারতীয় দলের খেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। কেন যে হইতেছে না অথবা হয় নাই, তাহা উক্ত দেশের ক্রিকেট পরিচালকগণই জানেন। তবে সম্প্রতি ইংলণ্ডের মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের সম্পাদক স্যার পেলহ্যাম ওয়ার্নার ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক মিঃ কে এস্ রঙ্গরাওর নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের সৌভাগ্য সমাগত। স্যার পেলহ্যাম লিখিয়াছেন, "ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের অন্তরে ভারত ভ্রমণ অথবা ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের ইংলণ্ড ভ্রমণ সম্পর্কে বহু আনন্দদায়ক স্মৃতি জাগ্রত আছে। ভারতীয় ক্রিকেট খেলার সংবাদ জানিতে পারিলে তাঁহারা বিশেষ আনন্দিত হইবেন। বর্তমান পৃথিবী-ব্যাপী যুদ্ধ আপনাদের সহিত আমাদের যে মধুর সম্পর্ক, তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের সভ্যগণ আপনাদের সংবাদ জানবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব। সহিত যোগসূত্র রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সম্ভাবনা শীঘ্রই হইবে। ইতিমধ্যে আপনাদের ক্রিকেট খেলা ও খেলোয়াড়দের বিষয় জানিতে পারিলে বিশেষ বাধিত হইব।"

মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের সম্পাদক পত্রের মধ্যে যে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা প্রকৃতই উৎসাহ বর্ধক। তবে এইরূপ পত্র অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট পরিচালকগণের নিকট হইতে আসিলে আমরা বিশেষ সুখী হইতাম। মেলবোর্ন ক্রিকেট দল দুই দুইবার ভারতে দল প্রেরণ করিয়াছেন ও টেস্ট ম্যাচ খেলিবার অনুমতি দিয়াছেন, এমন কি ভারতীয় দলের সহিত ইংলণ্ডের টেস্ট ম্যাচ খেলিয়াছেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট পরিচালকগণ তাহা করে নাই। ভারতীয় দলের সহিত যে সকল টেস্ট ম্যাচ খেলা হইয়াছে, তাহা প্রদর্শনী খেলা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট পরিচালকগণের এই [illegible] আচরণ কোন ভারতীয়ের পক্ষে বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট পরিচালকগণের মত পরিবর্তনের জন্য ইংলণ্ডের পরিচালকগণ কি করিতেছেন, ইহাই আমাদের জানিতে বিশেষ ইচ্ছা করে।

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আগতপ্রায়। বোম্বাই প্রদেশ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবেন না। বর্তমান দেশব্যাপী বিশৃঙ্খল অবস্থা অবলোকন করিয়া বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশন উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, করাচী, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানের [illegible]গণ অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন বলিয়া আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু বাঙলা দেশের ক্রিকেট পরিচালকগণকে এই বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্নমত প্রকাশ করিতে দেখা যাইতেছে। তাঁহারা প্রথম খেলাটি কোথায় হইবে সেই চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গত তিন বৎসর বাঙলার প্রথম খেলা বিহার দলের সহিত জামসেদপুরেই অনুষ্ঠিত হইতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি বেঙ্গল ক্রিকেট বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, ঐ খেলা কলিকাতায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ কারণ কি দেখা দিল যাহার জন্য বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণ অনুষ্ঠানটি কলিকাতায় করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছেন, বুঝা গেল না। বিহার দল গত বৎসর বিশেষ বেগ দিয়াছিল। মাত্র এক রাণের ব্যবধানে বাঙলার দল জয়ী হইতে সক্ষম হন। এই বৎসর বিহার দল আরও শক্তিশালী হইয়াছে। ভারতের খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় এস ব্যানার্জ্জি (সুটে) বিহার দলে যোগদান করিয়াছেন। বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণের ইহাতে ভীতির সঞ্চার হইবে নাকি?

বেংগল ক্রিকেট ক্লাব

বাঙলার ক্রিকেট খেলা এখনও আরম্ভ হয় নাই। বিমান আক্রমণ হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার ফলে অনেক ক্রিকেট ক্লাবকেই খেলার মাঠ হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। পুরাতন ক্লাবসমূহের অনেকেই কিরূপে নিজেদের অস্তিত্ব রাখিবেন এই চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। ঠিক এই সময় বেংগল ক্রিকেট ক্লাব নামক একটি নবগঠিত ক্লাবকে বেংগল ক্রিকেট বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হইতে দেখিয়া আমরা বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইলাম। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে এই ক্লাবের পরিচালকগণ সকলেই বিশিষ্ট স্পোর্টিং ইউ-নিয়ন দলের সভ্য। স্পোর্টিং ইউনিয়ন দল এতদিন তাঁহাদের সুনাম অর্জনে সাহায্য করিল। হঠাৎ এই দল ত্যাগ করিয়া নূতন দল গঠন করিবার যে কি কারণ ঘটিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। খেলার মাঠই বা কোথায় তাঁহারা পাইবেন তাহাও আমরা অনুমান করিতে পারিতেছি না। এত-গুলি বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় স্পোর্টিং ইউনিয়ন দল ত্যাগ করিবার পর এই দলের অস্তিত্ব থাকিবে বলিয়াও সন্দেহ হইতেছে। দেশের বর্তমান অবস্থার সময় নূতন দল গঠন, পুরাতন দলের অস্তিত্ব লোপ করা খুব সমীচীন হইতেছে কি?

বোম্বাই রোভার্স ফুটবল প্রতিযোগিতা

বোম্বাইর রোভার্স ফুটবল প্রতিযোগিতা ভারতের একটি খ্যাতনামা অনুষ্ঠান। এই প্রতিযোগিতায় যোগদান ও সাফল্যলাভ করায় ভারতীয়, এমন কি অনেক ইউরোপীয় সৈনিক দলই গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। এই জন্য প্রতি বৎসর এই প্রতিযোগিতায় বহু বিশিষ্ট সৈনিক ইউরোপীয় ও ভারতীয় দলকে যোগদান করিতে দেখা যায়। কিন্তু বর্তমান বৎসরে তাহা সম্ভব হয় নাই। ভারতব্যাপী বিশৃঙ্খল অবস্থা অনেক বিশিষ্ট ভারতীয় ও ইউরোপীয় দলকে যোগদান হইতে বিরত করিয়াছে। ফলে এই বৎসরের অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতার খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হয় নাই। স্থানীয় কয়েকটি সৈনিক ও অফিস দল যোগদান করে। বাঙলা হইতে বাটা কোম্পানীর এক দল গমন করে। ইহাও অফিস দলের অন্তর্ভুক্ত। সৈনিক দল-সমূহ শক্তিশালী না হওয়ায় অফিস দলসমূহের পক্ষে শেষ সীমানায় উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। সকল খেলা শেষ হইয়াছে। দুইটি সেমি-ফাইনাল খেলা বাকি আছে। একটি সেমিফাইনাল খেলায় অটোমোবাইল এসোসিয়েশন দল বনস্পতি স্পোর্টস ক্লাবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে, অপর সেমি-ফাইনালে টাটা স্পোর্টস ক্লাব বাটা স্পোর্টস ক্লাবের সহিত খেলিবে। এই চারিটি দলের মধ্যে অটোমোবাইল ও বাটা দল ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। এই খেলায় বাটা দলেরই সাফল্যলাভ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। ইহা যদি সম্ভব হয় তবে মহমেডান স্পোর্টিং দলের পর বাটা কোম্পানীর দল হইবে দ্বিতীয় বাঙলার দল যে রোভার্স কাপ বিজয়ী হইয়াছে। বাটা দল সাফল্যলাভ করুক ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব

বাঙলার সন্তরণ মরসুম শেষ হইয়াছে। বিশিষ্ট সাঁতারুগণের রংপুর ভ্রমণ ব্যতীত সন্তরণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে ইতিপূর্বে অন্য কোন কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ অনেকেই এতদিন বলিয়া আসিয়াছেন, "বেঙ্গল এ্যামেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের নীরবতা সকল প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব লোপ করিয়াছে। কোন প্রতিষ্ঠানই নিয়মিতভাবে সন্তরণ শিক্ষা অথবা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারে নাই।" এই সকল উক্তি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন, সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের পরিচালকগণ। তাঁহারা সন্তরণ মরসুম সময় নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, অথবা ক্লাব একেবারে বন্ধ করিয়া দেন নাই। তাহা তাঁহাদের সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান হইতেই সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ইঁহাদের সন্তরণ অনুষ্ঠান নিম্ন শ্রেণীর অথবা অতি সাধারণ শ্রেণীর হয় নাই। প্রত্যেকটি বিষয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভূত হয়। প্রতি-যোগিতার বিভিন্ন ফলাফল আশাপ্রদ হইয়াছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সন্তরণ অনুষ্ঠানের অন্তরায় হইলেও আন্তরিক প্রচেষ্টা সকল কিছুই যে সম্ভব করিতে পারে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের অনুষ্ঠান তাহার নিদর্শন।

বেংগল হকি এসোসিয়েশন

বাঙলার হকি খেলার সময় এখনও হয় নাই। পাঁচ মাস পরে এই খেলার মরসুম আরম্ভ হইবে। তাহা হইলেও এই বিভাগের পরিচালকমণ্ডলীর এক সাধারণ সভা সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। এই সভায় কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যগণও নির্বাচিত হইয়াছেন। গত বৎসরে যাঁহারা এই সমিতির কর্ণধার ছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় নির্বাচিত হইয়াছেন। নির্বাচন ব্যাপারে একটি বিষয় আমরা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি "টস্" করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে ইতিপূর্বে আমরা কখনও দেখি নাই। উক্ত সাধারণ সভায় প্রথম শ্রেণীর দলের প্রতিনিধি নির্বাচনে এই প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। এই বিভাগের সাতটি স্থানের জন্য আটজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রথম ছয়জন অধিক ভোট পাওয়ায় নির্বাচিত হন, কিন্তু সপ্তম স্থানের জন্য দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীর ভোট সমান হয়। তখন সভাপতি "টস্" করিয়া সপ্তম স্থান পূরণ করেন।

কুমিল্লা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী এই তিনটি স্থানের প্রতি-নিধিকে সমিতিতে গ্রহণ করা হইয়াছে। অপর কোন দেশ বা স্থানের কোন প্রতিনিধিই সমিতির মধ্যে স্থান পাইল না ইহার বর্ধমান, বাঁকুড়া, রাজসাহী, রংপুর, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় হকি খেলার বিশেষ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ সেই সকল স্থানের কোন প্রতিনিধিই সমিতির মধ্যে স্থানে পাইল না ইহা রহস্য বুঝা ভার? এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে বাঙলায় হকি খেলার প্রচার, প্রসার ও উন্নতি করা। সুতরাং এই সমিতির সভ্য সকল জেলার প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হওয়া উচিত। কয়েকটি বিশিষ্ট ক্লাবের প্রতিনিধি লইয়া এবং কতকগুলি পেটোয়া স্থানের প্রতিনিধি লইয়া যদি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়, তবে উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হওয়া অসম্ভব। কলিকাতার বিভিন্ন ক্লাব লইয়া বাঙলার হকি খেলার উন্নতির পরিকল্পনা করার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণতা হওয়া অসম্ভব। আমরা আশা করি বাঙলার নব-গঠিত হকি এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ এই সকল বিষ চিন্তা করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর

বাঙলা—কাঁথির সংবাদে প্রকাশ, গত ২৬শে সেপ্টেম্বর রামনগর থানার এলাকাধীন বেলবনী গ্রামে এক জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে তিনজন লোক নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে। তমলুকের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য তমলুক শহরের তিনটি বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলী চালনার ফলে ৫।৭ জন লোকের প্রাণহানি হইয়াছে। ময়মনসিংহের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য পল্লীবাসীরা ঈশ্বরগঞ্জের বাজার লুট করিয়াছে।

বরিশালের সংবাদে প্রকাশ, ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা শান্তিসুধা ঘোষ এম এ-কে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আসাম—তেজপুরের সংবাদে প্রকাশ, গত ২০শে সেপ্টেম্বর ঢেকিয়াজুলি থানা প্রাঙ্গণে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলী চালনায় কয়েকজন হতাহত হয়। গৌহাটির খবরে প্রকাশ, কামরূপ জেলার পাচাবারকুচী থানার দারোগা জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হন। পুলিশ জনতার উপর গুলী চালায়; ফলে দুইজন নিহত ও দুইজন আহত হয়।

উড়িষ্যা—ভদ্রকের নিকট কাচাশশী নামক স্থানে এক জনতা দারোগা ও কনেষ্টবলকে জখম করিলে পুলিশ ৩৫ রাউণ্ড গুলী চালায়, ফলে ছয়জন নিহত হয় এবং পাঁচজন আহত হয়। আহতদের মধ্যে দুইজন হাসপাতালে মারা যায়।

বিহার—কিষণগঞ্জে জনতার উপর পুলিশের গুলী চালনার ফলে একজন নিহত হয়।

বোম্বাই—গতকল্য নাসিক শহরে পুলিশ শোভাযাত্রীদের উপর বেত্র চালনা করে; ফলে দুইজন মহিলা আহত হন।

মাদ্রাজ—২৮শে সেপ্টেম্বর নেট্টিকুলামের নিকট এক জনতার উপর পুলিশ গুলী চালায়; ফলে একজন মহিলা নিহত ও চারিজন আহত হন।

লক্ষ্ণৌর সংবাদে প্রকাশ, গত ১৭ই সেপ্টেম্বর মজঃফরনগরে একদল বিচারাধীন বন্দীর সহিত জেলের কর্মচারীদের সংঘর্ষ হয়। ফলে ছয়জন বন্দী ও একজন শান্ত্রী নিহত হয়।

শোক-সংবাদ—রয়টার ও এসোসিয়েটেড প্রেসের কলিকাতা শাখার অস্থায়ী ম্যানেজার শ্রীযুত কুমুদিনীমোহন নিয়োগী গত ২৯শে সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন।

১লা অক্টোবর

বালেশ্বর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ভদ্রক মহকুমার বাসুদেবপুর থানার ইরম গ্রামে এক জনতা থানা আক্রমণের চেষ্টা করিলে পুলিশ জনতার উপর গুলীবর্ষণ করে; ফলে ২৫ জন লোক নিহত হইয়াছে। আর একটি সংবাদে প্রকাশ, ২৮শে সেপ্টেম্বর খৈরায় পুলিশের গুলী চালনার ফলে দুই ব্যক্তি নিহত হয়। খৈরা নীলগিরি রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত।

বিহার—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর এক জনতা মানভূমের মানবাজার থানা আক্রমণ করে। তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করা হয়। ফলে একজন নিহত ও দুইজন আহত হয়।

২রা অক্টোবর

বাঙলা—তমলুকের সংবাদে প্রকাশ, কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি তমলুকের খাসমহল অফিস, সাবরেজিষ্ট্রারী অফিস এবং আবগারী দোকান পোড়াইয়া দিয়াছে। ২৯শে সেপ্টেম্বর কুকুরাহাটিতে (থানা সুতাহাটা) খাসমহল অফিস, সাবরেজিষ্টারী অফিস, পোষ্ট অফিস এবং আবগারী দোকানে অগ্নিসংযোগ করিয়া ভস্মীভূত করা হয়। ঐ দিনই প্রায় ৫ হাজার লোক সুতাহাটা থানায় হানা দেয় এবং তাহারা থানার কাগজপত্র সব পোড়াইয়া ফেলে। প্রকাশ, খাস-মহলের সব-ম্যানেজারকে অপহরণ করা হইয়াছে এবং অফিস পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। মহিষাদল হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, স্থানীয় রাজকাছারীটি ভস্মীভূত হইয়াছে এবং মহিষা-দলের পাঁচটি স্থানে ধানের গোলা লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছে। চাঁদপুরের সংবাদে প্রকাশ, দুর্গাপুরে ইউনিয়ন বোর্ড এবং পোষ্ট অফিসে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়।

বর্ধমানের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য শহর হইতে ১৬ মাইল দূরবর্তী জোড়কদার নিকট কয়েকজন লোক একজন রানারকে আক্রমণ করিয়া চারিটি মেলব্যাগ লইয়া যায়। গত ২৯শে সেপ্টেম্বর বামুনিয়ার ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত বিজয় সিং নাহারকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাণাঘাটের নিকট বিমান হইতে মেশিনগান চালনা সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক জানান যে, ঐস্থানে সৈন্যগণ পর্যবেক্ষণ কার্য চালাইতে-ছিল। তাহারা রেলওয়ে লাইনে কর্মরত কতকগুলি কুলীকে ভুলক্রমে ধ্বংসাত্মক কার্যে রত বলিয়া মনে করে এবং কয়েকটি গুলী ছোড়ে। সৌভাগ্যবশত কেহ হতাহত হয় নাই। তিনি বলেন, এই ঘটনাটি মাত্র গত পরশ্ব বাঙলা গভর্নমেণ্ট জানিতে পারিয়াছেন।

দিল্লীতে গুলীচালনার ফলে একজন নিহত ও একজন আহত হয়।

কানপুরে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস উপলক্ষে এক বৃহৎ প্রভাত ফেরী বাহির হয়। পুলিশ দুইশতাধিক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকজন মহিলাও আছেন। কাণপুরে কলেজের ছাত্রদের এক শোভাযাত্রা পুলিশ ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় এবং ৪৯ জন ছাত্র ও ৬৬ জন ছাত্রীকে গ্রেপ্তার করে।

৩রা অক্টোবর

বাঙলা—ময়মনসিংহের সংবাদে প্রকাশ যে, গতকল্য আঠার-বাড়ির নিকট রায়েরবাজারে একটি বড় হাট জনতা কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। সংবাদ পাইয়া স্থানীয় জমিদারের লোকজন ও রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অনেক লোক ঘটনাস্থলে যায় এবং জনতা ছত্রভঙ্গ কয়েকজন আহত হইয়াছে। আঠারবাড়ি হইতে একশতেরও অধিক কয়েকজন আহত হইয়াছে। আঠারবাড়ী হইতে একশতেরও অধিক লোককে গ্রেপ্তার করিয়া ময়মনসিংহে আনা হইয়াছে। বহরম-পুরের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য রাত্রিতে নসীপুরে রেল ষ্টেশনের (বি এণ্ড এ রেলওয়ে) বুকিং অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ভস্মীভূত হইয়াছে।

আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ একটি কূপের ভিতর

হইতে ১৫টি এবং একটি পুষ্করিণীর ভিতর হইতে একটি অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধার করিয়াছে।

৩রা অক্টোবর

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে বোম্বাইয়ের উত্তরাঞ্চলে ৪৪ জন মহিলাকে, সেগাঁওয়ের নিকট থালাকওয়াড়ীতে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এবং পুণায় ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বোম্বাই—হুবলীর সংবাদে প্রকাশ গতকল্য সাম্পগাভান্দ ও নারগুন্দের মধ্যবর্তী স্থানে সশস্ত্র জনতা কর্তৃক মোটরগাড়ি হইতে মেলব্যাগ লুঠের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৪ঠা অক্টোবর

কয়েকদিন শান্ত থাকার পর অদ্য কলিকাতায় পুনরায় গোলযোগ আরম্ভ হয়। গড়পার রোডের একটি ডাকঘরে বিক্ষোভকারিগণ অগ্নিসংযোগ করে। প্রকাশ, ১০।১২ জন বিক্ষোভকারী উক্ত ডাকঘরে হানা দিয়া দুইটি জ্বলন্ত ন্যাকড়ার পুটুলি ঘরের মধ্যে নিক্ষেপ করে; একটি দেশী বোমাও নাকি এই সময় নিক্ষিপ্ত হয়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ডাকঘরের কতকগুলি কাগজপত্র ভস্মীভূত হয়। শ্যামবাজার ডাকঘরের সম্মুখে এবং আহিরীটোলা ডাকঘরের সম্মুখে দুইটি চিঠির বাক্সে আগুন দেওয়া হয়। বাগবাজারের একটি রাস্তার ডাকবাক্সেও অদ্য অগ্নি নিক্ষেপ করা হয়।

গত ২রা অক্টোবর অনুমান এক হাজার লোকের এক জনতা হাওড়ার শ্যামপুর থানা আক্রমণের মতলবে থানা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। পরে প্রহরারত পুলিশগণকে সশস্ত্র দেখিয়া উহারা চলিয়া যায়।

ময়মনসিংহের খবরে প্রকাশ যে, গত ১লা অক্টোবর রায়ের বাজারে পুলিশের গুলী চালনায় তিনজন নিহত ও অপর কয়েকজন আহত হয়।

আসাম—ধুবড়ীর সংবাদে প্রকাশ, ২রা অক্টোবর রাত্রে ধুবড়ী রেলওয়ে স্টেশন-ভবনের একাংশ পোড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। আগুন দেওয়ার ফলে টেলিগ্রাফ ট্রান্সমিটার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং কতকগুলি কাগজপত্র ভস্মীভূত হইয়াছে।

৩০শে সেপ্টেম্বর

রুশ রণাঙ্গন— রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ, স্টালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে ডন নদীর তীরে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে।

স্টালিনগ্রাদে জার্মানরা শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত একটি শ্রমিক বস্তির মধ্য দিয়া ভলগার তীরে পৌঁছিবার পথ করিয়াছে।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী তুয়াপশে বন্দর দখলের জন্য যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

বার্লিনে "শীতকালীন সাহায্য" আন্দোলনের উদ্বোধন উপলক্ষে এক বিরাট সভা হয়। হের হিটলার এই সভায় বক্তৃতা করেন। হিটলার বলেন, "চূড়ান্ত জয়লাভ না করা পর্যন্ত শত্রুকে পরাস্ত করিতে হইবে, ইহাই আমাদের দৃঢ় ধারণা।" তিনি আরও বলেন, "জার্মান রাইখ কখনই আত্মসমর্পণ করিবে না। যতদিন ইচ্ছা শত্রুরা যুদ্ধ চালাইয়া যাউক। মিত্রশক্তিবর্গের সহিত জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদী জার্মানী বিজয় গৌরবে এই যুদ্ধ শেষ করিবে।"

১লা অক্টোবর

রুশ রণাঙ্গন—রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বলেন যে, স্টালিনগ্রাদের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। উত্তর-পশ্চিম শহরতলীতে স্টালিনগ্রাদের কারখানা অঞ্চল দখলের জন্য প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। শহরের একটা উল্লেখযোগ্য জায়গায় ঢুকিয়া পড়িয়া জার্মান বাহিনী শহরের মধ্য দিয়া ভলগার দিকে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। ভলগার রণতরীসমূহ হইতে কামান দাগিয়া তাহার আড়ালে সোভিয়েট পদাতিক বাহিনী স্টালিনগ্রাদের দক্ষিণে খানিকটা আগাইয়াছে।

২রা অক্টোবর

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, স্টালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া জার্মানরা অসংখ্য ট্যাঙ্ক, পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য রণক্ষেত্রে নিয়োগ করিতেছে। হৃত স্থান পুনরুদ্ধারের জন্য সমস্ত জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে।

৩রা অক্টোবর

রুশ রণাঙ্গন—রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, স্টালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের চারিস্থানে বড়রকমের যুদ্ধ চলিতেছে:— শহরের অন্তর্ভাগে বিশেষভাবে উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠের শিল্প-প্রধান উপকণ্ঠে, উত্তর দিক হইতে সোভিয়েটের ডন অভিমুখী অভিযানে, দক্ষিণ দিক হইতে সোভিয়েটের ডনমুখী অভিযানে এবং ডনের পন্টুন সেতুসমূহের চতুঃপার্শ্বে। স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠের অবস্থাই অত্যন্ত গুরুতর। সমগ্র শহর ডন বাঁকের উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে স্টালিনগ্রাদ পর্যন্ত বিস্তৃত দুইশত মাইল-ব্যাপী এক বিরাট অথচ বিচ্ছিন্ন রণাঙ্গনের অংশরূপে পরিণত হইয়াছে।

৪ঠা অক্টোবর

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, মার্শাল টিমোসেঙ্কো স্টালিনগ্রাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে জার্মানদের পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করিয়া এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া অগ্রসর হইতেছেন এবং একটি সমগ্র জার্মান রেজিমেণ্টকে চূর্ণ করিয়াছেন। শহরের উত্তর-পশ্চিমে জার্মানরা সোভিয়েট বাহিনীর বিপরীত দিক দিয়া সমান্তরালভাবে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে এবং জার্মানরা অবিরাম দলে দলে রিজার্ভ সৈন্য আমদানী করিতেছে। ককেসাসের মজদক এলাকায় জার্মানরা সম্প্রতি পাঁচবার আক্রমণ চালায়; কিন্তু গ্রজনী তৈলখনি অভিমুখে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না।

৫ই অক্টোবর

রুশ রণাঙ্গন—স্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ, স্টালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে মার্শাল টিমোসেঙ্কোর সাহায্যকারী সৈন্যদল প্রবল প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে। এই এলাকায় শক্তি বৃদ্ধিকল্পে জার্মানরা বিমানযোগে দলে দলে সৈন্য আমদানী করিতেছে। বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে, ডনের যুদ্ধে পানৎসার বাহিনীর জেনারেল ফন স্যাণ্ডগারম্যান নিহত হইয়াছেন। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, গত ২৪ ঘণ্টায় স্টালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের প্রায় সমস্ত অংশে যুদ্ধ রুশদের অনুকূলে গিয়াছে।
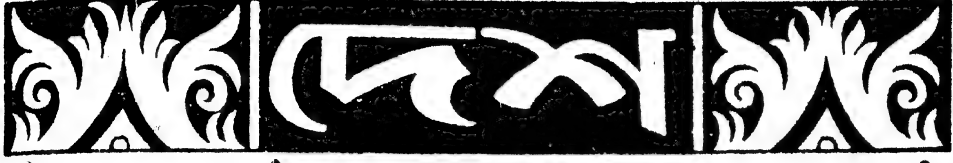
সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ১৪ই কার্তিক, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 31st October, 1942. [৫০শ সংখ্যা
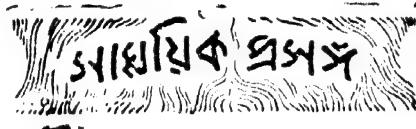
বিজয়ার সম্ভাষণ

বৎসরের বহু-প্রত্যাশিত এবং বহু-আকাঙ্ক্ষিত শারদীয়া মহাপূজার উৎসব সমাপ্ত হইল। পূজা সমাপ্তির পর বিজয়া উপলক্ষে সকলকে আত্মীয়তার আলিঙ্গন দিবার ধারা বহু যুগ ধরিয়া এদেশে প্রচলিত আছে। এই রীতির মধ্যে একটি মহান্ সত্য নিহিত রহিয়াছে। তাহা হইল এই যে ভেদ সত্য নহে, বৈষম্য অনিত্য; কিন্তু ভেদ-বুদ্ধির ফলে যে গ্লানিভার আমাদিগকে বহন করিতে হইতেছে, তাহা জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই সত্য। বিজয়ার পর শূন্য মণ্ডপে বসিয়া আমরা যেন এই সত্যকে সমগ্র অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারি এবং আমাদের ভিতরকার ভেদ-বুদ্ধিগত পাপের ফলে চারিদিক হইতে যে অসহায়ত্ব আমাদিগকে অভিভূত করিতেছে, লাঞ্ছিত নিপীড়িত জীবনের বেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া সকলের সঙ্গে আত্মীয়তাকে সত্য করিয়া তুলিতে সমর্থ হই। বিজয়ার বাণী হইল ঐক্যের সেই শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবারই বাণী। সে বাণী আমাদের সমাজ-জীবনে সার্থক হইয়া উঠুক। এই শুভ উপলক্ষে আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং পৃষ্ঠপোষকবর্গকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

গত ১০ই কার্তিক, মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মিত্র মহাশয় বাঙলা দেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম জীবনেই তিনি বাঙলা দেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন। তিনি স্বদেশ-সেবায় ত্যাগী কর্মীস্বরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু দাশ স্বরাজ্য দল গঠন করিলে তিনি সেই দলে যোগদান করেন এবং স্বরাজ্য দলের কর্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর তাঁহার নির্বাসিত জীবন আরম্ভ হয়। বাঙলার অপর কয়েকজন স্বদেশপ্রেমিক সন্তানের সহিত তিনি ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত হন এবং মান্দালয় জেলে অবরুদ্ধ থাকেন। দীর্ঘকাল বন্দি-জীবন যাপন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া মিত্র মহাশয় ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং সেখানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ইহার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিপদে নির্বাচিত হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মিত্র মহাশয়ের প্রথম জীবনের কর্ম-সাধনার ভিতর স্বাধীনতার জন্য ত্যাগপূর্ণ যে প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যাইত, পরবর্তী জীবনে তাহা ততটা পরিস্ফুট ছিল না; কিন্তু তিনি তাঁহার অমায়িক প্রকৃতির জন্য সকল দলের প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ব্রিটেনের সদিচ্ছা

লর্ড সভায় ভারত সম্পর্কিত বিতর্কে সহকারী ভারত-সচিব ডিভনশায়ারের ডিউক একটি অপূর্ব ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মহিমা মামুলী ভাষায় বর্ণনা করিয়া ডিউক সাহেব বলেন, কংগ্রেসের অস্তিত্বের বহু পূর্বে ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করাই ব্রিটিশ রাজনীতিকদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু ভারত যে ইহা পায় নাই, তাহার কারণ ইহা নহে যে, ব্রিটেন তাহাদিগকে উহা দিতে অসম্মত। না পাইবার কারণ হইল এই যে, ব্রিটেন যখনই ভারতবাসীদিগকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করিতে গিয়াছে, তখন সকলে না হইলেও ভারতবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃত

মূল্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ডিউক মহোদয়ের এমন ঐতিহাসিক আবিষ্কারে মৌলিকত্ব আছে স্বীকার করিতেই হইবে এবং এই আবিষ্কারের ফলে পরিশেষে ইহাই হয়ত প্রতিপন্ন হইবে যে, কংগ্রেসের অস্তিত্বের পূর্বে কেন, পলাশীর যুদ্ধেরও বহু পূর্ব হইতেই, এমনকি, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তুলাদণ্ড করে লইয়া এদেশে পদার্পণ করিবারও পূর্বে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের বিশ্বপ্রেমিক পূরুষগণ ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দান করিবার ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তাঁহারা জলে-জঙ্গলে ঝাঁপ দিয়া ভারতে আগমন করেন। সুতরাং লর্ড মর্লের ন্যায় উদারনীতিক যদি এই কথা বলিয়া থাকেন যে, ভারতবাসীদিগকে অদূর ভবিষ্যতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করা ব্রিটিশের উদ্দেশ্য নয়; লর্ড ব্রেণ্টফোর্ডের ন্যায় স্বনামখ্যাত রাজনীতিক যদি গর্বের সহিত এই উক্তি করিয়া থাকেন যে, ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দান করিবার জন্য ইংরেজ ভারতবর্ষে যায় নাই, ল্যাংকাশায়ারের জন্য বাজার সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই সেখানে গিয়াছে; ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড লিটন যদি বলিয়া থাকেন যে, ইংরেজ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান সম্পর্কে ভারতবাসীদিগকে এ পর্যন্ত যত প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, কোনটিই পালন করে নাই; তবে সে সব কথাই ভুল এবং ডিভনশায়ারের ডিউকেরই উক্তি পরম সত্য। কিন্তু অপূর্ব এই ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার সত্ত্বেও ইংরেজ কখন ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে চাহিয়াছে, এই প্রশ্ন থাকিয়া যায় এবং পক্ষান্তরে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতবাসীরা রাষ্ট্রনীতিক অধিকার লাভের জন্য যখনই কোনরূপ আন্দোলন করিয়াছে, ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ কঠোর হস্তে এবং ভেদনীতির কূটকৌশলে তাহা দমিত করিবার চেষ্টাই করিয়াছেন এবং এখনও সেই চেষ্টা সমভাবেই চলিতেছে। ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দান করিবার ইচ্ছা ব্রিটেনের কোন দিন ছিল না এবং এখনও নাই।

সমরোদ্যম ও ব্রিটিশ নীতি

মিত্রশক্তির সমরোদ্যমকে শক্তিশালী করিতে হইলে ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করা কর্তব্য—এই যে যুক্তি, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে বর্তমানে ইহা কিছু অসুবিধার ভিতর লইয়া ফেলিয়াছে; কারণ এই যুক্তির অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করিয়া মিত্রশক্তির অন্যান্য দেশের, বিশেষভাবে আমেরিকার জনমত উত্তরোত্তর ভারতবাসীদের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি করিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে বিশেষভাবে চাপ দিতেছে। সেদিন লর্ড সভায় ভারত সম্পর্কিত বিতর্কে সহকারী ভারতসচিব এই যুক্তি খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে একটি নূতন কৌশল উদ্ভাবন করেন। তিনি বলেন, ভারতবাসীদিগকে রাষ্ট্রনীতিক কর্তৃত্ব প্রদান করিলে মিত্রশক্তির সমরোদ্যম তো শক্তিশালী হইবেই না, অধিকন্তু উহা দুর্বল হইয়াই পড়িবে। ইহার সোজা অর্থ এই যে, ভারতের রাজনীতিকেরা যাহাই বলুন না কেন, ভারতের অধিবাসীরা রাষ্ট্রনীতিক অধিকার চাহে না; তাহারা ক্রীতদাসের জীবনই যাপন করিতে চায়; কিন্তু এই বাস্তব সত্যের সঙ্গে এমন উক্তির যদি কিছুমাত্র সামঞ্জস্য থাকিত, ভারতীয় সমস্যা বলিয়া কোন সমস্যারই সৃষ্টি হইত না। রাজনীতিকদের দাবীর পিছনে জনমতের সমর্থন রহিয়াছে বলিয়াই স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত ছুটিয়া আসিতে হইয়াছিল। ডিভনশায়ারের ডিউক এই গর্ব করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ হইতেছে এবং তদপেক্ষা অধিক সৈন্য প্রস্তুত করিবার মত তোড়জোড় ভারত সরকারের নাই, সুতরাং রাজনীতিক অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নের দ্বারা সমরোদ্যম প্রভাবিত হইবে না। বলাব হুল্য, একথাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। বর্তমান যুদ্ধের সাফল্য শুধু সেনাবলের উপর নির্ভর করে না, সমগ্র দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা তাহাতে আবশ্যক হইয়া থাকে। মালয় এবং ব্রহ্মদেশের বিপর্যয় হইতেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদিগণ এই শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সংকীর্ণ স্বার্থের দায় এমনই বুদ্ধিবিভ্রম ঘটাইয়া থাকে।

ভারতসচিবের স্পষ্ট কথা

বড়লাটের শাসন পরিষদের যে সব বিভাগের ভার শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের উপর ন্যস্ত আছে, সেগুলি ভারতীয় সদস্যদের হাতে অর্পণ করা হয় না কেন, পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় এই মর্মে সম্প্রতি একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব মিঃ আমেরী বলেন,—"যুদ্ধের অবস্থা বিবেচনা করিয়া শাসন পরিষদ সম্প্রসারণে বড়লাট যোগ্যতা এবং ধারাবাহিকতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন। বর্তমানে বড়লাট এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, শাসন পরিষদের যাঁহারা যে দপ্তরের ভার পাইয়াছেন, সেই দপ্তরের কার্য পরিচালনে তাঁহারাই যোগ্যতম ব্যক্তি। জাতিগত কারণে কোন বিশেষ পদে কাহাকেও নিযুক্ত করিবার কোন প্রশ্ন উঠে নাই।" আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে, বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে দেশের লোকের রাষ্ট্রনীতিক কর্তৃত্বের কোন সম্পর্ক আছে, আমরা ইহা মনে করি না। বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগিরি, সহজ কথায় নোকরী বা গোলামগিরি ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কর্তার ইচ্ছায় কর্মের নীতি অনুসরণ করা ছাড়া শাসন পরিষদের সদস্যদের হাতে প্রকৃত কর্তৃত্ব কিছুই নাই এবং এই দিক হইতে যোগ্যতার বিচার করিয়াই সদস্যদিগকে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। সুতরাং বড়লাটের শাসন পরিষদকে ভারতীয় করিলেই, অর্থাৎ শাসন পরিষদের সবগুলি চাকুরীতে ভারতীয়দিগকে নিযুক্ত করিলেই যে ভারতের রাষ্ট্রীয় দাবীর সমাধান হইবে, ইহা নয়। কিন্তু ভারতসচিবের উত্তর হইতে দেখা যাইতেছে, ভারতবাসীদের হাতে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনে প্রকৃত কর্তৃত্ব প্রদান করা তো দূরের কথা, শাসন পরিষদে যে কয়েকটি পদে কিছু কর্তৃত্ব পরোক্ষভাবেও থাকিতে পারে, এমন পদে তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে নিযুক্ত

করিয়া বিশ্বাস পান না। এক্ষেত্রে যোগ্যতা এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখিবার যুক্তি একটা বাজে অজুহাত মাত্র। আমেরী সাহেব এই নিয়োগের মূলে বর্ণবৈষম্যগত কোন প্রশ্ন নাই, কতকটা গায়ের জোরেই এমন কথা বলিয়াছেন, ইহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। কারণ এই সব বিভাগের কাজ চালাইবার উপযুক্ত ভারতবাসীর অভাব নাই। সুতরাং ভারতীয় সদস্যদের হাতে শাসন পরিষদের অন্যান্য বিভাগগুলি পরিচালনার ভার দিলে যোগ্যতার কোন হানি ঘটিবে, এমন যুক্তি টিকে না। তারপর ধারাবাহিকতা বজায় রাখিবার কথা। দেশের শাসনকার্য পরিচালনায় দেশের জনমতের একটা মূল্য আছে; বিশেষভাবে যুদ্ধের ন্যায় সঙ্কটকালে জন মতের সমর্থন শাসন বিভাগের কার্যে বিশেষভাবে প্রয়োজন; শাসন বিভাগের কার্য পরিচালনায় যোগ্যতার হানি না ঘটাইয়া যদি ভারতীয় সদস্যদের হাতে ভার দিলে জনমতের সমর্থন পাওয়া যায়, তবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখিবার নামে জনমতকে উপেক্ষা করা রাজনীতিক অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক হইয়া থাকে। গভর্নমেণ্টের শাসন পরিষদের সদস্যদিগকে 'দেশপ্রেমিক' জ্ঞানী, গুণী বলিয়া প্রশংসা করিবার সঙ্গে সঙ্গে শাসন বিভাগের অপেক্ষাকৃত কর্তৃত্বপূর্ণ দায়িত্ব ভারতীয় সদস্যদের উপর না দেওয়ার সম্পর্কে ভারতসচিব এই যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, ইহাতে 'জ্ঞানী ও গুণীগণ' কতটা আপ্যায়িত হইলেন, আমরা তাহাই চিন্তা করিতেছি; কিন্তু আত্মমর্যাদা বুদ্ধির বালাই যাঁহারা চুকাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এ প্রশ্ন অবান্তর।

ভারতবাসীরাই দায়ী

রয়টার সাম্রাজ্যবাদ স্বার্থের বকযন্ত্রে চোয়াইয়া ভারত সম্পর্কিত সংবাদ বিদেশে প্রচার করিতে কসুর করিতেছেন না, তথাপি ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রনীতিক অচল অবস্থা মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দেশে, বিশেষভাবে আমেরিকার জনমতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। লর্ড হেডিংটন চীনেও এ সম্বন্ধে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, এমন কথা বলিয়াছেন। স্বয়ং সহকারী ভারতসচিবের উক্তি হইতে দেখা যাইতেছে যে, এই প্রভাব হইতে রুশিয়াও একেবারে নির্মুক্ত নহে, অবশ্য ভারতের রাজনীতিক ব্যাপার লইয়া মার্কিন দেশে এবং চীনে আলোচনা-গবেষণার যেমন খবর পাওয়া যায়, রুশিয়ার তেমন কোন খবরই আমরা পাই না। রুশ রাজনীতিকেরা কেহ যে ভারতের সমস্যা লইয়া কেহ কোন উচ্চবাচ্য করিয়াছেন, ইহা জানা যায় নাই; কিন্তু সহকারী ভারতসচিব সেদিন বলিয়াছেন—"ভারতের ব্যাপারে পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য মাসের পর মাস ধরিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ও ভারত গভর্নমেণ্ট অনবরত আক্রান্ত হইতেছে। ভারতে, রুশিয়ায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপনিবেশসমূহে এবং ইংলণ্ডে অবিশ্রাম বাক্যবৃষ্টি চলিতেছে এবং প্রবন্ধ বাহির হইতেছে!" বাস্তবিকই তো সন্দেহ নাই! ভারতবর্ষের ব্যাপার হইল ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ঘরোয়া ব্যাপার। এ সম্বন্ধে অন্য শক্তির কি বলিবার আছে? সেদিন ভারতসচিব আমেরী সাহেব মার্কিনবাসীদিগকে এই কথাটাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমেরিকা ইংরেজের প্রধান বল ও ভরসা; সুতরাং আমেরী সাহেবকে যথোচিত মোলায়েম ভাবাতেই কথা বলিতে হইয়াছে। তিনি মার্কিনবাসীদিগকে বলিয়াছেন যে, বাহির হইতে ভারতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কিছু নাই। ভারতের সমস্যা ভারতবাসীদের নিজেদের জন্য এবং ভারতবাসীদের দোষেই সে সমস্যার সমাধান হয় না। এই প্রসঙ্গে তিনি ক্রিপস প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া বলেন, বর্তমান শাসনতন্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া ভারতবাসীদের হাতে যথাসম্ভব রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রদানের জন্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস প্রস্তাব করেন, কিন্তু কংগ্রেসীদের দোষেই সে প্রস্তাব ফাঁসিয়া যায়। কংগ্রেসীরা বড়লাটের 'ভেটো' করিবার বিশেষ ক্ষমতা রহিত করিবার জন্য দাবী করে এবং সেই অযৌক্তিক দাবীর জন্যই সে আলোচনা পণ্ড হয়। শাসন পরিষদের সংখ্যাধিক্যের অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা বড়লাটের হাতে থাকিবে, কেন্দ্রীয় পরিষদের নিকট শাসন পরিষদ দায়িত্বসম্পন্ন হইবে না, তবু ভারতের শাসন-ব্যাপারে ভারতবাসীরা কর্তৃত্ব লাভ করিবে, ভারতবাসীদের হাতে শাসন-ব্যাপারে কর্তৃত্ব দানের এ প্রস্তাব কেমন অপূর্ব, সহজেই বুঝা যায়। জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদাবলে প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী আল্লাবক্সকে পদ হইতে অপসারিত করার ব্যাপারেই জনগণের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা বিবেচনা করিয়া গভর্নর এবং গভর্নর-জেনারেল কিভাবে বিশেষ ক্ষমতা পরিচালনা করেন, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমেরী প্রমুখ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারকর্যের এই ধরণের ধাপ্পাবাজীতে মার্কিন জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইবে না, এবং যদি বিভ্রান্ত হয়ও ভারতের সমস্যার তাহাতে সমাধান হইবে না। ভারতবাসীরা আজ স্বাধীনতা চায় এবং সেই স্বাধীনতা-স্পৃহা দমিত হইবার নহে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ঔদ্ধত্য সে স্পৃহাকে দুর্জয় সঙ্কল্পশীলতায় সুদৃঢ় করিয়াই তুলিবে।

ব্রিটিশ শাসনের মহিমা

মিঃ ভার্নন বার্টলেট ইংলণ্ডের একজন প্রবীণ সাংবাদিক। তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য এবং উদারনীতিক বলিয়া খ্যাত; ইহা ছাড়া ভারতহিতৈষী বলিয়াও অনেকের কাছে পরিচিত। ইনি সম্প্রতি আমেরিকার 'লাইফ' নামক পত্রে ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে মিঃ ভার্নন বার্টলেট ব্রিটিশ শাসনের মহিমা কীর্তন করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষে গত এক শতাব্দীকাল এক প্রকার রক্তপাত হয় নাই। পৃথিবীর আর কোথায়ও কি এমন নজীর আছে? এই যে রক্তপাত হয় নাই, ইহার দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, ব্রিটিশ শাসন ভারতে যে শান্তি আনিয়াছে, তাহার মূলে একটা ভদ্র এবং ন্যায়পরায়ণতারই আদর্শ রহিয়াছে। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের অনেকের মুখেই ভারতবর্ষের এই শান্তি প্রতিষ্ঠায় বড়াইয়ের

কথা আমরা শুনিতে পাই! কিন্তু মিঃ ভার্ণন বার্টলেট যে এই শান্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, ইহাই আশ্চর্য। যে দেশে শতকরা ৯০ জনের অধিক লোক এখনও বর্ণজ্ঞানহীন, যে দেশের শতকরা ৭৫ জন অধিবাসী এখনও দুই বেলা উদর পূর্তি করিয়া অন্ন পায় না, সে দেশের শান্তি কি সুখের শান্তি, মানুষের অভীপ্সিত শান্তি? কোন হৃদয়বান ব্যক্তির পক্ষেই এ কথা স্বীকার করা অসম্ভব। ভূতপূর্ব ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রের সহিত সংশিলষ্ট থাকিয়াও ভারতের এই শান্তির স্বরূপ চোখ বুজিয়া অস্বীকার করিতে পারেন নাই। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের মুখবন্ধে তিনি দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতের জনসাধারণের শান্তি, ইহা মানুষের শান্তি নয়, নির্জীবের শান্তি Placid contentment)।" প্রায় দুইশত বৎসরকাল ব্রিটিশ জাতির মুরুব্বিয়ানায় শান্তির মধ্যে থাকিয়াও ভারতবাসীরা যদি মানুষের প্রাথমিক যে স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতা লাভ করিবার যোগ্যতাই অর্জন না করিয়া থাকে, এখনও যদি তাহাদিগকে অসহায়ভাবে ক্রীতদাসের মতই জীবনযাপন করিতে হয়, তবে তেমন শান্তির জন্য স্পর্ধা করিবার কি আছে? ভারতের শান্তি পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত জাতিসমাজে দুর্লভ হইতে পারে, কিন্তু স্বাধীন মনুষ্য জীবনের চেয়ে পরাধীন পশুর জীবন নিশ্চয়ই কাম্য নহে। ভারতবাসীরা মানুষ হইতে চায়, দুর্লভ দেশের দর্শনীয় পশু থাকিতে রাজী নয়।

অন্নবস্ত্রের সমস্যা

অন্তঃপ্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকৃতি দুইয়ের দুর্যোগের মধ্যে বাঙালীর দুর্গাপূজা কোনরকমে কাটিয়া গেল। বহিঃপ্রকৃতির দুর্যোগ বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু অন্ন এবং বস্ত্রের দারুণ সমস্যার ভিতর দিয়া অন্তঃপ্রকৃতির দুর্যোগ দিন দিন ঘনীভূত হইতেছে। এবার হৈমন্তিক ধান্য গৃহস্থের ঘরে উঠিলেই নাকি বাঙালীর অন্নের ভাবনা থাকিবে না, আমরা বাঙলা দেশের কর্তৃপক্ষের মুখে এমন কথা শুনিতেছি। কিন্তু ইতিমধ্যে অবস্থা দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। মফস্বলের কোন কোন স্থানে চাউলের দর মণ প্রতি পনের টাকা দাঁড়াইয়াছে। এমন অন্নকষ্টের অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা হইবার, নানাস্থানে সেই অশান্তি উপদ্রবও দেখা দিয়াছে। বুভুক্ষু জনতা দোকানপাট লুট করিতেছে, হাটে-বাজারে ধান চাউলের গোলায় হানা দিতেছে, ধানের নৌকা লুটও হইতেছে। এদিকে কর্তৃপক্ষ জিনিষপত্রের যে দর বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া লাভখোরদের ব্যবসা চলিতেছে। কলিকাতা শহরে বাঙলা সরকার ছয় আনা সের দরে চিনি বিক্রয় করিবার জন্য একশত দোকনে ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু ফলে ব্যবস্থার পরিবর্তে অব্যবস্থাই স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সরকারের নির্দিষ্ট দোকানগুলি রাজদ্বারে পরিণত হইয়াছে। সেখানে সারি বাঁধিয়া ধন্না দিয়া পুলিসের ধমক, গুণ্ডার ধাক্কা এবং দোকানীদের নির্বিচার উপেক্ষা ছাড়া চিনির পোঁটলা খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটিতেছে; অথচ পাশের দোকানেই বার আনা দরে চিনি বিকাইতেছে এবং লোকে ছয় আনা সেরে চিনি খাওয়ার সুখের চেয়ে বার আনার সেই স্বস্তিই শ্রেয় মনে করিতে বাধ্য হইতেছে। এদিকে চিনির ব্যবসার ভিতরের খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহাদের মুখেই শুনিতেছি যে, চিনির অভাব দেশে নাই। গত ৫ বৎসরে এই ব্যবসায়ের এতটা উন্নতি হইয়াছে যে, দেশের চিনির অভাব মিটাইয়াও এখন চিনি বাড়তি দাঁড়ায়। অন্য সব দেশে উৎপন্ন মালের অভাবই অনটনের কারণ হয়, এদেশে সে অভাব না থাকিলেও অনটন দেখা দেয়, ইহাই হইল অবস্থা। সেদিন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সরকারপক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, কলিকাতায় আলুর অভাব দূর করিবার জন্য অবিলম্বেই কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছেন; কিন্তু সে কথা কার্যে পরিণত হয় নাই। শহরের আলুর মহার্ঘতা সমানই আছে। বস্ত্র সমস্যা আরও ভীষণ; সম্মুখে শীত আসিয়া পড়িল, এখন কাপড়ের অভাবে লোকের দুর্দশার অবধি থাকিবে না। এতদিন স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ নামক অপূর্ব বস্তুর প্রতীক্ষায় থাকা গিয়াছিল; কিন্তু সম্প্রতি যে খবর শুনিতেছি, তাহাতে মনে হয় সুলভ মূল্যে গরীবের বস্ত্র যোগাইবার জন্য ভারত সরকারের সে প্রস্তাব বাগাড়ম্বরেই পর্যবসিত হইল। ভারত গভর্নমেণ্ট নাকি এ সম্বন্ধে এখনও তাঁহাদের মত স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ ক্রয় করা এবং সেগুলি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার ঝঞ্ঝাট প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কর্তারা গ্রহণ করিতে রাজী হইতেছেন না। এখন ভারত সরকার কাপড়ের কলের মালিকদের দ্বারস্থ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সুলভ মূল্যে ঐরূপ বস্ত্র কিছু পরিমাণে উৎপাদনের বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এমন চেষ্টার সফল সম্বন্ধে আমরা নিজেরা কোনরূপ আশা পোষণ করিতে পারি না। মোটের উপর দেখা যাইতেছে, দেশের লোকের অন্নবস্ত্রের এই সমস্যার কিছু প্রতীকার করিতে হইলে সুনির্ধারিত একটা নিখিল ভারতীয় কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করাই প্রয়োজন; কিন্তু সে প্রয়োজনীয়তা ভারত গভর্নমেণ্ট এখনও উপলব্ধি করিতেছেন না এবং তেমন কর্মপদ্ধতির অভাবে জিনিসপত্র সরবরাহের ব্যবস্থার ক্রমাগত ত্রুটিই দেখা দিতেছে। সেই সব ত্রুটির জন্য এ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টেরও যত চেষ্টা সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতেছে। গরীবের দুঃখ সমানই থাকিয়া যাইতেছে, অথচ চোরাগোপ্তা চালে লাভখোরদের কারবার বেশ চলিতেছে। অবস্থার যদি অবিলম্বে প্রতীকার না হয়, তবে দেশব্যাপী বিষম অনর্থের সূত্রপাত হইবে, আমাদের এই আশঙ্কা হইতেছে।

Nadharan

Regd.

নাধারণ

জন্ম নিয়ন্ত্রণের অর্থ চিরতরে সন্তান জন্ম নিরোধ নহে। সহজ কথায় ইহার অর্থ . এই যে, এমন কয়টি সন্তানোৎপাদন করা—যাহা স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যের হানি না করিয়া ধারণ করা সম্ভব এবং যাহাদিগকে সুশিক্ষা দিয়া এবং সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিয়া লালনপালন করা মাতাপিতার পক্ষে সম্ভব। জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা জাতির পক্ষে অত্যাবশ্যক।

শ্রীমতী কান্তা বৈদ্য বাচস্পতি এই ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য ৪॥ বৎসর ধরিয়া বিরামবিহীনভাবে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "আমার এইরূপ একটি ঔষধ প্রস্তুত করা উদ্দেশ্য ছিল—যাহাতে কোনক্রমে স্ত্রীলোকের জন্ম দান ক্ষমতার কোন হানি না ঘটে।"

শ্রীমতী কান্তা এই উদ্দেশ্য লইয়াই প্রাণপণ চেষ্টা এবং পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। **নাধারণ** তাহারই **ফল, যে ২০০** রোগীকে তিনি ইহা ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন, তাহার একটিও বিফল হয় নাই।

নাধারণ জন্ম নিয়ন্ত্রণের অব্যর্থ ও নির্দ্দোষ ঔষধ।

কান্তা আয়ুর্ব্বেদিক প্রোডাক্টস,

মূল্য ৫, **টাকা**। ডাক খরচা লাগে না। পোঃ অঃ বক্স নং ৫৮৬ **বোম্বাই**

F|1
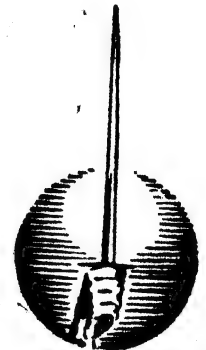
হরিবংশ

(উপন্যাস)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নোট আর কাঁচা টাকায় ভরতি পাটের থলেটা সাবধানে মাজার কাপড়ের নীচে রেখে সুবল কেবল বাজারখোলার দিকে পা বাড়িয়েছে ওবাড়ির বুড়ো নবদ্বীপ অনুনাসিক সুরে খেদ করতে করতে এসে উপস্থিত হ'ল। 'ও বাবা সুবল, তোরা থাকতে এর কি কোন বিচার হবে না? তোরা থাকতে ও আমার গায়ে হাত তুলতে পর্যন্ত সাহস পায়?'

যাত্রার প্রারম্ভেই বাধা। সুবল ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বিরক্ত মুখে বলল, 'দোকানে যাচ্ছি জেঠামশাই, দোকান থেকে ফিরে এসে আপনার কথা শুনব।'

কিন্তু নবদ্বীপ তেমনি পথ আগলেই রইল, বলল, 'এসে আর আমাকে দেখতে পাবিনে বাবা, ততক্ষণে ও আমাকে মেরেই শেষ ক'রে ফেলবে।'

বিষয়টা অবশ্য কৌতুকের। নবদ্বীপের ছেলে মুরলী নবদ্বীপকে মেরেছে, যে নবদ্বীপ পাড়ার মধ্যে সব চেয়ে ধনী, সমাজের একজন মোড়ল, তার দুর্বৃত্ত ছেলে তাকে ধরে ঠেঙিয়েছে। আর নবদ্বীপ অসহায়ভাবে সুবলের কাছে এসেছে—সমাজে আজো যার তেমন প্রতিষ্ঠা হয়নি, কারবার যার এখনো দাঁড়াতে পারেনি ভালো ক'রে, দেনার ভারে আজো যা টলমল করছে। রীতিমত আত্মপ্রসাদ অনুভব করে সুবল, না—অর্থ এখনো সব নয়। অর্থই সব নয়, দোকানে একটু পরে গেলেও কিছু এসে যাবে না। মাণিক ছোঁড়াটা গেছে দোকানে, সে-ই দোকান খুলে বসবে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ যারা তাড়ায়, তারাই জানে এতে কি উত্তেজনা, কি আনন্দ, আর কি আত্মগৌরব, খোরাকটা চিরকাল ঘর থেকেই আসে, কিন্তু উত্তেজনার জন্য পরের মুখাপেক্ষী না হয়ে উপায় কি! আর এই জিনিসটা সুবলের বউ মঙ্গলা সবচেয়ে বেশী অপছন্দ করে। অন্যের ব্যাপার নিয়ে কেন যে এত মাথা ঘামায় সুবল, তা সে বুঝে উঠতে পারে না। ঘন ঘন চুড়ির শব্দে বিরক্ত হয়ে বলল, 'আচ্ছা জেঠামশাই, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি আসছি ঘর থেকে।'

ঘরে ঢুকে সুবল বলে, 'কি, অত চুড়ি বাজাচ্ছিলে কেন?'

মঙ্গলা বলে, 'কি আবার। ওই বুড়োর প্যানপ্যানানি শোনবার জন্য তুমি কি বেলা দুপুর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি। বাপ-বেটায় মারামারি ক'রেছে, সে কথা তুমি শুনে কি করবে।'

মঙ্গলার এই কর্তৃত্বের ভঙ্গী সুবলের ভারি দুঃসহ লাগে। ওকে যত সে চেপে রাখতে চায়, তত সে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সমাজে চওড়ায় সুবলকে সে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলে যেন তার ধারণা, ক্ষমতায়ও সে ছাড়িয়ে যাবে স্বামীকে। সুবল ধমকের সুরে বলল 'কি করব না করব, তা কি তোমার কাছে শুনতে হবে?'

মঙ্গলা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দেয়, 'আমার কথা যখন না শোন, তখনই তো ঠকো। কি দরকার আমাদের বাপ-বেটার বিবাদের মধ্যে যাবার? তোমার জেঠার ছেলে তো আস্ত একটা গুণ্ডা, যত গুণ্ডা আর বদমাসের দল তার পিছনে পিছনে ফেরে, যদি রাতে বিরাতে এক ঘা দিয়ে বসে, তখন কি হবে।'

সুবলের পৌরুষে ঘা দিয়ে কথা বলতে বেশ ভালবাসে [illegible] ক্রমে নিরাপদ করতে থাকে, ইচ্ছা হয় দেয় এক ঘা বসিয়ে। কিন্তু সব সময় তেমন সুযোগ হয়ে ওঠে না। নবদ্বীপ ঘন ঘন কাসছে। সুবল সাড়া দিয়ে বলে, 'যাচ্ছি জেঠামশাই।'

সুবল বাইরে এলে নবদ্বীপ বলে, 'কি ঠিক করলে বাবা। তোমরা দশজন থাকতে ও এমন অনাচার কদাচার করবে, বুড়ো বাপকে ধরে ধরে মারবে, এর কোন বিচার তোমরা করবে না?'

সুবল মনে মনে গর্ব বোধ করে। এক অসহায় অথর্ব বৃদ্ধ তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছে, সুবিচার প্রার্থনা করছে। দুর্বৃত্ত পুত্রের উৎপীড়ন থেকে তাকে রক্ষা করতে হবে। মঙ্গলা তাকে মানতে না চাইলে হবে কি, সমাজে ক্রমেই সম্মান আর প্রতিষ্ঠা বাড়ছে সুবলের। সরিকী কলহ বিবাদ মিটাতে, সালিশ হিসাবে বুড়োদের সঙ্গে সুবলেরও ডাক পড়ে আজকাল। সামাজিক দলাদলি, দরবারের বৈঠকে সুবলকে না হলে চলে না, বিয়েতে, শ্রাদ্ধে লোকজন খাওয়াবার সময় জিনিস-পত্রের অমন ঠিক ঠিক তায়দাদ করতে বুড়োরাও পারে না। চতুর, বুদ্ধিমান হিসাবে ক্রমেই নাম ছড়িয়ে পড়ছে সুবলের। কেবল মঙ্গলাই যেন তা স্বীকার করতে চায় না। না করে না করল, তাতে কিছু এসে যাবে না সুবলের। প্রদীপের নীচেই থাকে অন্ধকার। আর কেউ যদি চোখ বুজে সূর্যের আলোকে অস্বীকার করতে চায়, সে চিরজীবন চোখ বুজেই থাকুক। সূর্যের আলো তাতে ঢাকা পড়বে না। তবু মাঝে মাঝে মঙ্গলার ধরণ-ধারণে অবাক হয়ে যায় সুবল। এ কেমন ধরণের মেয়েমানুষ—স্বামীর গৌরবে যে গর্বিত হয় না, স্বামীর যশকে যে হিংসা করে, স্বামীকে যে ছোট ক'রে রাখতেই ভালোবাসে।

এই নবদ্বীপ, সুবলের চেয়ে দশগুণ যে ধনী, পাড়ায় একমাত্র যার জোতজমি আছে, মান সম্মান, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির যার তুলনা নেই, সেও এসে সুবলের শরণ নিয়েছে, সালিশ মানছে, বিচার করতে ডাকছে সুবলকে।

নবদ্বীপ বলল, 'চল বাবা, তুমি ওর কাছ থেকে স্পষ্ট শুনে দাও—ও চায় কি, ওর মতলবটা কি আসলে; ও কি চায় যে ওকে আমি জেলে দিই, ত্যাজ্যপুত্র করি? কথাটা তুমি ওর কাছ থেকে শুনে দাও আমাকে।'

সুবল সান্ত্বনার সুরে বলে, "অত হতাশ হচ্ছেন কেন জেঠামশাই, চিরকাল কি আর মানুষ একরকম থাকে, একদিন না একদিন শোধরাবেই।'

নবদ্বীপ উত্তেজিত হয়ে জবাব দেয়, 'শোধরাবে? শোধরাবে কি আর আমি মলে? ওর নিজের বয়সই কি কম হল নাকি? চাল্লিশের কাছাকাছি গেল না প্রায়? মেয়ের বয়সই তো বার তের বছর? অত বড় বয়স্থা মেয়ের সামনেও যা তা কেলেঙ্কারি করতে ওর লজ্জা হয় না। মদ খেয়ে এসে মাতলামো করবে, এতদিন বউকেই মারধোর করেছে, এখন তো আমার গায়েও হাত তোলা আরম্ভ করল। আর ব'ল না বাপু, লজ্জায় আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে।

নবদ্বীপের বাড়িতে ঢুকতেই যেখানটায় উত্তরের পোঁতার সাজানের বন্ধ টিনের ঘরটা ভেঙে

রাজমিস্ত্রীরা যে পাকা কোঠা তৈরী করছে, সেই দিকে চোখ পড়ল সুবলের। এসব দেখলে অবশ্য কারো মনে করা শক্ত যে, নবদ্বীপের চিত্তে একটুও সুখ নেই, আর ছেলের দুর্ব্যবহারে তাঁর মুহুর্মুহু গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু নবদ্বীপ তেমনি সখেদে বলে যেতে থাকে, 'কিছু দণ্ড ছিল, কিছু দেনা ছিলাম রাজমিস্ত্রীদের কাছে আর জন্মে, তাই এসব করবার দুর্বুদ্ধি হয়েছে। নইলে আমি কি বুঝতে পাচ্ছি না যে, চোখ বুজবার সঙ্গে সঙ্গে একখানা ইঁটও দালানের থাকবে না, সব ও ওড়াবে। আমি কিন্তু ঠিক ক'রে রেখেছি সুবল, একটা কাণাকড়িও ওকে আমি দিয়ে যাব না। বাড়িঘর বিষয়সম্পত্তি সব আমি কোন সৎকাজে দান ক'রে যাব, পরকালের কাজ হবে তাতে।'

টিনের ঘর। যে ঘরটা ভেঙে দালান হচ্ছে, তার সমস্ত জিনিসপত্র এনে এই দু'ঘরে ঠাসা হয়েছে। পূবের ঘরেই সবচেয়ে বেশী

পূবের পোতায় আর দক্ষিণের পোতায় ছোট ছোট দুখানা বোঝাই হয়েছে জিনিসপত্রে। বাকি যে স্থানটুকু আছে দক্ষিণ দিকে, সেখানে ছোট একটু তক্তপোষ পাতা নবদ্বীপের জন্য। মাদুরটা শুধু এখন পাতা রয়েছে, বিছানাটা সযত্নে গুটানো রয়েছে একধারে। তক্তপোষের নীচে নবদ্বীপের তামাক খাবার সরঞ্জাম। ঘরে ঢুকে নবদ্বীপ নিজেই তামাক সাজতে বসল। সুবলের দিকে তাকিয়ে দক্ষিণের ঘরের দিকে ইসারা ক'রে বলল, 'এখানে নয়, দেখ গিয়ে ও ঘরে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বাবুর নভেল পড়া হচ্ছে, আর ওই বয়স্থা মেয়েটার সামনে বউর সঙ্গে এই দিনের বেলায় ফষ্টি-নষ্টি করছে। যত অনাচার, অমান্য—দুচোখে যা দেখতে পারিনে তাই। আরে হারামজাদা, বউকে অতই যদি ভালোবাসিস, তবে বাজারে গিয়ে এত কেলেংকারী করিস কেন। কেন আমার টাকার এমন সর্বনাশ করিস? বউটাও দিনের পর দিন এমন ভালো মানষৌত আর ঠ্যাকারেপনা করছে যে, দেখে আমার পায়ের তলা জ্বলে যায়! যত বয়স হচ্ছে তত যেন ওদের ঠ্যাকার বাড়ছে। ইচ্ছা করলে ওই বউ-ই কি ওকে ফিরাতে পারতো না, স্বভাব জোর করে বদলাতে পারতো না ওর? তোমার জেঠিমা মরে বেঁচেছে, আমি বুড়ো মানুষ আমি আর কি করব বল; বয়স্ক হলে এ-সব কথা সামনা-সামনি বলতেও তো লজ্জা হয়। তোমারি বউর মত অমন শক্ত জবরদস্ত মেয়েমানুষ যদি হ'ত, আমার পুতের বউ, তাহলে কি ছেলে আমার এমন বযে যেতে পারে?'

কথাটা কেমন যেন কানে এসে খট্ করে বাজল সুবলের। তার স্ত্রী যে বেশ শক্ত মেয়েমানুষ, একথা পাড়ায় আর কারো জানতে বাকি নেই। একথা নিয়ে পাড়ায় বোধ হয় খুব আলোচনাও চলে। সুবলের কেন যেন মনে হয়—শক্ত আর বুদ্ধিমতী স্ত্রী থাকা সত্যি সত্যি খুব গর্বের কথা নয়। 'তোমার স্ত্রী ভাই বেশ শক্ত জবরদস্ত মেয়েমানুষ, আর বুদ্ধিও রাখে বেশ।' একথা যে বলে এবং সত্য বলে মনে করে, মনে মনে সে একথা ভেবে নিশ্চয়ই না হেসে পারে না। 'আর তুমি তো ভাই তার কাছে দুর্বল ভেড়াকান্ত বনে আছ।' একজনের প্রশংসার মধ্যে আর একজনের নিন্দা প্রচ্ছন্ন থাকে। সুবলের মনে ভয় হয় মাঝে মাঝে, তার সম্বন্ধে লোকে কি মনে করে? তারা কি সন্দেহ করে যে, সুবলের বুদ্ধি মঙ্গলার কাছ থেকেই ধার করা? অথচ তা কিন্তু মোটেই নয়। সুবলের বুদ্ধি তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। কিন্তু যেহেতু লোকে মঙ্গলাকেও বুদ্ধিমতী বলে জানে, লোকের অমন সন্দেহ করা অসম্ভব নয়। স্ত্রীর সুখ্যাতি যে বোকার মত কেন মানুষ কামনা করে, সুবল তা বুঝে উঠতে পারে না। স্বামীর গৌরবে স্ত্রীর গৌরব বটে, কিন্তু স্ত্রীর গৌরবে স্বামীর গৌরব বাড়ে না। মঙ্গলার খ্যাতির কথা শুনে তাই ভয় হয় সুবলের, ঈর্ষা হয়, মুখ তার কালো হয়ে যায়। এর চেয়ে একজন রোগাটে আর বোকা স্ত্রী যদি থাকত সুবলের, তাহলে যেন সে বেশী সুখী হ'ত, সমাজের কাছে আরো মান থাকত তার!

নবদ্বীপ এতক্ষণ অনন্যচিত্তে হুঁকো টানছিল, তামাকটা ভালো করে ধরিয়ে নেওয়ার জন্য, আগুনটা কলকির ওপর দপ করে জ্বলে উঠতেই আস্তে আস্তে কয়েকটা টান দিয়ে হুঁকোটা নবদ্বীপ সুবলের দিকে বাড়িয়ে দিল, 'রেখে দাও সুবল,' সুবল বারান্দায় হুঁকো রাখতে চলে গেল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুবল হুঁকো টানছে—ও-ঘরের জানলা দিয়ে দৃশ্যটা চোখে পড়তেই মুরলী সোল্লাসে বলে উঠল, 'আরে সুবলদা যে! কি ছাই বাজে তামাক টানছ বসে বসে, এ-ঘরে ভালো সিগারেট আছে এস, এস।'

থামে হুঁকোটা ঠেস দিয়ে রেখে সুবল যেতে যেতে বলল, 'আসছি।'

মুরলী বাড়িতেও যখন থাকে, তখনও বেশ সেজেগুজে থাকে। পরিষ্কার মিহি একখানা ধুতি তার পরণে, দামী টুইলের একটা হাফ সার্ট গায়ে, দেখে মনে হয় এইমাত্র তার ইস্ত্রি ভেঙেছে। দাড়ির একটু অঙ্কুরও দেখা যায় না তার মুখে, নিজে প্রত্যেক দিন সে ক্ষৌরি হয়, তারপর দামী স্নো মাখে। দেখে মনে হয়—সব সময়ই শরীরকে সে প্রসাধনের ওপর রেখেছে। একেবারে কলকাতার ফিট্‌বাবু। এত পরিষ্কার জামা-কাপড় বাইরে বেরুবার সময়ও জোটে না সুবলের, শুধু সুবলের কেন, পাড়ার আর কারই-বা জোটে! সুবল ঘরে ঢুকতেই মুরলী একটা চেয়ার এগিয়ে দিল সুবলকে, 'এস এস সুবলদা।' নিজের অপরিচ্ছন্নতায় সুবল অস্বস্তি বোধ না করে পারছে না। ওর কাছে আপনা-আপনিই যেন ছোট হয়ে গেছে সুবল। আর যাই হোক, কলকাতায় ঘোরাঘুরি করে বড়লোকি চালটা বেশ শিখেছে। চিটা গুড়ের হাঁড়ি বয়ে বয়ে নবদ্বীপের মাথায় টাক পড়ে গেছে বলে মুরলী যে লম্বা লম্বা চুল পিছন দিকে উল্টিয়ে রাখবে না, তার কি মানে আছে। সুবলের মনে হ'ল, মুরলীর এই বিলাসিতায় নবদ্বীপেরও যেন গোপন প্রশ্রয় আছে, নাহলে নবদ্বীপের নিজের রোজগারেরই-তো সব টাকা, মুরলী তো এক পয়সাও আয় করে না, বাপের কারবার আজও তো সে মন দিয়ে দেখে না, তবু কেন নবদ্বীপ তাকে এমন করে টাকা নষ্ট করতে দিচ্ছে! কষ্ট হয়ত নবদ্বীপ পায় টাকাগুলির এমন অপব্যয় হওয়ার জন্য, কিন্তু এক ধরণের আনন্দও হয়ত অনুভব করে নবদ্বীপ। বুড়ো-বয়সে দশজনের সামনে বাবুগিরি করতে নিজে তো আর নবদ্বীপ পারে না। কিন্তু মুরলীর পারতে কোন বাধা নেই। আর ইচ্ছা করলেও অমন করে চুল ওল্টাবার সাধ্য নেই নবদ্বীপের, ছেলের কালো সুচিক্কণ চুলের জন্য অন্যের কাছে বোধ হয় গর্বই বোধ করে নবদ্বীপ; একা যখন থাকে তখন তার যতই ঈর্ষা হোক না কেন। নবদ্বীপের তাহলে মতলবটা কি। সে কি সত্যিই মুরলীকে তিরস্কার করবার জন্য ডেকে এনেছে সুবলকে, না ছেলের ঐশ্বর্য আর সৌন্দর্য দেখাবার জন্য?

জিনিসপত্র এ-ঘরে অপেক্ষাকৃত কম। এরই মধ্যে নিজের পছন্দমত ঘরখানাকে সাজিয়েছে মুরলী। থামে থামে নানা রকমের ফটো। কোনটাই ঠাকুর-দেবতার নয় এবং কোন-কোনটার দিকে একেবারেই তাকানো যায় না, অবশ্য না তাকিয়ে যে পারা যায়, তা নয়। মুরলীর বিলাসিতা আর আড়ম্বরে নিজেকে ভারি দীন মনে হ'তে থাকে সুবলের। এমন লোককে কি করে জিজ্ঞাসা করা যায় 'কেন তোমার বুড়ো বাপকে মেরেছ?' এমন সাজানো গুছানো ঘরে এমন সাজসজ্জাওয়ালা বড়লোকের সামনে ও-কথা উচ্চারণ করতে তো মুখে বেজে যায়। তার চোখের সামনে দিয়েও যদি মুরলী অস্থানে, কু-পল্লীতে ঢোকে, সুবলের মনে হ'ল, সুবল তাকে একটা কথাও বলতে পারবে না। একি পাড়ার ফটিক ছোঁড়া যে কানে ধরে হিড় হিড় করে তাকে টেনে আনবে? সুবলের মনে হ'তে লাগল 'অর্থ' সব না হলেও 'অর্থ' অনেকখানি। মুরলীর মত অর্থবান হ…

(৫২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আত্মিক

অমর সান্যাল

পাশাপাশি দুটি শহর, মাইল আষ্টেকের ব্যবধান মাত্র। ছোট হলেও শহর দুটির গুরুত্ব কম নয়। লোচনপুর ব্যবসার জায়গা, পয়সাওয়ালা লোকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শহরে চুরি ডাকাতি খুন জখম লেগেই আছে। থানায় থাকে মাত্র আট দশজন পুলিশ; তারা পেরে ওঠে না অপরাধীদের সঙ্গে। তবে যেদিন ধরতে পারে সেদিন আর নিস্তার নেই। দারোগা নিত্যানন্দ হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি ইউনিফর্ম গায়ে দেয়, হেড্ কনস্টেবল হনুমান সিং পাকা গোঁফে তা দিয়ে বিজয়ীর মত ওপরদিকে সিগন্যাল তোলে। দড়িবাঁধা আসামীদের নিয়ে সপারিষদ দারোগা সদলবলে যাত্রা করে সদরের দিকে।

খোয়াবাঁধান সরকারী সড়ক; কুড়ি মিনিটে বাস গিয়ে দাঁড়ায় নারায়ণগড়ের স্ট্যান্ডে। ফৌজদারী আদালতের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, ধুলোয় চারদিক অন্ধকার করে মিত্তির কোম্পানীর লোচনপুরের বাস আসছে; ড্রাইভারের পাশে বসে নিতাই দারোগা। সকলে বুঝতে পারে লোচনপুরের একটা গ্যাং আবার ধরা পড়েছে।

দু'শহরের মধ্যে যাতায়াত করে বাস মাত্র ওই একখানা। বড় জোর চব্বিশ জন লোক একবারে আসতে পারে। সুযোগ বুঝে ছ্যাকরাগাড়িওয়ালারা চড়া ভাড়া হেঁকে বসে। আট মাইল পথের ভাড়া চার টাকা পর্যন্ত উঠে। বেশীরভাগ লোকই যাতায়াত করে হেঁটে; তবে দল বেঁধে, একলা নয়। পথের দুর্নাম ত আছেই, তা ছাড়া চারদিক এত নিস্তব্ধ যে বেশীক্ষণ একলা চললে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। ঝিলে জঙ্গলে দু'একখানা ঘর দেখা যায় বটে, কিন্তু তার সামনে বাবরী চুল, পাথরের মত শক্ত কালো কালো হাত পা নিয়ে যারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের দেখলেই ভয় হয়। বাসের মহিলা যাত্রীরা দুলে মেয়েদের স্বাস্থ্যবান সজীব প্রতিমার মত দেহসৌষ্ঠব দেখে গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। নিতাই দারোগা বলে,—ওদের পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরাও বেরোয় ডাকাতি করতে। কি চেহারা রে বাবা! চামুণ্ডার চেলা!

আরা-সাসারাম লাইট রেলওয়ের ফায়ারম্যান মীর খাঁ কাজ হারিয়ে বাড়ি বসে আছে প্রায় তিন মাস। বর্ধমানের ম্যালেরিয়া-দূষিত আবহাওয়ায় দেহে তার ঘুণ ধরলেও মনেপ্রাণে রয়ে গেছে পাঠান পূর্বপুরুষের ঘরছাড়া চেতনার তীব্র আমেজ। বাড়ি বসে শুধু ক্ষেত-খামারের কাজ,—কতটুকুই বা সময় লাগে শেষ করতে! বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন, মীর খাঁর মনে হয় তিন মাস সে বসে আছে নিষ্প্রাণ জড়ের মত। দুর্গাপুরের ক্ষুদ্র কুটীর, ঝোপ-জঙ্গলে ঘেরা অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ, রোজদেখা লোকের একই সম্ভাষণ 'খবর কি মীরু ভাই',—সে যেন হাঁপিয়ে উঠল। সন্ধ্যাবেলাটা যেন কাটতে চায় না। বিক্রমগঞ্জের রানিং-রুমের কথা মনে পড়ে। ডিউটি সেরে কুয়োর ঠাণ্ডা জলে স্নানের আনন্দ দুর্গাপুরে কোথায়? বিশ্রামের সময় হত না, তাড়াতাড়ি ছুটতে হত স্টেশনের দিকে,—রাত আড়াইটের ছাড়বে সাসারামের গাড়ি।

দুর্গাপুরে খবর আনল হারু মণ্ডল,—লোচনপুরে রেল হচ্ছে; ছোট লাইন বসবে নারায়ণগড় পর্যন্ত। খবর শুনে মীর খাঁ এই প্রথম বেরুল পাড়া বেড়াতে। হারুকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করল,—খুড়ো, খবরটা সত্যি? হারু রসিকতা করে বল্লে,—বাড়ি আর ভাল লাগছে না বুঝি? তা লাগবেই বা কেন, বিয়েটিয়ে ত আর করলে না।

পরদিন সকাল থেকে মীরকে দুর্গাপুরে দেখা গেল না। আট দিন পরে সে ফিরে এল, রেলের ইউনিফর্ম পরে। খাঁকী হাফসার্ট আর সর্টপরা কাঁধে কোম্পানীর লেবেল আঁটা মীর খাঁ উন্নতমস্তকে আর একবার পাড়া বেড়িয়ে এল। সে ফায়ার-ম্যানের কাজ পেয়েছে নতুন রেলপথে।

লোচনপুর নারায়ণগড়ের সড়ক আর চেনা যায় না। বড় বড় গাছ কেটে, ঝোপঝাড় উড়িয়ে দিয়ে লাইন বসেছে রাস্তার এক-ধারে। ছোট গেজের লাইন, দিনে-রাতে ট্রেন যাতায়াত করবে আটখানা। মিত্তির কোম্পানীর এতদিনে টনক নড়ল। চলতি বাসখানা রঙচঙে করে খেতুরের মেলায় খাটা ভাঙা বাসও তিন চারখানা এনে হাজির করল। ছ্যাকরাগাড়িওয়ালারা এতদিনের ব্যবসা মাটি হল দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

দু'শহরের লোক ফেলল আরামের নিশ্বাস। পথ সরল হওয়াতে লোচনপুরের মামলাবাজ বৃদ্ধেরা প্রতিবেশীর নামে নতুন মামলার ফিকির বার করতে লাগল। নারায়ণগড়ের বৃদ্ধারা লোচনপুরের গঙ্গায় স্নান করবার অবাধ সুযোগ পেয়ে মনে মনে রেল কোম্পানীর দীর্ঘায়ু কামনা করল। খুসী হল না কেবল নিতাই দারোগা; বল্লে—বদমায়েসদের সুবিধে করে দিল কোম্পানী, যত রাজ্যের চোর বাটপাড় এসে জমবে এবার এখানে। দারোগা বদলীর দরখাস্ত করে দিল।

ট্রেন চলার সঙ্গে সঙ্গে লোচনপুরের মরা সড়কে যেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হল। নির্জন প্রান্তর নতুন স্পন্দনে মুখর হয়ে উঠল। খোলা মাঠে চারা গাছের মত ছোট ছোট খড়ের বাড়ি মাথা তুলে হাওয়ায় কাঁপতে লাগল। দুলেরা সরে গেল মোষের পাল নিয়ে নদীর ওপারে ঘন জঙ্গলের মধ্যে। তাদের যাযাবর মনের প্রাচুর্য সভ্যতার নতুন আলো থেকে তফাতে রইল।

কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন লাইনের ফায়ারম্যান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মীর খাঁর বয়স ত্রিশের মধ্যে হলেও যৌবনের সকল চিহ্ন শুকিয়ে গেছে দেহে। রোগা শুকনো চেহারা, তোবড়ান গাল, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। হাত পা সরু সরু কাঠির মত, পা ধনুকের মত বাঁকা। এঞ্জিন যখন চলে, মনে হয় একটা জীবন্ত কঙ্কাল শভেল হাতে ফারনেসে কয়লা দিচ্ছে। কয়লামাখা সে চেহারা দেখলে ছোট ছেলেমেয়েরা ভয় পায়, রাতের বেলা বড়রা আঁতকে ওঠে। মীর খাঁ হাসে দাঁত বার করে, বলে—ভয় কি বাবু, মানুষ বৈ ত নয়!

দুর্গাপুরের মৌনী মীর খাঁ নারায়ণগড় ও লোচনপুরে বিখ্যাত হয়ে উঠল তার বাক্‌পটুতার জন্য। দীর্ঘ তিন মাসের অবরুদ্ধ জীবনস্রোত যেন হঠাৎ মুক্তির আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে বিপুলে বিশ্বের মাঝখানে। সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যগণ্ডী তাকে ধরে রাখতে পারেনি; তিন শ মাইল দূরে তার চঞ্চল মন ফিরে পেয়েছে হারানিধি। আরা-সাসারামের ভূত আবার চেপেছে ঘাড়ে, হাসান-বুজ্রোরের ঝাপসা স্মৃতি ফিরে এল নতুন রূপ নিয়ে।

নতুন রেলপথের যাত্রীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা হল ফায়ারম্যানের। লোচনপুরের হেমন্তবাবু ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন নারায়ণগড় পর্যন্ত। মীর খাঁর কাছে ধার করেন দু-এক টাকা; শোধ দিতে ভুলে যান প্রত্যেক বারই। নারায়ণগড়ের পুণ্যকামী বৃদ্ধাদের হাত ধরে সে গাড়িতে তুলে দেয়, তাঁরা বাড়ি এসে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ হন। সকালের ট্রেন সিটি বাজিয়ে চলে; পথের ধারে, মাঠে মাঠে ছেলে মেয়েরা হাত নেড়ে, গাছের পাতা উড়িয়ে অভিনন্দন জানায় মীর ভাইকে।

মীর খাঁর সবচেয়ে ভাল লাগে পুজোর সময়টা। ট্রেন বোঝাই লোচনপুরের প্যাসেঞ্জার। প্রবাসীরা ফিরছে স্ত্রীপুত্র নিয়ে। তার উৎসাহ বেড়ে যায় দ্বিগুণ। মাথার রুমালটা ভাল করে জড়িয়ে সে চাঙড় চাঙড় কয়লা দেয় ফারনেসে; কালো ধোঁয়ায় নারায়ণগড়ের স্টেশন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মাঝে মাঝে বাইরে দাঁড়িয়ে তৃষাতুর চোখে যাত্রীর মেলা দেখে; ড্রাইভার হোসেন আলীর ধমকে তার চমক ভাঙ্গে। গাড়ি সেদিন দশ মাইলের জায়গায় পনের মাইল স্পীডে চলে, এঞ্জিনের সিটি অকারণেই ঘন ঘন আর্তনাদ করে। বুড়ো ড্রাইভারের আফিমের নেশা টুটে যায়। ফায়ারম্যানকে আবার ধমক দেয়, পাঞ্জাব মেল চালিয়েছ যে! স্পীড কমাও শাগ্‌গীর, মোল্লারহাটের বাঁক আসছে। মীর খাঁর কানে আসে না বুড়োর কথা। সে তখন ভাবছে,—প্রবাস থেকে সেও একদিন ফিরবে দুর্গাপুরে, কিন্তু সঙ্গে থাকবে কে?

হোসেন আলী রাগ করে নিজেই ব্রেক কষে দেয়।

সেদিন আচমকা একখানা নতুন এঞ্জিন এসে হাজির হল নারায়ণগড়ের এঞ্জিন শেডে। মীর খাঁ বল্লে সাসারাম থেকে এসেছে। ব্রেকের সেই পুরানো হ্যাণ্ডল, সেই ফারনেস ও বয়লার; অনেকদিনের হারানো বন্ধু যেন ফিরে এসেছে। সিটি বাজাতেই শোনা গেল সেই পরিচিত আর্তনাদ। মীর খাঁ পুলকিত হয়ে উঠল।

নতুন এঞ্জিন গাড়ি টানে হাঁপলাগা বৃদ্ধ অশ্বের মত। গাড়ির স্পীড গেছে কমে। যাত্রীরা অনুযোগ করে। মীর খাঁ বলে, —নতুন এঞ্জিন কি না দাদা, পথঘাট এখনও ভাল রপ্ত হয়নি। দিন দুই পরে চলবে দেখ পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত। মরচেধরা এঞ্জিন ঘসে মেজে সে ঝকঝকে করে তুলল। কোম্পানীকে অনেক লেখা-লেখি করে কোণ্‌ভাঙ্গা ফানেলটা সারিয়ে নিল। এ এঞ্জিনে কয়লা লাগে একটু বেশী। ফারনেসের ঢাকনা খুলে মীর খাঁ শভেলের পর শভেল কয়লা দেয়, বলে,—খা বেটা খা। অঙ্গার জ্বলে উঠে দাউ দাউ করে; গন্‌গনে আগুনের তপ্ত ঝলক তার চোখে মুখে এসে লাগে। পরমস্নেহে হোসেন আলীকে সে বলে,—খেয়ে দেয়ে বেটার আমার বাঁক হয়েছে, চাচা।

ড্রাইভার ফায়ারম্যানকে পাগল বলে ধরে নিয়েছে। লোচন-পুরের রাঁনিং-রুমে সে রাত কাটায় না, এঞ্জিন পাহারা দেয় সারা-রাত ধরে। অন্ধকার নদীতীরে কসাড়বনের মধ্যে এঞ্জিন রাতের মত বিশ্রাম করে, একটু একটু ধোঁয়া হাঁপলাগা নিশ্বাসের মত বেরিয়ে আসে ফানেল দিয়ে। স্টেশন থেকে আব্‌ছা আব্‌ছা দেখা যায়,—বালতি বালতি জল এনে কে যেন এঞ্জিনের গায়ে ঢালছে, খুট্‌খাট শব্দে ভাঙ্গাচোরা মেরামত করছে। গভীর রাতে শুধু শোনা যায় এঞ্জিনের ফোঁস ফোঁস শব্দের সঙ্গে মিশে গেছে তার দরদী বন্ধুর তন্দ্রাভরা অর্থহীন বকুনি—

সাসারাম-ফেরত এঞ্জিনের স্পীড আর হয় না; সাইকেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়েও পেরে ওঠে না। মিত্তির কোম্পানীর বাসের সংখ্যা আরও বেড়েছে, ট্রেনের প্যাসেঞ্জার গেল কমে। ছ্যাকরা-গাড়িও দু-একখানা চলে। আট মাইল পথ যেতে ট্রেনের লাগে এক ঘণ্টা। মীর খাঁ বলে,—বাচ্চা এঞ্জিন, এত শাগ্‌গীর স্পীড হলে দম ফুরিয়ে যাবে যে। প্যাসেঞ্জাররা হাসে। অন্তা বোষ্টম বলে,—বাচ্চা না হাতী, বুড়ো এঞ্জিনের তোমার দম গেছে ফুরিয়ে মীরু ভাই।—

ভোরের গাড়ি ছেড়েছে লোচনপুর থেকে। ঝক্‌ঝক্‌ শব্দ করে চলছে এঞ্জিন আঁকাবাঁকা লাইনের ওপর দিয়ে। হোসেন আলী আজ নিজের হাতে নিয়েছে গাড়ি চালানোর ভার, গতিবেগে সমস্ত এঞ্জিনটা থর থর করে কাঁপছে। বার মাইলের বেশী স্পীড উঠল না; শিথিল কলকব্জা থেকে থেকে আর্তনাদ করে উঠছে। বিবর্ণমুখে দাঁড়িয়ে আছে শভেল হাতে মীর খাঁ। দৃষ্টি তার বাইরের দিকে; এঞ্জিনের অন্তিম প্রচেষ্টা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে বাজছে তার বুকে। মিত্তির কোম্পানীর বাস পর পর চারখানা এঞ্জিনকে বিদ্রূপ করে হর্ন দিতে দিতে উধাও হয়ে গেল। আসগরের নতুন ঘোড়ার গাড়িখানা চলেছে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

আকাশ জুড়ে সুরু হয়েছে তখন মেঘের খেলা। নদীর ওপারটা বৃষ্টিধারায় ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে। মন্দিরের সাদা চূড়োটা দেখা যাচ্ছে না, লাল রঙের পোলটার মাথা মাঝে মাঝে জেগে উঠছে বনের আড়াল থেকে। মাঠে মাঠে নতুন ধানের চারা অসহায় শিশুর মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, মোল্লারহাটের শুকনো বিলটা জলে ভরে গেছে। মীর খাঁর আজ অনেকদিন পরে মনে পড়ল দুর্গাপুরের কথা।

গাড়ি আবার চলছে ঢিকুতে ঢিকুতে। এঞ্জিনের আর্তনাদ গেছে থেমে। হোসেন আলী বল্লে,—নাও বাপু, তোমার এঞ্জিন চালান আমার কম্ম নয়; যে রকম ফোঁস ফোঁস করছে, বয়লার না ফেটে যায়। দূরে দেখা যাচ্ছে নারায়ণগড়ের ডিস্‌টাণ্ট সিগন্যাল। মীর খাঁ পরম সমাদরে ব্রেক টেনে ধরল।

এঞ্জিনের স্পীড বাড়ানোর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল। আরা-সাসারামের লৌহবর্ম্মে তার সকল শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। মীর খাঁ পীরের দরগায় সিন্নি মানল, কালীতলায় জোড়া-পাঁঠার ভেট অঙ্গীকার করল, একদিন ছুটি নিয়ে নারায়ণগড়ের রোমান ক্যাথলিক গীর্জার বৃদ্ধ পাদরীর সঙ্গে দেখা করে এল।

রাণী ঝিলের মাঠে বেড়িয়ে ফেরার মরসুম এল। একটা দেওদারের নীচে দেখা যায় হরিজন স্কুলের ছেলেরা ড্রিল করছে। আয়ার দল ঘুরছে পেরাম্বুলেটার টেনে। শরৎবাবু ও কান্তিবাবু, —বিহার জুডিসিয়ারির দু'জন রিটায়ার্ড মানুষ, লাঠি হাতে একসঙ্গে পা ফেলে চলেছেন বাঁধের লাল কাঁকরের সড়ক ধরে।

রাণী ঝিলের নতুন বাতাস আজ ডাক দিয়েছে সবাইকে। হাসপাতাল রোড ধরে সপরিবারে লালবাগের ভদ্রলোকেরা বেড়াতে আসছেন। গলফের লাঠি হাতে মুখে পাইপ কামড়ে আসছে স্যামুয়েল সাহেব। মালা বিশ্বাস বেড়াতে এসেছে, খোঁপায় জড়ানো প্রকান্ড একটা রঙীন রুমাল উড়ছে বাতাসে। প্রচারক চৌধুরী মশায় ঝিলের জলের ধারে একটা গাছের ছায়ায় খবরের কাগজ পেতে-ছেন, উপাসনায় বসবার জন্য।

* * * *

সকলে থমকে দাঁড়াচ্ছিল সেখানে। ছোট একটা কালো পাথরের টিলা, তার গা ঘেঁসে একটা করবী গাছ। এই পাথরটা ক্রস রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে আজ পঞ্চাশ বছর ধরে। কোন দিন এর দিকে তাকিয়ে দেখার মত কিছু ছিল না। গরু চরাতে এসে রাখালেরা কোন দুপুরে মাঝে মাঝে এখানে ভাত খেতে বসে।

সকলেই একবার দাঁড়াচ্ছিল সেখানে। জায়গাটা পার হতে অন্তত দু'তিন মিনিট সময় লাগছিল সবারই। পাথরটার ওপর বড় বড় হরপে সাদা খড়ি দিয়ে গদ্যে পদ্যে মিশিয়ে নানা ছন্দে কি সব লেখা। পথচারী সকলেই, কেউ একা কেউ সদলে চোখ ভরা দুরন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়ছিল লেখাগুলি। প্রথম শরতের সকাল বেলা এই পথে-পড়ে-থাকা পাথরটার গায়ে কে ছড়িয়ে গেল এমন এক মুঠো রোমান্স!

বেশীক্ষণ কেউ দাঁড়াচ্ছিল না সেখানে। তা সম্ভবও ছিল না। পড়ে নাও আর সরে পড়। লেখাগুলি ভয়ানক রকমের অশ্লীল।

শুধু তাই হ'লে ভাল ছিল। দেখা যাচ্ছে, কথাগুলি সবই একটি মেয়েকে উদ্দেশ্য করে লেখা। শুধু নাম থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কাদের বাড়ির মেয়ে। এই নিদারুণ পরিচয়-লিপির অনেক কিছু বাদ দিলে সংক্ষেপে তাকে এইটুকু শুধু চেনা যায়।

—পূর্ণিমা বসু। রূপে আর নামে এমন মিল আর দেখা যায় না। তুমি নাকি গয়না ভালবাস না। লজ্জাই তোমার ভূষণ, সত্যি কথা। ছ' মাস চেষ্টা করে একটি বার শুধু তোমায় চোখে দেখতে পেয়েছি। যাক্, তোমার চিঠি, আসে ভিয়েনা থেকে। এবার ম'লে ফর্সা হব। তিনি ভাল আছেন তো? আর এক যক্ষ যে সিমলা পাহাড়ে হাঁ করে বসে আছে। যাচ্ছ কবে? যখন তখন ওভাবে হাই তুলতে নেই, বড় বিশ্রী দেখায়।

* * * *

কে লিখেছে কে জানে! এই অজানা অশ্লীল কুৎসাবিশারদের লেখাগুলি মৌচাকে ঢিলের মত শহরের বুকে এসে লাগলো। তিন ঘণ্টার মধ্যে, প্রত্যেক ঘরে ও বৈঠকে, নিভৃতে ও নেপথ্যে গুন্ গুন্ করে উঠলো শুধু এই প্রসঙ্গ—কালো পাথরের লেখা।

শুধু এই প্রশ্ন, কে লিখলো? কে পূর্ণিমা বসু? কথা-গুলি কি সত্য? মনে মনে, মুখে মুখে, আলাপে আলোচনায়, সন্দেহে ও সন্ধানে এক প্রচন্ড কৌতূহল যেন পরোয়ানা হয়ে ছুটছে চারদিকে। এই প্রশ্নের উত্তর চাই।

প্রথম কৌতূহলের বিকার একটু শান্ত হয়ে এল—পূর্ণিমা বসুর পরিচয় পাওয়া গেছে। আজ দু'বছর হলো পুরানো গির্জার দক্ষিণে য নতুন বাড়িটা তৈরী হয়েছে, সেই বাড়ির মালিকের নাম মহীতোষ-বাবু। মহীতোষবাবুর মেয়ে পূর্ণিমা। ক'জনই বা এদের চেনে! তা-মোড়া উঁচু প্রাচীর দিয়েই ঘেরা থাকে এ'দের বড়মানুষী বনিয়াদ। া অগোচর। পূর্ণিমা বসুকে একরকম অলীক বললেই হয়। কিন্তু সেও আজ সব জানা অজানার ব্যবধান ঘুচিয়ে নতুন আবিষ্কারের মত সবার কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

কেউ একজন এসেছে এ'শহরে। যেই হোক্, পূর্ণিমা বসুর ওপর তার এত আক্রোশ কেন? হয়তো কোন বিগত অপমানের প্রতিশোধ। তবুও এটা বড় কাপুরুষের মত কাজ হয়েছে। অত্যন্ত গর্হিত।

অনেকে এই ভেবে লজ্জিত হচ্ছে, পূর্ণিমার বাড়ির লোকেরা কি মনে করলো। কেন তাদের ওপর এই অহেতুক কুৎসার আঘাত। সত্য হোক্ মিথ্যা হোক, এই আঘাত কারও গায়ে না বেজে পারে না।

মহীতোষবাবুর বাড়ির সকলে বিকেলের দিকে একবার বেড়াতে বার হতো। সমস্ত দিনের মধ্যে প্রাচীরের বাইরের পৃথিবীতে একটিবার ঘোরাফেরার এই শ্রদ্ধাটুকুও তাদের হারাতে হলো। তাদের কাউকে আজ কোথাও দেখা গেল না।

কিন্তু পূর্ণিমা কি ভাবলো? এতক্ষণে সেও নিশ্চয় সব খবর শুনেছে। হয়তো ঘরে খিল দিয়ে কাঁদছে, হয়তো আজ সারাদিন খায় নি। ভাবতে গেলে কত কি মনে হয়, কিন্তু ঠিক বোঝা যায় না এই উপদ্রবে পূর্ণিমার মনের শান্তি কতটা নষ্ট হলো। এও হতে পারে সে কিছুই গ্রাহ্য করছে না, তার রীতিমত মনের জোর আছে।

ক্ষুব্ধ হয়েছেন চৌধুরী মশায়। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন পাপের এই দুঃসাহসিক রূপ দেখে। রাগে ও ঘৃণায় চৌধুরী মশায় স্থৈর্য হারালেন। স্বয়ং থানায় এসে ডায়েরী করিয়ে গেলেন, কে বা কারা শহরের বুকের ওপর বসে এই অপকীর্তি করলো? অবিলম্বে তাকে যেন ধরে ফেলা হয়। এমন কঠোর শাস্তি তাকে দেওয়া হোক, যাতে এক যুগ ধরে যত দুষ্ট ও দুর্বৃত্তের বুক কাঁপতে থাকে। নইলে বুঝতে হবে দেশে সুশাসনের শেষ হয়েছে, গভর্ন-মেন্ট নেই।

পুলিশের ইনস্পেক্টর প্রতিশ্রুতি দিলেন—তিনি এই ঘাড়িয়াল বদমাসকে সাত দিনের মধ্যে ধরে ফেলবেন, সে যতই গভীর জলে থাক না কেন।

* * * *

মালা বিশ্বাস অবশ্যই দেখেছে পাথরের লেখাগুলি। বোধ হয় একমাত্র সেই লেখাগুলি ভাল করে পড়েছে, পরম নির্ভয়ে নিঃসংকোচে। মালা চিনেছে পূর্ণিমাকে; লোকমুখে শুনে নয়; সে আগেই তাকে জানতো। গির্জার সড়কে বেড়াতে গিয়ে কতদিন সকালবেলা মালা তাকে দেখেছে। দোতালা ঘরের জানলার কাছে বই হাতে বসে আছে পূর্ণিমা। চোখোচোখি হতেই পূর্ণিমা সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে দিত। বোঝা যেত এই জানালা বন্ধ করা একটা সশব্দ প্রতিবাদ মাত্র। কিন্তু কিসের বিরুদ্ধে বা কার বিরুদ্ধে তা ঠিক আন্দাজ করা যায় না। হতে পারে—সেটা মালার গায়ে জড়ানো ঐ সবুজ রঙের রেশমী নেট; বড় বেশী ঝক্‌ঝক্ করে।

প্রতিদিনের মত আজও জানালায় দাঁড়িয়েছে মালা। আজ তার মনের সব শাসন উপেক্ষা করে দুর্বার এক হাসির ঝলক বার বার উথলে পড়ছে। সারাক্ষণ হেসেছে মালা। একা একা এভাবে হাসা তার নিজের কাছেই কেমন অদ্ভুত লেগেছে। কিন্তু কি করবে, না হেসে তার উপায় নেই। জোর করে থামতে গেলে আরও উদ্দাম হয়ে ওঠে।

সমস্ত শহরের শাসন ও সতর্কতাকে বিদ্রূপ করে ক্রসরোডের পাথরটা পনের দিনের মধ্যে আর একবার খেউড় গেয়ে উঠলো।—"সুমিতা নন্দী, প্রতিজ্ঞা করেছে মনের মত মানুষ না পেলে গলায় মালা দেবে না। তবে তোমার এলবাম ভরা ওসব কাদের ছবি? কিছু বেছে উঠতে পারলে? এ অভ্যেস ভাল নয়, এটা দ্বাপর যুগ নয়। বয়সতো সাত বছর ধরে সেই তেইশে ঠেকে রয়েছে।

তবে তোমার স্বাস্থ্যের পায়ে গড় করি। আজও একটু কোঁচ পড়েনি। নাঃ, তুমি সত্যিই সুতনুকা, তুমি অমর্ত্যবধূ। ও ছাই মানুষের ছবির এলবামে কি হবে? তোমার বিয়ে না করাই ভাল।"

ব্যাপারটা আগাগোড়া বিস্ময়কর বলেই মনে হচ্ছে। যেই লিখুক না কেন, সে দুঃসাহসী সন্দেহ নেই। সুচতুরতো নিশ্চয়ই। প্রতি দুশ্চিন্ত মনের মেঘে মেঘে, সন্দেহের পরতে পরতে এক একবার তার রূপ আবছায়ার মত গোচরে আসে যেন। কল্পনার নেপথ্যে এই অদ্ভুতকর্মা কাজ করে চলেছে। নেহাৎ বাজে ফক্কড় গোছের কেউ নয়। লেখাপড়া খুব ভালই জানে। বয়স বিশ পঁচিশের বেশী বোধ হয় হবে না। বোধ হয় কোন হতাশ-প্রেমিক।

সেবক সমিতির অফিসে সন্ধায় মোমবাতি জ্বালিয়ে সেক্রেটারী ননীবাবু চিন্তিতভাবে বসেছিলেন। আজ জেনারেল মিটিং আহবান করা হয়েছে। সভ্যেরা সব এল একে একে। এরা সবাই ছাত্র—সতু, প্রিয়তোষ, লোকনাথ......।

ননীবাবু জানালেন—এটা আমাদের সবারই অপমান। কোন্ এক বদমাস দিনের পর দিন এইসব কুকর্ম করে চলেছে, অথচ আজও ধরা পড়লো না। সে যে শীগগির বন্ধ করবে, তারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কখন কার নামে লেখা উঠবে এই ভয়েই সবাই শঙ্কিত। বাস্তবিক......।

ননীবাবু দুঃখের হাসি হাসলেন।

—যেই হোক্, এটা বুঝতে পারছি, বাইয়ের লোক কেউ নয়। নিশ্চয় আমরা সবাই তাকে চিনি, তবে ভোল দেখে হয়তো বুঝতে পারছি না।

ননীবাবুর কথায় সংশয়ের কুয়াসা ঠেলে তার মূর্তিটা যেন ছায়ার মত দেখা যায়। অনুমানে মনে হয় এই সেই। কিন্তু আরও খানিকটা তথ্য পাওয়া চাই।

—এ ধরণের লোককে সহজে চেনা মুস্কিল। যাকে কোন-মতেই সন্দেহ হচ্ছে না, একাজ হয়তো তারই।

সভ্যদের অনুমানের মেঘ আবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। স্বয়ং ননী-বাবু আশ্বাস দিয়ে বলেন,—একে না ধরতে পারলে কোন সুরাহা হবে না। একে হাতে হাতে ধরে ফেল।

চৌধুরী মশাই রণে হার মানেন নি। অনেকদিন পরে সংগ্রাম করার মত এক পাপের চ্যালেঞ্জকে পাওয়া গেছে। আবার একদিন থানায় এসে পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে একপ্রকার বচসা করে গেলেন। চৌধুরী মশাই বিশ্বাস করেন না যে, পুলিশ আন্তরিক-ভাবে তার কর্তব্য করছে, নইলে অপরাধী নিশ্চয় এতদিনে ধরা পড়তো। তিনি প্রস্তাব করলেন,—পাথরটার কাছে দিবারাত্র পাহারা দেবার জন্য এক বন্দুকধারী শান্ত্রী মোতায়েন করা হোক্।

ইনস্পেক্টর হেসে বললেন।—কী যে বলেন চৌধুরী মশায়, পুলিশের আর কাজ নেই। একটা মামুলী ব্যাপারে কামান বন্দুক নিয়ে টানাটানি করতে হবে।

চৌধুরী মশাই উত্তেজিত হলেন—মামুলী ব্যাপার! কথা প্রত্যাহার করুন।

ইনস্পেক্টর।—আপনি বৃথা রাগ করছেন। চুরি রাহাজানি খুন ডাকাতির খবর দিন, এক সপ্তাহে আসামীকে বেঁধে আনছি। কিন্তু এসব ভূতুড়ে গোছের ব্যাপার, এটা কি একটা তদন্ত করার মত কেস চৌধুরী মশাই।

চৌধুরী মশাই।—তাহলে প্রাইভেট ডিটেক্টিভ নিয়োগ করুন।

ইনস্পেক্টর।—মাপ করবেন, আপনি আমার শ্রদ্ধেয়। আপনার প্রস্তাব গ্রাহ্য করতে আমরা অসমর্থ, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

চৌধুরী মশাই।—তাহলে আমাকেও বাধ্য হয়েই গভর্নরকে টেলিগ্রাম করে কমপ্লেন জানাতে হয়।

চৌধুরী মশাই উঠে চলে গেলেন।

ইনস্পেক্টর ভয় পেল কি না বোঝা গেল না। চৌধুরী মশাইয়ের মত প্রবীণ শ্রদ্ধাভাজন লোককে রাগানো উচিত নয়। যেকারণেই হোক্ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একজন কনেস্টবল লাঠি হাতে পাথরটাকে পাহারা দিল। সকালবেলা ছিল সামান্য একটু পুরানো লেখার অবশেষ। সুমিতা নন্দীর কলঙ্কগুলি প্রায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কিন্তু এই সজাগ সতর্ক প্রহরার এক ফাঁকেই বিকেলের মধ্যে ঝলসে উঠলো একটা নতুন লেখা। সারা গোধূলিবেলা পাথরটা যেন ঠাট্টার সুরে হাসতে লাগলো।—'সুধা দত্ত, অনেক মেয়ের গলার সুর শুনেছি, তবে তোমার মত এত মিষ্টি কারও নয়। সত্যিই গলাটি তোমার সুধায় ভরা, ছোট্ট গলগণ্ডটাই তার প্রমাণ। হাই কলার ব্লাউজে ঢাকা পড়ছে না। কেন যে এত ইংরেজি বুলি বলছো বুঝি না। প্রফেসর ভদ্রলোকের স্ত্রী আছে যে, ও পথ ছেড়ে দাও।'

কনস্টেবলের চাকরী যাবার উপক্রম হলো। সে কসম খেয়ে জানালো, এক মুহূর্তের জন্য সে ডিউটিতে ফাঁকি দেয় নি। একটা পিঁপড়ের দিকেও ভুল করে তাকায়নি।

আশ্চর্য এই কালোপাথরের অশরীরী শিল্পী।

সন্দেহের ঝড় উঠছে। অলক্ষ্যে যদি গরুর হাড় বা মড়ার মাথা কেউ ফেলে দিয়ে যেত, তবে না হয় বলা যেত ভূতের কাণ্ড। কিন্তু এটা নিছক প্রাকৃতিক আর চারিত্রিক ব্যাপার। একজন কেউ আছে পেছনে। সাবাস্ তার বাহাদুরী। তিন মাস ধরে শহর সুদ্ধ লোককে আঙুলের ডগায় নাচাচ্ছে। এক এক সময় বেশ ভেবে চিন্তে সন্দেহ করতে হয়। যাক তাকে এই যোগ্যতা দেওয়া যায় না। যেই হোক্ সে কবি ও প্রেমিক, সে দুঃসাহসী ও চতুর। এতগুলি তরুণী হিয়ার গোপন কথা যে জানতে পেরেছে, সে গুণী ও যাদুকর। সব সময় তাকে অশ্লীল বলতে বাধে, সে বড় রসিয়ে লেখে।

কিন্তু একবার যদি এই অধরা যাদুকর ধরা পড়ে! চৌধুরী মশায়, পুলিশ, সেবক সমিতি আর নিন্দিতাদের বাপভাইয়েরা ওর হাড়মাস কুচি কুচি করে ছড়িয়ে দেবে রাণীঝিলের মাঠে। সন্দেহ হয় অনেককে। কার্নিভালের বাঙালী ম্যানেজারটা ঠিক তিন মাস ধরে শহরে বসে আছে। কেন? ঘড়ির দোকানে নতুন ম্যাট্রিক পাশ ছেলেগুলি বড় বেশী গুলতানি করে আজকাল। কেন? নন্দ মিস্ত্রির উপন্যাস পড়ছে। হাতুড়ি ছেড়ে হঠাৎ এ সখের ব্যামো আবার কেন? প্রশান্ত পানের দোকান করে, এমন কী লাভ হয়? তবু সপ্তাহে তিনখানা রেকর্ড কেনে। হঠাৎ এত সুরেলা হয়ে উঠলো কেন সে? তবু ভরসা, প্রশান্ত নাকি লেখাপড়া জানে না। কিন্তু এ ভব মাঝারে কিছুই অসম্ভব নয়। সেবক সমিতি সন্দেহ করে পুলিশকে, পুলিশ সন্দেহ করে খদ্দরধারী মতিলালকে। মতিলাল চেষ্টা করছে, কাকে সন্দেহ করা যায়। এই সন্দেহের মাৎসন্যায় কারও অস্তিত্ব বুঝি আর থাকে না।

ক্রসরোডের পাথর কি বোবা হয়ে গেল? এক মাস পার হয়ে গেছে, কোন নতুন রহস্যের দাগ পড়ছে না আর। কিন্তু তাহলে চলে কি করে! শহরের প্রাণের তার যে বাঁধা পড়েছে কালো পাথরের সুরে। দিবস রজনী ঐ কালো পাথরে ফুটে উঠবে নব নব শ্বেত-লিপিকার ফুল। জ্যোৎস্না রোদ কুয়াসা শিশির—তাদের ছোঁয়ার প্রতি প্রভাতে বিচিত্র প্রেমবৈচিত্র্যের অর্ঘ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে ক্রস-রোডের পাষাণবেদিকা। কমাসের মধ্যে কত অজানা কথা বলে দিল পাথরটা। এই লেখাগুলির মধ্যেই শহরের ঘুমন্ত মহিমা সাড়া দিয়ে উঠেছে।

সিনেমায় দর্শকের ভীড় কমে গেছে। সকাল বিকেল রাণী ঝিলের মাঠে লোকের সমারোহ। গত বছরেও শরৎ এসেছিল এমনি

আকাশভরা নীল নিয়ে। কিন্তু রাণী-ঝিলের মাঠে আর ক্রসরোডের ধূলো এত চঞ্চল হয়ে ওঠেনি জনপদধ্বনির উচ্ছ্বাসে। ঘরে ঘরে চিত্তে চিত্তে দোলা লাগে। ক্রসরোডের পাথর তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। এবার কার পালা কে জানে। মনে হয়, এই ক্ষমাহীন পাথরের অমোঘ অনুশাসন একে একে সকল গোপনচারিণীর কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দেবে।

শত শত মূক মুখের প্রার্থনা পাথরের কানে পৌঁছল যেন। বহু জিজ্ঞাসার আবেদনে ক্রসরোডের পাথরে অনুগ্রহের স্বাক্ষর আবার জ্বল জ্বল করে ফুটে উঠলো।

—"প্রীতি মুখার্জি, তুমি অপরূপ না হলেও অদ্ভুত। পরের কোলের ছেলে নিয়ে এত টানাটানি কেন? সবই বুঝি সখি। যাক্, যা হবার হয়ে গেছে, এবার সামলে থেক। গিরিডিকে ভুলে যাও!"

যেই যাক্ ক্রসরোড দিয়ে, সকলকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে হবেই লেখাগুলিকে, যতদিন না কেউ সাহস করে মিটিয়ে দেয়। ক্ষুন্ন ক্ষুব্ধ বিরুদ্ধ, মুখে যে যাই বলুক, এই কুৎসাদৃপ্ত পাথরের কাছে যেন ঝুঁকে পড়ে সকলেই, অভিবাদনের আবেশে।

শরৎবাবু যান, কান্তিবাবু আসেন। ক্রসরোডে মুখোমুখি দুজনের সাক্ষাৎ হয়। উভয়েই এই কুপথে চলার গ্লানিটুকু বার্তালাপের মধ্যে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করেন।

কান্তিবাবু—এ যে অসহ হয়ে উঠলো মশাই। কুৎসিত লেখাগুলি কি বন্ধ হবে না।

শরৎবাবু—আর বলেন কেন, বড় ঘৃণ্য ব্যাপার।

সজ্জনদ্বয়ের আলাপ হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলতো, আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতো; কিন্তু তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন চৌধুরী মশাই—সাদা ভুরু ও দাড়ির মাঝখানে শাণিত নাক আর কঠোর দৃষ্টি। ওভাবে চলে যাওয়া বড় অস্বাভাবিক মনে হয়। শরৎবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

কান্তিবাবু—চৌধুরী মশাই ওভাবে তাকালেন কেন বলুন তো?

শরৎবাবু সশব্দে হেসে বললেন—কে জানে, উনি হয়তো মনে করছেন আমরা দুজনেই লেখাগুলি লিখেছি।

কান্তিবাবু—বলা যায় না, এ সন্দেহ তাঁর হতে পারে, যে রকম নীতিবাতিক লোক।

এতক্ষণে তারা কি ভাবছে? কালো পাথরের লেখাগুলি যাদের সুনামকে কালো করেছে, সেই অপমান শয্যা থেকে তারা কি এতদিনে সুস্থ হয়ে উঠতে পেরেছে? কিন্তু যতই কৌতূহল হোক্ না কেন, এ সংবাদ জানবার উপায় নেই। প্রথমে ভয় হয়েছিল নিন্দিতাদের মধ্যে দু'একজন অতি-অভিমানিনী আত্মহত্যা করে না বসে। খুব বেশী ভয় হয়েছিল সুধা দত্তর কথা ভেবে।

সত্য মিথ্যা যাচাই হয় না, তবু রীতিমত মনোবেদনা পায় অনেকে। মানুষ আজ খারাপ থাকে, কাল ভাল হয়ে যায়। কিন্তু লোক সমাজে কারও দোষ-ত্রুটিকে ঢোল পিটিয়ে রটিয়ে দিলে কোন লাভ হয় না, বরং তাতে অনেকে উল্টো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। যদি সত্যও হয়, তবুও এতগুলি ভদ্রবাড়ির মেয়ের চরিত্র নিয়ে মাঝ-ময়দানে লেখালিখি করা খুবই অন্যায়।

শুধু সন্দেহ নয়, বিচিত্র রকমের গুজব উড়ছে চারদিকে। পূর্ণিমারা চিরকালের মত চলে যাচ্ছে এ শহর ছেড়ে। সুমিতা নন্দী বিষ খাবার চেষ্টা করেছিল। প্রীতি মুখার্জীর দাদা গুণ্ডা লাগিয়েছে—যে এসব লেখা লিখছে, তাকে খুন করা হবে। সুমিতার নাকি জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই মাসেই। গুজব উড়ছে—বিশ্বাস না করলেও অবিশ্বাস করার উপায় নেই। এতগুলি বাড়ির ভিতরের খবর কে আর স্বচক্ষে দেখে এসে বলতে পারে। সে কাজ একমাত্র পারে এবং যদি দয়া করে—সে হলো কালো পাথরের কবি।

* * * *

মালা বিশ্বাস তাদের দেখলো একদিন, টাউন সিনেমার ওপরের গ্যালারিতে। প্রথম সারে বসে আছে—পূর্ণিমা, সুমিতা, সুধা ও প্রীতি। গুনে গুনে তারা ঠিক চারজন। পাশে ও পেছনের সারিতে আরও অনেক মেয়ে বসে আছে। মালা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আছে একেবারে শেষ প্রান্তে—ঝক্‌ঝকে একটা আলোর ঝাড়ের নীচে।

মালা ভাল করে আর একবার দেখলো। ঠিক ওরাই চারজন। কবে ওরা এত ঘনিষ্ঠ হলো? আগে তো ওরা কেউ কাউকে ভাল করে চিনতোও না। আশ্চর্য, আজ ওরা এক হয়ে গেছে।

পেছনের সারিতে সেনপাড়ার মেয়েদের মধ্যে বসে আছে মুক্তি রায়, মালারই স্কুলজীবনের বন্ধু। ওরা সকলেই ব্যস্ত, সবাই উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখছে সামনের সারির চারজনকে। মুক্তি রায় এক এক করে চিনিয়ে দিচ্ছিল সকলকে—কে পূর্ণিমা, কে সুমিতা, কে সুধা...।

পূর্ণিমারাও চুপ করে বসেছিল না। ওদের আলাপ গল্পের উচ্ছল কলরব সমস্ত গ্যালারিকে চুপ করিয়ে রেখেছিল। সকলেই নীরব, শুধু পূর্ণিমারা ছাড়া। ওদের হাসি থামতে চায় না। একজনে বাদাম কেনে, চারজনে ভাগ করে খায়। ওরা তাকায় না কারও দিকে। সমস্ত গ্যালারির জনতা যেন প্রকাণ্ড একটা ছায়া মাত্র, শুধু ওরাই সজীব।

মালা একা পড়ে গেছে, তাকে কেউ দেখছে না। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম সে আড়ালে পড়ে গেল। এত প্রখর বিদ্যুতের বাতিটার নীচে বসে আছে মালা, অস্ট্রিচের পালকের বর্ডার দেওয়া মেরিনো পশমের জামা গায়। দু'ইঞ্চি লম্বা সোনার চেনে গাঁথা এক জোড়া পাথরের দুল দু'কান থেকে ঝুলে ঘাড়ের ওপর লুটিয়ে আছে। তবু কোন বিস্মিত বিরক্ত বা ধিক্কারভরা দৃষ্টি কোন দিক থেকে তার দিকে তেড়ে আসছে না। মালা আজ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

ছবির অভিনয় আরম্ভ হলো। ক্ষান্ত হ'ল গ্যালারির কলরব। আলোগুলি নিভলো। পূর্ণিমাদের সারি থেকে এক এক টুকরা হাসি-ভরা কলরব মাঝে মাঝে বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত উছলে পড়ছে। কোন্ সার্থকতায় ভরে উঠেছে ওদের জীবনে এই খুসিয়ালী রাত!

সিনেমার ছবি চোখের সামনে বৃথা ঝলসে পড়ছিল। মালা ডুবেছিল তার মনের অন্ধকারে। কালো পাথরের সেই ভয়ঙ্কর কুৎসাকলা, মনে পড়লেই আতঙ্ক হয়। মালা জানতো এই গরবিণীরাই তো মান হারিয়েছে। কিন্তু এ আবার কোন্ ছবি! এ যে নতুন করে মান পাওয়া। ওদের চোখে মুখে সেই তৃপ্তির উদ্ভাস।

পেছনের মেয়েদের দৃষ্টি আর এক তৃষ্ণার ছলনায় ছলছল। ওরা তাকিয়ে আছে পূর্ণিমাদের দিকে—এক দুরধিগম্য মহিমলোকের দিকে। ওখানে আসন পেতে হলে ছাড়পত্র চাই, সে বড় কঠিন ঠাঁই।

কালো পাথরের কবি মরে যায়নি।

সেদিন মেয়েদের বাৎসরিক আনন্দমেলার অনুষ্ঠান। রাণী-ঝিলের মাঠে বাঁশের জাফরি আর খেজুর-পাতার ঘেরান দিয়ে সারি সারি স্টল সাজানো হয়েছে। পথে যেতে সবাই দেখলো, বহুদিনের স্তব্ধ পাথরটা আবার মুখর হয়ে উঠেছে।—"মুক্তি রায়, অমন মেঘে ঢাকা চাঁদের মত ফুলবাগানে গাছের আড়ালে আর কতদিন থাকবে? আজকাল সব সময় হাতে ওটা কি থাকে? কাব্য-গ্রন্থ? তোমার আসল কাব্য ভাল আছেন মজঃফরপুরে। আমার আর কি লাভ। শুধু যখন হেঁটে চলে যাও, তখন পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি। বড় সুন্দর তোমার চলার ছন্দ। মুখের দিকে তাকাতে ভাল লাগে না। স্নো-পাউডার দিয়ে কি চোখের কালি ঢাকা পড়ে? অসুখটা সারাবার ব্যবস্থা কর।"

দলে দলে মেয়েরা এসেছে আনন্দমেলায়। মালা বিশ্বাস

এসেছে। আজ তার বেশভূষায় কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দীনতা। একটা সাধারণ মিলের সাড়ী, আঁচলটা আধ হাত ছে'ড়া। দেশী ছিটের একটা আধময়লা ব্লাউজ। পায়ে জুতো নেই, চশমা খুলে রাখা।

চন্দ্রার দিদিরা একটা স্টল নিয়েছে। হরেক রকম ফুলের তোড়া আর বুকে বিক্রী হচ্ছে সেখানে, এক আনায় একটি। স্কটিশ মিশনের মেয়েরা খুব ভীড় করেছে সেখানে, তোড়া কেনার জন্য। মালা সেখানে সামান্য একটু দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে চল্‌লো।

মালতীরা একটা স্টল নিয়েছে—ঘরে তৈরী নানারকম জ্যাম, জেলী আর চাটনী শিশি শিশি ভরে সাজিয়ে রেখেছে। সেখানে কোন ভীড় নেই, তবু মালতীর অনুরোধে দাঁড়ালো একবার। এক শিশির দাম ছ'আনা পয়সা রেখে দিয়ে মালা বলে গেল, ফেরবার সময় নিয়ে যাবে।

মালার চোখে পড়েছে—একটু দূরেই রাণুদের ম্যাজিকের স্টল। ভীড় সেখানেই সবচেয়ে বেশী। নবীনা, প্রবীণা সকলেই সেখানে দলে দলে ঘাসের ওপর বসে পড়েছে। কী এমন আকর্ষণ আছে রাণুদের স্টলে? আর একটু এগিয়ে যেতেই নজরে এল, হাঁ কারণ আছে। সেখানে বসে আছে পূর্ণিমাদের দল। আজ তাদের মধ্যে একটা নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে, মুক্তি রায়। পূর্ণিমারা সবাই খুসী হয়ে ম্যাজিক দেখছিল, আর সবাই দেখছিল পূর্ণিমাদের।

মালার চলার বেগ শান্ত হয়ে এল। ওদিকে এগিয়ে যেতে ওর বুক দুরু দুরু করছে আজ। কিন্তু যেতেই হবে তাকে। তার ছে'ড়া কাপড়, খালি পা, নোংরা ব্লাউজ। নিশ্চয় তাকিয়ে দেখবে সবাই। পূর্ণিমারাও দেখবে।

হঠাৎ পাশে অনেকগুলি বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে চীৎকার করে ডাকলো—মালাদি! মালাদি!

মালা মুখ ঘুরিয়ে দেখলো অনুপমারা ডাকছে তাদের চায়ের স্টলে। সবাই মিলে চীৎকার করে মালাকে চা খেতে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

কী ভেবে নিয়ে মালা স্টলের ভেতরে গিয়ে বসলো। পর পর তিন কাপ চা খেল। অনুপমারা খুব খুসী। বয়স্কাদের মধ্যে কেউ তাদের এক কাপ চা খেয়েও অনুগৃহীত করেনি। কত চেনা অচেনা মহিলাদের হাত ধরে ওরা টানাটানি করেছে, কিন্তু কারও হৃদয় গলেনি।

অনুপমা মানুষ জাতির ওপর তাই চটে গেছে। ম্যাজিকের স্টলের দিকে তাকিয়ে চড়া মেজাজে জানালো।—বুঝলে মালাদি, আমাদের দোকানের সব বিক্রী মাটি করে দিয়েছে রাণুদি। কাঁচা আম জলে ডুবিয়ে দেখাচ্ছে আম নেই। ছাই ম্যাজিক, ওটা তো চিনির তৈরী আম।

মালা—রাণুদি তোমাদের দোকানের বিক্রী মাটি করে নি।

অনুপমা—তবে কে?

মালা—করেছে......

উত্তর দিতে গিয়ে মালা হঠাৎ সামলে গেল। অনুপমার মত এতটুকু মেয়েকে অবাক্ করে দিয়ে আর লাভ কি!

চায়ের স্টলের সামনে দিয়ে কতজন আসছে যাচ্ছে। মালা আজ জোর করে সকলের চোখের ওপর ভেসে রয়েছে। তবু যেন তাকে কেউ লক্ষ্য করছে না একটু দূরেই বসে রয়েছে পূর্ণিমারা। খুবই ইচ্ছে করছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে। আজও ভীড়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো সবাই তাকিয়ে দেখবে তার এই ছে'ড়া-ময়লা সাজ—তার নিরাভরণ জীবনের চরম বিনতি। কিন্তু যদি কেউ না তাকায়, এই আবেদনও যদি ব্যর্থ হয়। মালার সাহস হলো না।

মালা যেন আভাষে দেখতে পাচ্ছে—এই মেলার ভীড় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তিন ভাগে। এখানে একদল আছে, যারা পূর্ণিমাদের মন অনন্যসাধারণ। একদল রয়েছে রাণু, অনুপমা ও এই পাঁচশত নবীনা প্রবীণার মত সাধারণ। আর আছে মাত্র একজন—মালা বিশ্বাস—সাধারণের নীচে। তার এতদিনের আত্মবিজ্ঞাপনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

মালা ঘরে ফিরে গেল।

সেবক সমিতির বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে আবার। সেক্রেটারী ননীবাবু বললেন—একটা দুঃখের কথা বলবো আজ।

ননীবাবুর গলার স্বরে বোঝা গেল, অদ্ভুত কিছু একটা ঘটেছে। সভ্যেরা কৌতূহলী হয়ে ননীবাবুর মুখের দিকে তাকালো। ননীবাবু টেবিলের আলোটার গায়ে একটা বই মেলে দিয়ে তাঁর চিন্তিত মুখের ওপর যেন আরো খানিকটা অন্ধকার মেখে নিলেন।

—তোমাদের গ্যারেণ্টি দিতে হবে, একথা আমাদের ক'জন ছাড়া বাইরের কোন জীবের কানে পে'ছিবে না। সে ধরা পড়ে গেছে—কালো পাথরের লেখাগুলি যার কুকীর্তি।

কায়মনেপ্রাণে এই বার্তা শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে তারা। একি দুঃখের কথা? ননীবাবু ভুল বুঝেছেন, বড় বেশী ভূমিকা ফলাচ্ছেন। উৎকর্ণ রুদ্ধশ্বাস সভ্যেরা তবু অপলক চোখে তাকিয়ে রইল ননীবাবুর দিকে, চরম বাণীর অপেক্ষায়।

নবীনবাবু—এ কাজ করেছে চৌধুরী মশাই।

কথাগুলি যেন মাথায় হাতুড়ি মেরে ভয়ানক একটা ঠাট্টা করে বসলো। প্রিয়তোষের রাগ হলো—আপনি কি তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন?

ননীবাবু—ইয়েস্। যারা দেখেছে স্বচক্ষে, তারাই বলেছে।

প্রিয়তোষ—কি রকম?

ননীবাবু—মাঝরাত্রে চৌধুরী মশায় ক্রসরোডের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁরাও পেছন পেছন গিয়েছিলেন। হাতে হাতে ঠিক ধরতে পারা যায়নি। পাথরটার কাছাকাছি যেতেই চৌধুরী মশাই ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে অন্ধকারে সরে পড়লেন।

সতু—সত্যিই বিশ্বাস করতে পারছি না। এ অভিযোগের কোনে মানে হয় না। লোকে এইভাবেই জোর করে স্বচক্ষে ভূত দেখে।

ননীবাবু—আমারও বিশ্বাস হতো না। কিন্তু যাদের মুখে শুনেছি, তাঁরা বাজে লোক নন। তৈরী করে একটা মিথ্যা সাজাবার মত চরিত্র তাঁদের নয়। যাক্, তাঁদের নাম আর নাই করলাম।

লোকনাথ—তাঁদের দেখার মধ্যেও তো ভুল হতে পারে।

ননীবাবু—অন্তত সেটুকু লজিক তাঁদের আছে। যে ক'জন স্বচক্ষে এই কাণ্ড দেখেছে, তারা সবাই চৌধুরী মশাইকে সব চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করে। অন্য কেউ দেখলে হয়তো তখনি চৌধুরী মশায়ের কব্জি চেপে ধরতো। কিন্তু তাঁদের পক্ষে ততটা নির্মম হওয়া সম্ভব নয়।

প্রিয়তোষ—ততটা নির্মম হ'লেই ভাল ছিল। হাতে হাতে সত্য মিথ্যা যাচাই হয়ে যেত। মোটের ওপর আপনি যা বলছেন, সেটা শোনা-কথা।

ননীবাবু—হাঁ শোনা-কথা, কিন্তু অবিশ্বাস করার মত কথা নয়। চৌধুরী মশায়ের চোখের চাউনি দেখেই বোঝা যায়, তাঁর মতিগতি বেসামাল হতে চলেছে। এটা এক ধরণের হিস্টিরিয়া। যাক্, তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। ভালয় ভালয় আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেলে সর্বদিক রক্ষা হয়।

লোকনাথ—একদিন ধরেই ফেলা যাক্ না। দেখি কি উত্তর দেন। আমরা তো তার জন্যে তাঁকে আর আদালতে টেনে নিয়ে যাব না।

ননীবাবু—না, অতদূর যেও না। প্লীজ, তাতে ফল খারাপ হবে।

সেবক সমিতির দায়িত্ব সমাপ্ত হলো এইখানে। কিন্তু এই উদ্ভট অকল্পেয় সত্যটি প্রতিজ্ঞা দিয়ে বেঁধে গোপন রাখা সম্ভব হলো না। দু'দিনের মধ্যেই সকলে জানলো, বার লাইব্রেরী থেকে আরম্ভ করে গুরুদাসের ঘড়ির দোকান পর্যন্ত। যে শোনে, সেই লজ্জা পায়, আপত্তি তোলে—এও কি সম্ভব?

তবু এই বিশ্বাসের সম্পদ হারাতে কেউ রাজী নয়। হোক্ না শোনা-কথা, শোনা যাচ্ছে—কেউ একজন স্বচক্ষে দেখেছে। তাহলেই হলো।

বিশ্বাসবাড়ির জানালায় সেই অচঞ্চল মূর্তি আর দেখা যায় না। ক্রসরোডের কালো পাথরে আর লেখা পড়ছে না। শহরের উৎসাহে মন্দা পড়েছে। জমাট গানের মাঝখানে হঠাৎ যেন সুর ছিঁড়ে গেল।

আজকাল ঘরের ভেতরেই থাকতে ভালবাসে মালা। বাইরের পৃথিবী, সেখানে মানায় পূর্ণিমাদের। ওরা অঘ্রাণের তারা, সন্ধ্যা সকালে ওদেরই শুধু দেখতে হয়।

সার্থক জীবন পূর্ণিমাদের। ওরাই প্রার্থিতা। আড়াল থেকে মুক্ত করে এনে সংসার ওদেরই মুখ দেখতে চায়। ওরা দয়িতা—জীবনের কামনার লীলাকুরঙ্গী। কুৎসা কলঙ্কেও ধন্য হতে চায় ওদেরই আশ্রয়ের প্রসন্নতায়। আর, সকল কামনার সীমানার ওপারে, এক বেদনাহীন বিরাগের মরুস্থলীতে দাঁড়িয়ে আছে মালা। সে একা, সে নিঃস্ব।

মালা নিজেকে বন্দী করে ফেলেছে। সব দেখা আর দেখা দেওয়ার পালা শেষ হয়ে গেছে। ওর মধ্যে কোন সত্য নেই। পৃথিবী চোখে চোখ নিজেকে যে অকুণ্ঠভাবে সঁপে দিয়ে এসেছে, সেই মুছে গেল আজ। এই উপলব্ধিই আজ তার সর্বস্ব।

জানালার খড়খড়ি দিয়ে পড়ন্ত রোদের এক ফালি ঘরে এসে পড়ছিল। আনমনে জানালাটা খুলে দিয়েই মালা বন্ধ করে দিল আবার।

আয়নার সামনে বসেছিল মালা। নিজের চেহারা চোখে পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিল। আর বুঝতে বাকী নেই, এ চেহারা যদি গ্রহের মত আকাশে ভেসে বেড়ায়, তবুও চোখ তুলে কেউ তাকাবে না।

এক এক সময় মালা চেষ্টা করেও তার অস্থিরতাকে চেপে রাখতে পারে না। মনে হয় বাইরের বাতাসে নিশ্বাস না নিলে যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে তার। তবু জোর করে কপাটে খিল এঁটে দেয়—কোন পলাতকার পায়ে যেন বেড়ি পরিয়ে তাকে সবলে ধরে রাখে।

সন্ধ্যে হয়ে আসে, অনেকদিন পরে চাঁদ উঠছিল আবার। মালা জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা ঝড়ো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। দৃশ্যটা ভালোই লাগলো মালার। মালা ডাক্‌লো—রামজীবন, আমি বেড়াতে যাব এখনি।

সাজ-সজ্জার পর মালা কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে রইল আয়নার সামনে। চোখের জলে দু'দুবার মুখের পাউডার ভিজে গেল। রামজীবন বার বার হাঁক দিচ্ছে। নিজেকে একরকম জোর করে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল মালা।

রাণীঝিলের চারদিকে দু'বার ঘোরা হলো, মাঠটা আড়াআড়ি দু'বার হাঁটাফেরা হলো। দিক ছাপিয়ে অন্ধকার আসছে। পূবে পশ্চিমে দেওদারের মাথা শিউরে উঠছে। বনজোয়ানের গন্ধমাখা ধুলো ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে। ঝড় আসছে। রামজীবনের হাঁক-ডাকে অগত্যা মালা ফিরলো ঘরের দিকে।

রামজীবন এগিয়ে গেছে কিছু দূরে। মালা যাচ্ছিল ধীরে সুস্থে। ক্রসরোডের মোড়ে পেঁছতেই সেই পাথর, অন্ধকারে যেন কারও প্রতীক্ষায় বসে আছে।

মালা থমকে দাঁড়ালো। এই সেই পাথর, এই কলঙ্ক-কীর্তনিয়ার প্রসাদে কত নগণ্যা গরীয়সী হয়ে উঠেছে। অপবাদ হয়েছে প্রশস্তি। কিন্তু এ পাথরের মনে সুবিচার নেই। তার সব চক্রান্তকে আজ একটি আঘাতে চূর্ণ করে দেওয়া যায়। কালো পাথরের কবিকে কেউ ধরতে পারেনি, মালা তাকে আজ নিঃশেষ করে দিতে পারে। সব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারা যায় এইক্ষণে। মালা যেন একটা ঝাঁপ দিয়ে লুটিয়ে পড়লো পাথরটার ওপর। ব্লাউজের ভেতর থেকে টেনে বার করলো এক টুকরো খড়ি।

বিদ্যুৎ চমকাবার আগে, রামজীবনের হাঁক শোনার আগেই খড়ির আখরে এক স্তবক ঘনঘোর মিথ্যা সাদা ফুলদলের মত ছিটিয়ে পড়লো কালো পাথরের গায়ে।

—মালা বিশ্বাস, তোমায় দূর থেকে সেলাম করি। এক দুই তিন চার...থাক, বেচারাদের নাম আর করবো না। কত পতঙ্গের পাখা পুড়ে গেল। আর সংখ্যা বাড়িও না। তোমার চিঠির তাড়া রাণী ঝিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সুস্থির হও।

[সম্প্রতি হইতে উদ্ধৃত]
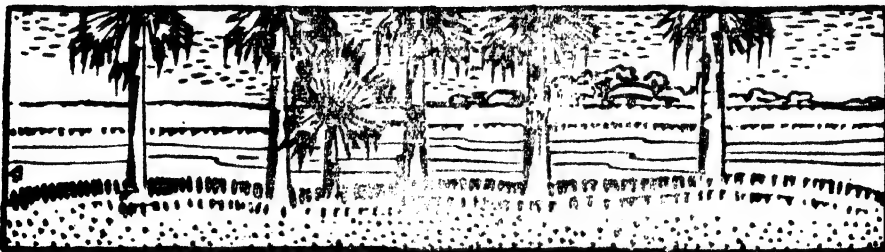
ইনফ্লেশন

শ্রীঅনিলকুমার বসু, এম-এ

বিগত মহাযুদ্ধের সময় আমরা "ইনফ্লেশন" শব্দটির সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হই। আবার বর্তমান মহাযুদ্ধেও এই শব্দটির উল্লেখ লোকের মুখে মুখে শুনিতে পাই। শব্দটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি অত্যন্ত ব্যাপক ও Time Bombএর মতই মারাত্মক। প্রথমদিকে স্রোতের টানে গা ভাসাইয়া দেওয়ার একটি সহজ মোহ আছে। কিন্তু শেষ দিকে যখন এই স্রোত একটি বিরাট আবর্তের সৃষ্টি করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে তখন মুহূর্তে মোহের ঘোর কাটিয়া যায় এবং উহার ধ্বংসমূর্তি চোখের সামনে প্রকট হয়। "ইনফ্লেশন" সম্বন্ধে উপরোক্ত তুলনাটি বোধ হয় বেশী বেমানান হইবে না। কারণ "ইনফ্লেশন"এর আরম্ভটা আপাত মধুর, যদিও পরিণাম জলাবর্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর। এখন অনুধাবন করিয়া দেখা যাক্ এই "মুখে মধু অন্তরে গরল" "ইনফ্লেশন" জিনিষটি কি।

"ইনফ্লেশন" টাকার বাজারেরই একটি রূপ। তবে ইহার রূপটি কিন্তু অত্যন্ত রাজসিক। টাকা বলিতে কেবল স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা তাম্রমুদ্রা বুঝায় না, এই সকল দ্বারা যে সকল দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করা যায়, ইংরেজীতে বলে 'Command over goods and services.' সহজ কথায় দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতা (Purchasing power)। এই ক্রয় করিবার ক্ষমতার মাপ-কাঠিতেই টাকার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা নিরূপিত হয়। তাহা হইলেই দেখা যায় দ্রব্য-সামগ্রীর জোগানের সাথে টাকার মূল্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। একটিকে ছাড়া অপরটিকে ভাবা যায় না। যখন জিনিষপত্রের জোগান কমিয়া যায়, কিন্তু টাকার চলতি ও পরিমাণ সমানই থাকে, তখন জিনিষপত্রের দামও বাড়িয়া যায়। ঐ অবস্থায় জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যাওয়ার অর্থ, পূর্ব পরিমিত টাকায় এখন অপেক্ষাকৃত কম জিনিষ ক্রয় করা যায়। অর্থাৎ টাকার ক্রয় ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে আমরা এই পাইলাম যে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যাইলেই টাকার কেনার ক্ষমতা আপনা আপনি কমিয়া যায়। অপরদিকে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গিয়া জিনিষপত্রের জোগান পূর্ববৎ থাকিলেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যায়। ফলে টাকা পিছু কম জিনিষ পাওয়া যায়। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে "ইনফ্লেশন"এর একটি লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কিন্তু এই দর বাড়া ও টাকার ক্রয় ক্ষমতা কমিয়া যাওয়াটাকে আমরা ইনফ্লেশনের সাথে সকল ক্ষেত্রে যুক্ত করিতে পারি না। অনেকের ধারণা থাকিতে পারে, যেই মুহূর্তে জিনিষের দর বাড়িতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই বুঝি ইনফ্লেশন শুরু হইল। কিন্তু একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বোঝা যাইবে এই ধারণা সকল সময় ঠিক নহে। দর বাড়িবার নানা রকম কারণ থাকিতে পারে যাহা ইনফ্লেশনের পর্যায় পড়ে না। টাকার পরিমাণ সমান থাকিয়া জিনিষপত্রের উৎপাদন যদি কোন কারণে কমিয়া যায়, সে ক্ষেত্রেও জিনিষপত্রের দর স্বভাবতই চড়িয়া যাইবে। কিন্তু ইহাকে ইনফ্লেশন বলিয়া ধরিয়া লইলে ভুল করা হইবে। কোন দেশে হঠাৎ মড়ক লাগিয়া কিংবা অন্য কোন রোগের (ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, বসন্ত) প্রাদুর্ভাবে যদি অনেক লোক ক্ষয় হয় এবং দৈবক্রমে ফ্যাক্টরী ইত্যাদির কারিকরগণই অধিক সংখ্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তবে কর্মীর অভাবে দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন বাধ্য হইয়াই কমিয়া যাইবে এবং জিনিষপত্রের দামও সেই সঙ্গে বাড়িবে। এমতাবস্থায় ইহাকে 'ইনফ্লেশন' বলা যাইতে পারে না। সেইরূপ জিনিষপত্রের জোগানের অনুপাতে লোকসংখ্যা অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইলে যে দুর্মূল্যতা অনুভূত হয় উহাকেও 'ইনফ্লেশন' বলা যায় না। এইরূপে আরও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এখন চিন্তার বিষয়, কোন্ অবস্থায় প্রকৃত ইনফ্লেশন আরম্ভ হইল। এক কথায় বলিতে গেলে যখন দেশে চলতি টাকার পরিমাণ ক্রমশ বাড়িতে থাকে অথচ জিনিষপত্রের জোগান সেই অনুপাতে বাড়ে না তখনই সব জিনিষের দর উর্ধগামী হয় এবং এরূপ মূল্য বৃদ্ধি ক্রমবর্ধনশীল আকার ধারণ করিলে পরিশেষে যে অবস্থার উদ্ভব হয় উহাকেই ইনফ্লেশন বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। এই ব্যাপারটির বিস্তৃত আলাপ করিলে বুঝিতে পারিব ইনফ্লেশনের স্বরূপ কি।

পূর্বেই বলিয়াছিলাম ইনফ্লেশন টাকার বাজারের একটি রাজসিক রূপ। আর্থিক প্রাচুর্যের মাঝেই ইহার উৎপত্তি। যুদ্ধ বিগ্রহাদির সাথে সাথে ইহার আবির্ভাব। এই (যুদ্ধবিগ্রহাদি-জনিত) বিপুল ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য গভর্নমেণ্টকে বাধ্য হইয়া মুদ্রা সম্প্রসারণ করিতে হয়। যুদ্ধবিগ্রহ স্বভাবতই কিরূপ ব্যয়সাধ্য তাহা বর্তমানে ইংলণ্ড ও ভারতে যে দৈনিক যথাক্রমে ৩০ কোটি ও ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইতেছে তাহা হইতেই সহজে অনুমেয়। আমেরিকার কথা ছাড়িয়াই দিলাম। এই মুদ্রা সম্প্রসারণের জন্য সরকারকে ছাপাখানার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, অর্থাৎ অধিক মাত্রায় নোট ছাড়িতে হয়। এই স্থলে নোট 'ইসু' করার নীতি একটু আলোচনা করা বোধ হয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ অধিক মাত্রায় নোট ইসু করার মাঝেই "ইনফ্লেশন"এর মূল অর্থ নিহিত। সাধারণত নোটের পিছনে "metallic reserve" অর্থাৎ স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য থাকে। ইচ্ছা করিলেই নোটের সাথে মুদ্রার বিনিময় করা যায়। প্রতি নোট পিছুই যে সমান সংখ্যক মুদ্রা সব সময় রাখিতে হয় তাহা নয়, কারণ সকলেই আর নোট ভাঙাইতে এক সঙ্গে সরকারের দ্বারস্থ হয় না। তাই মোট নোট ইসুর একটি ভাগ স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য মুদ্রায় সকল সময় মজুত রাখা হয় যাহাতে জনসাধারণের দাবী চাহিবামাত্র মিটাইয়া দেওয়া যায়। এইরূপে আমেরি-কাতেও মোট চলতি নোটের ৪০% স্বর্ণ, ফ্রান্সে ৩৫% স্বর্ণ, জার্মানীতে ৩০% স্বর্ণ ও ১০% ফরেন এক্সচেঞ্জ এবং ভারতবর্ষে ৪০% স্বর্ণ ও স্টার্লিং সিকিউরিটিতে মজুত রাখিতে হয়। সরকারকে ব্যয়াধিক্য মিটাইবার জন্য যুদ্ধাদির সময় অস্বাভাবিক উপায়ে মুদ্রা সম্প্রসারণ করিতে হয় এবং সেই সময়ই এত অধিক নোট ছাড়িতে হয় যে, উপরোক্ত কথা আর বলবৎ থাকে না। ফলে নোটের "gold backing" লোপ পায় এবং ঐ সকল নোটই "Inconvertible" পর্যায়ে পড়িয়া যায়। অর্থাৎ ঐ সকল নোটের বিনিময়ে মুদ্রা দেওয়া হয় না।

আক্রমণ না আত্মরক্ষা ?

ইওরোপে শীত প্রায় এসে পড়ল। এবার মহাযুদ্ধের আবার দৃশ্যপট-পরিবর্তন। স্থানঃ আফ্রিকা এবং প্রাচ্যদেশ। আফ্রিকায় বড় আক্রমণ ইতিমধ্যেই সুরু হ'য়ে গেছে—ইংরেজরা আক্রমণ করেছে মিশরে জার্মানদের। প্রাচ্যে বড় অভিযান আরম্ভ না হ'লেও আসন্ন যে তার লক্ষণ পরিস্ফুট। জাপানীরা আসাম ও বাঙলার সীমান্তে আস্তানা করে আছে; সুতরাং দৃঢ়ভাবে আয়ত্তে আনা তাদের দরকার ছিল। অধিকৃত দেশে দখল সুপ্রতিষ্ঠ করা আত্মরক্ষার সংগ্রামেও যেমন দরকার, ভবিষ্যৎ অভিযানের পক্ষেও তেমন দরকার। জাপানীদের দ্রুত অগ্রগতি এবং আক্রমণমুখীনতার পরিচয়ে প্রথমে মনে হয়েছে তাদের কর্মতৎপরতায় বিরতি যদি কখনও আসে, তবে সে হবে আরো আক্রমণের জন্যে শক্তিসঞ্চয়ের স্বল্পস্থায়ী বিরতি। ব্রহ্ম-

ভারতবর্ষের পক্ষে গত শীতের মতো আবার দুর্ভাবনা দেখা দিল। শীতের সময় ইওরোপে যোদ্ধারা যখন ঠাণ্ডায় জড়োসড়ো হয়ে যায়, তখন এদিকে বীরবৃন্দ হাত-পা মেলবার আবহাওয়া পায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষার বন্ধনায় অবসন্ন ক্ষাত্রবীর্য আবার জেগে ওঠে।
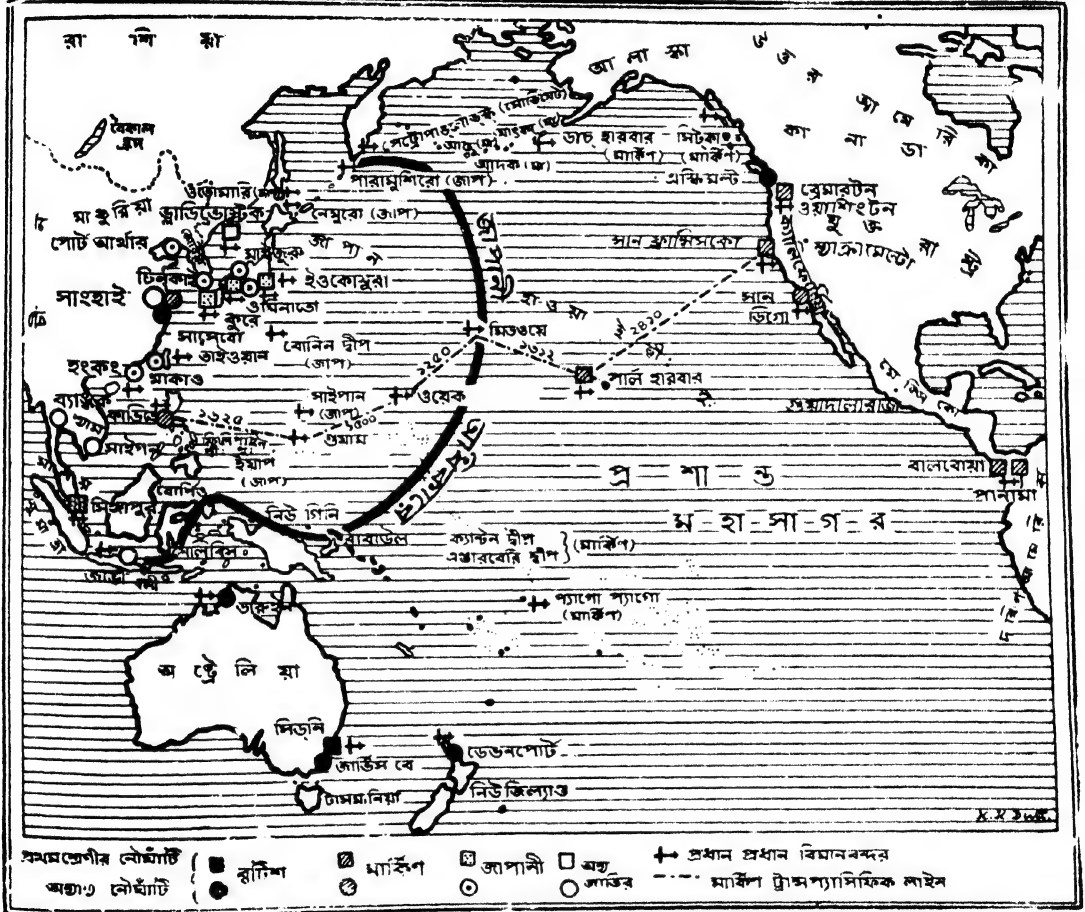
জাপানী বিমান বাঙলায় ও আসামে হানা দিয়ে তার প্রাথমিক সত্তা জানিয়ে গেছে। কিন্তু এ কি অভিযানের পূর্বাভাষ? সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। গত বছর ডিসেম্বর থেকে মাস ছয় সাত জাপানীদের যুদ্ধের যে প্যাটার্ন ছিল, বর্তমানের প্যাটার্ন ঠিক সে রকম নয়। অতি অল্প সময়ে তারা এক বিরাট সমৃদ্ধ মহাদেশখণ্ড ও দ্বীপশৃঙ্খল দখল করে' নেয়। এই ভূভাগ বিজয়ের পর এই নিঃসন্দেহ ধারণাই সকলের ছিল। ব্রহ্মের পর চীনের মধ্যে তাদের আবার অভিযান, অ্যালিউশিয়ানে পদার্পণ, প্রবাল সাগরে যাত্রা, মিডওয়ে দ্বীপাভিমুখে পদক্ষেপের চেষ্টা, নিউগিনিতে নতুন আক্রমণ, সাইবেরিয়া সীমান্তে সৈন্যপ্রেরণ,—এ সব থেকে এই ধারণাই সমর্থন পেয়েছে যে, তারা ভবিষ্যৎ বৃহত্তর অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে, বিশেষভাবে ইদানীং উপরোক্ত ধারণায় অনিশ্চয়তা এসেছে। কার্যক্ষেত্রে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটেছে যাতে মনে হয়, জাপান হয়তো এখন মূলত আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালাবারই সিদ্ধান্ত করেছে, তার অধিকৃত প্রধান ভূভাগ ধরে' রাখাই হবে সে সংগ্রামের উদ্দেশ্য। জাপানীরা অ্যালিউ-

শিয়ানের আত্তু ও আগাত্তু এই দুটো দ্বীপ ছেড়ে দিয়ে শুধু কিস্‌কাতে শক্তি সংহত করেছে। নিউগিনিতে বুনায় অবতরণ করার পর তারা ওয়েনস্ট্যানলি পর্বত পার হ'য়ে পোর্ট মোর্সবির কাছাকাছি চলে' গিয়েছিল; কিন্তু আবার সেখান থেকে হটে ওয়েনস্ট্যানলির অপর পারে সরে' এসেছে। এর আগে তারা পূর্ব চীনেও অনেকখানি হটে' এসেছে। পরিশেষে, সোভিয়েট সাইবেরিয়ার ধারে সৈন্য সমবেত করা সত্ত্বেও তারা আক্রমণ করে নি; আক্রমণ করলে এতদিনে করা উচিত ছিল, কারণ শীতকাল সাইবেরিয়া আক্রমণের সময় নয়।

জাপানীদের এই পশ্চাদপসরণের মূলে আছে নিশ্চয়ই প্রতিপক্ষের শক্তি সম্বন্ধে নবোন্মেষিত চেতনা এবং পূর্ব হিসাব অনুযায়ী সুযোগ বাস্তব ক্ষেত্রে না পাওয়া। নিজের শক্তি ব্যয় করে' কোনো জায়গায় অধিকার বিস্তার করার পর কেউ কখনো স্বেচ্ছায় সরে' আসে না কিংবা সময়ের দিক থেকে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করবার মুহূর্তে কেউ কখনো স্বেচ্ছায় চলে' যেতে দেয় না।

জাপানের দ্বিতীয় দফা আক্রমণ সম্বন্ধে আগে যে অনুমান করা হয়েছিল, তাতে তাকে প্রধানত লড়াই করতে হ'ত উত্তর-পশ্চিমে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে অথবা দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মার্কিন, চীনা ও ইংরেজের সঙ্গে। খবর রটেছিল যে, স্টালিনগ্রাদের পতন হলেই জাপানীরা সাইবেরিয়া আক্রমণ করবে। কিন্তু তিন মাস ধরে আক্রমণ চালিয়েও জার্মানরা আজও ঐ সোভিয়েট শহর দখল করতে পারল না। এতে সময়ের সুযোগ যেমন জাপানীদের হাতছাড়া হয়ে গেল, তেমন সোভিয়েট শক্তি সম্বন্ধে জাপানী জ্ঞান অনেকখানি বেড়ে গেল। এর ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা বর্জন জাপানীদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। ইতি-মধ্যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের অবস্থারও বেশ পরিবর্তন হয়েছে। সিঙ্গাপুর, ব্রহ্ম ও ডাচ ঈস্ট ইণ্ডিজ আক্রমণের সময় জাপানীরা প্রাচ্যের আকাশে যে বিমান প্রাধান্য এবং প্রশান্ত মহাসাগরে যে নৌ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, এখন তা আর বজায় নেই। প্রবাল সাগর ও মিডওয়ে যুদ্ধে জাপানী নৌবাহিনী গুরুতরভাবে ঘায়েল হয় এবং মার্কিন উৎপাদন-শক্তি দ্রুতগতিতে জাপানী বিমানবলকে খর্ব করে' ফেলতে থাকে। রণক্ষেত্রেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

অ্যালিউশিয়ানে আন্দ্রেয়ানফ দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকানরা নতুন ঘাঁটি করে' জাপানী ঘাঁটিগুলোর উপর ক্রমাগত প্রবল আক্রমণ করতে থাকে। চীনে মার্কিন বিমান জাপানী এলাকায় হামলা সুরু করে (চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানীদের উপর বিমান আক্রমণ এই প্রথম)। নিউগিনিতে জাপানীরা নতুন আক্রমণে প্রথমে এগিয়ে গেলেও তাদের পেছনে যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রচণ্ড বিমানহানায় বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়ে এবং তাদেরই কৌশল অবলম্বন করে' জেনারেল ম্যাকআর্থারের অধীন অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যেরা তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। সব চেয়ে বড় ঘটনা হ'ল সলোমন। এই বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ জাপানীরা প্রথম ছয় মাসের যুদ্ধের মধ্যে সহজে দখল করে' নিয়েছিল; কিন্তু মার্কিন সৈন্য ও নৌবহর পাল্টা অভিযান করে' সলোমনের দক্ষিণ-পূর্ব দ্বীপ গুয়াদালকানার আবার ছিনিয়ে নেয় এবং সেখানে বিমানঘাঁটি স্থাপন করে। এই ঘটনাবলী থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, এক পক্ষের শুধু মারবার এবং অপর পক্ষের মার খাবার অবস্থা পার হয়ে গেছে।

এই কয়মাসে মিত্রপক্ষ পাল্টা অভিযানের জন্যে আয়োজন করবারও যথেষ্ট সময় পেয়েছে। বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষই একাধিকবার বলেছেন যে, ভারতবর্ষে সামরিক ব্যবস্থা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। জেনারেল ওয়েভেল ইঙ্গিত করেছেন যে, মিত্রপক্ষ ব্রহ্ম আক্রমণ করবে।

সুতরাং বলা যায়, প্রাচ্য-যুদ্ধের ছকটা বদলে গেছে। জাপানী পরিকল্পনা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় রূপান্তরিত হ'য়ে থাকতে পারে। নেগেটিভ দিক থেকেও এই ধারণার সমর্থন মেলে। অভিযান করতে হ'লে আগে থেকে যে রকম বিমান আক্রমণ চালিয়ে পথ প্রস্তুত করতে হয়, সে রকম কোনো বিমান আক্রমণ জাপান গত কয়মাস চালায়নি। ভারতবর্ষ ও অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে জাপানী বিমান-বহর নিষ্ক্রিয়ই ছিল বলা যায়। ভারতবর্ষে বিমান হানা না হওয়ায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নিরুপদ্রবে শক্তিবৃদ্ধি ও সামরিক তোড়জোড়ের অবসর পেয়েছে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ থেকে মিত্রপক্ষের বিমান গিয়ে বার বার ব্রহ্মে গোলযোগ ঘটিয়েছে। জাপানীরা এখন যে সব হানা দিচ্ছে, সেগুলো বড় নয় এবং তাদের লক্ষ্য হচ্ছে মিত্রপক্ষের সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলো, যেখান থেকে পাল্টা অভিযান চলতে পারে। জেনারেল ওয়েভেল কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে, তাঁর মতে জাপানীরা ভারতবর্ষ বা অস্ট্রেলিয়া অভিযানের মতো বৃহৎ ব্যাপারে হাত দেবে না। তাঁর কথা সত্য হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।

মিত্রপক্ষের শক্তিবৃদ্ধি এবং কঠোর প্রতিরোধের সম্ভাবনাই শুধু জাপানী অভিযানের বাধা নয়। মার্কিন আক্রমণের ফলে ইতিমধ্যে তাদের জলস্থলে বিস্তৃত বিরাট লাইনের পার্শ্বভাগ যেভাবে বিপন্ন হয়েছে, তাতে নতুন কোনো অভিযান খুব ঝুঁকির কাজ। জাপানীরা তাদের পার্শ্বরক্ষায় যে কি রকম গুরুত্ব আরোপ করছে, সলোমনের যুদ্ধ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সময় ও সামরিক প্ল্যানের দিক থেকে জাপানীদের হিসেব যে খানিকটা গোলমাল হয়ে গেছে, তারও প্রমাণ সলোমনের যুদ্ধ। সলোমনে প্রবল সংগ্রাম হচ্ছে; সে এই দ্বীপপুঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থানের জন্যে। অথচ এটা একটা নতুন কোনো অভিযান নয়। এ অঞ্চল তো জাপানীরা দখলই করে' নিয়েছিল; মাঝখান থেকে আমেরিকানরা গুয়াদালকানার দ্বীপ দখল করে' নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়েছে। বাইরে থেকে যেমন কেউ অনুমান করেনি যে, এই অখ্যাত জায়গা নিয়ে এত বড় একটা সংঘর্ষ হবে, তেমন জাপানীদের পক্ষেও অনুমান করা কঠিন ছিল, সম্মুখ থেকে দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত করে' পেছনের একটা অধিকৃত অঞ্চলে আবার

(শেষাংশ ৫৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিজয়ার সম্ভাষণ

বাঙালী জীবনের উৎসবানন্দের বহুপ্রতীক্ষিত দিনগুলি পূজাবসানের সঙ্গে সঙ্গে একে একে শেষ হয়ে এল। আবার আমরা কর্মক্ষেত্রকে উপলক্ষ করেই রঙ্গজগতের অনুরাগী পাঠক ও পাঠিকা, সিনেমা-দর্শক ও সিনেমা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছি; তাই বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ প্রারম্ভেই জানাচ্ছি। কর্তব্যের কঠোর অনুশাসনে রঙ্গ-জগতের অনেক শ্রদ্ধাবান বন্ধুকে হয়তো আমরা আমাদের অনিচ্ছাকৃত আঘাতে ক্ষুব্ধ করেছি, কিন্তু বিজয়ার এই মহা-মিলনের শুভক্ষণে আমরা পূর্বসঞ্চিত রাগ, দ্বেষ ও ক্ষোভ ভুলে গিয়ে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপনের জন্য আমাদের হস্ত প্রসারিত করলাম। রঙ্গজগতের পাদ-পীঠে আমরা যারা একত্রে সম্মিলিত হয়েছি, আমাদের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন হলেও সকলের একই উদ্দেশ্য ও একই আদর্শ। সুতরাং মতান্তর যদি কখনো ঘটে থাকে, তা মনান্তর নয়, মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার ক'রে বিজয়ার এই শুভ-মিলনের দিনে আমাদের প্রীতিনমস্কার জানাচ্ছি।
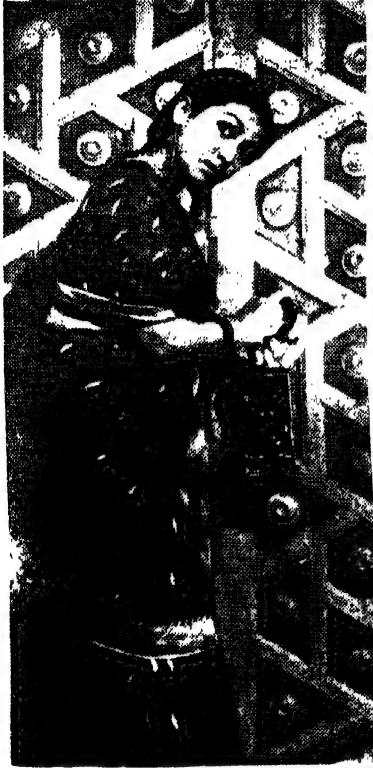
পাঞ্চালী আর্ট-এর 'জমিদার' চিত্রে মনোরমা

* * * * *

এবার পূজায় চিত্রগৃহ ও রঙ্গজগৎগুলি ব্ল্যাকআউটের শাসনে আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে নি। 'ব্যাফেল্ ওয়ালে' বিপর্যস্ত সংকীর্ণ পথ অন্ধকারে অতিক্রম করে দর্শকদের এবার বহুকষ্টে আনন্দ আহরণ করতে হয়েছে। যুদ্ধ-আতঙ্ক ও অর্থ-সংকট থাকা সত্ত্বেও কলকাতার চিত্রগৃহ ও থিয়েটারগুলি জনসমাগমে সরগরম হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে চিত্রগৃহে বিভিন্ন রুচির দর্শকদের জন্য বিচিত্র রকমের আনন্দ পরিবেশনের আয়োজনও হয়েছিল। ধর্মপ্রাণ বাঙালী নরনারী যাঁরা ভক্তি-রসপূর্ণ ছবি দেখে আনন্দলাভ করতে চান, তাঁদের জন্যে শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয়ের কাহিনী অবলম্বনে প্রকাশ পিকচার্সের ভক্তিমূলক চিত্র 'ভরত-মিলাপ' প্রদর্শিত হচ্ছে। আর যাঁরা নিছক আমোদপ্রমোদ ও চিত্তবিনোদন চেয়েছেন, তাঁরা বম্বে টকীজের 'বসন্ত', চিত্রা প্রোডাকসন্সের 'কিসিসে-না-কহনা', আর আচার্য প্রডাকসন্সের 'কুঁয়ারা বাপ' ছবির নাচগান, কৌতুকপূর্ণ প্রেমাভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

বাঙলা ছবির ছায়াচিত্রগৃহে পূজা উপলক্ষে কোন নতুন ছবি পরিবেশিত হয়নি। 'জীবন সঙ্গিনী', 'শেষ উত্তর', 'প্রতিশ্রুতি', 'চৌরঙ্গী' প্রভৃতি পূজার বহুপূর্বে প্রদর্শিত ছবিগুলি দিয়েই পূজার আসর জমিয়ে রেখেছিল।

চিত্রায় মিলন

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর ছবি। পরিবেশক—রায়সাহেব চন্দনমল ইন্দ্রকুমার। কাহিনী, লেখক, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক—কুমার শচীন দেব-বর্মণ। ছবিখানি চিত্রায় প্রদর্শিত হচ্ছে।

মিঃ মুখার্জির কন্যা সুচরিতা আধুনিক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা এবং আলোকপ্রাপ্তা। মিঃ মুখার্জি তাঁর মেয়েকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও সমাজে মেলামেশার সুযোগ দিয়েছেন, নারীপ্রগতি তিনি পছন্দ করেন। অজিত নামে একটি সরলহৃদয় যুবককে সুচরিতা ভালোবেসেছে। কিন্তু অজিত একজন সাধারণ মোক্তারের ছেলে এবং মধ্যবিত্ত সমাজের লোক। সুচরিতা তাকে ভালবাসলেও তার বাবা যে পাত্র হিসাবে তাকে পছন্দ করবেন না, প্রণয়ালাপের ফাঁকে ফাঁকে এ আশংকাও অজিত সুচরিতার কাছে প্রকাশ করে।

দেখা গেল অজিতের আশংকা মোটেই অমূলক নয়। পরেশ মিত্র নামে একজন ধনী, বিপুল সম্পত্তির মালিককে তিনি সুচরিতার জন্য নির্বাচন করেছেন; পরেশের আর একটি কৃতিত্ব সে কন্টিনেন্ট ঘুরে এসেছে। আধুনিক চালচলন, আদবকায়দায় কেউ তার সমকক্ষ নেই।

নিজের জন্মতিথি উপলক্ষে এক পার্টিতে পরেশ মিঃ মুখার্জি আর সুচরিতাকে নিমন্ত্রণ করল এবং অবকাশমত সুচরিতাকে প্রণয় নিবেদন করতে গিয়ে শুনতে পেল যে, সে এনগেজড্। অজিত যে সুচরিতার প্রণয়ী, একথা পরেশ পূর্বেই জানতে পেয়েছিল।

দারুণ ঈর্ষায় দগ্ধ হয়ে সুচরিতা আর অজিত যেখানে অনন্য-চিত্তে প্রেমালাপের অবকাশ রচনা করেছিল, সেখানে মিঃ মুখার্জিকে টেনে আনল এবং তাকে এই প্রণয়-দৃশ্য প্রত্যক্ষ করাল।

মিঃ মুখার্জি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সুচরিতাকে বাড়িতে এনে তার এই হীন প্রবৃত্তির জন্য তাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলেন, বাড়ির বাহির হতে নিষেধ করে দিলেন এবং আদেশ করলেন, পরেশকেই তার বিয়ে করতে হবে। সুচরিতা দৃপ্তভাষায় তার অসম্মতি জানাল এবং বাপ-মার নিষেধ সত্ত্বেও, বাবার অনুপস্থিতিতে বাড়ির বাইরে গিয়ে অজিতের বাবা মোক্তার ব্রজবল্লভের কাছে সকল কথা জানিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করল। ব্রজবল্লভ তথাকথিত প্রগতি এবং আধুনিক শিক্ষার অন্তঃসারহীনতার কথা বিশেষভাবে জানেন এবং এসব তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। তবু সুচরিতার দীপ্ত তেজস্বিতায় তিনি মুগ্ধ হলেন এবং তাকে পুত্রবধূ করতে স্বীকৃত হলেন। অজিতের বন্ধু এবং তাঁর ব্লাডপ্রেসারের চিকিৎসক বিমলের সঙ্গে সুচরিতাকে তিনি অজিতের মামারবাড়ি এক পল্লীগ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। অজিত সেখানেই ছিল। সেখানে অজিতের সঙ্গে সুচরিতার নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু এই বিয়ের সংবাদ পেয়ে মিঃ মুখার্জি ব্রজবল্লভের বাড়ি এসে তাঁকে জোচ্চোর, ইত্যাদি বলে গালাগালি ও অপমান করলেন এবং ব্রজবল্লভ তার প্রত্যুত্তর দিতে গেলে তিনি আরও উত্তেজিত হয়ে ব্রজবল্লভকে ধরে ঘাড় ঝাঁকানি

দিলেন এবং তার ফলে ব্লাডপ্রেসারের রোগী ব্রজবল্লভ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ভয়ে, আতঙ্কে মিঃ মুখার্জি ফেরার হলেন। ব্রজবল্লভের মূর্চ্ছা আর ভাঙল না।

সুচরিতাকে না পেয়ে পরেশের মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলতে লাগল এবং যে কোন প্রকারে অজিত আর সুচরিতার সুখের নীড় ভেঙে দিতে কৃতসংকল্প হল। বিমল মাঝে মাঝে প্রায়ই অজিতদের বাড়ি আসত এবং সুচরিতাকে বউদি বলে ডেকে স্নিগ্ধ হাস্য-পরিহাস করত। পরেশ অজিতকে ডেকে বিমল আর সুচরিতা যে পরস্পর আসক্ত, এ সম্বন্ধে তার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়ে দিল। দুর্বল-হৃদয় অজিত সন্দিগ্ধ হয়ে স্ত্রী এবং বন্ধু বিমলকে অপমান করল এবং তীব্র সংশয়ের জ্বালায় দগ্ধ হতে লাগল। তারপর নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে পরেশের লাম্পট্য এবং হীন উদ্দেশ্যের অজিত প্রমাণ পেয়ে গেল। সুচরিতাকে অসদুদ্দেশ্যে জোর করে অধিকার করতে এসে ধরা পড়ে পরেশ আত্মহত্যা করে মরল। অজিতের মন হতে মিথ্যা সংশয়ের বিষ অন্তর্হিত হল এবং স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন ঘটল।

চিত্রনাট্যের এই দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে চিরাচরিত প্রেম, ঈর্ষা আর সংশয় ছাড়া আর কোন কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেশের বর্তমান সমাজজীবন যেসব বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তাদের কোন আভাষ এই কাহিনীর মধ্যে অনুসন্ধান করতে যাওয়া বৃথা। কাহিনীকার তার কোন ইঙ্গিতই দেন নি। কিন্তু যে সূক্ষ্ম রচনা কৌশলে সাধারণ প্রণয়োপখ্যানও বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে, সেইরূপ শিল্পবোধের পরিচয়ও এই গল্পের মধ্যে দুর্লভ। বরং সংলাপের মধ্যে স্থানে স্থানে বক্তৃতার ভঙ্গী, ঘটনা গ্রন্থনে মাঝে মাঝে অতিনাটকীয়তা কাহিনীর দুর্বলতার পরিচয় দেয়।

অজিত আর সুচরিতা—দুই প্রেমিক প্রেমিকার ডুয়েট গানের মধ্য দিয়ে ছবির প্রারম্ভ সূচিত হয়েছে। গানের কথা-বস্তুর মধ্যে আছে সেই অলি আর ফুল, রাধা আর শ্যাম। মনে হয় আধুনিক শিক্ষিত সমাজে প্রণয়ালাপের পদ্ধতি বহুদিন হতেই ভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে কিন্তু সিনেমায় প্রেমালাপের এই রাধা শ্যামের উপমা সম্বলিত সাঙ্গীতিক প্রকাশ আজও অক্ষুণ্ণ হয়ে রইল। প্রণয়ী প্রণয়িণীর অধরোষ্ঠের মিলনের মুহূর্তে দৃশ্য অপসারিত করে কপোত-কপোতীর ঘন চঞ্চুচুম্বনের মধ্যে যে ইঙ্গিত প্রকাশ করা হয়েছে তাতে যথার্থই পরিচালকের সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

অভিনয় অংশে পরেশের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর অভিনয় সত্যই চরিত্রোপযোগী হয়েছে যদিও আগা-গোড়া অপরিবর্তনীয়, ক্রমপরিণতিহীন এইরূপ একটি

'মিলন' চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী চিত্রা

চরিত্রের অভিনয় কথঞ্চিৎ একঘেয়ে হয়ে পড়িবার সম্ভাবনা অনতিক্রম্য এবং অনস্বীকার্য। অজিতের চরিত্রও বৈশিষ্ট্য বর্জিত দুর্বল এবং ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। এইরূপ চরিত্রের অভিনয়ে ধীরাজবাবু তাঁর চিরাচরিত পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। মিঃ মুখার্জি ভূমিকায় রতীন বন্দোপাধ্যায়ের অভিনয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য লক্ষিত হল। মোক্তার ব্রজগোপালের ভূমিকায় পরলোকগত যোগেশ চৌধুরীর অভিনয় বেশ স্বাভাবিক এবং উপভোগ্য হয়েছে। বিমলের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় ভাল লাগল। অজিতের ভৃত্যের ভূমিকায় সত্য মুখার্জি এবার আর হাস্যরসের সেইরূপ অবকাশ পান নি। স্ত্রী ভূমিকাগুলির মধ্যে সুচরিত্রার চরিত্রে চিত্রা দেবীর অভিনয় মোটামুটি মন্দ হয় নি, স্থানে স্থানে একটু মঞ্চ ঘেঁষা হয়ে পড়েছে বলে মনে হল। মিসেস মুখার্জির ভূমিকায় সুপ্রভার অভিনয় চলনসই। বীণার ভূমিকায় রেণুকা রায় সাবলীল অভিনয় করেছেন কণকের ভূমিকায় অরুণা দাসের নৃত্য তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও গান ও অভিনয় ভাল হয়েছে। রেণুকা রায়ের গানখানিও প্রশংসনীয়।

সংগীত পরিচালনায় শচীন দেব বর্মণ সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। গানগুলির কথাবস্তুর মধ্যে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না। ফটোগ্রাফি ও শব্দ গ্রহণ ভালই হয়েছে।

আক্রমণ না আত্মরক্ষা?

(৫৪০ পৃষ্ঠার পর)

এমনভাবে শক্তি নিয়োগ ও শক্তি ক্ষয় করতে হবে। যে সময়টা নতুন নতুন অভিযানের অনুকূল, সেই সময় গুয়াদালকানার নিয়ে অনেকখানি ব্যাপৃত থাকতে হ'ল, এটাই তাদের পক্ষে পরিতাপের। এর চেয়ে কত বড় আর কত ভালো জায়গা এর আগে কত সহজে তারা নিয়ে নিয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায়, অবস্থা আগে থেকে কেমন বদ্‌লেছে। অথচ অধিকৃত বিরাট ভূভাগ রক্ষা করতে হলে সলোমন নিয়ে ব্যাপৃত না হ'য়ে উপায় নেই। গুয়াদালকানারের মতো কীলক সরানো তাদের একান্ত দরকার। সুতরাং সলোমনের যুদ্ধকে জাপানীদের আত্মরক্ষার যুদ্ধই বলা উচিত।

ভানু গুপ্ত
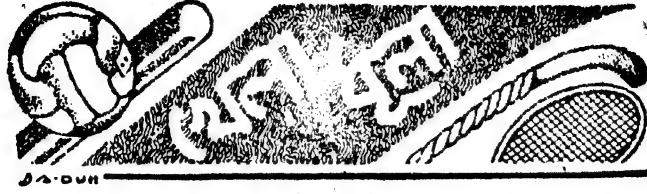
আন্তপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট

আন্তপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সম্পর্কে বাঙলার পরিচালকগণ যেরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বা যেরূপ ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে সকলেরই ধারণা হইতেছে এই বৎসরের অনুষ্ঠান গত বৎসরের ন্যায় নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। কিন্তু আমরা সেইরূপ ভরসা করিতে পারিতেছি না। এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান লইয়া বিভিন্ন প্রদেশে যেরূপ আলাপ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহতে আশঙ্কা হইতেছে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে না। বোম্বাই প্রদেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে না, এইটুকু জানাইয়া যদি নিশ্চিন্ত থাকিত, তাহা হইলে হয়তো তাহাদের অবর্তমানে অথবা কয়েকটি প্রদেশের অবর্তমান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিত না। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশ না যোগদান করিবার যুক্তি হিসাবে যে সকল কারণের উল্লেখ করিয়াছে, তাহা বাঙলা প্রদেশের পরিচালকগণ উপেক্ষা করিলেও ভারতের সকল প্রদেশের ক্রিকেট পরিচালকগণকে বিশেষভাবেই চিন্তিত করিবে। বোম্বাই প্রদেশ না যোগদানের যুক্তি হিসাবে বলিয়াছে—"দেশের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সকল খেলাধূলার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধভাব জাগ্রত করিতেছে। যানবাহনাদির চলাচলে যে বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও খেলাধূলা অনুষ্ঠানের অনুকূলে নহে।" বোম্বাই প্রদেশের এই সকল যুক্তি প্রকৃতপক্ষে চিন্তা করিলে কি অস্বীকার করা চলে? সকল দেশেই কি এই রাজনৈতিক আন্দোলন ও যানবাহনাদির চলাচলের বিঘ্ন অনুষ্ঠানের প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে নাই? বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ড অনুষ্ঠানের সময় বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণ কি তাহা উপলব্ধি করেন নাই? শীল্ডের শেষের খেলাগুলি অনুষ্ঠিত করিতে কতদিন পরিচালকগণকে খেলা স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল, ইহা কি তাঁহারা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন? বোম্বাই রোভার্স প্রতিযোগিতায় যে বাহিরের দল যোগদান করিতে পারে নাই উক্ত সকল কারণের জনাই, ইহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। ডুরান্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান যে সম্ভব হইল না, তাহাও এইজন্যই। এই কথা ঠিক যে, ফুটবল মরসুমের সময় দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থা যেরূপ ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা অনেকাংশে প্রশমিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও বিশৃঙ্খল অবস্থা বর্তমান আছে। উহা যে কোন সময়েই ভীষণাকার ধারণ করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণ বোম্বাই প্রদেশের যুক্তি উপেক্ষা করিয়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও, অন্যান্য দেশের পরিচালকগণ বোম্বাইর যুক্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিবেন, এইরূপ ভরসা করা চলে কি? তাহা ছাড়া বাঙলা প্রদেশের ক্রিকেট পরিচালকগণ যে শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠান হইবেই, এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস মনে পোষণ করিতেছেন বলিয়াও তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইতে মনে হয় না। তাঁহারা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদকের নিকট যে প্রস্তাবটি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার শেষভাগে উল্লেখ করিয়াছেন, "যদি দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অথবা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি খুবই শোচনীয় আকার ধারণ করে তবে বাঙলা প্রদেশ প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিবে।" শোচনীয় আকার যে ধারণ করিবে এই আশঙ্কা তাঁহাদের মনে আছে বলিয়াই এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। সুতরাং বাঙলা প্রদেশ রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে এই উক্তি করায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবেই ইহা স্থির নিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না। বোম্বাই প্রদেশের যুক্তি সপর্কে বাঙলা প্রদেশ নিজেদের মতামত ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে জানাইয়া দিয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশ এখনও জানান নাই। ঐ সকল মতামত প্রকাশিত শীঘ্রই হইবে এবং তখন ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে যে, রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এই বৎসর অনুষ্ঠিত হইবে কিনা?

বৈদেশিক খ্যাতনামা খেলোয়াড়গণ

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা যদি এই বৎসর অনুষ্ঠিত হয়, তবে ইংল্যান্ডের কয়েকজন খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড়কে বিভিন্ন দলে যোগদান করিতে দেখা যাইবে। এই সকল খেলোয়াড় সামরিক কার্যে ভারতে আগমন করিয়াছেন ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করিতেছেন। ঠিক কয়জন খেলোয়াড় ভারতে আসিয়াছেন, তাহা জানা যায় নাই। তবে বিহার দলে বিখ্যাত বোলার ভেরিটী খেলিবেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। বাঙলা দলের বিখ্যাত ব্যাটস্ম্যান হাউষ্টাফ, বোলার গর্ডাড প্রভৃতির খেলিবার সম্ভাবনা আছে। হার্টন, এডমান্ড, ব্রাউন প্রভৃতি বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ ভারতে আছেন। তবে তাঁহারা কোন দলে খেলিবেন নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইলে এই সকল খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে সকল কিছু জানিতে পারা যাইবে।

বাঙলা বনাম বিহার

বাঙলা বনাম বিহার দলের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা গত তিন বৎসর জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত হইতেছিল। এই বৎসর বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে আগামী ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে নভেম্বর এই তিন দিন এই খেলা কলিকাতার ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত হইবে।

বাঙলার এ্যাথলেটিক স্পোর্টস

বাঙলার এ্যাথলেটিক স্পোর্টস অনুষ্ঠানের সময় আগত।

এই বৎসর কোন অনুষ্ঠান হইবে কিনা এই চিন্তা উৎসাহী এ্যাথলীটদের বিশেষভাবেই চঞ্চল করিয়াছে। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন অনুষ্ঠান হইবে, কি হইবে না সেই বিষয় কিছুই প্রকাশ করেন নাই। কবে যে তাঁহারা প্রকাশ করিবেন, তাহার কোনই ঠিকানা নাই। অথচ এ্যাথলীটগণ নানারূপ আলাপ-আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ বলিতেছেন, "গত বৎসর যখন যুদ্ধের জন্য কোন অনুষ্ঠান হয় নাই, এই বৎসরও হইবে না। কারণ গত বৎসর যে অবস্থার মধ্যে সকল অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায়, বর্তমান বৎসরেও তাহার কোনই পরিবর্তন হয় নাই।" কেহ কেহ বলিতেছেন, "এই বৎসর সকল অনুষ্ঠান না হইলেও কয়েকটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান হইবে। বিলাতে ভীষণ বিমান আক্রমণের মধ্যে যখন স্পোর্টস অনুষ্ঠান একেবারেই বন্ধ হইয়া যায় নাই, তখন আমাদের দেশে বিমান আক্রমণ সম্ভাবনা আছে বলিয়াই অনুষ্ঠান বন্ধ থাকা সমীচীন হইতেছে না।" আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, "অনুষ্ঠান হইবে কি করিয়া? মাঠের অধিকাংশ বিমান আক্রমণ হইতে স্থানীয় জনসাধারণ যাহাতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন তাহার জন্য বড় বড় পরিখা ও আশ্রয়স্থল নির্মাণ হওয়ায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মাঠে যেটুকু স্থান আছে তাহাতে স্পোর্টস হইতে পারে না।" কেহ কেহ বলিতেছেন, "ক্রিকেট খেলার জন্য যখন ব্যবস্থা হইতে পারে তখন স্পোর্টস অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা অনায়াসেই হইতে পারে। ইডেন উদ্যানে বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন চেষ্টা করিলেই কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে পারেন।" এই সকল আলাপ আলোচনার মূল্য কিছুই নাই। কারণ বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ যতদিন না এই বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন অথবা ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করিতেছেন ততদিন কোনই অনুষ্ঠান হওয়া সম্ভব নহে। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সাধারণ বার্ষিক সভা দুই মাস হইল অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই বৎসরের কর্মকর্তা নির্বাচনও শেষ হইয়াছে। অথচ এই দুই মাসের মধ্যে তাঁহারা এ্যাথলেটিক স্পোর্টস অনুষ্ঠান সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করিতেছেন, অথবা করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করেন নাই। আমাদের মনে হয় বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের উচিত এই বিষয় কোন বিবৃতি প্রদান করা। এই বিবৃতি যত শীঘ্র প্রকাশিত হয় ততই ভাল। কারণ তাঁহারা কোন কিছু না প্রকাশ করা পর্যন্ত এ্যাথলিটগণ ঠিক করিতেই পারিতেছেন না যে তাঁহারা কি করিবেন। অনুশীলন আরম্ভ করিবেন কিনা, তাহাই চিন্তা করিতেছেন। অনুশীলন আরম্ভ করিয়া পরে যদি শুনিতে পান যে কোন অনুষ্ঠানই হইবে না, তাহা হইলে খুবই মর্মবেদনা অনুভব করিবেন। এই মর্মবেদনা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই তাঁহারা অনুশীলনে প্রবৃত্ত না হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া আছেন। এই অচল অবস্থার অবসানের একমাত্র উপায় হইতেছে, বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের বিবৃতি প্রকাশ করা। যদি পরিচালকগণের মনে হইয়া থাকে দেশের বর্তমান অবস্থায় কোন স্পোর্টস অনুষ্ঠান হইলে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যাইবে না, তাহা হইলে তাঁহারা প্রকাশ করিয়া দিন যে, এই বৎসর কোন অনুষ্ঠান হইবে না। আর যদি তাঁহাদের ভরসা থাকে যে, অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইলেই সাড়া পাইবেন, তাহা হইলে নীরব না থাকিয়া প্রকাশ করুন যে, বৎসরের সকল অনুষ্ঠানই হইবে। তাহা ছাড়া বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ নীরব থাকায় এ্যাথলীটগণও দিন দিন এসোসিয়েশনের কর্মক্ষমতা বিষয় সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের ন্যায় একটি খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা খুবই কলঙ্কের বিষয়।

বেঙ্গল এ্যামেচার সুইমিং এসোসিয়েশন

বাঙলার সন্তরণ মরসুম শেষ হইয়াছে। এই সময় সন্তরণ প্রতিযোগিতা অথবা সন্তরণ কৌশল প্রদর্শনের ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বাঙলার সন্তরণ পরিচালকগণ অর্থাৎ বেঙ্গল এ্যামেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণ পুনরায় একটি সাঁতারু দল ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে সন্তরণের কৌশল প্রদর্শন করিবার জন্য প্রেরণ করিতেছেন। এক মাস পূর্বে রংপুরে এ্যামেচার এসোসিয়েশন একটি দল প্রেরণ করেন এবং ঐ দল রংপুরে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। ঐ উৎসাহ ও উদ্দীপনার কথা পরিচালকগণের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা পুনরায় দল প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। এক মাস পূর্বে দেশের যে অবস্থা ছিল বর্তমানে তাহা নাই। বিশেষ করিয়া তখন সবেমাত্র সন্তরণ মরসুমের অবসান হইয়াছে। সুতরাং সেই সময় দল প্রেরণ করায় স্থানীয় জনসাধারণ যেরূপ উৎসাহিত হইয়াছিলেন, বর্তমান অবস্থায় অথবা বর্তমান সময় হইবেন এই আশা কিরূপে পরিচালকগণ পাইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যে সময় দল প্রেরিত হইয়াছিল ঠিক তাহার এক সপ্তাহের মধ্যে যদি তাঁহারা পুনরায় দল প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেন হয়তো বা কোন ফল হইত, কিন্তু বর্তমানে তাহার কোনই সম্ভাবনা আমরা দেখি না।

রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা

বোম্বাইর রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হইয়াছে। বাঙলার বাটা কোম্পানীর ফুটবল দল এই খেলায় সাফল্য লাভ করিয়াছে। বাঙলা দলের সাফল্য আনন্দদায়ক সন্দেহ নাই। ইতিপূর্বে বাঙলার মহমেডান স্পোর্টিং দল উক্ত কাপ বিজয়ী হইয়া যে গৌরব অর্জন করিয়াছিল বাটা কোম্পানীর ফুটবল দল তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে। বাটা দল ফাইন্যালে বোম্বাই লীগ চ্যাম্পিয়ান দলকে পরাজিত করিয়া কাপ বিজয়ী হওয়ায় বোম্বাই ক্রীড়ামোদিগণ বাটা দলের ক্রীড়ানৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। বিজয়ী দলের খেলাও খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। বাঙলার ফুটবল খেলা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা উচ্চস্তরের ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

১১ই অক্টোবর

রুশ রণাঙ্গন—গত রাত্রে স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে জার্মানদের পাঁচটি পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত হয়। ইহা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, স্ট্যালিনগ্রাদের তিন-চতুর্থাংশ সাত সপ্তাহ পূর্বে জার্মান বিমান বাহিনীর এক হাজার বোমারু বিমানের প্রথম আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছে।

১২ই অক্টোবর

মার্কিন নৌবিভাগ ঘোষণা করেন যে, গত ৮ই সেপ্টেম্বর সলোমন দ্বীপপুঞ্জের নিকট আমেরিকার তিনখানা বড় ক্রুজার নিমজ্জিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার 'ক্যানবেরা' নামক ক্রুজারখানি যে সময় নিমজ্জিত হয়, এই জাহাজ কয়খানিও সেই সময় নিমজ্জিত হয়। এই সম্পর্কে বহু লোক হতাহত হইয়াছে। এই ক্রুজার তিনখানির নাম 'কুইন্সি', ভিনসেনিস এবং এস্টোরিয়া।

১৪ই অক্টোবর

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, স্ট্যালিনগ্রাদ এলাকায় সোভিয়েট বাহিনী তাহাদের ঘাঁটিসমূহ সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছে। স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠের শিল্পকেন্দ্রে এখনও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণে সোভিয়েট বাহিনী জার্মানদের একটি সুদৃঢ় ঘাঁটি দখল করিয়াছে। ককেসাস পর্বতমালার পূর্ব প্রান্তভাগে মোজদক রণাঙ্গনের এক এলাকায় সোভিয়েট বাহিনী অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ যে, গুয়াদালকানালে জাপ সৈন্যাবতরণের সংবাদ সরকারীভাবে জানান হইয়াছে। মার্কিন নৌবিভাগের ঘোষণায় প্রকাশ, জাপ রণতরীগুলি গুয়াদালকানাল দ্বীপে মার্কিন বিমান ক্ষেত্র ও ঘাঁটির উপর গোলাবর্ষণ করে এবং একটি জাপ সৈন্যবাহী জাহাজ হইতে দ্বীপটির উত্তর উপকূলে আরও জাপ সৈন্য অবতরণ করে। সুদূরপ্রাচ্য দরিয়ায় মার্কিন সাবমেরিন একখানি বড় জাপ ক্রুজার ডুবাইয়া দিয়াছে।

১৫ই অক্টোবর

রুশ রণাঙ্গন—স্ট্যালিনগ্রাদ এলাকায় সোভিয়েট ঘাঁটিগুলি জার্মান পদাতিক ও ট্যাঙ্ক বাহিনী কর্তৃক বার বার আক্রান্ত হইতেছে এবং এ পর্যন্ত সমস্ত আক্রমণই প্রতিহত হইয়াছে বলিয়া সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে। স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম দিকে পাঁচবার জার্মান আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। গতকল্য পূর্ব-ককেসাসের মোজদক এলাকায় বার কয়েক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। জার্মানরা সেখানে গ্রজনী তৈলের খনি ও কাস্পিয়ান সাগরের দিকে নবোদ্যমে আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে নিজেদের শক্তি সংহত করে।

১৮ই অক্টোবর

ওয়াশিংটন হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সলোমন দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকানগণ শত্রুপক্ষের এক প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে। জেনারেল ম্যাক আর্থারের হেড কোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে সর্টল্যাণ্ড দ্বীপের অদূরে শত্রুপক্ষের একটি সৈন্যবাহী জাহাজের উপর মিত্রপক্ষীয় বিমানসমূহের বোমাবর্ষণের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ওয়েন স্ট্যানলী অঞ্চলে জাপানীদিগকে আরও পিছনে হঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে

রুশ-রণাঙ্গন—জার্মান বিমানবাহিনী গতকল্য সারারাত্রি স্ট্যালিনগ্রাদে বোমাবর্ষণ করে। সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, জার্মানগণ গত রাত্রে স্ট্যালিনগ্রাদ অঞ্চলে অগ্রসর হইতে পারে নাই। জনৈক সমর সংবাদদাতা রণক্ষেত্র হইতে জানায় যে, জার্মানদের স্ট্যালিনগ্রাদ রক্ষাব্যূহ ভেদ করার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়; কেবল এক জায়গায় একটা প্রধান কারখানা এলাকায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।

১৯শে অক্টোবর

রুশ-রণাঙ্গন—স্ট্যালিনগ্রাদ রক্ষীরা শত্রুপক্ষের আরও কয়েকটি আক্রমণ প্রতিহত করে; কিন্তু অবস্থা সংকটাপন্নই আছে। আরও প্রকাশ যে, স্ট্যালিনগ্রাদের চরম পর্যায় শুরু হইয়াছে।

জাপানীরা গুয়াদাকানালে আমেরিকান বিমান ক্ষেত্রটি দখল করিবার জন্য প্রবল চাপ দিতেছে। সলোমন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, এক দ্বীপ ও অন্য দ্বীপের মধ্যে যে গোলমেলে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে মার্কিণ রণতরীসমূহ যোগ দিয়াছে। সাধারণ পরিস্থিতি এখনও অস্পষ্ট; তবে মনে হয় যে, জাপানীরা আক্রমণ চালাইতেছে এবং আমেরিকানরা আত্মরক্ষামূলক লড়াই করিতেছে। গুয়াদালকানালের উত্তরাংশে জাপানী সৈন্য ও সমরোপকরণের উপর মার্কিণ বিমান বারবার আক্রমণ চালাইতেছে।

২০শে অক্টোবর

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, জার্মানরা তুমুল যুদ্ধের পর স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম অংশে শ্রমিক এলাকা অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সোভিয়েট সৈন্যদল প্রবলভাবে বাধা দেয়; কিন্তু ট্যাঙ্ক ও পদাতিকবাহিনীর সাহায্যে তুমুলভাবে আক্রমণ চালাইয়া জার্মান সৈন্যদল উক্ত শ্রমিক এলাকা দখল করে। 'রয়টারের' বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ এখন ভল্‌গা দখল ও রক্ষার যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। জার্মান বিমানবহর আরও নূতন বিমান আনিয়া নদীর উপর প্রবল আক্রমণ চালাইতেছে। জার্মানরা আরও নূতন সৈন্য আনিয়া ফেলিতেছে এবং শ্রমিক বস্তি এলাকা হইতে ভল্‌গা অতিক্রমের চেষ্টা করিতেছে। মস্কো রেডিও যোগে জানা যায় যে, কৃষ্ণসাগরোপকূলে নোভোরোসিস্কের দক্ষিণ-পূর্বে জার্মানরা সামান্য অগ্রসর হইয়াছে এবং সোভিয়েট সৈন্যেরা তুমুল হাতাহাতি যুদ্ধের পর দুইটি জনপদ ছাড়িয়া আসিয়াছে।

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, জার্মানরা তুমুল যুদ্ধের পর স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম এলাকা অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। নভোরোসিস্কের দক্ষিণ-পূর্বে জার্মানরা সামান্য অগ্রসর হইয়াছে এবং সোভিয়েট সৈন্যেরা দুইটি জনপদ ছাড়িয়া আসিয়াছে।

২৪শে অক্টোবর

মিশর রণাঙ্গন—ব্রিটিশ অষ্টম আর্মি গত রাত্রে এল আলামেনে প্রবল আক্রমণ সুরু করে।

রাবাউলে মিত্রপক্ষের বিমান বাহিনীর আক্রমণে দশখানি জাপ জাহাজ জলমগ্ন অথবা ঘায়েল হইয়াছে।

২৬শে অক্টোবর

ভারতবর্ষ—সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, গতকল্য চট্টগ্রামের বিমান ঘাঁটি এবং উত্তর-পূর্ব আসামের কয়েকটি বিমান ঘাঁটির উপর শত্রু বিমান হানা দিয়াছিল। ফলে সামান্য সংখ্যক লোক হতাহত হয়, ক্ষতিও অল্প হয়। আজ প্রাতে উত্তর আসামের একটি বিমান ঘাঁটিতে জাপ বিমান হানা দিয়াছিল।

১১ই অক্টোবর

সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্সকে সিন্ধুর গভর্নর গতকল্য পদত্যাগ করিতে বলেন। তিনি পদত্যাগ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে গভর্নর তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি মিঃ আল্লাবক্স 'খান বাহাদুর' এবং 'ও বি ই' উপাধি ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গভর্নরের আস্থা হারাইয়াছেন। গভর্নরের এই সিদ্ধান্তের ফলে সিন্ধুর আরও তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন।

টাঙ্গাইলের সংবাদে প্রকাশ, গত ৮ই অক্টোবর রাত্রে টাঙ্গাইল দেওয়ানী আদালতের নাজারতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু আগুন সঙ্গে সঙ্গে নিভাইয়া ফেলা হয়।

১২ই অক্টোবর

"বে-আইনী এবং ধ্বংসমূলক কার্য করার জন্য" মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা, মহিষা দল, তমলুক, নন্দীগ্রাম এবং পাঁশকুড়া থানার অধিবাসীদের উপর ১৫ হাজার হইতে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে। ভগবানপুর থানার বীরসিংহপুর, ঈশ্বরপুর এবং হরিপুর এই তিনটি মৌজার প্রত্যেকটির অধিবাসীদের উপর তিন হাজার টাকা করিয়া পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে।

পুলিশ হুবলীতে (বোম্বাই) তিনটি বাড়িতে খানাতল্লাসী করিয়া একটি দেশী বোমা, একটি দেশী রিভলভার, কয়েকটি কার্তুজ এবং কিছু বারুদ উদ্ধার করিয়াছে।

১৩ই অক্টোবর

গতকল্য ঢাকায় গোলক পাল লেনে জেলা গোয়েন্দা বিভাগের একজন ওয়াচার কনেস্টবলকে ছোরা মারা হয়। লোকটি অদ্য মিটফোর্ড হাসপাতালে মারা গিয়াছে। পুলিশ উক্ত এলাকা পরিবেষ্টন করে এবং বহু বাড়ি তল্লাসী করে। ২৪জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বর্ধমান জেলার কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীদের উপর ১৫ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে। ঐ সকল গ্রামের বাসিন্দাদের ধ্বংসমূলক কার্যের ও অগ্নিকাণ্ড ঘটাইবার ফলে জামালপুরগঞ্জ রেল স্টেশনের, জামালপুর ডাক ঘরের এবং জামালপুর থানার ক্ষতি হওয়ার অভিযোগে এই পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে।

বে-আইনী ও ধ্বংসমূলক কার্যকলাপের অভিযোগে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানার কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীদের উপর ১০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য হইয়াছে।

তেজপুর সংবাদে প্রকাশ যে, ২০শে সেপ্টেম্বর তেজপুর জেলায় গুলী চালনার ফলে এ পর্যন্ত ১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তেজপুরে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে। গোহাটীর সংবাদে প্রকাশ যে, আসাম জাতীয় মহাসভার সভাপতি শ্রীযুত নীলমণি ফুকন জোড়হাটে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

সিউড়ীর স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট ভারতরক্ষা বিধানানুসারে রবীন্দ্রনাথ ঠকুরের দৌহিত্রী শ্রীমতী নন্দিতা দেবী এবং শ্রীমতী সুমিত্রা সেন ও ৬ জন যুবকের প্রত্যেককে ৬ মাস কারাদণ্ড ও একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। শ্রীমতী নন্দিতা দেবী ও শ্রীমতী সুচিত্রা সেনকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যুবকগণকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

১৪ই অক্টোবর

ভাগলপুর জেলার কতিপয় গ্রামে ৭৫ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য হইয়াছে। পাটনা জেলার ফতোয়া অঞ্চলের গ্রামসমূহে মোট ১০ হাজার অনুরূপ পাইকারী জরিমানা ধার্য হইয়াছে।

বারাণসী জেলায় ধামাপুর থানার অধীন ৫৪খানি গ্রামের অধিবাসীদের উপর ৫০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য হইয়াছে।

হুগলীর সংবাদে প্রকাশ, আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার এলাকাধীন দেবখণ্ড পোস্ট অফিসের কাগজপত্র এক জনতা কর্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছে এবং হুগলী জেলার কতকগুলি ইউনিয়ন বোর্ড, ঋণশালিসী বোর্ড এবং একটি খাসমহল কাছারীর রেকর্ড ও কাগজপত্রাদি ভস্মীভূত হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য নির্মিত একটি শিবিরও ভস্মীভূত হইয়াছে।

দিল্লীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্মে এক আদেশ দিয়াছেন যে, কোন শোভাযাত্রায় দশ জনের অধিক লোক যোগদান করিতে পারিবে না। উক্ত আদেশ অমান্য করিয়া গত ২০শে সেপ্টম্বর একটি শোভাযাত্রা বাহির করিবার অপরাধে লক্ষ্মীরাম ও শিবকুমার নামক দুই ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। এই শোভাযাত্রায় এগারটি গর্দভ ছিল। তাহাদিগকে হাজত হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই এগারটি গাধার মাথায় শোলার টুপী পরাইয়া দেওয়া হয় এবং উহাদের এক একটির বুকে শাসন পরিষদের এক একজন সদস্যের নাম অঙ্কিত ছিল।

১৫ই অক্টোবর

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব মন্ত্রী মিঃ বি গোপাল রেড্ডি ভারতরক্ষা বিধানে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

উড়িষ্যা পরিষদের ডেপুটি স্পীকার শ্রীযুত নন্দকিশোর দাসকে ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে।

গতকল্য পাটনা জেলার ফতোয়ার নিকট এক গ্রামে বোমা বিস্ফোরণের ফলে দুইজন লোক আহত হইয়াছে।

বোম্বাই হাইকোর্টের প্রোটোনোটারীর রেকর্ড রুমে কিছু রাসায়নিক দ্রব্যপূর্ণ একটি ছোট টিনের বাক্স পাওয়া যায়।

১৬ই অক্টোবর

ভাগলপুরের সংবাদে প্রকাশ যে, ভাগলপুর জেলায় সম্প্রতি রাজনৈতিক হাঙ্গামার সময় জনতা প্রায় ৯০টি পোস্ট অফিসে হানা দেয়। জনতা ৬০টি পোস্ট অফিসের নথিপত্র পোড়াইয়া দিয়াছে এবং সাবোর ও জামদহের পোস্ট অফিস দুইটি ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার ফলে প্রায় ৩৩ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

১৭ই অক্টোবর

বোম্বাই—গত রাত্রিতে সাহারন ট্রড়ী থানা প্রাঙ্গণে আর একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের ফলে একজন লোক আহত হইয়াছে।

গতকল্য চুঁচুড়া, বর্ধমান, কুষ্টিয়া, কান্দি, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী প্রভৃতি অঞ্চলে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা হইয়া গিয়াছে। ফলে বিভিন্ন স্থানে বহু ঘর বাড়ি পড়িয়া গিয়াছে এবং সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। চুঁচুড়ায় দুইজন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে। বর্ধমান ও চুঁচুড়ায় ইলেকট্রিক তারের ক্ষতি হইয়াছে।

২০শে অক্টোবর

গতকল্য কিশোরগঞ্জে একটি মসজিদের নিকট এক জনতা দুর্গাপ্রতিমাসহ এক মিছিলে বাধা দেওয়ায় পুলিশ জনতার উপর গুলী চালায়। ফলে দুইজন নিহত ও ১৪ জন আহত হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত শিবনাথ ব্যানার্জি কলিকাতায় ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

দেশ

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ২১শে কার্তিক, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 7th November, 1942. [৫১শ সংখ্যা

নাচুক তাহাতে শ্যামা—

বাঙলার বীর সন্তানের বাণী—"চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান নাচুক তাহাতে শ্যামা। বাঙালী এ বৎসরে নূতন রকমে কালী পূজা করিবে। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, ইহার পরও হৃদয়ে যেটুকু শান্তি বাকী ছিল প্রলয় ঝঞ্ঝার তান্ডবতালে তাহাও বিচূর্ণ করিয়া বাঙলার বুকে শ্যামমায়ের নাচ আরম্ভ হইয়াছে। মেদিনীপুর এবং ২৪-পরগণার উপর দিয়া গত ১৬ই এবং ১৭ই অক্টোবর যে ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া যায়, তাহার সম্বন্ধে সম্প্রতি বাঙলা সরকার একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। এই বিবৃতি আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছে। এত বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাঙলা দেশে আর কোন দিন ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। ১৮৬৪ সালের ঝড়ের কথা বাঙলায় প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। গত বৎসরেও বরিশাল ও নোয়াখালির উপর দিয়া যে ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া যায় তাহাও সে অঞ্চলের অশেষ ক্ষতিসাধন করে; কিন্তু এক মেদিনীপুর জেলাতেই দশ হাজার লোকের প্রাণহানি, ঝড়ের এমন ধ্বংস লীলা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে; ইহার উপর ২৪-পরগণা জেলাতেও ক্ষতির পরিমাণ কম নয়। সেখানেও হাজার লোকের প্রাণ গিয়াছে। প্রাণহানি সম্বন্ধে এই যে সরকারী খবর ইহাও সঠিক বলিয়া মনে হয় না; কারণ সম্পূর্ণ সংবাদ এখনও সংগৃহীত হয় নাই; ক্রমে খবর আরও পাওয়া যাইবে। প্রাণহানি যেখানে এত বেশী, সেখানে ঘরবাড়ীর ক্ষতি, গৃহপালিত পশুর ক্ষতি যে কত ঘটিয়াছে, তাহা বলিয়াও বোধ হয় শেষ করা যায় না। উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই। শীত আরম্ভ হইয়াছে, আবহাওয়াও দুর্যোগপূর্ণ, ইহার মধ্যে হাজার হাজার স্বজন বিয়োগ ব্যথায় উন্মত্তপ্রায় নরনারী আশ্রয়-হীন। তাহাদের মাথা রাখিবার জায়গা নাই। এমন একটি গাছও নাই, যাহার নীচে তাহারা মাথা গুঁজিবে। উপরে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, নীচে বন্যার জল। মা তাহার ছেলে হারাইয়া, ভগ্নী তাহার ভাই হারাইয়া, পত্নী তাহার স্বামীকে হারাইয়া এই কাদায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। কেমনে বলিব এই দুঃখের কথা, বলিবার ভাষা আমাদের নাই। লেখনী অচল হইয়া পড়িতেছে। দেশবাসী, দেখ, আমাদের শ্যামা মায়ের এই নূতন রূপ দেখ। বঙ্কিমচন্দ্র তো দেখাইতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু দেখিয়াও আমরা দেখি নাই। এসো এইবার নয়ন ভরিয়া দেখি, মানুষের প্রাণ যদি আমাদের থাকে, এ দৃশ্য দেখিয়া চঞ্চল হইবই। এমন সকলহারা সর্বনাশকরা দেবতার ডাকে ক্ষুদ্র স্বার্থের অচলায়তনেও নাড়া পড়িবেই। সেই আশা যে আমাদের বড় আশা। সেই আশাতেই দেশবাসীকে আজ ডাকিতেছি, উঠ, জাগো, মায়ের পূজায় অগ্রসর হও। আর বসিয়া থাকিবার সময় নাই। বিপন্ন ভ্রাতা-ভগিনীকে রক্ষা করিবার জন্য নিজেদের সর্বস্ব নিবেদন কর, মায়ের পূজার সার্থকতা তো সেইখানে। আজ মা পূজা চাহিতেছেন। সহস্র সহস্র দুর্গত নরনারীর কণ্ঠ হইতে তাঁহারই আর্তনিনাদ দিক্‌মন্ডল আপূরিত করিতেছে। বুভুক্ষায় আজ তিনি অতিবিস্তর বদনা জিহ্বাললনভীষণা—শুষ্ক মাংসাতিভৈরবা। মা আজ কঙ্কালমালিনী কপালিনী। এক মুঠা অন্ন মুখে দিবার আগে একবার চিন্তা কর মসীবর্ণা মায়ের সেই মলিন মুখ। দোহাই তোমাদের, শবাসনা দিগ্বসনা আমার শ্মশানবাসিনী শ্যামামায়ের সেই মুখের দিকে তোমরা সকলে একবার তাকাও। আজ আহ্বান করিতেছি বাঙলার যুবক দলকে, তাঁহারা নিজেদের কর্মশক্তি দুর্গকের সেবার জন্যই উদ্বুদ্ধ করুন। আজ আমাদের আবেদন দেশের যাঁহারা ধনী তাঁহাদের দুয়ারে, তাঁহারা আগাইয়া আসুন দীন নারায়ণের সেবা করিয়া তাঁহাদের ধন সার্থক করুন প্রলয় অনলে যিনি নূতন সৃষ্টির উদ্বোধন করেন, যাঁহার খড়্গের আঘাতের অবসন্ন অন্তরেও নবশক্তি জাগ্রত হয়, আজ আমরা বেদনার্দ্র অন্তরে তাঁহাকে বন্দনা করিতেছি, জননী তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক, করুণাময়ী তুমি, নিঃশেষে আমাদের সর্বস্ব আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ের রক্তশতদলে তোমার অর্ঘ্য রচনা কর।

বিপন্নের সাহায্য

বাঙলার অর্থসচিব ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষিসচিব ঢাকার নবাব বাহাদুর, বর্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ এস কে হালদার এবং রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বি আর সেন মহাশয় মেদিনীপুর জেলার কাঁথী, তমলুক, মহিষাদল প্রভৃতি ঝটিকা বিধ্বস্ত অঞ্চলে বিপন্ন জনগণের সাহায্য ব্যবস্থা করিবার জন্য গমন করেন। তাঁহারা সহায্যের জন্য বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত

হইয়াছে। বাঙলার মন্ত্রিগণ বিপন্ন অঞ্চলে গিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই সংবাদে আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। গত ১৭ই অক্টোবর মহাসপ্তমীর দিন এই ঝড় হয়; সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যা গভর্নমেন্ট এ সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন; কিন্তু বাঙলা সরকারের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে প্রথম বিবৃতি পাওয়া যায়, ২রা নভেম্বর এবং সেই বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ৩রা তারিখে, অর্থাৎ দুর্ঘটনার একপক্ষেরও পরে। প্রথম ঝড়ের সংবাদটি পরোক্ষভাবে একটি সংবাদে জানা যায়। সংবাদটি এই মর্মে ছিল যে, ২৫শে অক্টোবর তারিখে মেদিনীপুর জেলার প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণের একটি ডেপুটেশন প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব ও রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সাক্ষাৎ করেন। মেদিনীপুর জেলার ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্য কার্য কিভাবে পরিচালিত হইতে পারে তাহাই ডেপুটেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিপন্ন অবস্থা সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। সরকারী কার্য কতকগুলি বাধা নিয়ম-কানুনের ভিতর দিয়া চলে এবং সে জন্য বিলম্বও ঘটে। এ সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহই অগ্রণী হইয়া থাকে; সংকটের প্রথম সাহায্য দিবার দায়িত্ব তাহারাই বহন করে। কোথায় কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এবং কি রকমের সাহায্য প্রয়োজন হইবে যদি দ্রুত প্রকাশিত হইত তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের ব্যবস্থা হইত এবং দুঃস্থ নরনারীর দুঃখকষ্টের অনেক লাঘব হইত। বি এন রেলওয়ের কোন ট্রেন উলুবেড়িয়ার ওধারে যাইবে না, এ খবর দেওয়া গেল, টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া লাইন খারাপ হইয়াছে ইহাও জানান চলিল; কিন্তু ঝড়ের কথাটা সেই সঙ্গে প্রচারিত হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন দিক হইতে যে কি বিপর্যয়ের কারণ ঘটিত, আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সরকারী সংবাদ-নিয়ন্ত্রণের কর্তারাই তাহা বলিতে পারেন। এখনও কোথায় কতটা ক্ষতি হইয়াছে আমরা সে খবর পাই নাই এবং গভর্নমেন্ট হইতে মেদিনীপুরের বিপন্ন নরনারীদিগকে সাহায্য করিবার কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, সাক্ষাৎ সম্পর্কে বাঙলা সরকারের নিকট হইতে এ পর্যন্ত সে সম্বন্ধেও বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে যে অতি সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের উদ্বেগ দূর হইতেছে না। বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়া এ সম্বন্ধে উদ্বেগ দূর করা সরকারের পক্ষে কর্তব্য। এ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য কলিকাতায় জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্যোগে অবিলম্বে একটি জনসভা আহ্বান করাও সরকারের উচিত। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এতদিন পরে দুর্গতদের সাহায্যার্থ একটি আবেদনপত্র প্রচার করিয়াছেন এবং সেই আবেদনে দেশের সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই কার্যে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইয়াছে। হিন্দু মহাসভা, রামকৃষ্ণ মিশন, মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং অন্যান্য কয়েকটি সেবা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই সাহায্য কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন; বাঙলার সাংবাদিকগণ দুর্গত-পীড়িতের রক্ষার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। "আনন্দবাজার" এবং "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের" পক্ষ হইতে একটি সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। সকল দিক হইতে ব্যাপক ব্যবস্থার প্রয়োজন রহিয়াছে। এবং সাহায্যকার্যের সেই ব্যবস্থা সার্থক করিতে হইলে যাঁহারা সেবাধর্মী, এই সব কাজে অন্তরের যাহাদের টান আছে, তেমন লোকের প্রয়োজন। শুধু কর্তব্য সম্পাদনের নিক্তির ওজনে এমন সব কাজ চালে না, মন-প্রাণ একেবারে ঢালিয়া দিতে হয়। মেদিনীপুরের যে সকল জনসেবক কর্মীকে আটক রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে এই সময় মুক্তি দিলে সাহায্য-কার্যে সেই দিক হইতে বিশেষ সহায়তা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

দেশের অন্নসংকট—

দেশের অন্নসংকট উত্তরোত্তর গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মহার্ঘ্যতার জন্য শহরবাসীদের সংকট তো আছেই, কিন্তু মফঃস্বলবাসীদের সংকট তাহার চেয়ে অনেক বেশী। বাঙলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে চাউলের মূল্য ১৫ টাকা হইতে ১৮ টাকা মণ পর্যন্ত উঠিয়াছে। ময়মনসিংহ এবং কুমিল্লা হইতে খাদ্যাভাবের জন্য জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশার সংবাদ আমরা সব সময় পাইতেছি। সরকার খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা যে কিরূপ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে, শহরে থাকিয়া আমরা চিনি ও চাউলের ক্ষেত্রে প্রতিদিনই তাহার পরিচয় পাইতেছি; মফঃস্বলে এ সম্বন্ধে বিপর্যয় সর্বত্র এবং ষোল আনা রকমে। যে যেমন করিয়া প্যারিতেছে গরীবের ঘাড় মটকাইয়া রক্ত চুষিতেছে—কসুর করিতেছে না। লাভখোর আড়তদারেরা স্বচ্ছন্দে লাভের ব্যবসা চালাইতেছে, খুচরা দোকানেরাই দুই-একজন পুলিশের হুমকি খাইতেছে মাত্র। সরকার ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরায় সম্প্রতি ৭৫ হাজার মণ চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য অতি সামান্য এবং এই সাহায্যও গ্রাম অঞ্চলের গরীবদের কতটা কাজে আসিবে আমরা জানি না। যাহাদের টাকাপয়সা আছে, তাহারাই হয়ত অপকৌশল প্রয়োগে এই সুবিধা গ্রহণ করিবে। শুনিতেছি, ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই চাউল পৌঁছিবার ফলেই হউক কিংবা পৌঁছিবার সম্ভাবনার ফলেই হউক, চাউলের দাম পনেরো টাকা হইতে মণ প্রতি দশ টাকায় নামিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ঐ অঞ্চলে চাউল ছিল, বজার মন্দা পড়িবে, এই ভয়ে সেই চাউল এখন ছাড়াতেই দর এতটা নামিয়াছে; কিন্তু লাভখোরদের হাতে কৌশল আছে নানারকম; তাহারা অবস্থাটা নিজেদের অনুকূলে ঘুরাইয়া লইবার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করিবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হৈমন্তিক ধান্য বাজারে দেখা দিবে; কিন্তু সরকারের নিয়ন্ত্রণ-নীতি যদি সরবরাহ ব্যবস্থার দ্বারা সুপরিচালিত না হয়, তবে উৎপন্ন শস্যও যে গরীবের আশু ক্ষুন্নিবৃত্তির কতটা সাহায্য করিবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে। চিনির অভাব মিটাইবার জন্য সরকার কলিকাতায় যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণের সমস্যা যে মিটে নাই, একথা আমরা বহুবার বলি-

য়াছি। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, বাঙলাদেশের কারখানাসমূহে যে চিনি মজুত আছে, তাহার অর্ধেক পরিমাণ সরকারী নিয়ন্ত্রিত দরে বাজারে ছাড়িবার জন্য বাঙলা সরকার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই কর্মপ্রণালীর কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমরা এখনও কোন কথা বলিতে পারিতেছি না। আমাদের মনে হয়, বিহার হইতে চিনি আমদানীর উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিতে পারিলে শুধু বাঙলাদেশের চিনির কারখানার মজুত চিনির আধাআধি বণ্টন করিয়া সমগ্র প্রদেশের শর্করা সমস্যার কিছুই সমাধান হইবে না। অন্নসংকট, বস্ত্রসঙ্কট এবং অর্থসঙ্কটের এই দিনে ঝড়ের জন্য বাঙলাদেশের কোন কোন অঞ্চল, বিশেষভাবে বর্ধমান এবং মেদিনীপুরের জনসাধারণের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করিয়াছে। আমরা জানিতে পারিলাম, বাঙলা সরকারের সিভিল সাপ্লাই বিভাগ হইতে বিপন্ন অঞ্চলের দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য ২০ হাজার মণ চাউল এবং সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণ দাউল, চিঁড়া এবং গুড় পাঠাইবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। এ ব্যবস্থা মন্দ নয় ; কিন্তু সমগ্র দেশের ব্যাপক সমস্যার ইহাতে সমাধান হইবে না। এই সম্পর্কে পূর্ব হইতেই একটা কথা সরকারকে আমরা জানাইয়া রাখিতেছি। হৈমন্তিক ধান্যের ফসল কিছুদিনের মধ্যেই গৃহস্থের ঘরে উঠিবে। বাঙলা সরকারের অর্থসচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে এই ভরসা দিয়াছিলেন যে, এবার যে ধান্য উৎপন্ন হইবে, তাহাতে বাঙলা দেশের অভাব মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত দাঁড়াইবে ; কিন্তু সরকারী পূর্বাভাষে দেখা যাইতেছে অবস্থা ততদূর সন্তোষজনক নয়। গত বৎসরের চেয়ে এবার উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ একটু বেশী এই মাত্র। এই শস্য বাঙলার পক্ষে উদ্বৃত্ত তো হইবেই না, বরং আগামী বৎসরে আশ্বিন কার্তিক মাসে চাউলের বাজারে টান পড়িবার সম্ভাবনা ষোল আনাই থাকিবে। বাঙলার অভাব বর্তমানে নিদারুণ, এরূপ অবস্থায় এক গোটা ধানও যেন বাঙলার বাহিরে না যাইতে পারে। বাঙলা দেশকে আগে বাঁচিতে হইবে, তৎপরে অন্য প্রদেশকে সাহায্যের কথা।

পয়সার অভাব—

খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব, ইহার উপর পয়সার অভাব লোকের দুঃখদুর্দশা আরও দুরন্ত করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতা শহরে পয়সার অভাব দেখা দিবার বহু পূর্বেই বাঙলাদেশের মফঃস্বলে সে অভাব দেখা দেয়। এইঅভাব কেন ঘটিল, আমরা জানি না ; শুনিতেছি, তামার দর বাড়িয়া যাওয়াতে এক টাকায় যে পয়সা পাওয়া যায়, তাহার মূল্য এক টাকার ওজন দরে বেশী বলিয়া, পয়সা গলাইয়া তামা বিক্রয় করা একটা ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার ফলেই এই সঙ্কট। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে যেদিক দিয়া পারে নিজেদের কাজ বাগাইবার তালে আছে, মরিতেছে গরীবেরা। একটি আনি না হইলে বাজারে জিনিস কিনিবার উপায় নাই ; এরূপ অবস্থায় কয়েক খন্ড তাম্র মুদ্রাই দিনে যাহাদের সম্বল তাহারা নুন তেলটুকু পর্যন্ত কিনিতে পারিতেছে না। ট্রাম কোম্পানী এতদিন পরে কুপন বাহির করিবার ব্যবস্থা করিয়া সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হইয়াছেন। এ ব্যবস্থা মন্দের ভাল ; কিন্তু ইহাও বিশেষ সন্তোষজনক ব্যবস্থা নয়। বিস্ময়কর বিষয় এই যে, অবস্থার এই শোচনীয়তাতেও গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইতেছে না। তামার অভাব যদি সত্যই হইয়া থাকে এবং এক পয়সার বিনিময় মুদ্রা হিসাবে তামার ব্যবস্থা করা না যায়, তবে অন্য যে কোন ধাতুই ব্যবস্থা করা হউক না কেন। তামার বদলে লোহাতেও দেশের লোকের কোন আপত্তি নাই ; তাহাদের পয়সার প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই তাহারা বাঁচে।

ভারত সম্বন্ধে উইল্কী—

মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মুখপাত্র মিঃ উইল্কী সেদিন মার্কিনবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বেতারযোগে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। মিঃ উইল্কীর এই বক্তৃতাটি সম্পূর্ণভাবে এদেশে প্রকাশিত হয় নাই। "নিউইয়র্ক পোস্ট" পত্রের প্রসিদ্ধ লেখক মিঃ স্যামুয়েল গ্রাফট এই বক্তৃতার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, উইল্কীর এই বক্তৃতায় বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহে এবং ব্রিটিশ জনগণের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। এমন অকস্মাৎ ক্রন্দনের রোল উঠিবার কারণ কি ? উইল্কীর বক্তৃতার মধ্যে এমন কি ছিল। উইল্কীর বক্তৃতার যে অংশ আমরা এদেশে পাইয়াছি, তাহাতে দেখা যায় উইল্কী একটা কথা বলিয়াছেন তাহাই বোধ হয়, ব্রিটেনে ক্রন্দনের রোল উত্থানের কারণ ঘটাইয়াছে। তিনি বলেন,—"ভারতবর্ষ আমাদেরই সমস্যা। এই বিশাল দেশ যদি জাপান কর্তৃক অধিকৃত হয়, তাহা হইলে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইব।" এই মন্তব্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য উইল্কী ফিলিপাইনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলেন,—"যে অর্থে ভারতবর্ষ আমাদিগের সমস্যা সেই অর্থে ফিলিপাইন ব্রিটিশের পক্ষে সমস্যার বিষয়। ফিলিপাইনের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি আমরাই দিয়াছি, অস্ত্রবলের দ্বারা সে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে যদি আমরা না পারি, তাহা হইলে সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিপদাপন্ন হইবে। যে সকল জাতির নিকট আমরা গিয়াছি, তাহাদের সকলেরই সদিচ্ছার ভান্ডারে ছিদ্র দেখা দিয়াছে। আমরা যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারি নাই, তাহাই আমাদের বন্ধু হারাইবার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" ভারতীয় সমস্যা আজ আর একমাত্র ব্রিটেনের সমস্যা নয় ; ঐ সমস্যা ইংরেজের ঘরোয়া ব্যাপার, সুতরাং ইংরেজ যাহা খুসি করুক, ইহা বলিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না ; পরন্তু ইহার সমধানে মার্কিনেরও বিশেষ দায়িত্ব আছে। উইল্কীর উক্তির এই অংশটাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মনে চাঞ্চল্যের কারণ ঘটাইয়াছে। এই চাঞ্চল্যে উইল্কীর মন্তব্যের মধ্যে যে সে মন্তব্য ফলপ্রসূ হইবার মত শক্তিও রহিয়াছে ইহার সূচনা করিতেছে।

ক্রীপস প্রস্তাব সম্বন্ধে লুই ফিশার—

আমেরিকার বিখ্যাত সাহিত্যিক মিঃ লুই ফিশারের নম অনেকেই অবগত আছেন। কয়েক মাস পূর্বে ইনি ভারত ভ্রমণের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে ইঁহার কয়েকটি কথা মার্কিন জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। নিউইয়র্কের 'নেশন' পত্রে ইঁহার লিখিত 'ক্রীপস প্রস্তাবের ব্যর্থতার কারণ'

শীর্ষক প্রবন্ধটি সম্পূর্ণভাবে সম্প্রতি আমরা পাইয়াছি। ইহাতে ক্রীপস দৌত্যের অন্তর্নিহিত অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে মিঃ ফিশার বলেন,—"ক্রীপস কংগ্রেস নেতাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, প্রকৃত জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার অধিকার তাঁহারা লাভ করিবেন এবং বড়লাটের ভিটো করিবার ক্ষমতা আর থাকিবে না।" তিনি সামন্ত নৃপতিদিগকে জানান যে, যুদ্ধের পর ইংরেজের কর্তৃত্ব ভারতের উপর থাকিবে না ইহা একরূপ স্থির হইয়াই গিয়াছে; সুতরাং স্বাধীনতাবাদীদের অনুকূলেই তাঁহাদের রাজকীয় তরণীগুলিতে পাল তোলা ভাল হইবে। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেণ্ট মিঃ আর আর হেডো, কেন্দ্রীয়-ব্যবস্থাপরিষদের শ্বেতাঙ্গ দলের মুখপাত্র স্যার হেনরী রিচার্ডসন, শ্বেতাঙ্গ সভার প্রেসিডেণ্ট মিঃ লসন প্রমুখ শ্বেতাঙ্গ বণিক দলকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস বলেন, এতদিন তাঁহারা যেসব বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, ভবিষ্যতে তাঁহারা সেগুলি আর ভোগ করিতে পারিবেন না। শ্বেতাঙ্গ বণিকগণ স্যার স্ট্যাফোর্ডের এই কথায় চঞ্চল হইয়া উঠেন। তাঁহারা সিমলার কর্তাদের কাছে ইহার প্রতিবাদ করেন এবং তারযোগে মিঃ উইনস্টন চার্চিলের কাছে তাঁহাদের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ যায়। সামন্ত নৃপতিগণও ঐরূপ ভারতস্থ ব্রিটিশ রাজপুরুষদের কাছে ও অন্যত্র প্রতিবাদ উত্থাপন করেন এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রতিকূল ভাব জ্ঞাপন করেন। ইহার পরেই স্যার স্ট্যাফোর্ডের সুর একেবারে ঘুরিয়া যায়। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মামুলী সুর ধরেন এবং সাম্প্রদায়িকতার যুক্তি উপস্থিত করেন। অথচ এতকাল পর্যন্ত তিনি আলোচনার কোন ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন উত্থাপন করা দরকারও বোধ করেন নাই। তখন ক্রীপস বলেন, জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারাই সে গভর্নমেণ্ট নিয়ন্ত্রিত হইবে—সুতরাং হিন্দুদের প্রাধান্য ঘটিবে। তাঁহার যুক্তি যদি মানিয়া লইতে হয়, তবে ইহাই দাঁড়ায় যে, ভারতবর্ষ কোনদিনই স্বাধীনতা পাইবে না এবং কোনদিন ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিবে না। অথচ এই ক্রীপসই ১৯৪০ সালে ভারত পরিদর্শন করিয়া হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মতিগতির নিন্দাবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মতিগতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে "ভারতের স্বাধীনতা বিরোধী মোসলেম লীগের দলই প্রশ্রয় পাইতেছে।" মিঃ লুই ফিশার ক্রীপসের এই শোচনীয় অধঃপতনের জন্য দুঃখ করিয়াছেন। আমরা ভারতবাসী, আমাদের পক্ষে এ অভিজ্ঞতা নূতন কিছুই নয়। আমরা জানি, ভারতের ব্যাপারে কর্তৃত্ব হাতে না পাওয়া পর্যন্তই তথাকথিত ভারত-হিতৈষী ব্রিটেনের বক্তৃতাবাজী চলে এবং সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত বাস্তব স্বার্থের সঙ্ঘাতে সে হিতৈষণা কর্পূরের মত উবিয়া যায়। ভারতের ভাগ্য ভারতবাসীদিগকেই গঠন করিতে হইবে; পরের অনুগ্রহে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবে না।

আম্বেদকরের আস্ফালন—

ভারতবাসীদের সঙ্গে আপোষ নিষ্পত্তি করিবার পক্ষে আমেরিকায় আন্দোলন হইতেছে, ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ তাহাতে বিচলিত হইয়াছেন; কিন্তু তাহার চেয়েও বেশী উত্তেজিত হইয়াছেন দেখা যাইতেছে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পরিচালক রাজনীতিকদের অনুগত যে ভারত গভর্নমেণ্ট, সেই ভারত গভর্নমেণ্টের অনুগত চাকুরীয়া ডাক্তার আম্বেদকর। ডাক্তার আম্বেদকর বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থার শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে। ছি ছি, এমন ভিক্ষাবৃত্তি বড়ই লজ্জাকর। ভারতবাসীরা যাইতেছে আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের কাছে আবেদন করিতে। আমেরিকার নিজের ঘরেই কত দোষত্রুটি রহিয়াছে। নিগ্রো সমস্যা যেখানে মিটে নাই। আমেরিকার নিগ্রোদের জন্য ডাক্তার আম্বেদকরের এ বেদনার মানে আমরা বুঝি; ব্রিটিশ প্রভুদের একান্ত আনুরক্তি এবং সেই সূত্রে শাসন পরিষদের সদস্যস্বরূপে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের মহিমার পাছে হানি ঘটে—এ জন্যই তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিয়া রাখুন যে, আমেরিকার প্রেসিডেণ্টকে আক্রমণ করিলেই ভারতবাসীদের মনে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজনীতিকদের প্রতি আনুরক্তির স্রোত উথলিয়া উঠিবে না; কিংবা রাজনীতিক ক্ষেত্রে ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগের প্রেরণা পাইবার জন্যও দেশের লোক বড়লাটের শাসন-পরিষদের বর্তমান জ্ঞানী ও গুণীগণের কাছে যাইবে না। ইঁহাদের মর্যাদাবোধের মূল্য কি, দেশের লোকে তাহা ভালভাবেই বুঝিয়া লইয়াছে এবং দেশের মর্যাদা বজায় রাখা সম্বন্ধে তাঁহাদের এই ধরণের উপদেশ দেশের লোকের মনে বিরক্তিরই সঞ্চার করিয়া থাকে।

বিমান আক্রমণ ও দেশবাসী—

আসামে পর পর তিন দিন জাপানী বিমান হানা দিয়াছে। চট্টগ্রামেও একদিন হানা দিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গত বৎসর বিমান আক্রমণের আশঙ্কাতেই কলিকাতাবাসীদের আতঙ্ক দেখা দেয়া এবং শহর ত্যাগের জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ হয়। এবার কলিকাতায় বা বাঙলায় সেরূপ কোন আতঙ্কের সঞ্চার হয় নাই। ইহার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, গত বৎসর ভয়ে পড়িয়া কলিকাতা শহর ছাড়িয়া যাঁহারা বাহিরে গিয়াছিলেন, বিদেশে বিভূঁয়ে বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে ফিরিতে হইয়াছে। এবার বোমার ভয়েও তাঁহারা সেই দুঃখের ভিতর ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছেন না। ইহা ছাড়া, আক্রমণের প্রথম অবস্থায় লোকের মনে যতটা ভয় ছিল, এখন সে ভয় ভাঙিয়া গিয়াছে। ইহা একটা সুলক্ষণ বলিতে হইবে; কারণ এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত অনর্থ সৃষ্টি হইয়া থাকে অনেক ক্ষেত্রেই ভয়েরই জন্য, আক্রমণজনিত ক্ষতি ততটা হয় না। অন্যান্য স্থানের বিমান আক্রমণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ইহাই হইল অভিমত। নিরাপত্তার অজুহাতে ভয় সৃষ্টি না করিয়া বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য মনের দৃঢ়তা জাগানোই এক্ষেত্রে অধিক প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি।

হরিবংশ

(উপন্যাস)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
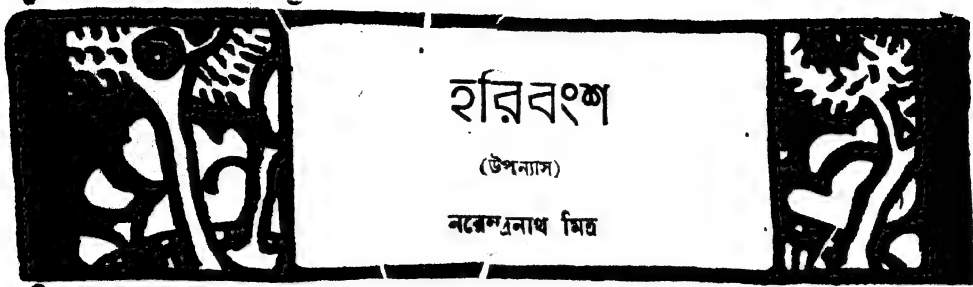
২

আচ্ছা বিলাতি নাম রেখেছে মেয়ের, সুবল মনে মনে মনে ভাবল। একটু পরে ললিতা যখন চা নিয়ে ঘরে ঢুকল তখন অবাক হয়ে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সুবল। শুধু বিলাতি নামই নয়, বিলাতি বেশও মেয়েকে মুরলী পরিয়ে ছেড়েছে। এত বড় মেয়ে কিন্তু তাকে এখনো ফ্রক পরিয়ে রেখেছে মুরলী। কিন্তু ফ্রক পরবার পর ললিতাকে আর মোটেই বড় মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না তো। মেয়ের বয়স কমাবার আচ্ছা ফন্দি ঠিক করেছে তো মুরলী। এই মেয়েকে শাড়ি পরালেই এক ধাড়ী মেয়ে ব'লে মনে হোত।

সুবলকে দেখে ললিতা লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে উঠল। তার চোখের দিকে চেয়ে ললিতার বুঝতে বাকি রইল না সুবল কি দেখছে কিই বা ভাবছে। তার বাবার খামখেয়ালীর জ্বালায় লোকের সামনে তার বের হবার জো নেই। অথচ লোকের সামনে যা প'রে বের হওয়া যায় তা পরে আবার তার বাবার কাছে বের হওয়া চলবে না। আচ্ছা বিপদে পড়েছে ললিতা। অথচ বাবা তাকে ভালোবাসে। ভালো এক হিসাবে সবাই বাসে ললিতাকে। তার দাদু, মা, পিসীমা, কেউ কম ভালোবাসে না তাকে। বাড়িতে আর কোন ছেলে মেয়ে নেই, তাই সবাইর সমস্ত আদর আর ভালোবাসবার জোয়ার তার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। ললিতার মোটেই ভালো লাগে না। তারা যদি শুধু ভালোবেসে, আদর ক'রে নিরস্ত হ'ত তাহ'লে কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু এদের প্রত্যেকে শুধু যে ললিতাকে ভালোবাসে তাই নয়, প্রত্যেকেরই ইচ্ছা ললিতাও যেন তাকে ভালোবাসে; তার কথা মত, তার পছন্দ মত যেন চলে, কিন্তু একজনের পছন্দের সঙ্গে আর একজনের পছন্দ মেলে না, অথচ ললিতাকে সকলের ইচ্ছার সঙ্গেই মিল রেখে চলতে হয়।

ললিতার আড়ষ্টতা লক্ষ্য ক'রে বুঝি একটু দয়া হোল মুরলীর। বলল, 'আচ্ছা তুই যা'।

ললিতা চ'লে গেলে মুরলী বলল, 'অমন হা' ক'রে কি দেখছিলে সুবলদা, তোমার চা যে গেল।'

সুবল চায়ের কাপটার দিকে একটু তাকিয়ে দেখল, কিন্তু এখনো তার উষ্ণতা কমেছে ব'লে মনে হোল না। একবার শহরে এক উকিলের বাসায় গরম চায়ে চুমুক দিয়ে তার খুব আক্কেল হয়েছিল। এখন চায়ের কথা শোনা মাত্রই রীতিমত অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল সুবলের। অত্যন্ত নিস্পৃহ ভাবে সুবল জবাব দিল, "তা যাক, কিন্তু মেয়েকে যে একেবারে মেম বানিয়ে ছেড়েছিস মুরলী।"

মুরলী একটু হাসল, 'কি করব, বউটাকে যখন কিছুতেই মেম বানানো গেল না, তখন ভাবলুম মেয়েটাকেই দেখা যাক ঘষে মেজে।'

সুবলের কোন তিরস্কার, কোন ব্যঙ্গ বক্রোক্তি যেন গায়ে মাখবে না মুরলী, সমস্তই সহজভাবে সে যেনে নেবে। তার এই হাসি, এই ধরণের ঠাণ্ডা মেজাজ সবচেয়ে দুঃসহ লাগে সুবলের। এর চেয়ে যদি চটে উঠত মুরলী, যদি গরম হয়ে তর্কবিতর্ক করত তা হলেও সুবলের যেন মান থাকত; কিন্তু মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে মুরলী যেন এই কথাই প্রমাণ করে দিল যে সুবলের সমালোচনায় কিছুই যায় আসে না তার। সুবলের কথাগুলি এত হাল্কা, এত ছেলেমানুষের মত যে তাতে মুরলীর কান না দিলেও চলে। সুবলকে যে সে দাদা বলে সেটা নিতান্তই, আসলে কোন আমলই যে দিতে চায় না সে সুবলকে এই কথাটাই যেন সে বুঝিয়ে দিতে চায়। মুরলীর এই নীরব অবজ্ঞার সামনে নিজেকে সুবলের নিতান্তই অসহায় মনে হ'তে থাকে। অথচ সুবলের চেয়ে অন্তত তিন চার বছরের ছোট হবে মুরলী। ছেলেবেলা থেকেই সে তাকে দেখে এসেছে। তবু কেন যে তার মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলতে পারে না সুবল, কেন যে তার তাচ্ছিল্য এমন নিঃশব্দে সে হজম ক'রে যায় তা সুবল নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। নিজের এই দুর্বল ভীরুতার জন্য নিজের ওপর তার রাগের অবধি থাকে না। অথচ সুবল সত্যি সত্যিই, আজকাল আর একটা কেউ কেটা নয়। ভিতরে যাই থাক, তার কারবার যে অনেকের চেয়েই ভালো চলছে বাজারের সকলেরই এ ধারণা আছে। পাড়ায় একজন সে অন্যতম মাতব্বর। দক্ষিণ পাড়ার বামুন কায়েতরা পর্যন্ত কোন কোন বিষয়ে আজকাল মাঝে মাঝে তার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে। সেই সুবল কিনা মুরলীর মত একটা লুচ্চা আর চালিয়াৎকে ভয় ক'রে চলে, মুখের ওপর কড়া ধমক ঝাড়তে পারে না, কেমন যেন থতমত খেয়ে ঘাবড়ে যায়। নিজের ওপরই দারুণ রাগ হয় সুবলের।

কেন এত ভয় করে সে মুরলীকে? ভয়? না ভয় ঠিক নয়। একে ভয় ঠিক বলা চলে না। ভয় কেন করতে যাবে সে মুরলীকে? কি ক্ষমতা আছে মুরলীর? কোন ক্ষতি করতে পারে সে সুবলের এমন কোন সাধ্য আছে তার? পাড়ার মধ্যে সব চেয়ে ঝানু আর কূটবুদ্ধির লোক হোল নবদ্বীপ। সে পর্যন্ত আজকাল সুবলকে সমীহ ক'রে চলে। আর তারই ছেলে মুরলীকে সুবল ভয় করবে? কিন্তু অদ্ভুত চালিয়াৎ ছেলে এই মুরলী। ইংরেজী স্কুলের চার পাঁচটা ক্লাস প'ড়ে

সে যেন বিদ্যা দিগগজ হয়েছে। থানা, কাছারি আদালত সব যেন তার নখদর্পণে। সবারই সঙ্গে সে সমান তালে চলতে চায়, সবারই সঙ্গে তার আলাপ, মাখামাখি, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, আদব-কায়দায় সে যেন ওদেরই একজন। কলকাতায় হরদম সে যাতায়াত করছে, টাকা উড়াচ্ছে, নিত্য নূতন ফ্যাসান শিখে আসছে, নানারকম দামী দামী আসবাবপত্র সে কিনে এনে বাড়ি বোঝাই করছে, এই জন্যই কি শিক্ষিত ভদ্রলোক উকিল, ডাক্তার মহলে মুরলীর এত আধিপত্য? দামী আর ধোপ দুরস্ত জামা কাপড় পরে, আর ভদ্রলোকের ভাষায় কথা বলে দেখেই কি সকলে তাকে তার বাপের চেয়েও বেশী সম্মান করে, এমন কি তার বাপও তাকে ভয় ক'রে চলে, আর এমন কি সুবলও?

'চলো হে সুবল, বেলা অনেক হয়ে গেছে,' নবদ্বীপ তার ময়লা ফতুয়াটা গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কাপড়ের নিচে লোহার চেনে ঝুলানো বড় বড় কয়েকটা চাবি ঝন ঝন ক'রে উঠল। হাঁটবার সময়ও এই চাবির শব্দ শোনা যায় নবদ্বীপের। সুবল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। যেন নবদ্বীপ তাকে সত্যিই বাঁচিয়েছে। কুটিল হোক, এই নবদ্বীপকে সুবল বুঝতে পারে। এর সঙ্গে বেশ মিশতেও পারে সুবল। বয়সের ব্যবধানে কিছু যায় আসে না। নবদ্বীপের সঙ্গে তার কারবারপত্র ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা চলে, নানা বিষয় সম্বন্ধে চলে মত বিনিময়, নবদ্বীপের সঙ্গে সমান তালে চলতে সুবলের মোটেই অসুবিধা হয় না। কিন্তু তার ছেলে মুরলীর সঙ্গে কিছুতেই যেন পেরে ওঠে না সুবল। সে তার কয়েক পাতার ইংরেজী বিদ্যা আর ধোপদুরস্ত জামা কাপড় নিয়ে যখন তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকায় তখন চিত্ত জ্বলে যেতে থাকে সুবলের, তবু মুখ দিয়ে কোন প্রতিবাদের ভাষা বেরোয় না।

নবদ্বীপের বাড়ির উত্তর দিকে বিঘা দেড়েক জমিতে ছোট একটু সুপারি আর নারকোলের বাগান। ভিটাটুকু নাকি ছিল নবদ্বীপের খুড়ো বৃন্দাবনের; তার মৃত্যুর পর নানা ফন্দি খাটিয়ে নবদ্বীপ জায়গাটুকুকে হাত ক'রেছে। বৃন্দাবনের বিধবা স্ত্রী বহু চেষ্টা ক'রেও তা উদ্ধার ক'রতে না পেরে মনের দুঃখে কোন এক বৈরাগীর কাছে গিয়ে ভেখ নিয়েছিল। সে অনেক দিনের কথা। তারপর নবদ্বীপের নিজ হাতে রোয়া নারকোল গাছ-গুলি এত বড় বড় হয়েছে যে সে সব গাছে উঠতে সকলে সাহস করে না সব সময়। এই বাগানের ভিতর দিয়েই বাড়ি থেকে বেরুবার পথ। তারপরেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা শুরু হয়েছে। সুবলকে সঙ্গে নিয়ে বাগানের ভিতর ঢুকে চার দিক একবার সন্তর্পণে তাকিয়ে নবদ্বীপ ফিস্ ফিস্ ক'রে জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর, বললে কিছু মুরলীকে? আচ্ছা ক'রে ধমকে দিয়েছ তো?' নবদ্বীপের এই ভঙ্গী দেখে সমস্ত শরীর যেন জ্বলে গেল সুবলের। সত্যি সত্যি যে রাগ নিয়ে এসেছিল সুবল তার একটুও যে মুরলীর সামনে প্রকাশ ক'রতে পারে নি এজন্য নিজেরই বিরক্তির সীমা ছিল না সুবলের। সুবল যে কিছুই বলতে পারে নি মুরলীকে, শাসনের জন্য একটি আঙুলও যে তুলতে পারে নি, নবদ্বীপ যে তা বুঝতে পেরেছে এ সম্বন্ধে কোন সংশয়ই নেই সুবলের। তবু নবদ্বীপ এমন ভাণ করছে কেন? সুবলের মনে হোল নবদ্বীপ নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছে। 'কি খুব তো চোটপাট ক'রে এসেছিলে, এখন কি হলো, একটা কথাও কি বলতে পারলে আমার ছেলেকে?' নবদ্বীপ কে যে তার ছেলে মানে না, অপমান করে, তাতে এখন আর কোন কথাটি নেই নবদ্বীপের, হবু মোড়ল সুবলকেও যে কোন কথাটি না ব'লে নাকাল হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে এতেই যেন নবদ্বীপের আনন্দ। সুবলের মনে হোল এই যে সন্তর্পণে নবদ্বীপের ফিস্ ফিস্‌ানি এ যেন সুবলকেই ব্যঙ্গ করা, সুবলের ব্যর্থ মাতব্বরিকেই মুখ ভেংচানো।

সুবল একটু কি ভাবল, তারপর বলল, 'ভেবেছিলাম বটে, যে বেশ একটু ধমকে দেব ছেলেটাকে, কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে, ওর কথাবার্তায় আলাপ ব্যবহারে মনেই হোল না যে ও আপনাকে মারতে পারে। অত অভদ্র ও হ'তেই পারে না জেঠামশাই, আপনি নিশ্চয়ই বাড়িয়ে বলেছেন। ওটা আপনার চিরকালের অভ্যাস। মুরলীকে কিন্তু আমার ভালোই লাগে জেঠামশাই। বেশ ছেলে, ভারি চমৎকার স্বভাব। কেবল চরিত্রটিই নেই, কিন্তু আর সবই আছে। আলাপ আপ্যায়নে ভদ্রতায়, বিদ্যায় বুদ্ধিতে গ্রামের মধ্যে কারো চেয়েই মুরলীকে খাটো বলতে পারবেন না। বরং সকলের সে ওপরেই থাকে এক কাঠি।' (ক্রমশ)

জীবজন্তুর ভাষা

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এস-সি

মানব-সভ্যতার যে ইতিহাস ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রথম অধ্যায় অধিকার করিয়া রহিয়াছে ভাষা। বস্তুত, ইহাকে আমরা সভ্যতার অগ্রদূত বলিতে পারি। অন্তরের অনুভূতিগুলি যে ছন্দবদ্ধ শব্দের সমাবেশে রূপায়িত হইয়া উঠে, যে শব্দের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় হইয়া থাকে, সেই ভাবপ্রকাশক ছন্দময় বাণীকে আমরা ভাষা নামে অভিহিত করিয়াছি। অস্থিকে ঘিরিয়া মাংস যেমন নশ্বর দেহ গড়িয়া তুলে, ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া অনুভূতিগুলি তেমনই সভ্যতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অঙ্গভঙ্গী এবং মুখাবয়বের বিভিন্ন পেশী সঞ্চালনের দ্বারা কিছু কিছু ভাব প্রকাশ করা যায় বটে, কিন্তু ভাষায় যেমনটি হয়, শুধু ভঙ্গিমায় তেমনটি হয় না। অনেকে বলেন, বুদ্ধি হইতেই ভাষার উৎপত্তি; মানুষ বুদ্ধির বলে এই ভাষার জন্ম দিয়াছে; শব্দের দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা শুধু মানুষেরই আছে, জীবজন্তুর নাই; এই ভাষাই মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যে অন্যতম প্রধান পার্থক্য নিরূপণ করিতেছে। আবার কেহ কেহ বলেন, ভাষা হইতেই বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে। এ যেন সেই নৈয়ায়িক পণ্ডিতের "পাত্র তৈলাধার অথবা তৈল পাত্রাধার" সমস্যার মতন হইল। যাহা হউক, এখন আমরা ভাষা ও বুদ্ধির পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে বসি নাই—জীবজন্তুর মধ্যে ভাষার প্রচলন আছে কি না, ইহাই আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়।

অবশ্য একথা সত্য যে, অন্তরের প্রত্যেকটি ভাবকে সুস্পষ্ট বাক্য সংযোজনার দ্বারা প্রকাশ করা মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তথাপি জীবজন্তুরও ভাষা আছে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ভঙ্গিমার সাহায্যেই প্রাণীগণ তাহাদের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, তথাপি articulate language বা সুসংবদ্ধ ভাষা যে একমাত্র মানুষের সামগ্রী, এ ধারণা যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের সেই ধারণার মূলে রেঙ্গার (Rengger), ডেনেশ বারিংটন (Daines Barrington), হাউজু (Houzeau), ডারুইন (Darwin) প্রভৃতি নিসর্গবিদগণের পরীক্ষা ও গবেষণা কুঠারাঘাত করিতেছে।

ধর্মযাজক হোয়েটলি (Whately) বলিয়াছেন,—"man is not the only animal that can make use of language to express what is passing in his mind, and can understand, more or less, what is expressed by another."—

মানুষই একমাত্র প্রাণী নয়, যে তাহার মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাষা ব্যবহার করিতে পারে এবং অপরের (ভাষায়) ব্যক্ত মনোভাবকে অল্পবিস্তর বুঝিতে পারে।

সেবাস আজেরি (Cebus azarae) নামে প্যারাগয়ে এক-জাতীয় বানর আছে। ইহারা অন্তত ছয়টি বিভিন্ন শব্দের দ্বারা আপনাদের বিভিন্ন মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে। ইহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একটি বানর যে শব্দের দ্বারা আপনার ক্রোধ, ভয় বা হর্ষের বিশিষ্ট আবেগটি প্রকাশ করিয়া থাকে, অপর বানরগুলিও অনুরূপ উত্তেজনায় ঠিক সেই বিশিষ্ট শব্দটিই ব্যবহার করে।

গৃহপালিত কুকুরের মধ্যেও অন্তত চার-পাঁচ প্রকারের বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক শব্দ প্রয়োগের ব্যবহার দেখা যায়। একটু মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে ঘেউ ঘেউ শব্দের মধ্যেই স্বরের তারতম্য বুঝিতে পারা যাইবে। ব্যস্ততা ও আগ্রহের স্বর বুঝিতে পারিবেন, কুকুর যখন বিড়াল, ইঁদুর অথবা অন্য কোন শিকারের প্রতি ধাবিত হয়। ক্রুদ্ধ অথবা বিরক্ত হইলে সে গোঁ গোঁ শব্দ করে। যখন তাহাকে কোন অপরিচিত স্থানে অথবা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তখন যে শব্দ সে করে, তাহা অস্বস্তিপূর্ণ হতাশাব্যঞ্জক। যখন সে বুঝিতে পারে, এইবার প্রভু তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবেন, তখন সে যে হর্ষধ্বনি করিতে থাকে, তাহা অন্যান্য শব্দ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আবার কোন কোন কুকুর কখন কখন রাত্রিতে একটানা ঘেউ ঘেউ শব্দ করিয়া যখন গৃহস্থের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়, তখন বুঝিতে হইবে যে, সে স্বপ্ন দেখিতেছে।

[কুকুরের স্বপ্ন দেখা—কথাটা হয়ত অনেকের কাছেই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে। তাই আর একটু বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন মনে করি। মানুষের ন্যায় কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া প্রভৃতি উচ্চতর প্রাণিগণও স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। তাহারা যে স্বপ্ন দেখিতেছে, একথা বুঝিতে পারা যায় তাহাদের ইতস্তত সঞ্চরণ ও একপ্রকার বিচিত্র বিশ্রী শব্দ হইতে। শুধু নিদ্রিত অবস্থার মধ্যেই যে স্বপ্ন দেখিতে হইবে, এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। অনেকে হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে কোন কোন কুকুর চাঁদের দিকে চাহিয়া ঘেউ ঘেউ শব্দ করিয়া চলিয়াছে। এ-শব্দ যে কোন বিপদের সঙ্কেতজ্ঞাপক নয়, তাহা যাঁহাদের বাড়িতে পোষা কুকুর আছে, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন। কেহ কেহ কুকুরের এই অনর্থক চীৎকারে বিস্মিত ও বিরক্ত হন—ভাবেন, কই প্রাচীরের উপরে একটা বিড়ালও তো বসিয়া নাই, যে তাহাকে দেখিয়া তাঁহার কুকুর চীৎকার করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার হইল এই যে, আকাশের চাঁদ অথবা দিগন্তের যে কোন স্থির পদার্থ, যাহা অল্পক্ষণের মধ্যেই দৃষ্টির অন্তরালে সরিয়া যায় না, তাহা কুকুরের চলমান চিন্তাধারার গতি ব্যাহত করিয়া দেয় এবং ইহার ফলে তাহার মনে যে কাল্পনিক বিক্ষোভ জাগে, তাহাই কু-স্বপ্নের ন্যায় তাহাকে অস্বস্তিতে ভরিয়া তুলে। তবে সব কুকুরই এইরূপ অত্যধিক কল্পনাশক্তির অধিকারী নয়।]

হাউজু বলিয়াছেন, গৃহপালিত মোরগ অন্তত দ্বাদশটি বিভিন্ন শব্দ করিতে পারে। দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, ভয়, বিস্ময়, ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতিগুলি আমরা "আহা", "উঃ", "অহো",

"ঈস" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা যেভাবে প্রকাশ করি, জীবজন্তুর মধ্যেও অনুরূপ নির্দিষ্ট শব্দের প্রচলন আছে। আট-দশ মাসের শিশু সব কথা বলিতে পারে না বটে, কিন্তু মাতার অস্ফুট গুঞ্জন সে বেশ বুঝিতে পারে। সে-ও হাত-পা নাড়িয়া, হাসিয়া কাঁদিয়া আপনার মনোভাব বুঝাইয়া দেয়। জীবজন্তুগণকে এই ছোট শিশুর সহিত তুলনা করা চলিতে পারে। তাহারা আমাদের অনেক কথা, অনেক ছোট ছোট বাক্য ঠিক মানব-শিশুর মতই অবলীলাক্রমে বুঝিতে পারে।

কথাও যে বলিতে পারে না, তাহা নয়। ময়না, টিয়া প্রভৃতি পাখীগুলি মানুষের স্বর এমন নিখুঁতভাবে অনুকরণ করিয়া কথা বলে যে, তাহা শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

আবার যাঁহারা মনে করেন যে মানুষ যেমন নির্দিষ্ট কোন বিষয়, বস্তু বা ব্যক্তির সহিত নির্দিষ্ট কোন বিশেষ কথার সমাবেশ করিয়া থাকে জীব-জন্তুরা ঠিক তেমনটি অত্যন্ত পারে না, তাঁহাদের এ-ধারণাও তোতাপাখীদের দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। বিমল নামধারী কোন ভদ্রলোক কমল নামে কোন বন্ধুর সন্ধানে হয়ত মাঝে মাঝে তাঁহার বাড়িতে গিয়া থাকেন। বারান্দায় দাঁড়ে বসিয়া কমলবাবুর টিয়াটি যে ছোলার সদ্গতি করিতেছে তাহা হয়ত তিনি একদিন লক্ষ্য না করিয়াই ঘরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে সহসা বিমলবাবু শুনিয়া চমকাইয়া গেলেন পিছন হইতে কে যেন কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"কে রে! কে রে! বিমল! বিমল এসেছিস? কমল বাড়ি নেই।" পাখীর এই দুষ্টামিতে রাগের পরিবর্তে তিনি হাসিয়া ফেলেন।

তাহা হইলে মানুষ এবং জীব-জন্তুর ভাষার মধ্যে প্রভেদ কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে ডারুইন বলিয়াছেন, বিচিত্রতম শব্দ ও ভাবকে একত্রে সংযোজিত করিবার মানুষের যে অসীম এবং বৃহত্তর ক্ষমতা আছে কেবলমাত্র তাহাই নিম্নতর প্রাণী ও মানুষের মধ্যে পার্থক্যের রেখা টানিয়া দিয়াছে।

ভাষাবিজ্ঞানের (Philology) অন্যতম জন্মদাতা হর্ন টুকে (Horne Tooke) বলিয়াছেন, চা-সরবৎ প্রস্তুত করা, রুটী সেঁকা অথবা লেখার ন্যায় ভাষাও একটি আর্ট বা কলা বিশেষ। ভাষাকে কখনই instinct বা সহজাত বৃত্তি বলিতে পারা যায় না, কারণ প্রত্যেক ভাষাই শিখিতে হয়। অথচ অন্যান্য সাধারণ কলাবিদ্যা হইতে ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক। নবজাত শিশুর অস্ফুট কাকলি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কথা বলিবার জন্য মানুষের এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে; কিন্তু প্রথম হইতেই কোন শিশুর লেখা বা অন্য কোন কলার প্রতি অনুরাগ দেখা যায় না। কোন ভাষাই আবার চেষ্টা করিয়া উদ্ভাবন করিতে হয় নাই, আপনা-আপনি অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে উন্নীত হইয়া আধুনিক পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাখীর কাকলিধ্বনির মধ্যে কতকাংশে ভাষার নিকটতম উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। একই জাতির অন্তর্গত প্রত্যেকটি পাখী একই রকম শব্দে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করে; এবং যে-সব পাখী গান গাহিতে পারে তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ঠিক মানুষের মতই তাহাদের সেই ক্ষমতা জাহির করিয়া থাকে। প্রদেশানুসারে মানুষের ভাষার যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনই বিভিন্ন প্রদেশের একই জাতের পাখীর স্বরেও রূপান্তর পরি[লক্ষিত] লক্ষিত হয়। ব্যারিংটন ইহাকে পাখীর "provincial dialects" বা "প্রাদেশিক ভাষা" নাম দিয়াছেন। আবার সংসর্গের ফলে এক জাতের মানুষ যেমন অন্য জাতের ভাষা শিখিয়া থাকে ঠিক তেমনইভাবে এক জাতীয় পাখী সেই প্রদেশের অন্য পাখী[র] স্বর শিখিতে পারে।

মিঃ হেন্‌স্‌লি ওয়েজউড (Mr. Hensleigh Wedgwood), রেভারেণ্ড ফ্যারার (Rev. Farrar), প্রফেসর স্লিকে[র] (Prof. Schleicher) এবং প্রফেসর ম্যাক্সমুলারের (Prof. Max Muller) অমর লেখনী হইতে এইটুকু নিঃসন্দেহে বলিতে পার[া] যায় যে, নানারূপ স্বাভাবিক শব্দের কিছু কিছু পরিবর্তন এব[ং] তাহা অনুকরণ এতদুভয়ের সম্মিলনেই ভাষার জন্ম হইয়াছে। এখন যেমন কোন কোন গিবন গান গাহিবার চেষ্টা করিয়া থাকে হয়ত সেই প্রাচীন যুগের আদিম মানুষ অথবা মানুষের আ[দি] পিতৃপুরুষ তেমনি করিয়াই আপনার স্বরে শ্রুতিমধুর শব্দ প্রবাহ আনয়ন করিবার প্রয়াস পাইত—যেন তাহার সেই স্বর বৈচিত্র্যে বিমোহিতা হইয়া ঈপ্সিতা সঙ্গিণীটি আপনাকে তাহা[র] অঙ্কশায়িনী করিবার জন্য ধরা দেয়। এমনি করিয়াই ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইল প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ঈর্ষার, প্রিয়া[র] প্রতি অনুরাগের এবং তাহাকে পাওয়ার আনন্দ-বাণী—হৃদয়ে[র] বিভিন্ন অনুভূতিগুলি এইভাবে ভাষায় রূপ পরিগ্রহণ করিল।

যতই স্বরের ব্যবহার হইতে লাগিল ততই স্বরযন্ত্রগুলি দৃঢ় এবং উন্নত হইতে লাগিল এবং এই ব্যবহারজনিত ফল বংশ পরম্পরায় বাক্‌শক্তির উপর ক্রমিক প্রভাব বিস্তার করিল। স্বর যন্ত্রের তথা ভাষার ব্যবহারের সহিত মস্তিষ্কের বা মনোবৃত্তি[র] বিকাশের যে সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহা উপেক্ষণীয় নয়। বাক্‌শ[ক্তি] মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া দীর্ঘ চিন্তাধারা পরিচাল[না] করিবার সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। গণিত অথবা অঙ্কের সাহা[য্য] ব্যতীত যেমন কোন দীর্ঘ গণনা চলিতে পারে না, তেমনই কথ[া] ব্যবহার ব্যতীত—তাহা উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত যাহাই হউ[ক] না কেন—কোন জটিল চিন্তাধারাও অগ্রসর হইতে পারে না। এমন কি সামান্যমাত্র চিন্তানুশীলনেও কোন-না-কোন প্রক[ার] রূপক ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। জনৈকা মূক, বধির এবং অ[ন্ধ] বালিকাকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে স্বপ্ন দেখিবার কা[লে] সে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া থাকে; এবং কুকুরের স্বপ্নদর্শ[ন] কালীন চীৎকারের কথাও আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। আবার কোন কোন মস্তিষ্ক রোগে বাক্‌রোধ হইয়া যাও[য়ার] ঘটনাও আমাদের কাছে নূতন নয়।

ম্যাক্সমুলার বলিয়াছেন, কোন কিছু ধারণা করিবার অথ[বা] করাইবার নিমিত্ত ভাষা প্রয়োগ করা হয়। প্রাণিগণের ভাষ[ায়] সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না—তাহারা ভাষার সাহায্যে কো[ন] সুস্পষ্ট ছবি মনের মধ্যে অঙ্কিত করিতে পারে না—মানু[ষের] ভাষার তুলনায় জীবজন্তুর ভাষার নিকৃষ্টতা হইল এইখানে। কিন্তু ম্যাক্সমুলারের এই উক্তি পুরাপুরি সত্য নয়। আম[রা] আগেই বলিয়াছি দশ বারো মাসের ছোট ছোট শিশু যেমন কি[ছু] কতকগুলি বিশেষ বিভিন্ন শব্দের সহিত কতকগুলি বি[ভিন্ন] বিভিন্ন চিত্র মনের মধ্যে আঁকিয়া লইতে পারে, ঠিক অনুরূ[প]

ভাবেই অনেক প্রাণী নির্দিষ্ট ভাষার সহিত নির্দিষ্ট ধারণাকে মিলাইয়া লইতে পারে। মিঃ লেস্‌লি স্টিফেন (Mr. Leslie Stephen) লিখিয়াছেন,—

"A dog frames a general concept of cats or sheep, and knows the corresponding words as well as a philosopher. And the capacity to understand is as good a proof of vocal intelligence, though in an inferior degree, as the capacity to speak."—

—বিড়াল অথবা মেষের একটা মোটামুটি ধারণা কুকুরে গড়িয়া লয় এবং বিশিষ্ট কথাগুলি ("বিড়াল" অথবা "মেষ" বলিতে যাহা বুঝায় তাহা) একজন দার্শনিক যেমন বুঝিতে পারেন সে-ও তেমনই বুঝিতে পারে এবং এই বোধশক্তি যেমন তাহার স্বর সম্বন্ধীয় বুদ্ধিমত্তার তেমনই কিছু কম তাহার বাক্‌-শক্তিরও প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর লোকের সন্ধানে প্রকৃতি আমাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছে। পিপীলিকা যেমন শুঁড়ের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত রাখে, বধির যেমন অঙ্গুলি স্পর্শে অপরের বক্তব্য বিষয় বুঝিতে পারে, আমরাও যদি অনুরূপভাবে অঙ্গুলির সাহায্যে ভাবের আদান-প্রদান করিতাম তাহা হইলে অনেকখানি সময় ও শক্তির অপব্যয় ঘটিত। স্বর-যন্ত্রের উন্নতি সাধানের সংগে সংগে আমরা হাত এবং মুখ দুই-ই একত্রে চালাইতে পারি। প্রকৃতির দান এই স্বরযন্ত্রকে যাহারা কাজে লাগাইয়াছে তাহারা ক্রমে ক্রমে উন্নত চিন্তাধারার জন্ম দিয়া ঊর্ধ্বলোকের পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

যে ভাষা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী তাহা বহুদূর অবধি আপনার শাখা বিস্তার করিয়া ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দুর্বলতর ভাষাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। জাতির ন্যায় কোন ভাষা যদি একবার পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয় তাহা হইলে পুনরায় তাহার আবির্ভাব ঘটিতে পারে না। আবার কয়েকটি শক্তিশালী পৃথক পৃথক ভাষা একত্রিত হইয়া এক মিশ্র ভাষার জন্ম দিয়া থাকে।

চিরন্তন জীবন-সংগ্রামের ন্যায় প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণ বা রূপের মধ্যেও এক অবিরাম পারস্পরিক সংঘাত চলিয়াছে। যাহা অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল ও সুন্দর তাহাই সকলের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়া আপন মহিমায় মুখর-প্রদীপ্ত হইয়া আছে।

বাইবেলে কথিত আছে, ব্যাবেল-নগরীর অধিবাসিগণ একবার স্বর্গারোহণ মানসে এক বিশাল সুউচ্চ গম্বুজ নির্মাণ করিতেছিল; ঈশ্বর তাহাদের এই কার্যে কুপিত হইয়া তাহাদের মধ্যে সহসা ভাষা-বৈষম্য ঘটাইলেন। এই ভাষাবৈষম্যের ফলে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল তাহা স্বর্গসোপান নির্মাণের অন্তরায় হইল এবং এইভাবে পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইল। জীব-জন্তুর ভাষার উৎপত্তি ও পরিণতি লক্ষ্য করিয়া এই কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে কোন ভাষাই ঈশ্বরের দ্বারা বিশেষভাবে সৃষ্ট হয় নাই—অগ্রগতির পথে প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা এই ভাষার উৎপত্তি ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

শারদীয়া সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের চিঠি

সবিনয় নিবেদন,

শারদীয়া সংখ্যা দেশে 'রবীন্দ্রনাথের চিঠি' পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। কিন্তু ৪০৩ পৃষ্ঠায় পতিসর হইতে লেখা ৬নং চিঠির তারিখ ১৩১৬ হইবে ১৩১৩ নয়। রবীন্দ্রনাথ ঐ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণে তপোবন প্রবন্ধ Y. M. C. A.-তে পাঠ করেন। পরে ইহা ১৩১৬, পৌষের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। (শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী' ১ম খণ্ড ৪৮৫ পৃষ্ঠা) আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের লেখা ১৩১৬ সালের চিঠি আছে। শেষের ৬টিকে ৩ বলিয়া ভুল করা খুব সহজ। সেই জন্যই সংগ্রাহকের ঐ ভুল হইয়া থাকিবে। ১৩১৩-র অন্য চিঠিগুলিতে অনুরূপ ভুল আছে কি না, পরীক্ষা করা উচিত।

শেষ চিঠিখানির (৮০নং) তারিখ নাই। কিন্তু উহার সাল নির্ণয় করা শক্ত নয়। ১৩১৩ সালের পূজার পর হইতে ১৩১৪ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনাল কলেজে সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতএব এই চিঠিখানি ১৩১৪-র আষাঢ়-শ্রাবণে লেখা (রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম খণ্ড, ৪৫৭ পৃষ্ঠা)। ইতি—২৬শে অক্টোবর, ১৯৪২।

ভবদীয় —

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

৩০, অতুলকৃষ্ণ বাড়ুজ্যে লেন,

বরানগর

নিষ্পাপ শিশু

প্রেমচাঁদ

গঙ্গু আমারই একজন চাকর। লোকে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিত। আর সেও ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজের পরিচয় দিত। আমার আর দুজন চাকর ছিল—একজন সহিস, আর একজন অষ্টপ্রহরের জন্য কাজ করিত। তাহারা আমাকে প্রত্যহ নমস্কার করিত। কিন্তু গঙ্গু কখনও আমাকে নমস্কার করিত না। সে আমার তোয়াক্কাই করিত না। মনে করিত, আমার ভৃত্য হইয়া সে আমাকে কৃতার্থ করিয়াছে। সে আমার উচ্ছিষ্ট গেলাস কখনও স্পর্শ করিত না। আমার এমন সাহস হইত না যে, তাহাকে বলি আমাকে একটু পাখার বাতাস কর। যখন আমি ঘামে ভিজিয়া যাইতাম, আর সেখানে যদি অন্য চাকর না থাকিত, তখন হয়ত সে দয়া করিয়া আপনা হইতে আমাকে আস্তে আস্তে পাখার বাতাস করিত। এমনভাবে বাতাস করিত, যেন সে আমার কত উপকার করিতেছে। যেন ইহা তাহার কাজই নহে। আমার মনে কি হইত জানি না। তৎক্ষণাৎ তাহার হাত হইতে পাখাটা কাড়িয়া লইয়া নিজেই বাতাস করিতাম। তাহার মেজাজ ছিল একটু কড়া। কিন্তু আমি তাহাকে কাহারও সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করিতে দেখি নাই। আমার অপরাপর চাকরদের সহিত সে কখনও বসিত না। সে কাহারও সহিত ঝগড়া করিত না অথবা ঠাট্টা-তামাসাও করিত না। এই শ্রেণীর লোকের মত তাহাকে কখনও গাঁজা, আফিং খাইতে দেখি নাই। আবার তাহাকে কখনও পূজাঅর্চনা করিতেও দেখি নাই। কোনও যোগ উপলক্ষে তাহাকে কখনও নদীতে স্নান করিতে দেখি নাই। সে ছিল ব্রাহ্মণ; আর এই আশা করিত যে, লোকে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মান্য করিবে ও সম্মান করিবে।

আমি স্বভাবত চাকরদের সহিত বেশী কথা কহিতাম না। আমার এই নিয়ম ছিল যে, যতক্ষণ না আমি কাহাকেও আহ্বান করি, ততক্ষণ যেন কেহ আমার নিকট না আসে। সামান্য ব্যাপারে চাকরদের ডাকহাঁক করিয়া একটা হাট বসাইয়া দেওয়া মোটেই আমার ভাল লাগিত না। কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া লওয়া, প্রদীপটা জ্বালাইয়া দেওয়া, জুতাটা ঠিক করিয়া দেওয়া, অথবা আলমারী হইতে কোন বহি বাহির করা—স্বহস্তে এই সব কাজ করাতেই আমি বেশ আরাম বোধ করিতাম। এইসব ছোটখাট কাজের জন্য কাহাকে ডাকাডাকি করিতাম না। ইহাতে আমার স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতা গুণ দৃঢ় হইত। চাকরগণ আমার স্বভাব ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল। তাহারা বিনা প্রয়োজনে কখনও আমার নিকট আসিত না। এইজন্য আমার আশ্চর্যবোধ হইল, যখন একদিন প্রত্যুষেই গঙ্গু আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চাকররা যখন বিনা প্রয়োজনে আমার নিকট আসে, তখন তাহাদের দুইটি উদ্দেশ্য থাকে। হয় তাহারা বেতনের টাকা অগ্রিম চাহে অথবা অন্য কোন চাকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। আমি এই দুইটি অভ্যাসকেই ঘৃণা করি। মাসের প্রথমেই প্রত্যেক চাকরকে বেতন দিয়া থাকি। মাসের মধ্যে যদি কেহ অগ্রিম কিছু চাহিত, তাহা হইলে আমি ভয়ানক বিরক্তি বোধ করিতাম। মাঝে মাঝে কিছু কিছু করিয়া দিয়া কে তাহার হিসাব রাখিবে? তাহাদের যখন মাসের প্রথমেই সমস্ত বেতন চুকাইয়া দেওয়া হয়, তখন মাসের মধ্যে চাহিবার তাহাদের কি অধিকার আছে? কেন তাহারা অযথা খরচ করিয়া দেয় এবং আগাম টাকা চাহিবার লজ্জা স্বীকার করে? দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটাকে অর্থাৎ এক চাকরের পক্ষে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনাকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। সুতরাং সকালবেলাতেই গঙ্গুকে দেখিয়া আমি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"গঙ্গু ব্যাপার কি? আমি তোমাকে ত ডাকি নি!"

আজ তাহার চেহারার মধ্যে একটা লজ্জার ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আমার মনে হইল সে যেন কিছু বলিতে চাহে, কিন্তু তাহার সাহসে কুলাইতেছে না। আমি একটু রুক্ষভাবে বলিলাম—"কথা কি? কেন বলছ না? আমার এখন বেড়াবার সময়। আমার দেরী হয়ে যাবে।"

গঙ্গু কাঁচুমাচু হইয়া বলিল, "আপনি এখন হাওয়া খেয়ে আসুন। আমি এসে দেখা করব।"

তাহার এই মূর্তি আরও বেদনাদায়ক। এই তাড়াতাড়ির মধ্যে সে হয়ত এক মিনিটেই তাহার কাহিনী শুনাইতে বসিবে। কারণ সে জানে, আমার অবসর নাই। এই হতভাগা আমার ভ্রমণের সময় আমার মাথার উপর আসিয়া খাড়া হইল। আমি রাগান্বিত হইয়া বলিলাম, "কিছু অগ্রিম বেতন চাও? আমি অগ্রিম দেব না।"

"না হুজুর, আমি অগ্রিম কিছু চাই না।"

"তবে কি কারুর বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাও? আমি এসব পছন্দ করি না।"

"না, কারুর বিরুদ্ধে কিছু বলবার জন্য আসিনি।"

"তবে কেন আমার মাথার উপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছ?"

গঙ্গু নিজের হৃদয়কে শক্ত করিয়া লইল। মনে হইল, সে যেন কোন কঠিন কথা বলিবার জন্য সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিতেছে। শেষে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল; "আমাকে আপনি ছুটি দিন। আমি আর আপনার চাকরী করতে পারব না।"

আমি চাকরদের সহিত সর্বদা সদ্ব্যবহার করি। কাহারও কোন অভিযোগের কারণ রাখি না। তাহার এই কথায় আশ্চর্য বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, তোমার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে?"

সে বলিল, "হুজুর, না, আপনার মত মনিব পাব কোথা? কিন্তু কথা এই যে, আমি আর আপনার কাছে থাকতে পারব না। পরে কোন একটা কথা উঠলে আপনার সুনাম নষ্ট হবে, এ আমি চাই না। আমার জন্য আপনি লজ্জায় পড়েন, তা আমার সহ্য হবে না।"

তাহার এই কথা শুনিয়া আমি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

আমার আর প্রাতঃভ্রমণ করা হইল না। চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিলাম—"তুমি পরিষ্কার করেই বল না ব্যাপার কি?"

গঙ্গু সবিনয়ে বলিল, "কথা এই যে, সেই মেয়েটিকে, যাকে সম্প্রতি বুদ্ধ আশ্রম হ'তে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই গোমতী দেবী"—এই বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। আমি অধৈর্য হইয়া কহিলাম, "হাঁ তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তা কি হয়েছে। তোমার চাকরীর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?" মনে হইল গঙ্গুর মাথা হইতে যেন একটা ভারী বোঝা নামিয়া গেল। সে বলিল, "হুজুর, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।"

আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। এই প্রাচীন খেয়ালের ব্রাহ্মণ গঙ্গু যাহার অঙ্গে নবযুগের রীতিনীতির হাওয়া লাগে নাই, সে এই মেয়েটিকে বিবাহ করিবে? যাহাকে কোন ভাল লোক নিজের ঘরে প্রবেশ করিতে পর্যন্ত দেয় না। গোমতী এই অঞ্চলে কিছুদিন পূর্বে একটা ব্যাপারে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে সে বুদ্ধ আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিল। আশ্রমের লোকেরা তিনবার তাহার বিবাহ দিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেকবারেই সে পলাইয়া আসিয়াছে। অবশেষে আশ্রমের কর্মকর্তা তাহাকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দিয়া রেহাই পাইলেন। সে এই অঞ্চলের একটি কুঠিতে থাকিত এবং সারা অঞ্চলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিত। গঙ্গুর সরল হৃদয়ের জন্য তাহার উপর আমার রাগ হইল। আবার দয়াও হইল। এই নির্দোষ লোকটির ভাগ্যে ত্রিভুবনে কোন মেয়ে জুটিল না যে, সে ইহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে—যে মেয়ে তিনবার স্বামীর গৃহ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে, সে ইহার নিকট কতদিন থাকিবে? গঙ্গু যদি অর্থশালী লোক হইত, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। মাস পাঁচ ছয় থাকিয়া আবার পলাইয়া যাইত। কিন্তু গঙ্গু ত একেবারে মূর্খ—ইহার নিকট মেয়েটা ত এক সপ্তাহ বোধ হয় থাকিবে না।

আমি একটু তিরস্কারের সুরে বলিলাম, "এই মেয়ের সব খবর জান ত?"

গঙ্গু যেন সবই জানে, এইভাবে বলিল, "সব মিথ্যা। লোকে অনর্থক তার দুর্নাম রটিয়েছে।"

আমি বলিলাম, "মানে? সে তিনবার নিজের স্বামীকে ফেলে আসেনি?"

"তারা একে তাড়িয়ে দিয়েছে ত কি করবে?"

"তুমি বোকা। লোকে এতদূর থেকে এসে বিয়ে করবে টাকা পয়সা খরচ করবে, সে কেবল তাড়িয়ে দেবার জন্যে?"

গঙ্গু কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বলিল, "যেখানে ভালবাসা জন্মায় না, সেখানে কোন মেয়েই থাকতে পারে না। মেয়েলোক কেবল ভাতকাপড় চায় না, কিছু ভালবাসাও চায়। তারা মনে করে বউকে বিয়ে করে তার উপকার করলাম। তারা চায় বউ প্রাণমন দিয়ে তাদের সেবিকা হয়ে থাকবে। কিন্তু বউকে নিজের মনের মত তৈরী করতে হলে তাকেও বউর আপনার জন হতে হবে। হুজুর, এই হচ্ছে আসল কথা। তাছাড়া এই মেয়েটার একটা ব্যারাম আছে। মনে হয় যেন তাকে ভূতে পেয়েছে। সে কখনো কখনো বকাবকি আরম্ভ করে, তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

আমি বলিলাম, "আর তুমি এই মেয়েকে বিয়ে করতে চাও? ভেবে দেখ, নইলে তোমার জীবন তিক্ত হয়ে উঠবে।"

"আমি ত মনে করি, আমার জীবন ঠিক হয়ে উঠ্‌বে। সব ভগবানের ইচ্ছা।"

আমি কথার উপর জোর দিয়া বলিলাম: "তুমি ঠিক করে ফেলেছো?"

"হাঁ, হুজুর।"

"আচ্ছা, আমি তোমার পদত্যাগ মঞ্জুর করলাম।" আমি অর্থহীন প্রথার দাস মোটেই নহি। কিন্তু যে লোক এইরূপ একজন মেয়েকে বিবাহ করতে চায়, তাহাকে আমার নিকট রাখা ঠিক মনে করিলাম না। হয়ত কত ঝগড়া হইবে, কত নূতন নূতন ঝঞ্ঝাট দেখা দিবে, পুলিস আসিয়া কত গণ্ডগোল সৃষ্টি করিবে। কি দরকার! গঙ্গু ক্ষুধিতের মত এক টুকরা রুটি দেখিয়া প্রলুব্ধ হইয়াছে—সে রুটি শুষ্ক, বিস্বাদ। কিন্তু সেদিকে তাহার কোন পরোয়া নাই। শান্তবুদ্ধিতে কাজ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। আমি তাহাকে বিদায় দিয়া যেন আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

২

পাঁচ মাস পরের কথা। গঙ্গু গোমতীকে বিবাহ করিয়াছে। এই অঞ্চলে কোথায় একটা খাপ্‌রার ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতেছে। সে একজন জাঠের নিকট কি একটা চাকরী গ্রহণ করিয়াছে। কোন রকমে তাহার দিন গুজরান হইতেছে। মাঝে মাঝে বাজারে তাহার সহিত দেখা হইত। তাহার প্রতি আমার একটা আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাহার কি ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিতে ঔৎসুক্য জাগিয়াছিল। তাহাকে বেশ প্রফুল্ল ও হাসিমুখ দেখিতাম। মনে হইত, সে বেশ আরামে ও স্বচ্ছন্দে আছে। তাহার চেহারার মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস ও সন্তোষ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নিশ্চিন্ত প্রাণের দীপ্ত আভা তাহার অঙ্গের সর্বত্র বিকশিত।

কিন্তু একদিন শুনিলাম, গোমতী গঙ্গুর ঘর ছাড়িয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। এ সংবাদে আমি মনে একটু আনন্দ অনুভব করিলাম। মনে হইল, এইবার গঙ্গু উপযুক্ত শাস্তি-ভোগ করিবে। তাহার সরল বিশ্বাসের পুরস্কার সে পাইল না। এবার দেখা যাবে, সে কেমন করিয়া সমাজে মুখ দেখায়। এখন নিশ্চয় তাহার চোখ খুলিবে এবং সে বুঝিবে, যে সব লোকে তাহাকে বিবাহ হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশ্য কত মহৎ ছিল। তাহার জীবনে এক নূতন অভিজ্ঞতা জন্মিবে, তাহার মুক্তির পথ সহজ হইয়া আসিবে। লোকে তাহাকে কত বুঝাইয়াছিল যে, এই মেয়েটা বিশ্বাসের পাত্রী নহে। এ কত লোককে ধোকা দিয়াছে, তোমার সহিতও ধোকাবাজী করিবে। কিন্তু এইসব সদুপদেশের কোন ফল হয় নাই। এখন নিজের জিদের ফলভোগ কর। এখন যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে জিজ্ঞাসা করিব, "কি মহারাজ, দেবীজী তোমাকে সুখী রাখতে পেরেছে ত? তুমি ত তার অজস্র

প্রশংসা করতে। বলতে যে, লোকে তার অনিষ্ট করবার জন্য মিথ্যা দোষ দিত। এখন বল কে ভুল করেছে?" এখন আমি বুঝিলাম যারা রূপের বেসাতি করে, লোকে কেন তাদের থেকে দূরে থাকিতে চায়।

সেদিন হঠাৎ বাজারে গঙ্গুর সহিত দেখা হইয়া গেল। দেখিলাম, সে একেবারে উদাসের মত। দেখিলাম, তাহার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গিয়াছে। অনুশোচনায় নহে, অন্তরের ব্যথায়। আমার একান্ত নিকটে আসিয়া বলিল: "বাবুজী, গোমতী আমার সঙ্গেও প্রতারণা করেছে।" আমি মনে মনে রাগতভাবে, কিন্তু বাহিরে সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলাম, "তোমাকে ত প্রথমেই বলেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার কথা শোনোনি। এখন ধৈর্য ধরে থাক। তাছাড়া আর কি উপায় আছে? টাকা পয়সা সব শেষ করে দিয়েছে, না কিছু রেখে গেছে?"

গঙ্গু বুকে হাত দিল, মনে হইল যেন আমার এই প্রশ্ন তাহার বুকে গিয়া বিঁধিয়াছে।

সে বলিল, "বাবুজী, এমন কথা বলবেন না। সে আমার একটি আধলাও স্পর্শ করেনি। তার নিজের যা ছিল, তাও ফেলে গিয়েছে। জানি না, সে আমার কি দোষ দেখেছে, হয়ত আমি তার উপযুক্ত ছিলাম না। কি আর বলব, সে লেখাপড়াজানা মেয়ে ছিল, আর আমি একেবারে মূর্খ। এতদিন যে সে আমার ঘর করেছে, এই যথেষ্ট। যদি আর কিছুদিন তার সঙ্গে থাকতে পেতাম, তবে ত আমি মানুষ হয়ে যেতাম। তার কথা আপনার কাছে কি বলব? অপরের কাছে সে যাই হোক, আমার কাছে সে দেবতার আশীর্বাদ। কি জানি আমার কি ত্রুটি হয়েছে, সে কিন্তু ভুলেও আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেনি। বাবুজী, আমার ক্ষমতাই বা কি? রোজ দশ বার আনা রোজগার করতাম, কিন্তু তার হাতের এমন গুণ ছিল যে, সে তাতেই সংসার চালাত; কোন কষ্ট হ'তে দেয় নি। তার চেহারাতে কখনও দাগ দেখি নি।"

তাহার এসব কথা শুনিয়া আমি হতাশ হইলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম, সে গোমতীর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী বর্ণনা করিবে, আর আমি তাহার নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া সহানুভূতি দেখাইব। কিন্তু এই নির্বোধের চক্ষু এখনও খুলিল না। এখনও সে তাহার কথা চিন্তা করিতেছে। নিশ্চয় ইহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহলে সে তোমার ঘর থেকে কোন জিনিসপত্র নিয়ে যায় নি।"

সে বলিল, "কিছুই নেয়নি বাবুজী। আধলার জিনিসও নেয়নি।"

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম: "তুমি তা হলে তাকে খুব ভালবাসতে?"

গঙ্গু বলিল, "আপনাকে তা কি বলব বাবুজী, সে ভালবাসা মৃত্যু পর্যন্ত মনে থাকবে।"

"তা সত্ত্বেও সে তোমাকে ছেড়ে চলে গেল?"

"এই ত তাজ্জবের ব্যাপার।"

"'কুলটা' মেয়ের নাম কখনও শুনেছ?"

"বাবুজী এমন কথা বলবেন না। যদি কেউ আমার গলায় ছুরি বসিয়ে দেয়, তবুও আমি তার গুণ গাইব।"

"তাহলে তাকে পুনরায় খুঁজে বের কর।"

"হাঁ, তাই করব। যতক্ষণ তাকে খুঁজে বের ক'রতে না পারছি, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না। সে কোথায় আছে তা যদি একটু জানতে পারি, তাহলে তাকে আমি নিশ্চয় ফিরিয়ে আনব। বাবুজী আমার মন বলছে, সে নিশ্চয় আসবে সেও আমার উপর রাগ করে নি। কিন্তু মন মানতে চায় না তাকে খুঁজতে যাবই, জঙ্গলে পাহাড়েও তাকে খুঁজব। যদি সে জীবিত থাকে, তবে আপনাকে দর্শন করাব।" এই বলিয়া সে পাগলের মত একদিকে চলিয়া গেল।

৩

কিছুদিন পরে একটা জরুরী কাজে আমাকে নইনিতাল যাইতে হইয়াছিল। এক মাস পরে এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছি কাপড়চোপড় এখনও ছাড়ি নাই। দেখিলাম, গঙ্গু একটি নবজাত শিশুকে কোলে লইয়া স্নিগ্ধহাস্যে আমার নিকট দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া নন্দ এতটা আনন্দ-বিভোর হন নাই। মনে হইল, তাহার দেহ হইতে আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি মহারাজ, গোমতী দেবীর কোন ঠিকানা পাওয়া গেল কি?"

গঙ্গু গদগদভাবে কহিল, "হাঁ বাবুজী, আপনার আশীর্বাদে তাকে খুঁজে বের করেছি। তাকে লক্ষ্ণৌয়ের এক মেয়ে হাসপাতালে পাওয়া গেল। এখান থেকে চলে যাবার সময় এক সখিকে বলে রেখেছিল যে, যদি আমি খুব অস্থির হয়ে পড়ি তাহলে যেন ঠিকানা বলে দেয়। আমি শোনামাত্র লক্ষ্ণৌ গেলাম। আজ তাকে নিয়ে এলাম। ফাউস্বরূপ এই কচি ছেলেকেও পাওয়া গেল।"

সে কচিছেলেকে আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। সে যেন কোন রত্নহার পাইয়া আমাকে দেখাইতেছে, কিন্তু আমার আশ্চর্যের সীমা রহিল না। মাত্র ছয় মাস হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। তবুও সে কিরূপ নির্লজ্জভাবে এই ছেলেকে নিজের ছেলে বলিতেছে, আর তাহাই লোককে দেখাইতেছে। আমি তামাসাছলে বলিলাম: "বেশ হল, একটা ছেলেও পাওয়া গেল। বোধ হয় গোমতী এইজন্যই এখান হ'তে চলে যায়।"

আমি তামাসা করে বলিলাম, "এ ত তোমারই ছেলে?"

"আমার কেন হবে বাবু? এ আপনার ছেলেও বটে, ভগবানেরও বটে।"

আমি—"এর ত লক্ষ্ণৌ-এ জন্ম হয়েছে?"

সে—"হাঁ বাবুজী, এই ত কাল একমাস পূর্ণ হয়েছে।"

আমি—"তোমার বিয়ে হয়েছে কতদিন?"

সে—"এই ছ-সাত মাস হ'ল।"

আমি—"তাহলে বিয়ের ছয় মাস পরে এর জন্ম হয়েছে?"

সে—"তা না ত' কি, বাবুজী!"

আমি—"তবুও বলবে এ তোমার ছেলে?"

সে—"হাঁ, তবুও বলব এ আমার ছেলে।"

তাহার এই নির্লজ্জ কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। আমি ঠিক বুঝিলাম না, সে আমার কথার অর্থ ধরিতে পারিয়াছে কি না। সে তাহার সরলহৃদয়ের উচ্ছ্বাস

(শেষাংশ ... পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিদ্যার্থী ইসারা করে বলল, "উড্-হাউস সাব্ আ রাহা।"

কালী তাড়াতাড়ি ফাইল বগলে নিয়ে সরে গেল। শেলী ডাবিন মাখাতে মাখাতে নিজের জায়গায় চলে গেল এবং অন্যান্যরা আশে পাশে যা পেল তা নিয়েই ব্যস্ততা ফুটিয়ে তুল্‌ল।"

উড্ হাউস এ্যাসিস্টেণ্ট ডিরেক্টর। তালগাছের মত লম্বা। মাথাটা বকের মত একটু ঝুঁকে ঝুঁকে চলে।

লম্বা মাথা দূর থেকে দেখেই সকলে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লোকটি তেল রপ্তানী করত, যুদ্ধের কল্যাণে এ্যাসিস্টেণ্ট ডিরেক্টর হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। মেজাজ সামরিক নয়, তবু লোকে ভয় পায়।

উড্ হাউস একবার চারদিক তাকিয়ে কণ্ট্রোল অফিসরের কক্ষে গিয়ে ঢুকল।

চারধারে কাজ চলছে। যাদের কোন কাজ নেই তারাও কাজ করছে। দীনবন্ধু মিত্রকে দেখে বুঝবার উপায় নেই। কাজের চাপ না থাকলেও সে মাইক্রোস্‌কোপের উপর ঝুঁকে পড়ে কাজ করে, কোন দিকে তাকায় না। স্লাইড তৈরী করবার জন্য সে সেক্‌সন কাটছে। কট্ কট্ কটাস্ করে এক একটা শব্দ হচ্ছে ছন্দ রেখে।

ট্যান্ডন ক্যাস্টর অয়েলের আওডিন ভ্যাল্ দেখছে। আর শেঠী ফিল্টার প্যাড কাটতে কাটতে হাঁপিয়ে উঠেছে। দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে আর নতুন গোঁফে মোচড় দিচ্ছে। বেচারা বহু যত্নে গোঁফগুচ্ছের চাষ করছে। গোপাল চক্রবর্তী ঘন ঘন পান চিবোচ্ছে।

মিসেস হিল চুপ্ করে বসে থাকতে পারে না। সারাক্ষণ খুট্ খুট্ করে খুঁড়িয়ে চলে। শ্বেতাঙ্গিনী বলে এখনও তাল রাখতে পারছে। নইলে পঁয়ত্রিশ পুরুষের মাঝে মুসড়ে পড়ত। ছেলেরা তাকে পাগলী বলে নিজেদের মধ্যে ডাকে। আশে পাশে যখন ঘোরে তখন ছেলেদের মনটা কেমন করে। আকর্ষণ করবার মত কিছু নেই শুধু নারী ব্যতীত। জাত, ধর্ম, ভাষা ও পদমর্যাদার কোন বিচার নেই—সব পুরুষই পুরুষ হয়ে যায়।

বিভিন্ন বিভাগের কেমিস্টদল ঘুরে ঘুরে ক্যানটিনে আসে। এ জায়গাটা সময় কাটাবার পক্ষে মন্দ নয়। কেউ কেউ আট ঘণ্টা ডিউটির মধ্যে চার পাঁচ ঘণ্টা এখানেই কাটিয়ে দেয়। জায়গাটা লোভনীয় নয় উপরে ত্রিপল, তিন দিক খোলা। লম্বা লম্বা বেঞ্চ। বালিতে কিচ্ কিচ্ করে। কাপ প্লেট যেমনি নোংরা, তেমনি চা ও কেক্ বিশ্রী। তবু লোক আসে বেশি দাম দিয়ে চা, বিস্কুট, কেক্ খায় সময় কাটাবার জন্য এবং অভ্যাসটা চালু রাখবার জন্য।

প্রজ্ঞান, সুধীর ও সলিল ক্যানটিনে এসে বসল।

সুধীর বল্‌ল, "পালোয়ান।"

পালোয়ান এই স্টলের কন্‌ট্রাক্টর।

বিনয় প্রকাশ করে পালোয়ান বল্‌ল, "জী!"

সলিল বল্‌ল, "চায়ে মিলে গা।"

পালোয়ান ললাটের ঘাম মুছতে মুছতে বল্‌ল, "কাহে• নেই মিলে গা। এই সাবদের চায়ে দাও।"

প্রজ্ঞান একটা বিস্কুট মুখে পুরতে পুরতে হঠাৎ বলে উঠল, "লেডী কেমিস্ট।"

সলিল ও সুধীর একসঙ্গে বলে উঠল, "কোথায়।"

কোথায় আর দেখতে হল না। একটি টাঙ্গা এসে গেটে থামল।

একজন বাঙালী যুবতী টাঙ্গা থেকে নামল। সঙ্গে এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটি টাঙ্গার ভাড়া চুকিয়ে দিলেন।

সুধীর বল্‌ল, "ইণ্টারভিউ দিতে এসেছে। তা' হলে সত্যি সত্যি মহিলা কেমিস্ট নেবে।"

সলিল বল্‌ল, "হপাই (মিঃ. হপকিনের বিকৃত নাম) দেখছি একটা কেলেংকারী না বাধিয়ে ছাড়বে না।"

প্রজ্ঞান যুবতীটির দিকে তাকিয়ে কেমন আনমনা হয়ে গেল। সে কোন কথাই বল্‌ল না এবং কারও কোন কথা যে শুনছে—তা' তার মুখ দেখে বোঝা গেল না

সুধীর বল্‌লে, "বড্ড রোগা, তবু মন্দ নয়। আমার এ্যাসিস্টেণ্ট করে দিলে বেড়ে হয় কিন্তু।"

সলিল বিদ্রূপ করে বল্‌ল, "জেনেনা কেমিস্ট, তোকেই হয়ত ওর বিকার টেস্ট টিউব ধুইয়ে সাহায্য করতে হবে। কিরে প্রজ্ঞান, তোর যে চোখের পলক পড়ছে না। নারীবর্জিত দেশ—আহারে বেচারী!"

প্রজ্ঞান বল্‌ল, "মেয়েটি আমার পরিচিতা।"

"বলিস কি! তোর যে পোয়া বার। নাম কি, কোথায় পরিচয়?" সুধীর ও সলিল একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল!

"কলকাতায় নিউ থিয়েটার রোডে ওরা আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকত। এম-এস-সিতে থার্ড ক্লাস পেয়েছে, আমাদের দু বছরের জুনিয়র।"

"নাম কি?"

"দেবযানী গুপ্তা।"

"তোর সঙ্গে ভাব কেমন—মানে," সলিল চোখের টানে কথাটা শেষ করল।

"সামান্য পরিচয় মাত্র।"

"শেষ পরিচয় নয়ত?" সুধীর অর্থপূর্ণ হাসি হাসল।

মহেশ বাহাদুর, ডি কে জেন, সাক্‌সেনা ও ভাস্কর প্রভৃতির দল লেবোরেটরী থেকে স্যাম্পল চুরির বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল। দেবযানীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ওদের আলোচনা মোড় ঘুরল। তাদের চোখে দীপ্তি প্রকাশ পেল, ভাষায় রস সঞ্চার হল। লেডী টাইপিস্টরা কাছে থেকেও বহু দূরে—এবার দেবযানী হয়ত ব্যবধানের সীমানা হ্রাস করে দেবে। দেবযানীকে হয়ত অনুসরণ করবে সরস্বতী বাঈ, দুর্গা ইলা।

দেবযানীকে এড়াবার জন্য প্রজ্ঞান সুধীর ও সলিলের পাশে একটু গা ঢাকা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। কিন্তু প্রজ্ঞান দেবযানীর দৃষ্টি এড়াতে পারল না।

দেবযানী পূর্বেই তাকে তাঁবুর নীচে বসে থাকতে দেখেছিল। সে আশা করেছিল, প্রজ্ঞান তার সঙ্গে কথা বলতে আসবে।

প্রজ্ঞানকে এড়িয়ে চলে যেতে দেখে দেবযানী একটু আহত হল। প্রথম ভেবেছিল, সেও তাকে এড়িয়ে যাবে। পরিচয় স্বীকার করবে না।

কিন্তু পারল না, দেবযানী ছোট্ট করে ডাকল, "প্রজ্ঞানবাবু!"

সলিল প্রজ্ঞানকে চিমটি কাটল।

প্রজ্ঞান একটু থমকে দাঁড়াল।

দেবযানী পুনরায় ডাকল।

প্রজ্ঞান ফিরে দাঁড়াল।

এতদিন পর দেখা। প্রজ্ঞানের মুখে কথা ফুটল না, হাসিও দেখা দিল না।

এখানে কেউ কাউকে প্রত্যাশা করেনি, তবু কেউ কোন বিস্ময় প্রকাশ করল না।

প্রজ্ঞান ধীরে ধীরে সুমুখে এসে দাঁড়াল।

দেবযানী বল্ল, "এড়িয়ে যাচ্ছিলে কেন?"

প্রজ্ঞান কোন উত্তর দিল না, প্রশ্ন করল, "তুমি এখানে কি মনে করে?"

"তোমার কি মনে হয়?"

"কনট্রাকটরীও হতে পারে।"

"হবে হয়ত।"

"কি স্যাম্পল পাশ করতে এসেছ? জি-টু-ডি মিকসচার, সিমিং ভ্যার্নিস, গ্রাউন্ড সীট—কোনটা?"

"তুমি রুটিনে না রিসার্চে?"

"আমি ঘুস খাইনে। তবে ইউরোপীয় ফার্ম হলে আমাদের সহজ করে টেষ্ট করতে হয় অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ স্যাম্পল পাশ করেন। অবিশ্যি যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে মাল প্রায় রিজেকটেড হয় না। আচ্ছা আমি যাই।"

"দাঁড়াও!"

"কনট্রাক্টরদের সঙ্গে কথা বলা বে-আইনী।"

প্রজ্ঞান এতক্ষণ পরে একটু মৃদু হাসিল। পুনরায় সে বল্ল, "তুমি কি পোস্টের জন্য ইনটারভিউ দিতে এসেছ?"

"ওরা জে এস এ'র পোস্ট দিতে চাচ্ছে। আমি এস এস এ'র জন্য জোর করব।"

"দেখতে পার, বোধ হয় দেবে না। কারণ এখানে বহু ফার্স্ট ক্লাস—তা'ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র; দিন পাঁচ টাকা হারে কাজ করছে। অবশ্য ওভার টাইম নিয়ে ওদের জে এস এ'দের চেয়ে বেশি রোজগার হয়।"

"ইন্টারভিউ কে নেবে?"

"কিছু ঠিক নেই। কেমিক্যাল ব্র্যাঞ্চে অন্তত তিনজন ইন্টারভিউ নেবে। তারপর লুব্রিকেটিং সেকসনেও ইন্টারভিউ দিতে পারে। যে সেকসনে ভাল ইন্টারভিউ হবে সে সেক্সনে তোমার কাজ হয়ে যাবে।"

"বাবাঃ! খুব কঠিন প্রশ্ন করে নাকি?"

"খুব কঠিন প্রশ্ন করে না কিন্তু খুব বেশি প্রশ্ন করে। অধিকাংশই কেমিস্ট্রীতে রাম পণ্ডিত। কাজ করতে হবে হয়ত রুটিন ওয়ার্ক, কিন্তু প্রশ্ন করবে গোটা কেমিস্ট্রীর যা ওদের মনে আছে। আচ্ছা, এখন আমি যাই। কোন অফিসর দেখলে চটতে পারে।"

"পরে দেখা কর।"

"আচ্ছা।"

শত শত চোখের মধ্য দিয়া প্রজ্ঞান তাড়াতাড়ি লেবোরেটরীর কক্ষে প্রবেশ করল।

বারটা থেকে একটা পর্যন্ত লাঞ্চে খাওয়ার জন্য কোন রুমের ব্যবস্থা নেই। মুসলমানরা শুধু আলাদা এক স্থানে যায়, আর হিন্দুরা ও অন্যান্যরা সমগ্র লেবোরেটরীর বিভিন্ন কক্ষে দল বেঁধে খেতে বসে যায়। যন্ত্রপাতি ও স্যাম্পলগুলি এক পাশে সরিয়ে লম্বা টেবিলগুলির উপর কেমিস্ট দল খেতে বসে। কেউ বসবার জন্য টুল পায়, কেউ পায় না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খায়। যাদের বাড়ি নিকটে তারা বাড়িতে খেতে যায়।

ইন্দু, নির্মল, নলিন, সলীল এক দল, কমল, কালী, মাইকেল, সুধ, আয়ার প্রভৃতি এক দল; এমনি ভাবে বিভিন্ন বেঞ্চে কেমিস্টগণ খেতে বসে। যার ভাল খাবার আসে বন্ধুদল তার খাবার কেড়ে খায় কিংবা কারো খাবার কোনদিন ভাল না এলে সে অপরের খাবারে ভাগ বসায়। সাধারণত ননীর খাবার সব্বাইর চেয়ে ভাল আসে। তাকে সব্বাই রাজা বলে ঠাট্টা করে। কারণ তার বৌদি শোভনা দেবী খুব চমৎকার রান্না করেন এবং প্রত্যেক দিন ভাল ভাল খাবার পাঠান। তাই ননীর খাবার নিয়ে প্রায়ই ছেলেদের কাড়াকাড়ি হয়।

খাওয়ার পর প্রজ্ঞান, চম্পু, বিমল, গোপাল, সুধীর প্রভৃতি তাঁবুর নীচে জড়ো হয়। সেখানে লেবোরেটরীর দৈনন্দিন ঘটনা থেকে সুরু করে নানা বিষয়ের আলোচনা হয়। অনিল গোস্বামীর নাম দেওয়া হয়েছে ক্যারেকটর। সে অশ্লীল কথা পছন্দ করে না। অথচ সর্বদা শুনে যায়। কেউ কখন কোন অশ্লীল কথা বল্লে, সব্বাই লাফিয়ে উঠে, বলে, অশ্লীল, অশ্লীল—ভাগ্যি গোঁসাই শুনতে পায়নি।

তাঁবুটা দর্শকদের বসবার জন্য খাটানো হয়েছে। লাঞ্চের ছুটিতে বাঙালী যুবক দল এখানে মিলিত হয়। এ তাঁবুর নীচে সকলেই একবার করে অধীর প্রতীক্ষায় বসেছিল, ভেতরে কার্ড পাঠিয়ে। আজ আর কোন অধীরতা নেই, কোন উদ্বেগ নেই। সেদিনের কথা আর মনেও পড়ে না।

দলটার মধ্যে প্রায় সকলেই অবিবাহিত। তাই নারীকে কেন্দ্র করে কথা সুরু হয়, মোড় ঘোরে যৌন আলোচনায়।

এতগুলি অবিবাহিত যুবক। অধিকাংশই সবে মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছে। কেউ বা ব্যর্থতার রথচক্র বন্ধুর পথে চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে এখানে এসে ঠেকেছে। সকলেরই কেমন যেন সংসার শূন্য জীবন যাত্রা, কেমন যেন অসামাজিক জীবনপদ্ধতি। সূর্যোদয় থেকে প্রায় সূর্যাস্ত অপিস, তারপর ক্লান্তি শ্রান্তি। জীবনে আনন্দ নেই। এমন কি ভালবাসবার কেউ নেই। মনকে কেন্দ্রীভূত করে এগিয়ে চলবার কোন রোমাঞ্চকর রেখাপথও নেই।

কে কোথায় ছিল, কে কোথায় বা ছড়িয়ে পড়বে তা কেউ জানে না। অর্থের সন্ধানে এসেছে, অর্থের প্রয়োজনেই এই কৃত্রিম বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে চলে যাবে। বন্ধুত্বের মহিমা ফুরাবার

সঙ্গে সংগে এ বন্ধুত্ব, এ দলাদলি, এ মানাভিমান সবই ধুলোর মত ঝরে পড়বে এই পান্থশালায়। এই বৃহত্তম পান্থশালায় এসে মানব যেমন অতীতকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত এবং একে ত্যাগ করবার সংগে সংগে যেমনি সব বিস্মৃত হয়, তেমনি এরাও একে ভুলে যেতে চাইবে। হয়ত একেবারে বিস্মৃত হতে পারবে না, কিন্তু স্রোতের আবর্জনাকে কেউ ধরে রাখতে পারে না।

এমনি করে জীবন চলে। জীবন চলার কোন স্থায়ীত্ব নেই। তবু এই অস্থায়ী জীবিকাই মানুষের মনে আশার আলোক জ্বালায়। সেই আভায় মানুষ জীবনকে গ্রন্থীবদ্ধ করে পরিণয়ে। জীবন-সূর্য মেঘের আড়ালে আড়ালে মধ্যাহ্ন অতিক্রম করে যায়, তাই মানুষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে জীবনকে পূর্ণ করতে চায়।

প্রজ্ঞান একাকী। সে কোণঠাসা লোক, মিশতে পারে না, কেউ এসে জমিয়ে তুলতে চাইলে সে জমতে পারে না—ধীরে ধীরে কেমন যেন আলাদা হয়ে পড়ে।

বন্ধুবান্ধব, বন্ধু ভাগিনী কিংবা অপর কোন নারীর প্রতি তার প্রাণের টান উপলব্ধি হয় না। সত্যিকার আনন্দ কেউ দিতে পারে না। শুধু মাত্র নরনারীর চিরন্তন সম্পর্ক ব্যতীত এরা উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বিস্ময়ের, আনন্দের রূপ নিয়ে ধরা দিতে পরে না। তাই সে কোথায়ও যায় না—কেউ এলে অন্তরের দিক থেকে গ্রহণ করতে পারে না।

দেবযানী জে এস এর কাজ পেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছে।

একই কক্ষে পাশাপাশি দেবযানী ও প্রজ্ঞান কাজ করে। প্রজ্ঞান রুটিন এবং দেবযানী রিসার্চ বিভাগে।

রোজই তাদের সারাক্ষণ দেখা হয়, কিন্তু কথা হয় অতি সামান্য।

দেবযানী হয়ত প্রশ্ন করে, "লিনসীড অয়েলের আইওডিন ভ্যালু কত বলুন ত?"

প্রজ্ঞান বলে, "ভুলে গেছি। সাহিত্যিক মানুষকে কেন লজ্জা দাও। সলীলকে জিজ্ঞেস কর। বোধ হয় ১৭৫ থেকে ২০০ পর্যন্ত হয়। ওই বুদুলদা ও তেওয়ারী মশাই আসছেন।"

দুজনই গম্ভীর হয়ে কাজ করতে থাকে। সকলের দৃষ্টিই দেবযানীর উপর ঘুরে ফিরে পড়ে। প্রথম প্রথম দৃষ্টির মাঝে যে উগ্রতা ছিল এখন আর তা নেই।

দেবযানী কারণে অকারণে সর্বদাই প্রজ্ঞানকে নানা প্রশ্ন করে, কিন্তু প্রজ্ঞান তাকে এড়িয়ে চলে। যখনই তার কোন কাজ না থাকে তখনই সে অন্য দিকে চলে যায়। দেবযানী প্রজ্ঞানের সংগে কথা বলবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রজ্ঞান সাড়া দেয় নি। বোধ হয় সে ভয় করে।

একদিন দেবযানী বলল, "তুমি আমায় এত এড়িয়ে চল কেন?"

"তা বটে, কিন্তু ঘুরে ঘুরে 'ত সারাক্ষণই আড্ডা দাও।"

"বিদেশে এসে দুর্নাম কেনা বিশেষ ভাল হবে বলে আমার মনে হয় না।"

দেবযানী চুপ করে গেল। এর উত্তরে বলবার মত কোন যুক্তি সে পেল না।

অথচ এমন একদিন ছিল, যখন দেবযানীকে শুধু দেখবার জন্য প্রজ্ঞান অধীর প্রতীক্ষায় থাকত।

দেবযানীর আজ ঘুরে ফিরে সে দিনের কথাই কেবল মনে পড়ে।

শেষ সাক্ষাতের দিন প্রজ্ঞান তার হাত ধরে বলেছিল, "আমরা বিংশ শতাব্দীর যুবক যুবতী, সামান্য শ্রেণী-বিভাগ কেন মানব। তুমি বৈদ্য, আমি কায়স্থ—এই নগণ্য বাধা হবে আমাদের প্রেম, মন, প্রাণের চেয়ে বড়!"

দেবযানী বলেছিল, "তুমি পিতৃহীন, তুমি পুরুষ—তোমার যে স্বাধীনতা রয়েছে আমার তা' নেই। আমার পিতা-মাতা, সংসার ও সমাজকে আমি ত্যাগ করতে পারিনে।"

"তুমি কি ভালবাসার কোন মূল্যই দাও না?"

"ভালবাসাই দীর্ঘ জীবনের শেষ কথা নয়। মা—"

প্রজ্ঞান বাধা দিয়ে বলেছিল, "তার মতই কি তোমার মত? আমি গরীব, বেকার—সাহিত্যসেবা জীবিকানির্বাহের পেশা নয়। সাহিত্যিক শুধু সাহিত্যিক—বিয়ে করবার কোন অধিকার নেই। ভাষাটা আমার মনে নেই। তিনি আমায় অনেক উপদেশই দিয়েছিলেন, তুমি আর নাই বা দিলে দেবযানী।"

দেবযানী কোন কথা বলতে পারেনি। এটা যে তার শেষ কথা নয় এবং কত বড় মিথ্যা তা সে প্রজ্ঞানকে জানাতে পারেনি। অজ্ঞাত মন চিরকালই অজ্ঞাত রয়ে গেল।

তারপর প্রজ্ঞানের সংগে তার আর কখনো দেখা হয়নি। প্রজ্ঞান বি-এস-সি পাশ করে কোথায় যে চাকরি পেয়ে চলে যায়, তার সন্ধান আর দেবযানী পায় নি।

দীর্ঘ সাত বছর পর এখানে এসে তাদের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ হয়েছে।

সেজন্যই ত' দেবযানীর এত দুঃখ হয় এবং অভিমানের কুল পায় না। দীর্ঘ সাত বছর কেটে গেল। এই সাত বছরেও তার কুমারীত্ব ঘুচল না—এত বড় কথাটা ভুলেও কি প্রজ্ঞানের মনে জাগে না।

প্রজ্ঞান কি এতই কঠিন, এতই নিশ্চেষ্ট? মাঝে মাঝে দেবযানীর চোখ ফেটে জল আসে।

একদিন লেবোরেটরী থেকে বেরিয়ে প্রজ্ঞান দেখল, দেবযানী রাস্তায় তার জন্য প্রতীক্ষা করছে। প্রজ্ঞান তাকে এড়াতে চেষ্টা করল; কিন্তু পারল না।

এতগুলি সহকর্মীর সম্মুখে দেবযানী তাকে নাম ধরে আহ্বান করল।

ছেলেদের মুখে চাপা গুঞ্জনধ্বনি ফুটে উঠল, চোখে দেখা গেল কৌতুকের হাসি, প্রজ্ঞানের মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল।

প্রজ্ঞান বিশ্রী অবস্থাটা সহজ করে দেবার জন্য তাড়াতাড়ি টাঙ্গায় গিয়ে উঠল।

খানিকক্ষণ পরে প্রজ্ঞান বলল, "তোমার কি মাথা খারাপ হল? ছিঃ! ছিঃ!"

দেবযানী বল্‌ল, "ছিঃ ছিঃ করে ত' এত দিনই গেল—তাতে দুঃখই হল সার। আর আমি ছিঃ ছিঃ'র ভয় করব না।"

প্রজ্ঞান গভীর নয়নে তাকিয়ে বল্‌ল, "তোমার উদ্দেশ্যটা কি?"

"উদ্দেশ্য মানে?"

"মানে এই।"

"এই নয়। তুমি কি বুঝতে পারছ না?" দেবযানী অভিমানে বল্‌ল, "তা কি করে পারবে, কারণ তোমরা পুরুষ মানুষ।"

"আমি তর্ক করিনে, বিশেষ করে, যার কোন মূল্য নেই।"

"মূল্য নেই!"

"না, নেই। প্রজ্ঞান দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌ল, "তুমি নিজের হাতে যার চরম মীমাংসা একদিন করে দিয়েছিলে তার শেষ সেখানেই হয়ে গেছে।"

"ভুলই কি শেষ কথা?"

"ভুল নয়। হৃদয় নিয়ে যে কারবার, তা'র ভুল হতে পারে না, হলেও সেখানেই তার শেষ হওয়া উচিত এবং হয়েছেও।"

"ভুলের প্রায়শ্চিত্তও ত' কম হয়নি প্রজ্ঞান।" দেবযানীর চোখ ছল ছল করে এল, কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে গেল।

"প্রায়শ্চিত্ত!" প্রজ্ঞান চমকে একবার দেবযানীর দিকে তাকাল।

সত্যই ত'! দেবযানীর এ কি চেহারা হয়েছে। কিসের জন্যই বা তার চেহারায় এ কাঠিন্য ফুটে উঠেছে—কিসের জন্যই বা বন্ধন স্বীকার না করে জীবনটাকে স্রোতের টানে ভাসিয়ে দিয়েছে। সে কি তার জন্য—এ কি ভুলের প্রায়শ্চিত্ত?

ঠুং ঠুং করে টাঙ্গা চলছে। আর কোন শব্দই নেই। কেমন যেন থমথমে ভাব।

দেবযানী উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু প্রজ্ঞান কোন জবাব খুঁজে পেল না। এমনি নীরবতার মধ্যেই টাঙ্গা গ্রীন পার্ক পার হয়ে এল। প্রজ্ঞান হঠাৎ টাঙ্গা থামাতে বল্‌লে।

দেবযানী অবাক হয়ে চেয়ে রইল, কোন কথা তার মুখ থেকে বেরুল না।

প্রজ্ঞান টাঙ্গা থেকে নেমে বল্‌ল, "আমি এখানেই নামব। কাল তুমি জবাব পাবে।"

পরদিন প্রজ্ঞান আর লেবোরেটরীতে এল না।

দেবযানী জবাব পাবার চিন্তায় সারারাত ভাল করে ঘুমাতে পারে নি। কত কি সে ভেবেছে।

সকাল বেলায় লেবোরেটরীতে এসে সে উদ্গ্রীব হয়ে প্রজ্ঞানের জন্য প্রতীক্ষা করেছে।

প্রজ্ঞান আসে নি।

লাঞ্চের খানিক পূর্বে সলিল দেবযানীকে খামে আটা একখানা চিঠি দিয়ে বল্‌ল, প্রজ্ঞান এ চিঠিখানা আপনাকে দেবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে।

"উনি আসেন নি কেন, শরীর খারাপ হয়নি ত'?"

"না। প্রজ্ঞান ত' আজ কলকাতায় যাচ্ছে।"

"কলকাতায় কেন? কত দিনের ছুটি নিয়েছেন?"

"চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।"

"কাজ ছেড়ে দিয়েছেন!"

দেবযানী স্তম্ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সলিল ধীরে ধীরে চলে গেল।

মিনিট পাঁচেক স্তব্ধ হয়ে দেবযানী দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর ধীরে ধীরে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

লেবোরেটরীতে এসে চিঠিখানি খুলল।

প্রজ্ঞান লিখেছেঃ

'হৃদয় ব্যাপারে একবার ভুল হলে তার সংশোধন হয় না। যা ভুল হয়েছিল তা এমনিই থাকবে। তোমার প্রায়শ্চিত্ত আমার অন্তরে ব্যথার মধ্য দিয়ে গৌরবময় হয়ে প্রতিভাত হল ঝড়-ঝঞ্ঝার পর সূর্যালোকের মত।

আমি বিবাহিত। তাই আমার মনের গতি আমার নয়, সত্যোপলব্ধি আমার নয়। আমার বিবেক, সত্তা গতি—সবকে আমার জোর করে রোধ করতে হয়। প্রতিনিয়ত চলছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। সংসারের বন্ধন যখন স্বীকার করেছি, তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে আমাকে সর্বদা পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়। তাই বারবার চাকরি ছেড়েও চাকরি নিতে হয়। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা মনকে স্বীকার করতে রাজি নয়—শ্রদ্ধা জানান ত' কল্পনাতীত। আমি অবশ্য ওদের দোষ দিতে পারি নে। বুভুক্ষা, লোভ, মোহ শুধুমাত্র কল্পনাবিলাসিতার দ্বারা পূরণ করা যায় না।

টাকার লোভে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু প্রতিক্ষণ চলছিল অন্তরের সঙ্গে সংঘর্ষ। তুমি আমায় এ সংঘর্ষ থেকে মুক্তি দিয়েছ। আজ আমি মুক্ত। মুক্তির আনন্দে আমি জানাই তোমায় অশেষ ধন্যবাদ।

তোমার সম্মুখীন হতে পারব না বলেই পালিয়ে গেলাম—বিদায় নেবার সাহস পেলাম না। একদিন তুমি আমায় ভালবেসেছিলে—আজ তা' পরিপূর্ণতা নিয়েছে। তাই ত' তোমার নিকট বিদায় নিলুম। জানি তুমি আমার ট্রাজিডি বুঝতে পারবে এবং অতি সহজেই ক্ষমা করতে পারবে। যে নারী তার স্বামীকে শুধু সাংসারিক স্বামীরূপেই জানে—তার নিকট এরপর আমার কি মূল্য থাকবে তা তুমি কি কল্পনা করতে পারবে? যদি পার তবে তোমার দুঃখ অতি সহজ হয়ে যাবে—এই আমার বিশ্বাস। ইতি।

মিসেস হিলের সাড়া পেয়ে দেবযানী তাড়াতাড়ি চিঠিটা লুকিয়ে ফেলল এবং চোখের জল গোপন করবার জন্য একটু ঘুরে দাঁড়াল।

লাঞ্চের পর পুনরায় কাজ চলছে। শেলী মিত্র চুপি চুপি গাইছে—'লেবোরটরীতে আমার দিন ফুরাল, রাপি রাপি, তোমায় দিয়ে যাব, কাহার হাতে।' গোপাল চক্রবর্তী নারকেল তেলের 'স্যাপ ভ্যালু—২৫৫ পেয়ে আনন্দের চোটে চার পাঁচটা পান মুখে পুরেছে। বিমল দত্ত ভাইয়া ভাইয়া বলে হিন্দুস্থানী বাঙলা বলছে বিজয়ের সঙ্গে। হানিফ, ভাস্কর, শেঠী, ইন্দু

(শেষাংশ ৫৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হইতে অপসৃত হইবে এবং ইনফ্লেশনের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনাশ পাইবে। এই জন্যই যুদ্ধ সময়ে "Saving campaign" প্রচলিত করা হয়। আমাদের দেশেও ডিফেন্স বণ্ড, ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট প্রভৃতি চালু করিয়া সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আয়করের পরিবর্তে ডিফেন্স সার্টিফিকেট কিনিয়া সঞ্চয় করিবার নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে। ইংলণ্ডের বর্তমান অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা Keynes বিগত যুদ্ধাবসানের ইনফ্লেশনের বিষময় ফল স্মরণ করিয়া বর্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভেই বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের উপর জোর দিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও তাঁহার "Anti-inflation bill"-এ অনুরূপ বিধান রাখিয়াছেন। ইনফ্লেশনের ফলে লোকের হস্তস্থিত টাকা (Money-income) হঠাৎ বাড়িয়া গিয়াই যত গোলমালের উৎপত্তি হয়। ইহার প্রতিবিধানকল্পে তিনি Senateএর বিরোধিতা সত্ত্বেও সর্বোচ্চ আয়ের হার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এমন কি তাঁহার নিজের আয়ের উপরও ঐ বিধান প্রয়োগ করিয়াছেন। এরূপ করার উদ্দেশ্য অতিরিক্ত টাকা নিষ্ক্রিয় করিয়া টাকার বাজারে শান্তি স্থাপন করা ও ইনফ্লেশনের পথ রোধ করা। কাজেই ইনফ্লেশনের প্রধান ঔষধ যতদূর সম্ভব সঞ্চয় বৃদ্ধি করা (Save your utmost).

পরবর্তী উপায় প্রত্যেকের স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করা। এই উপদেশ যে-কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষেই প্রযোজ্য। দেনা চুকাইয়া দিলেই হস্তস্থিত অতিরিক্ত অর্থ দেনাদারের কাছে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। কারণ ঋণ পরিশোধ করায় উপরোক্ত অর্থ তাঁহার আয় (Money-income) হইতে বাদ পড়িল এবং জিনিস কেনার ক্ষমতাও সেই অনুপাতে কমিয়া গেল। একটি উদাহরণ দিয়া দেখাইলে এই ব্যাপারটি বোধ হয় আরও স্পষ্ট বোঝা যাইবে। ধরুণ কেনারাম নামক ব্যক্তি কোন এক ব্যাঙ্কের কাছে ঋণী আছে। ব্যাঙ্কের খাতায় তাহার Debt-balance. কেনারাম বর্তমান যুদ্ধে সামরিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী জোগান দিয়া অনেক টাকার মালিক হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে সে দেনা না চুকাইয়া হস্তস্থিত অর্থ ব্যয় করিয়া সাধারণ ভোগ্য জিনিস অনায়াসে ক্রয় করিতে পারে। যদি সে তাহার উপার্জিত লাভের অংশ এইভাবে ব্যয় করে, তবে বাজারে চলতি টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গিয়া গরম দেখা দিবে। অপর পক্ষে সে যদি ঐ টাকা তাহার ব্যাঙ্কে ঋণ পরিশোধকল্পে জমা দেয়, তবে আর ঐ অর্থ বাজারে চালু হইতে পারিল না এবং ইনফ্লেশনের আশু সম্ভাবনাও বিলীন হইল।

ইনফ্লেশন বিলোপ করিতে হইলে সাধারণের হস্তস্থিত অতিরিক্ত টাকা যাহাতে বাজারে চালু না হইতে পারে, তাহারই পন্থা বাহির করিতে হয়। এই জন্যই যুদ্ধকালীন অবস্থায় আয়কর, অতিরিক্ত লাভকর, বিক্রয়কর ইত্যাদি চাপান হয়। এরূপ কর চাপাইলে, লোকের অর্থ সরকারের হাতে ফিরিয়া আসে এবং ইনফ্লেশন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয়। যুদ্ধরত দেশগুলিতে দিনের পর দিন যেরূপ নূতন ট্যাক্স বসিতেছে তাহা হইতেই আমরা ইহার প্রতিষেধক শক্তি কিছুটা অনুভব করিতে পারি। যদি বাজারে অতিরিক্ত টাকা চালু হইয়াই পড়ে, তাহা নিষ্ক্রিয় করিতেও অন্য উপায় আছে। এরূপ ক্ষেত্রে গভর্নমেণ্ট ট্রেজারি বিল ইত্যাদি বাহির করিয়া লোকের অর্থ আকর্ষণ করে এবং অতিরিক্ত অর্থের শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিও অনুরূপ ক্ষেত্রে বাজারে অগ্রণী হইয়া কোম্পানী কাগজ ইত্যাদি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে এবং এতদ্দ্বারা লোকের অর্থ নিজ তহবিলে টানিয়া লয়। যাহাতে যৌথ ব্যাঙ্কগুলি এই সব অবস্থায় অবাধভাবে দাদন দিতে অগ্রসর না হয়, সেইজন্য অনেক সময় Bank rate বাড়াইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি যৌথ-ব্যাঙ্কের দাদননীতি সঙ্কুচিত করে। কারণ যৌথব্যাঙ্কগুলির লগ্নীকৃত টাকার পরিমাণ বাড়ান ইনফ্লেশনের অপর কারণ। ব্যাঙ্কের দাদন সম্প্রসারিত হইলে লোকের হস্তস্থিত টাকা (Money-income) ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে গভর্নমেণ্টকেও অধিক টাকার সংস্থান রাখিতে হয়। এরূপ পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী পরিণামই হইল সরকারের বাজারে কাগজের নোট চালু করা। ইংলণ্ডের "Committee on Currency and foreign Exchange (1918)"-এর রিপোর্টে ব্যাঙ্কের অবাধ দাদননীতির ফলে উপরোক্ত যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহার বিশদ বর্ণনা আছে। এই জন্যই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে যৌথব্যাঙ্কগুলির ও নিজেদের ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া অতিরিক্ত অর্থ মজুত তহবিলে (Resrve Fund) নিয়োগ করা উচিত। কারবারের মজুত তহবিল বাড়ানর উদ্দেশ্য হইল ভবিষ্যৎ বিপদের সংস্থান করা। কাজেই অতিরিক্ত অর্থ অন্যভাবে ব্যয়িত হইয়া বাজারে চালু হইতে পারে না এবং ইহার ফলে ইনফ্লেশনেরও আবির্ভাব হয় না। বিগত মহাযুদ্ধের ইনফ্লেশনের প্রতিক্রিয়া হইতে ইউরোপের কোন দেশ বর্তমান মহাযুদ্ধ বাধিবার পূর্ব পর্যন্তও মুক্ত হইতে পারে নাই। বর্তমান মহাযুদ্ধেও যদি ইনফ্লেশনের পুনরাবৃত্তি ঘটে, তবে বিশ্বব্যাপী মন্দার যে ঘোর দুর্যোগ দিন ঘনাইয়া আসিবে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। কাজেই এখন হইতে ইনফ্লেশনের প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

হিন্দুসমাজের কথা

ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি

[সমাজতত্ত্ববিৎ ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকারকে তাঁহার "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" গ্রন্থ সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রখানিতে বাঙলার তথা ভারতের হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে এমন অনেক নূতন কথা ডাঃ দত্ত বলিয়াছেন, যাহা পাঠকবর্গের জন্য প্রয়োজন। সেইজন্য ডাঃ দত্ত ও প্রফুল্লবাবুর সম্মতিক্রমে এই পত্রখানি প্রকাশিত হইল]।

—সম্পাদক—'দেশ'

প্রিয় প্রফুল্লবাবু,

আপনি যে 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের একটি কপি আমায় উপহার দিয়াছেন এবং তৎবিষয়ে আমার মন্তব্য জানাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

সর্বপ্রথমে বক্তব্য যে, আপনি বাঙলার হিন্দুর বর্তমান অবস্থা বিষয়ে নানাদিক থেকে আলোচনা করিয়াছেন, সেই সব বিষয়ে এই স্থলে আমার বক্তব্য বলা অসম্ভব। তবে অনেক স্থলে আপনার ও আমার সিদ্ধান্তের ঐক্য আছে দেখিতেছি। আমিও বাঙলাভাষীদের বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি এবং হিন্দুদের বর্তমান অবস্থার কথা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আমি কখন বাঙলাভাষী হিন্দুদের অন্যান্য ভারতীয়দের থেকে পৃথকভাবে দেখিতে শিখি নাই। সেইজন্য আপনার ও আমার চিন্তাধারা এই স্থলে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইতেছে।

যৌবনের প্রারম্ভে যখন দেশকে চিনিতে শিক্ষালাভ করিলাম এবং দেশপ্রেমিকতা শিক্ষা করি, তখন এই শিক্ষাই লাভ করি যে, সর্বভারতীয়েরা এক গোষ্ঠীর লোক। তখনকার জাতীয়তা নিখিল ভারতীয় জাতীয়তা ছিল এবং সেই সময়ে আজকালকার মতন প্রাদেশিক জাতীয়তা ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গজিয়া উঠে নাই। যে মণ্ডলী মধ্যে থেকে দেশের জন্য জান কোরবানী করিতে গিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে বাঙালী ও অবাঙালী, হিন্দু ও মুসলমান ছিলেন এবং সর্বোপরের নেতারা অন্য প্রদেশের লোক ছিলেন বলে আমাদের জানা ছিল। বিদেশেও সর্বভারতবাসীর সমস্যা এক। ভারতের একজাতিত্বপূর্ণ স্বরাজ প্রচেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছি কাজেই বাঙলার "হিন্দু" বলিয়া ভাবটি মাথায় ঢোকেনি এবং বোধ হয় ইহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু এই পুস্তকে হিন্দুর বিষয়ে আপনি যে সব সমস্যা তুলিয়াছেন, তাহা নিখিল ভারতীয় সমস্যা এবং ইহা সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক সমস্যা না হইয়া ভারতীয় সমাজতত্ত্বের অন্তর্গত সমস্যা বলিয়া গণ্য করিলে ভাল হয়। এই পুস্তকে আপনি যে সব সমাজতাত্ত্বিক সমস্যা তুলিয়াছেন এবং নির্ভীকভাবে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উপস্থিত আপনার পুস্তকের স্থানে স্থানে অভিমত বিষয়ে আমার মন্তব্য জানাইতেছি:—

(১) ভূমিকাতে বলা হইয়াছে—"ডাঃ ভগবান দাস বলিয়াছেন—হিন্দু সমাজ......বহু বিভিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমষ্টি মাত্র।" এই বিষয়ে আমি একমত। আমি বলি—Hindu Society is Congeries of Communities (বিভিন্ন সমাজের সমষ্টি মাত্র)। ইহার অর্থ—বর্তমান ইউরোপ ও জাপানের ন্যায় ভারতবর্ষ একজাতীয়তা (nationality) বিবর্তন করিতে পারে নাই। হিন্দুরা এখনও অনেক স্থলে কৌমাবস্থায় (tribal stage) রহিয়াছে, একজাতীয়তাবোধ কোথাও নাই। প্রাদেশিক হিন্দুদের মধ্যে ভাষার একত্ববোধ থাকিলেও বর্ণাশ্রম জন্য একজাতিত্ববোধ (nationhood) এখনও বিবর্তিত হয় নাই। আর ইহাই হইতেছে ভারতের সমস্যা। হিন্দুরা নিজেদের মধ্যেই একত্ববোধ ক্রমবিকাশ করিতে পারে নাই। অহিন্দুর সহিত এক হইবে কি প্রকারে?

(২) তৎপর তিনি বলিয়াছেন—"তথাকথিত উচ্চজাতিরা তথাকথিত নিম্নজাতিদের মধ্যে......কুসংস্কার সৃষ্টির সহায়তা করিতে লাগিল।" আমার ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস পাঠের ফলও এই। এই সত্যটি দেশের বিজ্ঞেরা স্বীকার করিতেছেন না। আপনি সত্যই বলিয়াছেন—"নিজেদের যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়......অন্ধকারময় হইয়াই থাকিবে।" দুঃখের কথা এই যে, আজকাল দেশে একদল খ্যাতনামা পণ্ডিত হইয়াছেন, যাহারা সমাজের গলদ গোপন করিয়া দেশে ও বিদেশে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজতত্ত্বের Social Fascist ব্যাখ্যা দিতেছেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা Hindu Chauvinist বলে বাহাবাও দিতেছেন।

(৩) "বাঙলার হিন্দু সমাজের লোকক্ষয়" শীর্ষক অধ্যায়ে আপনি যে সব কথা বলিয়াছেন, আমিও সেই সব বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। কৃষক-আন্দোলন ও বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে বাঙলার দুইটি জেলা বাদে সর্বত্র আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছি। আমার ধারণা এই যে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষককুল নির্মূল হইতেছে। এই বিষয়ে আমি "Modern Review" পত্রিকাতে "Population of Bengal" এবং "আনন্দবাজার পত্রিকা"তে বিগত দোলসংখ্যায় বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। তথায় আমি বলিয়াছি যে, অন্তত পশ্চিম বাঙলার শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহ অদৃশ্য হইতেছে এবং সেই সব স্থানে অন্য প্রদেশের লোকসমূহ এসে স্থান পূর্ণ করিতেছে। বিগত ১৯৩১ খৃঃ সেন্সাস্ রিপোর্ট এই বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রদান করে না। তথায় মাঝিমাল্লার, ধোপা, নাপিত, শ্রমিকশ্রেণীগুলিকে "হিন্দু" বলিয়াই চিহ্নিত করিয়া দিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছে! তথায় আমি এই কথাই জোর করিয়া বলিয়াছি যে নানা কারণে বাঙলার শ্রমজীবী-শ্রেণীরা জীবন সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইতেছে, তাহারা will to live হারাইয়াছে।

(৪) "অস্পৃশ্যতার অভিশাপ" অধ্যায়ে আপনি বলিয়াছেন—"জনকয়েক উচ্চবর্ণের লোক বেদবেদান্ত......আওড়াইয়া......কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।" ইহা অতি সত্য কথা, "(২)" সংখ্যা উত্তরে এই বিষয় আমি আমার অভিমত প্রকাশ করিয়াছি।

(৫) "নিম্নজাতির ক্ষয়" অধ্যায়ে আপনি বলেছেন—"বাঙলার উচ্চজাতীয় ভদ্র সম্প্রদায়ের যদি......হইয়া উঠিত।" এই কথাই আমি বরাবর বলিতেছি। পশ্চিমে দেখিয়া আসিয়াছি, তথায় উচ্চজাতীয় এবং গণশ্রেণীসমূহের একটা মেলামেশা আছে; কিন্তু বাঙলায় তাহার অত্যন্ত অভাব। বোধ হয় ইংরেজি শিক্ষার জন্য একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিবর্তনই এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

(৬) "উপধর্মবাদ ও অহিংসা" অধ্যায়ে আপনি বলিয়াছেন—কিন্তু হিন্দু সমাজের "শূদ্রশক্তিকে" আমরা বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদের

কাঠামোর......করিয়া রাখিয়াছে। এই বিষয়ে আমি আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত। এই উক্তির জন্য আমি আপনাকে অভিনন্দন করিতেছি। ইহাই আমার বর্তমান জীবনের প্রতিপাদ্য।" বেদের "শূদ্রারিয়াইউ" (শূদ্র ও বৈশ্য) হিন্দু সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। মহাপদ্ম নন্দ থেকে রণজিৎ সিংহ পর্যন্ত হিন্দু রাজচক্রবর্তীদের অনেকেই নীচ শূদ্র ছিলেন। আবার অনেক যুগ-প্রবর্তক ও ধর্মনেতা ও নীচ শূদ্রজাতীয় ছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত ভারতে শূদ্রের স্থান হইল না।

(৭) "প্রতিকার কোন পথে" অধ্যায়ে আপনি বলিয়াছেন—"শূদ্রদের মধ্যে যদি আমরা মনুষ্যত্বের বোধ......সৃষ্টি করিবে। ভারতের ইতিহাস পাঠে আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি।

(৮) "রাষ্ট্র ও সমাজ" প্রবন্ধে আপনি রঘুনন্দনকে যে স্থান দিয়েছেন, সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ তাঁহার মত সব বাঙলায় চলে না এবং মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া তাঁহার মত মানা হয় না। এই বিষয়ের সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ভালভাবে এখনও হয় নাই। তাঁহাকে আমি সমাজ-সংস্কারক (Social Reformer) না বলিয়া প্রতিক্রিয়াশীল (Counter-revolutionary) বলিয়া গণ্য করি। বাঙলার সাধারণ হিন্দু নিত্যানন্দ—বীরভদ্রের নিকট বিশেষ ঘৃণী বলে আমার ধারণা।

(৯) তৎপর আপনি সমাজ সংস্কারের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কারকরা এই কথাই বলিয়াছিলেন কিন্তু "কেহ শুনে না গান......বিফলে গীত অবসান"; ইহা কেন হইল বা হয়? পৃথিবীর সর্বত্রই এই প্রকার হয়। সমাজ পরিবর্তন রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য সাপেক্ষে, ইহা প্রত্যক্ষই আমরা বর্তমান জগতে দেখিতেছি। হিন্দুর সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হইতেছে না এবং নিখিল ভারতীয় একজাতীয়তা সংগঠিত হইতেছে না।

এই বিষয়ে বিষদ আলোচনা এই স্থলে সম্ভব নয়; তবে এই বিষয়ে দুই একটি কথা এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিব।

সংখ্যা শাস্ত্র (Statistics) বড় বিপৎজনক শাস্ত্র। এতদ্বারা অনেক Hocuspous করা যাইতে পারে। সঠিক সংখ্যা পাওয়া চাই। প্রথমে কথা হইতেছে বাঙলার বর্তমান হিন্দু কি ক্ষয়িষ্ণু? এই বিষয়ে সঠিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য কোথায় সংগৃহিত হইতেছে বা হইয়াছে? ইহা হইতে পারে যে, বাঙলা ভাষীদের মধ্যে অহিন্দুর সংখ্যা বাড়িতেছে। কিন্তু অতীতের সংবাদের সততার প্রমাণ কোথায়? বিগত কতিপয় সেন্সাসে দেখা যাইতেছে যে, বাঙলার অহিন্দুর সংখ্যা বাড়িতেছে। কিন্তু একশত বৎসর অগ্রের সংবাদ কোথায়? আর হাণ্টার প্রভৃতিরা সেই সময়-কার যে সংবাদ দিয়াছেন তাহার নির্ভুলতার প্রমাণ কি?

সিন্ধু, পাঞ্জাব ও বাঙলায় হঠাৎ হিন্দু কমিয়া গেল বলিয়া (হিন্দু) মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে, সেই সংবাদ বিষয়ে আমি সন্দিহান! আজ বাঙলা ও পাঞ্জাবের হিন্দুর সংখ্যা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে এত কম নয় যে, আমাদের বলিতে হইবে হিন্দু ক্ষয়িষ্ণু হইয়া নির্মূল হইতেছে। বাঙলা ভাষী যে সব হিন্দু আসাম ও বিহার প্রদেশে বাস করেন, তাঁহাদের গণনা করিলে বোধ হয় তফাৎ মারাত্মক হইবে না। এবং যে সংখ্যা শাস্ত্রের তালিকা আমাদের কাছে প্রদত্ত হইতেছে তদ্দ্বারা হিন্দু ধ্বংসের পথে যাইতেছে বলে জোর গলায় বলা যায় না। তবে এটা ঠিক যে, উপরোক্ত প্রদেশসমূহে হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠ। অন্তত পাঞ্জাব ও বাঙলায় কেন হইল তাহার কারণ-সমূহ আপনি বিচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিধবা বিবাহের অপ্রচলন একটা কারণ। জাতিতত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে অনুমান হইবে যে, এই সব প্রদেশে হিন্দু কোন কালেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। তবে "অ-মুসলমান" বলিলে যদি হিন্দু বুঝায় তাহা হইলে কথা স্বতন্ত্র। সিন্ধু দেশ থেকে শুনিয়া আসিয়াছি যে, আরব আক্রমণের পর এবং উপর্যুপরি মুসলমান শাসন প্রবর্তন থাকায় তথাকার সব লোকই মুসলমান হইয়াছিল। এমন কি হিন্দু শাসক জাতীয় সোমড়া ও সাম্মা রাজপুতেরাও মুসলমান হয়। পরে পাঞ্জাবের মুলতান এবং গুজরাট থেকে ব্যবসায়ীরা গিয়ে এবং রাজপুতানা থেকে ব্রাহ্মণেরা গিয়ে নূতন হিন্দু সমাজ পত্তন করে। ইহারা সবই শহরে বাস করে। অনেক সিন্ধি ভদ্রলোক আমায় পাঞ্জাবী বংশোৎপন্ন বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন। লাহোরেও শুনিয়াছি যে, এখনও সিন্ধিদের সহিত মুলতানের হিন্দুদের বিবাহ চলে। কাজেই একথা বলা চলে না যে, সিন্ধের হিন্দুরা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানের সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হইয়াছে।

তৎপর পাঞ্জাবের কথা, যে চাপে আফগানীস্থান মুসলমান হইয়াছে, সেই চাপেই পশ্চিম-পাঞ্জাব মুসলমান হইয়াছে। এক্ষণে কথা এই, প্রাচীন গান্ধার, চিত্রল, দরদিস্থানের ও পাঞ্জাবের লোকেরা কতটা হিন্দু ছিল? মনুতে পাঞ্জাবের উল্লেখ নেই এবং বাকি দেশের লোকদের 'ব্রাত্য' বলিয়াছে। আর মহাভারতে (কর্ণ পর্ব) পঞ্চনদ, গন্ধারক, সিন্ধু সৌবীরদের, গোথাদক, ব্রাত্য ও ব্রাহ্মণ বর্জিত বলিয়াছে। অবশ্য এই সব জাতিরা ভারতীয় বা Indian বা হিন্দি ছিল কিন্তু তাহারা কি বর্ণাশ্রমী হিন্দু বা সকলে বৌদ্ধ ছিল? Yuan-Chwang আফগানীস্থানের অনেক কৌমদের তুর্কি ও অতিবর্বর বলিয়া গিয়াছেন আর আল-বেরুনী পাঞ্জাবের গক্করদের এবং পাঞ্জাবের লোকদের যে সব আচার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাহাদের আর্য সভ্যতাপ্রাপ্ত হিন্দু বা বৌদ্ধ বলা যায় না। হয়ত এই সব কৌম তাহাদের কৌমগত আচার ও বিশ্বাস নিয়াছিল. তৎপরে রাজনীতিক কারণে মুসলমান হয়।

বাঙলায় আমার অনুমান তদ্রূপ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাঙলা সমাজের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। Risley বলিয়া গিয়াছেন, হিন্দুদের মধ্যে অনেক tribal castes আছে। ইহার অর্থ, অনেক-গুলি tribe হিন্দু হইয়া casteএ পরিণত হইয়াছে। আজও তাহাই হইতেছে (Haikerwalএর পুস্তক দ্রষ্টব্য)। বোধহয়, বাঙলায় অনেকগুলি আদিম জাতীয় tribes ছিল, তাহাদের tribal religion ছিল। শাস্ত্রীর মতে ব্রাহ্মণেরা তাহাদের অন্ত্যজ বলিত। হয়ত বৌদ্ধ শ্রমণেরা তাহাদের কাছে যাইতেন বা যাইতেন না; হয়ত কাহার কাহার মধ্যে "নাথধর্ম" প্রচার হইয়াছিল। এককথায় তাহারা আর্যধর্ম ও সভ্যতার বাহিরে ছিল, তাহারাই পরে রাজার ধর্ম ইসলামের সাম্যবাদে আকৃষ্ট হয়।

...ভূত বৈদিক ধর্মপ্রসূত ব্রাহ্মণ্যধর্ম, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধ-...সবক বাঙলায় কয়জন ছিল? ভারত আজও সম্পূর্ণরূপে ...ভূত হয় নাই, সম্পূর্ণরূপে হিন্দু হয় নাই, সম্পূর্ণরূপে মুসলমান হয় নাই। ইহাই হইতেছে ভারতের সমস্যা।

অন্যদিকে Hunter বলিয়া গিয়াছেন, বেশী হিন্দু মুসলমান হয় নাই, মুসলমানদের বংশ পরিচয়েই তাহা ধরা পড়ে। আবার, উর্দু কবি হালি দুঃখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"Ganges broke the Continuty of Islam"। পুনে বাঙলার কতিপয় মুসলমান লেখক অনেক যুক্তি, তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিতে চান যে, বাঙলার মুসলমানরা বিদেশাগত। অবশ্য যেটুকু শারীরিক নরতাত্ত্বিক অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহাতে উভয়ের পার্থক্য দেখা যায় না। কাজেই, হঠাৎ হিন্দু কমিয়া গেল—এই কথাটি ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া অনুসন্ধান করিয়া বিচার করিতে হইবে।

পুন কথা উঠে, "হিন্দু" কাহাকে বলি এবং "বাঙালী" কাহাকে বলি? আমার মত এই যে, বাঙলায় বাঙলাভাষী হিন্দুর ভাগ্যে যাহাই থাকুক না কেন, তাহার ভাগ্যকে নিখিল ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে হইবে। বাঙলার হিন্দু Indian বা ভারতবাসীরূপে বিবর্তিত হইতে হইবে। ইউরোপের ইহুদিদের ন্যায় হিন্দুরে Diaspora করে পৃথকভাবে থাকিবার চেষ্টা করিলে তাহা পরিণামও ভীষণ হইবে। মুসলমান বিষয়েও এই কথা প্রযোজ্য স্বদেশী যুগের আদর্শের কথা পূর্বেই বলিয়াছি; কিন্তু আজকা বাঙলার বৈশিষ্ট্য ভারতের বৈচিত্র্য, হিন্দুর বৈশিষ্ট্যরূপ বুলী শু... যায়। ইহার ফলে, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা বাড়িয়া যাইতেছে। বাঙলার হিন্দুর সংকীর্ণতাই তাহার কাল হইবে।

অবশ্য হিন্দুর সমাজপদ্ধতিতে যেসব গলদ আছে, তাহা দেখাইয়া আপনি লোকের উপকারই করিয়াছেন। হিন্দুর কৌমগত সমাজপদ্ধতি এই যুগে অচল। যদি হিন্দুকে বাঁচিতে হয়, তাহা হইলে তাহার সমাজতত্ত্বকে আমূল পরিবর্তিত করিতে হইবে। মুসলমান বিষয়েও এই কথা খাটে। উভয়কার সমাজতত্ত্ব এ... প্রণালীতে চলিতেছে। কিন্তু পরিবর্তন রাষ্ট্রশক্তির সাপেক্ষ। উভয় সম্প্রদায় বিভিন্ন Diaspora করিয়া নিজেদের Ghethর ভিতর থেকে পচিয়া মরিবে কি উভয়ে সম্মিলিত হইয়া ভারতীয় এক জাতীয়তা বিবর্তন করিবে, ইহাই হইতেছে বর্তমানের সমস্যা।

দেশবাসীর নিকট আবেদন

বিগত ১৬ই অক্টোবর বাঙলার কোন কোন অঞ্চলের উপর দিয়া যে ভয়াবহ ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছিল, তাহার ফলে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশে অবর্ণনীয় দুর্দশা ও ক্ষতি হইয়াছে। সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিবাত্যার ফলে সহস্র সহস্র নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, ঘর-বাড়ী ধ্বংস হইয়াছে এবং মানুষ সর্বহারা হইয়াছে। ঐ স্থানের দুর্গত জনগণের সাহায্যের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে'র পক্ষ হইতে একটি 'রিলিফ্ ফাণ্ড' খোলা হইয়াছে। দুর্গত জনগণের জন্য আমরা আমাদের পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক ও সহৃদয় দেশবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। অর্থ, খাদ্য, ঔষধপথ্য, বস্ত্র এবং ঘরবাড়ি নির্মাণের সরঞ্জাম যাঁহার যাহা সাধ্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া বিপন্ন জনগণের সাহায্য করিবেন —ইহাই প্রার্থনীয়। ইতি

কোষাধ্যক্ষ—"আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, বেঙ্গল সাইক্লোন রিলিফ ফাণ্ড"—১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা অথবা বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ৮৬নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা অথবা ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক—ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্, মিশনরো, কলিকাতা।

আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, বেঙ্গল সাইক্লোন রিলিফ ফাণ্ড। ১, বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, আনন্দবাজার পত্রিকা—সম্পাদক। **ভাইস-চেয়ারম্যান**—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নাগ, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড—সম্পাদক। **মিঃ জে সি দাস**—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ। **মিঃ এস এম ভট্টাচার্য**—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ।

সেক্রেটারী—শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড।

সহ-সেক্রেটারী—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত বনবিহারী গোস্বামী।

জয়েণ্ট কোষাধ্যক্ষ—১। মিঃ আর কে চৌধুরী, সেক্রেটারী—ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ, ২। মিঃ এম এ চক্রবর্তী, চীফ একাউণ্টেণ্ট, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ, ৩। শ্রীযুক্ত হরসুন্দর চক্রবর্তী—আনন্দবাজার পত্রিকা।

অডিটার—মিঃ এস এন মুখার্জী, এফ্ এস এ, আর এ ইনকরপোরেটেড একাউণ্টেণ্ট এ্যাণ্ড অডিটার (লণ্ডন), ১বি ওণ্ডপোস্ট অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

এই রিলিফ্ ফাণ্ডে আনন্দবাজার পত্রিকা দান করিয়াছেনঃ—৫০১্, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড—৫০১ মোট—১০০২্।

সাহায্যদাতাগণের নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে।

"দেশ"

আগামী ১৪ই নভেম্বর 'দেশ' পত্রিকা ১০ম বর্ষে পদার্পণ করিবে। এতদুপলক্ষে এই সংখ্যাটি

রবীন্দ্রনাথের

অপ্রকাশিত পত্রাবলী

ও

নানা গল্প প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হইয়া বিশেষ সংখ্যারূপে

প্রকাশিত হইবে।

আগামী সংখ্যা হইতে শ্রীহাসিরাশি দেবীর উপন্যাস

চক্রবাল

ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে

আন্তপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

আন্তপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এই বৎসর অনুষ্ঠিত হইবেই, ইহা কেহও জোর করিয়া বলা চলে না। সকল প্রাদেশিক ক্রিকেট এসোসিয়েশন তাহাদের মতামত ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের নিকট প্রেরণ করে নাই। বাঙলা প্রদেশ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পক্ষে মত দিয়াছে। দিল্লী ক্রিকেট এসোসিয়েশন যোগদান করিবে বলিয়া জানাইয়াছে। তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কার্যকারী সমিতির সভায় কয়েকজন সভ্য আপত্তি তুলিয়াছিলেন। আপত্তিকারিগণের সংখ্যা খুবই কম হওয়ায় ফল কিছুই হয় নাই। সিন্ধু ক্রিকেট এসোসিয়েশন যোগদান করিবে বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। তবে এই প্রস্তাব গ্রহণের সময় কার্যকারী সমিতির সভ্যগণ বোম্বাই প্রদেশের যুক্তি একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, বোম্বাই প্রদেশ যে অসুবিধাসমূহের কথা উল্লেখ করিয়াছে, তা অস্বীকার করা যায় না। তবে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হইতেছে একমাত্র ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট অনুষ্ঠান। সুতরাং এই প্রতিযোগিতা অসুবিধা ও বিঘ্নের জন্য বন্ধ হইয়া থাকিবে ইহা কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না। প্রতিযোগিতা যদি অনুষ্ঠিত হয়, তবে সিন্ধু প্রদেশ তাহাতে অতিঅবশ্য যোগদান করিবে।" এই প্রস্তাব পাঠ করিলে ইহাই অনুমিত যে, প্রস্তাবকারিগণ অনুষ্ঠান যে হইবেই, সেই সম্পর্কে নিঃসন্দেহ নহেন। মহীশূর ক্রিকেট এসোসিয়েশন রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে না বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। এই এসোসিয়েশনের কার্যকারী সমিতিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় কোন অনুষ্ঠান হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড যাহাতে এই বৎসর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা না করেন, তাহার জন্য এই এসোসিয়েশন অনুরোধ করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

এই পর্যন্ত রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান সম্পর্কে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, তিনটি প্রদেশ অনুষ্ঠানের পক্ষে ও তিনটি প্রদেশ অনুষ্ঠানের বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। বাঙলা, দিল্লী ও সিন্ধু প্রদেশ অনুষ্ঠানের পক্ষে এবং বোম্বাই, মহারাষ্ট্র ও মহীশূর প্রদেশ অনুষ্ঠানের বিপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এই বৎসর অনুষ্ঠিত হইবেই, ইহা কে বলিতে পারে?

কলিকাতায় ক্রিকেট খেলা

কলিকাতায় ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হইয়াছে। তবে পূর্ব নির্দিষ্ট অনুযায়ী সকল খেলা অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। [illegible] উপযোগী করা সম্ভব হয় নাই। আরও এক সপ্তাহের পূর্বে এই সকল ক্লাবের মাঠ তৈয়ারী হইবে না। এই পর্যন্ত যতগুলি খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই উচ্চাঙ্গের হয় নাই। গত রবিবার কলিকাতায় তিনটি মাত্র খেলা হয়। একটিতে এস দত্তের দলের সহিত শিবপুর ইনস্টিটিউট দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এস দত্তের দলে কমল ভট্টাচার্য, কার্তিক বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ যোগদান করেন। এস দত্তের দলই খেলায় ৩১ রানে বিজয়ী হয়। এস দত্তের দল প্রথমে ব্যাট করিয়া মোট ১৮৩ রান করিয়া ইনিংস শেষ করে। কে বিশ্বাস ৭০ রান করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। শিবপুর দলের এস রায় ৬৪ রানে ৫টি উইকেট পান। পরে শিবপুর দল খেলা আরম্ভ করিয়া ১৫২ রানে ইনিংস শেষ করে। শঙ্করী দত্ত ৫২ রান করেন। এস দত্ত ২৬ রানে ৩টি ও কমল ভট্টাচার্য ২০ রানে ২টি উইকেট পান। অপর খেলায় টাউন ক্লাব দলের সহিত বি জি প্রেস দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। টাউন দল প্রথমে খেলিয়া ৭ উইকেটে ১৯৬ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। টাউন দলের এস ঘোষ মাত্র ৮ রানের জন্য শত রান করিতে পারেন না। কে রায়ও ৪৩ রান করিয়া ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। বি জি প্রেস দল প্রত্যুত্তরে মাত্র ১১৯ রান করিতে সক্ষম হয়। ফলে, টাউন দল খেলায় ৭৭ রানে বিজয়ী হয়। টাউন দলের পি সেন মাত্র ১৬ রান দিয়া ৬টি উইকেট দখল করেন।

তৃতীয় খেলায় ক্যালকাটা পার্শী দলের সহিত ক্যালকাটা ট্রামওয়ে দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। খেলায় পার্শী নিজ ৬ উইকেটে বিজয়ী হইয়াছে। পার্শী দলের এ দস্তুর ১৫ রানে ৩টি, ডি স্যাডন ৯ রানে ৩টি ও কে খাম্বাটা ১৫ রানে ৪টি উইকেট পান।

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন এক ভ্রমণকারী সাঁতারু দল ৩রা নবেম্বর পাঠাইবেন বলিয়া শোনা গিয়াছিল কিন্তু সম্প্রতি এই এসোসিয়েশনের কার্যকারী সমিতির যে সভা হয় তাহাতে স্থির হইয়াছে, ১৫ই নবেম্বর দল প্রেরণ করা হইবে। এইরূপে বিলম্ব করিবার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, বিভিন্ন জেলার খেলাধুলা পরিচালকগণ এসোসিয়েশনকে জানাইয়াছেন, "১৫ই নবেম্বরের পূর্বে কোন দল প্রেরণ করিবেন না। স্কুল, কলেজ বর্তমানে বন্ধ আছে। এই সকল ছাত্রগণই খেলাধুলায় ও সন্তরণে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রদর্শনীর সময় যাহা কিছু শিক্ষণীয় থাকিবে তাহা ছাত্রগণ দেখিবার সুযোগ লাভ করে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। তাঁহারাই বাঙলার ভবিষ্যৎ খেলাধুলা ও সন্তরণের উন্নতির একমাত্র কর্ণধার। ১৫ই নবেম্বরের পূর্বে কোন দল আসিলে ছাত্রগণ সুযোগ পাইবেন না।" এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন

সমর বার্তা

[illegible]শে অক্টোবর

ভারতবর্ষ—নয়াদিল্লী মার্কিন [illegible]নীর হেড কোয়ার্টার হইতে [illegible]চারিত এক ইস্তাহারে [illegible] হয়:—[illegible] অক্টোবর অপরাহ্ণে একটি [illegible]ক্তিশালী জাপ বোমারু [illegible]নবহর এ[illegible]জঙ্গী বিমানবহর উত্তর-পূর্ব আসামে ডিব্রুগড় অঞ্চলে [illegible]মেরিকান [illegible]ন ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করে। জাপ বিমানগুলি প্রায় [illegible]ন্দ হাজা[illegible] উঁচু হইতে আসিবামাত্র আমাদের জঙ্গী বিমানের সহিত [illegible]দের সংঘর্ষ বাধে। আমাদের জঙ্গী বিমানগুলি জা[illegible]দের দুই[illegible] বিমানকে গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করে। [illegible]দের এব[illegible] বিমান গুলীবিদ্ধ হইয়া ভূপাতিত হয়।

গতকল্য পূর্বাহ্ণে দুই ঝাঁক[illegible]শ বিমান জঙ্গী বিমান পরিবেষ্টিত হইয়া আকিয়াব অঞ্চলে জা[illegible]ক্ষ্যবস্তুর ওপর আক্রমণ চালায়। প্রতিপক্ষের অধিকৃত [illegible]দের উ[illegible]বোমা বর্ষিত হয় এবং কয়েকস্থানে আগুন লাগে। একখানি [illegible]ণ বিমানও খোয়া যায় নাই।

রুশ রণাঙ্গন—রয়টারের [illegible]ষ সংবাদদাতা জানান যে, শ্রমশিল্প এলাকায় জার্মানদের শেষ [illegible]তির ফলে স্ট্যালিনগ্রাদের ভিতরে [illegible]বস্থা অত্যন্ত [illegible]ন হইয়াছে। জার্মানরা আর একটি শ্রমিক-[illegible]তিতে পা গাড়িয়াছে। মধ্য[illegible] কারখানা অঞ্চলে তুমুল যুদ্ধের [illegible] গত ১৬ই অক্টোবর একটি [illegible]কবসতি পরিত্যাগ করা হয়।

মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কী [illegible]র্কিন জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এক [illegible]বেতার বক্তৃতায় ইয়োরোপে দ্বি[illegible] রণাঙ্গন সৃষ্টির কথা পুনরাবৃত্তি করেন। ভারত সম্পর্কে মিঃ [illegible]ল্কী বলেন, "ভারতবর্ষ আমাদেরই সমস্যা। জাপান যদি এত বড় [illegible]টা দেশ দখল করে—আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব।" [illegible]সাধারণ ভার[illegible] স্বাধীনতা সমস্যা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুষ্ণীভাব সুদূর[illegible]চ্য তাহাদের খাতির পাত্র অনেকখানি শূন্য করিয়া ফেলিয়াছে।"

২৮শে অক্টোবর—

সলোমনের যুদ্ধ—ও[illegible]টনের সংবাদে প্রকাশ, গত ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর সলোমন দ্বীপপুঞ্জে স্থলে, জলে ও অন্তরীক্ষে যুদ্ধে জাপানের দুইখানি বিমানব[illegible] জাহাজ, দুইখানি বড় ক্রুজার এবং একখানি ছোট ক্রুজার জখম হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্তত ২২খানি জাপানী বিমান গুলীবিদ্ধ হইয়া খোয়া গিয়াছে। মার্কিন ডেস্ট্রয়ার "পোর্টার" নিমজ্জিত এবং [illegible]খানি বিমানবাহী জাহাজ গুরুতররূপে জখম হইয়াছে।

২৯শে অক্টোবর—

ভারতবর্ষ—নয়াদিল্লী [illegible] জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, গতকল্য জাপানী বিমান উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি বিমানঘাঁটি[illegible]নরায় আক্রমণ করে। প্রাথমিক সংবাদে প্রকাশ, হতাহতের সংখ্যা[illegible]ব কম এবং ক্ষতির পরিমাণও সামান্য। মার্কিন বিমানবাহিনীর [illegible] বিমানসমূহ শত্রুপক্ষের একখানি জঙ্গী বিমান ও একখানি [illegible]রু বিমান নিশ্চিতভাবে ভূপাতিত করে। দুইখানিই চুরমার হইয়া গিয়াছে। শত্রুপক্ষের আরও কয়েকখানি বিমানের ক্ষতি হইয়াছে।

গত ২৫শে অক্টো[illegible] ডিব্রুগড় অঞ্চলে প্রতিপক্ষের ৫০খানি [illegible]বোমারু ও ৪৫খানি জ[illegible] বিমান মার্কিন বিমানঘাঁটিরগুলির উপর [illegible]ক্রমণ চালায়। বর্ত[illegible] যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, [illegible]পৃষ্ঠে অবস্থিত অ[illegible] দশখানি জঙ্গী বিমান ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত [illegible]য়। তাহা ছাড়া [illegible]কগুলি সৈন্যবাহী বিমানও ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গত ২৬শে [illegible]বর ২৭খানি জাপ জঙ্গী বিমান আসামের বিমানঘাঁটিগুলির উ[illegible] আক্রমণ চালায় ও গোলাবর্ষণ করে। এই সব বিমানের রক্ষণাধীনে পাঁচখানি পর্যবেক্ষণকারী বিমানও ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী জাহাজ "ওয়াস্প" খোয়া গিয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর জাপানী সাবমেরিনের আক্রমণে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে এই জাহাজখানি নিমজ্জিত হয়। ওয়াস্প ডুবি সম্পর্কে মার্কিন ইস্তাহারে বলা হয় যে গুয়াদালকানার এলাকায় যুদ্ধরত অবস্থায় জাপানী টর্পেডোর আঘাতে উক্ত জাহাজ নিমজ্জিত হয়।

৩০শে অক্টোবর—

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে সোভিয়েট সৈন্যেরা অতর্কিত আক্রমণে একটি বৃহৎ জনপদ দখল করিয়াছে। জার্মানরা চার ডিভিসন নূতন সৈন্য ও দুইটি ট্যাঙ্ক ডিভিসনসহ স্ট্যালিনগ্রাদের কারখানা অঞ্চলে আক্রমণ চালায়।

৩১শে অক্টোবর—

সলোমনের যুদ্ধ—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ যে, জাপ নৌবহর সলোমন দ্বীপপুঞ্জে জাপ নৌঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আজ রাত্রিতে এই কথা ঘোষণা করিয়া মার্কিন নৌ-সচিব কর্নেল নক্স বলেন, "সলোমন যুদ্ধের প্রথম পর্ব শেষ হইয়াছে। এখন দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভের অপেক্ষায় আছি।"

নিউ গিনিতে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী আলোলা অধিকার করিয়াছে। ঐ স্থানটি কোকোদার ৭ মাইলের মধ্যে অবস্থিত।

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, রাশিয়ান সৈন্যেরা স্ট্যালিনগ্রাদের কারখানা অঞ্চলে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়াছে এবং জার্মানদের বহু আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে। গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই এলাকায় জার্মানরা আর নূতন করিয়া কোন সাফল্য অর্জনে সমর্থ হয় নাই।

২রা নভেম্বর—

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, স্ট্যালিনগ্রাদরক্ষীরা কয়েকটি অংশে পাল্টা আক্রমণ করিয়াছে এবং কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে। স্ট্যালিনগ্রাদের শ্রমশিল্প এলাকায় আর এক বৃহৎ জার্মান আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। ককেশাসে সোভিয়েট সৈন্যেরা গত ২৪ ঘণ্টায় তুয়াপ্সেতে সমস্ত জার্মান আক্রমণ হটাইয়া তো দিয়াছেই, উপরন্তু তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে।

মিশর রণাঙ্গন—অষ্টম আর্মির দক্ষিণ পার্শ্বে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়াছে। অদ্য কায়রো হইতে যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয় যে, "শনিবার ও গতকল্য প্রতিপক্ষ আমাদের সৈন্যদিগকে আক্রমণের চেষ্টা করে। তাহারা আমাদের বাহিনীর পশ্চিমদিকে রেলওয়ে ও উপকূলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আসিয়া ঘাঁটি গাড়ে। আমাদের পদাতিক সৈন্যেরা তাহাদের ঘাঁটি রক্ষা করে; কিন্তু কিভাবে কয়েকটি শত্রু-ট্যাঙ্ক আমাদের ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। গতকল্য আমাদের ব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আক্রমণ চালায়।"

৩রা নবেম্বর

নয়াদিল্লীর এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে উভয়পক্ষের টহলদারী বৃদ্ধি পাইয়াছে। উভয়পক্ষে কয়েকটি ছোটখাট সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে; ফলে শত্রুপক্ষের সৈন্যেরা হতাহত হইয়াছে।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যবাহিনী বুনার পথে অবস্থিত কোকোদা ঘাঁটি দখল করিয়াছে।

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, লালফৌজ পূর্ব ককেশাস এলাকায় অবস্থিত নালচিক পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া আসিয়াছে।